সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সম্পাদিত।

Vol. 11

একাদশ বর্ষ।

১৩০৭।

কলিকাতা;
৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত
ও
৫।১২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, "মনিকা-যন্ত্রে"
শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ভ

নামানুক্রমিক সূচী।

চিত্র-সূচী।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সম্পাদিত।

Vol. 11

একাদশ বর্ষ।

১৩০৭।

কলিকাতা;
৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৫।১২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, "মনিকা-যন্ত্রে"
শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ও

ক

খ

চ

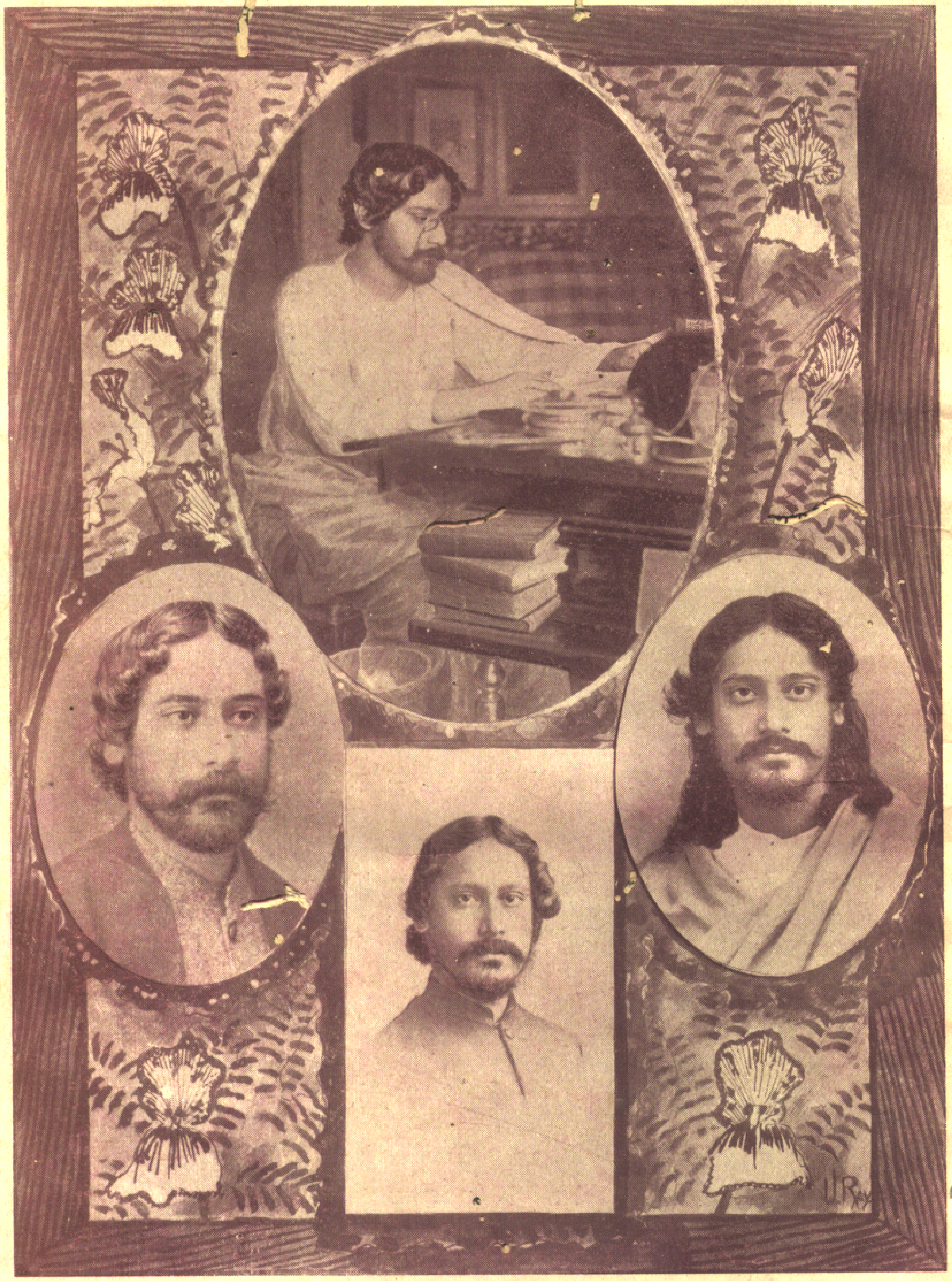
জ

ত

দ

নামানুক্রমিক সূচী।

চিত্র-সূচী।



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(বিভিন্ন বয়সে)।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

অপরা প্রকৃতি।

আমাদের নয়নের সম্মুখে যে বিশাল বিশ্ব প্রসারিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার বিবিধ বিচিত্রতায় বিমোহিত হইতে হয়। সে জগতের বিশালতা যেমন অচিন্ত্য, তাহার বৈচিত্র্যও সেইরূপ অদ্ভুত। আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী—যাহা অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি বালুকাকণার অধিক নহে, সেই পৃথিবীরই বৈচিত্র্য প্রায় সীমাহীন। ইহাতে কত নদ, নদী, সাগর, ভূধর, কত তরু, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, কত কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী বিরাজিত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এক মানব জাতিরই কত শাখা, প্রশাখা, বিভাগ, উপ-ভাগ! পৃথিবীতে কোটী কোটী মনুষ্য আছে, অথচ দুই ব্যক্তি সমান নহে। মানবের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইতর প্রাণীর সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে এত কীট,পতঙ্গ,সরীসৃপ,জলচর, ভূচর, খেচর জীবজন্তু আছে যে, তাহাদের গণনা মনুষ্য-সংখ্যায় কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব আছে। অতএব পৃথিবীর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য একরূপ অসীম বলা যাইতে পারে।

আমাদের এই পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একটি অনতিবৃহৎ গ্রহমাত্র। অর্থাৎ, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে সকল গ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, পৃথিবী তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর ভ্রাতৃস্থানীয় আরও ৭।৮টি গ্রহ আছে—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি। কোন কোন গ্রহের অনুগত আবার উপগ্রহ আছে; যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। কে বলিবে, এই সকল গ্রহ উপগ্রহ, সজীব প্রাণিবৃন্দের আবাসভূমি নহে? খুব সম্ভব ঐ সকল গ্রহে উপগ্রহে নানা শ্রেণীর বহুবিধ জীবজন্তু বিরাজিত আছে। অবশ্য,পৃথিবীর জীব জন্তুর সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে প্রভেদ। সম্ভবতঃ, তাহারা সম্পূর্ণই ভিন্নরূপ। হয় ত, ঐ সকল গ্রহ উপগ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সহিত যদি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বৈচিত্র্য একযোগে ভাবা যায়, তবে তাহা কতই সুবিশাল হইয়া পড়ে!

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের সূর্য্যের মত আরও লক্ষ লক্ষ সূর্য্য আকাশমণ্ডলে বিলম্বিত রহিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, আমরা আকাশপটে যে অগণ্য তারকারাজি চিত্রিত দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকেই

এক একটি সূর্য্য। আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত যেমন কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ আছে, সম্ভবতঃ অধিকাংশ তারকারই এইরূপ এক একটি মণ্ডল আছে। কে জানে, কত গ্রহ উপগ্রহ, সেই সেই মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী? হয় ত, সেই অগণিত গ্রহ উপগ্রহ, বিবিধ বিচিত্র প্রাণিসমূহের লীলাক্ষেত্র। সম্ভবতঃ প্রত্যেকেরই প্রাকৃতিক সংস্থান এবং উদ্ভিদ ও জীব জন্তুর আকার প্রকার স্বতন্ত্র। এই বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্য যদি মানব-কল্পনা একযোগে ভাবিতে পারে, তবে তাহার পরিমাণ, অনন্তবিস্তৃত হয় না কি?

অন্যপক্ষে, যদি এই অনন্ত বৈচিত্র্যের সম্প্রসারণ গুটাইয়া আমরা একত্বের অভিমুখে লইয়া যাই, তাহা হইলে কিরূপ হয়? একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সঙ্গীতে নানাপ্রকার রাগ রাগিণী আছে। প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের বিচিত্রতায় বিমুগ্ধ হইয়া মনে হয় যে, বুঝি তাহাদের বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞেরা অবগত আছেন যে, সা, ঋ প্রভৃতি সপ্তস্বরের সংযোগ সম্মিলনের ফলে এত রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ জগতের ভাষায় কত কোটী শব্দ আছে; আভিধানিকেরা তাহার ইয়ত্তা করিতে গিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া বসেন। কিন্তু শব্দবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই অসীম শব্দরাশি ৫০টি মাত্র বর্ণের সংযোগ সম্মিলন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টির বিশাল বৈচিত্র্যের মধ্যে কি এইরূপ কোন প্রণালীর প্রয়োগ করা যায় না?

সৃষ্ট পদার্থসমূহের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভাজ্য—স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গমের আবার দুই ভাগ—জীব ও উদ্ভিদ্। ইহাদিগের যথাক্রমে ইংরাজী নাম Mineral, Vegetable, Animal। প্রত্যেক ভাগের আবার বিভাগ, উপভাগ, জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি কত কি আছে। কিন্তু মূলতঃ সৃষ্ট পদার্থ হয় স্থাবর, নয় জঙ্গম (উদ্ভিদ বা জীব)। রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই কয়েকটি মূল ভূতের (elements) সংযোগ সম্মিলন হইতে উদ্ভূত। রসায়নবিদেরা বলেন যে, এই মূল ভূতের সংখ্যা ৬৫টি। জগতে যে কিছু ভৌতিক পদার্থ আছে, তাহা হয় এই ৬৫ মূল ভূতের মধ্যে কোন একটি, নয় ইহাদের কয়েকটির পরস্পর সংযোগ সম্মিলন হইতে উৎপন্ন বস্তু। অতএব সঙ্গীতের যেমন মূল স্বর ৭টি, ব্যাকরণের যেমন মূল বর্ণ ৫০টি, তেমনি রসায়নের মূল

রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে, সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত যে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ, এমন কি স্বয়ং সূর্য্যদেবের স্থূল দেহটি পর্য্যন্ত এই মূল-ভূতসমূহের উপাদানে গঠিত; তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন যে, অতি দূরতর তারা-সূর্য্য (যাহার ক্ষীণ রশ্মি পৃথিবীতে পঁহুছিতে, হয় ত, কত অযুত বৎসর সময় লাগে) সেই তারকাও ঐ সকল মূলভূতের উপাদানে নির্ম্মিত। অতএব তাঁহাদের মতে ঐ ৬৫টি মূলভূতই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানস্বরূপ। রসায়ন বিজ্ঞান ইহার অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশ্রান্তি যেমন সপ্তস্বরে, ব্যাকরণের বিশ্রান্তি যেমন ৫০ বর্ণে, তেমনই রসায়নের বিশ্রান্তি এই ৬৫ মূল ভূতে। কিন্তু একত্বের প্রবাহ এরূপ অর্দ্ধপথে বিশ্রান্ত হইতে পারে না। ইহার গতি আরও অনেকদূরগামিনী।

স্থূলতঃ বলিতে গেলে, ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে রসায়নের সিদ্ধান্ত এইরূপ। যে ৬৫টি মূল্‌ভূত সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপাদান, তাহারা পরস্পর বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। অবশ্য, প্রত্যেক স্থূল মূল ভূতই পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি। কিন্তু এক ভূতের পরমাণু অন্য ভূতে পরিণত হইতে পারে না। স্বর্ণের যে পরমাণু, সে স্বর্ণই থাকিবে, তাহাকে কিছুতেই পারদে পরিণত করা যাইবে না। এইরূপ পারদ পারদই থাকিবে, তাহার পরমাণুকে কোন মতেই স্বর্ণে বা লৌহে পরিণত করা যাইবে না। অন্যান্য মূল ভূত সম্বন্ধেও এইরূপ। অর্থাৎ, এই সকল মূল ভূত পরস্পর সংহত হইয়া অন্যান্য ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহারা কেহই অপর উপাদানের সংহনন-জনিত নহে। যে হেতু তাহারা মূল ভূত, অন্য সকল পদার্থ ফলভূত।

কয়েক বৎসর হইতে চিন্তাশীল রাসায়নিকেরা এই মতের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছিলেন। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহাও বলিয়াছিলেন যে, রসায়নোক্ত মূল ভূত সকল যে এক অদ্বিতীয় ভূতের পরিণামমাত্র, বিজ্ঞানের এই কল্পনা এক দিন সত্যে পরিণত হইবে।* বিজ্ঞানের এই কল্পনা বৈজ্ঞানিকপ্রবর সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ মহোদয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রসায়নোক্ত ৬৫টি মূল ভূত (elements) প্রকৃতপ্রস্তাবে, এক অদ্বিতীয় মহামূলভূতেরই পরিণতিমাত্র। রাসায়নিক এত দিন যাহাকে পরমাণু বলিতেন, তাহা বস্তুতঃ পরমাণু নহে। তাহা এই

* It is the dream of science that all the recognised chemical elements will one day be found but modifications of a single material element.—World Life. p. 48.

মহামূলভূতের (ক্রুক্‌স্ যাহার নামকরণ করিয়াছেন Protyle) পরমাণুপুঞ্জের সংহনন-জনিত ফলভূত। * মনীষী ক্রুক্‌স্ যাহা বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিছু দিন হইল,এক জন মার্কিনদেশীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এম্নস্ তাহা হাতে কলমে করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিজ্ঞানশালায় কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগে রৌপ্য হইতে নিখুঁত স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছেন। † এই কৃত্রিম স্বর্ণ ও খনিজ স্বর্ণের মধ্যে স্বর্ণকারেরা বহু পরীক্ষা করিয়াও কোন প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। অতএব এক অদ্বিতীয় মহামূল-ভূতের অস্তিত্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কল্পনা এখন বাস্তব সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, এই অশেষবৈচিত্র্যময় স্থূল জগৎ এক অদ্বিতীয় মহামূলভূতের সংহনন-বৈচিত্র্য-জনিত বিশেষ বিশেষ পরিণতিমাত্র।

---

* Crookes' chemistry admits that the primary constituents of all matter, of all atoms are identical in their nature and issue from one single basis called 'protyle', their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.—Dr. Marques : Scientific Corroborations p. 11.

Prof. Rucker believed matter to be a *complicated* collection of units themselves similar. Sir Norman Lockyer said 'we have no reason to suppose that the socalled atoms are not dissociable at high temperatures''—Report of a meeting of the British Association at Dover published in the *Nature* for January 1900.

* What is science in fact doing as to the atom ? It is finding in what is called the atom a composite body, a compound not an element. This discovery is chiefly due to the researches of Sir William Crookes. * * There is but one matter and all chemical elements are but modifications, aggregations of this one ultimate matter.—Annie Besant's Evolution of life and form. p. 32.

† Professor Emmens, one of the most skilled American mettallurgists claims that 'in the reduction of silver, the molecules are so subdivided as to differ so materially from the metal that they must be regarded as a new substance, parent apparently of both gold and silver i. e. 'the raw material out of which either gold or silver is constructed' Professor Emmens also finds that 'this new metlallic substance can be aggregated into molecules of greater density than silver and corresponding to gold in colour and weight'—Dr. Marques p 14.

Professor Emmens can at present make four ounces of gold out of six of silver.

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই কষ্টার্জ্জিত তত্ত্বনির্ণয়ের সঙ্গে আর্য্য ঋষির উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য ঋষিরা বলেন যে, এই যে বিবিধবৈচিত্র্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড; ইহা এক অদ্বিতীয় মূল প্রকৃতির পরিণতি-মাত্র। এই মূল প্রকৃতিই গুণত্রয়ের সংশ্লেষ, সংঘর্ষ ও সংরম্ভে নানা পরিণাম-গ্রস্ত হইয়া বিচিত্র বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে। এই উপদেশের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চরমসিদ্ধান্তের অনেকটা ঐক্য নাই কি? এখন কথা এই যে, আর্য্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রোক্ত "প্রোটাইল" কি এক পদার্থ? আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে এই উভয়কে এক পদার্থ মনে হয় না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতকে স্থূলভাবে দেখেন; সেই জন্য তাঁহার দৃষ্টি স্থূল জগতেই সীমাবদ্ধ। জগতের যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম স্তর আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। তাঁহার মতে, পদার্থের ঘন (solid), তরল (liquid) এবং বাষ্পীয় (gaseous) এই তিনটিমাত্র অবস্থা আছে। যেমন অপের তিন অবস্থা, বাষ্প, জল এবং বরফ। কেহ কেহ কায়ক্লেশে আজ কাল পদার্থের আকাশীয় (etheric) অবস্থাও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ইহার উপর আর উঠিতে প্রস্তুত নহেন। অথচ প্রাচীনেরা ক্ষিতি (solid), অপ্ (liquid) তেজ (gaseous) ও মরুৎ (etheric),—পদার্থের এই চারি অবস্থার উপরে আরও সূক্ষ্মতর ব্যোমের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রের স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও দুইটি সূক্ষ্মতর অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। সে অবস্থাদ্বয়ের নাম অনুপাদক ও আদি। অতএব আর্য্য ঋষিদিগের মতে এই স্থূল জগতের (যাহার শাস্ত্রোক্ত নাম 'ভূঃ'লোক) পর পর সাতটি স্তর আছে। সেই স্তর কয়টির সূক্ষ্মতম হইতে যথাক্রমে নাম—আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী। এক এক স্তরের ভূত এক একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব। এবং এক একটি তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী আমাদের এক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই তত্ত্বের সংযোগে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে যে বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উদ্ভূত হয়, আমরা যথাক্রমে তাহাদের নাম দিই—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। আদি ও অনুপাদক তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয় এখনও মনুষ্যদেহে স্ফুরিত হয় নাই; সেই জন্য তাহাদের সংযোগে যে স্পন্দন উৎপন্ন হইতে পারিত, আমাদের ভাষায় তাহাদের কোনও নাম নাই। এক এক তত্ত্বের উপাদানভূত পর-মাণুর পারিভাষিক সংজ্ঞা "তন্মাত্র"। পার্থিব পরমাণুর নাম গন্ধতন্মাত্র, জলীয়

পরমাণুর নাম রসতন্মাত্র, তৈজস পরমাণুর নাম রূপতন্মাত্র, বায়বীয় পরমাণুর নাম স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশীয় পরমাণুর নাম শব্দতন্মাত্র।

এ পর্য্যন্ত গেল, স্থূল জগতের কথা—ভূর্লোকের কথা। আর্য্য ঋষিরা বলেন যে, এই ভূর্লোকের পর পর আরও ছয়টি লোক আছে। তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম। এই সপ্তলোকের নাম যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। এই সপ্তলোকের প্রত্যেকই ভৌতিক উপাদানে গঠিত; পরস্পরে কেবল স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্য। প্রত্যেক লোকের আবার সাতটি করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকের সপ্তস্তরের আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপর ছয় লোকেরও এইরূপ সাতটি করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকের যাহা সূক্ষ্মতম স্তর—আদিতত্ত্ব, তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের protyle। অর্থাৎ, ভূর্লোকের আদিতত্ত্বই সেই জগতের চরম পরমাণু (ultimate atom)—সেই লোকের অদ্বিতীয় মহামূলভূত। সেই মূলভূতের সংহননেই নিম্নের অপরাপর ছয় স্তরের উপাদান গঠিত হয়। ভূর্লোকের যে আদিতত্ত্ব (protyle), তাহাই বিচিত্ররূপে সংহত হইয়া যথাক্রমে অনুপাদক তত্ত্ব, শব্দতন্মাত্র (আকাশতত্ত্ব), স্পর্শ-তন্মাত্র (বায়ুতত্ত্ব), রূপতন্মাত্র (তেজস্‌তত্ত্ব), রসতন্মাত্র (অপ্‌তত্ত্ব) ও গন্ধতন্মাত্র (পৃথিবীতত্ত্ব) উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু protyle ভুবর্লোকের আদিতত্ত্ব নহে। বস্তুতঃ ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব, ভুবর্লোকের স্থূলতম স্তর (পৃথিবী-তত্ত্ব) হইতেও স্থূল। ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের তুলনায় ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব চরম পরমাণু নহে; কিন্তু ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের পরমাণুপুঞ্জের সংহনন-জনিত। ভুবর্লোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য লোক সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এইরূপ পরস্পর বিশ্লেষণ করিয়া সত্য-লোকের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদিতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই আর্য্য ঋষির কথিত মূল প্রকৃতি। এই সর্ব্বসূক্ষ্মতম একমেবাদ্বিতীয় মহামূলভূত পর পর স্তরে স্তরে সংহত ও পরিণত হইয়া সর্ব্বনিম্ন স্তরে (ভূর্লোকে) আদিতত্ত্ব প্রোটাইলের রূপ ধারণ করে। অতএব, প্রকৃতি ও প্রোটাইল একজাতীয় হইলেও এক পদার্থ নহে।

এই মূল প্রকৃতির নামান্তর মায়া। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—মায়াকেই প্রকৃতি জানিবে। মায়া ও প্রকৃতি এক তত্ত্বেরই নামান্তর। যাহা এ পিঠে মায়া, তাহাই ও পিঠে প্রকৃতি। অর্থাৎ, যাহা পরাক্ দৃষ্টিতে (objective point of view হইতে) প্রকৃতি, তাহাই

প্রত্যক্ দৃষ্টিতে (subjective point of view হইতে) মায়া। এই প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,

"দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী। গুণ বলিলে আমরা এখন quality বা attribute বুঝি; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সেরূপ গুণ নহে। মূল প্রকৃতি এই তিনটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার (tendency) রঙ্গভূমি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অদ্বিতীয়, নির্দোষরূপে সম, মহামূলভূতে (অর্থাৎ সত্যলোকের absolutely homogeneous matterএতে) এই তিনটি পরস্পরবিরোধিনী প্রবণতার নিত্যসংগ্রাম চলিতেছে। এই সঙ্ঘর্ষ চিরস্থায়ী। যখন কালবশে এই বিরোধী গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (equillibrium) সংঘটিত হয়, তখন তাহার নামকরণ করা হয় প্রকৃতি। সে প্রলয়ের অবস্থা, অব্যক্তাবস্থা। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, যখন প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির অভিমুখী হয়, তখন তাহার নাম প্রধান। সৃষ্টির মুখে প্রকৃতি স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া সত্য প্রভৃতি সপ্তলোকে অনুলোমক্রমে ব্যাকৃত হয়। আর প্রলয়কালে এই সপ্তলোক বিলোমক্রমে স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অব্যাকৃত হইতে হইতে অবশেষে অব্যক্তা মূল প্রকৃতিতে উপশান্ত হয়।

এই সূক্ষ্মতমা মূলপ্রকৃতিকে ভগবান গীতাতে 'অপরা প্রকৃতি' আখ্যা দিয়াছেন। এই মূল প্রকৃতি আর এক প্রকৃতির সহিত নিত্য সম্বন্ধে জড়িত। ভগবান সেই প্রকৃতির নাম দিয়াছেন 'পরা প্রকৃতি'। কেহ কেহ ইহাকে দৈবী প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। পরা প্রকৃতির বিষয় আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। *

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

* এই প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

নামরহস্য।

শেক্ষপিয়ার লিখিয়াছেন,—

"———নামে কি করে?
গোলাপ, যে নামে ডাক, সৌরভ বিতরে।"

কিন্তু নামমাহাত্ম্যে কি কিছু নাই? কেবল নামের গুণে এ সংসারে অনেক কার্য্য সিদ্ধ, অনেক নিষ্ফল উদ্যম প্রশংসিত হয় না কি? শেক্ষপীয়র নিজেই দেখাইয়াছেন যে, নামের গুণ আছে। জুলিয়স সিজরের হত্যাকারীদিগের মধ্যে এক জনের নাম ছিল—'সীনা'। সীনা নামে আর এক জন কবি ছিলেন। এণ্টনির বক্তৃতা শুনিয়া রোমের অধিবাসিগণ যখন সিজরের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় কবি সীনার সহিত অকস্মাৎ পথে তাহাদের দেখা। তাহাদের মধ্যে এইরূপ কথা হইল,—

নাগরিক। তুমি কোথায় যাইতেছ?

সীনা। সিজরের সৎকার দেখিতে।

না। শত্রুভাবে, না মিত্রভাবে?

সী। মিত্রভাবে।

না। তোমার নাম কি, সত্য বল।

সী। সত্যই বলিতেছি আমার নাম সীনা।

না। এ এক জন ষড়যন্ত্রকারী, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল।

সী। আমি কবি সীনা! আমি কবি সীনা!

না। ইহার কদর্য্য কবিতার জন্য ইহাকে খণ্ড খণ্ড কর।

সী। আমি হত্যাকারী সীনা নহি।

না। নাই বা হইল, ইহার নাম ত সীনা বটে। ইহার হৃদয় হইতে নামটা ত উৎপাটন কর।

নাম-মাহাত্ম্য কিছু নাই কি?

১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে পারী নগরের "রু ব্লাঙ্কি" নামক রাস্তার ৭০ নং বাড়ীতে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ সমবেত। ঘোর বিপদ। লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দারুণ ষড়যন্ত্র

করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ ভীত, চকিত, ক্রুদ্ধ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বড়ই কঠিন সময়। সময়ও অল্প। স্থির হইল, প্রকৃতিপুঞ্জকে উত্তেজিত করা আবশ্যক। তজ্জন্য ঘোষণা অবিলম্বে প্রচার করিতে হইবে। অনেকে বলিয়া উঠিল,—"কি ঘোষণা দিতে হইবে বলুন, আমরা লিখিয়া লইতেছি।"

ভিক্টর হুগো বলিতে লাগিলেন; বোডিন্ লিখিলেন,—"লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বিদ্রোহী।"

জুল্স্ ফাবার বলিলেন,—"নেপোলিয়ন কথাটা কাটিয়া দাও। প্রজা-সাধারণ ও সৈন্যমধ্যে সে মহিমাময় নামের প্রভাব অসীম।"

ভিক্টর হুগো বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছেন।"

"নেপোলিয়ন" কথাটা কাটিয়া দেওয়া হইল। লেখা হইল,—"লুই বোনা-পার্টি বিদ্রোহী।"

নামের মাহাত্ম্য কিছু নাই কি? লুই নেপোলিয়নও কেবল নামের গুণেই সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে নামের গুণ ও দোষ অতি বিস্তৃতরূপে স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত নহে; কার্য্যেও প্রতিপাদিত। নাম না করিয়া আমাদের কোন কাজ হয় না। জমাখরচের খাতাই লিখি, আর চিঠিই লিখি, অগ্রে শ্রীদুর্গা বা শ্রীহরি না লিখিলে চলে না। কেহ কেহ প্রতিদিন নিয়মিতসংখ্যক দুর্গানাম না লিখিয়া আর কিছু লিখে না। বিপদে মধুসূদন, শয়নে পদ্মনাভ, শয্যাত্যাগে ও যাত্রা-কালে দুর্গা-নাম না করিয়া আমাদের কোন্ কাজ হয়? অন্ধকার রাত্রে বিজন পথে আমরা "রাম রাম" বলিয়া চলি,—বিশ্বাস, নামের গুণে, প্রেতযোনি পলাইবে; নিশাকালে সর্পের কথা উঠিলে স্ত্রীলোকেরা গড়ুরের নাম করে—ধারণা, সাপ আর আসিবে না, ভক্ত বলেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

জ্ঞান নহে, কর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে—কেবল নাম। নামের সেবক আমাদের মতন কেহ নাই।

আমরা জানি, কেবল নামের গুণে ত্রেতাযুগে জলে শিলা ভাসিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি,—

"হরিনামের গুণে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল।"

আবার পক্ষান্তরে, কেবল নামের গুণে গ্রাবু খেলায় চারিখানা তাস্ উঠিয়া

যায়। এমন নাম আছে, যাহা আহারের পূর্ব্বে কেহ করে না। সে নাম করিলে আহারে বিঘ্ন উপস্থিত হয়—হয় প্রস্তুতপ্রায় অন্নের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া আকায় পড়ে, নয় সজ্জীকৃত মুখের আহার জলের জালা ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়।

কেবল নামের জন্য আমাদের কতই না আগ্রহ, কতই না লালসা। ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক আসিয়া প্রাণপাত করিলেও যিনি একটা পয়সা দেন না, নিজের নাম গেজেটে দেখিবার জন্য তিনি শত সহস্র মুদ্রা অকাতরে জলে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরাশ্রয় প্রজার মুখের গ্রাস হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া যাঁহারা পাওনা খাজনার কড়া ক্রান্তি আদায় করিয়া লয়েন, তাঁহারাই একটা নামের জন্য, একটা "রায় বাহাদুর" "রাজা-বাহাদুরে"র জন্য শালগ্রামের উপবীত পর্য্যন্ত বেচিয়া শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতে যারপরনাই ব্যগ্র, এবং করিতে পাইলে যারপরনাই কৃতার্থ। আমরা নাম পাড়াইবার জন্য ভারতবৎসল, নাম পাড়াইবার জন্য সমাজসংস্কারক, নাম পাড়াইবার জন্য কাগজে লিখি, নাম পাড়াইবার জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা করি, এবং উত্তমর্ণকে ঠকাইবার জন্য সম্পত্তি বেনামী করি।

মানুষের নামের সম্বন্ধে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর নামের পক্ষপাতী। বীরভূমের লোকের নামে "হরি" শব্দটা বড় প্রবল; যথা—ভজহরি, রাখহরি, থাকহরি, বলহরি। ঢাকা অঞ্চলে পুরুষের নাম—রাজচন্দ্র, কালীচন্দ্র, বঙ্কচন্দ্র, শশীচন্দ্র; স্ত্রীলোকের নাম—রামমণি, কৃষ্ণ-মণি, হতমণি। ময়মনসিংহে "কিশোর" কথাটার খুব প্রাদুর্ভাব—রাধাকিশোর, নন্দকিশোর, ভবানীকিশোর, যুগলকিশোর, কেবলকিশোর। আমাদের এ অঞ্চলে অনেকে আজ কাল পুত্রকন্যার নাম নাটক উপন্যাস হইতে বাছিয়া বাহির করে। পূর্ব্বে লোকে দেবতার নামে ছেলে মেয়ের নাম রাখিত। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! উন্নতি না অবনতি!

কতকগুলি নাম আছে, যাহা শুনিলেই নামধারীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা আপনাআপনি মনে উদয় হয়। নামধারীকে কখন দেখি নাই, তাহার কথা কাহারও কাছে শুনি নাই, তাহার কোন কার্য্যের সহিত পরিচিত নহি, অথচ কেবল নাম শুনিয়া স্থির করিয়া লই, লোকটা কি রকমের। এই প্রথম ধারণা অনেক সময় পরে সংশোধন করিতে হয় বটে, কিন্তু তখন মনে হয়—নাম এবং নামধারী পরস্পর উপযোগী নহে—এ লোকের এ নাম হওয়া

রসিক, আমোদপ্রিয়, শ্যামবর্ণ, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ। ইয়ারকির মজলিশে বেশ পসার; পণ্ডিতের মধ্যে কিছু মুখচোরা। পক্ষান্তরে তেমনি "গোবর্দ্ধন" নাম শুনিলেই মনে হয়, লোকটা নির্ব্বোধ, একটু হাবা, স্থূলকায়, একটু "রামবল্লভ" রকমের, বাজার হাট করিতে গিয়া দরদাম লইয়া প্রত্যহই দোকানদারের সহিত ঝগড়া করে, এবং প্রত্যহই ঠকিয়া আসে। কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস, জিনিসপত্র কিনিতে তাহার ন্যায় দক্ষ বিশ্ব বাঙ্গলায় আর কেহ নাই। রাম-সদয় মিত্রের পত্নীর সম্বন্ধে রজনী বলিয়াছে,—"তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানি না, কিন্তু তাঁহার গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ব্যতীত অন্য নাম আমার মনে আসে না।"

পাঁচ জনে নাম করিবে, ইহার জন্য কত লোকে কত দুষ্কর্ম্ম করে—খ্যাতির জন্য কলঙ্ক কিনে। সুনামই হউক, দুর্নামই হউক, নাম ত বটে। এইরূপ নামের জন্য একটা প্রাচীন গ্রীক একটা দেবমন্দির পোড়াইয়াছিল।

ইংরেজেরা বলেন, Give your dog a bad name and hang it. ইহার অর্থ, তোমার কুকুরের একটা বদনাম দেও, তাহার পর তাহাকে ফাঁসি দিও। এইরূপ কোন কথা বাঙ্গলায় নাই বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, কেহ কেহ চাকর ছাড়াইতে হইলে একটা দুর্নাম দিয়া ছাড়ায়। অন্য দিকে মানুষের স্বভাব এই যে, নিজের কুপ্রবৃত্তি, কুঅভ্যাস, কুকাজে একটা সদাখ্যা প্রদান করিয়া আত্মপ্রতারণা করে। আমরা যদি সকল সময়ে সকল বিষয়কে তাহার প্রকৃত নামে অভিহিত করি, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক পাপের হাত এড়াইতে পারি।

আমাদের দেশের লোকে একটা বড় ভুল করিয়া থাকে। বেনামী দরখাস্ত গ্রহণ করে। যাহাদের প্রকাশ হইবার সাহস নাই, তাহারাই বেনামী দরখাস্ত বা চিঠি লেখে। আমরা এতই অল্পবুদ্ধি যে, আমরা তাহাই গ্রহণ করি, এবং তদুপলক্ষে কার্য্য করি। নামের কথা আর বলিব কি, যে জিনিস সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, তাহারই নাম বিনামা। এই প্রবন্ধটাই যে "সাহিত্যে" স্থান পাইতেছে, সেও বোধ করি যে কেবল একটা নামের জন্য।

এই পার্থিব জীবনের শেষ—মৃত্যু। মৃত্যু ত ক্ষণিক। তাহারই পর অনন্ত। তাহাকেই পরিণাম বলে। নামের কথা ইহার উপর আর কি বলিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

দান শাহ্।

সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাসলেখকগণ দান শাহকে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাবৃত নিভৃত সমাধি হইতে টানিয়া আনিয়া উজ্জ্বল সাহিত্যক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়াছেন। ইংরেজী ইতিহাসে ইনি "দানা শা", স্বীয় প্রতিবেশিগণের নিকট "দান শা", এবং প্রতিবেশী ভক্ত স্বধর্ম্মীর নিকট "শা দান উল্লা" নামে পরিচিত। মালদহ জেলার অন্তর্গত রতুয়া থানার এলাকায় সাহাপুর গ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল, সাহাপুর কালিন্দী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, এবং রাজমহল হইতে গঙ্গার অপর পারে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

দান শাহ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন ;— "সিরাজউদ্দৌলা রাজমহলের অপর পারে উপস্থিত হইলে, তিনি ও তদীয় বেগমগণ ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া দানা শা নামক এক মুসলমান দরবেশের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সম্পদের দিনে সিরাজ দানা শার অপমান করিয়াছিলেন, সেই অবমাননার প্রতিহিংসানল তখনও দানা শার হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। কিন্তু দানা সিরাজকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া খেচরান্ন প্রস্তুত করিবার আয়োজন করেন, এবং অপর দিকে গঙ্গার অপরপারে রাজমহলের ফৌজদার মীরজাফরের ভ্রাতা মীর কাশিমের নিকট সিরাজের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করেন। মীর কাশিম এই সংবাদ পাইবামাত্র দরবেশের কুটীরে আসিয়া সিরাজকে ধৃত করেন।" কোন কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, সিরাজ দানা শার নাসাকর্ণচ্ছেদ করেন; কেহ বা লিখিয়াছেন, সিরাজের আদেশে দানা শার শ্মশ্রুগুম্ফ কর্ত্তিত হয়, এবং সেই আক্রোশেই দানা শা সিরাজকে ধরাইয়া দেন ; আবার কোনও কোনও ইতিহাসলেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কোনও প্রতিহিংসাপরায়ণ দরবেশের প্রদত্ত সংবাদে সিরাজ বন্দী হইয়াছিলেন; অথচ তাঁহারা সেই দরবেশের নাম প্রদান করেন নাই। এই সকল পরস্পরবিরুদ্ধ বিবরণের সামঞ্জস্যসাধন করিলে এইমাত্র ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় যে, সিরাজ দরবেশবিশেষের অপমান করিয়া তাহার আক্রোশভাজন হন, এবং তাহার ফলে সেই দরবেশের চক্রান্তে শত্রুহস্তে বন্দী হন। এই দরবেশই দান শাহ কি না,

তাহা ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধেয়। দান শাহ সম্বন্ধে ইতিহাসলেখকগণের উক্তির সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম ; এক্ষণে দানা শাহের উত্তরপুরুষগণের নাম-তালিকা সহ তাঁহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ জনশ্রুতি হইতে সংগ্রহ করিয়া বিবৃত করিতেছি।

দান শাহের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাঁর উত্তরপুরুষ-গণের বংশপত্রিকা এই ;—

- শা দান উল্লা।
  - শা হেদায়ৎ উল্লা।
    - শা মতি উল্লা।
      - সা ফজেল আলি।
        - শা খোরম আলি।
      - শা তালেব আলি।
      - শা বন্দে আলি।
        - শা তফজ্জল আলি।
    - শা হাফিজ উল্লা।
      - শা করম হোসেন।
        - শা আসক হোসেন।

সাহাপুরের জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট শুনিয়াছি যে, দান শাহ মুরশিদাবাদের নবাব-বংশের মুরশিদ বা গুরু ছিলেন। ইনি নবাবের নিকট নিষ্কর জোত জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দান শাহের পৌত্র মতি ও হাফিজ, সিরাজের ব্যবহারদোষে তাঁহার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করেন, এবং পরে ইংরেজ-আমলে ইহাঁদিগের জোত সকল বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। দান শাহ অমায়িক, নিরহঙ্কার ও আড়ম্বরবিহীন সাধুপুরুষ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ইহাঁর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। ইহাঁর উত্তরপুরুষগণও ধার্ম্মিক ও সম্মানভাজন ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে দান শাহের পৌত্র মতি ও হাফিজ অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। দান শাহের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শা আসক হোসেন প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে সন ১২৯১ সালে লোকান্তরিত হন। ইহাঁর দুই স্ত্রী ও তিন কন্যা ১৩০৩ সালের কার্ত্তিক মাসে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁর মধ্যমা কন্যার গর্ভজাত দৌহিত্রের বয়স এই সময়ে কুড়ি বৎসরের অধিক হইয়াছিল।

সাহাপুরের প্রান্তভাগে "দান শাহের দরগা" বলিয়া একটি স্থান আছে। জনশ্রুতি এই যে, এই স্থলে দান শাহ ও তাঁহার উত্তরপুরুষগণ সমাহিত হন। এই স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও তরুলতায় বেষ্টিত। এই স্থানে কতকগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর পতিত আছে। স্থান দেখিয়া বোধ হয় যে, পূর্ব্বে এখানে একটি মসজি-

দণ্ড ছিল। একখানি প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলি তুখরা অক্ষরে ক্ষোদিত লিপি আছে। দান শাহ ইষ্টকপ্রস্তরগঠিত অট্টালিকা ভালবাসিতেন না। তিনি তৃণবংশগঠিত কুটীরেই আনন্দলাভ করিতেন; সুতরাং দান শাহের দরগাতেও তদুপযুক্ত কোনও সুনির্ম্মিত সমাধি বর্ত্তমান নাই। দান শাহের দরগায় দ্রষ্টব্য কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি রাশীকৃত ইষ্টক প্রস্তর ও অনাবৃত পতিত ভূখণ্ড তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

দান শাহ যে সিরাজউদ্দৌলাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করেন, তাহা স্থানীয় লোকে ও তাঁহার বংশধরগণ 'ঝুট' বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাঁরা বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলার সময় দান শাহ জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পৌত্রদ্বয়ের সহিত দুইবারমাত্র সিরাজউদ্দৌলার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সাক্ষাৎসম্বন্ধীয় জনশ্রুতি ঐতিহাসিকগণের প্রয়োজনে আসিতে পারে, এই বিবেচনায়, এ স্থলে তাহা লিপিবদ্ধ হইতেছে।

কালিন্দী নদী সাহাপুরের পশ্চিমপার্শ্ববাহিনী। এই কালিন্দী নদীর পূর্ব্ব-পার্শ্বে দানা শাহের দরগা ও পশ্চিম পার্শ্বে কাহেলা গ্রাম। এই গ্রামে সিরাজের সময় শাহ হালাল নামে জনৈক পীরজাদা বুজরুকী-বলে সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সিরাজ একবার সসৈন্যে এই কাহেলা গ্রামের পীরজাদার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। শাহ হালাল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পাগড়ী নিক্ষেপ করিয়া তাহা আপন বুজরুকী-বলে গোলাপ পুষ্পে পরিণত করেন। ইহা দেখিয়া সিরাজ অতিমাত্র বিস্মিত হন, এবং সাহাপুরের মতি ঐরূপ বুজরুকী দেখাইতে সমর্থ কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। অহঙ্কারী শাহ হালাল বলেন,—"মতি নামে বটে, কিন্তু গুণে নয়।" অতঃপর উদ্ধত সিরাজ বলেন যে, "আগামী কল্য প্রত্যূষে মতিকে এ পারে আনাইয়া তাহার বুজরুকী দেখিতে হইবে; মতি বুজরুকী দেখাইতে পারে ভালই, নচেৎ তাহার শ্মশ্রুগুম্ফ গর্দ্দভের মূত্রসিক্ত করিয়া মুড়াইতে হইবে।" মতি অপর পারে থাকিয়াই বুজরুকী-বলে ঐ ব্যাপার অবগত হন, এবং আপন ভ্রাতা হাফিজকে বলেন,—

'লাল কি লালি গেই, সাদা হো গয়া।
লড়্‌কো খাসলৎ ছোড়কে মাদা হো গয়া॥'

পরদিন প্রত্যূষে সিরাজের আহ্বানে মতি ও হাফিজ নদীর উপর রুমাল ভাসাইয়া তৎসাহায্যে কালিন্দী পার হইয়া কাহেলা গ্রামে সিরাজের শিবিরে গমন করেন। তখন পীরজাদা শাহ হালাল ইহাঁদিগকে বসিবার আসন (কুর্সি)

প্রদান করিলে, পীরজাদার সাক্ষাতে আসনগ্রহণ উচিত নহে, এই বলিয়া, তাঁহারা বিনয়সহকারে ভূমিতলেই উপবেশন করেন। পরে সিরাজ বুজরুকী দেখাইতে আদেশ দিলে, তাঁহারা যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে বলিলেন, পীরজাদা বুজরুকী না দেখাইলে নিজেরা কিরূপে দেখাইবেন? তখন শাহ হালাল বাহাদুরী-প্রকাশের সুবিধা পাইয়া ও নবাবের মুরশিদ-পদলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া পূর্ব্বদিনের বুজরুকীর পুনরাবৃত্তি করিলেন। পীরজাদা যেমন গোলাপ তুলিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডের উপর হস্ত প্রসারিত করিলেন, অমনই সিরাজ পূর্ব্বদিনের আদেশ স্মরণ করিয়া পার্শ্বচরকে গর্দ্দভ আনয়ন করিবার ইঙ্গিত করেন, এবং মতি নিজ হস্তস্থিত সোটা (যষ্টি) দ্বারা অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ করেন, এবং তৎক্ষণাৎ শাহ হালালের হস্ত স্কন্ধচ্যুত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়। অতঃপর মতি "চলে আও!" বলিয়া পূর্ব্বদিকে নেত্রপাত করিলেন। সেই দিক হইতে বাদলের বারি-ধারার ন্যায় তীরবেগে ইষ্টকরাশি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন সিরাজ ও হালাল মতি ও হাফিজের শরণাপন্ন হইলেন, এবং মতির আদেশে ইষ্টকগুলি অন্য কোন দিকে না গিয়া একটি বটবৃক্ষের উপর পতিত হয়। এই দিন হইতে দান শাহের তেজস্বী বংশধরগণ সিরাজের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। কাহেলা গ্রামে ঐ বটগাছটি এখনও বর্ত্তমান, এবং তন্নিম্নে ইষ্টকরাশি এখনও স্তূপীকৃত আছে।

ইহার কিছু কাল পরে সিরাজ রাজ্য সৌভাগ্যশ্রী হারাইয়া যখন নৌকাযোগে সাহাপুরের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি মতি ও হাফিজের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কুটীরমাত্র সম্পত্তির মালিক মতি ও হাফিজ সিরাজকে গুপ্তভাবে রাখিয়া বলেন, আমাদের কোনরূপে সাহায্যদানের ক্ষমতা নাই। এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক; ইতিহাসলেখকগণ সাহাপুরের পরিবর্ত্তে বাখড়া বড়ালের পার্শ্ব দিয়া সিরাজের নৌকাযোগে পলায়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাহাপুর বাখড়া বড়াল গ্রামদ্বয় হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে কালিন্দী নদীর তীরে অবস্থিত।

দান শাহ ও তাঁহার পৌত্রদ্বয়ের সহিত সিরাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ প্রদেশে যে জনশ্রুতি প্রচলিত, তাহা যথাযথ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্কাশন আমার সাধ্যাতীত। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, দান শাহের মত সাধুপ্রকৃতি লোক যে সিরাজ গুরুতর আততায়ী হইলেও তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস

হয় না। তবে কাহেলা গ্রামের পীরজাদার নিকট দানা শাহের বংশধরগণের অপমানজনক সিরাজের মন্তব্য ও পরে ইহাঁদের বাসগ্রামের সন্নিকটে সিরাজের শত্রুহস্তে বন্দী হইবার বৃত্তান্ত হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, প্রকৃত ঘটনা রূপান্তরিত হইয়া তাহা হইতেই সিরাজ কর্ত্তৃক দরবেশ দানশাহের অপমান ও তাঁহারই চেষ্টায় সিরাজের শত্রুহস্তে বন্দী হইবার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার আবশ্যক। কাহেলা গ্রামের পার্শ্বেই শুয়রমারা গ্রাম। মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সিরাজের এই স্থলে বন্দী হইবার বৃত্তান্তকে হেতু করিয়া শুয়রমারা গ্রাম ও দান শাহকে "শুভামার" সংজ্ঞায় আখ্যাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থানের নিকটে সিরাজ ধৃত হন বলিয়া তাহার নাম "শুভামার" দেওয়া অন্যায় না হইতে পারে, কিন্তু স্থানীয় কেহই শুয়রমারাকে "শুভামার" বলে না, বা ইহা "শুভামার" বলিয়া কখনও পরিচিত ছিল বলিয়া জানে না। সিরাজ যে ঠিক কোন্ স্থানে ধৃত হন, তাহাও নির্ণয় করা যায় না। এই জন্য শুয়রমারাকে শুভামার আখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না।



ভরার মেয়ে।

[পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে শ্রোত্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। পাত্রকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। সেই জন্য অনেক ব্রাহ্মণকে অকৃতদার থাকিতে হয়। পূর্ব্বে এই সুযোগে এক দল লোক একটা ব্যবসায় চালাইত। তাহারা দূরদূরান্তরের গ্রাম হইতে অল্প মূল্যে দরিদ্রকন্যা ক্রয় করিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিত। সাধারণতঃ নৌকায় আনীতা হইত বলিয়া ঐ সকল কন্যা "ভরার মেয়ে" নামে অভিহিতা হইত। কোন কোন অকৃতদার ব্রাহ্মণ সস্তা দরে সেই মেয়ে ক্রয় করিয়া বিবাহ করিত। যাহারা ঐ সকল অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত পরিণয়বদ্ধ হইত, তাহাদিগকে সমাজের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। তাহাদের মধ্যে যাহারা সৌভাগ্যক্রমে অর্থশালী হইয়া উঠিত, তাহাদের সমাজে

'চলিবার' সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু যাহারা দরিদ্র থাকিত, তাহাদিগকে বংশপরম্পরাক্রমে সমাজের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। লোকে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার নাও করিতে পারিত। কোনও সভায় বা নিমন্ত্রণস্থলে ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের সহিত একত্র উপবেশনে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের পক্ষে সে স্থান ত্যাগ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।]

৯

'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিয়া অন্নদাচরণের বাহিরে যে বিপদ না হইল, ঘরে সে বিপদ ঘটিল। একটা বয়স আছে, যখন হৃদয়ে প্রেমপিপাসা স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠে,—মানব জীবনের সঙ্গীর সন্ধান করে। সেই জীবনের বসন্তসময়। বাহিরের লোকের মধ্যে যাহারা সে বয়সের সীমার মধ্যে ছিল, তাহারা বলিল, অন্ত মেয়ের অভাবে ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়া অন্নদাচরণ বিশেষ গর্হিত কায করে নাই ; আর যাঁহারা সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন,—যাঁহাদের হৃদয়ে বসন্তের কুসুম নিদাঘতাপে ম্লান হইয়া আসিতেছিল, তাঁহারা কেবল পূর্ব্বপাড়ার বসুদের চণ্ডীমণ্ডপে পাশার বৈঠকে ধূমপান করিতে করিতে গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অন্নদা ছোঁড়া ঘর নষ্ট করিয়া কাযটা ভাল করে নাই। সামাজিক বিপদ এখানেই একরূপ শেষ হইল ; এমন কি, সামাজিক নিমন্ত্রণাদিতেও আর কোন গোল হইল না।

কিন্তু ঘরে তাহার বিপদের অন্ত রহিল না। অন্নদাচরণ কিছুতেই মাতঙ্গিনীকে বুঝাইতে পারিল না যে, সে দাসীর অভাবে তাহাকে বিবাহ করে নাই, পরন্তু পত্নী চাহিয়া বিবাহ করিয়াছে। মাতঙ্গিনী নিতান্ত সহিষ্ণু দাসীর মত স্বামীর সকল আজ্ঞা নীরবে—বিনা আপত্তিতে পালন করিত ; কিন্তু কখনই যুবতী স্ত্রীর মত মান অভিমান দেখাইত না, বা আদর সোহাগ চাহিত না। স্বামীর তিরস্কারে কোন দিন অভিমানে তাহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিত না। সে যেন গৃহকর্ম্মসম্পাদনের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্র ; তাহাকে লইয়া সংসার চালাইতে আর ভাবিতে হয় না, কিন্তু কলের জল যেমন দূষিতপদার্থবর্জ্জিত ও তৃষ্ণানিবারক হইলেও তাহাতে স্রোতের জলের আস্বাদ বা গুণ কিছুই পাওয়া যায় না, তেমনই তাহাকে লইয়া যৌবনের প্রবল প্রেমতৃষ্ণার নিবারণ করা সম্ভব নহে। একে ত যৌবন সাধারণতঃই প্রেমের লীলাভূমি, তাহাতে আবার অন্নদাচরণের জীবন বহির্জগতের সহিত সম্পর্কশূন্যভাবে ঢাকা জেলার এই সুদূর পল্লীতেই অতিবাহিত হয় নাই। যে বিহগ পিঞ্জরে জন্মগ্রহণ করিয়া পিঞ্জরেই

বর্দ্ধিত হয়, পিঞ্জরে. তাহার তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু যে বিহগ মুক্ত বাতাসে নীলাম্বরতলে প্রসারিতপক্ষে সূর্য্যের কর উপভোগ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দে বনে বনে মাঠে মাঠে বিচরণ করিয়াছে,পিঞ্জর তাহার পক্ষে যন্ত্রণার আধারমাত্র। বাল্যকাল হইতে কিছু দিন অন্নদাচরণ মাতুলালয়ে কাটাইয়াছিল। সেই বৃহৎ গ্রামে সে বহির্জগতের সহিত বিশেষ সংস্রবে আসিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া অন্নদাচরণ গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তখন সংসারে কেবল একটি অবিবাহিতা ভগিনী—বয়স সাত বৎসর। দেশে যে জমা-জমি ছিল,তাহাতে একটা ছোট পরিবারের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ী আসিয়া অন্নদাচরণ প্রথম প্রথম কাযের অভাবে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু প্রথমে যাহা নূতন থাকে, ক্রমে তাহা সহিয়া যায়; তখন পরিচয়ের মাধুরী তাহাকে নূতনসৌন্দর্য্যরস-সিক্ত করিয়া তুলে। পরিচিত কুটীর দরিদ্রের নিকট অপরিচিত প্রাসাদ অপেক্ষা প্রিয়, পুরাতন দ্রব্যের প্রতি একটা মমতা নিতান্তই স্বাভাবিক। একটা নূতন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা পুরাতন পরিচিত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে অধিক প্রভাব সংস্থা-পন করে। ক্রমে সে জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবার পর অন্নদাচরণ আর সে কর্ম্মাভাব অনুভব করিত না।

অন্নদাচরণের ঘরে সমানে বিবাহ করা সহজ নহে। প্রথমতঃ কন্যার অভাব—দ্বিতীয়তঃ সে বিবাহ ব্যয়াধিক্যবশতঃ দরিদ্রের ক্ষমতার অতীত। এই সব ভাবিয়া—আপনি বুঝিয়া শেষে অন্নদা 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিল। বিবাহ করিয়া সে কতকটা হতাশ হইল। সে বহির্জগতের সম্পর্কে যাহা জানিয়াছিল, তাহাতে সে স্বভাবতঃই স্ত্রীর নিকট দাসীত্ব ভিন্ন আরও কিছুর প্রত্যাশা করিয়াছিল। প্রথমে বহু চেষ্টায় স্ত্রীর ভাবপরিবর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া সে আশা করিয়াছিল, সন্তান হইলে স্ত্রীর এ ভাব ঘুচিবে। কিন্তু তাহার সন্তানলাভের আশা পূর্ণ হইল না।

যখন বিবাহের পর পাঁচ বৎসর কাটিল, তথাপি স্ত্রীর ভাব-পরিবর্ত্তন হইল না, তখন অন্নদাচরণ সময় সময় হতাশায় বিরক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহার সে বিরক্তি কখনও স্থায়ী হইত না। সবলের প্রেমে একটা সুস্নিগ্ধ স্নেহ মিশ্রিত থাকে; তাই সে আপনি বিপন্ন হইয়াও দুর্ব্বলকে বিপন্মুক্ত করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে, আপনার কষ্ট কষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। তাই স্ত্রীর মান অভিমানে স্বামী বিরক্ত হয় না, স্ত্রীকে সুখী করিয়া আপনি গর্ব্বের সুখ অনু-

ভব করে। স্ত্রী কথায় কথায় স্বামীর উপর রাগ করে, স্বামী তাহার শত অপরাধ দুর্ব্বলের চাপল্যপ্রসূত বলিয়া সানন্দে ক্ষমা করিয়া থাকে।

২

'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত অন্নদাচরণের জীবনে উপন্যাসের উপযোগী কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই;—একটা আসন্ন মরণ ও অসম্ভব উদ্ধার, অপ্রত্যাশিত বিপদ ও জটিল উপায়ে বিপন্মুক্তি, সংসারে বিরক্তি ও সন্ন্যাসগ্রহণ, বা জমীজমা লইয়া বিবাদে প্রতিবেশীর পুত্রকে হত্যা করা—এমন কিছুই ঘটে নাই। সংসারে শতকরা নিরনব্বই জন লোকের জীবনে 'রোমান্সে'র ছায়া পড়ে না—কোনও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে না। সংসারে শতকরা নিরনব্বই জন লোক অসাধারণ প্রতিভার, অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির বা অসাধারণ রহস্যরসের অধিকারী নহে। সংসারে শতকরা নিরনব্বই জন লোকের পাপপ্রয়াস বা পুণ্যপ্রার্থনাও অসাধারণ নহে। তাহাদের পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বিষাদ, সবই আতিশয্যবর্জ্জিত—সবই নিতান্ত সাধারণ। অন্নদাচরণের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাতে দাঁতন করিতে করিতে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে গাছের চারাগুলি পরীক্ষা করা হইতে, মধ্যাহ্নে আহারের পর দাওয়ায় বসিয়া সমাগত সমবয়স্কদিগের সহিত আলাপ ও তাস-খেলা প্রভৃতি সব ঘটনার বিবরণ বিবৃত করা আবশ্যকও নহে—সঙ্গতও নহে।

এই সময় অন্নদাচরণের মনে কেবল একটা চিন্তা প্রবল ছিল;—ভগিনী বিবাহ-যোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা, সামর্থ্যে কুলায় অথচ পাত্রটি সচ্চরিত্র হয়—তাহার গৃহে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কষ্ট না হয়, এমন একটি পাত্রের সন্ধান করিয়া সে বিফলযত্ন হইতেছিল। সাধারণতঃ শ্রোত্রীয়গণ কন্যার বিবাহে বিস্তর অর্থ পাইয়া থাকে, কিন্তু একে ভগিনীবিক্রয়ে অন্নদাচরণের প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাতে আবার সে নিজে 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করায় সকলে তাহার ভগিনী-গ্রহণে সম্মত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাকেই অর্থ দিতে হইবে। সে স্থির করিয়াছিল, ছোট ঘরে ভগিনীর বিবাহ দিবে সেও ভাল, কিন্তু তাহাকে অপাত্রে ন্যস্ত করিবে না। সে সমাজের শাসনের অপেক্ষা বিবেক-তাড়নের অধিক ভয় করিত; সমাজের সম্মানের অপেক্ষা হৃদয়ের প্রকৃত সুখ বাঞ্ছনীয় মনে করিত। তাহার ভরসার মধ্যে এইটুকু ছিল যে, ভগিনী সুরূপা; যে কেবল অর্থের জন্য বিবাহ নাও করিতে পারে, সে সম্ভবতঃ তাহাকে দেখিলে

বিবাহ করিতে সম্মত হইবে। কিন্তু যৌবনাগমে তাহার সে রূপরাশি যতই পরিস্ফুট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, ততই তাহার ভগিনী ও পত্নী সে রূপরাশিকে আপদ বলিয়া মনে করিতেছিল। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের বৌ ঝিকে নানা কাযে সময় সময় একাও ঘাটে বা প্রতিবেশিগৃহে যাইতে হয়। যে কুরূপা, তাহার কুরূপই তাহার রক্ষক, যে অসামান্যরূপবতী, লোকে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখে। পুরুষের প্রশংসার দৃষ্টি বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা না করাতেই হিন্দুর মেয়ে মনে করে যে, রূপযৌবনসম্পদ স্বামী ব্যতীত আর কেহ দেখিলে সে সম্পদ বিপদে পরিণত হয়, আর "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।"

অন্নদাচরণের জীবন এমনই ভাবে কাটিতেছিল। একদিন প্রভাতে তাহার দ্বারে নীল আকাশে বজ্র-ঝঞ্ঝা-সহচর মেঘের মত কৃতঃপ্রাতঃস্নান নামাবলীগাত্রে শিরোমণি ঠাকুরের আবির্ভাব হইল। অন্নদাচরণ যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তিনি নিষ্ঠাবান—অন্নদাচরণ আম্রের পত্র আনিয়া নল প্রস্তুত করিয়া দিল—হুক্কায় সেই নল লাগাইয়া শিরোমণি ধূম পান করিতে লাগিলেন। অন্নদার পিতার সহিত তাঁহার কিরূপ আত্মীয়তা ছিল—ইত্যাদি নানা কথার পর তিনি মৃদুস্বরে কি একটা প্রস্তাব করিলেন। অন্নদাচরণ যেন দেহে তাড়িতস্পর্শে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আপনি কি রহস্য করিতেছেন?"

গম্ভীর হইয়া কিছু রুক্ষস্বরে শিরোমণি বলিলেন, "রহস্য কেন? তোমার সহিত আমার রহস্য করিবার কারণ?"

এইবার যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িল। অন্নদাচরণ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনার নাতিনীরা আমার ভগিনীর অপেক্ষা বয়সে বড়, আর আপনি আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে চাহেন! আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। আপনি কিসে আমাকে এমন অমানুষ বুঝিলেন যে, ভাবিয়াছেন, আমি আমার ভগিনীকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিব?"

"এ প্রদেশে এমন কে আছে, যে মাধব শিরোমণিকে ভগিনীদান করিলে কৃতার্থ না হয়? আমি আমার মান খোয়াইয়া তোমার মান বাড়াইতেছিলাম। আজ তুমি যাহা করিলে, তাহার জন্য তোমাকে পস্তাইতে হইবে।—ব্রহ্মশাপ—তোমার ভগিনীই তোমার কাল হইবে।"

"আপনি বৃদ্ধ না হইলে আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম। কেবল বৃদ্ধ

বলিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম। আর আমার বাটীর ত্রিসীমায় আসিবেন না।”

“কে কাহাকে শিক্ষা দেয় দেখিবে”—বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে শিরোমণি অন্নদাচরণের গৃহত্যাগ করিলেন।

অন্নদাচরণ বেগে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখনও ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল।

৩

ইহার পর অন্নদাচরণ সর্ব্বস্বপণ করিয়া ভগিনীর বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বহুকষ্টে বহু দূরে—অন্নদাচরণের মাতুলের আবাসগ্রামে একটি পাত্রের সন্ধান মিলিল। পাত্রের পিতা মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করিলেন। তিনি সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতেছিলেন, সহজেই অন্নদাচরণের ভগিনীকে স্বাগ্রহে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। অন্নদাচরণ সকল যোগাড় করিতে গ্রামে বিবাহের কথা প্রকাশ করিল না।

অন্নদাচরণ ভগিনীকে ও স্ত্রীকে লইয়া মাতুলালয়ে গেল। নির্দ্ধারিত দিনে ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেল। মাতুল অতি চতুর লোক, তিনি বুঝিলেন, অন্নদা ‘ভরার মেয়ে’ বিবাহ করিয়াছে, শত্রু মিত্র সকলেরই আছে, সে ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া যাইলে যদি কেহ কোন কথা তুলে,তবে তাহার ভগিনীর শ্বশুর পুত্রবধূকে ঘরে লইতে আশঙ্কা করিতে পারেন। তাই তিনি অন্নদাকে বলিলেন যে, তাহার ভগিনী বয়ঃপ্রাপ্তা, হয় ত তাহার শ্বশুর শীঘ্রই তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিবেন; কিন্তু তাহার গ্রাম দূরপথ,সে স্থান হইতে মেয়ে পাঠান বড় ব্যয়সাধ্য, তাহাতে নানা অসুবিধা, সুতরাং তাঁহার ভাগিনেয়ী তাঁহার নিকটেই থাকুক। এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া অন্নদাচরণ ভগিনীকে মাতুলালয়ে রাখিয়া স্ত্রীকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

ননন্দার বিবাহ হইয়া গেলে মাতঙ্গিনীর বুকের উপর হইতে যেন গুরুভার নামিয়া গেল। যে ঘরে বড় মেয়ে,সে ঘরের গৃহিণীর বড় জ্বালা,—লজ্জা আশঙ্কা; বিশেষ শিরোমণিঠাকুর অন্নদাচরণকে যে শাসাইয়া গিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনী তাহা শুনিয়াছিল। ক্রোধে অন্নদাচরণের কণ্ঠস্বর কিছু উচ্চ হইয়াছিল। পার্শ্বের ঘর হইতে মাতঙ্গিনী তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই অবধি তাহার আশঙ্কার আর অবধি ছিল না।

৪

ইহার পর প্রায় এক বৎসর গেল। অন্নদাচরণ ও মাতঙ্গিনী উভয়েই শিরোমণির কথা প্রায় ভুলিয়া গেল। জীবনে নিত্য কত ঘটনা ঘটে, মনে রাখিবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কে সে সব মনে করিয়া রাখে ?

এই সময় গ্রামের জমীদার মাধবনাথ রায়ের মাতার মৃত্যু হইল। 'দানসাগর' শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। দেশবিদেশ হইতে অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া 'বিদায়' লইতে আসিলেন। গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সে অঞ্চলে আর তেমন সমারোহের শ্রাদ্ধ হয় নাই। সাত দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামের গোপগৃহে পচা দধির গন্ধ বাহির হইতে লাগিল, জমীদারবাড়ীর বড় বড় ভাণ্ডারঘরগুলা আহারীয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—দিবারাত্রি খোলা জ্বালিয়া ভিয়ান চলিতে লাগিল। দুই দিনের পথ হইতে কাঙ্গালীর দল আসিয়া গ্রামের বড় বড় গাছতলায় আড্ডা গাড়িয়া গ্রামে বিসূচিকার আবির্ভাবসূচনা করিল। ভিক্ষার আশায় এক দিকে ভাট ব্রাহ্মণ, আর এক দিকে পাঞ্জাধারী ফকীর, সকলেরই শুভাগমন হইল। গ্রামে রামনবমীর মেলাতেও কখন এমন জনসমাগম হয় না।

নির্দ্ধারিত দিন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে জমীদারগৃহের সামিয়ানায় আচ্ছন্ন বৃহৎ প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া গেল। তর্ক, বিতর্ক, হাসি, গল্প ও ধূমপান চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িলে ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডাক পড়িল।

সকলে আহারার্থ আসন গ্রহণ করিলে গ্রামের শিরোমণি ঠাকুর সহসা আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারি দিক হইতে সকলে যখন কলরব করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণের সহিত আহার করি না। যে 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করে,তাহার সহিত একত্র আহার করিলে ব্রাহ্মণের জাতি যাইবে।"

অন্নদাচরণ 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিবার পর গ্রামের ব্রাহ্মণগণ অনেকবার তাহার সহিত আহার করিয়াছেন। প্রথম প্রথম সে সঙ্কোচবোধ করিত, কিন্তু আহারের সময় ব্রাহ্মণগণই তাহাকে ডাকিয়া লইতেন। তাহার পর আর কেহ সে কথা তুলে নাই। সেই জন্যই আজ সে ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্র আহার করিতে বসিয়াছিল।

আজ এই অপমানে লজ্জায় ও ক্রোধে যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

সে জানিত, ব্রাহ্মণগণ আপত্তি করিলে সমাজশাসনে তাহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। শিরোমণির কথা শুনিয়া লোকে তাহার দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই সে বেগে সে স্থান ত্যাগ করিল।

তখন চারি দিকে বিষম গোল উঠিল। সকলেই কথা কহে, কেহই শুনে না। বহুকষ্টে সে গোল থামাইয়া ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে প্রদত্ত খাদ্যরাশি আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৫

অন্নদাচরণ যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার মুখে চক্ষে ক্রোধ জ্বলিতেছে। মাতঙ্গিনীর মনে একবার তাহার এই আকস্মিক ক্রোধের কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল হইল, কিন্তু অভ্যস্ত সংযমবশে সে সহজেই সে কৌতূহল নিবৃত্ত করিল। কিন্তু কারণটা জানিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। সেই দিন অপরাহ্নে সে যখন ঘাটে গেল,তখন ঘাটে কেবল সেই কথা, "অন্নদা ঠাকুর 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিয়াছে বলিয়া জমীদারবাড়ী ব্রাহ্মণভোজনের স্থান হইতে তাহাকে উঠাইয়া দিয়াছে।" তাহাকে দেখিয়া কেহ কেহ সে আলোচনা বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু সকলে করিল না। মাতঙ্গিনী সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা থাকিত, কাহারও সহিত বড় মিশিত না, পরচর্চ্চায় যোগ দিত না, গ্রামের ধনীদিগের দুহিতা ও বধূদিগের সকল কথায় "হুঁ" দিত না ;—সেটাকে কেহ কেহ দেমাক বলিতেন। তাঁহারা তাহার সে দেমাক ভাঙ্গিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন।

মাতঙ্গিনী ঘাট হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,অন্নদাচরণ গৃহে নাই। সে নিয়মিত সকল গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিল।

খানিকটা রাত্রি হইলে অন্নদাচরণ গৃহে ফিরিল ; সে আসিয়া মাতঙ্গিনীকে বলিল, "কাল প্রত্যূষে এখান হইতে যাইতে হইবে। জিনিসপত্র গুছাইয়া লও।"

মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

অন্নদাচরণ বলিল, "সে কথা শুনিয়া কায নাই।"

মাতঙ্গিনী স্থির স্বরে বলিল, "আমি সব শুনিয়াছি।"

অন্নদাচরণ এইবার যেন আপনাকে দ্বিগুণ অপমানিত বোধ করিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে কষ্টে আত্মসংবরণ করিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "আমাকে লইয়াই তোমার সব বিপদ। আমাকে ত্যাগ কর।"

মাতঙ্গিনী ইতঃপূর্ব্বে কখনও স্বামীর সহিত এমন করিয়া কথা কহে নাই। অন্নদাচরণ অন্ধকারে আলোক দেখিল; সে বিপদের মধ্যে সৌভাগ্যসূচনার সম্ভাবনায় পুলকিত হইল। বাত্যাবৃষ্টিপীড়িত শস্যক্ষেত্রে ঊষালোকের মত তাহার ক্লিষ্ট হৃদয়ে আশার আলোক পড়িল। সে ভাবিল, হয় ত এইবার এই বিপদের তরঙ্গে পতিপত্নীর মধ্যে ব্যবধান ঘুচিল; মাতঙ্গিনী এইবার সোহাগে আদরে, মানে অভিমানে, প্রেমে বিরাগে তাহার সহিত পত্নীর মত ব্যবহার করিবে। সে পত্নীকে কাছে টানিয়া লইল; তাহার মস্তক আপনার স্কন্ধে রাখিয়া তাহার একগুচ্ছ কেশ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "তুমি আমার পত্নী, আমি তোমার জন্য জগতে সব তাগ করিতে পারি, সব ত্যাগ করিব—কিন্তু তোমায় ত্যাগ করিতে পারিব না।"

* * *

সমস্ত রাত্রি স্বামী স্ত্রীতে দ্রব্যাদি গোছাইয়া লইল। অন্নদাচরণ নৌকা ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। মাঝিরা দ্রব্যাদি নৌকায় বোঝাই করিতে লাগিল। পল্লী তখন সুপ্ত। জমীদারগৃহে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গোলমাল চলিয়াছিল। এখন সারাদিনের গোলমালের পর গ্রাম নিস্তব্ধ। ধূলিময় পল্লীপথে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে মাঝিরা জিনিসগুলা সব বহিয়া লইয়া গেল।

অতি প্রত্যূষে অন্নদাচরণ চিরদিনের মত জন্মস্থানের নিকট বিদায় লইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া নৌকায় উঠিল। সে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিল,—পত্নীর জন্য জগতে আর সব ত্যাগ করিবে—পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।

তখনও গ্রাম সুপ্ত। নীড়ে প্রায় সকল বিহগ নীরব—কেবল নদীকূলে দূরে একটা বকুলশাখায় একটা দয়েল প্রভাতী ধরিয়াছে। তখনও দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই,—আকাশে তারকারাজি ম্লান, কিন্তু তখনও নিভে নাই। দূরে গাছের শাখায় তখনও আঁধার জড়াইয়া আছে,—নদীর জল তখনও কাল। পূর্ব্বগগনে উপরে খানিকটা ধূসর—নিম্নে কেবল পাটকিলা রং ফুটিয়া উঠিতেছে। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

অন্নদাচরণ একবার গ্রামের দিকে চাহিল; বুঝি তাহারও অজ্ঞাতে সে একবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। বিদায়ে মরণের ছায়া আছে, তাই বিদায়-কালে হৃদয় ব্যথিত হয়। বিদায় বেদনাময়—বিষাদময়।

ভাদ্রের ভরা পদ্মায় নৌকা ভাসিয়া চলিল। অল্পক্ষণমধ্যেই অন্নদাচরণের গ্রাম দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

৬

সারাদিন নৌকা চলিতে লাগিল। কেবল মধ্যাহ্নে এক স্থানে তীরে তরী ভিড়াইয়া মাঝিরা রাঁধিয়া খাইয়া লইল। মাতঙ্গিনী নৌকাতেই রাঁধিল;—স্বামী স্ত্রীতে ভোজন করিল। পথে এরূপ আহারে বড় আনন্দ,—আহার্য্য বড় মিষ্ট বোধ হয়। তাহার পর আবার নৌকা ভাসান হইল।

জলবেণীরম্যা পদ্মার শত মোহিনী মূর্ত্তি—শত ভিন্ন ভঙ্গী। কোথাও গ্রাম ভাঙ্গিতেছে, কোথাও চর উঠিতেছে। কোথাও বিপুলবক্ষে মলিন জলরাশি যেন গভীর আবেগগাম্ভীর্য্যে কেবল মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া বহিতেছে, কোথাও জল-প্রবাহ উন্নত—অসমান সফেন তরঙ্গহিল্লোলে ক্রোধাবেগে তীরে আছাড়িয়া পড়িতেছে। কোথাও তীরে ক্ষেত্রে শ্যামশস্যশীর্ষে ক্রীড়ারত পবনের হিল্লোল, কোথাও যত দূর চাহ কেবল বারিবিস্তার—মেঘ ও নদীবক্ষ মিশাইয়া গিয়াছে। কোথাও আকাশে বলাকামালা তোরণাবলম্বনহীন পুষ্পমাল্যের মত শোভা পাইতেছে। কোথাও চরে জলচর বিহঙ্গরাজি কলরব করিতেছে। যেন পলে পলে নয়নসমক্ষে নব নব চিত্র উদ্ভাষিত হইয়া উঠিতেছে।

এই সকল নূতন নূতন দৃশ্যের মধ্যে এই নূতন অবস্থায় অন্নদাচরণ অজস্র মনোযোগে ও সহস্র কথায় মাতঙ্গিনীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। মাতঙ্গিনীও যেন কতকটা স্বাধীনভাবে স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

প্রায় দিনশেষে নৌকা যেখানে উপস্থিত হইল, সেখানে এক দিকে একটি ক্ষুদ্রকায়া খরস্রোতা তরঙ্গিনী বীচিবিভঙ্গে যেন বেণী বিনাইয়া পদ্মার বিপুলবক্ষে দেহ ঢালিয়াছে; আর এক দিকে একটি বিলের মত জলবিস্তার—চঞ্চলগতি পদ্মা হয় ত কোন দিন সেই পথে বহিত, এখন ভিন্ন পথে জলস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। সেখানে জলে শৈবাল জন্মিয়াছে, পদ্মার অস্থির স্রোতের তুলনায় সেই জলচরসঞ্চারচঞ্চল জলরাশি স্থির। তখনও অস্তগিরির সমুজ্জ্বল শিখরে রজনীর সুদীর্ঘ পক্ষচ্ছায়ায় দিবসের শেষ কনক কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম গগনে মেঘের উপর সমান, অসমান, সরল, বক্র রেখায় বর্ণের উপর বর্ণ ফুটিয়া উঠিতেছে, বর্ণের কোলে বর্ণ ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও উদ্ভেদোন্মুখ পদ্মপলাশের লোহিত আভা, কোথাও প্রবালের রক্তরাগ; কোথাও ধূসরের সহিত ঈষৎ রক্তাভার মিশ্রণ, কোথাও স্বর্ণাভলোহিত; কোথাও পল্লবরাগতাম্র, কোথাও গাঢ় পাটল; কোথাও নীলে লালে মেশামিশি, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন নীল; কোথাও নীলে শ্বেতের আভাস, কোথাও নীলের কোলে শ্বেত।

সেখানে স্রোতের বড় টান। নৌকার দুই মুখে দুই জন মাঝি দাঁড়াইয়া ক্ষেপণী ধরিল। মাতঙ্গিনী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝিরা দাঁড়াইল কেন?"

অন্নদাচরণ উত্তর করিল, "এখানে স্রোতের প্রবল টান; একটু অসাবধান হইলে নৌকা ঘুরিয়া যাইবে, হয় ত ডুবিবে। এখানে নৌকা একবার টানে ভাসিলে সহজে ফিরান যায় না।"

মাতঙ্গিনী ছইয়ের মধ্যে এক প্রান্তে বসিয়াছিল। সহসা ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল—চারি দিকে জল ছিটকাইয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী জলে পড়িল দেখিয়া অন্নদাচরণও জলে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন মাঝিও তাহাদের উদ্ধারকল্পে জলে ঝাঁপ দিল।

মাঝিরা একে বিশেষ সন্তরণপটু, তাহাতে তাহাদের অসমগ্রবসনে সন্তরণের বিশেষ সুবিধা। অন্নদাচরণ তখনও সাঁতারিয়া যাইতেছিল, তাহারা বহুকষ্টে তাহাকে ধরিল; কিন্তু মাতঙ্গিনীর দেহ আর দেখিতে পাইল না।

স্রোতের প্রবল টানে তাহারা সেখানে কূলে উঠিতে পারিল না, বহুকষ্টে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটা বাঁকের মুখে তীরে উঠিল। তখন মাঝিরা শ্রান্ত—অন্নদাচরণ সংজ্ঞাহীন। মাঝিদের চেষ্টায় অন্নদাচরণের সংজ্ঞা ফিরিল, তাহার দেহে চিরদিনের জন্য বিগত-আনন্দ জীবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সংজ্ঞালাভ করিয়া অন্নদাচরণ প্রথমেই মাঝিদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে বাঁচাইলে কেন?"

মাতঙ্গিনীর দেহ কোথায় গেল, তাহা আর জানা গেল না। যে পদ্মা একদিন বিস্তারিতপক্ষ রাজহংসের মত তরণীতে সেই অজ্ঞাতকুলশীলাকে কোন্ অজানিত গ্রাম হইতে আনিয়া অন্নদাচরণকে উপহার দিয়াছিল, আজ সেই পদ্মার গর্ভে বায়ুহীন, আলোকহীন, প্রাণহীন অতলে তাহার জীবনরহস্য চিরদিনের জন্য সমাহিত রহিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সাবিত্রীর বিবাহ।

সাবিত্রীর জন্মকথার পরই মহাভারতকার তাঁহার বিবাহের কথা কহিয়াছেন। যেন সাবিত্রীর জন্ম ও বিবাহের মধ্যে আর কিছুই ঘটে নাই। অমন বয়সে সকল ছেলে মেয়ের যাহা ঘটিয়া থাকে সাবিত্রীরও অবশ্য তাহা ঘটিয়াছিল, অন্য ছেলের ন্যায় তিনিও হয় ত দুরন্ত ছিলেন, হয় ত সহজে দুধ খাইতেন না, মা গুণ গুণ করিয়া গান না করিলে হয়ত ঘুমাইতেন না, হয় ত পড়িয়া গিয়া দুইবার ঠোঁট কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন আর একবার একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, হয় ত ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ঋগ্বেদখানা মুখস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, হয় ত একবার ছয় মাস মাসীর বাড়ীতে ছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শৈশব ও বাল্যের এইরূপ বহুতর কথা ইউরোপীয় প্রণালীতে লিখিত জীবনচরিতে থাকে। আর এইরূপ কথা যত অধিক থাকে, ঐ সকল জীবনচরিতও সাধারণতঃ তত উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। বস্‌ওয়েল সাহেবের লিখিত ডাক্তার জনসনের জীবনচরিতে এইরূপ কথার পরিমাণ অতিশয় অধিক; সেই জন্য উহা একরূপ আদর্শ জীবনচরিত বলিয়া অনেকের দ্বারা প্রশংসিত হয়। এখন বাঙ্গলা ভাষাতেও এই প্রণালীতে জীবনী লিখিত হইতেছে। তজ্জন্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা বহুল-পরিমাণে এবং অত্যধিক শ্রমসহকারে সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতেছে। এ প্রণালী কিন্তু আমাদের প্রাচীন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ত সাবিত্রীর আখ্যায়িকাতেই দেখা যাইতেছে, জন্মের কথার পরই বিবাহের কথা। অত বড় যে রামায়ণ, রামের কথায় পরিপূর্ণ—পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গা, রাগ করিয়া দুইবার মামার বাড়ীতে পলাইয়া যাওয়া, মাকে না বলিয়া মাসীর বাড়ী যাওয়া—এ প্রকার কথা উহাতেও নাই। ফলতঃ পুরাণের কোন নরনারীর আখ্যায়িকাতেই এরূপ কথা দেখা যায় না। আমাদের ও ইউরোপীয়দিগের লিখিত জীবনাখ্যায়িকায় ইহা আর একটি গুরুতর প্রভেদ। এ প্রভেদও লক্ষ্য করা আবশ্যক। ইহার অর্থ স্থানান্তরে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু স্ত্রীর জন্ম ও বিবাহের মধ্যে এখন সচরাচর যত সময়ের ব্যবধান থাকে, সাবিত্রীর জন্ম ও বিবাহের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক সময়ের ব্যবধান ঘটিয়াছিল।

এখন হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ কুমারী অবস্থায় হয়; সাবিত্রীর বিবাহ যৌবনপ্রাপ্তির পর হইয়াছিল।

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ॥
তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সংমেনিরে জনাঃ॥

অর্থাৎ, সেই নৃপকুমারী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল-নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে 'ইনি দেবকন্যা, মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন' এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী যৌবনপ্রাপ্তা হইয়াছেন, তিনি নিবিড়নিতম্বিনী হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

তাস্তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবাধিতঃ॥

অর্থাৎ, ফলতঃ পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্জ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না।

তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু এখন তাঁহার নিজের মনে বিবাহিতা হইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। তিনি একদিন স্নানান্তে ইষ্টদেবতার পূজা করতঃ ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। পিতা বলিলেন—

পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ॥

অর্থাৎ, পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণসদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর।

অশ্বপতি স্পষ্ট ভাষায় যৌবনপ্রাপ্তা কন্যা সাবিত্রীকে বলিতেছেন—তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যদি এরূপ বলা যায় যে, সেই প্রাচীন কালে কোন কোন স্থলে স্ত্রীলোকে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তবে তাহাদের বিবাহের কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহা হইলে

পারে, এ প্রকার অনুমান করিবারও হেতু আছে। অশ্বপতির কথায় বোধ হইতেছে যে, তখন পিতা অগ্রে কন্যার নিমিত্ত পাত্রনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেন, পরে,তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কন্যাকে স্বয়ং পতি অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিতেন। পিতা সম্ভবতঃ কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং অবিলম্বে পাত্র পাইলেও কন্যার যৌবনলাভের পূর্ব্বে কখনই তাহাকে সম্প্রদান করিতেন না, এরূপ বিবেচনা করিবার হেতু নাই। অশ্বপতির কথাতেই বুঝা যায় যে, কন্যাকে পতি অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে পাত্র পাইলে তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে পাত্রস্থা করিতেন, এবং তাঁহার সম্প্রদানকার্য্য কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বেও ঘটিতে পারিত। যাহা হউক, যৌবনলাভের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি তখন থাকুক আর নাই থাকুক, যৌবনলাভের সময় যে কন্যার বিবাহের কাল বলিয়া বিবেচিত হইত, অশ্বপতির কথায় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বেদপুরাণাদিতে যৌবনপ্রাপ্তির পর কন্যার বিবাহের বহুতর উল্লেখ আছে। অতএব ও কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না—অস্বীকার করিবার আবশ্যকতাও নাই। অনেকে ঐরূপ উদাহরণগুলিকে বাল্যবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বা অবৈধতার প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান করেন। যাঁহারা মনে করেন যে, বাল্যবিবাহ শারীরিক মানসিক প্রভৃতি সকল প্রকার দুর্ব্বলতার হেতু, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বাল্যবিবাহের ফল অতি শোচনীয় জানিয়া যৌবনপ্রাপ্তি হইলে কন্যার বিবাহ দিতেন, তখন আমাদেরও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়া যৌবনবিবাহ প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দুইটি কথাই ভ্রমাত্মক। তখনকার যৌবনবিবাহের গূঢ় অর্থ বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বুঝাও বড় কঠিন নয়। যে কথাগুলি কহিয়া অশ্বপতি সাবিত্রীকে পতি অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, কন্যার বিবাহের জন্য তিনি কিছু চিন্তিত—কন্যার পাণিগ্রহণার্থ কেহ আসিতেছে না বলিয়া তিনি যেন একটু অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ আদেশ দিবার সময় অশ্বপতি কন্যাকে পতির অন্বেষণে তৎপর হইতে বলিয়াছিলেন :—

ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।

অর্থাৎ, তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও।

সাবিত্রী যৌবনলক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন, অথচ তাঁহার বিবাহ হইতেছে না, এ জন্য অশ্বপতি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যেরা শারীরিক শক্তিবর্দ্ধনার্থ আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় যৌবনে কন্যার বিবাহ দিতেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাবিত্রীর বিবাহের কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া অশ্বপতির এই ব্যস্ততা, অস্থিরতা, চিন্তাকুলতা কেন? কন্যার যৌবনলক্ষণ দেখিলেই ত ইউরোপীয়েরা তাহার বিবাহের নিমিত্ত ব্যস্ত হয় না। তাহারা বরং কন্যার যৌবনের পরিপক্কতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, কখন কখন যৌবন অতিক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ না দেওয়াই ভাল বিবেচনা করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে আধুনিক ইউরোপে কন্যার বিবাহের কাল বিলম্বিত হয়, যুবতী কন্যার বিবাহে প্রাচীন আর্য্যদিগের সে উদ্দেশ্য ছিল না।

সাবিত্রীর বিবাহের বিলম্ব দেখিয়া অশ্বপতির ব্যস্ততা ও চিন্তাকুলতার কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ—

শ্রুতং হি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি গদতো মে বচঃ শৃণু॥
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপয়ন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা॥
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু॥

অর্থাৎ, হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিদিগকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যা দান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন; এবং যে পুত্র ভর্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।

স্পষ্টই বলা হইল যে, কন্যাদান করা ধর্ম্মশাস্ত্রমতে পিতার একান্ত কর্ত্তব্য— কন্যার যৌবনলক্ষণ দেখিয়া তাহার বিবাহ দিতে বিলম্ব করিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে পিতা দেবতাদিগের নিকট নিন্দনীয় হন। ইউরোপে কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতা আপন অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করেন না; কন্যা যৌবনপ্রাপ্তির পর অবিবাহিতা থাকিলে পিতা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবেন, এরূপ সংস্কা-

রও তথায় কাহারও নাই। অশ্বপতির ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখে বুঝা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যেরা ধর্ম্মার্থই কন্যার বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মার্থই কন্যার যৌবনোদ্গম সত্ত্বে তাহার বিবাহ না দেওয়া বা বিবাহ দিতে বিলম্ব করা, পিতার পক্ষে নিন্দনীয় বা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিবাহপ্রণালীকে আধুনিক ইউরোপের শারীরিকশক্তিসাধনোদ্দেশ্যমূলক বিবাহপ্রণালীর অনুরূপ ভাবিয়া যাঁহারা বলেন যে, বালিকার বিবাহ উঠাইয়া দিয়া যুবতীর বিবাহ প্রচলিত করিলে আমরা আমাদেরই প্রাচীন বিবাহপ্রণালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

অনেকে বলেন যে, বেদবিহিত বিবাহপ্রণালী আধুনিক ইউরোপের বিবাহপ্রণালীর ন্যায় শারীরিকশক্তিসাধনোদ্দেশ্যমূলক ছিল—সুতরাং অতি উৎকৃষ্টই ছিল। কথাটা ঠিক কি না, দেখা যাউক। "হিন্দু-কন্যার বিবাহ কোন্ সময়ে হওয়া শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ ঋতুলাভের পূর্ব্বে বা পরে" এই নাম দিয়া শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর বাবু পণ্ডিত; চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী; তিনি এইরূপ আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি এই পুস্তিকাখানিতে ঋগ্বেদ হইতে দুইটি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাতে ঋতুলাভের পর হিন্দুকন্যার বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইয়াছে। ঋক্ দুইটি এইঃ—

উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভীরিলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং সতে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলমহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ॥

ঋগ্বেদসংহিতা; ১০ম, ৭অ, ৮৫সূ, ২১।২২ ঋ।

রমেশ বাবু ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেনঃ—হে বিশ্বাবসু এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্ত হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর, সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও। ২১।

হে বিশ্বাবসু, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দ্বারা তোমার পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও। তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামীসংসর্গিণী করিয়া দাও। ২২।

যে কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুকে অবিবাহিতা কন্যার নিকট যাইতে বলা হইতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক স্ত্রী ক্রমান্বয়ে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি দেবতা কর্ত্তৃক অধিকৃতা হয়। ইহাও লিখিত আছে যে, যে স্ত্রীর স্তনোদ্‌গম হইয়াছে, সে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই দুইটি ঋকে যখন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুকে বিবাহিতা কন্যা পরিত্যাগ করিয়া অবিবাহিতা কন্যার নিকট যাইতে বলা হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, যে স্ত্রীর স্তনোদ্‌গমরূপ যৌবনচিহ্ন বিকশিত হইত, সেও অবিবাহিত থাকিত। ২২ ঋকে বিশ্বাবসুকে নিতম্ববতী অবিবাহিতা নারীর নিকট যাইতে বলা হইয়াছে। নিতম্বও যৌবনোদ্‌গমের লক্ষণ। সুতরাং তখন যৌবনোদ্‌গম পর্য্যন্ত কন্যার অবিবাহিতা থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ঋক্ দুইটি একটু অভিনিবেশসহকারে পড়িলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, অশ্বপতির কথার ন্যায়, উহাতেও স্ত্রীলোকের বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞান এবং যৌবনোদ্‌গমে তাহাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ততাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'যে কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ-লক্ষণযুক্ত হইয়া আছে সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে', এরূপ কথার অর্থ এই যে স্ত্রীলোকে বিবাহিতা হইবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টা হইয়া জন্মগ্রহণ করে—অর্থাৎ বিবাহ স্ত্রীজাতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়তি—বিধিবিহিত সংস্কার—অবশ্য-কর্ত্তব্য। আর গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুকে বার বার 'নিতম্ববতী' অবিবাহিতা কন্যার নিকট যাইতে বলায় এবং সেই কন্যাকে 'পত্নী করিয়া স্বামিসংসর্গিণী' করিয়া দিতে বলায়, এইরূপ প্রতীতি হয় যে ঐরূপ কন্যার বিবাহের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ব্যস্ততা প্রকাশ করা হইয়াছে। অশ্বপতির কথাতেও বলিয়াছি, বেদের এই দুইটি ঋক সম্বন্ধেও বলিতেছি, যাহারা কন্যার বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করে অথবা কন্যার যৌবনলক্ষণ দেখিলে তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহারা যৌবনোদ্‌গমে কন্যার বিবাহ দিলেও, ইউরোপে যে অভিপ্রায়ে অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ হয়, সে অভিপ্রায়ে ওরূপ করে না। বিবাহিতা না হইলে স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিণী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত, কি বেদ কি পুরাণ, সর্ব্বত্র তাহাদের বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার বলিয়া বিবেচিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যৌবনোদ্‌গমের পর অবিবাহিতা থাকিলে স্ত্রীলোকে ব্যভিচারিণী অথবা অবৈধভোগাভিলাষিণী হইতে পারে, এই ভয়ে, কি বেদ কি পুরাণ, সর্ব্বত্র যৌবনোদ্‌গম হইলে তাহাদিগকে 'স্বামিসংসর্গিণী' করিয়া

দিবার নিমিত্ত ব্যস্ততাও দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্যতার ব্যবস্থা করিবার এবং যৌবনোদ্গম হইলেই তৎপর হইয়া তাহাদের বিবাহ দিবার ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ, বোধ হয় অন্য অর্থ হইতে পারে না। যৌবনোদ্গমের পর অবিবাহিতা থাকিলে স্ত্রীলোকের শরীর কলুষিত হইতে পারে; শরীরও যদি কলুষিত না হয়, মন কলুষিত হইতে পারে। মন কলুষিত হইলে অনিষ্টের আর কিছু বাকি থাকে না। মলিনতা মনে, পাপও মনে। সাবিত্রী মনে মনে সত্যবানকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে শুনিয়া অশ্বপতি তাঁহাকে অন্য বর অন্বেষণ করিতে বলিলেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন:—

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

অর্থাৎ, অংশ, অর্থাৎ পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগনির্দ্ধারিকা গুটিকা, একবার নিপতিত হয়; লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে, এবং 'দান করিলাম' এ কথাও একবার বলে; এই তিনটি বিষয়ই এক বারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ু হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্ম দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ—যাহা করিবার অভিলাষ তাহা সর্ব্বপ্রথমে মনে স্থিরীকৃত হয়, তৎপরে তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, শেষে তাহা সম্পন্ন করা হয়। অতএব কর্ম্মের মূল মনে। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম যদি করাও না হয়, তথাপি মনে যদি তাহার মূলের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে মন দূষিত হইবার জন্য দুষ্কর্ম্ম কৃত হইবার যে অনিষ্ট তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঘটে। সাবিত্রী মনকেই প্রমাণ বুঝিয়া অন্য বর অনুসন্ধান করিতে অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কাজ করিয়াছিলেন। ওরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার মন অপবিত্র হইয়া পড়িত, এবং মন অপবিত্র হইলে

চরিত্রও অপবিত্র হইয়া পড়ে। সাবিত্রী ধর্ম্মরূপিণী—তাঁহার অসীম তেজ, অসীম দৃঢ়তা, অসীম মানসিক শক্তি। যাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বৎসরান্তে কালগ্রাসে পতিত হইবেন, এই সাংঘাতিক কথা শুনিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না, ভীত হইলেন না—স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন, সত্যবান ভিন্ন আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না। সাবিত্রী বলিয়া এইরূপ হইল—মন এবং চরিত্র দুইই অকলুষিত রহিল; মন এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা নষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্টতাই প্রাপ্ত হইল। আবার বলি, সাবিত্রী বলিয়া এইরূপ হইল। আর কেহ হইলে এরূপ না হইতেও পারিত। না হইলে, মন এবং চরিত্র দুইই ত কলুষিত হইত। মন ও চরিত্র একবার কলুষিত হইলে বার বার কলুষিত হইতে পারে। বোধ হয়, প্রাচীনকালে যাহাদের যৌবনোদ্গমের পর বিবাহ হইত, তাহাদের অনেকের মন ও চরিত্র এইরূপে কলুষিত হইত। কন্যা যৌবনলাভ করিয়া যাহাকে পতিরূপে মনোনীত করে, পিতা তাহাকে কন্যাদান করিতে না পারিলে, কন্যার মন এইরূপে কলুষিত হইবারই কথা। সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে অনেক স্থলে এইরূপ হইত। ইংরাজ-সমাজে কখন বাস করি নাই, সুতরাং সে সমাজের বিবাহব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমার নাই। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, অনেক যুবতীকে আপন মনোনীত ব্যক্তি ছাড়িয়া পিতামাতার আদেশে অন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হয় অথবা গৃহত্যাগ করিয়া ব্যভিচারে নিমজ্জিত হইতে হয়। যৌবনোদ্গম পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না হইলে এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ হইতে থাকিলে অধর্ম্ম ও অপবিত্রতার বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মশীলতার হ্রাস বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ধর্ম্মজ্ঞানও অপরিষ্কার, অপ্রখর এবং নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। শারীরিক বল বল, মানসিক বল বল, আধ্যাত্মিক বল বা ধর্ম্মবলের সমান কোন বলই নয়। ভারতের প্রাচীন আর্য্যদিগের মতে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই জগতকে ধারণ বা রক্ষা করিতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম সকলপ্রকার ধর্ম্মচর্য্যার স্থান। গৃহস্থাশ্রমের মূল বিবাহ। ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যেরা ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে শারীরিকশক্তিলাভকে সেই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার ন্যায় ভ্রমান্ধতা বা বাতুলতা আর হইতে পারে না। তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি ছিল, ধর্ম্মের উপর। তেমন দৃষ্টি আর কিছুরই উপর ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে, অপর সমস্ত সেই সঙ্গে রক্ষিত

হইয়া যায়। এই জন্যই কন্যার যৌবনোদ্গম হইলে, তাহার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন এবং যখন বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যস্ততা সত্ত্বেও কন্যার মন ও দেহ কলুষিত হইতেছে বা হওয়া সম্ভব, তখন গোভিল গৃহ্যসূত্রে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে দারপরিগ্রহার্থ 'নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা,' ঋতুমতী হয় নাই এমন কন্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তাহাতে অনগ্নিকার বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়া যে আবশ্যক, তাহা এক রকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে নগ্নিকার বিবাহই একমাত্র ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে আমাদের যে বিবাহ-প্রণালী ছিল, এখনও ঠিক সেই বিবাহ-প্রণালী রহিয়াছে। কেবল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-পক্ষে পূর্ব্বে ঐ প্রণালীর যে অংশটুকু ব্যাঘাতের হেতুস্বরূপ ছিল, প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থামতই এখনকার প্রণালীতে সে অংশটুকু নাই। বোধ হয়, প্রাচীনতম কালে অনেক স্থলে কন্যার স্বামিসঙ্গলাভের শারীরিক উপযুক্ত-তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যৌবনোদ্গমে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইত; কিন্তু কন্যার স্বভাব-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি যে তখন একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; বরং ছিল বলিয়াই যৌবনোদ্গম হইলেই ব্যস্ততা-সহকারে কন্যার বিবাহ দেওয়া হইত। ক্রমে কিন্তু শারীরিক যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা অবিধেয় বিবেচিত হইয়াছিল। তখন বিবাহের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়; অতএব বুঝা যাইতেছে, সেই প্রাচীনতম প্রণালী সুসংস্কৃত হইয়াই এখনকার প্রণালী হইয়াছে; কিন্তু সে প্রণালী যখন ছিল, এখনকার প্রণালীও তখন ছিল। ইদা-নীন্তন কালের অত্যাচারপ্রিয়, অদূরদর্শী, অর্থগৃধ্নু, দুর্ব্বৃত্ত, নীচমনা বামনগুলা দেশটাকে উৎসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, ঋষিদিগের প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট মানবোচিত বিবাহ-প্রণালী নষ্ট করিয়া একটা জঘন্য পাশব বিবাহ-প্রণালী উদ্ভাবিত করে নাই। আমাদের বিবাহ-প্রণালীই ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মপ্রধান জাতিরই উপযুক্ত প্রণালী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শারীরিক বল সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা আপনারাই অসীম শারীরিক বলে বলীয়ান ছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির বাহুবলের কথা কহিতে কহিতে যাঁহারা আনন্দে উন্মত্ত হইতেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুস্থকায় মহাবলশালী ছিলেন এবং শারীরিক বলের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেন। শারীরিক বললাভের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন ধর্ম্মসর্ব্বস্ব—ধর্ম্মসর্ব্বস্বের ন্যায় ধর্ম্মশীলতায়, ধর্ম্মচর্য্যায়, সংযমে, মিতাচারে, তাঁহারা শারীরিক বলের মূল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত

পক্ষে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতার অমন মূলও আর নাই। উত্তর-পশ্চিমাদি প্রদেশে সে মূল এখনও নষ্ট হয় নাই, সেই জন্য তথায় শারীরিক শৌর্য্য বীর্য্য এখনও রহিয়াছে। আমরা আজিকার বাঙ্গালী, সে মূলের বিষয় অবগত থাকিয়াও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন; তজ্জন্য আমরা কীটপতঙ্গবৎ হইয়া পড়িতেছি; এ কথা এ স্থলে আর অধিক কহিব না।

পিতার আদেশ পাইয়া সাবিত্রী বর-অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কি প্রকারে বহির্গত হইয়াছিলেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর-অন্বেষণার্থ তিনি একক অথবা পরিচারিকামাত্র লইয়া যান নাই। তাঁহার সঙ্গে কে যাইবে, তাঁহার পিতা বলিয়া দিয়াছিলেন :—

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
ব্যাদিদেশানুযাত্রঞ্চ গম্যতাঞ্চেত্যচোদয়ৎ॥

অর্থাৎ, রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সাবিত্রীও দ্বিরুক্তি না করিয়া পিতার পদধূলি লইয়া তাঁহার বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগের সঙ্গে বরান্বেষণে গমন করিলেন :—

সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব তপস্বিনী।
পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্॥
সা হৈমং রথমাস্থায় স্থবিরৈঃ সচিবৈর্ব্বৃতা।
তপোবনানি রম্যানি রাজর্ষীণাং জগাম হ॥

অর্থাৎ, তপস্বিনী সাবিত্রী তখন লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পিতার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তদীয় চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই নির্গত হইলেন। তিনি সুবর্ণময় রথে আরোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববর্গে পরিবৃতা হইয়া রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবন-সমুদায়ে গমন করিলেন।

সাবিত্রী যুবতী—স্বয়ং বর খুঁজিতে যাইতেছেন। তিনি যে পুরুষ ভুলাইবার মত বেশভূষাদি করিয়াছিলেন, মহাভারতকার তাহা বলেন নাই। তখনকার রাণী ও রাজকুমারীদের অনেকগুলা করিয়া সখী থাকিত। তাহারাও এক একটা রাণী রাজকুমারীর ন্যায় সাজসজ্জা করিত—গান গাহিত, বাজনা বাজাইত, বিরহের গল্প বলিত, রাণীরাজকুমারীদের মনের কথায় কথা কহিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন দুই চারিটা সখী যে সাবিত্রীর সঙ্গে গিয়াছিল, মহাভারতকার তাহাও বলেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, পিতা জনকতক বুড়া মন্ত্রীকে মেয়ের সঙ্গে যাইতে বলিলেন, মেয়েও জনকতক বুড়া মন্ত্রী সঙ্গে লইয়া

বর খুঁজিতে বাহির হইলেন। ইউরোপের যুবতীরা নিশ্চয়ই যুবতী সাবিত্রীর মতন বেশভূষা না করিয়া কেবল কতকগুলা বুড়া সঙ্গে লইয়া বর ধরিতে যায় না। তাহাদিগকে কখন বর ধরিতে যাইতে দেখি নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতে গিয়া তাহাদিগকে বর ধরিতে দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন এ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বিবেচনাও করি নাই। ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া এবং সাহেব বিবিদিগের ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিয়াছি, আমাদের সাবিত্রীর ধরণের বর ধরিতে যাইবার রীতি বিবিদের মধ্যে একেবারেই নাই। সাবিত্রী ভুলিতে ভুলাইতে যান নাই। তিনি গিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক, গুণবান, সুবংশজাত রাজ-জামাতা হইবার যোগ্য পুরুষ খুঁজিতে। তাই তিনি 'পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামা-বিচারিতম্', 'পিতার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই', পিতার বিজ্ঞ অভিজ্ঞ প্রবীণ মন্ত্রীদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপ লোক দ্বারা পরিচালিত না হইলে যুবতী কুলকন্যার যোগ্য ব্যক্তি নির্ণয় করা সহজ হয় না। পতিনির্ব্বাচনে যুবতীর কিছু বেশী আবেগবতী, কিছু বেশী মোহাভিভূতা হইয়া ভ্রমে পতিত হওয়াই সম্ভব। এমন যে সাবিত্রী, তিনিও একটি ভ্রম করিয়াছিলেন। পতি-অন্বেষণ করিবার আদেশ দিবার সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন :—

প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃষ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্॥

অর্থাৎ, যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমারে সম্প্রদান করিব।

অশ্বপতি যখন সাবিত্রীকে বলিয়া দিলেন,—তোমার যিনি প্রার্থনীয় হই-বেন, তাঁহার কথা আমাকে জানাইও, তুমি এখন ইচ্ছানুসারে বরণ কর, আমি পরে বিবেচনা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিব,—সাবিত্রীর তখন বুঝা উচিত ছিল যে, তাঁহার নিজের নির্ব্বাচন চূড়ান্ত হইবে না, তাঁহার পিতার মতসাপেক্ষ হইবে, তিনি আপন ইচ্ছানুসারে বরণ করিবেন বটে,কিন্তু তাঁহার পিতা বিবে-চনা করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন। পিতা যদি তোমাকে আমায় সম্প্র-দান করেন, তাহা হইলে তুমি আমার পতি হইবে—যৌবনসুলভ আবেগে সাবিত্রীর ন্যায় রমণীও এইভাবে সত্যবানকে মনে মনে বরণ করিতে সমর্থা

হয়েন নাই। ইউরোপের যুবতীরা বিবাহকে যেরূপ কার্য্য মনে করিয়া, যে ভাবে পতি অন্বেষণ করিতে যায়, সাবিত্রী বিবাহকে তদপেক্ষা অনেক গুরুতর কার্য্য ভাবিয়া, সে ভাব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অতি গম্ভীর ভাবে পতি অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তথাপি একটি ভুল করিয়াছিলেন। যৌবন বিবাহে এতই সঙ্কট।

কোর্টসিপে ইউরোপের যুবতীরা বরকে বুঝিবার ও ভুলাইবার চেষ্টা করে। ইউরোপীয়দিগের কোর্টসিপ কখন দেখি নাই। দেখিবার প্রয়োজনও নাই। শুনিয়াছি, অনেক স্থলে কোর্টসিপ ভুলাইবার,মুগ্ধ করিবার, মজাইয়া ফেলিবার ফল। যাহা শুনিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। কোর্টসিপ যে অনেক স্থলে ঐরূপ ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সাবিত্রী যুবতী হইয়াও কোর্টসিপ কি কোর্টসিপের ন্যায় কিছু করেন নাই। রাজর্ষিগণের তপোবনে গিয়া তিনি কি করিয়াছিলেন?

মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
বনানি ক্রমশস্তাত সর্ব্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত॥
এবং তীর্থেষু সর্ব্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্ব্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ॥

অর্থাৎ, তথায় তিনি মাননীয় বৃদ্ধবৃন্দের চরণাভিবন্দনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। নৃপনন্দিনী সাবিত্রী এইরূপে সমুদয় তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধন দান করিতে করিতে নানা স্থানে বিচরণ করিলেন।

বিবাহ বড় গুরুতর কার্য্য, স্ত্রীজাতির ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায়, এইরূপ বুঝিয়া, সাবিত্রী সমস্ত বৃদ্ধদিগের সম্মাননা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তীর্থে তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধনদান করিয়াছিলেন। সাবিত্রী কোর্টসিপ না করিয়াছিলেন, এমন নয়। ইউরোপীয় রমণীগণের অপেক্ষা অনেক অধিক একাগ্রতাসহকারে, অনেক অধিক আয়াসসাধ্য কোর্টসিপ করিয়াছিলেন। তিনি তপোবনে তপোবনে, তীর্থে তীর্থে ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত কোর্টসিপ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যেখানে বিবাহপ্রণালীর ভিত্তি ধর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, কেবল সেইখানেই সাবিত্রীর ন্যায় কোর্টসিপ সম্ভব, অন্যত্র অসম্ভব। অপর পক্ষে, যেখানে সাবিত্রীর ন্যায় কোর্টসিপ, কেবল সেইখানেই বিবাহ প্রণালীর ভিত্তি ধর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, অন্য কোথাও নহে। প্রাচীন ভারতের যুবতীর বিবাহের যে প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছি, অথ-

পতির যুবতী কন্যার কোর্টসিপে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

সত্যবানকে কন্যাদান করিবার সময় অশ্বপতি অপূর্ব্ব মহত্ব, মহানুভবতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন রাজ্য হারাইয়া, দৃষ্টিহীন হইয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া, তখন অতি হীনাবস্থায় তপস্বীর ন্যায় বনে বাস করিতেছিলেন। তখন পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অশ্বপতির ন্যায় বৈভবশালী রাজার রাজপ্রাসাদে আসিবার মত কায়িক মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। মহামনা অশ্বপতি সেই জন্য আপনিই কন্যাকে লইয়া তাঁহার বনমধ্যস্থ কুটীরে গমন করিয়াছিলেন।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমানিন্যে চ তৎ সর্ব্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপ॥
ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্ব্বান্ ঋত্বিজঃ সপুরোহিতান্।
সমাহুয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া॥

অর্থাৎ, অনন্তর মহীপতি অশ্বপতি কন্যাপ্রদানের বিষয়ে নারদের কথিত সেই বাক্যই বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে বিবাহের উপযোগী সমস্ত সম্ভার আহরণ করাইলেন; পরে সমুদয় ঋত্বিক, পুরোহিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দিবসে কন্যাসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

সুবিচক্ষণ অশ্বপতি তখনও দ্যুমৎসেনকে আপন অভিপ্রায় পর্য্যন্ত জ্ঞাত করান নাই। তিনি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলে—

তস্যার্ঘ্যমাসনঞ্চৈব গাঞ্চাবেদ্য স ধর্ম্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ॥

অর্থাৎ, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহারে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগ্রে অশ্বপতির অভিপ্রায় অবগত হইলে, পাছে দ্যুমৎসেন আপনিই কষ্ট স্বীকার করিয়া পুত্রকে লইয়া কন্যার গৃহে আগমন করেন, বোধ হয়, এই জন্যই অশ্বপতি তাঁহাকে পূর্ব্বে কোন কথা বলেন নাই। অশ্বপতি কন্যাকে লইয়া দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গিয়া বড়ই মহানুভবতার কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার যে প্রকারে রাজ্যভ্রষ্ট, চক্ষুহীন, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হীনাবস্থাপন্ন কিন্তু মহাধর্ম্মপরায়ণ দ্যুমৎসেনের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বের অতি রমণীয় বিকাশ হইয়াছিল। অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি পদব্রজে দুঃস্থ নরপতির নিকটে গমন করিয়াছিলেন:—

মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ দ্যুমৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ॥

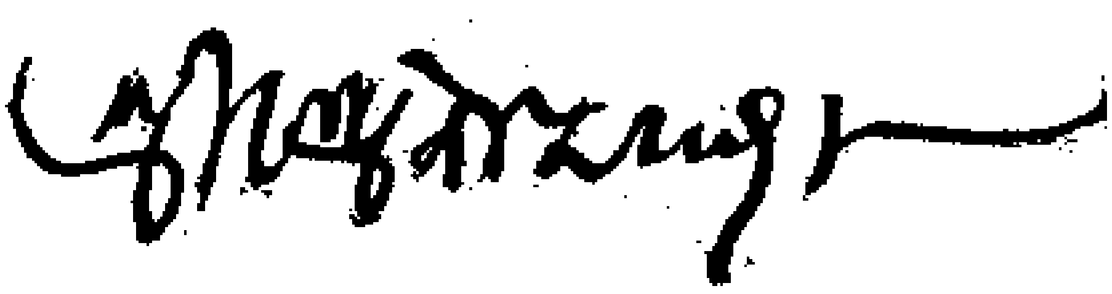
অর্থাৎ, পবিত্র অরণ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপনীত হইয়া সেই নরপতি দ্বিজাতিগণের সহিত পদব্রজেই সেই রাজর্ষির সন্নিহিত হইলেন।

অশ্বপতির ন্যায় মহাপুরুষেরই ত সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা হইয়া থাকে।

কাশীরাম লিখিয়াছেনঃ—

একান্তে বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হইতে সত্যবানে আনিল তখন॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি॥

ইহা মহাভারতকারের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে অশ্বপতির মহত্ত্ব মহানুভবতাদি সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার অনেক ধনবান লোক দরিদ্রের ছেলেকে আপন আপন গৃহে আনাইয়া তাহাদের সহিত যেরূপ কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, ইহা ঠিক সেইরূপ। প্রাচীন আর্য্য মহাপুরুষকে এখনকার বাঙ্গালী সাজাইয়া যে বিষম ভ্রম করা হইয়াছে, তাহা কাহার ভ্রম, ঠিক বলিতে পারি না। শুনা যায়, কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের মুখে ভারতকথা শুনিয়া আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে গ্রন্থ বঙ্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভ্রম কথক মহাশয়দিগের দ্বারা কৃত হইয়া থাকিলেও, উহার অধিক আলোচনা অকর্ত্তব্য। কথক মহাশয়েরাও বঙ্গের অনেক মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তবে এ কথা বলা আবশ্যক যে, যে সকল বাঙ্গালী সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরাজীতে পারদর্শী হইতেছেন, তাঁহাদের রামায়ণ মহাভারতাদির মহামহিমাময়ী কথার কথকতায় নিযুক্ত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।



রবীন্দ্রনাথ।

১৩০৬।

তোমার সঙ্গীত-রবে স্পন্দিত বরষ—
ললিত রাগিণী কভু বীণার কাঁদন,
কভু বা মুরজ-মন্দ্র—গভীর বেদন
নর-হৃদয়ের! হেথা বসন্ত-সরস
ধ্বাণী—বন অরণ্যের শ্যামল হরষ;
নিদাঘ-রুদ্রের সেথা রক্তিম নয়ন;
বরষা-উৎসবে পুন সঘন শ্রাবণ—
ছন্দে ছন্দে বরষের বিচিত্র পরশ।

কালের অসীম নিশি আজি আলোকিত,
—চন্দ্র-সূর্য্যে নয়—তারা উঠে—অস্ত যায়—
প্রতিভার চিরোজ্জ্বল অমর প্রভায়
সমুজ্জ্বল চারি যুগ নয়নে উদিত!
কল্পনা—কাহিনী—কথা—কণিকা হীরার
চারি দিকে চারি রবি চতুষ্ক শোভার।

ফুলের রং ও ভ্রমর।

ফুলের এত সৌন্দর্য্য কেন, এত বিচিত্র বর্ণ কেন? মানুষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে, তাই সে ফুলের আদর করে; কত যত্ন করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে ফুলগাছ লাগায়। কিন্তু লোকালয়ে বাগানে মানবচক্ষের সমক্ষে ক'টা ফুল ফোটে? নিবিড় বনে বা মরুভূমিতে যেখানে মানবের যাতায়াত নাই, সেখানেই ত যত সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। সেখানে সৌন্দর্য্যগ্রাহী কে আছে যে, এত বহুল সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হয়? ফুলের এত বর্ণবৈচিত্র্য এত সৌন্দর্য্য তবে কি অনর্থক?

বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, এ সৌন্দর্য্যের সার্থকতা আছে। উদ্ভিদ্ জাতির সন্তানোৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে পুষ্পের উজ্জ্বল বর্ণ বা সৌন্দর্য্য প্রধান সহায়। পুষ্পের যে সকল অঙ্গ উজ্জ্বলবর্ণ, সেগুলি তাহার অত্যাবশ্যক অঙ্গ না হইলেও, খুব প্রয়োজনীয় বটে।

জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও স্ত্রী পুরুষ আছে। ফুলগুলি যেন সেই স্ত্রী-পুরুষের আবাসগৃহ। কোন কোন গাছের স্ত্রী পুরুষ একত্র এক বাড়ীতে থাকে, অর্থাৎ একই ফুলে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন গাছের স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক বাড়ীতে বাস করে, অর্থাৎ তাহাদের স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল পৃথক্। গোলাপ, শিয়ালকাঁটা, কুমুদ, পদ্ম, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের মধ্যে দলবেষ্টিত কতকগুলি সরু সরু কেশর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে পরাগ-কেশর বলে। পরাগকেশরবেষ্টিত পুষ্পমধ্যস্থ উন্নত অংশকে গর্ভকেশর বলে। পরাগকেশরগুলি পুরুষ। গর্ভকেশর স্ত্রী। কোন কোন গাছে পরাগ-কেশর ও গর্ভকেশর একই ফুলে থাকে; যথা, গোলাপ, শিয়ালকাঁটা, পদ্ম, চাঁপা, বাকস, নিসিন্দা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি। আবার কোন কোন গাছে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর সেই গাছের ভিন্ন ভিন্ন ফুলে থাকে; যথা, লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙ্গে, ভুট্টা। আবার এমনও হয় যে, একগাছে শুধু পরাগকেশরবিশিষ্ট পুরুষ ফুল ফোটে, আর অন্য গাছে শুধু গর্ভকেশর-বিশিষ্ট স্ত্রী-ফুল ফোটে। যথা, পেঁপে, পিঠুলি ইত্যাদি।

পরাগ কেশরের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র কোষে পরাগ বা রেণু জন্মে। গর্ভকেশরের

কোষে বীজাণু জন্মে। পরাগ বা রেণু গর্ভকোষের উপর পড়িলে কোষস্থিত বীজাণু পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাতে নূতন বৃক্ষোৎপাদনক্ষম বীজের উৎপত্তি হয়। পুষ্পের এই নিষেকক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হয়? কীট পতঙ্গ, মধুপায়ী পক্ষী ও পবন দ্বারা এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পের গর্ভকোষে নীত ও নিষিক্ত হইয়া ফুলের গর্ভাধানকার্য্য সম্পন্ন হয়। বহুকাল পূর্ব্বে বার্লিনের নিকট স্পাণ্ডো নগরে স্প্রেঙ্গাল নামক এক জন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনায় এতই মত্ত থাকিতেন যে, স্বীয়পদোচিত ধর্ম্মযাজকের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার অবহেলা লক্ষিত হইত। এই দোষে তিনি পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ফুলের গর্ভাধানকার্য্যে ভ্রমর * যে প্রধান সহায়, তদ্বিষয়ে এই স্প্রেঙ্গাল সর্ব্বপ্রথমে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহার পর বহুকাল পর্য্যন্ত এ বিষয়টা চাপা পড়িয়াছিল। পরে ডার্বিন ও তাঁহার শিষ্যেরা নূতন করিয়া ভিন্ন প্রকারে এ বিষয়ের আলোচনা করেন। তার পর যত শুকবৎ পঠিত-পঠনের আবৃত্তি। নানা লোকে নানা ভাবে আপন আপন কল্পনা ও কবিত্বশক্তির সাহায্যে নানা রং চড়াইয়া এই কথার প্রচার করিয়াছেন। ডার্বিন ও তাঁহার শিষ্যদের আলোচনার ফল এই যে, ফুলের উজ্জ্বল বর্ণে বা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর ফুলের কাছে আসে, পরে মধুলোভে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রবেশ ও নির্গমপথে বা মধুপানসময়ে তাহার দেহে পুষ্পপরাগ লাগিয়া যায়। ভ্রমর তথা হইতে অন্য ফুলে গমন করিলে,তাহার দেহস্থিত পরাগ সেই ফুলের গর্ভকোষে নীত ও তদ্দ্বারা ঐ ফুলের গর্ভসঞ্চার হয়। আবার তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় ভ্রমর স্বদেহে সেই পুষ্পের পরাগ বহন করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে ভ্রমরেরা মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া পুষ্পের গর্ভাধানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ফুলের উজ্জ্বল বর্ণ ভ্রমরকে পথ দেখাইবার জন্য; ভ্রমর যাহাতে ফুলের নিকট আইসে, তজ্জন্য ফুল যেন সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতিয়া রাখে। রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমর ফুলের কাছে আসে। আসিয়া দেখে, মধু রহিয়াছে। লুব্ধ ভ্রমর মধুপান করিবার জন্য ফুলের মধ্যে প্রবেশ করে, আর অমনি ফুলের যাহা উদ্দেশ্য (গর্ভাধান) তাহা সফল হইয়া যায়। সব ফুলের ভ্রমর সমান নহে। যে ফুলে যে ভ্রমর

---

* 'ভ্রমর' কথা এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ভ্রমর বলিলে ভোমরা, মৌমাছি, মাছি, বোল্‌তা, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি ছোট বড় সব রকম insects বুঝিতে হইবে।

সচরাচর যায়, সে ফুলের আকৃতি ও গঠন সেই ভ্রমরের অনুরূপ হয়। সুতরাং একজাতীয় ফুলে অন্যজাতীয় ফুলের পরাগ পড়িবার তত সম্ভাবনা থাকে না। আবার একই ভ্রমর বহুপুষ্পগামী হইলেও ফুলগুলির এরূপ গঠন যে, তাহাতে ভ্রমরদেহে দুই-তিন-জাতীয় ফুলের পরাগ থাকিলেও, যে জাতীয় ফুলে যে পরাগ পড়া উচিত, তাহাই পড়ে।

যাহা হউক, ফুলের গর্ভাধানকার্য্যে ভ্রমর প্রধান সহায়। ফুলের গর্ভাধান হইল না হইল, ভ্রমরের তাহাতে মাথা-ব্যথা কেন ? ভ্রমরকে দিয়া ঐ কার্য্যসাধন করাইয়া লইবার জন্য ভ্রমরকে লোভ দেখাইতে হয়, বা ঘুস্ দিতে হয়। সেটা মধু। মধু আবার এমন ভাবে রাখিতে হয় যে, তাহা খাইতে আসিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মধু যে আছে, তা ভ্রমর জানিবে কি করিয়া ? সে জন্য মোটা মোটা অক্ষরে বিজ্ঞাপনের দরকার। সেটা ফুলের উজ্জ্বল রং, অথবা সুগন্ধ। তেজালো উজ্জ্বল রং চোখে পড়িলেই ভ্রমর নিকটে আইসে। হয় পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারে নিকটে মধু আছে, নতুবা শুধু সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া আইসে, যেমন পতঙ্গ দীপশিখার নিকটে আইসে ; পরে মধু দেখিয়া তাহার পানে রত হয়, এবং অজ্ঞাতসারে ফুলের শুভ বেগার খাটিয়া দেয়।

ইহাই মোটামুটি প্রচলিত মত। আজকাল বিবর্ত্তনবাদ বা বিকাশবাদের দিন। ফুলের বিচিত্র বর্ণের ক্রমবিকাশ হইল ভ্রমরের পছন্দের উপর নির্ভর করিয়া। ফুলের সহিত ভ্রমরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য যত লোকে যত পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্লাটোর পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার সমস্ত পরীক্ষার ফলে ইহাই নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভ্রমরেরা পুষ্পের বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার এই সকল পরীক্ষার বিবরণ সময়ে সময়ে Bulletin de L'Academie Regale de Belgique নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

একবার ড্যালহিয়া ফুলের কয়েকটা গাছে অনেক ফুল ফুটিয়াছিল ; অধ্যাপক প্লাটো সেই সব ফুলের উজ্জ্বলবর্ণ পাপড়িগুলি সবুজ পাতা দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। তাহাতে ভ্রমরের আগমন কমিল না। ভ্রমরেরা পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে যাতায়াত করিতে লাগিল। ভ্রমরেরা ফুলের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হয়, ইহাই প্রচলিত মত। কিন্তু প্লাটো যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা সে মতের বিরুদ্ধই দাঁড়াইল। সুতরাং এ বিষয়ের আরও বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক মনে করিয়া

তিনি বহুবিধ পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। তাঁহার সমস্ত পরীক্ষার ফলে পূর্ব্বের ব্যাপারই প্রতিপন্ন হইল। উজ্জ্বল বর্ণ ভ্রমরকে পুষ্পের দিকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে বিশেষ সক্ষম নহে। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমর ফুলের কাছে আসে না; তবে বৈজ্ঞানিক কবির কি দশা হইবে! তাঁহারা কত মিঠেমিঠে কথা বলিতেন।—নির্লজ্জ ফুলকুমারীদের ভ্রমর ভুলাইবার জন্য নানা সাজগোজ করা, রঙ্গ বেরঙ্গের বসনভূষণ পরা, ভ্রমরের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া তাহাকে প্রেমপিঞ্জরে বন্দী করিবার প্রয়াস,—এ সবই কি তবে পণ্ডশ্রম হইল? এ সব কল্পনা করিতেও কবির কত সুখ হইত! কবির অপেক্ষা ত দেখিতেছি ভ্রমর অনেক অধিক বুদ্ধিমান। অনেক কবি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হন, রূপের নিকট আত্মবিক্রয় করেন; ভ্রমর রূপের ভিখারী নহে।

প্লাটোর মনে প্রথম এই প্রশ্নের উদয় হইল যে, ফুলের যে অংশটা সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত, সেই অংশটা ফেলিয়া দিয়া যদি অন্যান্য অংশ রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে কি ভ্রমর এইরূপ হৃতসৌন্দর্য্য লুপ্তদল পুষ্পে আসিবে? তিনি ফুটন্ত লোবেলিয়া ফুলের গাছ-বসান দুটি টব লইলেন, তাহার প্রত্যেকটিতে ৩০।৪০টি লোবেলিয়া ফুল ফুটিয়াছিল। একটি টবের সমস্ত ফুলের নীল পাপড়িগুলি অতি সাবধানে কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। অপর টবের ফুলগুলি যেমন ছিল, তেমনই রহিল। এই দুটি টব পরস্পর হইতে একটু পৃথকভাবে বাগানের এক স্থানে রাখিয়া দিলেন। তার পর নিকটে বসিয়া ভ্রমরের আগমনের হিসাব রাখিতে লাগিলেন। অবশেষে গণনার ফল এই দাঁড়াইল যে, সুন্দর নীলবর্ণের সম্পূর্ণ ফুলগুলিতে ৩৩টি ভ্রমর আসিয়াছিল, আর সৌন্দর্য্যহীন ছিন্নদল ফুলে ২৫টি আসিয়াছিল।

এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ডারবিন যখন এই ফুল লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তখন বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। লোবেলিয়ার নীল দল (বা পাপড়ি) ছিন্ন করাতে ভ্রমরের আসা বন্ধ হইয়াছিল। প্লাটো কনভলভিউলস্ (কলমীজাতীয় ফুল), লার্কস্পর, ফক্সগ্লভ্, প্রিমরোজ প্রভৃতি ফুল লইয়াও ঐরূপ পরীক্ষা করেন, তাহার ফলও পূর্ব্বানুরূপ হইয়াছিল।

উজ্জ্বল বর্ণের এমন অনেক ফুল আছে, যাহাতে ভ্রমরেরা যায় না। কেবল বর্ণ দ্বারাই যদি ভ্রমর আকৃষ্ট না হয়, কোন্ ফুলে মধু আছে, তাহা জানিবার যদি তাহার অন্য উপায় থাকে, তবে ঐ সকল মধুহীন ফুলে মধু দিলে ভ্রমরের আসা উচিত। এই মনে করিয়া প্লাটো বাগানের কতকগুলি লাল রঙ্গের

জিরেনিয়াম ফুলের মধ্যে একটু একটু মধু রাখিয়া দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আটটি ভোম্‌রা আসিয়া মধুমাখান ফুলগুলির উপর বসিয়া মধু খাইয়া চলিয়া গেল। পার্শ্বস্থিত মধুহীন জিরেনিয়াম ফুলগুলিতে একবার বসিলও না। ফ্লক্স, আনিমোনি, বাইণ্ডউইড্ প্রভৃতি ফুল লইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করিলেন, তাহার ফলও পূর্ব্বানুরূপ হইল।

আর এক কথা; তাঁহার মনে হইল যে, ভ্রমরেরা যদি প্রধানতঃ বর্ণসৌন্দর্য্যের দ্বারাই আকৃষ্ট না হয়, তবে তাহারা যে সকল সুন্দর ফুলে মধুপান করিতে যায়, সে সব ফুলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া অভ্যন্তর হইতে মধুকোষ উপড়াইয়া তাহাদিগকে মধুহীন করিয়া দিলে ত ভ্রমরের আগমন রহিত হইবে।

প্লাটো কতকগুলি একহারা ড্যালিয়া ফুলের মধ্যস্থিত মধুনিঃসারী সমস্ত উপদলগুলি সাবধানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং সেইগুলির পরিবর্ত্তে হল্‌দে রঙ্গের পাতা কুচি কুচি করিয়া সেই আকারে কাটিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিলেন।

তিনি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, এরূপ ফুলে কোন ভ্রমরই আসিল না। পরে ঐ সকল ফুলের কৃত্রিম উপদলের উপর এক এক ফোঁটা মধু মাখাইয়া দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দলে দলে ভ্রমর আসিতে লাগিল।

এমনও ত দেখা যায় যে, যে সব গাছের ফুল খুব সামান্য ও সাদাসিদে, তাহাদের ফুলের পরাগ প্রধানতঃ বায়ুসঞ্চালনে বাহিত হইয়া গর্ভকোষে পতিত হয়। তাহাতেই বীজোৎপত্তি হয়। এই সব ফুল মনোজ্ঞদর্শন নহে, এবং ইহাদের মধু বা পরাগের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য আড়ম্বর নাই; উজ্জ্বল বর্ণের পাপ্‌ড়ি বা দল নাই। তথাপি এই শ্রেণীর অনেক ফুলে, যথা নলখাগড়া, ঘাস, চিনোপডিয়ম্ প্রভৃতিতে ভ্রমর আসে। ভ্রমরকে ফুলে আকর্ষণ করিবার পক্ষে উজ্জ্বল বর্ণ যদি একমাত্র বা প্রধান উপায় হইত, তবে এই সকল ফুলে ভ্রমর যাইত না।

প্লাটো আবার ভাবিলেন, সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইয়া যদি মধুতে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমরেরা ফুলের কাছে যায়, তবে অনুজ্জ্বল অমনোহর ফুলে মধু মাখাইয়া দিলে তাহাতে ভ্রমরের যাওয়া উচিত। তিনি পরীক্ষায় ঐ প্রকার সতের রকম ফুলে (ভাঙ্গ, বিছুটী, চিনোপোডিয়ম, তৃণ প্রভৃতিতে) মধু মাখাইয়া দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেক রকমের ফুলেই দলে দলে ভ্রমর আসিয়াছিল।

হেলিবোর, আইভি, ফিগ্‌ওয়ার্ট, সাইকামোর, র‍্যাম্পবেরি প্রভৃতির সবুজ

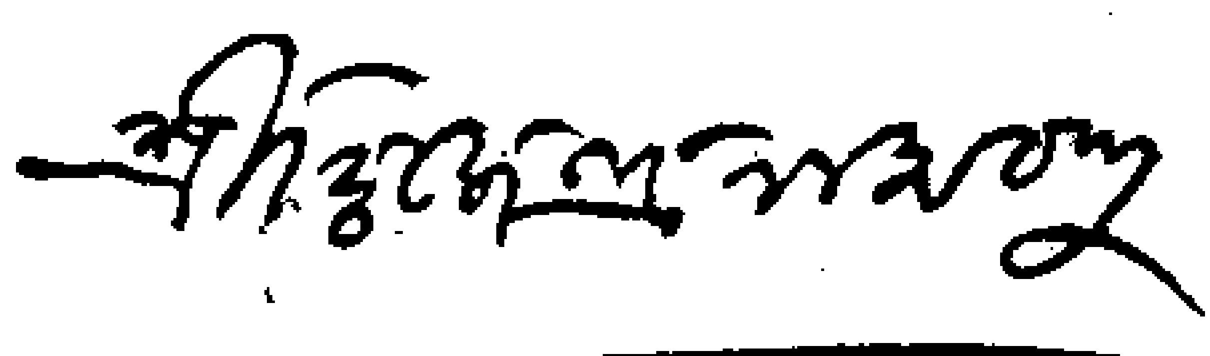
বা মেটেরঙ্গের ফুলেও ভ্রমর খুব যায়। ইহাতেও বুঝা যায় যে, ভ্রমরেরা সৌন্দর্য্যের দ্বারাই যে বিশেষ আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে।

অধ্যাপক প্লাটো বাগানের গাছে ফুটন্ত উজ্জ্বল বর্ণের আসল ফুলের মধ্যে কাগজ ও কাপড়ে নির্ম্মিত কৃত্রিম ফুল বসাইয়া দিলেন। এই ফুলগুলিকে দেখিয়া আসল কি নকল বুঝা যাইত না। এইরূপ ভ্রমোৎপাদক কৃত্রিম ফুলে একটিও ভ্রমর আসিল না। এই সব ফুলে মধু দেওয়া হইল, তবুও কিন্তু কোন ভ্রমর আসিল না। বোধ হয়,কাগজ বা কাপড়ের ফুলকে ইহারা সন্দেহের চক্ষে দেখে, অথবা তাহা হইতে এমন একটা গন্ধ বাহির হয়, যাহা তাহাদের তত পছন্দসই নয়।

অবশেষে প্লাটো গাছের সবুজ পাতা কাটিয়া তাহা দ্বারা নানা প্রকার অভিনবদৃশ্য কৃত্রিম ফুল প্রস্তুত করিয়া সেগুলিতে একটু একটু মধু দিয়া গাছে ঝুলাইয়া দিলেন। এই সকল কৃত্রিম ফুলে অনেক ভ্রমর আসিল।

অধ্যাপক প্লাটোর এই সকল পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকা যায় না যে, "ভ্রমরেরা ফুলের উজ্জ্বল রঙ্গিন অংশ থাকা না থাকা বড় একটা গ্রাহ্য করে না; তাহারা মধু অথবা পরাগের আকাঙ্ক্ষী, এবং ঘ্রাণশক্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়। দৃষ্টিশক্তির দ্বারা চালিত হইলেও অতি সামান্যভাবে হয়।"

পুষ্পের উজ্জ্বলবর্ণ ভ্রমরের পথপ্রদর্শক—এ কথা যদি অস্বীকার করা যায়, আর তাহা স্বীকার করিবারও উপায় নাই,—তবে বিবর্ত্তনবাদিগণ প্রধানতঃ যাহা অবলম্বন করিয়া এত দিন খুব আড়ম্বর পূর্ব্বক জনসাধারণে ভ্রমরনির্ব্বাচন-মূলক পুষ্পোৎপত্তি-বাদের প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাহার মূলে কুঠারাঘাত হয়। এই ভিত্তির উপর তাঁহারা যে Insect selection theory of the origin of flowers রূপ এক সুশোভন বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রখরপ্রভাকরকিরণসম্পাতে বাষ্পবৎ বিলীন হইয়া যায়।



রঘুবংশ। মুখ্য উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি।

* * বশিনাং রঘূনাং
মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি।

এইটুকুই রঘুবংশের বিশেষ গৌরবের কথা। যত দিন এ সংযম ছিল, তত দিনই রঘুকুলের গৌরব ছিল। দিলীপ রাজার চরিত্রনিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। দিলীপের তপস্যা হইতেই যে বংশীয় গৌরবের সূত্রপাত, কালিদাস তাহা বিশেষ যত্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এই তপস্যার ফল পুণ্যশ্লোক রঘু। তপস্যাবলে প্রাচীন দোষ পরাভূত করিয়া, পুণ্যময় একপত্নীত্বের ভিত্তিতে বংশীয় গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রঘুর জীবনে এই পবিত্রতা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া, সমগ্র বংশ রঘুনামে নামাঙ্কিত হইয়াছে। অজ এই দিলীপ-বীজ-সম্ভূত রঘুবৃক্ষের ফল। একপত্নীত্বের চরম আদর্শ এই ফলে। প্রথম যৌবনে যৌবনভোগের আরম্ভে পত্নীবিয়োগ হইল; অমনি রাজা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। পুত্রটিকে মানুষ করিবার জন্য, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত, যত দিন জীবনধারণ করিতে হয়, জীবনধারণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অন্তর্বর্দ্ধিত শোক, প্লক্ষপ্ররোহের মত তাঁহার দেহসৌধ ভগ্ন করিয়া ফেলিল।

ইহার পরেই দশরথ রাজার বহুবিবাহ। কি উদ্দেশ্যে বিশ্বস্রষ্টা আমাদের এই ধূলার জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জন্ম বিকাশ ও মৃত্যু এখানে পরে পরে সাজান। এত গৌরবের রঘুবংশেরও ক্ষয় হইবে, তাহার সূত্রপাত হইল। বহুকালের সঞ্চিত পুণ্যে যাহা গঠিত, তাহা একদিনের অনাচারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রবণ হইয়া উঠে। ঋষিদিগের তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারতসমাজে কত অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু এখনও তাহার বিনাশ হয় নাই। কত বিপ্লব বহিয়া গেল, তবুও আমাদের উচ্ছেদ হয় নাই। কিন্তু কেবলমাত্র প্রাচীন ভিত্তির জোরে আর কত দিন টিকিবে? প্রাচীন ভারতের তপস্যা গিয়াছে, ব্রহ্মনিষ্ঠা গিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযম গিয়াছে,এখন এই মাংসহীন,জীবনহীন কঙ্কাল আর কত দিন থাকিবে? নির্ব্বাণের পূর্ব্বে একবার রঘুকুলগৌরবের দীপ্তি বড় প্রখর হইয়াছিল। রামচরিত্রে যাহা অভিনীত, জগতে তাহা অতুল্য। রাজা দশরথ যাহা হারাইয়াছিলেন,

রাম তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ সেই জৃম্ভকাস্ত্র ও জৈত্রাভরণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামলক্ষ্মণাদির অক্ষুণ্ণ পুণ্যপ্রভাব সত্ত্বেও তাঁহাদিগের জীবনান্তেই রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। এক-দিকে যেমন "ভিন্নোঽষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ", অন্য দিকে তেমনি রাজত্বের গৌরব রাজ্যবিভাগে হীনতাপ্রাপ্ত হইল। একছত্র রাজত্ব আর রহিল না। রাজা দিলীপের সময় বলা হইয়াছিল যে,—

স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্।
অনন্যশাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব॥

এখনকার মাহাত্ম্যের কথা সুধু এইটুকু রহিল যে, পরস্পরে বিরোধ ছিল না বলিয়া কেহ কাহারও রাজ্যের দিকে চাহিতেন না,—

অন্যোন্যদেশপ্রবিভাগসীমাং
বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ॥

কিন্তু ইহাতে জৈত্র যাত্রা রহিত হইল; দিগ্বিজয়াদি দ্বারা দেশের সামরিক ভাব উদ্দীপ্ত রাখিবার আর পথ রহিল না।

কিন্তু সকল কথার বড় কথা এই যে, শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ ইন্দ্রিয়সংযম হারাইয়াছিলেন।

চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী, বুঝি চিরদিনের মত বিদায় লইবার জন্য নিশীথকালে কুশ রাজাকে দেখা দিয়াছিলেন। অৰ্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে, কুশরাজার শয্যা-গৃহে, রাজ্যলক্ষ্মী যুবতীবেশে দেখা দিলেন। রঘুবংশের এই স্থলের বর্ণনাটি যে কত মনোহর, তাহা কেহ না পড়িলে বুঝিতে পারিবেন-না। কুশ দেখি-লেন যে, রমণী যুবতী, এবং দুঃখে তাহার মুখশ্রী মলিন; অথবা কালিদাসের অমর ভাষায়

"বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।"

তখনও কুশের অধঃপতন হয় নাই, তখনও রামপুণ্যপ্রভায় তাঁহার অন্তঃ-করণ প্রদীপ্ত—তাই তিনি সমাগত একাকিনী যুবতী রমণীকে বলিলেন,—

কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা
কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং
মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি।

অর্থ,—কল্যাণি! আপনি কে? কাহার পত্নী? রঘুবংশীয়েরা চিরদিন

জিতেন্দ্রিয় এবং পরস্ত্রীতে বিমুখপ্রবৃত্তি, এ কথা স্মরণ রাখিয়া আপনি কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন, তাহা বলুন।

ভারতের সাহিত্যভাণ্ডারে যত মাণিক্য মুক্তা আছে, তাহার মধ্যে এই একটি।

যে শুভক্ষণে কুশ এই বংশগৌরবের কথা বলিয়াছিলেন, সে শুভক্ষণ অধিক দিন তিষ্ঠে নাই। অযোধ্যানগরীপ্রবেশের পরেই—সরযূজলে যুবতীগণপরিবৃত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন, দেখিতে পাই। এই প্রকারে বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা রঘুকুলে এই প্রথম দেখা দিল। এই স্থলে কাব্যশিল্পী যে ঘটনাটির সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা শিল্পচাতুর্য্যে ও সন্নীতিশিক্ষায় বড় মনোহর। রাজা জল ছাঁকিয়া কুম্ভীরাদি তাড়াইয়া নিরুপদ্রবে জলক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জৈত্রাভরণ জলে ডুবিয়া গেল।

যৎ কুম্ভযোনেরধিগম্য রামঃ
কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ।
তদস্য জৈত্রাভরণং বিহর্ত্তুঃ
অজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ॥

অর্থ;—রাম, অগস্ত্যের নিকট হইতে যে জয়কবচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই রাজ্য সহিত কুশকে দিয়াছিলেন। আজ জলবিহারকালে কুশের অজ্ঞাতসারে তাহা সলিলে ডুবিয়া গেল।

কুম্ভীরাদি তাড়াইয়া নিরুপদ্রব হওয়া সহজ; কিন্তু ইন্দ্রিয়জয় করিয়া কুশললাভ সহজ নহে। ভোগোৎসবমত্ত আসীরীয় রাজা দৈবলিপি দেখিয়া যেমন চমকিয়াছিলেন, কুশও তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। যে "অপরাজিত দিব্য কবচ" পরিয়া রাম "রিপুর প্রহারে" "অক্ষত" ছিলেন, আজি তাহা বিনষ্ট হইল।

তাহার পর কুমুদ নাগ আবার রাজাকে সেই আভরণ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন লেখা আছে। কিন্তু আসল কবচ বুঝি ফিরাইয়া দেন নাই। কারণ, পরীক্ষায় অন্তরূপ দেখা গিয়াছে। কুমুদ নাগ বলিলেন যে, আমার যুবতী ভগ্নীটিকে বিবাহ করিবে? রাজা বলিলেন, তথাস্তু। যুবতী পাইলে কে কোথায় পরিত্যাগ করে? এই যখন মনের ভাব, তখন কুমুদ নাগ যে জিনিস ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা নকল। তাহা না হইলে কবচটি বিহারকালে জলে ডুবাইবার সার্থকতা থাকে কই?

রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন, জয়কবচ অতল জলে ডুবিল, আর রঘুবংশের রহিল কি? তাহার পর এই জলক্রীড়া অপেক্ষাও প্রগাঢ়তর ইন্দ্রিয়াসক্তির কথা। পরবর্ত্তী রাজগণ কেবল অন্তঃপুরেই থাকিতেন, এবং রাজ্যশাসন দূরে থাকুক, প্রজাদিগকে কচিৎ পাদাগ্রভাগ দেখাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন। এইরূপে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ সর্গে ইন্দ্রিয়সেবানিরত রঘুকুলাধমদিগের বর্ণনা করিয়া কবি রঘুবংশের অধঃপতন চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্র যদি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের অন্তঃকরণে উজ্জ্বল থাকিত,তাহা হইলে আজিকার এ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না।

একপত্নীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যে ভাবে সমগ্র গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এবার সংক্ষেপতঃ তাহার উল্লেখ করা গেল। এতৎপ্রসঙ্গে কালিদাস যে সকল গূঢ় সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পরে দেখাইব।

[illegible]

বিদেশী গল্প।

সৈনিক। *

বিজয়ী জর্ম্মান সৈন্যের সহিত ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া অবধি ওয়াল্টার স্নাফ্‌সের দুঃখের আর সীমা ছিল না। স্থূলদেহভারে তাহার হাঁটিতে অত্যন্ত কষ্ট হইত, এবং পায়ে বড় বেদনা অনুভব করিত। সে বড় শান্তস্বভাব ছিল, বল বিক্রম তাহার আদপেই ছিল না। নিজের চারিটি সন্তানকে সে বড় ভালবাসিত, এবং তাহার তরুণী পত্নীর সামান্য আদর যত্নটুকু পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া বড় কষ্ট অনুভব করিত। ওয়াল্টার স্নাফ্‌স্ শীঘ্র শীঘ্র শয্যার আশ্রয় লইত, এবং যত দূর সম্ভব দেরী করিয়া উঠিত,ভাল দ্রব্য অনেক ক্ষণ ধরিয়া আহার করিত, এবং বিয়ার-পানে তাহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। সে তলোয়ার বন্দুক কামান পিস্তলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, এবং সঙ্গীনটাকে আদপেই পছন্দ

* গীদে মোপাঁসার ফরাসী গল্পের ইংরাজী হইতে অনুদিত।

করিত না; কারণ, নিজের দেহভার লইয়া সঙ্গীন দ্বারা আত্মরক্ষা করা তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল।

রাত্রে মোটা কোট জড়াইয়া নিদ্রামগ্ন সঙ্গীদের পাশে শুইয়া তাহার পরিবারের এবং আপনার বিপদসঙ্কুল জীবনের কথা ভাবিত। সে যদি মরিয়া যায়, তবে তাহার ছেলেপিলের দশা কি হইবে? কে তাহাদের প্রতিপালন করিবে? সে আসিবার সময় ধার করিয়া তাহাদের যে টাকা দিয়া আসিয়াছিল, তাহা ত বেশী নয়! সে তখন শুইয়া শুইয়া কাঁদিত।

যুদ্ধের প্রারম্ভে তাহার পদদ্বয় অবশ হইয়া পড়িত। সমগ্র বাহিনী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার ভয় না থাকিলে সে হয় ত সেই স্থানে পড়িয়া যাইত। বন্দুকের গুলি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত।

মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তাহার অশান্তি ও যন্ত্রণার অবসান হইল না।

সেই সময় সৈন্যগণ নর্ম্মাণ্ডির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। একদিন সেনাপতি স্নাফ্‌স্ ও আর কয়েক জনকে নিকটে শত্রু সৈন্য আছে কি না দেখিয়া আসিবার আদেশ দিলেন। সেখানে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

জর্ম্মানগণ একটা উপত্যকার উপর দিয়া যাইতেছিল; সহসা একটা ঝোপের পশ্চাৎ হইতে তাহাদের উপর মুষলধারে গুলি বর্ষিত হইল। জর্ম্মানদিগের কুড়ি জন সৈন্য তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার পর লুকায়িত ফরাসী সৈন্য ঝোপের পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া সঙ্গীন লইয়া জর্ম্মানদের আক্রমণ করিল।

ভয়ে স্নাফ্‌স একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল,—এমন কি, পলায়নের কথাটা পর্য্যন্তও তাহার মনে উদিত হয় নাই। হঠাৎ সে কথাটা মনে পড়িয়া স্নাফ্‌স্ বিচলিত হইল, কিন্তু তাহার কূর্ম্মগতি ফরাসীর ক্ষিপ্র গতির নিকট মুহূর্ত্তমধ্যে পরাজিত হইবে। স্নাফ্‌স্ তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত দেখিতে পাইল। কোনরূপ চিন্তা না করিয়া সে গর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

এই অভাবনীয় আশ্রয় পাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল নীল আকাশ; তবে ত শত্রুগণ গর্ত্তের মুখ দিয়া তাহার লুকায়িত শরীরটাকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিতে পারে, এবং তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! স্নাফ্‌স্ অতি কষ্টে পাতা ডালপালা সরাইয়া কোনরূপে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল।

অনেকক্ষণ পরে বন্দুকের শব্দ থামিয়া গেল। তার পর রাত্রি আসিল।

স্নাফ্‌স্ ভাবিতে লাগিল, সে এখন কি করিবে। পুনরায় সৈন্যদলে মিলিত হইবে? —তাহা হইলে তাহাদের কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? পুনরায় সেই দুঃখ-কষ্ট-যাতনাময় জীবন আরম্ভ করিবে? কখনই না! পথ চলিতেও পদে পদে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাহার আর আদৌ সামর্থ্য ছিল না।

কিন্তু এ গর্ত্তের ভিতরও ত যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকা যাইবে না। আহারটা ত নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে গর্ত্তের ভিতর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে স্নাফ্‌সের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। আর সেখানে, শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দুক, গুলি, গোলা আর সৈনিকপরিচ্ছদ লইয়া থাকা কি ভয়ানক বিপজ্জনক! স্নাফ্‌স শিহরিয়া উঠিল।

তার পর হঠাৎ একটা মৎলব তাহার মাথায় আসিল,—সে যদি বন্দী হয়! স্নাফ্‌স্ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। তাহা হইলে ত সে বাঁচিয়া যায়, আহার পাইবে, গৃহ পাইবে, বন্দুক তরবারি হইতে বহু দূরে থাকিতে পাইবে। বন্দী! আঃ কি সুখ! সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিল, "এখনি গিয়া ধরা দিব।" স্নাফ্‌স উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখনি আবার তাহার মনে নূতন ভীতি জাগিয়া উঠিল,—সে কোথায় গিয়া ধরা দিবে! মৃত্যুর ভীষণ ছায়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিয়া গেল! একাকী এ স্থানে বাহির হইলে বিপদের সীমা নাই। হয় ত সে এক দল কৃষকের সম্মুখে পড়িবে। তাহারা এক জন অসহায় জর্ম্মানকে দেখিয়া কি আর তাহার মুণ্ডের লোভ সংবরণ করিতে পারিবে? আর যদি এক দল ফরাসী সৈন্যের সহিত দেখা হয়, তবে তাহারা ত তাহাকে তামাসা দেখিবার জন্যই গুলি করিবে! সে কল্পনার চক্ষে আপনাকে একটা দেওয়ালের গাত্রে এক ডজন বন্দুকের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত দেখিল!

নিরাশার ভারে স্নাফ্‌স বসিয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ ঘোর অন্ধকার রাত্রি চারি দিক ছাইয়া ফেলিল। স্নাফ্‌স হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল। নিকট দিয়া একটা খরগোস দৌড়িয়া গেল, সে চমকিয়া উঠিল। পেচকের অশুভ চীৎকারে অনাদিকালের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ছবির কল্পনা করিল। প্রতিমুহূর্ত্তে সে কাহারও পদশব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তার পর গর্ত্তের মুখ দিয়া দেখিল, আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। অবসন্নদেহে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সে জাগিয়া বোধ করিল, সূর্য্য বোধ হয় মাথার উপরে; তবে ত বেলা

দুপুর হইয়াছে। চারি দিক নিস্তব্ধ। ওয়াল্টার বেশ অনুভব করিল যে, তাহার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। সৈন্যদের খাদ্য রসনাতৃপ্তিকর সসেজ কল্পনা-চক্ষে দেখিল। তাহার জিহ্বা সরস হইল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্ষীণপদে অগ্রসর হইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। আবার চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইল।

তার পর আর একটা মতলব মাথায় আসিল। এক জন নিরস্ত্র কৃষক একাকী বাহির হইবে, সে তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। সে মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিল, কারণ তাহার চূড়াটা তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারে। তার পর অতি সাবধানে গর্ত্তের মুখ দিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। যত দূর দৃষ্টি চলে, জনপ্রাণীর নামগন্ধও নাই। দক্ষিণে একটা ছোট গ্রামের বাড়ীগুলি হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল, সে ধূম হয় ত তাহাদের রন্ধনশালার! বামে একটা বহুচূড়াসমন্বিত প্রাসাদ দেখা গেল।

স্নাফ্‌স সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল, কিন্তু কোন কৃষক আসিল না। আবার রাত্রি আসিল। অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। আবার প্রভাত হইল। পূর্ব্ব দিনের মত আজও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তার পর স্নাফ্‌সের মনে আর একটা ভয় জাগিয়া উঠিল—সে হয় ত অনাহারে মরিবে।

শেষে মরিয়া হইয়া স্নাফ্‌স গ্রামের দিকে যাইবে স্থির করিয়া প্রস্তুত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ তিন জন হলস্কন্ধ কৃষককে ক্ষেত্রাভিমুখে যাইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার লুক্কায়িত হইল।

সন্ধ্যাসমাগমে সে আর থাকিতে পারিল না। গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া সে সভয়ে বাম দিকের সেই প্রাসাদাভিমুখে চলিল। গ্রামটাকে সে ক্ষুধার্ত্ত-ব্যাঘ্রসঙ্কুল বলিয়া মনে করিল।

নীচের তলার একটা বাতায়ন মুক্ত ছিল, গৃহমধ্যে আলো জ্বলিতেছিল, এবং সিদ্ধ মাংসের গন্ধে চারি দিক আমোদিত হইয়া যাইতেছিল,সে গন্ধ ওয়াল্টার স্নাফ্‌সের নাসাপথে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে গিয়া পঁহুছিল। দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া সে জানালার নিকট উপস্থিত হইল।

সে গৃহে আট জন ভৃত্য ভোজনে উপবিষ্ট ছিল। অকস্মাৎ এক জন দাসীর হস্ত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল, তাহার নয়নদ্বয় প্রজ্বলিত ও বদন বিস্ফারিত হইয়া পড়িল। সে যে দিকে চাহিয়াছিল, সকলে সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল।

বাপ রে! জর্ম্মানগণ প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে।

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তার পর গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি, চেয়ার টেবিল ভঙ্গ, দ্বারাভিমুখে জীবনভয়ে সকলের প্রস্থান! মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহ জনশূন্য। টেবিলের খানা যেমন ছিল, তেমনই রহিল। ওয়াল্টার স্নাফ্‌স বাতায়নপথে মুগ্ধনেত্রে তাহা দর্শন করিতেছিল। স্নাফ্‌স জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ক্ষুধার যাতনায় সে কাঁপিতেছিল, কিন্তু ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। সে কান পাতিয়া শুনিল, সমস্ত বাড়ী কাঁপিতেছিল। উপরতলায় পদশব্দ শুনা যাইতেছিল। দৌড়াদৌড়ি, দ্বারে শব্দ ইত্যাদির পর সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ওয়াল্টার স্নাফ্‌স একটা অস্পৃষ্ট ডিস্ টানিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। সে বড় বড় গ্রাস মুখে পুরিতেছিল, কারণ তাহার সঙ্কল্প,—বিপৎপাতের পূর্ব্বেই যথেষ্টপরিমাণে আহার সম্পন্ন করিবে। সময়ে সময়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, তখন সে মদ্যের বোতল মুখে ঢালিয়া বদ্ধ ভোজ্যগুলিকে উদরে প্রেরণ করিতেছিল।

স্নাফ্‌স্ সমস্ত ডিস ও বোতল শেষ করিয়া কোটের বোতাম খুলিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে বড় ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। প্রাসাদের বাহিরে বৃক্ষান্তরালে অনেকগুলি লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অস্তগামী চন্দ্রের কিরণে তাহাদের অস্ত্রগুলি এক একবার ঝলসিয়া উঠিতেছিল। প্রাসাদের বাতায়নপথে তখনও আলো দেখা যাইতেছিল।

এক জন গর্জ্জিয়া উঠিল,—"আক্রমণ কর।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বার ভগ্ন করিয়া ফরাসী সৈন্যগণ গৃহে প্রবেশ করিল। পঞ্চাশ জন সৈন্য, যে স্থানে ওয়াল্টার স্নাফ্‌স্ নিদ্রা যাইতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, নিমেষমধ্যে তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল।

স্নাফ্‌স হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। জরীর পরিচ্ছদে ভূষিত এক জন সেনাপতি স্নাফ্‌সের ভূপতিত দেহের উপর পদস্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুই আমার নিকট বন্দী! আত্ম-সমর্পণ কর!" স্নাফ্‌স অব্যক্ত শব্দ করিল। সকলে তখন তাহাকে একটা চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া পরিশ্রান্তদেহে বসিয়া পড়িল।

ওয়াল্টার আনন্দে হাসিয়া ফেলিল। তবে ত সে নিশ্চয়ই বন্দী!

আর এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "কর্ণেল, শত্রুগণ

পলায়ন করিয়াছে, আমার বোধ হয়, তাহাদের বহুসংখ্যক সৈন্য আহত হইয়াছে। এ স্থান আমরাই অধিকার করিয়াছি।"

বড় সেনাপতি কপালের ঘাম মুছিয়া চীৎকার করিলেন, "জয়!" তার পর পকেট হইতে একটা ছোট নোটবুক বাহির করিয়া লিখিলেন, "ভীষণ যুদ্ধের পর জর্ম্মানগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আহত ও মৃতদিগকে লইয়া গিয়াছে, হতাহতের সংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ জন। আমরা এক জনকে বন্দী করিয়াছি।"

ছোট সেনাপতি বলিল, "এখন কি করিব, কর্ণেল?"

"শত্রুগণ কামান টামান লইয়া পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, অতএব আমরা এখন প্রস্থান করিব।"

সৈন্যগণ ফিরিয়া চলিল। দৃঢ়বদ্ধ স্নাক্‌স্ ছয় জন পিস্তলধারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের সহিত চলিল।

পথে কোনও ভয়ের আশঙ্কা আছে কি না, দেখিবার জন্য চর প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ মধ্যে মধ্যে থামিয়া অত্যন্ত সাবধানে পথ চলিতে লাগিল। প্রত্যূষে তাহারা লা রস্ ওয়েজেনের ঘাঁটিতে আসিয়া পঁহুছিল। লা রস ওয়েজেনের ন্যাশনেল গার্ড সৈন্যদল এই যুদ্ধ জয় করিয়াছিল।

সহরের লোকেরা তাহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বন্দীকে দেখিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। এক জন বৃদ্ধ বন্দীর প্রতি তাহার কোদালি ছুঁড়িয়া মারিল, কিন্তু তাহাতে স্নাক্‌সের এক জন রক্ষীর নাসা ভগ্ন হইল।

কর্ণেল হুকুম দিলেন, "বন্দীকে হুঁসিয়ারিতে রাখ।"

তাহারা টাউনহলে আসিয়া পঁহুছিল। কারাদ্বার মুক্ত হইল। বন্ধন মুক্ত করিয়া স্নাক্‌স্‌কে সেখানে অবরুদ্ধ করা হইল। দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য অট্টালিকা পাহারা দিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ অজীর্ণরোগ সত্ত্বেও আনন্দে অধীর হইয়া স্নাক্‌স নৃত্য করিতে লাগিল, তার পর অবসন্নদেহে এক কোণে পড়িয়া রহিল।

এইরূপে ছয় ঘণ্টাকাল শত্রুকরে পতিত হইয়া সাম্পিনে প্রাসাদ ফরাসী কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইল।

সেদিনকার যুদ্ধের অধিনায়ক বস্ত্রব্যবসায়ী কর্ণেল রাতিয়ের এই বিজয়ের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

গ্র্যাণ্ট আলেন।

গ্র্যাণ্ট আলেনের মৃত্যুতে ইংরাজী-সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে একজন অমানুষী প্রতিভার অধীশ্বরের তিরোভাব হইয়াছে, এমন কথা তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ ব্যতীত আর কেহ বলেন নাই। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজী সাহিত্যের এক জন প্রতিভাশালী, বহুবিষয়সারগ্রাহিণী বুদ্ধির অধীশ্বর, আন্তরিকতাপূর্ণ প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমিক ও সাহিত্যসেবকের আসন শূন্য হইয়াছে। ভক্তগণের সান্ত্বনা এই যে, যাহারা তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিল না, তাহারা তাঁহার কৃত কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু দিয়া তাঁহাকে বিচার করিতে পারিবে না,—unrealised possibility বুঝিবার আশা সকলের নিকট করা যায় না। সময়, সুবিধা ও সুযোগ ব্যতীত প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পায় না; ইহাদের অভাবে প্রতিভা অকালবিকশিত কুসুমের দশা প্রাপ্ত হয়। কীট্‌সের প্রতিভা বিকশিত হইলে তাহার যে সৌরভে সাহিত্যকুঞ্জ সুরভিত হইত, আমরা তাহার অতি সামান্য আভাষমাত্র পাইয়াছি; গ্রের নিকট পাঠক স্বভাবতঃই আরও অধিক প্রত্যাশা করেন; একটা সামান্য ভ্রমে চ্যাটার্টনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; আমাদের দেশেও দৃষ্টান্ত বিরল নহে,—সঞ্জীবচন্দ্র, বিহারীলাল ও তারকনাথের নিকট আমরা কতটুকু পাইয়াছি? তাই প্রিয়বন্ধু হ্যালমের জন্য শোকগীতিতে টেনিসন গাহিয়াছেন,—

> "তুমি গেছ চলি'—আমি ভাবিতেছি বসি'
> ধরায় যাপিয়া গেছ তুমি যে জীবন;
> ভাবিতেছি,—ছড়া'ত কি উজল কিরণ,
> পূর্ণিমা আসিলে, তব প্রতিভার শশী।"

গ্র্যাণ্ট আলেন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহা স্থির করিয়া বলা দুষ্কর। কিন্তু যেমন সূর্য্যালোকে দশ দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যেমন অনলস্পর্শে তুচ্ছ তৃণপত্রাদিও সমুজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে, তেমনই তাঁহার প্রতিভার গুণে সকল বিষয়ই চিত্তাকর্ষক হইত। প্রকৃত প্রতিভার এই অসামান্য বর গ্র্যাণ্ট আলেন বোধ করি বহুসাধনায় পাইয়াছিলেন, বহু যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার এই পরিচয়-প্রবন্ধে "ফর্টনাইটলি রিভিউ" পত্রে তাঁহার ভক্ত রিচার্ড লুগালিঞ্জের রচিত প্রবন্ধ ও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯২ খৃঃ) তাঁহার প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে "আইড্‌লার" পত্রে

উন্নতিই গ্র্যাণ্ট আলেনের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি উন্নতির স্বপ্নে অভিভূত ছিলেন। যখন The Woman who Did গ্রন্থে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করায় চারি দিক হইতে নিন্দার নিষ্ঠুর গুঞ্জন ধ্বনিত হইল; বোধ হয়, তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতিস্বপ্ন অনেকটা তাঁহার কল্পনার ফল; ইংলণ্ডের উন্নতি অনেকটা কথার কথা। তাঁহার মৃত্যুকালে যেন কিছু দিনের জন্য উন্নতির উন্মুক্ত দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, দ্বারপ্রান্তে অবনতির রব শ্রুত হইতেছিল। মানসের (Ideal) এই দুর্গতিতে যেন তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল; সে উৎসাহোজ্জ্বল হৃদয়ে সে ছায়া ক্ষণিক হইলেও ছায়াপাত বোধ হয় অনিবার্য্য। কারণ, যে যুবক, সে জীবনপ্রভাতে মেঘ কুজ্ঝটিকা দেখিলে মনে করিতে পারে যে, এখনও দীর্ঘ দিন অবশিষ্ট, এ সবই অপসৃত হইবে; কিন্তু যাহার জীবনে অপরাহ্ণ উপস্থিত--ধূসরাঞ্চলা সন্ধ্যার সূচনা হইতেছে, তাহার পক্ষে দিনান্তের স্বর্ণাভাবিলোপ বড়ই কষ্টকর—বড়ই দুঃখের কারণ। স্বাধীনমতপ্রচারের জন্য অত্যাচার সহ্য করিবার দৃষ্টান্ত প্রাচীন। যখন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের জন্য লোক প্রাণ দিত, তখন যিনি কোন নূতন মতের প্রচার করিতেন, তাঁহাকে করাল কৃপাণ, লেলিহান অগ্নিশিখা ও অমানুষ অত্যাচার সব তুচ্ছ করিয়া সে কার্য্য করিতে হইত। কেহ কেহ বলেন, এখন বিশ্বাসের মূল শিথিল, ধর্ম্ম সংশয়বাদমাত্রে পর্য্যবসিত, সভ্যতার সংঘর্ষে মানুষের স্বাতন্ত্র্য গিয়াছে—সবই যেন এক ছাঁচে ঢালা, চারি দিকে কপটতা,—কাজেই এখন ক্ষুদ্রের দংশনে সামান্য জ্বালা,—কেবল সমালোচকের আন্তরিকতাহীন সমালোচনায় ক্ষণস্থায়ী চীৎকার।

উন্নতি।

যে সকল পরচ্ছিদ্রান্বেষী সমালোচক—আবর্জ্জনাপ্রিয় মক্ষিকাজাতীয় পতঙ্গের মত নিয়ত নিন্দাগুঞ্জনে লোকের বিরক্তির উৎপাদন করে, তাহারা গ্র্যাণ্ট আলেনের নিন্দা করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু গ্র্যাণ্ট আলেন তাহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। একটি অণুবীক্ষণ তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল; সেটি হাতে না থাকিলে যেন তাঁহার কথার উৎস শুকাইয়া যাইত। সার ওয়াল্‌টার স্কটের সতীর্থদিগের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে প্রশ্নের উত্তরপ্রদানকালে জামার বোতাম ধরিত। স্কট সে বোতামটি কাটিয়া দিলে সে আর যথাযথ উত্তর দিতে পারিল না, —সেই দিন হইতে সে আর কখনও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গ্র্যাণ্ট আলেনের অণুবীক্ষণটি সেইরূপ ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তিও অসাধারণ বলিয়া বোধ হইত। তিনি বহু বিষয় যেন নখদর্পণে দেখিতেন। বন্ধুরা কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক হইলে বলিতেন, "We must look it up in Grant." যে সকল পাণ্ডিত্যাভিমানী লেখক চিত্তাকর্ষক বিষয়কেও নীরস করিয়া তুলেন, তাঁহারা গ্র্যাণ্ট আলেনের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেন, তিনি সাধারণকে বুঝান—তাঁহার কায Popularising; যিনি স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ জ্ঞানের বিস্তার করেন, তিনিই স্বার্থপর বিদ্যাভিমানীর নিকট নিন্দিত। যাঁহারা ইংরাজী ও জার্ম্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন, তাঁহারা হইতে আরম্ভ করিয়া মেকলে, ফ্রুড, গ্রীন, সকলেরই বিরুদ্ধে এই এক অভিযোগ। গ্র্যাণ্ট আলেন অতি জটিল বিষয়কেও সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন।

বিজ্ঞান।

সরলতাই গ্রাণ্ট আলেনের রচনার প্রধান গুণ। বিশেষণবাহুল্যের অভাবে অনেকে পোপকে কবি বলিয়া স্বীকার করেন না ;—ডিকুইন্সি ও ষ্টীভেন্‌সনের গদ্যের বাহারে মুগ্ধ হইয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে, সহজবোধ্যতা ও সরল বিবৃতি গুণেই বেকনের রচনার আদর। অল্প কথায়, মিষ্ট করিয়া সহজে জটিল বিষয় বুঝাইবার ক্ষমতায় গ্রাণ্ট আলেনের প্রতিদ্বন্দ্বী অল্প।

রচনা-প্রণালী।

গ্রাণ্ট আলেনের যে রচনা চেষ্টার ফল নহে, তাহাই বড় মিষ্ট হইত। তাহা নির্ঝরের বারিরাশির ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। একবার তাঁহার একখানি পুস্তকের সমালোচনায় সমালোচক লিখিয়াছিলেন যে, সেখানির রচনাবিষয়ে লেখক তেমন যত্ন লয়েন নাই ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানিতে তিনি সাধারণ রচনার অপেক্ষা দশগুণ অধিক যত্ন লইয়াছিলেন, তাহার পাণ্ডুলিপির "টাইপ-রাইটারে" লেখা পৃষ্ঠাগুলি সংশোধনে পর সংশোধনের পূর্ণ। তাঁহার যত্নের ফল অপেক্ষা অযত্নসম্ভূত রচনা অধিক হৃদয়গ্রাহিণী। তিনি চলিত রকমে রচনা করিতেন ; সেই তাঁহার প্রকৃত নিজস্ব রচনাপ্রণালী।

গ্রাণ্ট আলেন পদে পদে ইংলণ্ডের প্রচলিত মতের পথ ত্যাগ করিতেন। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রচলিত মতের বিরোধ উপস্থিত হইত। তিনি সর্ব্বদা নির্ভীকভাবে স্বীয় মতের প্রচার করিতেন। আজকাল সভ্যজগতের চারি দিকে বিবিধ উপায়ে জন্মসংখ্যা-হ্রাসের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে ; দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাণ্ট আলেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আর দশ বৎসর পরে আজ ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার গ্রন্থে (Fecondite) সেই বিপদ্‌তূর্য্যধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক সব সহিবে ; কিন্তু যন্ত্রণার আগার বিবাহবিধির পরিবর্ত্তন করিবার কথা বলিলে তাহারা আর সহ্য করিবে না। * দুর্নীতির পঙ্কপূতিগন্ধময় সমাজ কিছুতেই সর্ব্বদোষাবরণকারীকে ছাড়িতে চাহে না, তাই তাহারা স্বাধীন প্রণয়ের নামে শিহরিয়া উঠে। মেরিডিথ ও হার্ডি ইংরাজের এইরূপ সঙ্কীর্ণতার কথা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট আলেন তাহা বুঝিয়া লোকহিতকল্পে লোকের চোখ ফুটাইবার জন্য স্বাধীন প্রেমের পক্ষে ওকালতি করিয়া শিরজিয়াম The Woman who Did গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি তাঁহার পত্নীকে উৎসর্গ করা হয়।

মতামত।

এই গ্রন্থে প্রচারিত মত সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। ইহা লইয়া চারি দিকে যে তর্কবিতর্ক উঠিয়াছিল, তাহাও সামান্য নহে। কিন্তু সেই আন্দোলনেই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ লোকের চোখ ফুটানই তাঁহার অভিপ্রায়। গ্রন্থশেষে যখন জননীর সকল আশার কেন্দ্র স্বাধীন প্রণয়ের প্রথম ফল কন্যা পিতামহের নিকট ফিরিয়া গেল, তখন বুঝা গেল, বংশপরম্পরাগত দায়াধিকারেরই জয়—একটা নূতন মত সমাজে স্থায়ী হওয়া বহুদিনসাপেক্ষ।

গ্রাণ্ট আলেনের মতে The Woman who Did তাঁহার সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস। সাহিত্য-শিল্প হিসাবে দেখিলে পুস্তকে কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এরূপ রচনার আদর সাহিত্যশিক্ষা হিসাবে নহে—উপকারিতা হিসাবে। এরূপ পুস্তক সমাজে জনসাধারণের মধ্যে অপরীক্ষিতপূর্ব্ব নূতন মতের

The Woman who Did.

লিকামাত্র, সে পুস্তকের বিশেষ বিক্রয়াধিক্য হইত না। বাস্তবিক কোরেলীর বা হল্ কেনের কোন পুস্তকই The Woman who Didএর অপেক্ষা অধিক বিকায় নাই।

এই বিজ্ঞাপনের ক্ষমতায় গ্রাণ্ট আলেন তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার একটা কথায় যে অগ্নি জ্বলিত, দেশের সব লোক পড়িয়া তাহা নিবাইবার চেষ্টা করিত। বাস্তবিক কোন নূতন মত প্রচার করিতে হইলে প্রথমে লোককে শুনাইতে হইবে—তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে হইবে। গ্র্যাণ্ট আলেনের এই ক্ষমতাটি বিশেষ ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।—উইলিয়ম্ ওয়াটসন্ যখন প্রথম কবিতা লিখিলেন, তখন "একাডেমী" ও "স্পেক্টেটরে"র মত প্রসিদ্ধ পত্রের অজস্র প্রশংসাতেও তাঁহার ভাগ্যে যশোলাভ হইল না। শেষে গ্র্যাণ্ট আলেনের কথায় লোকের চোক ফুটিল। অনেকে বলিলেন, বিজ্ঞানের "হাতুড়ে" গ্র্যাণ্ট আলেন কবিতার কি বুঝিতেন? তাঁহারা গ্র্যাণ্ট আলেনকে বুঝেন নাই। বুঝিলে এমন কথা বলিতেন না।

The Woman who Didএ প্রচারিত মত নূতন নহে। শেলীর এই মত ছিল; মেরিডিথ কিছু দিন পূর্ব্বে এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গ্র্যাণ্ট আলেনের ব্যক্ত করিবার ভঙ্গীটি নূতন। তিনি কেবল ন্যায়ের ভিত্তির উপর আপনার মতের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, মানব-হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ভিত্তিভূমির অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েন নাই। তিনি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে কোথাও এমন একটু ঘটনার ছায়াপাত করেন নাই, যাহাতে তাহাদের পক্ষে এই মত সমাজের চক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থ যুদ্ধের আহ্বান-তূর্য্যধ্বনি।

গ্র্যাণ্ট আলেনের মত ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; কিন্তু সমাজের পক্ষে তাহা কত দূর হিতকর, তাহা বিবেচ্য। গ্র্যাণ্ট আলেন স্বয়ং যে কবিতায় তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

"সে হৃদি দরিদ্র অতি, শুধু এক হৃদয়ের সনে
বদ্ধ হয়ে যে হৃদয় রহে স্থির তাহারি বন্ধনে।
অধিক বন্ধুত্ব তা'র বন্ধু জন অধিক যাহার,
অনেকে যে বাসে ভাল প্রত্যেকে অধিক প্রেম তা'র।"

গ্র্যাণ্ট আলেন স্বয়ং বৈজ্ঞানিক, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিয়ম দেখিতে চাহিতেন, তাই বুঝেন নাই যে, মানব-হৃদয়কে গণিতের নিয়মে বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। মাঝে মাঝে তাহার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অচিন্তিতপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। সে সোজা পথে যাইতে যাইতে সহসা এমন একটা স্থানে পাশ কাটাইয়া দাঁড়ায় যে, সেখানে তাহার গতিরোধের আবশ্যকসম্ভাবনা কখনও এঞ্জিনিয়ারের মাথায় ঢুকে নাই। তাহাকে সর্ব্বদা নিয়মে চালিত করা অসম্ভব। মনুষ্যত্বে পূর্ণ হৃদয় গ্র্যাণ্ট আলেন মানব-হৃদয়ের সহস্র অজ্ঞাতপূর্ব্ব গতির কথা ভাবেন নাই। ভাবিলে বলিতেন, প্রেমের হোমাগ্নি একেরই জন্য। তিনি যাহা উচিত মনে করিতেন, তাহাই করিতেন, বা করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহারই সহিত সংগ্রামরত হইতেন। নিয়মের প্রতি আকর্ষণের বলে ও অন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে তিনি ভুলিয়াছিলেন যে, মানব—

"সাধু হ'তে অভিলাষে,
পাপী হ'তে ভালবাসে।"

গ্র্যাণ্ট আলেনের আদর্শ মনুষ্যত্বে ও বাস্তবে বিস্তর প্রভেদ। উন্নতিপ্রিয় গ্র্যাণ্ট আলেন পুরাতনের প্রতি আকর্ষণের কোনও কারণ দেখিতেন না। পুরাতন ঐতিহাসিক অট্টালিকায় বাস বোধ করি তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত; কারণ, তাহাতে তাঁহাকে পদে পদে সামাজিক অসামঞ্জস্য ও অন্যায়াচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তাঁহার নিকট পুরাতন অর্থে কুসংস্কার ও মলিনতা।

উপন্যাসে।

গ্র্যাণ্ট আলেন তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিতেন, তাঁহারা যেন তাঁহার পেশাদারী উপন্যাস পাঠ না করেন, সেগুলা কেবল পেটের দায়ে লেখা। কিন্তু পাঠকদের বিশ্বাস, তাঁহার সেই উপন্যাসগুলিই ভাল। ছোট-গল্প-লেখকদের মধ্যে তিনি এক জন ক্ষমতাশালী পথপ্রদর্শক। তিনি স্বভাবতঃই ঔপন্যাসিক। কিন্তু তিনি তাহা জানিতেন না। সকল ক্ষমতার মত এ ক্ষমতাও ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথমে সভ্যতার সংঘর্ষণ গল্পের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। তিনি বিনয়সহকারে বলিয়াছেন, হার্ডি, কিপলিং, মেরিডিথ ও ওয়েলসের মত ঔপন্যাসিকদের উচ্ছিষ্ট পাইলেই তিনি তুষ্ট। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি কোনও অংশে কিপলিং বা ওয়েলসের অপেক্ষা নিম্নস্থানের যোগ্য নহেন। কেবল কথার চটকে যশোলাভ করা সাহিত্যশিল্প নহে। কৃত্তিবাসের রচনায় সাহিত্যদোষ অনেক আছে, ভারতচন্দ্রের রচনা মণিকারের শানে মার্জ্জিত হীরক—কিন্তু তবু ভারত "চেঙ্গড়া ভুলায়ে খান।" গ্র্যাণ্ট আলেনের Philistia হইতে The African Millionaire পর্য্যন্ত বহু উপন্যাসে তাঁহার ঔপন্যাসিকজনোচিত ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি ও ধর্ম্মবিশ্বাস।

গ্র্যাণ্ট আলেনের কবি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল না, কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কবিতা অনেকে পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কবিজনোচিত কোমল। ষ্টিভেন্সনের Travels with a Donkeyর সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি গর্দ্দভের পীড়নে ব্যথা বোধ করিয়াছেন। তিনি নির্দ্দয়তা সহ্য করিতে পারিতেন না; মনে করিতেন,—

"Why should a sob
For the vaguest smart
One moment throb
Through the tiniest heart ?"

যে কবিতায় তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম;—

"কিরীটী খেয়ালমাত্র জগতের অধীশ্বর,
সঙ্কুচিত শ্বেত পক্ষ পাষাণ হৃদয়'পর;
শ্রবণে শুনে না কিছু, নয়নে না যায় দেখা,
মানবের সুখে দুখে হৃদয়ে পড়ে না রেখা;
আছে শুধু প্রহারিতে উদ্যত কঠোর কর,
নীরব অধর ওষ্ঠ কহে শুধু নিরন্তর——

'এই রীতি চিরদিন জানিও জানিও ভবে,
অন্যায় আচর, নহে অন্যায় সহিতে হবে।'
তাই যদি হয়, তবে, হে অন্ধ—হৃদয়হারা,
অন্যায় সহিয়া মরি, অন্যায় না করি মোরা।"

শোকের আবেগে সংশয়ের তাড়নে কবি টেনিসনও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—জগতে সবই বিধ্বস্ত হইবে—জগতের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি মানব—

"Who roll'd the psalm to wintry skies,
Who built him fanes of fruitless prayer."

সেও কি কেবল ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হইবে? কিন্তু তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; তাহার প্রধান কারণ, তিনি বৈজ্ঞানিকের যুক্তিমার্গ অবলম্বন করেন নাই, কবির যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ভক্তিতে কেবল তোমা করি আলিঙ্গন,
যেখানে প্রমাণ নাই, বিশ্বাস সম্বল।"

—সেই পুরাতন কথা—"ভক্তিতে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।"

সাহিত্যসেবকের হিসাবে গ্র্যাণ্ট আলেনের সমকক্ষ দুর্লভ। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের রচনাই সরস করিতে পারিতেন। তাঁহার মত এক জন প্রতিভাশালী লেখক যে বাধ্য হইয়া বহু বিষয়ে আপনার ক্ষমতা বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বতোমুখিতাই সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন, প্রকাশক স্যাটো তাঁহাকে গল্প লিখিতে বলিলে তিনি সে অনুরোধে বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তখনই লিখিতে বসিলেন।

নানা কথা।

প্রতিদিন প্রাতে নয়টা হইতে তিনি টাইপরাইটারের সাহায্যে লিখিতে বসিতেন। কলের অবিরাম শব্দে বোধ হইত, তাঁহাকে কথার জন্য ভাবিতে হইত না। লিখিবার সময় সহসা আহারের আহ্বান-ঘণ্টা শুনিলে তিনি তখনই উঠিতেন; কিন্তু যদি দেখিতেন ঘণ্টা ভুল, একটু বিলম্ব আছে, তবে তখনই ফিরিয়া আবার লিখিতে বসিতেন। শত বাধায় তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইত না, তিনি লিখিতেন। কেবল গৃহে চিত্র বা কোন দ্রব্য যথাস্থানে না থাকিলে সেটা যথাস্থানে না রাখিলে তিনি স্থির হইতে পারিতেন না। তিনি অগোছাল ছিলেন না; তাঁহার প্রতিভাতেও এই ভাব দেখা যায়। তিনি মিথ্যার ধার ধারিতেন না; আচারে, ব্যবহারে,—কিছুতেই মিথ্যাচরণ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টার স্থলে ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারকে বসাইয়াছিলেন।

গ্র্যাণ্ট আলেন স্বয়ং পারিবারিক সুখশান্তির জন্য সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সকল স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন করিতে স্বীকৃত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, সাহিত্যসেবকের পরিবার আছে, তাঁহার মনে করা উচিত যে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য পরিবারের প্রতি; তিনি প্রথম পরিবার-পালক

গ্র্যাণ্ট আলেন স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে উপন্যাসে হাত দেন নাই। তিনি বলেন,

সাহিত্য-সেবা।

লোকে যেমন ঘটনাচক্রে পড়িয়া মদ্যপান করে, অহিফেন সেবন করে, বা অন্য কোন বদ্ অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে, আমিও তেমনই ঘটনাচক্রে পড়িয়া নিরীহ—নিঃস্ব বৈজ্ঞানিকের মার্গ ত্যাগ করিয়া "Shilling Shocker" রচনা করিতে আরম্ভ করি।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উপাধিলাভ করিয়া অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর তিনি নানা স্থানে শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জ্যামেকায় নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে কায পাইয়া তথায় গমন করেন। সেখানে তিনি মনস্তত্ত্ববিষয়ক কয়খানি পুস্তক-রচনার সূত্রপাত করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় তিনি প্রায় এক শত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া নানা পত্রে প্রেরণ করেন। সেগুলির একটিও প্রকাশিত হয় নাই। তাহার পর তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া "Physiological Aesthetics" রচনা করিয়া প্রকাশকের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তাঁহার হাতে কিছু টাকা ছিল। যুবজনসুলভ অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ তিনি নিজ ব্যয়ে পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন। খরচ পড়িয়াছিল—প্রায় এক শত কুড়ি পাউণ্ড। ডারউইন প্রভৃতি কয় জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ পুস্তকের বড় আদর করিলেন না। বহু কষ্টে প্রায় তিন শত খণ্ড পুস্তক বিক্রীত হইল। শেষে প্রকাশকের গৃহে অগ্নিসংযোগে পুস্তকরাশি ভস্মসাৎ হইলে তিনি ১৫ পাউণ্ড খেসারৎ পাইয়াছিলেন।

পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে আর কিছু না হউক, এই একটা উপকার হইল যে, সম্পাদকগণ আর তাঁহার প্রবন্ধ প্রাপ্তিমাত্র ত্যাগ করিতেন না। লেস্লি ষ্টিফেন-"কর্ণহিল" পত্রে তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ মূল্য দিয়া লইলেন। এই সময় হইতে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া কোন রূপে পরিবারপালন করিতে লাগিলেন। তখন সার উইলিয়ম হাণ্টার Gazetteer of Indiaর রচনায় প্রবৃত্ত। তিনি গ্র্যাণ্ট আলেনকে কাজ দিলেন। উত্তর-পশ্চিম বিভাগ, পঞ্জাব ও সিন্ধু সম্বন্ধীয় অধিকাংশ রচনাই গ্র্যাণ্ট আলেনের। ইহার পর বর্ণেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি দশ বৎসরে প্রায় ৩০ পাউণ্ড লাভ পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেটা তাঁহার অষ্টাদশ মাস পরিশ্রমের ফল। তাঁহাকে এই পুস্তক রচনায় পাঁচ কি ছয় সহস্র বার ভিন্ন গ্রন্থাদি দেখিতে হইয়াছিল।

এই সময় মানবের পক্ষে প্রেতাত্মা দেখিলেও যে তাহা জানা অসম্ভব, তিনি এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বুঝাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া প্রবন্ধটি গল্পের মত করিয়া লিখিত হয়। প্রকাশক মিষ্টার স্মাটো উহা "বেলগ্রেভিয়া" পত্রে প্রকাশ করেন, এবং ঐরূপ আরও গল্প চাহেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও গল্পলেখক হইবার কল্পনা তাঁহার মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই; অধিকন্তু পাছে বৈজ্ঞানিকের যশের হানি হয়, এই ভয়ে তিনি স্বনামে গল্প না লিখিয়া "জে. আরবুথনট উইলসন"—ছদ্মনামে গল্প লিখিতেন।

এই সময়ে জেমস্ পেন "কর্ণহিল" পত্রের সম্পাদক হইয়া গ্র্যাণ্ট আলেনকে লেখেন যে, অতঃপর সম্পাদকের পক্ষে আর তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ঐ একই সময়ে তিনি গ্র্যাণ্ট আলেনের ছদ্ম নামে তাঁহার নিকট গল্প চাহেন। ইহাতে গ্র্যাণ্ট আলেনের স্বীয় গল্পরচনার ক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তিনি অর্থলোভে গল্পরচনা করিতে লাগিলেন। আর নাম গুপ্ত রহিল না। পেনের পরামর্শে তিনি উপন্যাসরচনা করিলেন। কিন্তু উপন্যাসে প্রচারিত মত এমনই বিদ্রোহী যে, তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। তাহাতে গ্রাহক কমিবার সম্ভাবনা ছিল। তখনও গ্র্যাণ্ট আলেন বুঝেন নাই যে, ইংরাজ ঔপন্যাসিককে বৃটিশ "matron"এর বিশ্বাস ও বাসনার মন্দিরে আপ-

পাঠক গল্প দুঃখান্তক হইলে ভালবাসে না ; তাই শেষাংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হইল। প্রথমে নায়কের দুর্ভাগ্যের কথা ছিল ; শেষে তাঁহাকে বিবাহ করাইয়া গৃহস্থ করিয়া দেওয়া হইল। পুস্তক "জেণ্টল্‌ম্যান্‌স্ ম্যাগাজিনে" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া শেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

দশ বৎসর বিষম শ্রমের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য ও উৎসাহহীন হইয়া শেষে গ্র্যাণ্ট আলেনের ভাগ্যে যশোলাভ ও অর্থলাভ হয়। তাই তিনি বলেন যে, সাহিত্যব্যবসায়ে শ্রম যেমন অতিরিক্ত, পারিশ্রমিক তেমনি অল্প। তিনি বলেন, যদি রাস্তা ঝাঁট দিয়া খাইতে পার, তবে সাহিত্য-সেবা করিতে আসিও না।

বড় দুঃখে তিনি এ কথা বলিয়াছেন। তিনি চিরজীবন বিষম শ্রম করিয়া সংসার চালাইয়া বড় কষ্টে যশের ভাগী হইয়াছিলেন। আজ তিনি মৃত ; তাঁহার সেই কবিতার দুইটি চরণ আমাদের মনে পড়িতেছে—

"হয় ত আসিবে প্রাতে এক রশ্মি আলোকণা,
হয় ত ঘুমাব আমি—ঘুমাব কেবল।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। "চৈত্রপূর্ণিমা" একটি শূন্যগর্ভ সাধারণ রকমের কবিতা। "চিন্তামণি নায়কের গৃহ" প্রবন্ধের লেখক গল্পচ্ছলে উড়িষ্যার কৃষক-জীবনের একটি সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। "পিলাজী ও দামাজী গায়কবড়" বরোদার ইতিহাসের কিয়দংশ। "বসন্ত" একটি সুন্দর কবিতা। "দারোগা বাবু" একটি নক্‌সা।—অতিবিস্তৃতিদোষে অনেকটা রসভঙ্গ হইয়াছে। "বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি-রহস্য" আলোচনার যোগ্য। "গুরুদক্ষিণা" নামক ক্ষুদ্র গল্পে লেখকের গুণপণার কোন পরিচয় পাইলাম না।

প্রদীপ। চৈত্র। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু" প্রবন্ধে নূতন কথা বলেন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যুর পর সঞ্জীবনী পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদতিরিক্ত আর কোনও কথা দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "উপমা" নামক সুপাঠ্য কবিতাটির ছন্দের লালিত্য প্রশংসনীয়। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার "মুকুরে" প্রকাশিত হইয়াছে। "নিষ্ফল অপরাধ" একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। অতিপ্রাকৃত ও আষাঢ়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। যাহা আজগুবি, তাহাই অলৌকিক নহে। প্রতিভাশালী কবির কাব্যশিল্পে যাহা অতিপ্রাকৃত, কলাকৌশলে তিনি তাহা 'আষাঢ়ে' হইতে দেন না। অতিপ্রাকৃতকেও তিনি বাস্তবের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেন, সম্ভাবনার অতীত হইতে দেন না। বক্ষ্যমাণ গল্পে কিন্তু সেই সীমাচিহ্নটুকু নাই। নিতান্ত আষাঢ়ে কলাকৌশলের হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

স্বাস্থ্য। ফাল্গুন ও চৈত্র। এই যুগ্মসংখ্যায় স্বাস্থ্যের তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত হইল। "ধর্ম্মশাসন ও ভক্ষ্য", "কডলিভর অইল," "অভ্যঙ্গ বা তৈলমর্দ্দন" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ। আমরা স্বাস্থ্যের অধিকতর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মুকুল। ফাল্গুন ও চৈত্র। এই সংখ্যায় মুকুলের পঞ্চম বর্ষ অতীত হইল। "স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসুর" জীবনে মুকুলের পাঠকগণ শিক্ষালাভ করিবে। "সেকালের কথা" সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ।



স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়।

মারাচক্রুতয়া ভয়াবহগতিঃ প্রত্যর্থি-পৃথ্বীভুজাম্
মাহারাষ্ট্র-ভটচ্ছটা রণপটুর্নো পর্য্যটত্যেব চেৎ।
দেব-ব্রাহ্মণবর্গ-নিগ্রহকৃতো দেশাংস্তরক্ষা ইমে
নিপ্রত্যূহ-মনোরথা বিতনুয়ুর্নির্দ্দেব-ভূমিসুরান্॥—বিশ্বগুণাদর্শ।

যাদব-বংশের শাসনকালে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে, মোসলমান-দিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলিজী আট সহস্র তুরগসেনা সহ মৃগয়াব্যপদেশে দক্ষিণাপথাভিমুখে যাত্রা করিয়া সহসা মহারাষ্ট্র-রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ করেন। তিনি দিল্লীশ্বরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজমহেন্দ্রীর নরপতির নিকট কর্ম্ম-প্রার্থনা করিবার জন্য গমন করিতেছেন—এই অমূলক কথার প্রচার করায়, পথিমধ্যে কোনও হিন্দু নরপতি তাঁহার গতিরোধ করেন নাই। কথিত আছে, আলাউদ্দীনের নগর-আক্রমণকালে মহারাষ্ট্রপতি রামদেও রাও সপরিবারে স্থানান্তরে দেবদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। অতর্কিতভাবে দেবগিরি আক্রান্ত হওয়ায় তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উহার রক্ষা করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দীনের বিবিধ কুটিলতায় মহারাষ্ট্রপতির সকল প্রয়াস বিফল হইল। তিনি দিল্লীশ্বরের চক্রবর্ত্তিত্ব-স্বীকারে বাধ্য হইলেন।

সেকালের হিন্দুরাজন্যবর্গ অতর্কিতভাবে পররাষ্ট্র-আক্রমণ হেয় কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না দিয়া কাহারও বিরুদ্ধে অভিযান তখনকার হিন্দুনীতির বিরোধী ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণও যে রণসজ্জার পূর্ব্বে বিপক্ষদলকে সাবধান করিতে বিরত হইতেন না, চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়ান্ সঙের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। রাজপুতানাতেও এই উদার নীতি প্রচলিত ছিল। এই কারণে তদানীন্তন হিন্দুনরপতিগণ সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিতেন না। মোসলমানগণ বিপরীত নীতির অবলম্বন করায় হিন্দুনরপতিগণ তাঁহাদিগের হস্তে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসে পরাভূত হইয়াছিলেন। সরল যুদ্ধনীতির অনুসরণে এবং পররাষ্ট্রের বলাবল ও নয়নীতি (guiding principle) বিষয়ক অভিজ্ঞতালাভে ঔদাস্য হিন্দুদিগের পরাভবের এক প্রধান কারণ হইয়াছিল।

নরপতির পরাজয়-সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয়গণ সহজে আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যে

জলাঞ্জলি দেন নাই। মোসলমানগণের শত বৎসরের চেষ্টায় ও তাঁহাদিগের কূটনীতিমূলক অভিনব যুদ্ধপ্রণালীর গুণে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। তাহার পর সার্দ্ধ-দ্বিশত বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্রদেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা রামদাস স্বামী কর্ত্তৃক শিবাজীর নিকট নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থানসমূহ অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিপ্লবপূর্ণা হওয়ায় ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল হইয়াছেন, প্রজাবর্গের সুখ-সম্মান লোপ পাইয়াছে, যবনগণ তাহাদের প্রতি কটুভাষা ব্যবহার করে ও নানারূপে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়।"

দেশের এই দুর্দ্দশার মোচন করিবার জন্য মহাপুরুষ রামদাস যে সকল উপায়ের নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা এই,—

"ধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবন-বিসর্জ্জন কর। দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত কর। যাবদীয় মারাঠাকে একত্র ও একমতাবলম্বী কর। আপনাদিগের 'মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মের' বিস্তার কর। দেবদ্রোহীদিগকে কুক্কুরজ্ঞানে তাড়াইয়া দাও। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর। অধ্যবসায়সহকারে সকলে মোসলমানদিগের উপর চতুর্দ্দিক হইতে আপতিত হও। স্বদেশদ্রোহীদিগের বিনাশ-পূর্ব্বক দেশরক্ষা কর। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য নূতন দেশ বিজয় কর, এবং "মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম" ও মহারাষ্ট্র রাজ্য চারি দিকে বিস্তার কর।"

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনের ভাব কিরূপ ছিল, রামদাস স্বামীর এই সকল উপদেশ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। একনাথ ও তুকারাম প্রভৃতি ধর্ম্মশিক্ষকগণের যত্নে ইতঃপূর্ব্বেই স্বধর্ম্মের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই সময়ে হিন্দুগণের স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কারণে, তাঁহারা বিবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও স্বধর্ম্মপালনে বিরত হন নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দু ধর্ম্ম ঈদৃশী সহিষ্ণুতার প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তেজস্বী মারাঠাগণের দেশে, রামদাস স্বামীর উপদেশগুণে, উহা স্বল্পদিনের মধ্যেই জয়িষ্ণু-ভাব ধারণ করিল। সহিষ্ণু হিন্দু ধর্ম্মের সহিত এইখানেই রামদাস-কথিত "মহারাষ্ট্রধর্ম্মের" প্রধান পার্থক্য।

স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যরক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং সর্ব্বত্র মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম-বিস্তারের উচ্চাশা প্রায় দেড়শত বর্ষ কাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল ছিল। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী 'তোরণা' দুর্গ অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় 'স্বরাজ্য'-স্থাপনের সূত্রপাত করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশওয়ে বাজীরাও সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বরাজ্যের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হন। এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে কোনও অব্দই মহারাষ্ট্রীয়গণ বিনা অভিযানে অতিবাহিত করেন নাই; এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান সন্ধিপত্র তাঁহাদিগের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার প্রায় কোনটিতেই দেব ব্রাহ্মণ ও গোধন রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষকে বাধ্য করিতে তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। স্বরাজ্য ও স্বধর্ম্মের রক্ষা তাঁহাদিগের অধিকাংশ সন্ধিপত্রেরই সাধারণ সর্ত্ত ছিল। ইংরাজী চশ্‌মা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেশীয় দিব্যচক্ষুর সাহায্যে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গোব্রাহ্মণের রক্ষা ও তীর্থস্থানাদির সংস্কার পূর্ব্বক মোসলমান-প্লাবিত ভারতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল।

স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ অদীনপরাক্রমে মোসলমানদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বরাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাত্মা শিবাজী তাঁহাদিগের নেতা ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের শত্রুপক্ষীয় ইতিহাস-লেখকেরা যাহাই বলুন, স্বধর্ম্ম-রক্ষাই যে শিবাজীর সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণস্বরূপ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য রামদাস স্বামী শিবাজীকে যে সকল উপদেশপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কতিপয় ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামদাস অনুপযুক্ত পাত্রে তাঁহার "পরম দুর্লভ" উপদেশ প্রদান করেন নাই। সেকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শিবাজীকে একাধারে বীরতা ও ধর্ম্মাত্মতার অবতার এবং জ্ঞানানুরাগ ও প্রকৃতিবাৎসল্যের আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন।

পাশ্চাত্য মহাপুরুষগণের সহিত এ বিষয়ে শিবাজীর তুলনাই হইতে পারে না। কারণ তিনি সেকন্দর শাহের ন্যায় কখনও স্বজন-বান্ধবের হত্যায় লিপ্ত হন নাই, সিজারের ন্যায় সহধর্ম্মিণীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই, নেপোলিয়নের ন্যায় অধর্ম্মজনক হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হন নাই। ক্রমওয়েল যেমন

আইরিশদিগের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, তিনি কখনও কোনও জাতির সম্বন্ধে সেরূপ করেন নাই। ফ্রেডরিকের ন্যায় তিনি রিপুর বশীভূত ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার সদাচার-পরায়ণতা, পরাজিত শত্রুর ও রমণীকুলের সম্মানরক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন, সাধু-সহবাসে আকাঙ্ক্ষা এবং পররাষ্ট্র আক্রমণ-কালে তত্রত্য নিরীহ কৃষকশ্রেণীর ও পরোপকারপরায়ণ ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি যাহাতে কোনও প্রকারে অত্যাচার না ঘটে, বা মোসলমানদিগের পীর, ফকীর, মসজেদ্, কোরাণ প্রভৃতির অবমাননা না হয়, তজ্জন্য তিনি যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা, চিরকাল তাঁহার উদারতা ও অকৃত্রিম ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষিস্বরূপ বিবেচিত হইবে। স্বয়ং ভবানীদেবী তাঁহাকে স্বরাজ্যস্থাপন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, এই ধারণা শিবাজীর মনে বদ্ধমূল ছিল। সঙ্কটকালে তিনি ব্রতস্থ হইয়া দেবীর উপাসনায় চিত্ত সমাহিত করিতেন। বখর-লেখকগণ বলেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরী শিবাজীর দেহে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচার-পতি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে মহোদয় বলেন, বখরকারগণের এই উক্তির প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শিবাজী বিপৎকালে ভবানীর নিকট প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইতেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতেন, এ কথা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন। (১) ভবানীর প্রতি শিবাজীর যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এবং তিনি যে আপনাকে দেবীর বিশেষ অনু-গ্রহভাজন ও তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষা ও স্বরাজ্যস্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপ হইতেও স্পষ্ট অনুভূত হয়। অটল ভগবন্নিষ্ঠা ও ভগবানের অলোকিক শক্তির উপর বিশ্বাসই তাঁহাকে ও তাঁহার সামসময়িক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মোগলশাহী, আদিলশাহী ও কুতবশাহীর বক্ষের উপর "মারাঠাশাহী"র ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ করিয়াছিল। ফলতঃ, তদানীন্তন এই রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান না হইলে মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসের বিশেষত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্র সাহিত্যে এই রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের সমুজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

---

(১) প্রবন্ধলেখকের সহিত কথোপকথনকালে রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে মহোদয় এই মত অতীব দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাতেও তিনি কয়েক স্থলে এ কথার আভাস দিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, মহারাষ্ট্র ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় সে চিত্রের প্রতি মনোযোগ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই।

ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে শিবাজী কত-দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কান্যকুব্জের হিন্দী কবি ভূষণ বলিয়াছেন,—

বেদ রাখে বিদিত, পুরাণ রাখে সারস্থত !
হিন্দুন্‌কি চোটী, রোটী রাখি হায় সিপাহিন্‌কি।
কান্ধেমে জনেউ রাখ্যো, মালা রাখ্যো গরমে।
দেব রাখে দেবল, স্বধর্ম্ম রাখ্যো ঘরমে।
চারো বরণ ধর্ম্ম ছোড় কল্‌মা নিমাজ পঢ়ৈ,
শিবাজী ন হোতা তো সুন্নত হোতী সব্‌কি ॥

অনুবাদ।—হে সারস্থত ! বেদকে বিদিত (সুপরিচিত করিয়া) রাখিয়াছ, পুরাণসমূহের রক্ষা করিয়াছ। তুমি হিন্দুদিগের শিখা ও সিপাহীদিগের অন্ন রাখিয়াছ। (ব্রাহ্মণের) স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, (বৈষ্ণবের) গলায় মালা, মন্দিরে দেবতা ও গৃহে গৃহে স্বধর্ম্মের রক্ষা করিয়াছ। চতুর্বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া 'কল্‌মা নমাজ' পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এ সময়ে শিবাজী না থাকিলে সকলেই মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ (সুন্নত) করিতে বাধ্য হইত।"

যাঁহারা শিবাজীর এই স্বরাজ্যস্থাপন ও স্বধর্ম্মরক্ষার প্রয়াসের মধ্যে লুণ্ঠনাভিযান ও জিগীষার অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, তাঁহারা শিবাজীর প্রণীত প্রজাপালনবিষয়ক বিধিব্যবস্থাদির অনুশীলন করিবার কখনও অবসর প্রাপ্ত হন নাই। নচেৎ তাঁহাদিগকে মহামতি জর্জ্জ টমসন মহোদয়ের সহিত সমস্বরে বলিতে হইত,—

His regulations for the management of the civil, judicial and revenue affairs of his territory, proved him to have been a man of profound wisdom ; and it has been admitted by the greatest men who have ever come from this country to India, that *in provinces in which the laws of Shivaji remained in force, there was nothing to improve, but much to imitate.* In his conduct and character as a soldier and a lawgiver and in many of the events of his history, he may be termed, not altogether inaptly, the Charlemagne of the East." (১)

---

(১) ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সাতারা রাজ্য খাস করিবার সময় বিলাতে যখন আন্দোলন হয়, তখন পার্লামেণ্টের অন্যতর সদস্য মিঃ জর্জ টমসন্ শিবাজীর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত অংশটি তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ, বিচারব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় প্রভৃতি বিষয়ে শিবাজী যে সকল নিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র দেশের শেষ অধিপতি বাজীরাওয়ের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহা বহুল-পরিমাণে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যমধ্যে প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির কখনই অভাব ঘটে নাই।

একনাথ ও রামদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায়, তানাজী মালুসরে ও প্রতাপরাও প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণের বাহুবলে এবং বালাজী চিটনীস প্রভৃতি কায়স্থগণের নীতিকৌশলে, শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী ধর্ম্মপ্রাণ নরপতির নেতৃত্বাধীনে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা তৎপুত্র দুর্ব্বৃত্ত সাম্ভাজীর কর্ম্মদোষে রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়। সাম্ভাজী শৌর্য্য সামর্থ্যে হীন ছিলেন না। কিন্তু শিবাজীর ন্যায় তাঁহার ধর্ম্ম-রক্ষার দিকে মনোযোগ না থাকায়, তাঁহার দ্বারা কোনও রাষ্ট্রীয় কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় নাই। পক্ষান্তরে, তিনি স্বয়ং মোগল সেনাপতি কর্ত্তৃক বন্দীভূত হইয়া সম্রাটের আদেশে অতীব নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

শিবাজীর পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামদর্শনে মহারাষ্ট্রীয়গণ অতীব উত্তে-জিত হইলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর অওরঙ্গজেব বার লক্ষ সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র-দলনের জন্য দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাম্ভাজীর বিনাশ এবং বিজা-পুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিলোপসাধনে সফলপ্রযত্ন হওয়ায় তিনি জয়োল্লাসে অতীব উৎফুল্ল হন,এবং হিন্দুধর্ম্মীদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, বিজয়োন্মত্ত হইয়া তিনি স্বীয় অধীন হিন্দুসৈন্যদলেরও ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। সে যাহা হউক, মোগল-দিগের হস্তে স্বধর্ম্মের নিগ্রহ হইতেছে দেখিয়া,তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয়গণের ক্রোধানল প্রবৃদ্ধ হইল। তাঁহাদিগের নরপতি রাজারাম (শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র) তখন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া যবনদিগের ভয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে "জিঞ্জি" দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়গড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সুশিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। সমাজে দুই চারি জন বিশ্বাসঘাতক দেশবৈরীরও অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও তাঁহারা স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন;

ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া প্রচণ্ড সাগরতরঙ্গসদৃশ মোগল সেনার গতি-রোধে অগ্রসর হইলেন। যিনি কোনরূপে একখানি বল্লম সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তিনিই মোগলদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহাদিগের ভীষণ রণোন্মাদ দেখিয়া সম্রাটকেও ভীত ও চকিত হইতে হইল। মারাঠারা স্বধর্ম্মের ও সমধর্ম্মিগণের রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হওয়ায় বাদশাহীসৈন্যের নানা স্থানে পরাজয় ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ লক্ষ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া মুষ্টিমেয় মারাঠাগণের সহিত সপ্তদশ বর্ষ কাল অনবরত যুদ্ধ করিয়াও অও-রঙ্গজেব জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না!

ইতোমধ্যে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনা-তেও মহারাষ্ট্রীয়গণ বিচলিত হইলেন না। খৃষ্টীয় ১৬৮০ অব্দ হইতে ১৭০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাইশ বৎসরের মধ্যে একে একে শিবাজী, সাম্ভাজী ও রাজারাম লোকান্তরিত হইলেন; তথাপি মারাঠাগণের উৎসাহ ও উৎকর্ষের কিছু-মাত্র হ্রাস হইল না।

"ছিন্নোঽপি রোহতি তরুশ্চন্দ্রঃ ক্ষীণোঽপি বর্দ্ধতে।"

এই ন্যায়ানুসারে মারাঠাগণের অধ্যবসায় ও বিক্রম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহাদিগের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব, শীতগ্রীষ্মবর্ষায় সমান উৎসাহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও বিশ্রামের প্রতি অমনোযোগ ও দুর্ব্বার সমরোদ্যম প্রভৃতি দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া মোগল সেনানীগণ বলিতে লাগিলেন, "মরহট্টে লোগ আদমি নেহি হ্যায়—এতো ভূতখানা হ্যায়!" শুদ্ধ তাহাই নহে, মারাঠাগণের নাম মোগল-তুরঙ্গদলেরও বিভীষিকার স্থল হইয়া দাঁড়াইল। কথিত আছে, মারাঠাদলপতিদিগের নাম কর্ণগোচর হইলেও মোগল অশ্ব চমকিয়া জলপান পরিত্যাগ করিত!

মহারাষ্ট্রীয়দিগের কালান্তক মূর্ত্তির সংহার হইতেছে না দেখিয়া, মোগলগণ অগত্যা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মারাঠাদিগের বিক্রমে পলা-য়নও তাঁহাদিগের পক্ষে অতীব বিঘ্নকর হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ সম্রাট্ নিরুপায় হইয়া হতাশহৃদয়ে পথিমধ্যে "বৃথায় জন্ম গেল" বলিয়া প্রাণত্যাগ করি-লেন! দক্ষিণাপথে হিন্দুধর্ম্ম প্রায় নিষ্কণ্টক হইল। স্বধর্ম্মের ও স্বদেশের রক্ষার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের সহিত এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় ভারতের আর কোনও জাতি ঈদৃশ দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই। অকৃত্রিম ধর্ম্মোৎসাহে ও গভীর স্বদেশভক্তিতে সমগ্র জাতির হৃদয়

পূর্ণ না হইলে এরূপ অসাধ্যসাধন সুদূরপরাহত হইত, সন্দেহ নাই। ফলতঃ এ সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতির যেরূপ অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, স্বয়ং শিবাজীর সময়েও সেরূপ হয় নাই। ফলতঃ শিবাজী যে রাষ্ট্রীয় ভাবের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলদিগকে চমকিত করিয়াছিল।

সাম্ভাজীর হত্যার পর তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে মোগলেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধনের জন্য মারাঠাগণ পঞ্চদশ বৎসর কাল বিবিধ চেষ্টা করিয়াও সে বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল দর্প ও সাহস এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, নবীন সম্রাট ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাম্ভাজীর পুত্র শাহুকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শাহু দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজারামের পুত্রের সহিত রাজ্যের বিভাগ লইয়া তাঁহার কলহ উপস্থিত হইবে, এবং সেই বিবাদাগ্নিতে নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্য ভস্মীভূত হইলে দাক্ষিণাত্যে আবার মোগল সাম্রাজ্যবিস্তারের সুযোগ ঘটিবে। অওরঙ্গজেবেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কারণ, তরুণ সম্রাটের ন্যায় তিনিও মহারাষ্ট্রশক্তির মূলতত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মহামতি রামদাস মহারাষ্ট্রসমাজে যে স্বধর্ম্মানুরাগের বীজ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহা এত শীঘ্র বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

চারি বৎসরের মধ্যেই মারাঠাগণ আপনাদিগের গৃহবিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। পরবর্ত্তী চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার বিধান ও যথোপযুক্ত বল-সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে প্রবৃত্ত হন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরকে করতলগত করিয়া পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের দেশমুখী ও চৌথের সনন্দ আদায় করিলেন। এই সনন্দই মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যবিস্তারের প্রধান উপায়স্বরূপ হইল। হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য "হিন্দুপৎ বাদশাহী" বা স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যস্থাপনের আবশ্যকতা ইতঃপূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহ করিয়া মোসলমানেরা স্বধর্ম্মানুরাগী মারাঠাগণের অতীব বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। এই কারণেও এ সময়ে "মোগলশাহী"র স্থানে ভারতবর্ষে "হিন্দুশাহী" স্থাপন তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইল।

মহারাজ শাহুর আদেশে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও দিল্লীপতির

প্রদত্ত সনন্দ হস্তে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উত্তরে আটক হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য তিনি স্বদেশবাসীকে উৎসাহিত করিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্ক অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিলতায় মহারাষ্ট্রসমাজে আবার গৃহবিবাদ বাধিবার উপক্রম হইল। কিন্তু বাজীরাও কতিপয় যুদ্ধে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া গুজরাট ও খানদেশ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে চৌথ আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। নিজামের সমস্ত উদ্যম বিফল হইল।

এ দিকে উত্তর-ভারতে মহম্মদ খান বঙ্গষ নামক এক মোসলমান সর্দ্দার আপনার ক্ষমতাবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া বুন্দেলখণ্ড রাজ্য আক্রমণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ছত্রপতি শিবাজীর উপদেশক্রমে ক্ষত্রিয় বীর ছত্রসাল কর্ত্তৃক বুন্দেলখণ্ডে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও রাজা ছত্রসাল মহম্মদ খানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। দিল্লীশ্বরের হিন্দুসামন্তবর্গও মহম্মদ খানের সহায়তার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া রাজা ছত্রসাল মহারাষ্ট্রীয়গণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বাজীরাওকে লিখিলেন,—

"যো গতি গ্রাহ গজেন্দ্রকী সো গতি ভই হায় আজ।
বাজী যাত বুন্দেলকী রাখো বাজী লাজ॥"

অর্থাৎ,"পূর্ব্বকালে নক্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমাদিগের লজ্জা অবস্থা আজ সেইরূপ হইয়াছে! বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে; এ সময়ে হে বাজীরাও! তুমি তাহাদিগের রক্ষা কর।" এই কাতরোক্তিপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া বাজীরাওয়ের হৃদয় মোসলমানদিগের হস্ত হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় পরাক্রমবলে মহম্মদ খানের সম্পূর্ণ পরাজয়সাধন-পূর্ব্বক বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। সমরবিজয়ী বাজীরাও ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুগর্ভনয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমক্ষে তাঁহাকে আপনার তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধে পরাজিত শত্রুর প্রতি মহারাষ্ট্রীয়েরা সদ্ব্যবহার করিতে বিরত হন নাই।

বাজীরাওয়ের সময় আর একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। পশ্চিম-

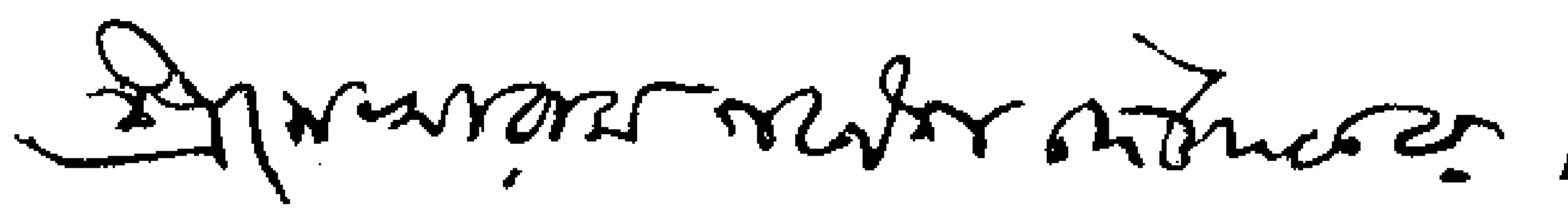
সমুদ্রতীরে বেসীন সাষ্টী প্রভৃতি স্থানে পোর্ত্তুগীজদিগের আধিপত্য ছিল। তাহাদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তত্রত্য হিন্দু প্রজাগণ ছত্রপতি মহারাজ শাহুর নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন,—

"খৃষ্টধর্ম্মীদিগের অত্যাচারে আমাদিগের স্বধর্ম্মরক্ষা দুষ্কর হইয়াছে। আপনি গোব্রাহ্মণের প্রতিপালক; আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া এই প্রদেশের নিমজ্জমান হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করুন।" বাজীরাও তখন নিজামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই কারণে মহারাজ শাহুর আদেশে বাজীরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমাজী আপ্পা বেসিন ও সাষ্টী প্রদেশস্থ হিন্দুদিগের রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। সাষ্টী অল্পদিনের মধ্যেই পোর্ত্তুগীজদিগের হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু সুদৃঢ় বেসীন দুর্গ দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পরও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল না। ইউরোপীয় তোফখানার অগ্নিবর্ষণে মহারাষ্ট্র তুরঙ্গবল পুনঃ পুনঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। পরিশেষে একদিন চিমাজী সমস্ত সর্দ্দারদিগকে সমবেত করিয়া বলিলেন,—"আমাকে দুর্গপ্রবেশ করিতেই হইবে। কিন্তু আপনারা যদি নিতান্তই দুর্গ অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে তোফের মুখে এরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া গোলা নিক্ষেপ করুন, যেন আমার দেহ দুর্গমধ্যে গিয়া পতিত হয়!" তাঁহার এই উক্তিতে মারাঠা সেনানীগণের উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইল। "হর হর মহাদেব" শব্দে সকলে একোদ্যমে প্রাণপণে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয়লাভ হইল (১৭৪০ খৃঃ)। কথিত আছে, এই যুদ্ধের পর বেসীনের একটি সৌন্দর্য্যপ্রতিমা চিমাজীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। লক্ষ্মণের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় চিমাজী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, বাজীরাও যুবতীকে অন্তঃপুরে স্থানদান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বুন্দেলখণ্ডে ও বেসিন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া "শরণাগতরক্ষক" ও "দীনদয়ালু" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ যশস্বী হইয়াছিলেন।

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তরে যমুনা ও দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রানদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশসমূহ মোসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। মোসলেমের ক্ষমতাহ্রাস হওয়ায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বাজীরাও লুপ্তপ্রায় বেদবিদ্যার পুনরুজ্জীবনের জন্য বহুল যত্ন ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী নামক জনৈক মহাপুরুষ তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। রামদাস স্বামীর ন্যায় তিনিও মারাঠা সর্দ্দার-

গণকে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। ভারতে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির এরূপ পবিত্র সম্মিলন আর কখনও ঘটে নাই।

ক্রমশঃ।



কাশ্মীরের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি।

কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা গিয়াছে, শতকরা তিরনব্বই জন মুসলমান; ৮১৪২৪১ জন অধিবাসীর মধ্যে ৫২৫৭৬ জন হিন্দু ও ৪০৯২ জন শিখ; অবশিষ্ট সবই মুসলমান। *

দেশের রাজা হিন্দু, কাজেই মুসলমানগণ হিন্দুদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহস করে না। বাস্তবিক এই সকল মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায়ই হিন্দু ছিল; আবার অল্পসংখ্যক হিন্দু প্রজা সর্ব্বদাই মুসলমানের সংস্রবে আসে। সুতরাং এই ভিন্নধর্ম্মীদিগের আচারব্যবহারে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য অনিবার্য্য। এই ভিন্নধর্ম্মীদিগের মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ নাই। বিবাদের প্রধান কারণ গোহত্যা এখানে নিষিদ্ধ। এই ভিন্নধর্ম্মীদিগের মধ্যে বিবাদ বিষয়ে রাজশাসন বড়ই কঠোর ছিল। ভিন্নধর্ম্মীদিগের মধ্যে এই অবিসংবাদের আর এক কারণ, কাশ্মীরী মুসলমানগণ কখনই দেশের প্রাচীন রীতিনীতি, এমন কি, বিশ্বাসও সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ফতেপুরা ও বারিপুরায় শিলাবক্ষে একই পদচিহ্ন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পূজা করিয়া থাকে। মুসলমান বলে, উহা কদম-ই-রসুল; হিন্দু বলে, উহা বিষ্ণুপদচিহ্ন। মুসলমানের 'দরগা' অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই কোন না কোন হিন্দু 'আস্তানের' চিহ্ন দেখা যায়। লোকে ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিলেও যে পূর্ব্বে পবিত্র বলিয়া বিশ্বসিত স্থানগুলিকে পবিত্র বলিয়া মনে করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

* রিস ডেভিড লাডককে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, কাশ্মীরে বৌদ্ধের সংখ্যা ২০০০০০। বৌদ্ধ প্রজা প্রধানতঃ লাডকেই আছে।

স্থানীয় মোল্লারা ও অন্য স্থানের মুসলমান প্রচারকগণ কাশ্মীরে মুসলমানদিগের ধর্ম্মে ঔদাস্যের কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করে, আবার হিন্দুরাও ধর্ম্মে উৎসাহহীনতার কথা বলে। পূর্ব্বে উপবাসের দিন হিন্দুরা কেবল সিঙ্গাড়া ভক্ষণ করিত, এখন অনেক খাদ্যই চলে। এখন তাহারা শিবচতুর্দ্দশীর দিন পূজার জন্য কষ্ট করিয়া তখ্‌ত-ই-সুলেমান পর্ব্বতে যাইতে বিরক্তি প্রকাশ করে। দেশে তাহারা যাহাই করুক, কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে আসিলে খুবই হিন্দুয়ানী দেখান। দেশে তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে ভারতীয় হিন্দুরা স্তম্ভিত হয়। মুসলমানের বাহিত পানীয়ের গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে; মুসলমানের নৌকায় পাক ও আহার চলিত। হিন্দুর ধাত্রী প্রায়ই মুসলমান। হিন্দুসংসারে ধাত্রীপুত্রের বিশেষ আধিপত্য। মহারাজ গোলাব সিংহ মুসলমানের জলব্যবহারনিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন ন । অথচ মাংসের বর্ণ লোহিত বলিয়া লোহিতবর্ণের অধিকাংশ শাকশবজী প্রভৃতি হিন্দুর অব্যবহার্য্য। পলাণ্ডু নিষিদ্ধ; কিন্তু মাংস চলিত! হিন্দুরা কুক্কুট, হংস ও তাহাদের অণ্ড ব্যবহার করে না; কিন্তু জলচর বন্য বিহগের মাংস ও অণ্ড ভক্ষণ করে। এই সকল পক্ষী আবার মুসলমান প্রথামতে জবাই (হালাল) করা হয়। আশ্চর্য্য বটে!

কাশ্মীরী গ্রাম স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের আগার। চারি দিকে বিস্তৃত সহস্রশাখ ঘনপত্রপূর্ণ বৃক্ষরাজির মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম যেন বিহগের সুখতপ্ত নীড়ের মত প্রতীয়মান হয়। গ্রামের প্রান্তেই স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী কলহাস্যে প্রবহমানা,—কূলে শ্যামতৃণমণ্ডিত ভূমিতে রক্ত উইলোমূলের রেখা; চারি পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র—তাহাতে শস্যগুচ্ছে কি বর্ণবৈচিত্র্য! রবিকরে তাহা যেন মসৃণ ধাতুনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া কৃষকের কুটীর নয়নগোচর হয়; কুটীরের ঢালু ছাত। প্রত্যেক কুটীরের সংলগ্ন ভূমিতে শবজীবাগ। কুটীরের কাছেই গোলায় শস্য পূর্ণ। প্রাঙ্গণে রমণীরা উদূখলে শস্য কুটিতেছে; তাঁত এখন আর চলিতেছে না; শিশুরা রৌদ্রতাপ উপভোগ করিতেছে; কুক্কুরগুলা ঘুমাইতেছে। বালকেরা পশু চরাইতে গিয়াছে। নদীকূলে অদ্ভুতগঠন স্নানাগার—স্নানার্থীরা সেখানে ধীরে ধীরে স্নান করিতেছে; তাহার নিম্নে মরালদল আহার করিতেছে। গ্রামের সমাধিক্ষেত্রে কুসুমের কি শোভা! গ্রামে যথেষ্ট স্থান আছে; বসতি ঘন নহে। গৃহ মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত।

কাশ্মীরে গৃহ প্রায়ই কাঁচা ইটে নির্ম্মিত ও বিচালী দিয়া আচ্ছাদিত—

তবে হ্রদের নিকটে হোগলার ছাউনীও লক্ষিত হয়। আবার জঙ্গলের নিকটে অনেক গৃহ সম্পূর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত—বৃক্ষকাণ্ডের প্রাচীর, তক্তার ছাত। বরফ সহজে সরিয়া পড়িবে বলিয়া সকল গৃহেরই ছাত ঢালু। গৃহ প্রায়ই ত্রিতল; নিম্নতলে গৃহপালিত পশু রাখা হয়, মধ্যতলে গৃহস্থের বাস, আর উপরের অংশে (loft) দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়। উপরের অংশের দুই দিক মুক্ত—গৃহে অগ্নি লাগিলে দ্রব্যাদি সত্বর বাহির করিবার সুবিধা হয়। শীতকালে কোন কোন গৃহে অগ্নি রক্ষিত হয়। কাষ্ঠের গৃহে অগ্নিরক্ষা ও সর্ব্বদা কাংড়ী ব্যবহার, এই দুই কারণে কাশ্মীরে অগ্নিকাণ্ডটা প্রায়ই হইয়া থাকে। কাংড়ী গোলাকার ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্র—চারি দিকে চটার ছাউনি বেষ্টিত (wicker work) ইহার মধ্যে অগ্নি রাখিয়া পাত্রটি গলদেশ হইতে বিলম্বিত করিয়া বক্ষে রক্ষিত হয়। যে সব কাষ্ঠ ভাসিয়া আসে ও জলে নরম হইয়া যায়, তাহাই কাংড়ীর অগ্নির জন্য প্রশস্ত, তবে গোময়লিপ্ত বৃক্ষপত্রও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, ইহা বিদেশ হইতে কাশ্মীরে আসিয়াছে; কিন্তু "রাজতরঙ্গিণী"তেও যখন ইহার উল্লেখ আছে, তখন ইহাকে আর দেশজ ব্যতীত কি বলিব?—কাশ্মীরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্ত্রীজনোচিত আলখেল্লার ব্যবহার করে। কাশ্মীরে ইহাকে "পিরাণ" বলে। কাশ্মীরিগণ বলে, এই পিরাণ ও কাংড়ী তাহাদিগকে হীন-বীর্য্য করিয়াছে। কেহ বলেন যে, আকবর কাশ্মীরীদিগকে হীনবীর্য্য ও বশীভূত করিবার আশায় এই দুই দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত করাইয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে, জৈনাল আবদিন হিন্দুদিগকে এই পিরাণ, কাংড়ী ও 'বাসি' রুটি ব্যবহার করিতে বাধ্য করেন। সে যাহাই হউক, কাশ্মীরের দুরন্ত শীতে কাংড়ী যে বিশেষ আরামপ্রদ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই; অধিকন্তু ইহাতে না কি ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

অনেক গৃহে আবার তক্তার ছাতের উপর মৃত্তিকা রক্ষিত হয়। সরস বসন্তে ছাত যখন "কুসুমে কুসুমময়" হয়, তখন গৃহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। শ্রীনগরের অধিকাংশ গৃহই এইরূপ বলিয়া নিকটস্থ হরিপর্ব্বত হইতে নগর অতি মনোরম দেখায়। বোধ হয়, যেন্ স্বপ্নরাজ্য—মায়াপুরী। তখন মনে হয়, কাশ্মীর "ভূস্বর্গ"ই বটে। গৃহের সম্মুখে দ্বিতলে বারান্দা থাকাতে গৃহের শোভাবৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে এই বারান্দা কাশ্মীরীর বড়ই প্রিয়। অবস্থা-পন্নদিগের গৃহে অতি সুন্দরকারুকার্য্যখচিত জাফরীওয়ালা জানালা আছে। শীতকালে সেগুলিতে কাগজ আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে শীতবায়ু প্রবেশ

কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ আলোকের গতিরোধ হয় না। গৃহের সর্ব্বনিম্নতলে গৃহপালিত পশু রাখিবার মুখ্য কারণ,—তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে গৃহ উত্তপ্ত থাকে।

কাশ্মীরীরা শয়নের জন্য খাট বা শয্যার ব্যবহার করে না; শয়ন প্রায়ই পাটী বা বিচালীর উপর। গৃহের আসবাব অতিসামান্য—একটি চরকা, শস্য কুটিবার জন্য একটি উদূখল, রন্ধনের জন্য মৃৎপাত্র, আর দ্রব্যাদিরক্ষার জন্য মাটীর জালা ও ঝুড়ি।

কাশ্মীরে পরিধেয় সকলেরই আলখেল্লা;—গ্রীষ্মকালে সূতী, শীতকালে পশমী। সাধারণ ব্যবহারের জন্য গোল টুপি, কোথাও যাইতে হইলে শ্বেত পাগড়ী। অবস্থাপন্নের পদে চর্ম্মপাদুকা, সাধারণ লোকের ব্যবহার বিচালীর জুতা (Sandal)। কাশ্মীরীরা আপনাদের এই বেশ পছন্দ করে না; বলে, রাজাদেশ হইলেই ইহা ত্যাগ করে। কিন্তু কাংড়ীর ব্যবহার থাকিতে যে আলখেল্লার ব্যবহার যাইবে,এমন মনে হয় না; কারণ, অন্য কোনরূপ পোষাকে এমন 'ওম'টি হইবে না। রমণীরা আলখেল্লামাত্র ব্যবহার করে, পুরুষেরা তন্নিম্নে পায়জামা ব্যবহার করে। পথ চলিবার সময় বেশের কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তখন পিরাণটা পায়জামার মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া হয়,আর পদে "পটী" জড়ান হয়। কাশ্মীরীদের বাহার ও বাবুগিরীর একান্ত অভাব; বস্ত্রে বর্ণের বাহুল্য নাই—সব শ্বেত, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার,তাই বস্ত্রাদিও মলিন। রমণীদিগের বস্ত্রে কখনও কখনও বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্বে কেহ বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য দেখাইলে রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাকে ধনী মনে করিয়া অর্থের জন্য উৎপীড়িত করিত, সেই জন্য কেহই বেশপারিপাট্য দেখাইত না, বরং তাহা সযত্নে পরিহার করিত। ক্রমে তাহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুমুসলমানের বেশভূষা প্রায় একপ্রকার হইলেও পার্থক্যানুভব দুষ্কর নহে। পণ্ডিত দক্ষিণ দিক দিয়া পাগড়ী বাঁধেন; মুসলমানের পাগড়ী বামাবর্ত্ত। পণ্ডিতের পিরাণের বঁদ বামদিকে—মুসলমানের দক্ষিণে। হিন্দুর পিরাণের আস্তিন আঁটা, মুসলমানের ঢিলা। বোধ হয়, মুসলমানদিগকে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; দক্ষিণ দিক দিয়া অশ্বারোহণ বিশেষ অসুবিধাজনক হইলেও মুসলমানের পক্ষে তাহাই প্রথা; হিন্দুর তাহা নহে। পণ্ডিত চুড়িদার পায়জামা, সরু লম্বা কাপড়ের পাগড়ী ও চেপটা টুপির ব্যবহার করেন; এবং একটি শিখামাত্র

রাখিয়া মস্তকমুণ্ডন করেন। লম্বা সরু আস্তিন অনেক সময় দস্তানার কায করে; তাহার সহিত পাদুকার সংস্পর্শ হইলেও আহারকালে সেই জামার ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। তিনি বামপদ হইতে স্নান আরম্ভ করেন। মুসলমান দক্ষিণ পদ হইতে স্নান আরম্ভ করেন। তাঁহার জামা ঢিলা, পাগড়ী চওড়া ছোট কাপড়ের, টুপি সরু হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত মস্তক মুণ্ডিত। কোন-রূপে খাদ্যের সহিত আস্তিনের সংস্পর্শ হইলে মুসলমানের পক্ষে সে খাদ্য পরিত্যজ্য।

পণ্ডিতানী পায়জামার ব্যবহার করেন না, কিন্তু কোমরবন্ধ ব্যবহার করেন। তিনি চর্ম্মপাদুকার ব্যবহার করেন না, ঘাসের জুতাই তাঁহার ব্যব-হার্য্য। তিনি স্বামীর নামোচ্চারণ লজ্জাকর বিবেচনা করেন, এবং সন্তান অপেক্ষা পতিতে অধিক অনুরক্তা। * মুসলমানীর পক্ষে গৃহের বাহির হইতে হইলে পায়জামা ব্যবহার চলিত আছে, কিন্তু কোমরবন্ধের ব্যবহার নাই। চর্ম্মপাদুকাব্যবহারে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। মুসলমানী সাধারণতঃ পতির অপেক্ষা সন্তানে অধিক অনুরক্তা। তাঁহার পক্ষে স্বামীর নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুরমণীর মস্তকাবরণ শ্বেত, বেশে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই। মুসলমানীর মূর্দ্ধাবরণ লোহিত—বেশেও কারুকার্য্যের অভাব নাই। গৃহ-কার্য্যে মুসলমানীর অপেক্ষা পণ্ডিতানী অধিক পটু। আবশ্যক হইলে উভয়েই পুরুষের মত (দুই দিকে পা ঝুলাইয়া) অশ্বারোহণ করিয়া থাকেন।

কাশ্মীরীরা পরিশ্রমী; আপনার কাযের সময় তাহারা বিশেষ পরিশ্রম করে। গ্রীষ্মকালে তাহারা ক্ষেত্রে কায করে। শীতকালে অনেকে পঞ্জাবে কায করিতে যায়। যাহারা দেশে থাকে, তাহারা পশমী বস্ত্র বয়ন করে। শীতের সুদীর্ঘ নিশাতেও তাহারা চারি পাঁচ ঘণ্টার অধিক ঘুমায় না।

কাশ্মীরীরা যেমন অধিক শ্রম করে, তেমনই কিছু অধিক আহার করে। এখন ভাতের ব্যবহারই অধিক; কাশ্মীরীরা অন্নভক্ত। ইতঃপূর্ব্বে চাউল প্রায়ই সহরে রপ্তানী হইত, কাজেই গ্রাম্য কাশ্মীরীরা যব, ভুট্টা প্রভৃতির ব্যবহার করিত। ঘৃতের ব্যবহার নাই; তাহাতে কাশ্মীরীর গলনালীর প্রদাহ হয়। চা ও নস্যও অপ্রচলিত নহে। তবে ধূমপানের বিরলপ্রচলন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে লোকের আর বিলাসসামগ্রী ব্যবহারের সামর্থ্য

* হিন্দু রমণীর সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই এই কথা।

ছিল না; সেই হইতেই তাম্রকূটের ব্যবহার কমিয়াছে। চা হয় সমধিক শর্করাযুক্ত, নয় ত অধিক লবণাক্ত করা হয়। কাশ্মীরীরা সকল খাদ্যেই লবণের আধিক্য ভালবাসে। কাশ্মীর মেওয়ার দেশ; গ্রীষ্মকালে অনেকে ফল খাইয়া কাটায়; আবার শীতকালের জন্য শুষ্ক করিয়া রাখে। অলাবু, লঙ্কা, আপেল প্রভৃতি শুষ্ক করিয়া রাখিলে শীতকালেও চলে। কাশ্মীরীরা সম্পন্ন নহে। একবার শস্য নষ্ট হইলে দেশে বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। তবে সকলেরই অনেকটা জমী ও মেওয়ার বাগান আছে। মোটের উপর কাশ্মীরীর অবস্থা সাধারণ ভারতবাসী প্রজার অবস্থার অপেক্ষা ভালই বলিতে হইবে।

কাশ্মীরীরা সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গৃহে বিশ্রাম করে; গল্পগুজব প্রায়ই করে না, খেলাধূলাও বড় নাই। পরস্পরের সহিত মেশামিশি যাহা কিছু কেবল পীরের দরগায়, মেলায় ও বিবাহসভায়। আমোদের মধ্যে ভগৎ (strolling players) প্রায়ই দেখা যায়। আর গ্রাম্য কবিও আছে। ইহারা প্রায়ই দরিদ্র, অনেকে আবার প্রকৃতিস্থও নহে। কাশ্মীরের বিবরণ-লেখক মিষ্টার লরেন্স এক জনের কথা বলিয়াছেন, সে পূর্ব্বে ভাল চাকরী করিত; মদ্যেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সে পার্শী কবিদিগের বয়েৎ উদ্ধৃত করিয়া আপনার ব্যবহারের সমর্থন করে। লেখক তাহাকে মদ্য কিনিবার জন্য অর্থ দিতে না চাহিলে সে তাঁহাকে গালি দিয়া বলিল, "হিন্দুর কলিযুগ উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

হিন্দুর সূতিকাগৃহে শয্যা মন্ত্রপূত করা হয়। ধাত্রী মুসলমানী। জাতাশৌচ একাদশ দিন। শিশুর ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, তিন বৎসরে মস্তকমুণ্ডন ও সাত বৎসরে উপনয়ন। ইহার পর বিবাহ। বিবাহে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে জামাতাকে কিছু অর্থও দিতে হয়; এই অর্থকে 'টেথ' বলে। এই টেথ অবস্থা অনুসারে আট আনা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কন্যাকে গৃহে আনিলে, প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণে ও ক্রিয়াকালে টেথ দিতে হয়। কাজেই বহু কন্যার জনকের পক্ষে টেথ বড়ই কষ্টকর।

বিবাহ আর মৃত্যু, ইহার মধ্যে কাশ্মীরী হিন্দুর আর কোনও সংস্কার নাই। মুমূর্ষুকে পরিষ্কার স্থানে নূতন শয্যায় শোয়াইয়া মন্ত্র শুনান হয়। শবদেহ স্নাত ও নূতন বেশে ভূষিত করিয়া মনুষ্যস্কন্ধে বা নৌকায়

শ্মশানে নীত হয়। পুত্র মুখাগ্নি করেন। মুসলমানের দ্বারা দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। অশৌচ দশ দিন। শবদাহের দুই তিন দিন পরে অস্থি ও ভস্ম সংগৃহীত হইয়া গৃহের প্রাচীরকোটরে রক্ষিত হয়; গঙ্গাষ্টমীর দিন তাহা হরমুখ-পর্ব্বতনিম্নস্থ পবিত্র হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধের অধিকারী দশম দিনে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরদত্ত বেশ পরিধান করে। একাদশ দিনে মৃতের ও ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। প্রথম তিন মাস পাক্ষিক ও তৎপরে নয় মাস মাসিক শ্রাদ্ধ চলে।

কাশ্মীরে বসন্তরোগের ভয়ে শীতলার পূজা প্রচলিত আছে। কাশ্মীরী পণ্ডিত প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা ও তর্পণ করেন, তাহার পর গৃহে 'ঠাকুর' থাকিলে পূজা করিয়া চরণামৃতপান ও জাফরাণের তিলক ধারণ করেন। তিনি একাদশী পালন করেন; শুক্লাষ্টমী ও পূর্ণিমার দিন একবারমাত্র আহার প্রচলিত। চৈত্রনবমী, জ্যৈষ্ঠ-অষ্টমী, হরসপ্তমী, হর-অষ্টমী, গঙ্গাষ্টমী, মহানবমী, ভীম-একাদশী, শিবরাত্রি প্রভৃতি প্রধান পর্ব্বদিনের পালনও আছে।

কাশ্মীরে পোষ্যপুত্রগ্রহণের প্রথা আছে। স্বগোত্র হইতে উপনয়নের পূর্ব্বে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হয়। ঔরসপুত্র ত্যাগ করা চলে, কিন্তু পোষ্য-পুত্রকে ত্যাগ করা অসম্ভব। পোষ্যপুত্রগ্রহণের পর ঔরসপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পোষ্যপুত্রই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। কাশ্মীরী হিন্দুর মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন নাই; দুই এক স্থলে এক জনের একাধিক পত্নী দৃষ্ট হয়। কিন্তু সপত্নীবিদ্বেষ নাই—তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। পুত্র না জন্মিলে কেহ কেহ পত্নীর মত লইয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করে। কিন্তু সাধারণতঃ কাশ্মীরীরা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ পছন্দ করে না। কাশ্মীরে বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই। বিধবা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

কাশ্মীরী মুসলমান নিকট আত্মীয় পাইলে আর কাহারও সহিত কন্যার বিবাহ দেয় না। নিতান্তই নিকট আত্মীয় না পাইলে সে দেখে, কোন দরিদ্র স্বধর্ম্মী বহুপুত্রপালনভারপীড়িত। সে তাহার একটি পুত্রকে গৃহে আনিয়া প্রতিপালন করিয়া শেষে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেয়। অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়াই প্রচলিত প্রথা। কাজেই কন্যার বয়স তিন বৎসর হইলেই পিতা কোন বালককে গৃহে আনিয়া রাখে। যত দিন বিবাহ না হয়, তত দিন খাটিতে খাটিতে বালকের প্রাণান্ত হয়। এই প্রথাকে 'খান-দমাদী' কহে। কন্যা গৃহে থাকিলে পিতৃগৃহে কাজ করিবার এক জন লোক

বাড়ে—এই সুবিধা হেতু কাশ্মীরে এই প্রথা বিশেষ প্রচলিত। প্রাচীন-লোকেরা দুঃখ করিয়া বলে, এখন বিবাহের পর 'খানদমাদ' আর শ্বশুরালয়ে থাকিতে চাহে না। নব্য যুবকগণ কিছু স্বাধীনতা-বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে হিন্দুর মত মুসলমানও ঘটকের শরণাপন্ন হয়। ঘটক প্রস্তাব করিলে বর কনের পিতা কোন উপলক্ষে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লগ্নপত্রের দিন স্থির করে। নির্দ্দিষ্ট দিন পাত্রের পিতা কয়েক জন আত্মীয় বন্ধুর সহিত কন্যার পিতৃগৃহে গমন করেন, এবং রৌপ্যালঙ্কার, নগদ অর্থ, লবণ ও চিনি উপহার প্রদান করেন। আহারের পর সম্বন্ধের কথা প্রচারিত হয়। তখন মোল্লা বিবাহপত্র লিপিবদ্ধ করেন। পরদিন প্রাতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ পাত্রের পিতা, প্রদত্ত অর্থ, চিনি ও লবণের অর্দ্ধেক ও তৎসহ একখানি কম্বল বা একটা পাগড়ী উপহার লাভ করেন। ইহার পর চারিটি প্রধান মুসলমান পর্ব্বদিনে তিনি ভাবী পুত্রবধূকে উপহার প্রেরণ করেন। ছয় মাস পরে বিবাহের দিন স্থির করিয়া পাত্রের পিতা 'কন্যা'র পিতৃগৃহে অবস্থানুসারে কুড়ি হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন। বিবাহের দিন বর স্নানান্তে সুসজ্জিত হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন দরগায় উপাসনা করিয়া ও পিতা বা পিতা-মহের সমাধি দর্শন করিয়া 'কন্যা'র গৃহে উপনীত হয়। 'কন্যা'পক্ষীয়া মহিলাগণ স্বাগতসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ও 'কন্যা'র রূপের প্রশংসা করিতে করিতে আইসে। গৃহদ্বারে নরসুন্দর এক কলস জল ঢালিয়া দেয়। বর শূন্য কলসে একটি টাকা নিক্ষেপ করে। তখন বরের পিতা ও 'কন্যা'র পিতা স্ত্রীধনের পরিমাণনির্দ্ধারণের জন্য ঘোর কলহ আরম্ভ করে। কলহ যতই তুমুল হউক না কেন, সকলেই জানে, সে কেবল লোকদেখান প্রথার মত। স্ত্রীধন নির্দ্দিষ্টপরিমাণই স্থির হইবে। তাহার পর আহার ও তৎ-পরে বিবাহ। এ দিকে আবার পাত্রের পিতার সহিত গ্রামের মণ্ডল ও গ্রাম্য কর্ম্মচারিগণ প্রাপ্য অর্থ লইয়া কলহ আরম্ভ করে। বিবাহান্তে কন্যা সুসজ্জিতা হইয়া ভ্রাতা কিম্বা মাতুল কর্ত্তৃক শিবিকায় আনীতা হয়। পূর্ব্বেই যানমধ্যে একটি মেষের হৃৎপিণ্ড ও লবণ রক্ষিত হয়। এক দল মহিলা গান করিতে করিতে আইসে। বধূর ভ্রাতা ও আর এক জন আত্মীয় তাহার সহিত তদীয় শ্বশুরালয়ে গমন করে। বধূ এক সপ্তাহ পরে পিতৃদত্ত বস্ত্র ত্যাগ ও

শ্বশুরদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্তা হয়। বিবাহের এক বৎসর পরে জামাতার শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ হয়,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মীয়গণেরও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। জামাতা সেখানে তিন দিন বাস করিয়া শ্বশুরদত্ত উপহার লইয়া গৃহে ফেরে। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান না হইলে সাধুর নিকট মাদুলী-গ্রহণ ও পীরের স্থানে মানৎ আরব্ধ হয়। প্রসবের দুই মাস পূর্ব্বে বধূ পিতৃগৃহে গমন করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মোল্লা আসিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে 'আজান' ও বাম কর্ণে 'তকবীর' শ্রবণ করান ও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেন যে, সকলেরই শেষ—মৃত্যু। প্রসূতি দুই দিন উপবাসের পর গোধূমের রুটী ও ডিম্ব ভক্ষণ করেন। সপ্তম দিনে প্রসূতি স্নান করিয়া অশৌচমুক্তা হয়েন। সেই দিন সন্তানের মস্তকমুণ্ডন হয়। সে দিন আহারাদির বিশেষ আয়োজন থাকে। দুই তিন মাস পরে প্রসূতি শ্বশুরালয়ে গমন করেন। পিতৃগৃহ হইতে সঙ্গে যে উপহার যায়, তাহার মধ্যে একটি সবৎসা গাভী বা সশাবকা ঘোটকী থাকা আবশ্যক।

মৃত্যুকালে মুসলমানকে উত্তর বা পূর্ব্ব শীর্ষ করিয়া শয়ন ও মধুর সরবৎ পান করান হয়। উপস্থিত ব্যক্তিরা আল্লার নামোচ্চারণ করে। শবদেহ স্নান করাইয়া কার্পাসবস্ত্র পরাইয়া দারুময় শবাধারে রক্ষিত হয়। শবাধার সমাধিক্ষেত্রে নীত হইলে তদুপরি কবরখননকারীর প্রাপ্য বস্ত্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। শব শবাধার হইতে বাহির করিয়া সমাধিস্থ করা হয়। তিন দিন ধরিয়া মৃতের কোন আত্মীয়গৃহে ভোজ দেওয়া হয়;—অশৌচ হেতু কেহ মৃতের গৃহে আহার করে না। চতুর্থ দিনের ভোজটিই কিছু বৃহৎ ব্যাপার। মৃত্যুর পরের শুক্রবারে সকলে গোরস্থানে গমন করিলে এক জন আত্মীয় মৃতের উত্তরাধিকারীর স্কন্ধে একখানি রঙ্গিন বস্ত্র নিক্ষেপ করে। মৃতের কল্যাণকামনায় চল্লিশ দিন নমাজ করা হয়, এবং দরিদ্রদিগকে ও মোল্লাকে আহার করান হয়। এক বৎসর প্রতি মাসে ও প্রতি বৎসর মৃত্যুর দিনে মোল্লাকে কিছু দান করা হয়।

কাশ্মীরীদের বিশেষ সুনাম নাই। পঞ্জাবে প্রবাদই আছে—কাশ্মীরী ব্যবহারে সর্পের মত (কুটিল) ও আচারে কুক্কুটের মত (অপরিচ্ছন্ন) বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিবে না। য়ুরোপীয় লেখকেরা প্রায় কেহই তাহাদের দোষ ব্যতীত গুণ দেখিতে পান না। তবে তাঁহাদের অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, সে সকল দোষ কুশাসনের ফল। মুরক্রফ্ট

বলেন, কাশ্মীরীরা স্বার্থপর, কুসংস্কারাপন্ন, মূর্খ, ধূর্ত্ত, কুচক্রী, অসাধু ও মিথ্যাবাদী। সুর প্রায় সকল লেখকেরই এইরূপ। জ্যাকমণ্ট বলেন যে, গত শতাব্দীতে আফগানগণ মোগলসম্রাটের নিকট হইতে কাশ্মীর জয় করে; আবার বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিখগণ আফগানদিগের নিকট হইতে রাজ্য লয়। রাজ্য-হস্তান্তরের সময় প্রতিবারেই লুঠতরাজ হইয়াছে। এই অব্যবস্থাকালে কোন দ্রব্যেই কাহারও যেন একটা স্বত্ব ছিল না। এই কারণে কাশ্মীরীরা ক্রমে অলস হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা মনে করিতে আরম্ভ করিল, যদি অনাহারেই থাকিতে হয়, তবে শ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া হৃত-সর্ব্বস্ব হওয়ার অপেক্ষা বিনা শ্রমে উপবাসই শ্রেয়ঃ। কাশ্মীরীরা আপনারা বলে, এক সময় তাহারা আত্মসম্মানশালী ও সাহসী ছিল; তাহাদের বর্ত্তমান হীন অবস্থা বিদেশীর অত্যাচারের ফল। কিন্তু যাঁহারা 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, বিদেশীয় বিজয় ও তৎসহচর অত্যাচারের বহু পূর্ব্বেও কাশ্মীরীরা ধূর্ত্ত ও অসাধু ছিল। কাশ্মীরের বিবরণকার মিষ্টার লরেন্স বলেন যে, কাশ্মীরীরা যেরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, সেরূপ অত্যাচারপীড়িত হইলে যে কোনও জাতির এইরূপ হীনাবস্থাপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। যখন ন্যায় বিচার দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন মিথ্যা প্রবঞ্চনাই দুর্ব্বলের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার মতে, কাশ্মীরীরা ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান। তাহারা কর্ম্মকুশল,—আপনাদের জমী বেশ চাষ করে; মালী ভাল—বাগানের কাজে পটু; ঝুড়ী বুনিতে নিপুণ। তাহারা পশমী কাপড় বুনে, আপনাদের গৃহনির্ম্মাণ করে, জুতা প্রস্তুত করে ও গৃহকর্ম্মের দড়ী পাকায়।

কাশ্মীরী কৃষক গৃহে পুত্রকলত্রের প্রতি সদয় ও সচ্চরিত্র। কেহ কেহ সময় সময় স্ত্রীকে শাসন করে ও সকলেই মুখে গৃহে সুশাসনের প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বটে, কিন্তু আসলে, কি হিন্দুর গৃহে, কি মুসলমানের গৃহে—স্ত্রীই সব; স্বামী স্ত্রীকে বিশেষ ভয় করে। নৌব্যবসায়ীদিগের চরিত্র প্রায়ই ভাল নহে বলিয়া কৃষকগণ তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে চাহে না। জোর করিয়া 'বেগারে' কায করিতে হইত বলিয়া ক্রমে কাশ্মীরীর অভ্যাস এমনই হইয়াছে যে, কায যতই কেন প্রয়োজনীয় হউক না, বলপ্রয়োগ ব্যতীত সে কায করিবে না। এমন কি, জোর করিয়া লইয়া না গেলে অনেক সময় তাহারা নিমন্ত্রণ খাইতেও যায় না। আপনাদের ফসল-রক্ষার জন্য কোন কায করিবার

চারীকে স্পষ্টই বলে—আমরা অর্থ চাহি না, জুতা চাহি;—অর্থাৎ আমাদের জোর করিয়া কাজ করাও।

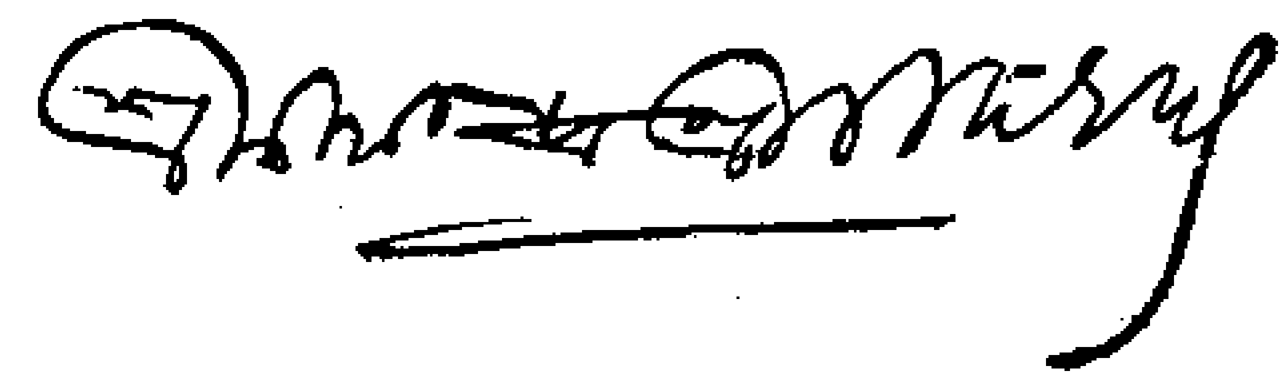
কাশ্মীরে অপরাধসংখ্যা অতি অল্প। ধন সম্পত্তি চুরীর কথা প্রায়ই শুনা যায় না। কলহ প্রায় গালিতেই শেষ হয়, মারামারী প্রায়ই হয় না। মহারাজ গোলাবসিংহের কঠোর শাসনই এই অপরাধস্বল্পতার কারণ। তাঁহার শাসনে চোরের শাস্তি ছিল—জীয়ন্তে চর্ম্ম-উত্তোলন। গ্রামের মণ্ডলের ও চৌকিদারের কার্য্য বিশেষরূপ কঠিন। অপরাধীকে ধরিতে না পারিলে তাহারা দণ্ডিত হয়। এতদ্ব্যতীত তখন গোয়েন্দার বাহুল্যে সর্ব্বত্রই ফাঁদ পাতা ছিল; একটু অসাবধান হইলেই "কে কোথায় ধরা পড়ে"—জানা দুষ্কর হইত। কাশ্মীরীরা অপরাধ করিতে বড় ভয় পায়।

কাশ্মীরীরা কিছু অতিরঞ্জনপ্রিয়। কাশ্মীরী কৃষক অনেকটা আইরিষ কৃষকের মত। তাহারা সঙ্গীতানুরাগী ও গায়কপক্ষিপ্রিয়। ক্ষেত্রে কায করিতে করিতে কৃষক গান ধরে—সুর সুমিষ্ট ও সকরুণ। কাশ্মীরীরা অত্যন্ত অপরিষ্কার—গ্রীষ্মকালে দুর্গন্ধে নিকটে তিষ্ঠান ভার। কিন্তু তাহারা একেবারে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণাহীন নহে। তাহারা গৃহ হইতে দূরে মলত্যাগ করে ও সংক্রামকপীড়াগ্রস্ত রোগীকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখে।

কাশ্মীরে সহরের লোকেরা আরও আরামপ্রিয়। তাহারা কোন কায করিতে চাহে না। সরকার হইতে তাহাদের জন্য সুলভে আহার্য্য ও জ্বালানী বিক্রয় করিতে হইবে। নহিলে তাহাদের বিরক্তির আর সীমা থাকে না। চাউল যতই কেন দুর্মূল্য হউক না, তাহারা সেই এক দরেই কিনিবে! রাজবাড়ীর নিকটে থাকে বলিয়া তাহাদের সব আবদারই গ্রাহ্য। তাহারা সর্ব্ববিধ সংস্কারের বিরোধী। স্বাস্থ্যোন্নতিবিধায়ক কোন নূতন বন্দোবস্তের কথা হইলে সহরের সকলের বিরক্তির আর অবধি থাকে না। ড্রেণ-স্থাপন ও রথ্যানির্ম্মাণ তাহাদের নিকট উপহাসাস্পদ। সহরে হিন্দু ও মুসলমান এখন ক্রমেই মদ্যপান আরম্ভ করিতেছে। সহরের লোক প্রায়ই সরকারী কার্য্যে লিপ্ত। প্রবাদই আছে,—সহরের লোক, মিথ্যাকথা, চাকরী বা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। সহরের হিন্দুরা অনেক সময় অল্প দিনেই প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করে ও মুক্তহস্ততা হেতু সঞ্চিত অর্থ অল্প দিনেই ব্যয় করিয়া ফেলে। সহরের হিন্দুদের মধ্যে একতাবন্ধন দৃঢ় থাকায় রাজকার্য্য তাহাদের একরূপ একচেটিয়া।

কাশ্মীরীদিগের চরিত্রে একটু স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় বিশেষত্ব আছে। কেহ দুই বা তিন পুরুষ অন্যত্র কাটাইয়া দেশে ফিরিলেও তাহাকে কাশ্মীরী বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয় না। বেশের, এমন কি, আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনেও তাহাকে চিনিতে কষ্ট হয় না। বিবরণাখ্যায়ক মিষ্টার লরেন্স বলেন যে, এত দিন এত অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহারা যে আরও হীনাবস্থায় উপনীত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহার বিশ্বাস, কিছু দিন সুশাসনের ফলে তাহাদের প্রকৃতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; তাহারা আবার কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান ও সাধু হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

কাশ্মীরের একটি নূতন রকমের প্রথার উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। কাশ্মীরীরা সম্রাটকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে; যখন যিনি সম্রাট থাকেন, তখন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হয়। সহরের পণ্ডিত হইতে পল্লীগ্রামের হিন্দু কৃষক পর্য্যন্ত সকল হিন্দুই সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এ প্রথা পুরাতন। এখন হিন্দুরা ভারতসাম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। কেবল হিন্দুপীড়ক অওরঙ্গজেবের সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল; হিন্দু প্রজাপীড়কের মূর্ত্তির পূজা করে নাই। *



মুদ্রাবিভ্রাট।

৩।

ভারতীয় টাঁকশালে যথেচ্ছ রৌপ্যমুদ্রাগঠনের যে ব্যবস্থা ছিল, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কি কারণে ভারত গবর্মেণ্ট সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

* প্রধানতঃ মিষ্টার ওয়াল্টার রোপার লরেন্সের কৃত The Valley of Kashmir অবলম্বনে লিখিত।

রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তি অর্থাৎ মূল্য, রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। একটি রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের সহিত একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ রৌপ্য আবশ্যক, সেই পরিমাণ রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের সহিত বিশেষ তারতম্য না থাকাই মুদ্রারাজ্যের একটি সাধারণ স্বাভাবিক নিয়ম। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের বড়ই হ্রাস হইয়াছিল; ১৲ টাকায় যে ১৮০ গ্রেণ রৌপ্য থাকে, সেই ১৮০ গ্রেণ রৌপ্যের দর ১২·৫৩ পেন্স হইয়াছিল। সাধারণনিয়মানুসারে এক টাকার মূল্যও ঐরূপ হওয়া উচিত। ১২·৫৩ পেন্স দেনা পরিশোধ করিতে যদি গবর্মেণ্টকে ১৲ টাকা দিতে হইত, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট বাটার দায়ে কিরূপ বিব্রত হইতেন, তাহা পাঠক এক্ষণে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। রৌপ্য টাঁকশালে প্রেরিত হইলেই রৌপ্যমুদ্রায় পরিণত করিতে সরকার বাহাদুর বাধ্য ছিলেন বলিয়াই রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের সহিত রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তির নিকট সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যত রৌপ্য আমদানি হউক না কেন, রৌপ্যের মুদ্রাকারে পরিণতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে, সহজলব্ধ রৌপ্যের ভারতে আগমন সত্ত্বেও প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যার বৃদ্ধি না হওয়ায় রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তির কতকটা স্থিরতাসম্পাদন করা যাইতে পারে। ভারত গবর্মেণ্ট যথেচ্ছ রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুতের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যার বৃদ্ধি পায় নাই, এবং রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যাধিক্য হয় নাই বলিয়াই রৌপ্যের দিন দিন মূল্যহীনতা সত্ত্বেও রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তি কতকটা অক্ষুণ্ণ ছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮০ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্যের স্বকীয় মূল্য ও মুদ্রাগঠনের অতি সামান্য ব্যয়ের সমষ্টি একটি রজতমুদ্রার মূল্য হওয়াই উচিত। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যভিচার বাঞ্ছনীয় নহে। অর্থনীতিবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম কখনই সংফলপ্রদ হয় না। গবর্মেণ্ট স্বয়ং উপায়ান্তর না দেখিয়া টাঁকশালে যথেচ্ছ মুদ্রাগঠন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট স্বয়ং স্বাভাবিক নিয়মের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ব্বে একবার গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,—

"The stamp of a properly regulated mint such as the Indian mints adds nothing except the cost of manufacture

and seenorage *to the value of the metal* on which it is impressed and only certifies to its weight and purity. A sound system must be automatic and self-regulating."

যথেচ্ছ রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুতের ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়ায় রৌপ্যমুদ্রার ও রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের আনুপাতিক সম্বন্ধ এইরূপ ঘটিয়াছিল—১২০ : ১০০ অর্থাৎ ১০০ ভরি রৌপ্যের স্বকীয় মূল্য যদি ১০০৲ মুদ্রা ধরা যায়, তাহা হইলে ১০০ ভরি রৌপ্যে নির্ম্মিত রজতমুদ্রার মূল্য ১২০ মুদ্রা ধরিতে হইবে। ১৮৯৩ সালে টাঁকশাল বন্ধ হইবার পরে স্যামুয়েল স্মিথ সাহেব উভয়ের আনুপাতিক মূল্যের এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"We had been obliged to go in for an artificial currency and now the Rupee had increased in value to 20 p. c. more than the silver which composed it."

দিন দিন ভারতে বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। বাণিজ্যের সাহায্য করিবার জন্যই মুদ্রার আবশ্যক। দিন দিন ভারতে বাণিজ্য যেরূপ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, দিন দিন মুদ্রার সংখ্যার সেইরূপ বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু টাঁকশালের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া মুদ্রার সংখ্যার পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা হইল; কিন্তু দুই একটি প্রধান কারণে বাণিজ্যের বিস্তৃতি সত্ত্বেও মুদ্রার সংখ্যার বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই, ভারত গবর্মেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথমতঃ এ দেশে নোটের অধিকতর প্রচলন হওয়ায় বিনিময়ের সাহায্যার্থ নোটের অধিকতর ব্যবহার হইবে, এবং সেই কারণে বাণিজ্যের বিস্তারের সহিত রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যার বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ গবর্মেণ্টের বিশ্বাস যে, এ দেশের লোকের গুপ্তধনসঞ্চয়ের বাসনা বড়ই প্রবল—ভারতবাসীর বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, মুদ্রার সদ্ব্যবহার করিবার স্পৃহা আদৌ নাই; কোন প্রকারে মুদ্রা হস্তগত করিয়া কোষাগারের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিলেই ভারতবাসী আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করেন। অনেকের বিশ্বাস যে, এরূপ গুপ্তধনের পরিমাণ এত অধিক যে, সেই সকল সঞ্চিত মুদ্রার ব্যবহার করিলে, বর্ত্তমান প্রসারিত বাণিজ্যের যাবদীয় বিনিময়ের কার্য্য, নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও, অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারে। মুদ্রার সংখ্যার স্থিরতাজনিত মুদ্রার বর্দ্ধিত মূল্য ভারতবাসীর অন্তরে মুদ্রার যথার্থ ব্যবহারপ্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিবে, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টাঁকশালে যথেচ্ছ মুদ্রাগঠন রহিত করিয়া দিয়া গবর্মেণ্ট স্বয়ং

বিভ্রাট হইতে একেবারে পরিত্রাণ পাইবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে আশা ফলবতী হয় নাই। টাঁকশাল বন্ধ হইবার কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অর্থসচিব সার মাইকেল হিক্‌সবিচ্‌ বলিয়াছিলেন যে, আইনের প্রতাপে রৌপ্যমুদ্রার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় বাঁটার দায় হইতে গবমেণ্ট কতকটা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে গবমেণ্টের প্রদত্ত ঔষধ রোগনিবারণে একেবারে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার উক্তি এইরূপ,—

"A few years ago the Government of India took the step of closing the mints against the free coinage of silver. Since that time they have, to a great extent achieved what I imagine was their object, in preventing the fall of rupee" But there was this remarkable result—the price of silver has very largely fallen, and every year there is an increasing divergence between the market value of the coined rupee and the real value of the silver which is in that rupee. In-fact India now has an inconvertible—appreciable currency. This is not a position……which I think can be held to be satisfactory or final solution of this great question.

ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই উদ্ধৃত কয়েক ছত্রের কথাই এই প্রবন্ধে বিশদ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের ক্রমিক হ্রাস, অথচ ভারতে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের কতকটা স্থিরতা, বাঁটার দায় হইতে গবমেণ্টকে কতকটা অব্যাহতি দিলেও, ইহাতে অন্য প্রকারে ভারতের অসুবিধা ঘটিতেছিল। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন আছে। ভারতের টাঁকশাল সকল ইচ্ছামত রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সময়ে চীন জাপান প্রভৃতি দেশের টাঁকশালে অবাধে রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হইতেছিল। কাজেই ঐ সকল দেশে রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের সহিত তথায় প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের নিকট সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রহিল; এবং সেই জন্যই ভারত অপেক্ষা চীন জাপান প্রভৃতি দেশ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা পাইল; এবং ঐ কারণেই বৈদেশিক বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যসমূহের আহরণে চীন প্রভৃতি দেশের ব্যয় ভারত অপেক্ষা অনেক অল্প হইতে লাগিল। মনে করুন, চীন ও ভারতে একই টাকার প্রচলন আছে, অর্থাৎ উভয় দেশেরই টাকা ১৮০ গ্রেণ রৌপ্যে নির্মিত, উভয়

দেশেরই চা ইউরোপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। চীন চা উৎপন্ন করিতে যে এক টাকা ব্যয় করেন, সেই প্রত্যেক টাকার মূল্য ১৮০ গ্রেণ রৌপ্যের প্রমাণ, অর্থাৎ, ১২ পেন্স। কারণ, ঐ প্রদেশে রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের সহিত রৌপ্য-মুদ্রার মূল্যের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা অক্ষুণ্ণ আছে, ভারতে কিন্তু টাঁকশাল বন্ধ হওয়ায় সেই এক টাকার মূল্য ১৮০ গ্রেণ রৌপ্যের সমান রহিল না, প্রায় ১৬ পেন্স হইল; অর্থাৎ প্রায় ২৬৯ গ্রেণ রৌপ্যের মূল্যের সমান হইল। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতে চা উৎপন্ন করিবার ব্যয় চীন অপেক্ষা অনেক অধিক হইতে লাগিল। পাঠক বোধ হয় এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আইনের প্রতাপে রৌপ্যনির্ম্মিত এই দেশের প্রচলিত মুদ্রার মূল্যের স্থিরতাসম্পাদন করায় রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যহীনতার জন্য চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ যে সুবিধা পাইল, ভারত তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইল।

টাঁকশাল বন্ধ হইবার পর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপযোগী মুদ্রার বিশেষ অনটন ঘটিয়াছিল। গুপ্তধনপ্রকাশের আশা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইল। গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকের দ্বিধা জন্মিল। রজতমুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ভারতের গুপ্তধন যক্ষের ধনের ন্যায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

এ সকল অসুবিধার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়াও করেন্সি কমিশন্ টাঁক-শালের দ্বার অবরুদ্ধ রাখাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলেন। কারণ বাঁটার দায় হইতে মুক্তি পাইবার আর অন্য উপায় নাই। রৌপ্য মূল্যহীন হওয়ায় চীন জাপানের যে সুবিধা সেই সুবিধা, মৌলিক যুক্তির অনুগামী হইলেও,কার্য্যতঃ চীন জাপান সেই সুবিধা উপভোগ করিতে পারে নাই,—অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। যাহারা টাঁকশাল বন্ধের পোষকতা করেন নাই, তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন যে, ভারত এক্ষণে যে সকল দ্রব্য বিনিময়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পাঠাইতেছেন, তাহার কতক অংশ চীন জাপান প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া লইবে। টাঁকশাল বন্ধ হইবার পর কার্য্যতঃ কিন্তু সেরূপ ঘটে নাই। টাঁকশাল বন্ধ করিয়া টাকার দর বাড়াইলে ভারতে রৌপ্যের আমদানি কমিবে, এবং তৎসঙ্গে স্বর্ণের আমদানির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই টাঁকশালে অবাধে রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুতের পুনর্ব্যবস্থা করিতে করেন্সি কমিশন অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ, ভারতে স্বর্ণের আমদানি না হইলে কালে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের ব্যবস্থা

আদৌ ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। "স্বর্ণ ও রৌপ্য" নামক পুস্তকের লেখক বহুদিন পূর্ব্বে করেন্‌সি কমিশনের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পোষকতা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

But, from the closure of the mints against the coinage of silver for the public, the exchange would rise and when it had risen sufficiently to allow the importation of gold, gold would be imported and coined, the Government receiving it freely in its treasuries,

ভারত ট্রেজারিতে সুবর্ণের আগমনের কথা ও স্বর্ণমুদ্রার আংশিক প্রচলনের ব্যবস্থার বিষয় বর্ত্তমান বজেটে ডকিন্স সাহেব বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংবাদপত্রে পাঠক সে সকল বিষয় অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অদ্যকার সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা এই সাত বৎসরের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন, আমি পরিষদের অধিবেশনে আহূত হইয়া যদি কোন দিন সভাগৃহে একাকী প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে চারি দিক হইতে আমার প্রতি প্রশ্ন হইত, 'রজনী বাবু কোথায়, রজনী বাবু কোথায়?' আজিকার অধিবেশনেও আমি আহূত হইয়া একাকী এই সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু আজি কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই—রজনী বাবু কোথায়? ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষদের সম্পর্কীয় সকল কার্য্যসম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম; যে দিন কোন কারণে তাঁহার সঙ্গ না পাইয়া আমাকে একা আসিতে হইত, সে দিন কোথায় যেন কিছু ফাঁক পড়িয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইত; ছয় বৎসরমাত্র অতীত না হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সহসা তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশার্থ আমাকে আহ্বান করিবেন, তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। Bengal Academy of Litera-

ture যখন বিজাতীয় নাম ও বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়, সেই দিন হইতেই রজনী বাবুর সহিত পরিষদের নিতান্ত আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। রজনী বাবুর সহিত পরিষদের কত দূর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা পরিষদের প্রাচীন সদস্যমাত্রেই অবগত আছেন; পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুস্বরূপে তিনি সদস্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; বঙ্গ সাহিত্যের অনুরক্ত ভৃত্যস্বরূপে তিনি বঙ্গের সাহিত্য-সমাজের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার সহিত তাঁহার অন্তরূপ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল; কলিকাতার মধ্যে তাঁহার ন্যায় আত্মীয় আমার দ্বিতীয় ছিল না; এবং এই স্থানে আমি পরিষদের সদস্য ও পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে দণ্ডায়মান হইলেও আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিহার করিয়া কোন কথা বলা নিতান্ত কঠিন। আমার উক্তির অধিকাংশই আমার ব্যক্তিগত কথা; আশা করি, পরিষদের সদস্যগণ তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালার নিম্নশ্রেণীতে যখন আমি অধ্যয়ন করিতাম, আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে dictation দেওয়া হইতেছিল। কয়েক দিন পরে দেখিলাম, সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমাদের বাড়ীতে তক্তপোষের উপর পড়িয়া আছে। পুস্তিকাখানির নাম দেখিলাম জয়দেবচরিত, গ্রন্থকারের নাম শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া ভাল বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু উহার বিজ্ঞাপনটা পড়িয়া মনের মধ্যে কিরূপ একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আজ প্রায় ২৭।২৮ বৎসর পরে ঠিক মনে আসিতেছে না। এই ঘটনার পাঁচ ছয় বৎসর পরে, যখন আমি ইংরাজী স্কুলের নিম্ন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম, তখন বাঙ্গালা বহি, বাঙ্গালা কাগজ পড়া আমার রোগের মধ্যে ছিল। সেই সময়কার একখানা বান্ধব পত্রিকায় একটা তীব্র ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করি। ইংরাজেরা আমাদের দেশের যে ইতিহাস লেখেন ও সেই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় যে সকল ইতিহাস রচিত হয়, তাহা অনেক বিষয়ে ভ্রমপূর্ণ ও পক্ষপাতদোষদুষ্ট, প্রবন্ধে এইরূপ সমালোচনা ছিল। এই কথাটা আমার নিকট তখন সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইংরাজের লেখা ইতিহাসে যে আবার ভুল থাকিতে পারে, এ কথা তখন জানিতাম না। বড় বড় পণ্ডিতে ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যে আবার পক্ষপাত করিয়া মিথ্যা কথা লিখিতে পারেন, মানবচরিত্রের এই

অঙ্গ আমার নিকট তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। যে ইতিহাস মুখস্থ না হইলে মাষ্টার মহাশয় প্রহার করেন, তাহাতে যে আবার ভুল আছে, ইহাও নিতান্ত কৌতুককর বোধ হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধেরই শেষভাগে উল্লিখিত দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, যাঁহার নামের সহিত পূর্ব্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, সেই রজনীকান্ত গুপ্ত প্রচলিত ইতিহাসের ভ্রমখণ্ডন করিয়া সিপাহীযুদ্ধের বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার সংকল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুবৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হইবে, তাহাতে বৈদেশিকগণের ভ্রম প্রদর্শিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের নানা কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইবে, এই চিন্তায় আমার বালক-হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। এক দিন সহসা দেখিলাম, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের খণ্ডশঃপ্রকাশিত প্রথমভাগ রজনী বাবুর অন্যতম বন্ধু ও আমার নিতান্ত আত্মীয় বাঁকীপুরের বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক পিতাঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। আগ্রহসহকারে আমি সেই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; একবার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না, পুনঃপুনঃ পাঠ করিলাম। গ্রন্থের ওজস্বিনী ভাষা ও বিষয়বর্ণনায় গ্রন্থকারের অনুরাগ ও উৎসাহ আমাকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা দেখি নাই, বিষয়বর্ণনায় গ্রন্থকারের এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বে দেখি নাই। সত্যের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিতে পাইলাম। গ্রন্থপাঠ করিয়া যেন গ্রন্থকারেরও চরিত্র চোখের উপরে দেখিতে পাইলাম; গ্রন্থপাঠে যে গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না। কতবার আমার বাল্যবন্ধুগণকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়া শুনাইতাম; আমি স্বয়ং যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, সেই আনন্দভোগে অপরকে অধিকারী করিয়া আরও আনন্দ পাইতাম।

তাহার পর তিন চারি বৎসর অতীত হইল। আমি যেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, রজনী বাবু সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আমি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে কি না অনুসন্ধানে বাহির হই। আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকের আমি তাহার পূর্ব্বে অনুসন্ধান লই নাই। সে

দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাড়ী দোকানের বাহিরে ফুটপাতের উপর সন্ধ্যার পর গুরুদাস বাবু মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন আশাপ্রদ উত্তর পাইলাম না। তখন নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিলাম। এই সময়ে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনের উপরে, বঙ্গবাসীর কার্য্যালয় ছিল। রজনী বাবু তাঁহার চাঁপাতলার বাসা হইতে মাঝে মাঝে চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন দিয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে যাইতেন। ঐ লেনে আমার বাসা হইতে আমি রজনী বাবুকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতাম। বঙ্গবাসী কাগজে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যাহা কিছু বাহির হইত, যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। ঐ সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া আর্য্যকীর্ত্তি প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে শুনিবামাত্র একখানা কিনিয়া আনিয়া পাঠ করি। রাজপুত ও শিখ ও মারাঠার বীরত্বকাহিনী রজনী বাবুর স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণিত হইয়া মনের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া দিত। আমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থে এই সকল কাহিনীর কোন উল্লেখ থাকে না, এই জন্য স্কুলপাঠ্যগ্রন্থের রচনাকারীদিগকে মনে মনে কতই ভর্ৎসনা করিতাম।

প্রেসিডেন্সি কালেজে আমার পঠদ্দশার শেষসময়ে রজনী বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ঘটে। অখিল মিস্ত্রীর লেনে পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর বাসায় তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি আমি তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; পরিচয়ের পর তাঁহার চরিত্রসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে এই সভাস্থলের অনেকেই মুগ্ধ ছিলেন; তাহার সম্বন্ধে আমার বাগ্‌বাহুল্যের কোন প্রয়োজন নাই।

রিপণ কালেজে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া অবধি আমি রজনী বাবুর প্রতিবেশী ছিলাম; পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুতায় ও বন্ধুতা ক্রমশঃ আত্মীয়তায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রকৃতির কোন অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না; তাঁহার সঙ্গ আমার বিদেশপ্রবাসের সর্ব্বপ্রধান আনন্দ ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়, অন্ততঃ তাঁহার মনের মধ্যে ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ রোগের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

স্বাস্থ্যভঙ্গের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম। তিনিও দুই এক জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট সে আশঙ্কা প্রকাশ করেন নাই! এমন কি, তাঁহার নিজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথা জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিতেন। গত শীতকালের অবসানে বাইসাইকল অভ্যাসের চেষ্টা করিতেন। কচিৎ বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া ওজন হইয়া আসিতেন।

তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্য কিছু ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গৃহের উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীটির পূর্ণতাসাধনের জন্য অকাতরে পুস্তকসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গত বৎসর পূজার পর গয়াধামে গিয়া পিতৃকৃত্য সমাধান করিয়া আসেন। কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলিতেন, পরিবারবর্গের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই কাশীবাস করিবেন। তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসখানি শেষ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে তিনি পরিষদের অপর চারি জন সদস্যের সহিত পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ ভূমি-প্রার্থনায় কাশীমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুরের সমীপে যাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে, তাঁহার হাতে একটা সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। আমার সঙ্গে তাঁহার প্রত্যহই দেখা হইত। কিন্তু সেই ব্রণের বিষয় আমিও জানিতাম না। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে আরও গোটা তিন ব্রণ হয়। তৎপরে পিঠে একটা ব্রণ উঠিয়া কিছু দিন কষ্ট পাইয়াছিলেন। ২১শে বৈশাখ ও ৩১শে বৈশাখ তিনি সেই পৃষ্ঠব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পত্র লেখেন। ৩১শে বৈশাখের পর আর তাঁহার পত্র পাই নাই। ঐ পত্রের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—"উহা সাধারণ ফোড়া বলিয়া বোধ হয় না; ডাক্তার বলেন carbuncular boil. এইরূপ কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। ঘা ভাল হইলে একবার বাড়ী যাইব। কারণ সর্ব্বাগ্রজ মহোদয় বাড়ীতে বড় পীড়িত অবস্থায় আছেন। ১০।১২ দিনের পর বাড়ী হইতে ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। শরীর ভাল থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব।"

ইহার পর সিপাহী যুদ্ধের শেষ ভাগের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া তিনি

বাড়ী যান। কার্ব্বঙ্কল সহিত বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা লইয়া ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আসেন। তখন আর জীবনের আশা ছিল না।

রজনী বাবু বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ী আসিবেন, আমি ও আমার বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্রভাবে এই প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, আমাদের সেই আশা আর পূর্ণ হইবার নহে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনীবাবু ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল। সাহিত্যসমাজে রজনী বাবুর স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সম্পাদিত কার্য্যের সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। অন্যে সেই ভার গ্রহণ করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার একান্ত অনুগত সুহৃৎকে হারাইয়াছে। পরিষদের জন্য তিনি যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বোধ করি আর কেহ করেন নাই। পরিষদের ভবিষ্যৎচিন্তায় তিনি যে পরিমাণ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, বোধ করি, আর কেহ তাহা করেন নাই। তিনি যে কার্য্যে হাত দিতেন, শ্রদ্ধার সহিত ও অনুরাগের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম অনুরাগ পৃথিবীতে অতি বিরল সামগ্রী। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই সেই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছেন। আমি অনর্থক বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব না। *

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কমলা।

১

বিনোদপুরের বামনদাস বিদ্যারত্ন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিনোদপুর বরিশাল জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম। বিদ্যারত্ন সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আমরা প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। বামনদাস শাস্ত্রব্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই বাড়ীতে আসিয়া একটি টোল

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

খুলিয়াছিলেন; তাহাতে আট দশটি ছাত্র অধ্যয়ন করিত। বলা বাহুল্য, বামনদাস কেবল তাঁহাদিগকে বিদ্যাদান করিতেন, এমন নহে; সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানও করিতে হইত। ব্রাহ্মণের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পৈতৃক কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমিই তাঁহার সম্বল। আর সময়ে সময়ে শ্রাদ্ধাদিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদায় মিলিত। বামনদাসের সময়ে পল্লীগ্রামের পণ্ডিতদিগের প্রতি গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, উপাধিপরীক্ষারও সৃষ্টি হয় নাই। এ দিকে বর্ণিত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই দেশে হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনাস্থার স্রোতঃ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং শ্রাদ্ধাদিতেও তেমন প্রাপ্তি ছিল না। আজ কাল দেখিতে পাই, দু' এক স্থলে কেহ পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় করিলে সংবাদপত্রে তাহা সৎকর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত সংবাদপত্রের জন্মের বহুপূর্ব্বে বঙ্গের এক এক শ্রাদ্ধে যে বিপুল অর্থরাশি ব্যয়িত হইত, তৎসমুদয়ের লিপিবদ্ধ ইতিহাস না থাকিলেও, জনশ্রুতি তাহা সহজে ভুলিতে দিবে না। আজ কাল বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণকারবিদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে!

বস্তুতঃ বামনদাস বড় অসময়েই অধ্যাপনাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার অন্নসংস্থানের সহায়তা করা দূরে থাকুক, বরং ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। ছাত্রগুলি না থাকিলে তাঁহার সামান্য আয়েই ক্ষুদ্র পরিবারের ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কিন্তু কৌলিকপ্রথানুসারে অধ্যয়নার্থ ছাত্র আসিলেই বামনদাস সাদরে তাহাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহও করিতেন। উহাদের জন্যই আমার আর্থিক কষ্ট, এমন কথা কখনই তাঁহার মনে আসিত না। ব্রাহ্মণ তাঁহার দরিদ্রতাতেই সন্তুষ্ট। তাঁহার মনে শক্তি ছিল, কিন্তু হিংসা ছিল না। সংসারে কত নিরেট মূর্খ পা ছড়াইয়া বসিয়া অর্থের অপব্যবহার করিতেছে বলিয়া কখনও তাঁহার মনে কষ্টের উদয় হয় নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণী অতিশয় গুণবতী ছিলেন। ছাত্রগণ সকলে শিষ্ট শান্ত এবং অধ্যাপকের অতিশয় বাধ্য ছিল। সে সময়ে লোকের ভরণপোষণের ব্যয়ও বর্ত্তমান কালের ন্যায় অধিক ছিল না। বামনদাস জমিতে ধান পাইতেন। শাকশব্‌জি বাড়ীতে জন্মিত। তিন চারিটি গাভী ছিল, দুগ্ধ প্রায়ই কিনিতে হইত না। ব্রাহ্মণী সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিতেন; ছাত্রেরা যথেষ্ট সাহায্য করিত। প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে তাহারা জল তুলিয়া দিত, এবং বাড়ীর শুকনো গাছপালা হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত। হাটে বাজারে তাহারাই যাইত, এবং

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতে লজ্জা বোধ করিত না। অনেক সময়ে তাহারা গাভীগুলিরও সেবা করিত, এবং তাহাদিগকে তৃণদূর্ব্বা আহার দিত। পরিচ্ছদ পরিবারস্থ সকলেরই সামান্য ছিল। অলঙ্কারের আড়ম্বর ত ছিলই না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে জামা জুতার প্রচলন তখনও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। বামনদাস চিরদিনই ধুতিচাদর এবং সময়ে সময়ে চটিজুতামাত্র ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। এখনী যেমন শুনিতে পাই, বড়লোকের বাড়ীতে ধূলিপায়ে প্রবেশ-অপরাধে কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে মর্ম্মান্তিক অপমান সহ্য করিতে হয়, বামনদাসের সময়ে কাহাকেও এরূপ ভাবে লজ্জিত হইতে হয় নাই।

আমরা বামনদাসের ক্ষুদ্র পরিবারের কথা কহিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কয় জন লোক, তাহা বলা হয় নাই। বামনদাসের এক পুত্র, এক কন্যা; ব্রাহ্মণীর নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পরের অধ্যায়ে আমরা যে সময়ের কথা বলিব, তখন পুত্রটির বয়স দশ বৎসর, এবং কন্যাটির পাঁচ বৎসরমাত্র।

২

বামনদাসের পুত্রের নাম প্রিয়নাথ, কন্যার নাম কমলা। প্রায় দুই বৎসর হইল, প্রিয়নাথের উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। এই উপনয়ন-উপলক্ষে বামনদাস কিছু ঋণী হইয়াছেন। গ্রাম্য মহাজন ভৈরব তাঁহার উত্তমর্ণ। ভৈরব মহাজন-জাতীয় লোক। নিজের জীবনে বাল্যে ও যৌবনে পরিশ্রম ও প্রতারণা এবং প্রৌঢ়াবস্থায় পরের রক্তশোষণ করিয়া সে অনেক অর্থের অধিকারী হইয়াছে। তাহার বাড়ী এখন অট্টালিকা। বিনোদপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী দু'চারিখানি গ্রামের অনেক দরিদ্রের জমাজমিই তাহার হস্তে আসিয়াছে। গ্রাম্য লোকের অনেকেই পরোক্ষে এখনও ভৈরব কয়াল বলিয়া তাহার নামোল্লেখ করিলেও সমক্ষে সকলেই প্রায় ভৈরব বাবু বলিয়া থাকে। বামনদাস দেড় বৎসর পূর্ব্বে ইহারই নিকট হইতে এক শত টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। এখন তাহা সুদে আসলে প্রায় দেড়শত টাকা হইয়াছে। মধ্যে ভৈরববাবুর সহিত বামনদাসের কিছু মনান্তর হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক কোন এক বিষয়ে ভৈরব তাহার নিকট হইতে এক শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থা আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হন নাই। এই ঘটনার পর হইতেই বামনদাস মনে করিতেছিলেন, ভৈরবের টাকা শোধ করা অতি শীঘ্র কর্ত্তব্য;

এবার তিনি শারদীয়া পূজার কিছু কাল পূর্ব্বেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ বড়ই সমৃদ্ধিশালী জেলা। এখানে যত ধনী জমিদার বাস করেন, বাঙ্গালার অন্য কোন জেলায় তত নাই। জমিদারদের মধ্যে অনেকেই পূজার সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে বার্ষিক বিদায় দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্রাহ্মণ ময়মনসিংহ সহরে এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে সঙ্গতিপন্ন হিন্দু সন্তানদিগের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও কিছু কিছু অর্থ প্রাপ্ত হন। বামনদাস পূর্ব্বে দু'একবারমাত্র ময়মনসিংহে গিয়াছেন, এবং জমিদারবাড়ী হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন; অন্যরূপ ভিক্ষা করেন নাই। জমিদারদিগের বাড়ীতে শাস্ত্রীয় বিচার ব্যাখ্যা প্রভৃতি হয়, এবং যাহার যেরূপ শাস্ত্রপারদর্শিতা, তিনি সেইরূপ বিদায় পাইয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এরূপ বিদায় বড়ই শ্লাঘ্য মনে করেন। অবস্থানুসারে বামনদাস এবার ভিক্ষা করিবেন কৃতসংকল্প হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ পঁহুছিতে বামনদাসের সাত দিন সময় লাগিয়াছিল। ময়মনসিংহ সহরে কতকগুলি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইঁহাদের কেহ কেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক; আর কেহ কেহ পৌরোহিত্য করিতেন। স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকে দুটি অন্ন দিতে ইঁহাদের কেহই কুণ্ঠিত নহেন। বামনদাস ইঁহাদের এক জনের বাসায় অতিথি হইলেন।

পূর্ব্বে কখনও ভিক্ষা করেন নাই বলিয়া বামনদাসের ভিক্ষায় বাহির হইতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। প্রাতঃস্নান সমাপ্ত করিয়া একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া তিনি বাসা হইতে বাহির হইলেন, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া একজন ব্রাহ্মণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভিক্ষায় উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন। এক স্থানে কয় দিন যাইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। যেরূপ জবাব পাইবেন, তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে, পুনরাগমনে ফল হইবে কি না। অনেকের মুখের কথা রুক্ষ হইলেও অন্তর ভাল, এবং দানের প্রবৃত্তি আছে। কেহ কেহ খুব মুখের মিষ্টতা দিয়া রিক্তহস্তে বিদায় করিবেন। যাহারা সহরের নিত্য অধিবাসী, অর্থবান হিন্দু, তাহাদের নিকট প্রায়ই কিছু কিছু পাইবেন। ইংরাজীওয়ালা বাজে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে দুই এক জন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মেজাজ চড়া। তাঁহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহেন বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা অল্প। নিরাশ হইবার

আশঙ্কা থাকিলে, ইঁহাদের বাসাতেই প্রথমতঃ যাওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিজেই শেষে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন, ইত্যাদি। বামনদাস প্রথমেই এক জন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছেন। বামনদাস বাহিরে কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন; ভাবিলেন, চা পান শেষ হইলেই দর্শনের প্রশস্ত সময় হইবে। বাবু কি বলিয়া উঠেন, কেবল এই ভাবনাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। বাবুর চা পান শেষ হইলে বামনদাস সাহসে ভর করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং অতিবিনীতভাবে কহিলেন, "ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ।" গৃহস্বামীর মেজাজ ভাল ছিল না। তিনি রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "এখানে কিছুই হইবে না। অন্যত্র দেখুন।" বামনদাস বাক্যব্যয় না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াও তিনি ফললাভ করিতে পারিলেন না। সেখানে বাবু বাক্যের সহিত কিছু বিদ্রূপ মিশ্রিত করিয়া কহিলেন, "আমরা নিজেরাই ভিক্ষার্থী, বিদেশে চাকরী করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করি। ভিক্ষা দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। জমিদারদের বাড়ীতে যান।" তৃতীয় বাসায় যাইয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সেখানে দুইটি বাবু একত্র বসিয়া আছেন; কে গৃহস্বামী, কে আগন্তুক চিনিতে না পারায়, বামনদাস উভয়ের নিকটেই প্রার্থনা জানাইলেন,—"শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কিছু ঋণী হইয়াছি। সেই ঋণ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত আপনাদের দ্বারস্থ।" বাবুদ্বয় বিরক্ত হইয়া, "যান, অন্য সময়ে আসবেন, দেখা যাবে," বামনদাসের সাক্ষাতে এইমাত্র বলিয়া তিনি বাহির হইতে না হইতেই এক জন আর এক জনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এ যায়গাটির এই এক ভয়ানক দোষ। পূজা আসিতেছে— এত ব্রাহ্মণ আসিয়া বিরক্ত করিবে—আর তার সময় নাই অসময় নাই, স্থান নাই অস্থান নাই, আপনি এসেছেন বেড়াতে—সে জ্ঞানই নাই—" ইত্যাদি। কথাগুলি বামনদাসের কাণে গেল। অন্য স্থানে যাইতে আর তাঁহার পা উঠিল না। মনে করিলেন, আজ আমার যাত্রাই খারাপ হইয়াছে। কাল আর এক জনের সঙ্গে বাহির হইব। বামনদাস বাসায় ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া শুনিলেন, বাড়ী হইতে তাঁহার একখানি চিঠি আসিয়াছে। চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই ব্রাহ্মণ মর্ম্মাহত হইলেন। যেখানে দাঁড়াইয়া চিঠি খুলিয়া-

ছিলেন, সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পত্রের মর্ম্ম পরের অধ্যায়ে পাঠককে জানাইতেছি।

৩

যে ভৈরব কয়ালের টাকার জন্য বামনদাস জীবনে আপনাকে প্রথম ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ভৈরব সেই টাকার জন্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে আদালতে এক ডিক্রী হাসিল করিয়াছেন। সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-প্রদানে অসম্মতি দিয়াই বামনদাস ভৈরবের কোপানলে পতিত হন। তিনি ভিক্ষার্থ ময়মনসিংহ যাইবেন, ভৈরব এ কথা শুনিয়াছিল; এবং তাঁহার গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়াই সে এক (অস্থাবর সম্পত্তির) ক্রোক বাহির করিয়া আনে। বামনদাস যে দিন বাড়ী হইতে যান, তাহার তিন দিন পরেই একদিন বেলা এক প্রহর অতীত হইলে ভৈরবের লোক জন আদালতের পেয়াদা লইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসে। বামনদাসের ব্রাহ্মণী তখন স্নানার্থ নিকটস্থ জলাশয়ে গিয়াছেন। বালক বালিকা বাড়ীতেই খেলা করিতেছে। অন্য লোক কেহই নাই। সহসা এতগুলি লোকের আগমন দেখিয়া প্রিয়নাথ তাহার জননীকে সংবাদ দিতে গেল। ভৈরবের লোকগুলি পেয়াদা সম্মুখে রাখিয়া গৃহের যথাসর্ব্বস্ব বাহির করিয়া উঠানে আনিয়া রাখিতে লাগিল। কমলা বালিকা হইলেও 'তোমরা কি কর কি কর?' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার জননী এবং অগ্রজ ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী বাড়ীর পশ্চাদ্দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন। ভৈরবের একটি লোক সে দিকে দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিল, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতা ব্রাহ্মণীর কক্ষে একটি পিত্তলের কলসী, এবং দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষুদ্র চুপড়ীতে রন্ধনের নিমিত্ত প্রক্ষালিত তণ্ডুল রহিয়াছে। সে কহিল, 'ও গুলি নাবান্।' বামনদাসের গৃহিণী বাক্যব্যয় না করিয়া জলের কলসী ও চালের চুবড়ীটি তথায় রাখিয়া দিলেন। ভৈরবানুচর জল ঢালিয়া কলসীটি এবং চালশুদ্ধ চুপড়ীটি আনিয়া বাহির-বাটীতে হাজির করিল। ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত হইলেন। সেই আর্দ্রবস্ত্রেই শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, গৃহ একবারেই শূন্য। কিছুই নাই। বাহিরে সমাগত লোকদিগের মধ্যে তাহার নিকট প্রতিবাসী দ্বিজপদ ভট্টাচার্য্যকে দেখিতে পাইলেন, এবং প্রিয়নাথকে দিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। দ্বিজপদ বামনদাস অপেক্ষাও নিরীহ। ব্রাহ্মণী তাহাকে [illegible]

লেন, 'একি ? একি ?' দ্বিজপদ উত্তর করিলেন, 'ভৈরব কয়ালের যে টাকা ধারিতেন, তাহারই জন্ত এই সব লইয়া যাইতেছে। বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিবে।' বামনদাস-গৃহিণী পুনরায় কহিলেন, 'ঘরের চাল ডাল সকলই নিয়াছে। পরিবার কাপড়খানিও রাখে নাই। উঁহারই টাকার জন্তে এবার ভিক্ষা করিবেন বলিয়া গিয়াছেন। পূজার সময়ে বাড়ী আসিয়া বোধ হয় টাকা শোধ করিতে পারিতেন। উহাদের বলিলে এই কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে পারে না ?' দ্বিজপদ কহিলেন, 'আমরা সকলেই বলিয়াছিলাম। ভৈরবের ছেলে—সে ত প্রিয়নাথের কিছু বড়, সেই তাঁকে কত বলেছে, তা কিছুতেই শুনেন না।' ব্রাহ্মণীর আর বাক্য সরিল না। প্রিয়নাথ ও কমলা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। দ্বিজপদ তাহাদিগকে ভুলাইয়া নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং তথায় মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। আহারের সময়ে বালক বালিকা মার জন্ত কাঁদিতে লাগিল। দ্বিজপদের মাতা ভগ্নী প্রভৃতি আসিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন।' কিন্তু ব্রাহ্মণী কিছুতেই আহার করিতে সম্মত হইলেন না, এবং গৃহত্যাগ করিলেন না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সেই আর্দ্রবস্ত্রেই কাটাইলেন। রাত্রিতে তাঁহার জ্বর দেখা দিল। জ্বরের অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া কেবল সেই ক্রোকের কথা বাহির হইতে লাগিল। 'ভাতের চালগুলি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। কাঁকালের কলসী-টার জল ফেলে নিয়ে গেল।' কেবল এইরূপ কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প। আর্দ্রবস্ত্রে বাড়ী আসিয়া অবস্থা দেখিয়াই তাঁহার হৃৎকম্প হইয়াছিল, তাহা আর কমে নাই। তাঁহার স্বভাবগুণে প্রতিবেশিনীর ব্রাহ্মণকন্তাগণ সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। এই বিপদের দিনে অনেকেই আসি-লেন। ব্রাহ্মণী কেবল বলিতে লাগিলেন, 'আমার বুকের কাঁপুনিটা কমিল না। যে ক'দিন ইনি বাড়ী না আসেন, তোমরা আমার প্রিয়নাথকে দেখিবে; আমাকে দেখ্‌বার দরকার নাই।'

প্রতিবাসী দ্বিজপদ এই সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া বামনদাসের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেই চিঠি পাইয়াই বামনদাস হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা উক্ত হইয়াছে।

বামনদাস যে দিন ভৈরবের অত্যাচারের সংবাদ পাইলেন, সেই দিনই বাটী যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে যাইয়া কি দৃশ্য দেখিব, পথে কেবল এই ভাবনাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। বামনদাস সাত দিনে ময়মনসিংহে পঁহুছিয়া

ছিলেন, কিন্তু পাঁচ দিনেই তিনি বাড়ী আসিলেন। পথে তিনি অল্পই বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী শয্যাগতা। তাঁহার পার্শ্বে প্রতিবেশিনী দুই এক জন রহিয়াছেন। গৃহমধ্যে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই। একটি মৃৎপাত্রে পানীয় জল রহিয়াছে। ব্রাহ্মণীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার কথা কহিতেও কষ্ট হয়। ব্রাহ্মণী স্বামীকে দেখিয়াই চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। বামনদাসেরও চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গ্রামের এক কবিরাজ ব্রাহ্মণীকে দেখিতেছিলেন। বামনদাসের আগমনের কিছু কাল পরেই তিনি আসিলেন, এবং রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, 'পীড়া ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠিতেছে।' বামনদাস ব্যাকুল হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিগণ ও চিকিৎসক সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে তাহার মনোবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণী কিছুতেই বাঁচিবেন না; আর তিনিই তাহার মৃত্যুর কারণ। যদি তিনি এরূপ অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে এমন হইত না; এইরূপ বিবিধ চিন্তা তাঁহার মনে আসিতে লাগিল।

সন্ধ্যাসমাগমে প্রতিবেশীরা একে একে বাড়ী যাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক রাত্রের ঔষধ ও শুশ্রূষার উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। ব্রাহ্মণীকে একাকিনী পাইয়া বামনদাস কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী 'কাঁদ কেন, কাঁদ কেন?' বলিয়া প্রশ্ন করায় কহিতে লাগিলেন, 'আমিই ত তোমাকে মারিয়া ফেলিলাম।' 'তোমার কি দোষ?' বলিয়া গৃহিণী স্বামীর চরণে হস্তস্পর্শ করিলেন, এবং কহিলেন, 'তুমি এসেছ, আর আমার মরিতে ভয় নাই। এত দিন মন বড়ই খারাপ ছিল। তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পারলে ভাবনা? ঠাকুরঝিকে খবর দিয়াছি, একবার এলে হ'ত। তাঁর হাতে প্রিয়নাথ আর কমলাকে দিয়া যেতাম্।'

বামনদাসের এক ভগ্নী ছিলেন। বিক্রমপুরে তাঁহার বিবাহ হয়; তিনি বিধবা। পুত্র কন্যা তাঁহার কিছুই নাই। প্রিয়নাথ কমলাকে তিনি বড়ই ভালবাসেন। ব্রাহ্মণী তাঁহারই কথা বলিতেছিলেন।

বামনদাস ব্রাহ্মণীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই চলিলে। আশীর্ব্বাদ করি, পুনরায় যদি নারীজন্ম পাও, যেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহিণী না হও।' ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'যদি নারীজন্ম পাই, যেন তোমাকেই পতিলাভ করি। একদিন তোমার মুখে

একটি অপ্রিয় কথা শুনি নাই। আমার কাজ কর্ম্ম রাঁধাবাড়া সকল বিষয়েই তুমি চিরসন্তুষ্ট।'

ব্রাহ্মণী আর কথা কহিতে পারিলেন না। বক্ষে ও পার্শ্বে ভয়ানক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বামনদাস যথাসাধ্য শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণীর তন্দ্রার ন্যায় একটু নিদ্রা আসিল। বামনদাসও পার্শ্বেই—অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন। সহসা ব্রাহ্মণীর চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'ঐ আবার কয়ালের লোক আস্‌ছে।' বামন জিজ্ঞাসিলেন, 'কই কয়ালের লোক?' ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, 'ঐ যে, দেখ্‌তে পাচ্ছনা?' 'এখানে কেউ নাই' বলিয়া বামনদাস তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। ব্রাহ্মণীর তন্দ্রাভঙ্গ হইল। কহিলেন, 'দেখ, একটা কথা বলা হয় নাই। কয়ালের দেনাটা যত শীঘ্র পার, শোধ করো। সেই দিন থেকে যেমনই একটু তন্দ্রা আসে, অমনই কেবল কয়ালের লোকই দেখি। ধোওয়া চালগুলি হাত থেকে নিয়ে গেল। বাছাদের মুখে আর আমি রেঁধে অন্ন দিই নাই। উঃ—' বামনদাসের বুক ফাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'কা'লই আমি জমি বেচে হ'ক বা যেমন করে হ'ক, ওর দেনা শোধ করে দেবো। তুমি সুস্থ হও। ব্রাহ্মণী আর সুস্থ হইলেন না, প্রলাপ বকিতে বকিতে তাঁহার রাত্রি কাটিল। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান, আর মধ্যে মধ্যে প্রলাপ। প্রলাপের উক্তি প্রায়ই ভৈরবের ক্রোক সম্বন্ধে। 'ওগো ঐ কয়ালের লোক এলো, সব নিয়ে গেল, তা যা'ক, আমার ছেলে মেয়ে একটু সাবধানে রেখো, ওরা বড় ভয় পায়, ওদের যেন ধরে না।' ব্রাহ্মণীর মুখে কেবল এইরূপ কথাই বাহির হইতে লাগিল।

পর দিন প্রভাতে যে দেখিল, সেই বলিল, আজ ইঁহার অবস্থা বড়ই খারাপ। মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বামনদাসের ভগ্নী আসিয়া পঁহুছিলেন। ভ্রাতৃজায়ার নিকটে গেলেই তিনি তাঁহার হাত দুখানি ধরিলেন, এবং আপনার পুত্রকন্যাকে ডাকিলেন। প্রিয়নাথ ও কমলার ক্ষুদ্র হাতগুলি লইয়া তাহাদের পিসীর হাতে রাখিয়া কহিলেন, 'ঠাকুরঝি! আমি ত চলিলাম; উনি যে আর সংসারে থাকিবেন, বোধ হয় না; তোমার পেটে কিছু হয় নি। এদের তুমি বড় ভাল-বাস। তুমিই এদের মানুষ করো। প্রিয়নাথ কমলাকে তোমার হাতে দিয়া যাব,—এই আমার ইচ্ছা ছিল।' ব্রাহ্মণীর চোক দিয়া দরদরধারে জল

অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বামনদাসও এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতিবেশী যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহারাও কাঁদিলেন।

ভৈরব! যদি মানুষের হৃদয় থাকে, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বামনদাসের ব্রাহ্মণী পতিপুত্রকন্যা সম্মুখে রাখিয়া আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দিব্যজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন; দরিদ্রতার নিপীড়ন ও অপমান হইতে এ জন্মের মত নিষ্কৃতি পাইলেন।

৪

অল্পকালমধ্যেই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণেরা মৃতদেহের সৎকারের উদ্যোগ করিল, এবং শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিল। বামনদাস ও প্রিয়নাথ শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চলিলেন। কমলা তাঁহার পিসীর কাছে বাড়ীতে রহিলেন। কিন্তু তাহাকে রাখিতে তাহার পিসী ও প্রতিবেশিনী দুই একটি ব্রাহ্মণকন্যার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। পাঁচ বৎসরের বালিকা যখন সরল অথচ কাতরভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল, মাকে অমন করে বাঁধলে কেন? মাকে ওরা কোথায় নিয়ে যায়? মা কখন ফিরে আস্‌বে? তখন সমাগত নারীগণ সকলেই আপন আপন চক্ষের জল চাপিয়া রাখিয়া দু'একটি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শেষে আবদার আরম্ভ করিল, 'দাদা, বাবা মা'র সঙ্গে গেল—আমিও যাই, পিসীমা তুইও চল্', তখন বামনদাসের ভগ্নী অতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা হয়ত কারণ না বুঝিয়াই পিসীর কান্নায় যোগ দিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া বালিকা যেন আপন মনে কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা যদি না আসে আমি পিসীমার কাছে থাক্‌ব' এই বলিয়া সে তাহার পিসীমার ক্রোড়ে মস্তক লুকাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; অল্পক্ষণেই সে নিদ্রার আশ্রয় পাইল। পিসীমা বালিকার চক্ষু হইতে বিগলিত শেষ অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া একখানি বস্ত্র পাতিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন। পুত্রধনে বঞ্চিতা রমণীর অন্তঃকরণ সেই মুহূর্ত্তেই যেন মাতৃস্নেহে ভরিয়া গেল। তিনি পুনঃপুনঃ কমলার মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বালিকার মুখে দু' একটি মাছি বসিতেছিল, অঞ্চল দ্বারা তাহা তাড়াইতে লাগিলেন। যাঁহারা শৈশবে মাতৃহীন হইয়া অপত্যহীন পিসী কি মাসীর স্নেহে পালিত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, জগতে এ স্নেহও সামান্য নহে।

প্রিয়নাথ ও তাহার পিতার শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। বামনদাস আসিয়াই ভগ্নীকে কহিলেন, 'আমার জ্বর হইয়াছে।' ভগ্নী শিহরিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, 'বালাই, জ্বর হয় নাই। মনের কষ্টে শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে।' ভ্রাতা পুনরায় বুঝাইলেন যে, বাস্তবিকই তাঁহার জ্বর হইয়াছে। ভগ্নী তখনও যেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। পল্লীগ্রামের অনেকের মনের ধারণা, কাহারও সৎকার করিতে গিয়া শ্মশান হইতে জ্বর লইয়া আসিলে সে জ্বর প্রায়ই সাংঘাতিক অথবা দুরারোগ্য হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের বলেই বামনদাসের ভগ্নী ভ্রাতার জ্বরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন, এবং পুনঃপুনঃ তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু শেষে যখন অগ্নিস্পর্শ ইত্যাদি করিয়া বামনদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তিনি বড়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বামনদাসের শরীর বিলক্ষণ গরম হইয়াছিল। তাঁহার কম্প হইতেছিল। ঘরে শয্যা অতি অল্পই ছিল। যে সামান্য গাত্রবস্ত্র ছিল, তাহা সমস্ত ব্যবহার করিয়াও বামনদাসের শীত ভাঙ্গিল না। তিনি কহিলেন, 'দিদি আমার জন্য বারাণ্ডায় একটু আগুন করিয়া দাও।' অগ্রজা তাহাই করিলেন।

প্রিয়নাথ কমলার পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বামনদাস ও তাঁহার ভগ্নী সে রাত্রি প্রায় জাগিয়াই কাটাইলেন। মধ্যরাত্রে বামনদাস একবার ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সে ত বলেই গেছে—আমিও বলে যাই, প্রিয়নাথ কমলা তোমারই। তোমাকেই ওদের মানুষ কর্ত্তে হবে। ছেলেটা বাঁচলে বাবার নামটা থাকবে, পূর্ব্বপুরুষেরা এক এক গণ্ডূষ জল পাবেন।' তাঁহার দিদি কহিলেন, 'ও কি কথা? জ্বর হয়েছে—সেরে যাবে।' 'না দিদি, এ জ্বর সারিবার নয়' বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিয়াই বামনদাস যেন তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রতিবেশীরা সকলেই পরামর্শ দিল, বামনদাস কিছু দিন তাঁহার ভগ্নীর বাটীতে গিয়া থাকুন। ভগ্নীরও সেই মত হইল। সেই দিনই বামনদাস ভৈরব কয়ালের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্রহ্মত্র জমির অনেকটা বিক্রয় করিতে হইল, ভৈরবই তাহা ক্রয় করিলেন। ক্রোকের দ্বারায় ভৈরব অতি অল্প মূল্যের সম্পত্তিই পাইয়াছিলেন। তাহাতে মোকদ্দমার ব্যয়ও শোধ হয় নাই। সুতরাং ঋণের টাকা সমস্তই জমি বেচিয়া দিতে হইল। বামনদাস তাঁহার সর্ব্বস্ব দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ইহার পরদিনই তাঁহারা সকলে যাত্রা করিলেন। বামনদাসের ভবন শূন্য পড়িয়া রহিল। এক মাস পূর্ব্বে যে ভবন বালক বালিকা ও ছাত্রগণের কোলাহলে পূর্ণ ছিল, আজ তাহা নীরব হইল। নৌকায় উঠিবার পূর্ব্বে বামনদাস একবার শূন্য গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার গণ্ড দিয়া অশ্রু গড়াইল। প্রতিবেশী দ্বিজবরকে কহিলেন, 'ছাত্রেরা কেহ আসিলে আমার অবস্থা ও আশীর্ব্বাদ জানাইও। আর আমি এ জীবনে বোধ হয় কাকেও পড়া'ব না। এখন নিজের পরকালের পড়া কিছু পড়তে পারি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তারা যেন সকলেই মানুষ হয়, আর বিনা ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান কর্ত্তে পারে।'

বাড়ী ছাড়িবার তিন দিন পরে বামনদাস ভগ্নীর আলয়ে পঁহুছিলেন। ভগ্নী প্রাণপণে ভ্রাতার শুশ্রূষা করিলেন, গ্রাম্য কবিরাজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। পীড়ার আরম্ভ হইতেই বামনদাস জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না বলিয়া তাঁহার বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, এইরূপ বিশ্বাসে মানুষের জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। মাতার মৃত্যুর পনর দিনের মধ্যেই প্রিয়নাথ ও কমলা পিতাকেও হারাইল। পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার আশ্রয়স্থল একমাত্র পিসীমা রহিলেন।

প্রিয়নাথ ও কমলার মুখ চাহিয়া বামনদাসের ভগ্নী যেন ভ্রাতৃশোকও ভুলিয়া গেলেন। কেমন করিয়া উহাদিগকে মানুষ করিব, এই চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইল। তাঁহার স্বামীর যে সামান্য জমি জমা ছিল, তাহাতে কথঞ্চিৎ তিনটি প্রাণীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারিত; কিন্তু পিসীর ভাবনা হইল প্রিয়নাথের শিক্ষা লইয়া। কমলার বিবাহের এখনও বয়স হয় নাই।

প্রিয়নাথ বাড়ীতে পিতার নিকট সামান্য সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনেকটা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। বামনদাস ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া পিসীর বড়ই ইচ্ছা, প্রিয়নাথকে সংস্কৃত পড়ান, কিন্তু এই গ্রামে টোল ছিল না। বাড়ীর নিকটে জমিদার হরদেব ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল ছিল। পিসীমা প্রিয়নাথকে সেই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

হরদেব ভট্টাচার্য্যের একটিমাত্র পুত্র। তাহার নাম চারুচন্দ্র। হরদেব প্রধানতঃ চারুচন্দ্রের শিক্ষার জন্যই বাড়ীতেই বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রিয়নাথের পিসী হরদেবের সহিত কথা কহিতেন না। তিনি তাঁহার দূরসম্পর্কীয় দেবর। তিনি একদিন চারুচন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন, 'বাবা চারু! তোমাদের বাড়ীর স্কুলে আমার প্রিয়নাথকে পড়িতে দিতে চাই—উহার মা বাপ কেহই নাই, তোমার বাবা আমার অবস্থা সমস্তই জানেন। তিনি কত গরীবের সাহায্য করেন। তুমি আমার হইয়া বলিও, যেন আমার প্রিয়নাথকে মানুষ করিয়া দেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, চিরদিন তোমাদের নাম করিবে।'

চারুচন্দ্র প্রিয়নাথ অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড়। চারুর স্বভাব বড়ই নির্ম্মল, বড়ই উদার। এই অল্পবয়সেই তাহার বালকত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল, এবং মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছিল। প্রিয়নাথের পিতার পীড়ার সময় চারু কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বামনদাসের মৃত্যুর পর হইতেই প্রিয়নাথের প্রতি তাহার কেমন একরূপ মমতা জন্মিয়াছিল। চারু বলিল, 'জেঠাই মা! প্রিয়নাথের পড়ার জন্যে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমাদের বাড়ীর স্কুলে যত দূর পড়া হয়, ও তাহা অনায়াসে পড়িতে পারিবে। ইহার পরেও উহার পড়ার বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি আজই যাইয়া বাবাকে বলিব।'

চারুর কথা শুনিয়া প্রিয়নাথের পিসী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, এবং কহিলেন, 'বাবা তোমার যেমন মন, তুমি রাজ্যেশ্বর রাজা হবে, চিরদিন সুখে থাক্‌বে, তোমার ছোট ভাই বোন থাকিলে তাদেরও ত ভালবাসিতে, প্রিয়নাথ কমলাকে সেই ভাবে দেখিও।'

রমণীর গণ্ড দিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। 'জেঠাইমা কেঁদ না' বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া চারু বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৫

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চারুর স্বভাব বড়ই উদার। সংসারের সমস্ত লোককেই, বোধ হয়, উদার ও অনুদার, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উদারস্বভাবের লোকেরা আত্মসুখের অন্বেষণ করেন না। ইঁহারা আপনার দ্রব্য পরকে দিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন। অন্যের ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে ইঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমার একটি ভাল জিনিসে অন্যের প্রয়োজন হইয়াছে জানিতে পারিলে, ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা বিসর্জ্জন করিতে পারেন, অথচ অন্যের কিছুতে ইঁহাদের লোভ হয় না। অনুদার স্বভাবের লোক

সাধারণতঃ অন্যের জিনিষটি আত্মসাৎ করিতেই ইচ্ছুক, অথচ নিজের কিছু থাকিলে অন্যের প্রয়োজন শুনিলেই হয় ত তাহা লুকাইয়া রাখে; পরের দোষ দেখিলেই ইহারা শতমুখে তাহার কীর্ত্তন করিতে থাকে, এবং দানের শক্তি থাকিলেও প্রার্থীর দোষ অন্বেষণ করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করে।

কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন,—'শিশুই (পূর্ণবয়স্ক) মানবের জনক।' ইহার অর্থ এই যে, মানুষ কে কেমন হইবে, শৈশবেই তাহার আভাস পাওয়া যায়; কেন না, সেই সময়েই তাহার মানসিক বৃত্তিগুলি গঠিত হইতে ও স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এই জন্যেই বালক বালিকার মধ্যেই আমরা এই উদার ও অনুদার স্বভাব দেখিতে পাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, একই বয়সের দুই প্রতিবেশী বালকের মধ্যে হয়ত এক জন উদার ও এক জন অনুদার স্বভাবের। প্রথমোক্ত বালক একটু খাবার পাইলে দ্বিতীয়কে না দিয়া খাইবে না, তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে। দ্বিতীয় বালকটি এমন অবস্থায় যাহাতে প্রথমের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিবে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ৭।৮ বৎসর বয়স্ক দুইটি সহোদর ভাই একই পুস্তক পড়ে। ছোটটি নিজের পুস্তকগুলি তুলিয়া রাখিয়া প্রায়ই বড়টির পুস্তকগুলি ব্যবহার করে। বড়ভাইয়ের একখানি পুস্তক ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অথচ ছোটটির সেই পুস্তক প্রায় নূতন রহিয়াছে। বড় ভাই কখনই আপত্তি করিত না। ছিন্ন পুস্তক দেখিয়া এক দিন কহিল, 'ছি ভাই! তুমি নিজের বই থাকৃতে সব সময়ে পরের বই নাও কেন?' চতুর অনুজ অনায়াসে উত্তর করিল, 'তুমি কি আমার পর? তুমি ত আমার বড়ভাই।'

ইহাদের মধ্যে বড়টি উদার, আর ছোটটি অনুদার, ইহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

তাই বলিতেছিলাম, চারু বালক হইলেও তাহার উদারতা ছিল। তাহার যেমন স্বভাব, তাহাতে প্রিয়নাথের সম্বন্ধে তাহার পিসীমার অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। চারু আপনিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই পিতৃমাতৃ-হীন বালক বালিকা দরিদ্রা পিতৃস্বসার ভবনে অবস্থান করিতেছে,—কিছুমাত্র সম্পর্ক না থাকিলেও ইহারা সাহায্যের পাত্র। প্রিয়নাথ কমলাকে তিনি ঠিক তাঁহার ছোট ভাই ভগ্নীর মত দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় হরদেব অতি সহজেই প্রিয়নাথের পুস্তকাদির মূল্য ও বিদ্যালয়ের বেতন দিতে সম্মত হইলেন।

প্রিয়নাথের পিসীর বাড়ী চারুদের বাড়ী হইতে অধিক দূরে নহে। প্রিয়নাথের প্রতি চারুর ভালবাসা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে প্রায়ই এক সঙ্গে থাকিতেন। চারুর অনুরোধে প্রিয়নাথকে অনেক দিন তাঁহার বাড়ীতেই আহার করিতে হইত। প্রাতঃকালে দুই জনেই এক সঙ্গে পড়িতেন, স্নান করিবার সময়ে চারু প্রায়ই প্রিয়নাথকে ছাড়িয়া দিতেন না। সন্ধ্যার পরেও উভয়ে চারুর ঘরে বসিয়া পাঠাদি করিতেন, প্রিয়নাথের পিসী প্রিয়নাথকে ডাকিতে আসিলে চারু প্রায়ই বলিতেন, 'ও আমার সঙ্গে খেয়ে আমার কাছেই শুয়ে থাক্‌বে এখন।' জেঠাইমা ফিরিয়া যাইতেন।

প্রিয়নাথের পিসীর বাড়ীর নিকটে চারুদের একটি ফলের বাগান ছিল। গ্রীষ্মকালে চারু প্রায়ই প্রিয়নাথকে সঙ্গে লইয়া আম লিচু কাঁঠাল ইত্যাদি পাড়িতে যাইত। ফলগুলি পাড়া শেষ হইলে চারু প্রত্যহই ঝাঁকায় ভাল ভাল আম ও বড় বড় লিচু কতকগুলি জেঠাইমাকে দিয়া আসিত। জেঠাইমা প্রায়ই বলিতেন, 'বাবা সব ভাল আমগুলি দিয়ে গেলে?' চারু বলিত, 'তা হউক, ঝাঁকায় ঢের আছে। আপনি আমগুলি প্রিয়নাথ ও কমলাকে খাওয়া-বেন ও নিজে খাবেন।'

দানের প্রতিদান স্বাভাবিক, ভালবাসিলে ভালবাসা পাওয়া যায়। তুমি মহৎ, আমি দরিদ্র, তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা। তুমি আমাকে দয়া করিতে পার, দান করিতে পার, আমার দুঃখ দূর করিতে পার, আমি প্রত্যক্ষ কিছু করিতে না পারিলেও তোমাকে অকৃত্রিম ভক্তি উপহার দিতে পারি। চারু প্রিয়নাথ কমলাকে ভালবাসিতেন, দয়া করিতেন, দান করিতেন, তাহারা ভাই ভগ্নী হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত দাসদাসীর ন্যায় তাহার সেবা করিত। প্রিয়নাথ তাঁহাকে বস্তুতঃই প্রভুর ন্যায় সম্ভ্রম করিতেন। কমলা বালিকা, তথাপি সে চারুর দয়া বুঝিতে না পারিত, এমন নহে, এবং সর্ব্বদাই দেখাইতেন যে, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় চারুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

সংসারে অতি পাষণ্ড ব্যতীত বোধ হয় সকলেরই প্রাণে উপকারীর সেবা করিবার একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। প্রিয়নাথের পিসী মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া চারুর তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও কিছু ভাল মিষ্টি, কখনও বা কিছু পিষ্টক স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রিয়-নাথকে বলিতেন, 'বাবা! আজ বৈকালে চারুকে ডেকে এন।' উভয়ে আসিলে রমণী সেই সামান্য দ্রব্য দুই জনকে ভাগ করিয়া দিতেন; এবং চারুকে কহি-

তেন, 'খাও বাবা, সোনার হাতে যবের ছাতু।' চারু মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহা আহার করিতেন, কমলা নিবিষ্টমনে সম্মুখে বসিয়া থাকিত, এবং পিসীমার ব্যক্ত অনুরোধ ও দীনতার সহিত-তাহার নিজের অব্যক্ত অনুরোধ ও দীনতা মিশাইয়া দিত। আহারের পর কিছুকাল গল্প স্বল্প করিয়া হয় ত প্রিয়নাথ ও চারু তাঁহাদের বাড়ীর দিকে যাইতেছেন। চারু তাঁহার হস্তিদন্তরচিত লাঠিখানি ফেলিয়া যাইতেছে, কমলা তাহা লইয়া পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'এই যে আপনার লাঠি।' চারু তাহার মুখে 'আপনার' শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, এবং আহ্লাদে ঠিক আপনার অনুজার ন্যায় হয় ত তাহার গালটি টিপিয়া দিতেন। বালিকার প্রাণ এ আদরে গলিয়া যাইত। বস্তুতঃ সে চারুকে ঠিক দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত; ভালবাসা কি, তাহা অবশ্য সে বুঝিত না; কিন্তু চারু যে তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করেন, ইহা সে বিলক্ষণ বুঝিত, এবং অনেক সময় সে নীরবে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। চারুর প্রত্যেক কার্য্য তাহার নিকট অতি মধুর, এবং তাহার প্রতি কথাই তাহার নিকট অতি মিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। চারু কোন কথা কহিলেই সে তাহা উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিত, এবং তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ সে নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করিত। সরলা বালিকা তাহার সহজ জ্ঞানেই যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছিল, চারুর হৃদয়ে বাক্যে ব্যবহারে বা কার্য্যে কোনরূপ কুটিলতা বা অপবিত্রতা নাই।

৬

প্রিয়নাথ ও কমলা পিসীর বাড়ীতে আসিবার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিসীমার বাৎসল্যে ও চারুর স্নেহে ভাই ভগ্নী অতি সুখেই কাল কাটাইয়াছে। প্রিয়নাথ ও কমলা চারুর সহোদর সহোদরা হইলেও তিনি তাহাদিগকে অধিক যত্ন করিতে পারিতেন না। সহসা চারুর কঠিন পীড়া হইল। এই বৎসর তাঁহার কোষ্ঠীর ফল ভাল ছিল না বলিয়া পিতামাতা পূর্ব্ব হইতেই শঙ্কিত ছিলেন। চারুর রিষ্টিনিবারণার্থ শান্তি স্বস্ত্যয়নেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার জ্বর দেখিয়া পিতামাতা উভয়ে বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চারুর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। চারুর যেরূপ জ্বর হইয়াছিল, তাহার ভোগকাল ছয় সপ্তাহ। চারু পিতা মাতার একমাত্র সন্তান,—তাঁহার রোগ যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তেমনই হরদেব ও তাঁহার ব্রাহ্মণী দুশ্চিন্তায় অতিশয় বিষণ্ণ ও প্রায়

উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। চারুর স্বভাবের গুণে গ্রামস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে ভালবাসিত। পীড়ার বৃদ্ধির সময়ে অনেকেই আপন আপন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, এবং তাঁহার পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দিত। প্রিয়নাথ অহোরাত্র চারুর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিত, এবং যত দূর সাধ্য, তাঁহার কষ্ট অপনোদনের চেষ্টা করিত। তাহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। চিকিৎসক অথবা গ্রামের লোক যে যখনই আসিত, প্রিয়নাথকে চারুর শয্যাপার্শ্বে দেখিত। অন্যে জোর করিয়া তাহাকে স্নান আহার করাইত। চারু যখন তন্দ্রাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় থাকিত, প্রিয়নাথ তখনই তাহার শয়নপ্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িত।

এত যত্ন শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সত্ত্বেও চারুর পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। জ্বর হইবার চল্লিশ দিনের দিন তাহার ভয়ানক বিকারের অবস্থা হইল। এত দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় শরীর অতিশয় শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছিল। গায়ে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বিছানায় মানুষ আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। এই অবস্থাতেও বিকারের জোরে চারু পুনঃপুনঃ উঠিয়া বসিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। যে দেখিল, সেই ভাবিল, জীবনের আশা অতি অল্প। হরদেব ও তাঁহার গৃহিণী ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয়নাথ তখনও সংজ্ঞাহীন হয় নাই; সে চিকিৎসকের হস্ত দুইটি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'আপনি আপনার ঔষধের থলি ঝাড়িয়া একটা বড় ঔষধ দেন।' চিকিৎসক বিষবড়ি প্রয়োগ করিলেন। প্রিয়নাথ অতি কষ্টে সেই ঔষধ চারুর গলাধঃকরণ করাইলেন। চারু নিদ্রিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইলেন, ক্রমশঃ শরীর যেন অসাড় হইতে লাগিল, পা দুটি হিম হইয়া আসিল; চিকিৎসক হাতটি ধরিয়াই বসিয়া আছেন, নাড়ী আছে কি নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তিনি একটু মুখ বাঁকাইলেন। এইবার প্রিয়নাথও শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। একটা মহাকলরব উপস্থিত হইল, বাহিরে দুই এক জন লোক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। সহসা চিকিৎসকের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। তিনি অতিশয় আহ্লাদের সহিত কহিয়া উঠিলেন, 'ঔষধ ধরিয়াছে, নাড়ী পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এ যাত্রা কাটিয়া গেল।'

চারু ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। অনেকেই বলিতে লাগিল,

হরদেব ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর পুণ্যবলেই পুত্র যমঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চারু এখনও অন্ন পথ্য করেন নাই। কবিরাজ যে তেজের ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার দোষনিবারণার্থ এখন চারু অনেক ঠাণ্ডা জিনিষ ব্যবহার করিতেছেন; চিকিৎসক দাড়িম্ব অথবা বেদানার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অসময় ও পল্লীগ্রাম বলিয়া কিছুই পাওয়া যায় নাই।

যে সময় দাড়িম্ব ও বেদানার কথা হয়, বালিকা কমলা তখন চারুর ঘরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রত্যহই চারুকে দেখিতে আসিত। ডালিম পাওয়া যায় নাই শুনিয়াই কমলা বাড়ী ফিরিয়া গেল, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া পিসীমার গৃহের উত্তরস্থ বাগানে প্রবেশ করিল। এই বাগানে একটি দাড়িম্বের গাছ ছিল। কমলা ইহার দুই মাস পূর্ব্বে দেখিয়াছিল যে, গাছে একটি ডালিম ধরিয়াছে। স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ বলিয়া সচরাচর কেহই সেই গাছের নিকটে আসিত না। বালিকা অতি কষ্টে জঙ্গল ঠেলিয়া গাছের নিকটে গেল, এবং দেখিল, একটি ডালে সেই দাড়িম্বটি পক্ক অবস্থায় ঝুলিতেছে। সে কত যে আহ্লাদিত হইল, তাহা বলা যায় না। তাহার ইচ্ছা, অন্যের সাহায্য না লইয়া এই ডালিমটি নিয়া চারুকে দিবে। অনেক কষ্টে ডালটির নিকটে যাইয়া ও তাহা নোয়াইয়া ধরিয়া বালিকা ডালিমটি পাড়িল; কিন্তু তাহার হাত ডালিমের কাঁটায় বাধিয়া বিলক্ষণ কাটিয়া গেল, ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কমলা তাহাতেও কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিল না। ডালিমটি লইয়া ঘরে আসিয়া পিসীমার অজ্ঞাতে একটু নেকড়া ভিজাইয়া হাতে বাঁধিল, এবং তাড়াতাড়ি চারুদের বাড়ীতে গেল। চারুর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়নাথকে কহিল, 'দাদা, আমি একটি ডালিম আনিয়াছি।' কথাটি চারুর কানে গেল। চারু অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন; তিনি মুখ ফিরাইয়া কমলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'কমল! কেহ ডালিম পাইল না, তুমি কোথায় পাইলে?' কমলা বলিল, 'আমাদের গাছে এই একটি ডালিম ছিল।' সহসা কমলার হাতের দিকে চারুর দৃষ্টি পড়িল। হাতে কি হইয়াছে বলিয়া প্রশ্ন করায় বালিকা লজ্জায় কোন উত্তর দিল না। চারু তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন, কমলা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহার নিকটে গেল। চারু তাঁহার রোগক্লিষ্ট হস্ত দ্বারা কমলার হাতের বস্ত্রখণ্ড উন্মোচন করিলেন, এবং দেখিলেন, হাতটি

যাইয়া হাতটি এমন করিয়া কাটিয়াছ ?' কমলা লজ্জায় মুখটি আরও নত করিল, এবং নীরবে বুঝাইয়া দিল, এ যেন কিছুই নহে। কেন বলিতে পারি না, প্রিয়নাথ এই দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না, এবং মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চারু ও কমলাকে একত্র রাখিয়া তিনি কোনও কার্য্যের ব্যপদেশে বাহিরে চলিয়া গেলেন। চারু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কমল, তুমি কি আমাকে দেখিতে আসিতে ?' কমলা উত্তর করিল, 'আমি প্রত্যহই আসিতাম, কিন্তু অনেক লোক দেখিয়া আপনার নিকটে আসিতে পারিতাম না।' বালিকা তাহার মুখটি অবনত করিল।

৭

পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরে চারুর জীবনে দুই অতি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চারু আরোগ্য হইবার পর ছয় মাস না যাইতে যাইতেই তাঁহার পিতার কাল হইয়াছে, এবং হরদেবের মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের তালুকটি পদ্মা নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় পদ্মার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নদী আর নাই। ইহার গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মনুষ্যের ভাগ্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পদ্মা আজ হয় ত কাহারও তালুক ভাঙ্গিয়া লইল, কাল হয় ত কাহারও ভাঙ্গা তালুক জাগাইয়া দিল। এক জনের অবস্থার অবনতি ও অন্যের উন্নতি হইল। চারু পিতৃহীন হইয়া মানুষিক দুর্জ্জয় কষ্ট সহ্য করিলেও পদ্মার প্রকোপেই তাহাকে প্রায় ভিখারী হইতে হইল। এক তালুকের আয়েই ইহাদের সংসারযাত্রা সচ্ছলরূপে নির্ব্বাহিত হইত ; নদী তাহার সমস্তই গ্রাস করিল। দুই চারি মাস চারু তেমন কষ্ট পাইলেন না বটে, কিন্তু কিছুকাল পরেই সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া আসিল ; চারু বিষম দারিদ্র্যে পড়িলেন। গ্রামে এমন লোক নাই, যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে। বিশেষতঃ কিছুকাল পূর্ব্বে চারুর পিতাই অনেককে সাহায্য করিয়াছেন, অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হইতে চারুর অভিমানে ভয়ানক আঘাত লাগিবার কথা।

বিপদ একা আইসে না, ইহা অনেকেই কহিয়াছেন। চারুর সংসারে একমাত্র তাঁহার জননী। ব্রাহ্মণী পতিশোকেই অতিশয় বিষণ্ণা হইয়াছিলেন। ভূসম্পত্তি ধ্বংস হইবার পর তিনি পাগলিনীর ন্যায় হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক রোগ দেখা দিল। মাতার শুশ্রূষার জন্য চারুর বাড়ী না থাকিলে চলে না—এ দিকে অন্নচিন্তাও বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি

পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জিনিষপত্র অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রয় করিলে হয় ত তাঁহার অনেক দিন চলিতে পারিত, কিন্তু তাহা করিতে চারুর কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। যেরূপে পারি, স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও জননীর উদরপোষণ এবং যত দূর সাধ্য পারিবারিক গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব, কেবল এইরূপ চিন্তাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। কিছু দিন চেষ্টা করিয়া চারু নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বেতন দিয়া তাঁহার পিতা দুই তিন জন শিক্ষক রাখিয়া গিয়াছেন, এখন চারুকে সেইরূপ পদ গ্রহণ করিতে হইল।

প্রিয়নাথ, কমলা ও তাহার পিসী চারুর উপকার ভুলেন নাই। তাঁহারা তিন জনেই যত দূর সাধ্য চারুর সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। কমলা ও তাহার পিসী অনেক সময়েই চারুর বাড়ীর সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতেন। মাতা অশক্ত হইলেও চারুকে কখনও নিজে রন্ধন করিতে হয় নাই। কমলা এখন আর বালিকা নাই। বাঙ্গালীর কন্যা যে বয়সে যৌবনসীমায় পদার্পণ করে, তাহার সেইরূপ বয়ঃক্রম হইয়াছে। কমলা রন্ধন, পরিবেশন, গৃহ-মার্জ্জন প্রভৃতি সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সমস্তই শিখিয়াছে। সে প্রায় সর্ব্বদাই চারুর মায়ের কাছে থাকিত, এবং অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিত। ভৃত্য অনুপস্থিত থাকিলে চারু বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কমলা তাঁহার পা ধুইবার জল, এবং গামছাখানি গুছাইয়া রাখিত।

কমলা এখন চারুর সমক্ষে প্রায়ই বাহির হইত না। পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন-ভাবে সে তাঁহার সহিত কথাও কহিত না। তাহার অন্তরে লজ্জার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। চারুকে সে যেমন দেবতার ন্যায় দেখিত, এখনও তাহাই দেখে, কিন্তু তথাপি নিকটে যাইতে যেন সাহস করে না। চারু তাহার এই ভাব লক্ষ্য না করিতেন, এমন নহে।

একদিন বিকালে কার্য্যস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারু দেখিলেন, তাঁহার জননী একাকিনী রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন; 'মা, তোমার কাছে কেহ নাই?' জননী উত্তর করিলেন, 'কমল ছিল,এই উঠিয়া যাইতেছে। বাবা, পরের মেয়ে, কিন্তু ও যে ভাবে আমার সেবা করিতেছে, আমার পেটের মেয়ে থাকিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক করিত না। আমাকে ঠিক মায়ের ন্যায় ভক্তি করে। একটা কথা বলিব বলিয়া অনেক দিন মনে করিতেছি, আজ

বলিয়া ফেলি। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না, তোমাকে সংসারে একা ফেলিয়া যাইব। আমার ইচ্ছা, তুমি কমলকে বিবাহ কর, মেয়েটি বড়ই লক্ষ্মী, ও তোমার ঘরে আসিলে, তোমার অবস্থা ফিরিবে। তিনি থাকিতেই আমি একবার এ কথা পাড়িয়াছিলাম, কমলা পিতৃমাতৃহীনা বলিয়া তিনি তত মত দেন নাই। এখন তোমার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তুমি বড় ঘরে বিবাহ করিতে পারিবে, এমত আশা নাই। কমলার পিতার বংশ অতি উচ্চ, আমাদের করণীয় ঘর। আমার বড়ই ইচ্ছা, তুমি এই বিবাহ কর। তোমার মত কি? আমাকে বলিতে লজ্জা করিও না।' চারু কাঁদ-কাঁদ মুখে উত্তর করিল, 'মা, আমি আপনার কুসন্তান, আমার অদৃষ্টদোষেই, আমাদের অবস্থার এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আপনি এত কষ্ট পাইতেছেন, এই অবস্থায় বিবাহের কথা আমার মনেই আসে না। যত দিন আপনি জীবিত থাকেন, আমি সাধ্যমত আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব। জগদীশ্বর যদি দিন দেন, তখন বিবাহের কথা বিবেচনা করা যাইবে। কমলাকে আমি ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি, আশীর্ব্বাদ করি, সে উপযুক্ত পতি লাভ করিয়া সুখী হউক, আমার দারিদ্র্যের সহিত আমি তাহার ভাগ্য মিশাইব কেন? কমলা পিতৃমাতৃহীনা হইলেও ভগবান তাহাকে ভাল বরই যুটাইয়া দিবেন।'

ভালবাসা সম্বন্ধে মানুষের হৃদয় বুঝিবার ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা রমণীর অনেক অধিক। চারু অতি সাবধানে কথা কহিলেও তাহার জননী বুঝিয়া লইলেন, কমলার প্রতি চারুর ভালবাসা আছে। তবে পুত্রের হৃদয় এতই পবিত্র যে, কমলা যদি অন্য স্বামী পাইয়া অধিকতর সুখী হয়, তাহা হইলে চারু তাহাতে বাধা দিতে প্রস্তুত নহে। জননী সে দিন এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা কহিলেন না।

৮

কমলার বিবাহের বয়স হইয়াছে, ইহা আর পাঠককে না বলিলেও চলে। তাহার পিতা বর্ত্তমান থাকিলে এত দিন হয় ত বিবাহ হইয়া যাইত। প্রিয়নাথ আশা করিয়াছিলেন, চারু এবং চারুর পিতাই কমলার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিবার পক্ষে সাহায্য করিবেন। চারুর পিতা ত চলিয়াই গিয়াছেন, সম্পত্তিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চারুরও সামাজিক প্রতিপত্তির অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। জমিদারী থাকিলে হয় ত চারুর বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই মাসে মাসে তাহাদের বাড়ীতে ঘটক আসিত, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। চারুর সহিত কমলার বিবাহের

সম্বন্ধ উত্থাপিত হইতে পারে, এ কথা প্রিয়নাথের মনে কখনও উদিত হয় নাই। প্রিয়নাথ চারুকে অগ্রজের ন্যায় ভক্তি করিত, কিন্তু পিসীমা ও কমলা ইহাদের উভয়ের মনেই এ কথা আসিত। চারুর মা ও কমলার পিসীমা দুই জনেই বুঝিয়াছিলেন, এ বিবাহে দম্পতি সুখী হইবে। পূর্ব্বেই দুইবার বলা হইয়াছে, কমলা চারুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। আমাদের অসহায় অবস্থায় উনিই আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। বাগানের আমগুলি পাড়িয়া ভাল ভাল আমগুলি আমাকে ও দাদাকে দিয়া যাইতেন। উঁহার যে কোন জিনিসে যেন উঁহার ও আমাদের সমান অধিকার, সর্ব্বদাই এই ভাব দেখাইয়াছেন, আমরা দরিদ্র বলিয়া এক দিনও আমাদিগকে ঘৃণা করেন নাই, এইরূপ স্মৃতি ও ভাব সকল বালিকার হৃদয়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত ছিল। দেবতার স্বভাব না হইলে গরীবকে এত ভালবাসিতে পারে না, সে ইহাই মনে করিত। বিবাহের কথা, ভালবাসার কথা যখন সে বুঝিত না, তখন সে চারুকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিত। এখন যখন সে বিবাহের কথা বুঝিতে লাগিল, দুই এক স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, তখন সে দেখিল, তাহার সেই শৈশবসঞ্চিত ভক্তি ভালবাসায় মিলিয়া যাইতে চাহে। উনি দেবতা, আমি মানুষ। আমি উঁহার পরিণীতা ভার্য্যা হইবার উপযুক্ত নহি। তবে চিরদিন দাসীর ন্যায় আমি উঁহার সেবা করিব। কমলা মনে মনে এইরূপই ভাবিত। তাহার মনের এই ভাব তাহার পিসীমা ও চারুর মা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চারু কিংবা প্রিয়নাথ তেমন বুঝিতে পারেন নাই।

চারু বিবাহ না করিয়া আরও দু চারি বৎসর কাটাইতে পারেন, বিবাহ একেবারে না করিলেই বা কি? কিন্তু কমলা কন্যা, তাহার বিবাহ হওয়াই চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কমলার পিতার বংশ অতি উচ্চ, আর কমলা অতিশয় সুরূপা ছিল। সুতরাং তাহার ভাল বর না জুটিবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না।

একদিন কমলার বিবাহের এক সম্বন্ধ লইয়া এক ঘটক আসিয়াছে। তাহার সহিত কমলাকে দেখিবার নিমিত্ত দুই তিন জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জল খাইতে দিতে হইবে বলিয়া কমলার পিসী দু'খানি বাসন মাজিবার জন্য কমলার হাতে দিয়া তাহাকে পুকুরের ঘাটে পাঠাইয়াছেন। অবস্থান্তরে হয় ত কমলাকে এই সময়ে অন্য স্ত্রীলোকে সাজাইয়া পাঠাইত।

কমলা নিজে বাসন মাজিতেছে। বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। বালিকা একাকিনী পুকুরের দিকে চাহিয়া এক একখানি বাসন ডলিতেছে, আর অবিশ্রান্ত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল, আমি কেন পিসীমার বাসনগুলি উপরে রাখিয়া দিয়া জলে ডুবিয়া মরি না? কমলা কেন কাঁদে, আর এমন কথাই বা কেন ভাবে?

সহসা পশ্চাতে মনুষ্য পদধ্বনি শ্রুত হইল। বালিকা চাহিয়া দেখে, চারু। তিনি একটি গাড়ু হাতে করিয়া ঘাটে আসিতেছেন। কমলা দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। তিনি যেন একজন অপরিচিত আগন্তুক, বালিকা এই ভাবে নিজের মস্তকে বস্ত্র টানিয়া লইল, এবং চারুচন্দ্রের বিপরীতমুখী হইয়া বাসন-মার্জ্জন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।

চারুচন্দ্র কমলার চক্ষে জল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার সলজ্জ ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কমল তুমি কি কাঁদিতেছ?'

কমলার উত্তর নাই।

চারুচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কমল কাঁদছ কেন?'

কমলা এবারেও কোন উত্তর দিল না।

চারুচন্দ্র আর পীড়াপীড়ি না করিয়া গাড়ুতে জল পূরিয়া উপরে উঠিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অর্থ কি? কমলা আমার সঙ্গে কথা কহিল না কেন?

প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে চারুর অধিক সময় লাগিল না। কমলার বিবাহের ঘটক আসিয়াছে, তিনি শুনিয়াছিলেন; সিদ্ধান্ত করিলেন, বালিকা এ বিবাহে সম্মত নহে, সে আমারই প্রতি অনুরাগিণী। সেদিন মার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, হয় ত ও তাহা শুনিয়াছে। মনে মনে বোধ হয় আমাকেই ভর্ৎসনা করিতেছিল, বলিতেছিল, 'তুমি যে কয়েক বৎসর ইচ্ছা বিবাহ না করিয়া থাকিতে পার। আমাকে যে জীবনের জন্য ডুবিয়া যাইতে হয়।' চারুর সেই ডালিম পাড়ার কথা মনে পড়িল। তাহার প্রতি কমলার অকৃত্রিম ভক্তিসূচক কত শত ক্ষুদ্র কথাই মনে আসিল। চারুর মতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কমলা যদি আমার হৃদয় চায়, তাহা পাইবে। আমি ত আর কোন বালিকাকে ভালবাসি নাই। দুঃখ আসিয়া দুঃখে

মাকে মনের ভাব জানাইতে চারুচন্দ্রের কালবিলম্ব হইল না। চারুর মা কমলার বিবাহের জন্য ঘটক আসিবার কথা শুনিয়াছিলেন। চারু মুখ হাত ধুইয়া তাঁহার কাছে আসিলে তিনি কথা পাড়িলেন, 'বাবা, বাঁচ্‌বোও না আর বেশী দিন, তোমার বিবাহটা দেখে যাবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। আর কিছু থাক্ না থাক্, নিজের ক'খানা গয়না তাকে দিয়ে যেতেম। বৌয়ের মুখ-খানা দেখে গেলে মনটা আমার বড়ই সুখী হ'ত। কমলাকে বিয়ে কল্লে ক্ষতি কি? মেয়েটি লক্ষ্মী।'

চারু আজ প্রতিবাদ না করিয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে জননীর অধিকক্ষণ লাগিল না।

সেই দিন রাত্রিতেই চারুর মা কমলের পিসীকে ডাকিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রিয়নাথকেও ডাকা হইল।

বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট। সেই দিনই স্থির হইয়া গেল যে, এক মাসের মধ্যেই শুভদিন দেখিয়া বিবাহ হইবে।

চারুর মা'র ইচ্ছা থাকিলেও চারুচন্দ্র বিবাহে কিছুমাত্র ব্যয়বাহুল্য করিতে দিলেন না। যাহাকে শাঁক বাজাইয়া বিবাহ হওয়া বলে, হরদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্রের সহিত বামনদাস বিদ্যারত্নের কন্যার বিবাহ প্রায় সেই ভাবে হইল। কিন্তু যাহাদের বিবাহে হাতী অশ্ব যান প্রভৃতি সজ্জিত হইয়া থাকে, তাহাদেরও অনেক দম্পতির মধ্যেও হয় ত চারু কমলার ন্যায় নির্ম্মল অনুরাগ থাকিত না।

উপসংহার।

চারুর সহিত কমলার বিবাহের পর ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারুর গৃহে কমলার আগমনে কমলারও আগমন হইয়াছে। যে বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ হয়, সেই বৎসর মাঘ মাসেই চারুদের পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত নষ্ট তালুকের জলময় স্থানে এক ক্ষুদ্র চর ভাসিয়া উঠে। দুই বৎসরের মধ্যেই এই চর প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া পুনরায় মনুষ্যের আবাসের উপযোগী হয়। পদ্মা যেন চারুর তালুক আবার ফিরাইয়া আনিয়া দিলেন। ঢাকা জেলার কালেক্টর সাহেব তদন্ত করিয়া এই চর চারুর সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। চারুর এখন চরের বার্ষিক আয় ছয় হাজার টাকা। চারু বড়মানুষ। চারু কমলার দাম্পত্যজীবন অতিশয় সুখের হইয়াছে

কমলা ভাবিত, আমি দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছি। চারু ভাবিতেন, বিবাহের সময়ে আমার যে অবস্থা ছিল, আন্তরিক প্রীতি না থাকিলে এ কখনই আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে এত আগ্রহ করিত না। অন্তঃকরণ উভয়েরই অতিশয় নির্ম্মল ছিল। এমন দম্পতি সুখী হইবে না কেন?

স্বামীর কাছে কমলার এক আব্‌দার হইল যে, বাড়ীতে একটি টোল করিয়া তাহাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হউক। চারু অতিশয় সন্তোষের সহিত এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। চারুর বাটীতে এখনও অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণসন্তান শিক্ষা পাইতেছেন। কমলার দ্বিতীয় অনুরোধ, কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর্থিক অসচ্ছলতায় বিপদে পড়িয়া দ্বারস্থ হইলেই তাঁহাকে যেন যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। চারুচন্দ্র এ অনুরোধও উপেক্ষা করেন নাই। ভৈরব কয়ালের অত্যাচারের কথা কমলার এখনও মনে আছে।

চারু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই স্ত্রীকে বলেন, 'এ তালুক তোমারই ভাগ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।' ইহার অর্থ, 'তুমি যে ভাবে বল, আমি সেই ভাবে ব্যয় করিতে বাধ্য।' কমলা উত্তর করেন, 'আদরের উত্তাপ অত বাড়িলে আমি গলিয়া যাইব।' স্বামীর সোহাগে কমলার মুখ ফুটিয়াছে,—না?

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

সাহিত্যের অবিধিবদ্ধ বিধি।

আইন দুই প্রকার, বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ। জগতে সকল কার্যই বিধিবদ্ধ আইনে চলে না; কিন্তু সংসারযাত্রার অনেক কার্যই অবিধিবদ্ধ আইনে চলে। সাহিত্যেও অবিধিবদ্ধ আইন আছে। তেজস্বিনী লেখিকা উইডা সাহিত্যের অবিধিবদ্ধ বিধি সম্বন্ধে "ফর্টনাইটলি রিভিউ" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

ইংলণ্ডে ফ্রেঞ্চ একাডেমির আদর্শে গঠিত—তাহারই মত সাহিত্য সম্বন্ধে ক্ষমতাশালী একটা একাডেমি সংস্থাপনের কথা হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজের 'ধাতে' একাডেমি সহিবে না।

ইংরাজী একাডেমি।

'রয়াল একাডেমি'ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তদ্ভিন্ন এরূপ একাডেমির প্রধান উদ্দেশ্য সাহিত্যের বিশুদ্ধিরক্ষা—সাহিত্যের শোভাসংবৃদ্ধি। এখন বিশুদ্ধ ইংরাজীর উৎসও সমল, আর এখন যে কোন ইংরাজী বা আমেরিকান

"প্লাঙ"—চীৎকারকারী ইংরাজী সমালোচকগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত! ইংলণ্ডে যে গ্রন্থকারসমিতি আছে, তাহার ফল কেবল রাশি রাশি অপদার্থ পুস্তকের প্রকাশ; আবার ইংলণ্ডে যে সকল সাহিত্যিক এজেন্ট আছেন, তাঁহারা এই কুকর্ম্মে বিশেষ সহায়।

উপন্যাস।

এখন ইংলণ্ডে বৎসরে রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সকল অপদার্থ পুস্তক কেন প্রকাশিত হয়? পাঠাগারে (Circulating Library) কেন এইগুলা গৃহীত হয়? এ সকল ক্রয় করে কে? কেনই বা এই সকল ছয়, আট, দশ বা বার শিলিং মূল্যের পুস্তক কিছু দিন পরেই সস্তা দরে বিক্রীত হয়? আজ-কাল ইংলণ্ডে সত্য সত্যই উৎকৃষ্ট পুস্তক অল্পই প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারের শেষ কোথায়? ইহাতে লাভ কাহার? প্রকাশকগণ বলেন, এরূপ না করিলে পাঠকসাধারণ মানসিক খাদ্যের অভাবে শীর্ণ হইবে। এ ক্ষুধা বুঝি রোগের অঙ্গ। যখন তিন খণ্ডে প্রকাশিত উপন্যাসের রেওয়াজ গেল, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, এবার ইংলণ্ডে ফ্রান্সের মত পুস্তকের একটা শ্বেত, হরিদ্রা বা ধূসরবর্ণের কাগজে বাঁধা সস্তা ও একটা অধিক মূল্যের সংস্করণ হইবে। তাহা না হইয়া হইল ছয় শিলিং মূল্যের রেওয়াজ। এই দাম না এ দিক, না ও দিক; সাধারণ পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত অধিক—আবার ইহাতে ভাল সংস্করণের প্রকাশ অসম্ভব। একখানা পুস্তক ছয় শিলিং মূল্যে প্রকাশিত হইলে এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার একটা সস্তা সংস্করণ হয়। ইহার অর্থ কি? হয় প্রথম গৃহীত মূল্য অধিক—ক্রেতাকে ঠকান, নহে ত শেষে গৃহীত মূল্য অত্যল্প—বিক্রেতার লোকসান। ইহার মীমাংসা কোথায়? যদি প্রথমে গৃহীত মূল্যই ঠিক হয়, তবে আবার তাহা কমাও কেন? আর যদি শেষে গৃহীত মূল্য ঠিক হয়,—তাহাতেই খরচা উঠে, তবে প্রথম হইতেই কেন সেই মূল্য লও নাই? এ বুঝি প্রকাশকসম্প্রদায়ের কোন অবিধিবদ্ধ বিধি?

গ্রন্থের আকার।

যে দেশে এক সময় আডিসন, গোল্ডস্মিথ, থ্যাকারে ও হেল্পসের পুস্তক প্রকাশিত হইত, সে দেশে নিত্য অপদার্থ পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার দেখিলে দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। এই সকল সাহিত্যসৌন্দর্য্যশূন্য রচনায় সাহিত্যের সর্ব্বনাশ হয়। প্রকাশকগণ এক এক জনে ইহার এক একরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন, অধিকাংশ পুস্তকই লেখকদিগের ব্যয়ে প্রকাশিত; কেহ বলেন, কিছু না কিছু প্রকাশ না করিলে চলে না; কেহ বলেন, পাঠকগণ ভাল মন্দ বুঝে না—পুস্তক হইলেই হইল। তবে ব্যবসায়ে লাভ আছে। অক্ষম রচনার বাগ্‌জালে জড়িত হইয়া উপন্যাসের মৃত্যুসম্ভাবনা। অথচ শুনিতে পাই, উপন্যাস নাকি আত্মহত্যাব্রতী; এখন আর উপন্যাসে পূর্ব্বের মত দীর্ঘ হয় না; পূর্ব্বে যে ছোট গল্পের আদরের সম্ভাবনামাত্র ছিল না, এখন তাহাই আদৃত;—এই সব কারণেই উপন্যাসের মৃত্যুসম্ভাবনা উপস্থিত। কথাটা আদৌ ঠিক নহে। থ্যাকারে ও ডিকেন্সও ছোট গল্প লিখিয়াছেন; এ কালেও বড় উপন্যাস রচিত হয়—লেখিকার Massarenes, থ্যাকারের Esmond-এর সমান। হামফ্রে ওয়ার্ড ও হল্‌ কেনের উপন্যাসও ছোট নহে। থ্যাকারে ও ডিকেন্সকে মাসিক সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য পুস্তক বাড়াইতে হইত; তাঁহারা রচিত চরিত্রের প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্তও অনেক স্থলে গল্প অকারণ বাড়াইতেন

ছেন। লোকের রুচির অনুসারে গ্রন্থ বাড়ান বা কমান বড়ই অন্যায়। গল্পের একটা স্বাভাবিক আকার আছে; ছোট সুন্দর জিনিসকে পিটিয়া বড় করিলে যেমন তাহার শ্রীর অভাব হয়, তেমনই স্বভাবতঃ ছোট গল্পকে টানিয়া বড় করিলে তাহার অস্বাভাবিক শ্রীহীনতা অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজ লেখকগণ যে পাঠকের রুচি-অনুসারে গ্রন্থের আকার স্থির করেন, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহারা শিল্পী নহেন। পাতার আধিক্য গ্রন্থের গুণের পরিচায়ক নহে। গল্পের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া যেখানে গল্প শেষ হয়, সেই তাহার স্বাভাবিক সীমা —সেই সীমা স্বীকার করা লেখকের অবশ্যকর্ত্তব্য। সেটা সাহিত্যের একটা অবিধিবদ্ধ বিধি। মোপাসাঁর একটা ক্ষুদ্র রেখাচিত্রের তুলনা কোথায়? ইংরাজ পাঠকের বিশ্বাস, পুস্তক সস্তা হইলেই তাহা অপদার্থ। অন্য দেশে সাধারণের সংস্কার স্বতন্ত্র—তাহারা গুণগ্রাহী।

ইংলণ্ডে পুস্তকে চিত্রাদির অবস্থা শোচনীয়। একখানা সাড়ে চার শিলিং মূল্যের শিশুপাঠ্য পুস্তকে দেখা গেল, কতকগুলা চিত্র পুরাতন—কাষ্ঠে খোদিত, কতকগুলা নূতন—ছায়াচিত্র।

চিত্রাদি।

সবগুলার মাপও সমান নহে। কোনটায় শিশু মক্ষিকার মত ক্ষুদ্র আকারে চিত্রিত, কোনটায় একটা কুকুর মানুষের অপেক্ষা বৃহৎ! এ যেন যাহা হয় হইলেই হইল; তাহার আর মা-বাপ নাই! সচিত্র পত্রাদিতেও এরূপ দুর্দ্দশা যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

সাহিত্যের একটা অবিধিবদ্ধ বিধি এই যে, প্রকাশের পর গ্রন্থকার আর পুস্তকে কোন পরিবর্ত্তন করিবেন না। ভাস্কর যদি ক্রেতাকে একটা মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া—আবার বাটালি ও

পরিবর্ত্তন।

মুদ্গার লইয়া সেটাকে কাটিতে আরম্ভ করেন, তবে সে কেমন দেখায়? অথচ ইংরাজ ঔপন্যাসিকগণ ঠিক তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকাশিত উপন্যাসে পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, বিবাহ দিবার পর কন্যার উপর পিতার যেমন আর অধিকার থাকে না, প্রকাশের পর পুস্তকের উপর তেমনই গ্রন্থকারের আর অধিকার থাকে না। প্রথমে অসম্পূর্ণ জিনিস দিয়া পাঠকদিগকে ঠকান গ্রন্থকারের পক্ষে গর্হিত। উপন্যাসরচনার পূর্ব্বে ভাল করিয়া সব দিক ভাবিয়া তবে রচনা করা কর্ত্তব্য। লেখকই যদি আপনার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে বাস্তব জগতের বলিয়া মনে না করিতে পারেন, তবে পাঠকগণ তাহা করিবে কেন? এ যেন গ্রন্থকার পুস্তকে পরিবর্ত্তনের পর হাসিয়া পাঠককে বলেন, "ছিঃ! তুমি কি বোকা। তুমি কি সব সত্য ভাবিয়াছিলে?" পাচক যদি পাতের কাছে অর্দ্ধপক্ক আহার্য্য দিয়া আবার তুলিয়া লয়, তবে সে কেমন দেখায়? ইহাও সেইরূপ। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষ হইতে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে,—লেখিকা তাহা বলেন নাই;—লেখক যদি পরিণত বয়সে আপনার পুস্তকগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া ঠিক করেন, তবে তাঁহার সাহিত্যশক্তির ক্রমবিকাশ বুঝা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অস্মদ্দেশে বঙ্কিমচন্দ্র ইহা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "ইন্দিরা" ও "রাজসিংহ" পরিবর্দ্ধিত ও "মৃণালিনী" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। "চন্দ্রশেখর" "বঙ্গদর্শনে" যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন তাহা নাই;—"রজনী" সম্বন্ধেও সেই কথা। "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "কপালকুণ্ডলা" উভয়েরই উপসংহার পরিবর্ত্তিত, "আনন্দমঠে"র পরবর্তী সংস্করণে শান্তি শান্ত হইয়াছে—ইত্যাদি।

যাহাদের কৃত কোন কার্য্যই গুপ্ত থাকে না, সবই সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সে সকল ব্যবসায়ীদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেই হয়। আমার ব্যক্তিগত মত, আমার ধারণা, সবই যদি হাটে বাজারে আলোচিত হয়, তবে আমার জীবনে সুখ ও শান্তি দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়। অথচ ইহার প্রতিবিধানের কোনও উপায়ই নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ নানা বিষয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের মত জানিয়া আসেন ও সেইগুলি পত্রে প্রকাশ করেন। তাঁহারা যদি এখানেই ক্ষান্ত হইতেন, তবে সে মন্দের ভাল ছিল; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহারা পরের সংখ্যায় একটা প্রবন্ধের জন্য ঐ মত ছাপাইবার পূর্ব্বেই অন্যকে দেখাইয়া রাখেন—তিনি উহার উত্তর লিখিয়া রাখেন, বা সমালোচনা করিয়া রাখেন; পরের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হয়। রচনা যে প্রকাশের পূর্ব্বে সম্পাদক ভিন্ন অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়া অবৈধ, সম্পাদকগণ এটুকুও বুঝেন না; ভদ্রতার এই সাধারণ নিয়মটির ব্যতিক্রম করিতে তাঁহারা কুণ্ঠামাত্র বোধ করেন না। আমরা এই কথাটির প্রতি বঙ্গদেশের সাময়িকপত্র-সম্পাদকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। এরূপ ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছে;—দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

সংবাদপত্রের আকার।

আর এক ঝঞ্ঝাট চুরি। চুরি ধরিয়া বেড়ানও অসম্ভব; কারণ, তাহার সংখ্যা প্রচুর। একবার একখানা প্রসিদ্ধ পত্রে একটি মহিলার লিখিত একটা গল্প প্রকাশিত হয়। সেটা লেখিকার Puck নামক উপন্যাসের একাংশের বেমালুম চুরি। লেখিকা সম্পাদককে লিখিলে উত্তর আসিল,—গল্পলেখিকা ইতঃপূর্ব্বে Puck পাঠ করেন নাই। তদুত্তরে লেখিকা সম্রাট জুলিয়ানের কথায় বলেন, "যদি দোষ অস্বীকার করিলেই সব চুকিয়া যায়, তবে কাহাকে দোষী বলিয়া ধরিবে?" ইহার আর কোন উত্তর আসিল না। আবার নালিশ করায় এত হাঙ্গাম যে, সে না করাই ভাল, চুরিও এত অধিক যে, নালিশ করিলে কেবল সেই কাযই করিতে হয়। অর্থ ও অবসর নষ্ট করিয়া কে কেবল তাহাই করিবে? যাঁহারা বিদেশবাসী, তাঁহাদের পক্ষে নালিশ আরও ব্যয়সাধ্য। তবে ইহার উপায় কি? উপায়মাত্র নাই।

সাহিত্যে চুরি।

কোন বিষয়ে মতপ্রকাশে ভাষা একটু অসংযত হইলেও তজ্জন্য আদালত করা সঙ্গত নহে, তাহাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু চুরি ডাকাতি বাটপাড়ীর নিবারণোপায় আবশ্যক। মানহানির আইনও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। কিছু দিন পূর্ব্বে কোনও পত্রে লেখিকাকে আক্রমণ করিয়া তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখিকার উকিল বলেন,—তিনটার একটা আইনের জালে বাঁধিতে পারে, তাহাতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাইবেন; কিন্তু নালিশে এত ব্যয়, হাঙ্গাম, দুশ্চিন্তা ও অপমান যে, সে কার্য্য না করাই শ্রেয়ঃ। তবেই, ইহার প্রতিকার নাই; কেন,—ইহার জন্য একটা স্বতন্ত্র আদালত হইতে পারে না? সে আদালতে বিচারাদি একটু গোপনে হইলেই সব চুকিয়া যায়।

মানহানি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু চুরীর সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। আমাদের সাহিত্য স্বল্পপরিসর—তাহার মধ্যে চুরী সহজেই ধরা পড়ে। তথাপি চুরীর প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইতে হয়। সেদিনও একখানা পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা

কবিতার নিম্নে আর এক ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখিয়া "ভারতী"-সম্পাদক লজ্জায় ও ক্রোধে আরক্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "এই টুকুই নূতন ; নির্লজ্জভাবে নূতন।"

প্রিন্স আলবার্ট একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে (অধুনা জার্ম্মান রাজমাতা) লিখিয়াছিলেন, বৎসরে কিছু টাকা রাখিও, 'চৌথ' দিতে হইবে। এই 'চৌথ' যে কেবল রাজারাজড়াকেই দিতে হয়, এমন নহে ; পরন্তু যাহার ভাগ্যে যশোলাভ ঘটে, তাহারই অদৃষ্টে 'চৌথে'র অত্যাচার অনিবার্য্য। সমাজের উন্নতি ব্যতীত ইহার নিবারণের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহার নিবারণ সম্ভব, এমন সব অত্যাচারই কি নিবারিত হইয়াছে? কই—নাম গোপন করিয়া প্রবন্ধ লেখা ত বন্ধ হয় নাই? অনেক অপদার্থ লেখক নামগোপন করিয়া যাহা ইচ্ছা লেখে, আর লোকে লেখক হয় ত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি হইবেন ভাবিয়া তাহার রচনা মনোযোগসহকারে পাঠ করে। যদি নামগোপন করিয়া কিছু লেখা বন্ধ করা হইত, তবে যে সব রামা শ্যামা কেবল নামগোপন করাতেই লোকে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে—তাহারা যাইত কোথায়? তাহা হইলে সাহিত্য অনেক আবর্জ্জনাশূন্য হইত, আবর্জ্জনাজাত কীটপতঙ্গের উৎপাতও কমিয়া যাইত। লোকে বলে, লেখিকা স্বয়ং অসংযত ভাষার ব্যবহার করেন ; কিন্তু তিনি যাহা লেখেন, নাম দিয়া লেখেন। যে কোনও মত ব্যক্ত করিবে, তাহার নামপ্রকাশের সাহস থাকা আবশ্যক। আর নাম দিতে হইলে বোধ করি লোকে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া মত ব্যক্ত করে। অবশ্য যে পাঠক কোন বিশেষ লেখকের আদর করেন, তিনি উপাসিতের রচনা চিনিতে পারেন। তবে সে কয় জন?

প্রচ্ছন্ননামা লেখক।

তবে এ অবস্থার নিবারণের উপায় কি? সাধারণের পূত প্রভাব ব্যতীত সাহিত্যে এ সব অবিধিবদ্ধ বিধি স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনামাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভাবিত নহে ; এখন শিক্ষার দোষে লোকের ব্যবহার মন্দ হইতেছে। তাহা না হইলে লোকে অনায়াসে অপরের পত্র ক্রয় বিক্রয় করিত না,—নাটককার ঔপন্যাসিকের উপন্যাস কাটিয়া ছাঁটিয়া—বিশ্রী করিয়া নাটকে পরিণত করিতে সাহস করিত না। যাঁহার পুস্তকের এইরূপ দুর্দ্দশা করা হয়, অনেক স্থলে তাঁহার অনুমতিও লওয়া হয় না। যদি বা ইহার নিবারণের উপায় থাকে, কিন্তু পত্রবিক্রয় হাতের লেখা বলিলেই বিক্রয় নির্দ্দোষ হইয়া দাঁড়ায়! আইনে বলে, পত্র লেখকের সম্পত্তি ; কিন্তু সে আইন অপ্রচলিত। পত্র গ্রহীতার সম্পত্তি হওয়াই ভাল ; কিন্তু একটা আইন থাকা আবশ্যক যে, তিনি তাহা দান বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আমি যখন তোমাকে পত্র লিখি, তখন আমি প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ লিখি না, অসাবধানভাবে তোমাকে মনের কথা বলি ; সেটা যে প্রকাশিত হইবে না, আমি ইহাই বুঝি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্যাতনামা লোকের পত্র প্রকাশ্যভাবে ক্রীত ও বিক্রীত হয়। যদি ইহা বেআইনী হয়, তবে ইহা চলে কেন? আর যদি বে-আইনী নাও হয়, তবু লোকে এ কার্য্যের সমর্থন করে কেন? বৈঠকখানার টেবিলে অনেক সময় যে সব পত্রাদি দেখা যায়—তাহাতে লজ্জিত ও বিরক্ত না হইয়া থাকা যায় না। ইহা বন্ধুত্বের অপব্যবহার। লেখিকা একবার এক স্থলে এক জন অতিপ্রসিদ্ধ জীবিত ব্যক্তির

উপায় কি?

একখানি গোপনীয় পত্র ঐরূপ ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বহু অর্থ পাইলেও লেখক কখন সেরূপ পত্র বিক্রয় করিতেন না। তবে কোন বন্ধুরূপী পিশাচ সে কার্য্য করিয়াছে? কোন নিমকহারাম ভৃত্য তাহা চুরী করিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়াছে? এ কুকর্ম্মও চলে?

আর এক অত্যাচার বিদ্রূপ-চিত্র (caricature)। সেগুলা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য; কিন্তু তাহারও একটা সীমা থাকা কর্ত্তব্য। যে যে ভাবে ইচ্ছা, তোমার চিত্র আঁকিয়া সংবাদ-পত্রে দিবে, ইহা তুমি পছন্দ নাও করিতে পার। এই সব চিত্রে অনেক সময় বিজ্ঞের প্রতি সম্মানের অভাব লক্ষিত হয়; তাহাতে রুচির বিকার উপস্থিত হয়। যে সকল প্রতিভাবান ব্যক্তি স্বভাবতঃ লাজুক, তাঁহারা এই অত্যাচারকে বড় ভয় করেন। এই জন্য আমরা অনেক প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হই; গুরুতর কার্য্যে তাঁহাদের পরামর্শে অনেক উপকার হইতে পারিত। এই "খ্যাতির শাস্তি"ই তাঁহাদিগকে সে কার্য্য করিতে দেয় না। আদালতের আশ্রয়গ্রহণ করা সকল সময় সম্ভব নহে, প্রীতিকর ত নহেই।

পাঠকসাধারণের যদি সাধারণ সম্মানজ্ঞান থাকিত, তবে সাহিত্যের অবিধিবদ্ধ বিধির কল্যাণে বিসমার্কের নবপ্রকাশিত জীবনীখানা প্রকাশিত হইতে পারিত না। যে ক্ষমতার অবতার আপনার শক্তিতে শতধা-বিভক্ত প্রদেশকে একত্র করিয়া মহান সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন, তিনি আজ মৃত। আর তাঁহার শবদেহ শীতল হইতে না হইতে তাঁহাকে লইয়া চারি দিকে যে ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত না হইয়া থাকা যায় না। কাট্‌তি ব্যতীত মালের সরবরাহ হয় না। পাপকৌতূহলবশে পাঠকগণ এইরূপ মাল না চাহিলে ইহার আমদানী হইত না। এ যেন কোন বিরাট পুরুষ মরিতে না মরিতে আমরা ক্ষীণ মানবগণ তাঁহার ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলি,—এখনও তাঁহার বিরাট ছায়ায় দেশ সমাচ্ছন্ন, তাঁহার তুলনায় আপনাদের ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া আমরা লজ্জায় মরিতেছি, তোমরা তাঁহাকে অসতর্ক অবস্থায় দেখিয়াছ—তাঁহার দুর্ব্বলতার কথা, তাঁহার ব্যাধির কথা, তাঁহার পাপের কথা,—সব বল, তাহাকে দেবত্বের উচ্চাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া আমাদেরই দশের এক জন করিয়া দাও,—আমরা তোমাকে পুরস্কার দিব। পাঠকসাধারণের এই বিকৃত রুচির সংশোধন ব্যতীত আমাদের দুর্দ্দশা নিবারণের কোনও উপায়ই নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। বৈশাখ। প্রথমেই স্বর্গীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচিত "সন্ধ্যার প্রদীপ" নামক একটি পুরাতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রদীপেই' প্রকাশ, উক্ত কবিতাটি ইতঃপূর্ব্বে 'নলিনী' নামক অধুনালুপ্ত মাসিকে মুদ্রিত হইয়াছিল। তবে 'প্রদীপে' তাহার পুনরাবৃত্তি কেন? "সাবিত্রী-আখ্যান" সম্পাদকের। পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর রচিত "সাবিত্রীর পাতিব্রত্য" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ। প্রতিবাদটি অন্তঃসারশূন্য,—[illegible]

বক্তব্য, তৎসমুদায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যদি সমগ্র গ্রন্থের আলোচনা করেন, ভাল হয়। উপস্থিত প্রবন্ধে তাঁহার প্রতিপাদ্য অল্প, তাহার খণ্ডনপ্রয়াস অনাবশ্যক। "সূচক" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসু বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয়বিশেষের পরিচয় দিয়াছেন। লেখক বলেন, "মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের জীবনী গ্রন্থ যেরূপ বিস্তৃত, ষট্ গোস্বামীর সেরূপ বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থ নাই। গোস্বামিগণের জীবন অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত গোস্বামী জীবনীর নাম সূচক।" বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবনবৃত্তের সাধারণ নাম সূচক কি না, তাহা লেখকের ভাষা হইতে বুঝিতে পারা গেল না। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের "জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব" আলোচনীয়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "বিবাহ" কবিতায় লিখিত একটি গল্প। আরম্ভ সুন্দর, লেখক শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সম্পাদকের রচিত "ছোট বউ" নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "ছোট বউ" শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'য়ের দ্বিতীয় সংস্করণ—কিন্তু তাহার সমকক্ষ নয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "রস্কিন" প্রবন্ধেই এবারকার প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। "ল্যাপল্যাণ্ডের কথা" শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। "প্রদীপ" অপেক্ষা 'মুকুলে' অধিকতর শোভা পাইত।

স্বাস্থ্য। বৈশাখ। স্বাস্থ্য তৃতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ করিয়া চতুর্থ বর্ষে উপনীত হইল। "নববর্ষে" সম্পাদক বলিতেছেন, "যাঁহারা স্বাস্থ্যের মত পত্রিকার আবশ্যকতা বুঝিয়া আমাদের সহিত একপ্রাণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিয়াছি। এই ব্যয়ে ৫০০ শত স্বাস্থ্য ৫০০ শত স্কুল পাঠশালায় বিতরণ করা হইয়াছে।" শুভসংবাদ! তাঁহাদের অর্থ সার্থক হইয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের মত উপকারী ও হিতকারী পত্রের পাঁচ শত প্রচার যথোপযুক্ত নয়; অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার 'স্বাস্থ্য' বিতরিত হইলে আমরা আনন্দলাভ করিতাম। সম্পাদক মহাশয়ের এই নিঃস্বার্থ দেশহিতব্রত প্রশংসনীয়, অনুকরণযোগ্য। তিনি পরিশ্রম দান করিতেছেন, দেশের ধনকুবেরগণ অর্থ দিয়া "স্বাস্থ্যের" বহুল প্রচারে সহায় হউন। "শত বর্ষের শিক্ষা"য় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবিধ নূতন আবিষ্কারের সংবাদ আছে। "দীর্ঘজীবন", "কৌমার তন্ত্র", "সর্দ্দি" প্রভৃতি প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। আশা করি, নব বর্ষে "স্বাস্থ্য" অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে।

নির্ম্মাল্য। মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচনা। বৈশাখ। নির্ম্মাল্য দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিলেন। এবার "নির্ম্মাল্যে"র আকার প্রকার প্রদীপের ন্যায়। আবার চিত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। কভারে প্রকাশ, নির্ম্মাল্য এক্ষণে "ময়মনসিংহাধিপতি বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর পৃষ্ঠপোষিত।" "পৃষ্ঠপোষিত" শব্দটা যাই হউক, সংবাদটি অত্যন্ত শুভ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহারাজা বাহাদুরের জয় হউক। প্রথমেই "উদ্বোধন" নামক একটি পদ্য। আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। লেখকের বক্তব্য গদ্যে লিখিলে ক্ষতি কি ছিল? কবির বক্তব্যমাত্র কবিতা হইতে পারে না, ইহা তাঁহার সহজবুদ্ধির অনধিগম্য হইল কেন?

"মহারাজ 'সূর্য্যকান্ত' সখা 'রামনাথ'

'নলিনী', 'গোলাপ', 'প্রিয়,' 'চিত্ত,' 'জলধর'
নির্ম্মালা-চালন ব্রতে হয়ে উদ্দীপিত,"

নিতান্ত অসহ্য। ইহাঁরা 'উদ্দীপিত' হউন, কবি এতদুপলক্ষে কবিতাকে উদ্দীপিত করিতে উদ্যত হইলেন কেন? কৃষ্ণের সহস্রনামের আর অনুকরণ কেন? "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও চন্দ্রনাথ বসু" প্রবন্ধটি পূর্ব্বানুবৃত্তি। বাদপ্রতিবাদে শিষ্টাচার কি বর্জ্জনীয়? চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি লেখক যে সব বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, লেখকের প্রতিপাদ্যরক্ষায় তাহারা সহায় হইবে না। চন্দ্রনাথ বাবুর মত ভ্রান্ত কি না, তাহার বিচার করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর মত ও চন্দ্রনাথ বাবু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। লেখক এক সঙ্গে উভয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মতের আলোচনা প্রার্থনীয়, প্রশংসনীয়ও বটে; কিন্তু মানুষের আলোচনা সুরুচিসঙ্গত নহে। রামনাথ বাবুর সমস্ত বক্তব্য আমরা দেখি নাই। কিন্তু এই সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশবাৎসল্য পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু যেখানে জাতীয় চরিত্রে সদ্‌গুণের অভাব দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ কি দেশে সদ্‌গুণের একান্ত অভাব? তাহা মনে হয় না। "আমার শিকারকাহিনী" মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের রচিত। লক্ষ্মীর বরপুত্র বাণীর পদে পুষ্পাঞ্জলিদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আনন্দের ও আশার সংবাদ। লেখকের কাহিনীও মনোজ্ঞ। শিকারকাহিনী যুরোপীয় সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বঙ্গসাহিত্যে তাহার একান্ত অভাব। মহারাজাবাহাদুর একজন প্রসিদ্ধ শিকারী। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের ও বর্ণনীয় বস্তুর অভাব হইবে না। নমুনা আশাপ্রদ। আমরা আশা করি, তিনি সঙ্কল্পিত ব্রতে অবহিত হইয়া বঙ্গভাষায় শিকারসাহিত্যের সূত্রপাত ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের "বার ভূঞা" একটি সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "অদৃষ্ট" একটি ক্ষুদ্র গল্প। পড়িয়া আমরা তৃপ্তি পাইলাম না। "ব্যবহারিক-শব্দ-বিচার" উল্লেখযোগ্য। কেন না, বক্ষ্যমাণ 'বিচার'টি সম্পূর্ণ নূতন;—দেখিলে প্রহসন-দর্শনের সাধ মিটিবে। এই অভিনয়ে পুত্রের পক্ষে পিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত,—এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার শিকার। দ্বিজেন্দ্র বাবুর জন্য দুঃখ হয়। "অস্থানে পততাং সদৈব মহতামেতাদৃশী স্যাৎ গতিঃ"—তা ছাড়া আর কি বলিব? 'বিচার' করিতে গেলেই কি বিচার্য্য বিষয়ের লেখককে গালি দিতে হইবে? লেখকের শেষ প্যারাটি বেশ! "দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কোনও বিষয়ে তাঁহার মনঃক্ষুণ্ণ হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। আমারই আদেশক্রমে অদ্বৈতবাদবিচারের লেখক আমার পুত্র শ্রীমান প্রিয়নাথ সেন দ্বিজেন্দ্র বাবুর যে কোন লেখার প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত আছে। সুতরাং আমাকে সত্যের অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে হইল"—ইত্যাদি। পিতার আদেশপালন সনাতন নিয়ম; কিন্তু ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি, পুত্রের আদেশপালন যদি বিধিবিহিত হইত, তাহা হইলে প্রিয়বাবু তাঁহার পিতৃদেবকে নিশ্চয়ই নিরস্ত করিতেন। পিতার আদর্শ 'বিচার'-পদ্ধতি দেখিয়া, দার্শনিক পুত্র নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইবেন।

প্রয়াস। মার্চ্চ। "বিহারিলাল" প্রবন্ধটি পূর্ব্বানুবৃত্তি। এ অংশও সুখপাঠ্য।

"পরিবর্ত্তন" গল্পটি অত্যন্ত কাঁচা। "কবি ও কাক" রহস্য, কিন্তু উপভোগ করিতে পারিলাম না। এবারকার 'প্রয়াসে' সুপ্রবন্ধের বড় অভাব।

পূর্ণিমা। বৈশাখ। পূর্ণিমার অষ্টম বর্ষ আরব্ধ হইল। "উদ্বোধন", "দুনিয়াদারী", "দুয়ের একত্ব" প্রভৃতি দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতা ; "পূর্ণিমা"য় ধর্ম্মের প্রবাহ বড় প্রবল। এ সব দ্রব্যের আস্বাদ পাঠক নিজে লইবেন। "যজ্ঞ" চতুর্থ প্রস্তাব। এক পৃষ্ঠামাত্র। তৃপ্তি হয় না। "ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত" শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের রচনা। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, "পুরুষ-সূক্তে প্রাচীন ঋষিগণ আমাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার অনুসরণপুরঃসর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে চলেন, তাহা হইলে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রপুরুষের দুর্গতির অবসান হইবে।" "সাত মন তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না।" নদীর স্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত করিয়া তাহার মূল প্রস্রবণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতের সামাজিক নিয়ম এ কালে প্রবর্ত্তিত হইবার নহে,—অসম্ভবের আলোচনা অনাবশ্যক।

ব্রহ্মবাদী। প্রথম বর্ষ, প্রথম ভাগ। বৈশাখ। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম-প্রতিপাদন "ব্রহ্মবাদী"র উদ্দেশ্য। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সমালোচনা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কবিতা-কুঞ্জ।

মৃত্যুমুখে।

তবে দাও মুক্ত করি জীবনের সহস্র বন্ধন—
শ্রান্ত এ হৃদয়ে মোর শান্তিসম নামুক মরণ।
আজ মরণের কূলে ভুলে যাই বন্ধুত্ব, বিবাদ,
ঘুচে যা'ক সুখ-আশা, মুছে যা'ক অতৃপ্তি, বিষাদ।
দহিয়াছে এ হৃদয় বাসনার বিষম দহন,
সহিয়াছি জীবনের শত শত হতাশা-দংশন,
বহিয়াছি এ হৃদয়ে সীমাহীন তীব্র ভালবাসা,
কল্পনার তুলিকাতে আঁকিয়াছি কত সুখ-আশা!
সেই শত সুখ-আশা, সেই শত অতৃপ্ত বাসনা,
কল্পনার সুখস্বপ্ন—কই—তা'র কিছু মিটিল না!
আজ সব জ্বালা শান্ত, আজ সব যাতনা নির্ব্বাণ,
আজ স্নিগ্ধ শান্তি মাঝে ঘুমাবে এ ব্যথিত পরাণ।
ক্ষম আজ জীবনের পদে পদে শত অপরাধ ;
মুক্ত কর মোহবন্ধ, দাও ক্ষমা সুস্নিগ্ধ—অগাধ।
জীবনের সুখ দুঃখ হয়ে যা'ক সব অবসান,
প্রশান্ত মৃত্যুর কোলে শান্তি পা'ক তাপিত প্রাণ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নির্ভর।

শৈশব সুখের কাল সব লোকে বলে,
আমি সে কাটানু শুধু কুহকের ছলে।
যৌবনে যাতনা যত কহিব কি আর,
জ্বলিয়া পুড়িয়া তনু হ'ল ছারখার।
প্রয়াণের পথে শেষে পশিনু যখন,
দেখিনু সমুখে সিন্ধু গরজে ভীষণ।
পারের সম্বল নাই, না জানি সাঁতার,
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা মৃত্যু অন্ধকার,
আকাশ পাতাল ভেঙে আইল ভাবনা,
বৃশ্চিক-দংশন সম শতেক বেদনা।
সাত পাঁচ ভেবে শেষে পড়িনু ঝাঁপিয়া,
কহিনু সান্ত্বনাভরে মনেরে স্মরিয়া ;—
"আর বৃথা পরিতাপে কি হইবে ভাই,
অকূল পাথারে এবে যা' করে গোঁসাই।"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়।

২।

১৭৪০।৪১ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওয়ের পুত্র বালাজী বাজীরাও মহারাষ্ট্রীয়গণের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী ও রাজকার্য্যধুরন্ধর ব্যক্তি মহাত্মা শিবাজীর পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-বলে মহারাষ্ট্র সমাজের বিভিন্নমুখ শক্তিনিচয় একাগ্র হইয়াছিল। রামদাস ও শিবাজীর জীবনের প্রধান ব্রত এই সময়ে উদ্‌যাপিত হয়। বালাজী বাজীরাওই "যাবতীয় মারাঠাকে একত্র" করিয়া "সর্ব্বত্র মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের বিস্তার" করিতে বহুপরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দেশে প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার বহুল চর্চ্চা আরব্ধ হয়। তিনি বেদ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি-বর্ষে পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এতদুপলক্ষে তিনি সময়ে সময়ে বৎসরে ১৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। কাশী, রামেশ্বর, মিথিলা প্রভৃতির ন্যায় দূর দেশ হইতেও বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরীক্ষাপ্রদান-পূর্ব্বক দক্ষিণা-গ্রহণের জন্য পুণায় সমবেত হইতেন। দক্ষিণার্থ সমাগত ব্রাহ্মণদিগের পরীক্ষাগ্রহণ ও পুরস্কারদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরস্কারলোভে দেশের ব্রাহ্মণসন্তানেরা শাস্ত্রজ্ঞানলাভে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমশঃ প্রতি বৎসর পুণায় ৩০।৪০ সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সমাবেশ হইতে লাগিল। দেশে শাস্ত্রচর্চ্চার স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইল। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও গীতবাদ্যবিশারদ ব্যক্তিগণও রাজাশ্রয়লাভে বঞ্চিত হয় নাই। দেশের কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির দিকেও বালাজী বাজীরাওয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনশৃঙ্খলা ও মহারাষ্ট্রশক্তির দৃঢ়তা সম্পাদিত করিয়া বালাজী হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের সুমহান্ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে একাধারে রাজনীতিকুশল শাসনকর্ত্তা ও সুদক্ষ সেনানায়করূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বালাজীর উপদেশ অনুসারে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একা-

দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যূন ৪২টি যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। এই সকল অভিযানের অধিকাংশই বালাজীর প্রত্যক্ষ-নেতৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইয়াছিল। অযোধ্যা, বেহার ও বঙ্গদেশ হইতে মোসলমান শাসনের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক উত্তরে আটক হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী "হিন্দুপৎ বাদশাহী"-(হিন্দু সাম্রাজ্য)-স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়গণ অতীব ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের হিন্দুধর্ম্মী রাজন্যবর্গের বিলোপসাধনে যত্নশীল হন নাই—কেবল তাঁহাদিগকে ছত্রপতির সার্ব্বভৌমত্বস্বীকারে ও করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। মোসলমানদিগের হস্ত হইতে মুক্তিপুরী অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, বারাণসী ও পবিত্র প্রয়াগক্ষেত্রের উদ্ধারসাধনার্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ বিবিধ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমন কি, পরিশেষে বিনিময়স্বরূপ অন্য প্রদেশ দান করিয়াও ঐ তীর্থস্থানগুলি হিন্দু শাসনকর্ত্তার অধীনতায় রাখিবার চেষ্টা করিতেও তাঁহারা বিরত হন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা অপ্রতিবিধেয় কারণে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী না হইলেও, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকেই তাঁহাদিগের উদ্যমের প্রশংসা করিতে হইবে। এরূপ পবিত্র উদ্যম "হিন্দুসূর্য্য"-আখ্যাধারী রাণাগণও কখনও প্রকাশ করেন নাই।

খৃঃ ১৭৫০ অব্দ হইতে ১৭৬১ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বকথিত সংকল্পনিচয়ের সংসাধনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রয়াস বহুপরিমাণে সফল হইয়াছিল। তাঁহাদিগের এই সময়ের অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়। বালাজীর পিতৃব্যপুত্র শ্রীমন্ত ভাউসাহেব সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা ভারতভূমির অতিক্রমপূর্ব্বক কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে মহারাষ্ট্র-বিজয়-কেতু উড্ডীন করিবার ইচ্ছা, সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পাণিপথের সমরক্ষেত্রে আহম্মদশাহ আব্দালীর সহিত বলপরীক্ষায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাগ্যবিপর্য্যয় ও পরবর্ত্তী দৈববিড়ম্বনাসমূহ না ঘটিলে ভাউ সাহেবের অভিলাষ পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত ছিল না বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বালাজী বাজীরাওয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষে মারাঠাগণের চক্রবর্ত্তিত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব, আজমীর, মালব, নাগপুর, বেরার (বিদর্ভ), মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, রাজপুতানা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে নিয়মিত-

রূপে তাঁহাদিগের চৌথ আদায় হইত। মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, মারওয়াড় ও অযোধ্যাদি প্রদেশের অধিপতিগণ তাঁহাদিগকে করপ্রদান করিতেন। দিল্লীর সিংহাসনে মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের মনোনীত ব্যক্তিকে সম্রাটরূপে স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহাদিগের আর কেহ ভীতিপ্রদ শত্রু রহিল না। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই শান্তি কিছু দিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তার এবং কলাবিদ্যার বিশিষ্ট সংস্কারে মহারাষ্ট্রীয়গণের দৃষ্টি নিপতিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁহাদিগের সে অবকাশ ঘটিল না।

ভারতবর্ষ হইতে মোসলেম শাসনের প্রভাব তিরোহিত হইয়া সর্ব্বত্র হিন্দু-ধর্ম্মীদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় মোসলমান সমাজের অধিনায়কগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। যে দিল্লীশ্বরের প্রতাপে এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছিল, যাঁহার আদেশে মহারাষ্ট্রপতি সাম্ভাজী নিহত ও তৎপুত্র শাহু সপরিবারে বন্দীভূত হইয়াছিলেন, কালচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে তাঁহারই বংশধরগণকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের করায়ত্ত হইতে হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহারাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি-দর্শনে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য একতাসূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন। আহম্মদশাহ্ আব্দালীর নিকট ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। পুন-র্ব্বার বাদশাহী-স্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল। স্বল্পদিবসের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরপ্রাঙ্গণে, আহম্মদশাহ্, নজীব-খান রোহিলা, সুজাউদ্দৌলা, কুতবশাহ, আহম্মদখান, দুন্দেখান প্রভৃতি রোহিলা, পাঠান ও দুরাণী সর্দ্দারগণ আপন আপন চতুরঙ্গবল সহ যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণও বিপুলবাহিনী সহ যথাসময়ে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন, উভয় পক্ষে প্রায় সার্দ্ধদ্বিলক্ষ বীরপুরুষ ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, রাজপুতানার হিন্দু রাজন্যবর্গ মহারাষ্ট্রীয়-দিগের বৈভবোন্নতি-দর্শনে ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া ও দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি বহুদিনের অভ্যস্ত ভক্তিবশতঃ গোপনে মোসলমান পক্ষের সহায়তা করিতে

লাগিলেন। সুজাউদ্দৌলার সহিত মিত্রতা হেতু ও তাঁহার ভেদনীতিগুণে জাঠ-সর্দ্দার সুরজমল্ল যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিতপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া মোসলমান-পক্ষে মিলিত হইলেন। দিল্লীর আধিপত্যলাভে অসমর্থ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত তাঁহার স্বার্থসংঘর্ষও ঘটিয়াছিল। এই সকল কারণে মহারাষ্ট্রীয়গণকে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বৈদেশিক শত্রুর গতিরোধে অগ্রসর হইতে হইল। স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য এক লক্ষ সত্তর হাজার মহারাষ্ট্রীয় প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের উৎসাহ, বিধর্ম্মীদিগের প্রতি বিদ্বেষ, হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনে অনুরাগ ও আগ্রহ, যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি বিষয় মহলাররাও হোলকরের আদেশে লিখিত বখরে অতীব মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণামবিষয়ে উভয় পক্ষের মনে সংশয় থাকায় মধ্যে এক-বার সন্ধির প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মোসলমানগণ সন্ধির বিনি-ময়ে যে সকল স্বত্বের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে বাহুবলদৃপ্ত মহা-রাষ্ট্রীয়গণ কোনও ক্রমেই সম্মতিপ্রকাশ করিতে পারিলেন না। সেই সর্ব্ব-লোকক্ষয়কর আপৎকালে মহারাষ্ট্র-সেনানী যদি শত্রুপক্ষের যে কোনও সর্ত্তে সম্মতিদান করিয়া সেই ভীষণ লোকসংক্ষয় হইতে অব্যাহতিলাভ করিতেন, এবং পরে অবসর বুঝিয়া প্রথম মারাঠাযুদ্ধে পরাজিত ইংরাজদিগের ন্যায় "সন্ধি-পত্রে কলিকাতার (মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে পুণার) কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সম্মতি ছিল না" প্রভৃতি আপত্তি করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এত অল্প দিনের মধ্যে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত বখরলেখক বলেন, কুরুপাণ্ডবের লীলাক্ষেত্রে, কৃষ্ণসহায় ধর্ম্মরাজের (যুধিষ্ঠিরের) বিজয়ভূমিতে পদার্পণ করায় স্বধর্ম্মানুরাগী মহারাষ্ট্রীয়-দিগের যবনবিদ্বেষ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইলেন না। সে যাহা হউক, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ১৭৬১ খৃষ্টা-ব্দের প্রারম্ভে পাণিপথের সমরযজ্ঞে মহারাষ্ট্র বৈভবের পূর্ণাহুতি হইল! ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছু দিনের জন্য বিলীন হইল!

যুদ্ধাবসানে মোসলমানেরা বন্দীকৃত সৈন্যদলের শিরশ্ছেদ করিয়া বীরধর্ম্মে অবহেলা প্রকাশ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, যে সকল দ্রব্যসম্ভার-

দিগের আদেশে হতভাগ্যদিগের ছিন্নশীর্ষসমূহ পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইয়া নিষ্ঠুর আফগানদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আব্দালীর অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। উত্তর-ভারতের মোসলমানগণও এই যুদ্ধের পরিণামে কোনও সুফললাভ করিতে পারেন নাই। দিল্লীর গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তত্রত্য বাদশাহ-গণের অবস্থা দিন দিন হীনতর হইতে লাগিল। পূর্ব্বাঞ্চলে ইংরাজ ও দক্ষিণ-ভারতে হাইদর আলি এবং পঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুদয় হইল।

এই দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও লক্ষাধিক সৈনিক এই সংগ্রামানলে ভস্মীভূত হন। মহা-রাষ্ট্র দেশের প্রায় সমস্ত সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত জাইগীরদার পাণিপথে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। বহুসংখ্যক মারাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়! মহা-রাষ্ট্রের একটি পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সুতরাং গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বালাজী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ভাউ সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের এরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় শ্রবণ করিয়া বালাজীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভাউ সাহেবের শোকে ও বিয়োগ-বিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকারশ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই গতাসু হইলেন। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী নেতার অভাবে মহারাষ্ট্র সমা-জের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল।

এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যেরূপ অপার ধনসম্পত্তি, অসংখ্য বীরপুরুষ ও অপরিমেয় যুদ্ধ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। ভারতের অপর কোনও জাতির এরূপ বিপৎপাত হইলে তাঁহারা অচিরাৎ ধরাশায়ী হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্র সমাজের মূলে যে ভারতব্যাপী হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপন ও স্বধর্ম্মের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ করিবার পবিত্র বাসনা-বীজ নিহিত ছিল, তাহাই এই ঘোর বিপৎকালেও তাহার প্রাণরক্ষা করিল। পাণিপথের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের অগ্রগতি কিছু দিনের জন্য নিবারিত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে মারাঠাদিগের অধঃপতন হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধের পাঁচ মাস পরেই অসাধারণ-অধ্যবসায়সম্পন্ন মহারাষ্ট্র-সেনাকে দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে আপনাদিগের আধিপত্য-স্থাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রসমাজের অধিনায়কত্ব লইয়া পুণায় গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। বালাজীর অন্যতম পিতব্যপুত্র রঘুনাথরাও (দাদা সাহেব) দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী আনন্দীবাঈয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রীর পরামর্শানুসারে তিনি রাজ্যের অর্দ্ধাংশের প্রার্থনা করায় নূতন বিভ্রাটের সূচনা হইল। বালাজীর পুত্র মাধবরাও তরুণবয়স্ক হইয়াও পিতৃব্যের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক অন্তর্ব্বিপ্লবের শান্তি করিলেন। বিবেক-ভ্রষ্ট রঘুনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তিহ্রাস হইয়াছে দেখিয়া হাইদ্রাবাদের নিজাম আপনার ক্ষমতাবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। রঘুনাথরাও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন; কিন্তু পেশওয়ের হস্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রাঘবের সহস্র চেষ্টা-সত্ত্বেও সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সম্মত হইল না! কাজেই দাদাসাহেবকে শত্রুহস্তে বন্দী হইতে হইল। যুবক মাধবরাও যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিবেশে পিতৃব্যের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃব্যের দুর্দ্দশাদর্শনে বিচলিত হইয়া স্বীয় রক্ষিবর্গ সহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃদ্ধ মহলাররাও হোলকর, এ সময়ে নিজামকে আক্রমণ না করিয়া পুণার সিংহাসন হস্তগত করিবার জন্য মাধবরাওকে পরামর্শ দান করিলেন। মাধবরাও বলিলেন, "কাকাকে শত্রুর হস্তে ফেলিয়া কোন্ মুখে পুণায় ফিরিব?" যুবকের এই মহত্ত্বপূর্ণ উত্তরে বৃদ্ধ মহলার রাও লজ্জিত হইলেন। মাধবরাও শৌর্য্যবলে অচিরে নিজামকে পরাজিত করিয়া পিতৃব্যের মুক্তিসাধন করিলেন। এই ঘটনায় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি দাদাসাহেবের স্নেহ বর্দ্ধিত হইল। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে মাধবরাওকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন!

মাধবরাও তেজস্বী, কোপনস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি কাহারও অন্যায় আচরণে ক্ষমাপ্রদর্শন করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, একদা তাঁহার মাতুল কোনও অনাথা যুবতীর প্রতি পাপদৃষ্টি করিয়াছিলেন। মাধবরাও তাহা অবগত হইলে মাতুলের প্রতি কঠোর বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া অপক্ষপাতিত্বের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার জননী ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে রাজধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "বেগার" ধরিবার প্রথা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত

ষ্ঠিত নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রজাদিগকে সুখী করিবার জন্য মাধবরাও বিবিধ হিতকর ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিত রামশাস্ত্রী তাঁহার শাসনসময়ে মহারাষ্ট্রদেশের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। (১) মহ্লাররাও হোলকরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈকে অন্যায়-পূর্ব্বক অধিকারচ্যুত করিয়া হোলকর রাজ্য খাস করিবার জন্য অর্থলুব্ধ দাদা-সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ মাধবরাও বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহার পাপচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এই সময়ে হাইদ্রাবাদের নিজামের দেওয়ান রুখমতদ্দৌলা স্বীয় প্রাসাদ-নির্ম্মাণের জন্য এক ব্রাহ্মণের অধিকৃত ভূমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিজামের দরবারে বহু চেষ্টা করিয়াও কোনও প্রতিকার পাইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি পেশওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। পুণা-দরবার হইতে এ বিষয়ের প্রতিকার করিবার জন্য নিজামসরকারে কয়েকবার পত্রাদি প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, নিজাম তৎপ্রতি মনোযোগ করিলেন না। তখন মাধবরাও নবাবের চৈতন্যোৎপাদনের জন্য সেনাসজ্জা করিলেন। মারাঠা ফৌজ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সন্ধিপ্রার্থী হইলে মাধবরাও বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পিত হইলেই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব। এই অভিযানের ব্যয়স্বরূপ নিজাম স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে যাহা দিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু নবাবকে কোরাণস্পর্শপূর্ব্বক বংশপরম্পরাক্রমে ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিবার সনন্দ লিখিয়া দিতে হইবে।" নবাব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলে মহারাষ্ট্র সৈন্য পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইল।

মাধবরাওয়ের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে পুনর্ব্বার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে মনে করিয়া যাঁহারা মস্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি স্বভুজবীর্য্যে স্বল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে দমিত করিলেন। নাগপুরের ভোঁসলেগণ এই সময়ে একটা অন্তর্বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবরাওয়ের কৌশলে পুনরায় মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যে দুর্দ্ধর্ষ হায়দার আলি,

(১) ভূতপূর্ব্ব দাসী পত্রিকায় রামশাস্ত্রীর পবিত্র জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

নিজাম আলি, আরকটের নবাব ও কুটিলনীতিকুশল ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রশক্তির নিকট বিনত হইলেন। মধ্যভারতের ও রাজপুতানার নরপতিগণ মহারাষ্ট্র-বিক্রমে স্তম্ভিত হইয়া পুনর্ব্বার পেশওয়েগণকে করপ্রদান করিতে লাগিলেন। জাঠেরাও পরাভব স্বীকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে, খৃঃ ১৭৭০ অব্দে দিল্লীর দ্বারদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সিংহনাদে কম্পিত হইতে লাগিল। পাণি-পথে পরাজয়ের পর মারাঠাগণ যে এত অল্পকালের মধ্যে চর্ম্মণ্বতী (চাম্বল) নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা রোহিলাদিগের স্বপ্নেরও অতীত ছিল! শৌর্য্যশালী শিখগণ আফগান-দমনে নিবিষ্ট হওয়ায় রোহিলাগণ, দিল্লী, আগ্রা ও গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে আপনাদিগের প্রভুত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের স্পর্দ্ধা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহারা পরিশেষে দিল্লীর শাহ আলমের বৃত্তি রহিত করিয়া বেগমদিগকেও নানা প্রকারে অবজ্ঞাত করিয়াছিলেন! এ দিকে দিল্লীশ্বর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহাদিগের আশ্রয়ে এলাহাবাদে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ রোহিলাদিগের দমনপূর্ব্বক মোগলবংশধর শাহ আলমকে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ১৭৭১ খৃঃ ২৫শে ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রীয়-গণের সহায়তায় দিল্লীতে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেককার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দিল্লীবাসিগণ রোহিলাদিগের উদ্ধত ব্যবহারে অতীব মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রকৃত বাদশাহকে সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন; উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহত হইল।

ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়গণ মোসলমানদিগের হস্ত হইতে অযোধ্যা, বারাণসী ও প্রয়াগের "উদ্ধারসাধন" করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।* এমন সময় দাক্ষিণাত্য হইতে পেশওয়ে মাধবরাওয়ের অসুস্থতার সংবাদ আসিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্ভাগ্যক্রমে ২৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাধবরাও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন! তাঁহার প্রধান সেনাপতিগণকে উত্তরভারতে প্রভুত্ববিস্তার কার্য্যে

* "উদ্ধার-সাধন"—এই পদটির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ প্রার্থনা করি। শুদ্ধ অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগের সম্বন্ধে নহে, মোসলমান-শাসিত প্রদেশমাত্রের অধিকার সম্বন্ধে এই পদের ব্যবহার মহারাষ্ট্রীয় বখর ও প্রাচীন পত্রাদিতে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। কোনও মহদ্ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া দেশবিজয়কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইত কি না সন্দেহ।

ব্যাপৃত দেখিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে হায়দার আলি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণে স্বীয় সেনাপতিদিগকে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য মাধবরাওকে আদেশ প্রেরণ করিতে হইল। সেনানীগণ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রপতি মাধবরাওয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমস্ত আশা ভরসা নির্মূল হইল। একছত্র হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপনের সুযোগ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। ইংরাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতাবিস্তারে অবকাশ পাইলেন। অকালে মাধবরাওয়ের মৃত্যু না ঘটিলে মহারাষ্ট্রশক্তির বিলোপ ঘটিত কি না সন্দেহ।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মাধবরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ষোড়শবর্ষবয়স্ক নারায়ণরাও রাজ্যারোহণ করিলেন। দাদাসাহেব (রঘুনাথ রাও) তাঁহার নামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আনন্দীবাঈয়ের কুমন্ত্রণায় তাঁহার মতিভ্রংশ ঘটিল। পাপীয়সীর প্ররোচনায় ১৭৭৩ খৃঃঅব্দের ভাদ্রমাসে নারায়ণরাও অতি-শোচনীয়রূপে নিহত হইলেন। (ক) আবার পুণায় অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইল। সুচতুর ইংরাজগণ সেই সুযোগে পূর্ব্বকৃত সন্ধিভঙ্গ করিয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নারায়ণরাওয়ের সদ্যোজাত ঔরস পুত্রকে অধিকারচ্যুত করিয়া দুরাচার রঘুনাথকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজেরা বদ্ধপরিকর হইলেন। নারায়ণরাওয়ের মৃত্যুতে পুণায় যখন গোলযোগ উপস্থিত হইল, সেই সময়েই তাঁহারা মহারাষ্ট্ররাজ্যের একটি বন্দর অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে ইংরাজদিগের রাজ্যলোভ এরূপ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুণা-দরবারে উৎকোচপ্রদান, বিদ্রোহের উত্তেজনা, রাজপুরুষদিগের মধ্যে বিদ্বেষ-সঞ্চার প্রভৃতি বিবিধ উপায়-অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রঘুনাথরাওকে লইয়া মহারাষ্ট্রসমাজে বিপ্লবের সূচনা হইলে তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা ভ্রাতুষ্পুত্র-হন্তা রঘুনাথের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাজেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ছয় বৎসর পরে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ইংরাজেরা এরূপ অন্যায়যুদ্ধে আর কখনও লিপ্ত

(ক) এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্যের ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হন নাই। বোধ হয়, পৃথিবীর কোনও সুসভ্যজাতি কখনও এরূপ অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই।

এ সময়ে পুণায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের কেহই নেতা ছিলেন না। মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে মতভেদ ও স্বার্থসাধনেচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না; এবং জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ায় পুণা-দরবারের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময়ে আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ভাউসাহেব পাণিপথের যুদ্ধে নিহত হইলেও তাঁহার শবদেহ পাওয়া যায় নাই। এই কারণে তিনি পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কথা অবগত হইয়া বাজী গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি সহসা ভাউসাহেব বলিয়া পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজেরা তাহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্বল্প দিনের মধ্যেই সেই প্রবঞ্চক ধৃত হইল। পুণার দরবার তাহার বিচারের জন্য পঞ্চায়েৎ বা কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগের বিচারে বাজী গোবিন্দ প্রবঞ্চক (pretender) প্রতিপন্ন হইল। ভাউসাহেবের স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রবঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন তাহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনার অবসান হইতে না হইতে কোহ্লাপুরপতি পেশওয়ের রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এইরূপ দুঃসময়েও মহারাষ্ট্র রাজমন্ত্রী নানাফড়ণবীসের মন্ত্রণাকৌশলে ও মহারাষ্ট্রীয়গণের অধ্যবসায়গুণে কয়েকবার ইংরাজদিগের পরাভব হইল। তাঁহারা দুইবার ক্ষমা চাহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুইবার সন্ধি করিলেন। তথাপি ইংরাজ কোম্পানীর অবাধ্যতা কমিল না। তাঁহারা বিলাতের ও কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের অসম্মতির উল্লেখ করিয়া আবার সন্ধিভঙ্গ করিলেন! সুতরাং আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। এ দিকে হায়দার আলি ও দাক্ষিণাত্যের অপর সামন্তগণ মহারাষ্ট্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। হোলকারও এই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজরক্ষিত রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহারাষ্ট্রদেশের এরূপ দুরদৃষ্ট অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আর কখনও হয় নাই। কিন্তু নানাফড়ণবীসের নীতিকৌশলে শীঘ্রই এ দুর্দ্দিন ঘুচিল। ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়া পরাভবস্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ হইল! রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাঈ বন্দিভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন!

নারায়ণরাওয়ের অল্পবয়স্ক পুত্র সওয়াই মাধব রাওকে (মাধবরাও নারায়ণকে) রাজা করিয়া নানাফড়ণবীস মহারাষ্ট্রবাসীকে সুশাসনে সুখী করিলেন। নিজাম ও টিপুসুলতান মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্যস্বীকারে বাধ্য হইলেন। মাহাদজী শিন্দে উত্তর-ভারতে গমনপূর্ব্বক গোলাম কাদেরের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে দিল্লীশ্বর ও তাঁহার পুরমহিলাদিগকে রক্ষা করিয়া ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহী মোসলমানদিগকে বাদশাহের অধীনতাস্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে (১৭৮৯ খৃঃ অঃ) "আলিজা বাহাদুর" উপাধি সহ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা-নিবারণের সনন্দ প্রদান করিলেন! রাজপুতানাতেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হইল। কাশী, প্রয়াগ ও অযোধ্যার উদ্ধারসাধনচেষ্টা এ সময়েও একবার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। সে যাহা হউক, মহারাষ্ট্ররাজ্যের এরূপ বৈভবোন্নতি ইতঃপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এরূপ শান্তি বোধ হয় বালাজী বাজীরাওয়ের সময়েও স্থাপিত হয় নাই। পেশওয়ে মাধবরাও অল্পবয়স্ক হইলেও সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারমণ্ডলী তাঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিতেন। উত্তরে শতদ্রু হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য অন্তঃশত্রুবিহীন হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈর সুশাসনে মালবের প্রজারা যেরূপ সুখী হইয়াছিল, বেরার, নাগপুর, গুজরাথ, মহারাষ্ট্র, কঙ্কণ প্রভৃতি প্রদেশেও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনে নানা প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে মহারাষ্ট্রীয়গণের সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমশঃ অস্তাচলপথের পথিক হইতেছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ অব্দের মধ্যে মহাদজী শিন্দে প্রভৃতি প্রধান সেনানীগণ ও নানাফড়ণবীস প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একে একে লোকান্তরিত হইলেন। পেশওয়ে সওয়াই মাধবরাও-ও একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৭৯৫ খৃঃ) ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ দুর্ঘটনা-পরম্পরায় অল্পদিনের মধ্যে রাজকার্য্যধুরন্ধর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের ও সমরকুশল সেনাপতিদিগের অভাবে মহারাষ্ট্রসমাজ শক্তিহীন হইল। অনেক স্থানেই

"অবলা যত্র প্রবলা বালো রাজা নিরক্ষরো মন্ত্রী"

হইয়া উঠিল। কাজেই সুকর্ণধারের অভাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাষ্ট্রপোত কালসাগরে বিপন্ন হইল।

এই সময়ে গণ্ডোপরি বিস্ফোটকের তুল্য তরুণবয়স্ক বাজীরাও মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে অধিবেশন করিলেন। ইনি রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাঈর পুত্র। জনক জননীর সমস্ত দোষই তাঁহাতে মূর্ত্তিধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার কল্যাণে কপটাচার ও দুর্ব্বৃত্ততা, বারুণী ও বারাঙ্গনা রাজসভায় প্রবেশলাভ করিল। শৌর্য্য, সাধুতা ও স্বদেশপ্রীতি ক্রমশঃ বিলীন হইতে লাগিল। সামরিক ব্যয়ের হ্রাস করিয়া তিনি বিলাসব্যসনে রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়িত করিতে লাগিলেন। অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজভক্ত কর্ম্মচারীদিগের হত্যায় ও নিগ্রহে এবং প্রজাদিগের লুণ্ঠনেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত কাপুরুষ মহারাষ্ট্র-সমাজে ইতঃপূর্ব্বে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইংরাজদিগের কুটিলনীতির মর্ম্মগ্রহণ করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। তিনি সেনাপতিদিগের জাইগীর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এরূপ ব্যক্তির হস্তে রাজ্যনাশ না হওয়াই বিচিত্র। যশোবন্তরাও হোলকর একবার ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র তেজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হোলকর রাজ্য বালকের ক্রীড়াভূমি হইল। তরুণবয়স্ক শিন্দে অন্তঃপুর-বিহারসুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁসলেগণ আত্মকলহে মত্ত হইলেন। রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের ইতিহাস পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ।

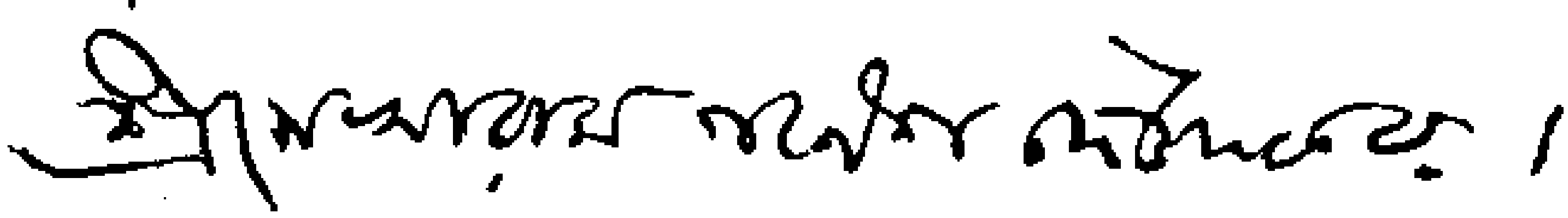
১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শিবাজী যে স্বরাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নরাধম বাজীরাও তাহা ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমার্থসাধনের জন্য বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিলেন। তাঁহার পরমার্থ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

ফলতঃ পরমার্থসাধন সম্বন্ধে রামদাস স্বামীর উপদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াই মহারাষ্ট্রীয়গণ অবনতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পবিত্র মহারাষ্ট্রধর্ম্মের পালনে অনবহিত হওয়ায় তাঁহাদিগের অধঃপতনের আরম্ভ হয়। সদাচার, নিস্পৃহতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সাত্ত্বিক নীতি যে রামদাস-প্রণীত মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, এ কথা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সহিত মহারাষ্ট্রসমাজের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। রামদাস-প্রণীত ধর্ম্ম হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের পক্ষপাতী হইয়াও পরমার্থমার্গের অন্তরায়-স্বরূপ ছিল না। সেই কারণেই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের ন্যায় উহা অতীব কষ্ট-

সাধ্য ছিল। কোনও সমাজই বহুদিন এরূপ কঠোর ধর্ম্মের পালনে সমর্থ হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণও কিছু দিন পরে ঐ ধর্ম্ম হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিষ্কাম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার হ্রাস হওয়ায় "মহারাষ্ট্রীধর্ম্ম" (মহান্ রাষ্ট্রের উপযোগী স্বত্ত্বগুণপ্রধান হিন্দুধর্ম্ম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পালনীয় ধর্ম্ম) এই গৌরবকর পবিত্র সংজ্ঞাটিও পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্র সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইল, এবং কর্ম্মকাণ্ডবহুল রাজস হিন্দুধর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করিল। চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা সোপচার পূজার্চ্চনা সমধিক পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় সমাজে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, কপটতা ও স্বার্থসাধনেচ্ছা বলবতী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। নিষ্কামধর্ম্মের নিগড় শিথিল হওয়ায় মহারাষ্ট্রসমাজেও এই সকল দোষ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল। মহ্লাররাও হোলকরের অবৈধ স্বার্থপরতায় পাণিপথে মহারাষ্ট্রগণের ভাগ্য বিপর্য্যস্ত হয়। রোহিলাদিগের দমনে হোলকরই মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধকালেও তিনি স্বার্থানুরোধে পাপিষ্ঠ রঘুনাথের ও ইংরাজ কোম্পানীর সহায়তা করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁস্লেদিগের দুর্ব্ব্যবহারেও মহারাষ্ট্র-সমাজের অল্প ক্ষতি হয় নাই। নারায়ণ রাওয়ের হত্যার জন্য আনন্দী বাঈর অপেক্ষা নাগপুরের ভোঁস্লেগণ কোনও অংশে অল্প দায়ী ছিলেন না। তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা ও ক্রূরতার জন্য সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজ বিপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গে তাঁহারাই মহারাষ্ট্র-নাম ঘৃণিত করিয়া তুলিবার প্রধান কারণ। প্রথম মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে ইঁহারা ইংরাজদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের অনিষ্টসাধনে বিরত হন নাই। শিন্দে (সিন্ধিয়া) পরিবার বহুদিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থের অনুবর্ত্তী হওয়ায় দেশের অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। স্বয়ং পেশওয়েগণও সর্ব্বত্র নিষ্কাম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ফলতঃ সাত্ত্বিক মহারাষ্ট্রধর্ম্ম উপেক্ষিত মহারাষ্ট্র-সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইতেছিল। তথাপি হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপনপূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মকে নিষ্কণ্টক করিবার পবিত্র বাসনাবশতঃ উহা বহুদিন সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভারতে আর কোনও জাতির হৃদয়ে সেই মহনীয় বাসনার উদ্ভব হয় নাই বলিয়া তাঁহারা এরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ উচ্চাশায় হৃদয় পূর্ণ না থাকিলে তাঁহারা পুনঃপুনঃ বাত্যাহত হইয়াও এরূপ দীর্ঘকাল আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন না।

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও অধঃপতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ। যাঁহারা কেবল দোষদর্শী, তাঁহারা ইহাকে অরাজকতার ইতিহাস বলিবেন। তাঁহাদিগের জন্য আমরা গুণগ্রাহী স্যার জন সলিভানের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"Pray do not give the enemy an advantage by speaking in unqualified terms of the bad Government of our predecessors. Considering the incessant wars and revolutions in which they had been engaged for a full century after the Moghul Empire broke up, it is quite a wonder that there was any Government at all. Yet in the midst of incessant fighting the civil institutions were undisturbed and almost everywhere the country was flourishing. Since our last good piece of work, when we put down the Pindaray ravages in 1818, we have held India with such an iron grasp that hardly a shot has been fired in our territory, but what have we made of this quiet interval? The Government is more in debt and I doubt if the people are so rich. Pray draw largely on your biographical stores as you go on. Give us Nana Furnavis and such like. What poor pigmies we are as Indian administrators, when compared with natives of that stamp!" *



* জেনারেল ব্রিগস্ নানা ফড়নবীসের জীবন-চরিতরচনাকালে ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ রাজপুরুষগণের সহিত এদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার একটি পত্রের উত্তরে স্যার জন সলিভান ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই একাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্বপন-পুরে।

১

স্বপন-পুরে
তোমাতে আমাতে,
বেড়াব দু'জনে,
নিকটে দূরে—
স্বপন-পুরে!

সুরভি-শ্বাস
মৃদুল, মধুর,
যূথীমুকুলের,
ঘন উচ্ছ্বাস
ক্ষীণ মদিরা
ঝরা বকুলের,

মধু গুঞ্জন
অলস পাথার
বনমধুপের,
মৃদু কম্পন,
তরঙ্গ- দোল,
তটিনী-বুকের,

—বাঁশীর সুরে—
তোমাকে আমাকে
বাহিবে দু'জনে
নিকটে দূরে,
স্বপন-পুরে!

২

স্বপন-পুরে
কে দেখাবে পথ,
কে লবে দু'জনে,
বাঁশীর সুরে,
নিকটে দূরে?

সন্ধ্যা-আকাশে
অলস যাত্রী
স্বর্ণ নীরদ-রাশি,
মেঘের-পাশে
উতলা বলাকা
উড্ডীন পাশাপাশি,

স্বর্ণ-কিরণে
ধরিবারে তারা
যে পথে ভাসে,
কুসুম-বনে
ফেরে প্রজাপতি
যে পথে আলসে,

সে পথ ধরে,
তোমাতে আমাতে,
ফিরিব দু'জনে
নিকটে দূরে,
স্বপন-পুরে,
বাঁশীর সুরে!

৩

ওগো স্বপন-পুরে
তোমাতে আমাতে
ফিরিব দু'জন
বাঁশীর সুরে
নিকটে দূরে।

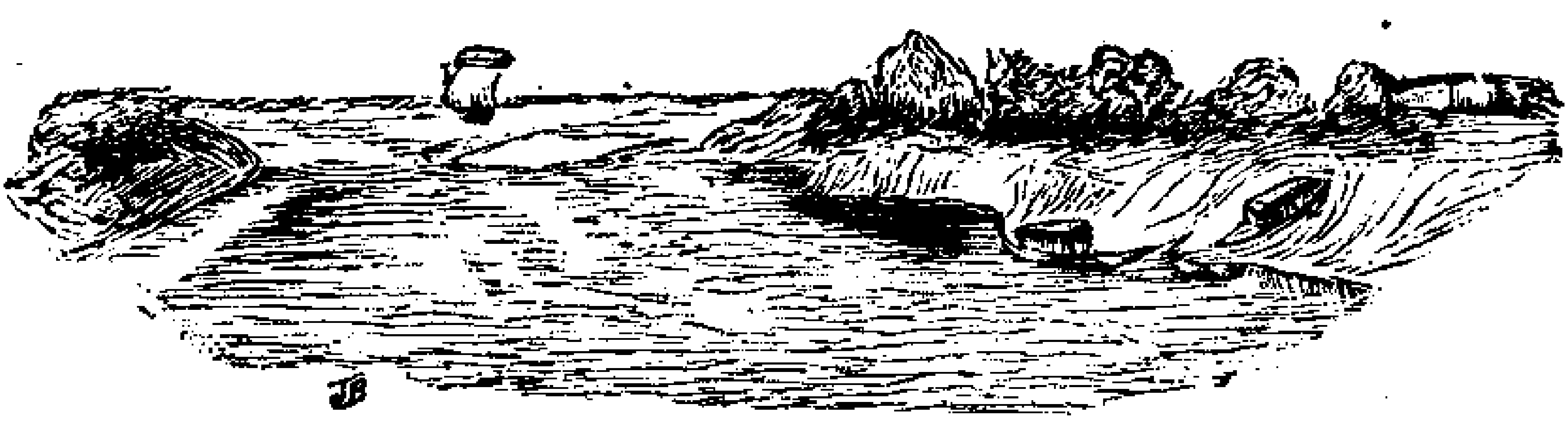
ওগো ঘুমের অতলে
প্রাণের বিরলে
পূর্ণ মিলন,
মুগ্ধ জীবন।

ওগো স্বপন- আবেশে
প্রেমের বিলাসে
মিলিব দু'জন—
পূর্ণ মিলন।

কোথা নাহি কোন বাধা,
দুটি প্রাণ প্রেমে সাধা,

ওগো! তোমাতে আমাতে
আমাতে তোমাতে
ফিরিব দু'জন।
অতুল মিলন,
অটুট বাঁধন,
হবে সে কোথায়,—
পাব সে কোথায়,
কাছে কি দূরে,
জগৎ ঘুরে?

ওগো! মুগ্ধ জীবন।
ওগো তোমাতে আমাতে
আমাতে তোমাতে
মিলিব দু'জন
বাঁশীর সুরে
স্বপন-পুরে,—
পূর্ণ-মিলন।



গোরাই ও পদ্মার সঙ্গমে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু।

রাত্রিশেষে কুষ্টিয়া ষ্টেশনে নামিয়া ঘাটে আসিলাম। বৈশাখের ক্ষীণাঙ্গী গোরাই সম্মুখে প্রবহমানা। অন্ধকারে পরপার দৃষ্টির বহির্ভূত। ঘাটে ষ্টীমার বাঁধা ছিল। তাহার চিমনী হইতে অল্প অল্প ধূম উদ্গত হইতেছিল। শুনি-

লাম, ঘাটের উপরে ষ্টেশন-ঘরে টিকিট কিনিতে হইবে; কিন্তু সে ঘরে কাহারও অস্তিত্ববোধ করিতে পারিলাম না। অগত্যা ষ্টীমারে গিয়া সম্মুখ-ভাগে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় শ্রান্ত হইয়াছিলাম। একটু তন্দ্রা আসিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ষ্টীমারের বংশীধ্বনির ভৈরব রবে চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলাম। সে ধ্বনি যাত্রীদিগকে টিকিট-ক্রয়ের জন্য আহ্বান করিতেছিল। আমি পুনরায় টিকিট-ঘরের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। এবার আমি ষ্টীমারের একজন খালাসীর শরণ লইলাম; বেচারী আমাকে অশেষ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিল।

তখন নদীর পর পারে পূর্ব্ব দিক রক্তাভ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষীণালোকে সে দিকে বালুকারাশি ও তৎপশ্চাতে বহু দূরে গ্রামের বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছিল। কিনারায় রেলপথে একখানা মালের গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে চলিয়া গেল। দুই জন খালাসী ছুটাছুটি করিয়া ষ্টীমার বন্ধনমুক্ত করিল; তার পর গোরাইয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাষ্পীয় তরণী ছুটিয়া চলিল।

নদীর জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড চড়া বারিরাশির এই অবিরাম অপ্রতিহত গতি উপেক্ষা করিয়া আপনার দেহভারে আপনি ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্টীমার চড়া প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল। নদী-তীরে দূরাগত দুই একটি স্ত্রীলোক কলসকক্ষে ষ্টীমারের দিকে চাহিয়াছিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে শিলাইদহের ঘাটে আসিয়া পঁহুছিলাম। অদূরে পদ্মা ও গোরাইয়ের সঙ্গমস্থল; দূরে, বহু দূরে পদ্মার পর পার সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল; তৎপশ্চাতে প্রভাতালোকে মেঘের গায়ে বর্ণ-বৈচিত্র্য যে কি পরম রমণীয় শোভার বিস্তার করিয়াছিল, তাহা কেবল দেখিবার সামগ্রী, লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া "কুঠী-বাড়ীর" দিকে চলিলাম। বামে গ্রাম। সম্মুখে নীল আকাশের কোলে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রারম্ভে রবীন্দ্র বাবুর দ্বিতল গৃহ, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ ও সুন্দর। দুই এক জন কৃষক আমার পাগড়ী ও জোব্বাটাকে দুই হাত যোড় করিয়া প্রণাম করিল!

অনতিবিস্তৃত রোয়াকের উপর রবীন্দ্রবাবু হাস্যমুখে দণ্ডায়মান ছিলেন; আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে,—তুমি কাল আস্‌বে মনে করেছিলুম;—তা তোমার দেরী হ'ল কেন? এস!"

গৃহসজ্জা ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা রবীন্দ্র বাবুর উপযুক্ত। একটি কাঁঠাল কাঠের টেবিল,তাঁহার নিজের ফরমাইসমত শিলাইদহের এক জন সূত্রধর নির্ম্মাণ করিয়াছে। তদুপরি অনেকগুলি কাগজপত্র, দুই একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি, একটি রৌপ্যাধারে দোয়াত, আঠার শিশি ও বল্-পয়েণ্টেড নিবের বাক্স, বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত। তিনখানি সংযুক্ত আয়নার মধ্যস্থলে একটি দেশীয় মৃণ্ময়ঘট পুষ্পাধাররূপে অবস্থিত হইয়া টেবিলের শোভাসম্পাদন করিতেছিল। তৎপশ্চাতে দেওয়ালের গায়ে রবীন্দ্র বাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অঙ্কিত চুনার দুর্গের চিত্র বিলম্বিত। দিগন্তপ্রসারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উদারতা সে চিত্রে প্রত্যেক তূলিকাস্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্রকাব্য কবির উপভোগ্য বটে। কবি তাঁহার নিজের ভাষার কবি, চিত্রকর সমগ্র জগতের কবি; দুই জনেই চিন্তাশীল স্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত টেবিলের পৃষ্ঠে রবীন্দ্রবাবুর অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির ঠিকানা লিখিত আছে। টেবিলের দুই পার্শ্বে দুটি ছোট শ্বেতপ্রস্তরের সাইড-টেবিল। তাহার একটির উপরে একটি কাগজপত্র রাখিবার বাক্স, এবং অপরটির উপরে একটি ডেস্প্যাচ-বাক্স। বসিবার চেয়ারের দুই ধারে দুইটি ছোট হোয়াটনট, তদুপরি অনেক রকমের পুস্তক। দুইখানি আরাম-চেয়ার দেহবিস্তার করিয়া সর্ব্বদাই বিশ্রামের জন্য আহ্বান করিতেছে। একটি মোটা গদী-আঁটা ডাইভান, তাহার উপর ছোট বড় তাকিয়া। বাম পার্শ্বে একটি সোফা, পশ্চাতে একটি দেরাজ। হর্ম্ম্যতলে একটি মুলতানী গালিচা।

দুই একটি কথা কহিয়া আমি বেশপরিবর্ত্তন করিয়া আসিলাম। তাহার পর সকলে মিলিয়া চা পান করিতে ভোজনকক্ষে সমবেত হইলাম। সে দিন রবীন্দ্র বাবুর গৃহে এক জন বন্ধু অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি বড় সরল আমোদপ্রিয় লোক। ভোজনে বসিয়া তিনি গল্পে গল্পে আমাদিগকে খুব হাসাইয়াছিলেন। চা সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু একটু গদ্যময়; কারণ,তিনি তাহা পান করেন না। তবে সেই উপলক্ষে যে মিষ্টান্নগুলি দর্শকবৃন্দের লোচনলোভন এবং উদরতৃপ্তিকর হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি অনেকটা পদ্যময়।

আহারান্তে আমরা সকলে মিলিয়া পাঠাগারে সমবেত হইলাম। ড্রাই-

পর গল্প আরম্ভ হইল। রবীন্দ্র বাবু শিলাইদহের পুরাতত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন; তার পর কলিকাতার কথা উঠিল। রবীন্দ্রবাবু বলিলেন, "গত বারের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, তবে এবার যে সত্য সত্যই প্লেগ হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" অভ্যাগত বন্ধু বলিলেন, "তাহা ঠিক; কিন্তু প্রতি বৎসর যাহারা মরে, তাহারাই মরিতেছে, ভয়ের কোন কারণ নাই।" তামকূটধূমরাশি তাঁহার মুখের পার্শ্ব দিয়া হু হু করিয়া বাহির হইয়া গেল। বন্ধুর পক্ষে উহাই সান্ত্বনার সামগ্রী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কথায় রবীন্দ্র বাবু বলিলেন, "পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র সুবৃহৎ, এবং দায়িত্বও যথেষ্ট; সকলে মিলিয়া নিঃস্বার্থভাবে অন্তরের সহিত কার্য্য করিলে পরিষদ হইতে বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।" তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিষদের নূতন বাড়ী দেখিয়াছ?" আমি সায় দিলাম। রবীন্দ্রবাবু বলিলেন, "পরিষদ যে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, ইহা খুব সুখের বিষয়।" বন্ধু বলিলেন, "কি মহাশয়, ভাঙ্গা পা নয় ত?" রবীন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে দিন এ বিষয়ে হীরেন্দ্রবাবু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ত ভগ্নপদের আশঙ্কা হয় না।" তার পর হীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, সেরূপ সরল গম্ভীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা তিনি অল্পই শুনিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু একটুও বিচলিত হন নাই বলিয়া তাঁহার কথার ওজন বেশ গুরু হইয়াছিল।

তখন ডাক আসিল। একখানি চিঠি রবীন্দ্র বাবুর মুদ্রাকর লিখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এবার আমি অনেক কবিতা ধুলি-ঝাড়া করিয়াছি। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক একটু ভাল করিয়া ছাপাইতেছি, তাহার নাম 'ক্ষণিকা'।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এই ঘরে বসিয়া লেখেন?" তিনি বলিলেন, "প্রায়ই।" "আপনি কোন্ সময়ে লেখেন?" "তাহার ঠিক নাই, যখন মনে হয়, তখন খুব লিখে যাই।"

রবীন্দ্রবাবুর হাতে প্রায়ই একখানি অতি ক্ষুদ্র লাল খাতা থাকে, তিনি ইচ্ছামত তাহাতে লিখিয়া যান। গুণ গুণ করিয়া গান করা তাঁহার খুব অভ্যাস। তিনি যখন ঢিলা ইজের ও ঢিলা পাঞ্জাবী পরিয়া গুণ গুণ করিতে করিতে এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া বেড়ান, তখন লিখিবার কিছু মনে হইলে ঘড়ীর চেনে সংলগ্ন সোনার পেন্সিলটি দিয়া সেই ছোট লাল খাতায় লিখিয়া ফেলেন।

হইলেন। রবীন্দ্র বাবু তাঁহাদের শারীরিক অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অসুস্থ ভদ্রলোকটির জন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তার পর কোনও প্রজার কথায় বলিলেন, "গরীব মানুষ, তাহার অসুবিধা করিও না। মোকদ্দমায় কাজ নাই, যাহা করিয়া হয়, একটা বন্দোবস্ত করিয়া লও।"

ততক্ষণে কলিকায় একবার ফূৎকার দিয়া নল মুখে করিয়া বন্ধু সঙ্গীত-সমাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। রবীন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা সকল সময়ে নাটকের wit and humour বুঝিয়া অভিনয় করিতে পারেন না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নাটকের পাত্রের অবস্থায় ফেলিয়া ঠিক তাহারই মত অভিনয় করা বড় দুরূহ। তদ্ব্যতীত মানুষের এমন সকল খুঁটি নাটি অভ্যাস আছে যে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অভিনয় আন্ত-রিকতাশূন্য হইয়া পড়ে।" ইহার উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিলেন, "আমি সঙ্গীতসমাজে 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ের সময় অভিনেতৃগণকে এক একটি বাজে কাজ দিয়াছিলাম। কেহ গল্প করিতে করিতে গোঁফে তা দিতে-ছিলেন, কেহ ফ্যাঁস্ করিয়া খবরের কাগজের কোণ ছিঁড়িয়া শলাকা পাকা-ইয়া কাণ চুলকাইতেছিলেন, ইত্যাদি। এ সব খুঁটিনাটিগুলিতে অভি-নেতাকে স্বাভাবিক দেখায়, নহিলে নিতান্তই যেন অভিনয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।" তখন বন্ধু তাম্রকূট ছাড়িয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলি-লেন, "আর ঐ কাঁদুনির সুরটা!" রবীন্দ্র বাবু বলিলেন, "হাঁ, সে আর একটা আপদ বটে।"

প্রাতরাশের আশায় আবার ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলাম। তখন হু হু করিয়া পদ্মার হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বর্ষাকালে পদ্মা কি রকম?" রবীন্দ্র বাবু বলিলেন "ওঃ সে কি ভীষণ! পাবনার ঘাট হইতে শিলাইদহের ঘাট পর্য্যন্ত অনন্ত জলরাশি। আর সে অবিশ্রান্ত ভীম গর্জ্জন এখানে বসিয়া শুনিয়া যাও। পদ্মার আমি সকল মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। আমার ভয় হয় না।"

রাত্রে রবীন্দ্রবাবু তাঁহার নবরচিত কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্প আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। সেগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র; গল্পাভাস বলিলেও হয়। গল্পগুলির আখ্যানবস্তু মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখ লইয়াই গঠিত, কিন্তু সেগুলি এমন কৌশলে চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত যে, সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।



রবীন্দ্রবাবুর পল্লীগৃহ।

পরদিন প্রভাতে চা পান করিয়া শিলাইদহ পরিত্যাগ করিলাম। পদ্মা ও গোরাইয়ের বাস্তব চিত্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; কেবল মসীময় চিত্র সঙ্গে আনিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

হায়দর আলি।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে মুসলমান্ বীরদ্বয় দাক্ষিণাত্যে আপনাদের অমানুষী ক্ষমতার বিস্তার করিয়া এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং যাঁহারা পিতা পুত্রে ব্রিটিশ কেশরীকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলেন, সেই হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের কথা ইতিহাসপাঠকমাত্রই অবগত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সুপ্রসিদ্ধ বীরদ্বয়ের অন্যতর হায়দর আলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

হায়দরের পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ বেলোল ফকীরের বেশে পঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। তথায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে হায়দরাবাদের প্রায় ৫৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কালবর্গা প্রদেশস্থ অলন্দ নামক স্থানে আপনার আবাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র মহম্মদ আলি

ও মহম্মদ ওয়ালি কিছু কাল অলন্দ-বাসের পর বিবাহাদি করিয়া কর্ম্মের অন্বেষণে বহির্গত হন ও সীরা নামক স্থানে গমন করেন; তথায় তাঁহারা রাজস্বপদাতিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে ফতে মহম্মদ নামে মহম্মদ আলির এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই ফতে মহম্মদই হায়দর আলির পিতা।

মহম্মদ আলি ও মহম্মদ ওয়ালি দুই ভ্রাতা সীরা হইতে পরিশেষে মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব কোলার নামক স্থানে গমন করেন। তথায় মহম্মদ আলির মৃত্যু হইলে, মহম্মদ ওয়ালি ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া, তাঁহার পুত্র ও পরিবারবর্গকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পিতৃহীন ও সম্পত্তিচ্যুত হইয়া ফতে মহম্মদ যারপরনাই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কোলারের পদাতিকগণের জনৈক নায়ক তাঁহাদিগকে আশ্রয়প্রদান করায়, ফতে মহম্মদ কোনরূপে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ফতে মহম্মদ নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি কোলারের পদাতিক-দলে প্রবিষ্ট হন। পদাতিকের পদে নিযুক্ত হইয়া, ফতে মহম্মদ এরূপ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সুনাম বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে তাঁহার উপর সীরার শাসনকর্ত্তার দৃষ্টি নিপতিত হয়। পদাতিকপদের কার্য্যতৎপরতায় ও ফতে মহম্মদের সৈনিকোচিত সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া সীরার শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বিংশতি পদাতিকের নায়কের পদ প্রদান করেন। এই পদ প্রাপ্ত হইয়া ফতে মহম্মদ, ফতে নায়ক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন ও তাঁহার উন্নতির পথ দিন দিন প্রশস্ত হইতে থাকে। ফতে মহম্মদের প্রথম বিবাহে তিনটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। কঙ্কণের নবায়েত নামে কোন সম্ভ্রান্তবংশের একটি কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। নবায়েত-বংশীয়েরা ফতে মহম্মদের ন্যায় এক জন সামান্য নায়ককে সহসা কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইতেন না। কিন্তু ঘটনাচক্রে উক্ত বিবাহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত কন্যার পিতা কঙ্কণ হইতে আর্কট গমনকালে পথিমধ্যে হৃতসর্ব্বস্ব ও নিহত হওয়ায়, তাঁহার বিধবা পত্নী, পুত্র ইব্রাহিম সাহেব ও দুইটি কন্যাকে লইয়া কোলারে আসিতে বাধ্য হন। তাঁহারা যারপরনাই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রকার আশ্রয়ের অন্বেষ

মহম্মদের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ দিতে বাধ্য হন। ফতে মহম্মদের দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত ফতে মহম্মদের পুনর্ব্বার বিবাহ হয়।* এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ফতে মহম্মদের দ্বিতীয়া পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। নায়কের পদ হইতে ফতে মহম্মদ ক্রমে ক্রমে কোলারের ফৌজদারের পদে উন্নীত হন, এবং বোদিকোটা নামক স্থানের জায়গীর লাভ করেন। বোদিকোটায় অবস্থানকালে, তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম সাবাজ ও কনিষ্ঠের নাম হায়দর। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সাবাজের ও ১৭২২ খৃষ্টাব্দে হায়দরের জন্ম হয়। ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হইয়া ফতে নায়ক, ফতে মহম্মদ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। সীরার সুবেদারের স্বত্বরক্ষার জন্য যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ফতে মহম্মদ খাঁ, সেই যুদ্ধে গমন করেন ও নিজের প্রথম বিবাহজাত জনৈক পুত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উক্ত পুত্র ফতে মহম্মদের প্রভুর বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ফতে মহম্মদের প্রথম প্রভুর পুত্র আবদুল রসুল, স্বীয় বংশের প্রথানুসারে প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের প্রভুভক্তির প্রতিভূস্বরূপ তাঁহাদের পরিবারবর্গকে আপনার জায়গীরমধ্যস্থ রালিপুর নামক বৃহৎ দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহাদের সহিত ফতে মহম্মদের পরিবারবর্গও আবদ্ধ ছিলেন। আবদুল রসুল ও ফতে মহম্মদ উভয়েই যুদ্ধে নিহত হইলে, আবদুল রসুলের পুত্র আব্বাস কুলি খাঁ, কোনরূপে পৈতৃক জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পিতার কর্ম্মচারিগণের পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। ফতে মহম্মদের বিধবা ও পুত্রদ্বয়ের প্রতিও অত্যাচারের ত্রুটি হয় নাই। কোলারের ফৌজদারীকালে ফতে মহম্মদের নিকট অনেক টাকা প্রাপ্য ছিল বলিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট দাবী করা হয়। তাঁহারা উক্ত অর্থদানে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করায় আব্বাস কুলি খাঁ তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সেই অর্থ আদায় করিয়া লন। এইরূপে লুণ্ঠিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ফতে মহম্মদের বিধবা পত্নী আপনার পুত্র দুইটিকে লইয়া বাঙ্গালোরের কিল্লাদার স্বীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম সাহেবের নিকট উপস্থিত হন।

মাতুলের নিকট থাকিয়া সাবাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রীরঙ্গপত্তনের সৈনিকদলমধ্যে প্রবিষ্ট হন, এবং ক্রমে ক্রমে দুই শত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদা-

তিকের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। হায়দার অনেক দিন পর্য্যন্ত নিজ কার্য্যদক্ষতার কোনও পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। ২৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি কোন পদে নিযুক্ত হন নাই। তিনি লেখাপড়ার কোন ধার ধারিতেন না, কেবল বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিকারে অথবা দাঙ্গা হাঙ্গামাদিতে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত অব্দে, যৎকালে মহীশূর সৈন্য বাঙ্গালোরের ১২ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দেওনহুলি দুর্গ অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়ে হায়দর স্বীয় ভ্রাতার অশ্বারোহিগণের মধ্যে অবৈতনিক সৈনিক-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও অপরিসীম সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। তদবধি তিনি মহীশূর-সেনাপতি নঞ্জীরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। নঞ্জীরাজ তাঁহাকে ৫০ জন অশ্বারোহী ও দুই শত পদাতিকের পদে নিযুক্ত করিয়া, দুর্গের এক দিকের তোরণরক্ষার ভার প্রদান করেন। দেওনহুলি হইতে শ্রীরঙ্গপত্তনে পঁহুছিতে না পঁহুছিতে মহীশূরসৈন্য হায়দরাবাদের সুবেদার নিজাম উল মুলকের পুত্র নাজিরজঙ্গের সাহায্যের জন্য, আর্কট প্রান্তরে উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে হায়দর ও তাঁহার ভ্রাতা মহীশূরের সেনাপতি বার্কি বিন্‌কটরাওএর অধীনে তথায় গমন করেন। নাজিরজঙ্গ ফরাসী অধ্যক্ষ ডিউপ্লের চতুরতায় ফরাসিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও মহীশূরসৈন্য তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই, এবং হায়দর সেই সময়ে ফরাসীসৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া আপনাকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলেন। সেই যুদ্ধে নাজিরজঙ্গ পরাজিত হইয়া কর্পার নবাবের হস্তে পতিত ও অবশেষে নিহত হইলে হায়দর স্বীয় উন্নতির পথবিস্তারের সূচনা করেন। তিনি ৩০০ শত কার্য্যদক্ষ বিদর পদাতিক সৈন্যকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, নাজিরজঙ্গের সম্পত্তি হইতে দুইটি উষ্ট্রের উপর বোঝাই স্বর্ণমুদ্রা, তাহাদের দ্বারা দেওনহুলিতে পাঠাইয়া দেন। এই লুণ্ঠিত দ্রব্য ও পরে কতকগুলি অশ্ব ও বন্দুক সংগ্রহ করিয়া, তিনি স্বীয় উন্নতিসোপানের প্রথম স্তরের সূচনা করেন। মহীশূর সেনাপতি নঞ্জীরাজ বরাবরই তাঁহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। হায়দর ক্রমে ক্রমে লুণ্ঠনে অভ্যস্ত বিদর পদাতিকের সংখ্যা ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহে আপনার ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি করিয়া দেশমধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার হিসাবাদি বন্দোবস্তের জন্য তিনি কুন্তীরাও নামক জনৈক বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণকে আপনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। যদিও হায়দর তাদৃশ লেখাপড়া জানিতেন না বটে, তথাপি

তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির প্রভাবে, তিনি অল্পক্ষণমধ্যে গণিতসম্বন্ধীয় গণনাদি করিতে পারিতেন। মহীশূর সৈন্যের সহিত ত্রিচিনাপল্লী গমন করিয়া তথা হইতে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার পদ বৃদ্ধি হয়, ও ১৫০০ অশ্বারোহী ৩০০০ পদাতিক ও ২০০০ পিয়াদা ও ৪টী কামান রক্ষার জন্য অর্থ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে মহীশূরের সিংহাসনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তৎকালে চিককাকৃষ্ণরাজ মহীশূরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু নঞ্জীরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা দেবরাজ,রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। নঞ্জীরাজের কন্যার সহিত রাজার বিবাহ হয়। নঞ্জীরাজ রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনলাভের চেষ্টা করেন। ইহাতে দেবরাজ ভ্রাতার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। হায়দর কুণ্ডীরাওএর পরামর্শক্রমে শ্রীরঙ্গপত্তনের দিকে অগ্রসর হন। সেই সময়ে বালাজীরাওএর অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট অবস্থিত হইয়া,অনেক অর্থের দাবী করিয়া বসে। নঞ্জীরাজ প্রথমে অশক্ত ভাব দেখাইয়া পরে তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে ৩৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়। হায়দর শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের লোকজন তখনও পর্য্যন্ত অর্থসংগ্রহ করিতেছিল। নঞ্জীরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হায়দর বর্ষার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিদূরিত করিবার পরামর্শ করেন। তাহার পর দেবরাজের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে মহীশূরের সৈন্যগণ আপনাদের বেতনপ্রাপ্তির জন্য নঞ্জীরাজকে পীড়াপীড়ি করায়, নঞ্জীরাজ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং হায়দর ও কুণ্ডীরাওএর উপর এই গোলযোগ মিটাইবার ভারার্পণ করেন। হরি সিং নামে এক জন রাজপুত মহীশূর সৈন্যের মধ্যে হায়দরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দেবরাজ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহবর্ষণ করিতেন। দেবরাজের মৃত্যুর পর হায়দর স্বীয় আত্মীয় মুকদুম সাহেবের দ্বারা তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করান। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার মহীশূর আক্রমণ করে। সেই সময়ে হায়দর আলি মহীশূর সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অসীম শৌর্য্য প্রদর্শন করায়, মহারাষ্ট্রীয়েরা অবশেষে হায়দরের প্রস্তাবানুসারে সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুণ্ডীরাও মহীশূরের বৃদ্ধা রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, নঞ্জীরাজকে মহীশূর হইতে বিদূরিত করেন। ক্রমে হায়দরের সহিত কুণ্ডীরাওএর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বিশ্বজী

পণ্ডিত কুণ্ডীরাওএর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দরকে আক্রমণ করেন। হায়দরের পুত্র ও পরিবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হয়, এবং তিনিও পলায়ন করিতে বাধ্য হন। বিশ্বজী পণ্ডিত হায়দরের নিকট হইতে ৩ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া পুণার অভিমুখে চলিয়া যান। ইহার পর কুণ্ডীরাও হায়দরকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন ও অবশেষে নিজে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এইরূপে আপনার অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হায়দর মহীশূরের একমাত্র কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ক্রমে সীরার নবাবী প্রাপ্ত হন। পরে চিতল দুর্গ বেদনোর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া আপনার রাজ্যকে বহুদূরবিস্তৃত করিয়া তুলেন। বেদনোর হইতে বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী যারপরনাই প্রসন্ন হইয়া উঠেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হায়দর মালবার অধিকার করেন, এবং কোচিন ও পালঘাটের রাজারাও তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হন। ক্রমে ক্রমে যখন দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান হায়দরের অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার দমনের জন্য এক বিরাট আয়োজন আরব্ধ হয়, এবং ইংরাজেরা তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা,মহারাষ্ট্রীয়গণ,কর্ণাটের নবাব আনোয়ার উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলি ও হায়দরাবাদের নিজামের সহিত মিলিত হইয়া, হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা হায়দরের নিকট হইতে অনেকপরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। নিজামও অবশেষে উক্ত পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহারা ইংরাজের পক্ষ পরিত্যাগ করায়, ইংরাজেরা অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ চ্যাঙ্গুমা নামক স্থানে ঐ সমস্ত মিলিত সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন, ও অবশেষে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিন্‌কমলীতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। হায়দর আম্বূর নামক স্থান অবরোধ করিলে, কাপ্তেন কলডীট সাহসের সহিত আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। পরে কর্ণেল স্মিথ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। হায়দর পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সম্মুখীন হইতে না পারায় মাদ্রাজে উপস্থিত হন। তথায় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে মার্চ্চ ইংরাজদিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহাতে পরস্পরের অধিকৃত স্থান পরস্পরের অধীন থাকার বন্দোবস্ত, উভয় পক্ষের বন্দীদিগের প্রত্যর্পণ ও ভবিষ্যতে পরস্পরের সাহায্যের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত হায়দরের প্রথম যুদ্ধের অবসান ঘটে।

ইহার পর মধুজী পেশওয়ার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিলে, হায়দর সন্ধির সর্ত্তানুসারেই ইংরাজদিগের সাহায্যের প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহারা হায়দরকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন। কারণ, মহারাষ্ট্রীয়েরাও ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রার্থী ছিল। হায়দর আপনার অধিকারস্থ রাজ্যের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত সন্ধি করেন। ইংরাজদিগের এইরূপ ব্যবহারে হায়দর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ফরাসীদিগের সহিত যোগদান করেন ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজেরা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে সোয়ার্টজ নামে জনৈক দিনেমার মিশনারী সন্ধির জন্য ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে হায়দরের নিকট প্রেরিত হন। সোয়ার্টজ হায়দরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন যে, আমি এক জন পাদরী, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আসি নাই, তবে ঈশ্বরের রাজ্যে যাহাতে রক্তস্রোত প্রবাহিত না হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হয়, তাহারই চেষ্টায় আমি এখানে আসিয়াছি। হায়দর তাঁহার কথা শুনিয়া এইরূপ উত্তর করেন যে, আমিও শান্তির পক্ষপাতী, ইংরাজেরা যদি সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই সন্ধির প্রস্তাব অবশেষে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহার পর উভয় পক্ষ যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হন। হায়দর কর্ণাট আক্রমণের জন্য প্রভূত আয়োজন করেন; তিনি পেশওয়া, বেরারের রাজা নিজামের সহানুভূতি পাইয়া ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে বাঙ্গালোর অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার ৮৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে প্রায় ৪ শত ইউরোপীয় বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি লালীর ভ্রাতুষ্পুত্রের অধীনে সজ্জিত হয়। বাঙ্গালোর হইতে তিনি জুলাই মাসে কর্ণাটের দিকে যাত্রা করেন। চিত্তুর, পোটনভো, গঞ্জীভরম্ লুণ্ঠন করিয়া, মাদ্রাজের সমীপস্থ হইলে মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট সার হেক্টর মনরোর অধীনে ৫ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়া কর্ণেল বেলির অধীনস্থ ৩ হাজার সৈন্যের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে আদেশ দেন। কর্ণেল ব্রেথওয়েট ১৫ শত সৈন্যের সহিত পণ্ডিচেরী হইতে মাদ্রাজের দিকে ও কর্ণেল কসবাই দুই হাজার দেশীয় পদাতিক, দুই দল নবাবের অশ্বারোহী ও দুইটি কামানের সহিত বিপক্ষগণের পরস্পরের সংযোগনিবারণের জন্য উত্তর দিকে প্রেরিত হন। হায়দর ইতোমধ্যে মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হন ও সেণ্ট

টমাসের ইউরোপীয় অধিবাসিগণকে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। পরে তিনি মাদ্রাজ হইতে আর্কটের দিকে ধাবিত হন। সার্ হেক্টর মনরো গঞ্জিভরমে উপস্থিত হইয়া কর্ণেল বেলির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। বেলি পেরাম্ বেকম্ নামক স্থানে হায়দরের পুত্র টিপু সাহেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মনোরর সহিত যোগ দিতে পারেন নাই। মনরো কর্ণেল ফ্লেচারের অধীন এক দল সৈন্য বেলির সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। হায়দর এই সংবাদ পাইয়া আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া বেলিকে আক্রমণ করিলে বেলির অধীনস্থ যাবতীয় ইংরাজ সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তিনিও বন্দিরূপে বিপক্ষগণের হস্তগত হন। সার্ হেক্টর মনরোকে অগত্যা পিছু হটিয়া প্রস্থান করিতে হয়।

ইংরাজ সৈন্যের দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে সার্ আয়ার কুট হায়দরকে দমন করিবার জন্য ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন। হায়দর ইতিমধ্যে আর্কট অধিকার করিয়া বসেন, এবং বুন্দীবাসে ইংরাজ সৈন্যগণকে অবরোধ করিলে কুট তাহাদের উদ্ধারের জন্য বুন্দীবাস অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হায়দরকে বুন্দীবাসের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহার পর কড্ডালোর, পোর্টনভো, ত্রিপাশোর, পলিলোর, বেলোর, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, নাগাপট্টম্ ও তেলীচেরী প্রভৃতি স্থানের মধ্যে কোন কোন স্থানের যুদ্ধে ও কোন কোন স্থানের অবরোধে ইংরাজদিগকে বিপন্ন করিয়া, এবং স্থানে স্থানে নিজেও পরাজিত হইয়া, হায়দরের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান ঘটে। তাঁহার পৃষ্ঠের উপরিভাগে প্রথমতঃ একটি স্ফোটকের সূত্রপাত হয় ও ক্রমে ক্রমে তাহা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। হিন্দু, মুসলমান ও ফরাসী চিকিৎসকগণের অপরিসীম চেষ্টাতেও হায়দরের পীড়ার নিবৃত্তি হয় নাই। হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র টিপু সুলতান পিতার পরিত্যক্ত সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হন, ও পরিশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় জীবনবিসর্জ্জন দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

এ মাসের বহি।

আকবর।*

বৈশাখ মাসের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমাদের দেশে নামের গুণ ও দোষ অতি বিস্তৃতরূপে স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত নহে; কার্য্যেও প্রতিপাদিত। নাম না করিয়া আমাদের কোন কাজ হয় না।" আকবর নামটা দেখিয়াই কেমন প্রথম হইতেই একটু ভক্তি হইয়াছিল। পড়িয়া দেখিলাম, ভক্তির যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আকবর নাম হইলেই আমাদিগের মনে সেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের কথা মনে পড়ে, কাজেই হয় ত অনেকে আশা করিবেন যে, গ্রন্থের নায়কও হয় ত সেইরূপ কোন নবাব বাদশা গোছের লোক। অতএব তাঁহাদিগের ভ্রমনিরাসের জন্য গ্রন্থকার গোড়ায় আকবরের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল;—"আকবর সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলে, গৌরকান্তি না হইলেও সৌম্যমূর্ত্তি ও বলিষ্ঠ। তাঁহার মাতুল কলিকাতার ডাক্তার, বড়লোক। সেই উপলক্ষে আকবরের পিতাও সমাজে একটু গৌরবান্বিত ছিলেন। আকবরের বিশ্বাস—লেখাপড়া শিখিয়া তিনিও মাতুলের ন্যায় বড়লোক হইবেন।"

গ্রন্থের প্রথমেই গ্রন্থকার তিনটি বালকের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম, ব্রাহ্মণবংশীয় অমরেশ্বর আচার্য্য;—গরিব, ভালমানুষ, সকলকেই ভয় করিয়া চলেন। দ্বিতীয়, ললিত কিশোর;—জমিদারবংশীয়, গর্ব্বিত এবং উদ্ধতস্বভাব। আর তৃতীয়, আমাদিগের নায়ক আকবর। তিন জনেই এক সঙ্গে পড়িতেন। এক দিন আকবর আদর করিয়া অমরের মাথায় একটি চাটি মারাতে ললিতকিশোর আসিয়া তাহার Champion হইয়া দাঁড়াইলেন। অমর তাঁহার রাগ থামাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন, শেষকালে রাগটা তাঁহার উপরই পড়িল, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আকবর ও ললিতে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপ একটি গল্প Edgeworth's Talesএ আছে। কিন্তু দেশভেদে রুচিভেদ, ইংরাজ বালকেরা লড়াই করিয়া নিজেরাই বিবাদের মীমাংসা করিল, কিন্তু বাঙ্গালীর সে উৎসাহ বা তেজ কোথায়? সহপাঠীরা পড়িয়া ললিত ও আকবরের যুদ্ধ থামাইয়া দিল; কিন্তু বিবাদটা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট পঁহুছিল; আর চিরকাল যেমন হইয়া থাকে, "বাঘে মহিষে যুদ্ধ করে, উলু খড়ের প্রাণ যায়", ললিত ও আকবরের বিবাদের ফলস্বরূপ বেচারা অমরেশ্বরের বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার গেল। তাহার পর পণ্ডিতমহাশয়ের অনুগ্রহে অমরেশ্বর যদিও স্কুলে পড়িতে পাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নানা বিপদ আসিয়া জুটিল। আজ

---

* শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত; হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত; সন ১৩০৫।

তাঁহার চালে খড় নাই, কাল তাঁহার পরণের কাপড় নাই, পরশ্ব তাঁহার ঘরে খাবার চাউল নাই, এইরূপ নানা বিপদে যখন বেচারা অমরেশ্বর ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তখন তাঁহার সহপাঠী আকবরই তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতেন। অমরেশ্বর বলিতেছেন, "ঘরের ভিতর জল পড়িতেছিল। যেখানে এতক্ষণ জল পড়ে নাই, খাটখানি সেইখানে ছিল ;—এখন চালের খড় উড়িয়া গিয়া সেখানেও জল পড়িল। শয্যাটি গুড়াইয়া মাতা পুত্রে তদুপরি বসিলাম। নূতন ছাতাটি মাথায় দিয়া বৃষ্টির জলে পুস্তকরক্ষা, শয্যারক্ষা ও কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিলাম।......রাত্রি অবসান হয়—আকবর আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে কতকগুলি পাকা ও আধপাকা আম। তিনি মুখে যাহাই বলুন—আমার মনে হয়—এই আমগুলি দিবার জন্যই তাঁহার এ সময়ে শুভাগমন। আকবর আসিয়া আমাদের দুর্দ্দশা দেখিলেন।...আকবর বৃহৎ এক বোঝা খড় লইয়া আমাদের গৃহদ্বারে দেখা দিলেন। মা কি বলিলেন—আকবর শুনিলেন না, দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন।.........তাঁহার (আকবরের) পিতা তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—'তুই এত দিন আমাকে এ কথা বলিস্ নাই কেন ?' এই সময়ে আমার দিকে দৃষ্টি পড়িল ; বলিলেন,—'তুমিই ত বাপু ফুলু আচার্য্য মহাশয়ের ছেলে ; তোমারই ত নাম অমর ; তুমি এখানে কত বার এসেছ ; তোমার ঘর ছাওয়া হয় নাই, খড় পাও নাই—এ কথা আগে ও আমাকে বলে নাই কেন ? এই ঝড়ে, এই বৃষ্টিতে, রাত্রির আঁধারে—গাদার খড় ভাঙ্গিয়া, নিজে মাথায় লইয়া যায় কেন ? গাদায় যদি সাপ থাকিত,—পথেই যদি সাপে কাটিত,—অন্ধকারে যদি পড়িয়া মরিত।' আকবর এবার চক্ষুর জলে পিতার বচন ডুবাইয়া দিলেন।"

এই দৃশ্য বড় সুন্দর, আর আরও সুখের কথা এই যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লেখনী হইতে ইহা বাহির হইয়াছে। বৃটীশ সিংহের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর অসদ্ভাব যে কত দূর অনিষ্টজনক, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। "নেড়ে", "যবন", "কাফের", এই সকল শব্দগুলি যে কত দূর অনিষ্টজনক, এবং এই একটি একটি কথাতে যে আমাদিগকে পরস্পর হইতে কত দূরে রাখিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। হিন্দুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শেখে। অথচ সেই মুসলমান তাহার এক দেশবাসী, এবং জীবনের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে তাহার সহিত একত্র করিতে হইবে। সাহেব যখন হিন্দুকে নিগার বলে, তখন তাঁহার মনে কি হয় ? কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুও মুসলমানকে 'নেড়ে' বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বাঙ্গালী হিন্দুর মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে যে, অপর ভারতবর্ষীয় জাতি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাই তাঁহারা বেহারীকে "ছাতুখোর", উড়িয়াকে "উড়ে মেড়া", মুসলমানকে "নেড়ে" প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু একবারও কি মনে হয় না যে, তুমি পরাধীন জাতি—প্রতি পদে পদদলিত হইতেছ, তুমি একটা 'নিগার' বহি আর কিছু নহ ! তোমার আবার অহঙ্কার কিসের ? তুমি কিসের জন্য অন্য স্বদেশবাসীকে ঘৃণা কর ? বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে মুসলমান আকবরের যে চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার সমদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অনেক হিন্দু উপন্যাসলেখক তাঁহাদিগের গ্রন্থে মুসলমানচরিত্রের কদর্য্য ভাবই দেখাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে এক জন খাঁটি হিন্দু লেখক, এক মুসলমান বালককে অন্যের আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থে অমরেশ্বর বলিতেছেন, "আকবর আমাকে ভালবাসিতেন; সুতরাং আমিও আকবরকে ভালবাসিতাম। ভালবাসার সম্মুখে জাতি-ভেদ, বর্ণভেদ থাকে না। প্রভাত-রৌদ্র অঙ্গে মাখিয়া সকল পদার্থই মোহন উজ্জ্বলরূপে দেখা দেয়। ভালবাসা-মাখান পদার্থ আরও উজ্জ্বল, আরও মধুর। আমি ব্রাহ্মণ, আকবর মুসলমান; কে ছোট, কে বড়—তাহা আমি জানি না। আর আমার জননীর মতে ইহাতে ছোট বড় হয় না। তবে সামাজিক সংস্থান অনুসারে আমাদের পরস্পর দূরতা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু প্রণয় রেলওয়ে টেলিগ্রাফের অপেক্ষাও দূরত্বসংকোচক; আমাদের উভয়ের অন্তরে আদৌ অন্তর ছিল না। একত্র আহার বিহার না করিলে ভালবাসা জন্মে না,—পরস্পরের উপকার না করিলে প্রণয় কিছুই নয়,—এ সকল কথা আমি স্বীকার করি না।..." আমাদের দেশে এই উপদেশ বড় সারবান্; বড় আবশ্যক।

বৃত্তিপরীক্ষার সময় আকবর, ললিত, অমরেশ্বর, তিন জনই পরীক্ষা দিলেন। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ অমর পরীক্ষায় প্রথম হইলেন। ললিত হিন্দু স্কুলে পড়িতে গেলেন, অনেক বড়মানুষের ছেলে সহচর পাইলেন। মাথায় সিঁথি কাটেন, মণ্টিথের বার্ণিসকরা জুতা পরেন, গান বাজনা করেন, আমোদে থাকেন। বৈগুলি বড় খুলেন না। পড়াশুনা আর বড় হইল না। জেলা স্কুল হইতে পাশ করিয়া অমর ও আকবর কলিকাতায় গেলেন। আকবর তাঁহার মামার বাসায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়িতেন, আর অমরেশ্বর বৃত্তি পাইয়া বি-এ পড়িতেন। আকবরের সহিত তদীয় মাতুলকন্যার বিবাহ হওয়াতে, তিনি বড় ডাক্তারের জামাই হইলেন।

এই স্থলে একটি কথা মনে পড়িল। শুনিতেছি, বাঙ্গলার জমীদার মহাশয়েরা তাঁহাদিগের সন্তানদিগের অধ্যয়নের জন্য একটি পৃথক কলেজ খুলিবেন। ললিতের কথায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "তাঁহার পিতা সম্মানাভিমানী প্রাচীন লোক। ছোটলোকের ছেলেদের সহিত পড়িতে হইবে না—বলিয়া ললিত পিতার নিকট ধনিসন্তানগণসেবিত সকলের বড় স্কুলে পড়িবার জন্য আবদার করিয়া বসিলেন। তালুকদারের পারিষদগণ সেই আবদারের প্রশংসা গাইলেন। ললিতের জয় হইল—ললিত কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।" কিন্তু পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা জানিলে, বোধ হয়, ললিতের পিতা এত ব্যস্ত হইতেন না। জমীদার মহাশয়েরা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

অনেক দিন পরে আবার এক সময় ললিত, আকবর ও অমরেশ্বর বাড়ী আসিলেন। আকবরের মা নাই, তাই মার আবদার অমরেশ্বরের মার উপরই চলিত। তিনি আকবরকে ডাকিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইতেন, কিন্তু এই খাওয়া হইতেই শেষে বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অমরেশ্বর একই দিনে আকবর ও ললিতকিশোরকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য কি? আকবরের সহিত ললিতের চিরকালই বিবাদ। অমর যদিও ললিতকে খাতির করিয়া চলিতেন, কিন্তু ললিত চিরকালই অমরকে বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিতেন। ললিত ও তাঁহার এক বন্ধু একত্র অমরের বাটীতে আহারে বসিয়াছেন।

মাঝে মাঝে উক্তি হইতেছে, "এ যে বৈদ্যবাটীর শ্রাদ্ধ!" "এ যে কেবল ঘাস—আমরা গরু নাকি!" "ভাতগুলি যে এক একটি মর্ত্তমান রম্ভা!" অমর এই সকল বিদ্রূপ শুনিয়া চুপ করিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার মা উত্তর করিলেন, "বাবা! অমর তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে; সেই জন্য আবদার করে তোমাকে এনেছে।" সত্যই প্রণয় অন্ধ, নচেৎ কি এরূপ বিদ্রূপের পরও ভাল কথা আসে? এই সময় আকবর গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অমর একটু ফাঁপরে পড়িলেন, তাঁহার প্রণয়ের পাত্র ললিত আকবর উভয়েই; কিন্তু তাহাদিগের বিবাদ মিটিবার নহে। ললিতের ভয়ে অমর আকবরের খাওয়ার জায়গা গোয়ালঘরে করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আকবর বলিয়া উঠিলেন, "আমি গরু নাকি, তাই গোয়ালঘরে খাইব?" আবার ললিত-কিশোর বলিয়া উঠিলেন, "না,—তুমি এসে আমাদের সঙ্গে বস। হিন্দুর বাড়ীতে ত কখন দেখি নাই—মুসলমান নিমন্ত্রণে আসে;—এক সঙ্গে খায়, সম্মুখে দাঁড়ায়। আমাদের জাতি-নাশ, আর অপমান করিবার জন্যই এই আয়োজন। চল্ বিজয়।" ললিতকিশোর উঠি-লেন, যাইবার সময় অমরকে বলিয়া গেলেন, "অমর, মনে যেন থাকে,—এই অপমানের ফল তুমি পাইবে। তোমার জাতি নাই, তুমিও মুসলমান।" এইরূপ অমরের "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" ভাবিতে ভাবিতে ললিতকিশোর চলিয়া গেল। ললিতকিশোর যাওয়ার পরও আকবর ছিল। কিন্তু অমর ও তাহার মা, উভয়েই বলিলেন, "আকবর অন্য সময় আসিলে ভাল হইত" তাঁহাদিগের মতে সে কথায় দোষ কিছু নাই; কারণ, তাহা হইলে, শ্যাম কুল দুইই রক্ষা হইত। কিন্তু ফলে এই কথাতে আকবর রাগিয়া গেল, এবং "তোমাদের ভাত হারাম" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। পৃথিবীতে অমরের মত এরূপ অবস্থা মানুষের অনেক সময় হয়, এবং সে সময় হয় ত উভয় কূল বজায় রাখিতে গিয়া, কিছুই বজায় থাকে না। এই ঘটনা সম্বন্ধে আকবর বলিতেছেন "ব্রাহ্মণ নিজের সম্মান বুঝে না; অপমান সহিয়া সহজে ভুলে—অনায়াসে পরিপাক করে। স্বাপেক্ষিতা, স্বাবলম্বনও কম। ব্রাহ্মণ আপনার সত্তা রাখিতে জানে না।—সে চেষ্টাও বড় নাই। মুসলমানে হিন্দুর সমস্ত গুণ আছে;—তাহার উপর নিজের বল বুঝে; হয় ত একটু আত্মগরিমাও আছে। ব্রাহ্মণের ন্যায় পরাপেক্ষী নহে—আত্মবিসর্জ্জনেও অভ্যাস নাই।" কথাটা বোধ হয় অনেকটা ঠিক; এক জন মুসলমান গাড়োয়ানকে অপমান বা গালাগালি করিতে লোকে ভাবে; কিন্তু বাঙ্গালী বাবুকে অপমান করিতে ভাবিবার আবশ্যক নাই! কথা আছে, "কলির বামন ঢেঁাড়া সাপ, যে না মারে তারি পাপ।" ক্ষমা সে কালে মহান ধর্ম্ম ছিল বটে, কিন্তু এ কালে কি না, ঠিক বলিতে পারি না।

যাহা হউক, অমর ক্ষমাশীল ছিলেন; যখন শুনিলেন, ললিত প্রভৃতি ডাকাইতি করিয়া আকবরের প্রাণনাশের চেষ্টায় আছেন, তখনই গিয়া তাহাকে খবর দিলেন, কিন্তু আকবর ভয় পাইবার ছেলে নহেন। রাত্রে ডাকাইতি হইল, একটা কাটাকাটি হইল, আকবর আহত হই-লেন, ডাকাইতেরা কিন্তু ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তাহার পর মোকদ্দমা। আকবর প্রথম অমরকে সাক্ষী মানেন নাই, কিন্তু পরে মানিলেন। তখন অমরের পক্ষে একটা ঘোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল—কিন্তু স্কুলের পরীক্ষার ন্যায় তাহাতেও তিনি জয়ী হইলেন। তিনি তাঁহার প্রাণসদৃশ

শাস্তি হইয়া গেল। ললিতকিশোর আত্মহত্যা করিলেন। অমর সাক্ষী দিয়া আসিয়া সংকট রোগে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু সারিয়া উঠিলেন।

আকবরের মামার ও স্ত্রীর পীড়ায় মৃত্যু হইল। কেবল এক আকবর পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর উপসংহারে আছে, অমরের কন্যা নলিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা বল না আকবর কে ?"

উত্তর হইল, "আকবর—দেবতা।"

এই গ্রন্থের ভিতর রমণীর প্রতি পুরুষের প্রেম, যাহা লইয়া আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় ছড়াছড়ি, তাহা বড় নাই। একরূপ ভাল, কিন্তু আমাদিগের নায়ক আকবরের স্ত্রী দিলজান বিবির সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। দিলজান আকবরের মামাতো ভগিনী। আকবর বলিতেছেন,"দিলজানের সহিত আমার বিবাহের কথা উঠিল। আমরা উভয়েই বড় লজ্জিত হইলাম। উভয়েই অন্যের দ্বারা অসম্মতি জানাইলাম। কিন্তু মামা বা মামী কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন দিলজানকে বলিলাম—'আমি কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যাই ; তাহা হইলে আমাদের এই অসঙ্গত বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।'

দিলজান উত্তর করিলেন, 'না।'

আমি বলিলাম, 'অমরও এ বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন,—এরূপ ঘরাঘরি বিবাহ ভাল নয়।'

দিল। তিনি কি তোমাকে পালাইতে বলেন ?

আমি। পলাইয়া যাওয়া তাঁহার মত নয়। তিনি বলেন,—তাহা হইলে মামা ও মামী বড়ই মনঃ-কষ্ট পাবেন।

দিল। আরও কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে তোমার পড়া বন্ধ হবে। অমরেশ্বর বাবা ও মা দু'জনকেই ভাল জানেন। তিনি বরং আসিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলুন। তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে নাই।

আমি। তাঁহারা একরূপ বুঝিতেছেন ; আমরা আর একরূপ বুঝি। যদি অমরের কথা না থাকে ?

দিলজান বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে অনেক কথার আন্দোলন করিলাম। শেষে বলিলাম,—'আমার ত মনে হয় না যে, অমরেশ্বরের কথা থাকিবে। মামা বড় বড় লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একরূপ স্থির করিয়াছেন।'

দিল। বড়লোকে কি সকল কথাই ভাল বুঝেন ?

আমি। তাঁহারা ত সেইরূপই মনে করেন। লোকেরও তাহাই বিশ্বাস।

দিল। তবে আর তুমি আমি কি করিব ?

আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।"

পাঠক দেখিবেন, বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য আকবর পলাইতে চাহেন, কিন্তু দিলজান রাজী হন না। দিলজান অমরকে অনুরোধ করিতে বলেন, কিন্তু আকবর সম্মত হন না। শেষে উভয়ই ঠিক করিলেন, কিছু করিবার নাই। অথচ আকবর বলিতেছেন, "বিবাহে উভয়েরই অসম্মতি ছিল।" পাঠক মহাশয় কি মনে করেন ?

পল্লীস্মৃতি।

এক বৎসরকাল সহরের ধূলি, ধূম ও জনতার মধ্যে বাস করিয়া শরীর ও মন যখন একটা পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন পল্লীজননীর শতসুখস্মৃতিমধুর মূর্ত্তি স্বভাবতঃই মানস-নয়ন-সমক্ষে দিব্যালোকে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। তাই সহরের নিকট এক পক্ষের অবকাশ লইয়া প্রবাস হইতে বাসে চলিলাম। সভ্যতার যে সকল উপকরণ সহরের সীমার বাহিরে না হইলেও চলে, সে সব রাখিয়া নিতান্ত আবশ্যক কয়টা জিনিস ও খানকতক কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি সঙ্গে লইলাম।

ট্রেণে ভ্রমণে যদি আর কিছুও না থাকে, তথাপি তাহার অস্থিরতার উত্তেজনা উপভোগ্য বটে। আপনার গর্জ্জনে নৈশ অন্ধকার মুখর করিয়া শেষরাত্রিকালে ট্রেণ আমাকে গন্তব্য ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দিল। সে স্থান হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ পথ আমাকে নরবাহযানে অতিক্রম করিতে হইবে।

বিলম্ব না করিয়া যাত্রা করিলাম। কয় মাইল পথ অতিক্রম করিতেই পূর্ব্ব গগনে ঊষাগম-সূচনা লক্ষিত হইল। অন্ধকারাবৃত পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবাল কৃষ্ণ হইতে ধূসরে ও ক্রমে ধূসর হইতে শ্বেতে পরিণত হইতে চলিল। আমি যান হইতে অবতরণ করিলাম। এই পল্লী! চিরপ্রিয় পল্লীপথে দাঁড়াইয়া বোধ হইল, কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া মুক্ত হইয়াছি; আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত। চারি দিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। পল্লীপথের ধূলি পরে বিহগ তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; দুই পার্শ্বে ক্ষেত্র হইতে শালিগন্ধামোদিত স্নিগ্ধ সমীরণ আমার মুখে চক্ষে স্নেহস্পর্শ দিতেছে। সে স্পর্শে বৃষ্টিবারিবিধৌত স্নিগ্ধ শ্যাম বৃক্ষপত্রে মৃদু মর্ম্মর উঠিতেছে। চারি দিকে বিহগকাকলী। এখন বসন্ত-অন্ত; কিন্তু কোকিলকূজন নিবৃত্ত হয় নাই; চারি দিকে আর সেই ক্রমোচ্চগ্রামস্পর্শী স্বরের ছড়াছড়ি নাই; কিন্তু দূরাগত বিরল বিরাব আরও মধুর। আর কোকিল ভিন্ন আরও কত বিহগের গান। দয়েল প্রভাতী ধরিয়াছে; বৌ-কথা-কও কোন অনির্দ্দিষ্টা প্রণয়িনীর বাক্যশ্রবণলোলুপ হইয়া সাগ্রহ মিনতি জানাইতেছে; গৃহস্থের-খোকা-হোক অযাচিত হইয়াই গৃহস্থের গৃহে শুভঘটনার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেছে; আরও কত

বিহগ উচ্ছ্বসিত স্বরভঙ্গীতে কূজন আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত প্রাচীন সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই; কিন্তু সে কৌলীন্যগৌরবহীন হইয়াও তাহারা পল্লীবাসীর স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহারা পল্লীজীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ। কত দিন হইতে তাহারা পল্লীবাসীর কর্ণে সুধাধারার বর্ষণ করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে যেন রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্ব গগনে প্রথম রবিরশ্মি ফুটিয়া উঠিল; সেই কিরণে পথিপার্শ্বে দূর্ব্বাদলে শিশিরবিন্দু বিগলিত রবিকরবিন্দুর মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যেন মন্ত্রবলে সহসা নানা বিহগের প্রভাতী নীরব হইল। এ দিকে জনহীন পল্লীপথে ও ক্ষেত্রে কৃষকেরা দেখা দিতে লাগিল। সেই প্রভাতালোকে প্রকৃতির আর এক মোহনমূর্ত্তি নয়নসমক্ষে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রপার্শ্বে বাবলা গাছের কণ্টকবহুল শাখা-রাজি হরিদ্রাবর্ণ কুসুমে যেন ছাইয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বে তৃণে ফুল ফুটিয়াছে; অদূরে তটিনী তপনকরে কলধৌতপ্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে; ক্বচিৎ বা দেখা যাইতেছে—গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া ঘাট হইতে ফিরিতেছে।

ক্রমে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল; তখন আবার যানের আশ্রয় লইতে হইল। অল্পক্ষণ পরেই যান গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল।

* * * *

এক পক্ষ কাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। যেখানে চারি দিকে নিত্য নূতন শোভা, অনির্ব্বচনীয় মাধুরী, সেখানে কি সময় কাটিতে বিলম্ব হয়? সহরে ধূলি, জনতা, কোলাহল ও ব্যস্ততা। পল্লীগ্রামে সৌন্দর্য্য, শান্তি, বিশ্রাম ও অবকাশ। সহরে সময় প্রভু হইয়া মানবকে দাসের মত খাটায়;—কাজের নামে শত আকারে বৃথাব্যস্ততায়, নিষ্ফল কালক্ষেপে, সহস্র অনাবশ্যক কাযে মনোযোগে মানুষের সময় কোথা দিয়া চলিয়া যায়; মানুষ আপনার সময় কাটাইবার কর্ত্তা নহে। আর পল্লীগ্রামে মানব সময়ের প্রভু, সময় তাহার আজ্ঞাপালক দাসমাত্র; সেখানে সহস্র দিকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় না, আবশ্যক কার্য্যে—ফলদায়ক বিষয়ে সময় ব্যয় করিয়াও অবসরের অভাব হয় না। সহরের জীবন নীরস গদ্য; পল্লীজীবন কবিতাময়। তাই পল্লী-কবি গোল্ডস্মিথ জীবনের সন্ধ্যায় শৈশবস্মৃতিসমুজ্জ্বল পল্লীগ্রামে ফিরিবার আশায় নিরাশের দুঃখকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে ষ্টেশন পর্য্যন্ত জলপথের যাত্রী হইলাম। যাঁহারা নিদাঘে নিশায় নৌকায় ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে সে ভ্রমণের সুখানুভূতি বুঝাইতে পারিব না। তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণের স্নিগ্ধস্পর্শ; তরণীর অঙ্গে তরঙ্গমালার সোহাগগুঞ্জন—সেরূপ অনুভূতি জীবনে সুলভ নহে। নদীকূলে তরুরাজি যেন অন্ধকার প্রান্তরে ঘনতর অন্ধকারব্যাপ্তি; উর্দ্ধে মেঘহীন গগনে তারকারাজি, আর নিম্নে

"তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী।"

কোথাও গ্রামের চৈত্যদ্রুমে খদ্যোতের ক্ষণবিকশিত ক্ষণবিলুপ্ত জ্যোতিঃ; দুই পার্শ্বে গ্রাম সুপ্ত, কেবল নদীকূলে অন্ধকার ঝিল্লীধ্বনি-মুখরিত; ক্বচিৎ অহিধৃত ভেকের আর্ত্তরব শ্রুত হইতেছে; আর কোথাও বা কোন তরণীতে কেহ সেই নৈশনিস্তব্ধতা স্বরমুখর করিয়া সুধাকণ্ঠ নীলকণ্ঠের গীত গাহিতেছে—

"সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে,
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে?
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে!
এমন মনোহর মাধুরী না হেরি মহীমণ্ডলে!
প্রখর-প্রভাকর-কিরণ-কর মকরকুণ্ডলে।
উচ্চ শিখিপুচ্ছ শিরে, উচ্চ চূড়া বামে হেলে;
তুচ্ছ করে জাতিধর্ম্ম, মূর্চ্ছা করে নারীকূলে।
মধুর মৃদু হাসিরাশি সুধা ঝরিত করে;
বাদ্য করি বাঁশী মন উদাসী করিতে পারে।
নীলকণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে অচেনায় চিনিতে পারে,
চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনামূলে।"

প্রায় মধ্যাহ্নে আমরা ট্রেণে উঠিলাম। নিদাঘের মধ্যাহ্নে ট্রেণে ভ্রমণ সুখদ নহে, কিন্তু সহযাত্রীর গুণে কষ্টের অনুভূতিমাত্র হয় নাই। সহযাত্রী প্রৌঢ়টি অল্পক্ষণমধ্যেই আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহার ঝাঁপি হইতে ডাব ও আমারস, তাঁহার বস্ত্রের তোরঙ্গ হইতে পাত্র ও তাঁহার ও তাঁহার আফিসের নামাঙ্কিত ক্যাসবাক্সের মত অসম্ভব স্থান হইতেও আম্র বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গী যুবকের ক্ষমতাও

অসাধারণ! তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ষ্টেশনে নামিয়া লবণ ও ছুরিকা হইতে মিষ্টান্ন ও বরফ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিলেন। যাঁহার গৃহে আদর বঙ্গদেশে প্রবচনে পরিণত হইয়াছে, বোধ হয়, স্বয়ং তাঁহার সহিত ভ্রমণেও এরূপ আয়োজন দেখা যায় না। এরূপ সহযাত্রী যেমন বাঞ্ছনীয়—তেমনই দুর্ল্লভ।

অপরাহ্নে ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে ট্রেণ সহরের প্রান্তে আসিয়া স্থির হইল। পল্লীজীবনের শতসুখস্মৃতিসমুজ্জ্বল পক্ষকালের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা আবার সহরের পাষাণবক্ষে জনতায় প্রবেশ করিলাম।

সাইনোমেটোগ্রাফ বা বাইওস্কোপ।

আজ কাল বাইওস্কোপের ছবি অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং ইহার সাহায্যে প্রথম প্রথম কেহ কেহ বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন (যাহাকে বাঙ্গালায় ছায়াবাজী বলে) ও এই বাইওস্কোপের ছবিতে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত ছবিতে কোন একটি ঘটনা বা মূর্ত্তি নিশ্চল অবস্থায় দেখান হয়, আর শেষোক্ত ছবিতে সেই ঘটনা বা মূর্ত্তিটিকে প্রবহমান অবস্থায় দেখান হয়। মনে কর, কোন একটি লোক শূন্যের উপরে ডিগ্‌বাজী খাইতেছে। ছায়াবাজীতে এই ডিগবাজী খাওয়ার অংশবিশেষ প্রদর্শিত হইতে পারে;—অর্থাৎ যখন সে মাথা নীচু করিয়া পা ঊর্দ্ধে তুলিবার উপক্রম করিতেছে সেই দৃশ্যটি, কিংবা যখন সে মস্তক নীচে রাখিয়া পা ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে সেই দৃশ্যটি, অথবা যখন সে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পুনরায় সোজা ভাবে পায়ের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই দৃশ্যটি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বাইওস্কোপের ছবিতে একটি লোকের ডিগ্‌বাজী খাওয়ার উপক্রম হইতে সমাপন পর্য্যন্ত যাবতীয় দৃশ্যই দ্রুতবেগে ক্রমে প্রদর্শিত হয়, তাহাতে ঠিক একটি লোক ডিগ্‌বাজী খাইয়া উঠিল বলিয়া বোধ হয়।

উভয়ের এই প্রভেদের কারণ এই,—ছায়াবাজীতে ডিগবাজীর অংশবিশেষের একটি ফটো বা হাতে আঁকা ছবি কাচের উপরে লওয়া হয়। পরে

একটি উজ্জ্বল আলো এই ছবির পশ্চাতে রাখা হয় ও সম্মুখে একটি পর্দ্দা রাখিয়া ঘরের সকল আলো নির্ব্বাপিত করা হয়। তাহাতে কাচের উপরে অঙ্কিত ছবি দ্বারা কাচের স্বচ্ছতার স্থানে স্থানে ইতরবিশেষ হওয়াতে উজ্জ্বল আলো পর্দ্দার উপরে সমানভাবে না পড়িয়া কোথাও বেশী ও কোথাও অল্প পরিমাণে পড়িয়া থাকে।—সংক্ষেপে, ইহাতেই কাচে অঙ্কিত ছবিটি পর্দ্দার উপরে প্রতিফলিত হয়।

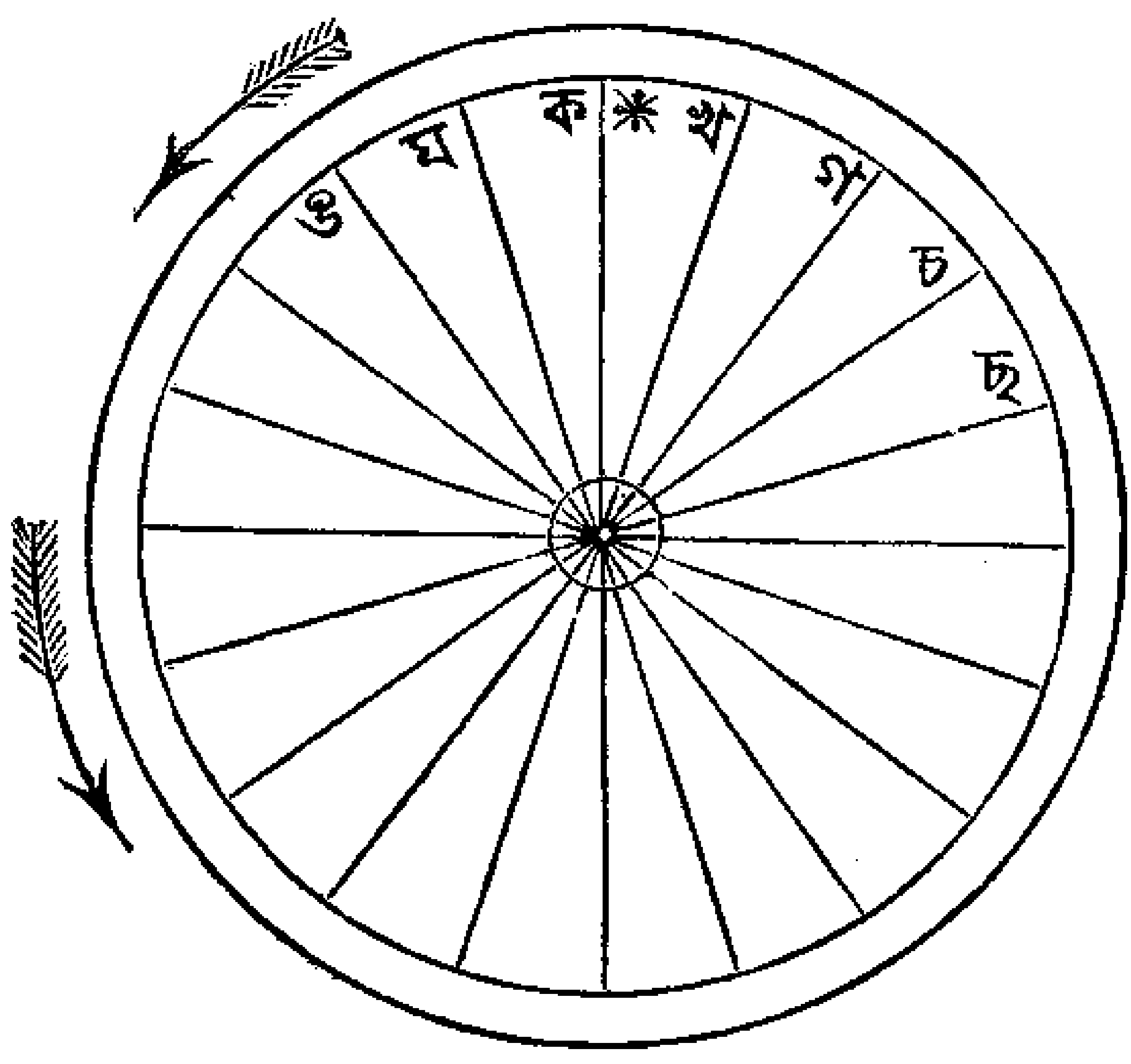
বাইওস্কোপে ডিগ্‌বাজী খাওয়ার উপক্রম হইতে সমাপন পর্য্যন্ত, অবস্থাবিশেষে দুই তিন শত ফটো ধারাবাহিকক্রমে লওয়া হয়। সেলুলইড্ (celluliod) নামক অর্দ্ধস্বচ্ছ একটি পদার্থে নির্ম্মিত সুদীর্ঘ একটি ফিতার উপরে গায়ে গায়ে, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া, এই ছবিগুলি, লওয়া হয়। পরে ছায়াবাজীরই ন্যায়, একটি উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে এই ফিতাটি একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নগতিতে টানিয়া লওয়া হয়। তাহাতে ডিগ্‌বাজীর আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবস্থার ছবিগুলি অবিচ্ছেদে পর্দ্দায় পতিত হওয়াতে ঠিক যেন একটি লোক ডিগ্‌বাজী খাইয়া উঠিল বলিয়া দর্শকগণের ভ্রম হয়। এবং 'বহুসংখ্যক ছবির একত্র সমাবেশ দেখিলাম', ইহা মনে না করিয়া, 'একটি ছবিই দেখিলাম' বলিয়া মনে করেন।

এই দৃষ্টিবিভ্রমের একটি কারণ আছে। একটি ডিগ্‌বাজীর জন্য যত অধিকসংখ্যক ফটোই লওয়া হউক না কেন, এবং ফিতাটী যত দ্রুতই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া হউক না কেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ডিগ্‌বাজীর ঠিক সকল অবস্থার ছবি ফিতাতে বর্ত্তমান থাকে না, আর পর্দ্দার উপরে একটি ছবি পড়িয়া তাহা চলিয়া যাওয়া ও অপর ছবিটী আসা—এতদুভয়ের মধ্যে একটু সময়ের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু আমাদের চোখের গঠন এমনই যে, উহাতে কোন একটি ছবি পড়িলে, সেই ছবি চলিয়া যাওয়ার পরেও কিয়ৎকালের জন্য চোখে সেই ছবির প্রতিবিম্বটি থাকিয়া যায়। অর্থাৎ, আমাদের চোখের সম্মুখে কোন একটি পদার্থ ধরিলে পরে সেই পদার্থ সেখান হইতে অপসারিত করার পরেও আমরা মুহূর্ত্তের জন্য সেই পদার্থ সেইখানেই দেখিতে পাই। এই জন্যই ফিতার একটি ছবি একবার দর্শকগণের চোখে পড়িলে সেই ছবি অপসারিত হওয়ার পরেও উহার চেহারাটি দর্শকগণের চোখে কিয়ৎকাল প্রতিভাসিত থাকে; এ দিকে এই চেহারাটি চোখে থাকিতে থাকিতেই দ্বিতীয় ছবিটি আসিয়া চোখে প্রতিফলিত

হয় ; তাহাতে দুইটি পৃথক ছবি দেখা হইল বলিয়া বোধ না হইয়া ঠিক একটি ছবি দেখা হইল বলিয়া ভ্রম হয়।

স্বচ্ছ কাচখণ্ডের উপরে ফটো না তুলিয়া অনতিস্বচ্ছ সেলুলয়েডের উপরে ফটো লওয়া হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একটি অনতিপরিসর সুদীর্ঘ কাচ-খণ্ড সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, উহা লইয়া চলা ফেরা করাও সুবিধা-জনক নহে, ইত্যাদি কারণে কাচের পরিবর্ত্তে উক্ত পদার্থের উপর ফটো তোলা হয়। কিন্তু ইহাতে একটু অসুবিধা এই যে, উহা কাচের মত স্বচ্ছ নহে বলিয়া অতি উজ্জ্বল আলোর দরকার হয়, ছায়াবাজীর আলো তত উজ্জ্বল না হইলেও ক্ষতি হয় না।

বাইওস্কোপের ছবি যাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যখন একটি দূরাগত চলিষ্ণু শকটের চিত্র প্রদর্শিত হয়, তখন অনেক সময়ে তাহার চক্রগুলি বিপরীত দিকে যাইতেছে, এরূপ বোধ হয় ; কখন বা সেই চলিষ্ণু গাড়ীর চক্র নিশ্চল অবস্থায় দেখা যায়। এই রহস্যের মীমাংসা একটি চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতেছি।



কেমেরার সাহায্যে যখন বাইওস্কোপের জন্য কোন একটি ঘটনার (অর্থাৎ ঘটনাসংসৃষ্ট বস্তুর) ধারাবাহিক ফটো গৃহীত হয়, তখন সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ হইতে ৪০টী ফটো লওয়া হইয়া থাকে। ফটোর সংখ্যা যত বেশী হয়, অর্থাৎ যত দ্রুত লওয়া হয়, ততই বাইওস্কোপ অর্থাৎ জীবন্ত চিত্রের

নামের সার্থকতা হয়। মৃদুগতিতে ফটো গৃহীত হইলে, অথবা ছবির ফিতাটি মৃদুগতিতে টানিয়া লওয়া হইলে, চক্ষুর যে দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ দর্শকগণ একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনাকে চোখের সম্মুখে ঘটিতে দেখেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইয়া উঠে না; অর্থাৎ ঘটনাটি খাপ্‌ছাড়া হইয়া দাঁড়ায়।

সাধারণতঃ মধ্যম শ্রেণীর কেমেরাতে প্রতি সেকেণ্ডে কুড়িটি ফটো লওয়া হইয়া থাকে। মনে কর, এইরূপ একটি কেমেরার সাহায্যে কোন রেল-ওয়ে ষ্টেশনের অভিমুখে ধাবমান একটি শকটের ফটো গৃহীত হইতেছে; আর সেই সময়ে গাড়ীর চাকাও প্রতি সেকেণ্ডে একবার আবর্ত্তন করিতেছে। এক্ষণে যদি ঐ চাকায় বিশটী ব্যাসার্দ্ধ যষ্টি (spokes) থাকে, তবে ঐ চক্রের প্রতিরূপ ফটোর প্রত্যেকটিতে যষ্টিগুলি ঠিক একই স্থানে অবস্থিত দেখা যাইবে। অর্থাৎ প্রথম ফটোতে ক চিহ্নিত যষ্টি যেখানে আছে দেখা যাইবে, দ্বিতীয় ফটোটীতে খ চিহ্নিত যষ্টি ঠিক্ সেখানে দেখা যাইবে, এইরূপ তৃতীয় ফটোতে গ চিহ্নিত যষ্টি সেখানে দেখা যাইবে। কারণ, প্রথম ফটো লইবার সময় ক চিহ্নিত যষ্টি চক্রের ঠিক্ ঊর্দ্ধভাগে ছিল, কিন্তু ঐ ফটো লওয়া হইয়া যখন দ্বিতীয় ফটো লওয়া হইবে, তখন ইত্যবসরে খ চিহ্নিত যষ্টি চক্রের ঠিক্ ঊর্দ্ধভাগে (অর্থাৎ ক-এর স্থানে) আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই-রূপ তৃতীয় ফটো লইবার কালে গ চিহ্নিত যষ্টি ক এর স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু চক্রের পরিধির সর্ব্বাংশ ও বিশটী যষ্টির প্রত্যেকটী অবিকল একরূপ বলিয়া সকল ফটোই চক্রের নিশ্চল অবস্থার ফটো বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং বাইওস্কোপে প্রদর্শিত ছবিতে বাষ্পীয়যানের অন্যান্য অংশ, ক্রমশঃ আকারবৃদ্ধিবশতঃ চলিষ্ণু বলিয়া বোধ হইলেও, উহার চক্র এ স্থলে নিশ্চল বলিয়া বোধ হইবে।

এইরূপ যদি গাড়ীর চক্রের গতির বিবৃদ্ধিবশতঃ প্রথম ফটোতে ক ও দ্বিতীয়টিতে গ ও তৃতীয়টিতে ছ যষ্টি ঠিক্ একই স্থানে (যেমন চক্রের সর্ব্বোচ্চ ভাগে) অঙ্কিত হয়, তাহা হইলেও বাইওস্কোপে প্রদর্শিত ছবিতে চক্র নিশ্চল বলিয়াই দর্শকের নিকটে প্রতীয়মান হইবে।

এক্ষণে মনে করা যাক্, চক্রের গতির হ্রস্বতাবশতঃ প্রথম ফটো লইয়া দ্বিতীয় ফটো লইবার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানসময়ে খ যষ্টি পূর্ণ এক ঘর (ক হইতে খ, ও খ হইতে গ পর্য্যন্ত চক্রপরিধিস্থ ব্যবধানকে এক একটি ঘর বলা হই-

অর্থাৎ, প্রথম ফটোতে ক যষ্টি চক্রের ঠিক্ ঊর্দ্ধতম বিন্দুর স্থানে অঙ্কিত হইয়া দ্বিতীয় ফটোতে খ যষ্টি সেই বিন্দুর প্রায় কাছে (একটু ডান্ দিকে) গিয়াছে, তৃতীয় ফটোতে গ যষ্টি সেই বিন্দু হইতে আরও কিছু দূরে অর্থাৎ ডান্ দিকে রহিয়াছে, ইত্যাদি ; এরূপ স্থলে বাইওস্কোপে গাড়ীর চাকা গাড়ীর বিপরীত দিকে যাইতেছে বলিয়া দর্শকগণের বোধ হইবে।

অতঃপর মনে করা যাক্, গাড়ীর চাকার বেগবৃদ্ধিবশতঃ প্রথম ফটোর পরে দ্বিতীয় ফটো লইবার সময়ে খ যষ্টি সওয়া ঘর অগ্রসর হইয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথম ফটোতে ক যষ্টি চক্রের ঊর্দ্ধবিন্দুর স্থানে থাকিয়া দ্বিতীয় ফটোতে খ যষ্টি সেই বিন্দুর কিঞ্চিৎ বামে দেখা যাইবে ; এবং তৃতীয় ফটোতে গ যষ্টি আরও কিছু বামে দৃষ্ট হইবে ; অন্যান্য যষ্টির বেলাও এইরূপ হইবে। সুতরাং বাইওস্কোপে প্রদর্শিত চিত্রে চাকাটি ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ মনে হইবে, অর্থাৎ, যাহা স্বাভাবিক, তাহাই দৃষ্ট হইবে।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনারকালি।

জনপ্রবাদমূলক গল্প।

সেদিন সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার বাড়ীতে একটু কায ছিল, সেই জন্য একটু সকাল সকাল আফিসের কায সারিয়া পথে বাহির হইলাম। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বোধ হয় মেঘবাহন ইন্দ্রদেবের বাড়ীতে কোন কায কর্ম্ম ছিল না ; তাই নিশ্চিন্তমনে বসিয়া কলিকাতার পথে আশ মিটাইয়া জল ঢালিতেছিলেন। যখন কর্দ্দমাক্তপদে সিক্তবস্ত্রে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তখন ইন্দ্রদেবের রোখটা কিছু বাড়িয়া উঠিল। মুষলধারে জল ঢালিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ একটা খালি অথচ ঘেরা কামরা পাইলাম, তাই লোকলজ্জার বিশেষ ভয় না করিয়া ভিজা জামা চাদর ও পাদুকা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখের বেঞ্চের গদীর উপর শীতল চরণদ্বয় রক্ষা করিয়া যথেষ্ট আরাম বোধ করিলাম। গাড়ী প্রায় ছাড়ে এমন সময়

এক জন টিকিট-কলেক্টর এক জন জলসিক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোককে আনিয়া আমার কামরায় তুলিয়া দিল। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল। আগন্তুক যখন গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তখন গাড়ীর ভিতর প্রায় অন্ধকার। মনে করিলাম, আগন্তুক যিনিই হউন না কেন, সিক্তবস্ত্রে আর শরীর আবৃত করিব না। আগন্তুকও গায়ের জামা ছাড়িয়া শুকাইতে দিলেন। ষ্টেশন পার হইয়া গাড়ী অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলে সবিস্ময়ে দেখিলাম, আগন্তুক আর কেহই নহেন, আমার সেই পুরাতন বন্ধু প্রাণকৃষ্ণ!

প্রাণকৃষ্ণ বাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি যে দেশে আসিয়াছেন, তাহা জানিতাম না। আজ অকস্মাৎ এই মেঘাবৃত আলো-আঁধারে বর্ষার দুর্দ্দিনে আমারই ন্যায় আর্দ্রবস্ত্রে বন্ধুকে আমার প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তুমি কবে আসিলে? তুমি পশ্চিমে ছিলে না?"

বন্ধুবর আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার হাত ধরিয়া সবেগে নাড়া দিলেন এবং বলিলেন,

"এবারে তোমার জন্য অনেক material সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। কত চাই? প্রত্যহ একটা করিয়া শুনাইব। কি বলিব, বাঙ্গালা লেখাটা আমার আসে না, তা না হলে আজ আমি এক জন নামজাদা লেখক হইতে পারিতাম।"

প্রাণকৃষ্ণের স্বভাবটা আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। যখন material-এর কথা পাড়িয়াছেন, তখন একটা গাঁজাখুরি গল্প না বলিয়া ছাড়িবেন না। মনে করিলাম, অনেকক্ষণ সিক্তবস্ত্রে একাকী যাইতে হইত, তার চেয়ে যদি দুই একটা গল্প শুনিতে পাই ত মন্দ কি? প্রকাশ্যে বন্ধুকে বলিলাম,

"আচ্ছা তোমার material গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপাততঃ তোমার ঐ দিকের সাসীটা তুলিয়া দাও দেখি, বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে। চারি দিক বন্ধ করিয়া একটু গরম হওয়া যাক্।"

"গরম হবে? এত ক্ষণ মনে করে দিতে হয়!" এই বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ তাঁহার কোরিয়ার ব্যাগ হইতে একজোড়া চুরুট ও একটা দেশলাই বাহির করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আমিও চুরুট মুখে দিয়া, জল কণিকাচ্ছাদিত কাচের ভিতর দিয়া দেখিলাম, বাহিরে মাঠে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতেছে, আর পবনদেব বড় বড় গাছের মাথা ধরিয়া সবলে মাঠের কাদায়

দোলাইয়া 'না' 'না' করিয়া খাড়া হইবার চেষ্টা করিতেছে, পবন ততই সবেগে 'শো' 'শো' বলিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া শুয়াইয়া দিতেছেন। মনে একটু কবিত্বের উদয় হইল। ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়িল—"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ"—আজ প্রাতে হয় ত এই পবনদেব ঐ সকল গাছের পাতা লইয়া কতই খেলা করিয়াছেন, কত ধীর সমীর, কত নব কিশলয়—বন্ধুবর অকস্মাৎ বলিলেন, "আনারকালির কথা শুনিয়াছ?"

"আন্নাকালী? গাঙ্গুলীদের? ভাল আছে ত?"

"আরে না না, আন্নাকালী নয়, 'আনারকালি,'—লাহোরের 'আনারকালি'!"

"না, জানি না; সে কে?"

প্রাণকৃষ্ণ খুব লম্বা এক 'শোষটান' টানিয়া আরম্ভ করিলেন;—

১

গত পুর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে লাহোরের নিকট বিস্তীর্ণ লিচু-বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল; পূর্ব্ব দিকে পূর্ণিমার চাঁদও উঠিয়াছিল; কিন্তু লিচু-বাগানের অন্তরালে থাকায় চাঁদের সুগোল কমনীয় মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নয়নগোচর হইতেছিল না। আকাশে আলোক, ধরায় আঁধার, দক্ষিণে বাতাস, রজনীগন্ধ ফুলের পরিমল, আর, কয়েকটা পাপিয়া একত্র হইয়া যেন কি একটা ষড়যন্ত্র করিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,—"বাবুজি!"

চাহিয়া দেখিলাম, নিকটবর্ত্তী একটা লিচু-গাছের তলায় একখানা গালিচার উপর এক জন প্রাচীন মুসলমান বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া সেলাম করিয়া বলিলাম, "আপনি আমায় ডাকিতেছেন?"

মুসলমান প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনাকে ডাকিতেছিলাম। আজ এই চাঁদিনী আলোয় আমার একটা পুরাতন কেচ্ছা মনে পড়িতেছে, কাহাকেও বলিবার জন্য প্রাণটা বড় উৎসুক হইয়াছে। যদি আপনার সময় থাকে, তবে মেহেরবানী করিয়া এই গরীবের নিকট উপবেশন করুন।"

মন্দ নহে; লোকটা পাগল না কি? না জানি কি কথা শুনাইবেন মনে করিয়া আমি তাঁহার নিকট গালিচায় বসিলাম। পদস্পর্শমাত্র বুঝিলাম, এ গালিচা পারস্যদেশীয়, বহুমূল্য, কিন্তু অতিপ্রাচীন; স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যখন আমি বসিলাম, তখন লিচু গাছের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো

আসিয়া বৃদ্ধের মুখে পড়িয়াছে। দেখিলাম, গালিচার ন্যায় গালিচার অধিকারীও উচ্চবংশসম্ভূত, প্রাচীন, এবং গালিচারই ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ। বৃদ্ধের এক পার্শ্বে মৃগনাভিসুগন্ধি তামাকু সাজা, অপর দিকে একখানি পাখা পড়িয়া আছে। হেনার আতর তাঁহার পরিধেয় শুভ্র বসন হইতে স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। আমি উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম,

"আমায় কি বলিবেন?"

"আপনি এই বাগানের ইতিহাস জানেন? আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি নূতন আসিয়াছেন?"

"আমি অল্প দিন হইল, এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি; এখানকার ইতিহাস যাহা কেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই জানি, অধিক কিছু জানি না।"

"কেতাবে পড়িয়াছেন? আংরেজি কেতাবে বুঝি? সে না জানারই মধ্যে। কেতাবে কি ইতিহাস থাকে! কেতাবে মিথ্যা অহঙ্কার থাকে, পরনিন্দা থাকে, গ্লানি কুৎসা থাকে। যাহা সত্য, যাহা অভ্রান্ত, যাহা নিত্য, তাহা কেতাবে থাকে না। বিশেষতঃ আংরেজী কেতাবে। আমাদের ইতিহাস উহারা কোথায় পাইবে?"

কেতাব সম্বন্ধে বৃদ্ধের অভিমত শুনিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু বৃদ্ধের নিকট অভব্যতাপ্রকাশ অনুচিত মনে করিয়া সামলাইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, ইংরাজী ইতিহাসে সত্যকথা থাকে না, এও কি একটা কথা? অমন পলাশীর যুদ্ধ, ক্লাইবের বীরত্ব, নবাবের অত্যাচার, ইহা অপেক্ষা সত্য কিছু আছে না কি?

প্রকাশ্যে বলিলাম, "শুনি আপনার ইতিহাস।"

উদ্ভাষিত চন্দ্রালোকে দেখিলাম, বৃদ্ধ কিছু বিমর্ষ হইয়া নিজের সুশুভ্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুমধ্যে ধীরে ধীরে শীর্ণ শুভ্র অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতেছেন। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"প্রায় চারি শত বৎসরের কথা, এইখানে শাহেন শা বাদশাহজাদা সেলিমের একটা দৌলতখানা ছিল। এখন এই যেখানে লিচু-বাগান দেখিতেছেন, ঠিক এইখানে গড় ছিল। আজ যেখানে আপনাতে আমাতে গালিচা পাতিয়া বসিয়া আছি, এক সময়ে এইখানে অগাধ জল ছিল, শাজাদা সেলিম তাঁহার প্রিয় বয়স্য ও সখীগণ সমভিব্যাহারে এইখানে পান্‌সি করিয়া হাওয়া খাইতেন। আর ওই যে দূরে শ্বেতপাথরের সমাধি দেখিতেছেন,

ইহারই নীচে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা 'আনারকালি' চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। বাবুজি! আপনি হয় ত মনে করিতেছেন যে, তাঁহার চিরপ্রিয়তমা নূরজাহান ত আগ্রায় সমাধিস্থ হইয়াছেন, এ 'আনারকালি' আবার কে? কিন্তু যখন নূরজাহানের নাম নূরজাহান ছিল না, তখন আনারকালি জাহাঙ্গীরের হৃদয়েশ্বরী ছিলেন। এ সব কথা আংরেজী কেতাবে পড়িয়াছেন কি?"

"না।"

"তাই বলিতেছিলাম, বিদেশীরা হৃদয়ের নিগূঢ় কথা কোথায় পাইবে? আনারকালি সেলিমের ক্রীতদাসী। তাঁহার নাম কি, কেহ জানিত না। ইরাণের দাসী-বাজার হইতে এক অলোকসামান্যরূপবতী বালিকা ক্রীত হইয়া ভাবী ভারতসম্রাটের সেবার জন্য প্রেরিত হয়। বাদশাহদিগের চির-ন্তন প্রথা অনুসারে বালিকা যৌবনসীমায় পদার্পণ পর্য্যন্ত জাঁহাপনার নয়ন-পথে পড়ে নাই। তার পর একদিন,—সেও এই প্রকার পূর্ণিমা,—বাদশাজাদা, ঐখানে—এখন যেখানে কবর দেখিতেছেন,— ঐখানে তখন রুমের শ্বেতমর্ম্মর-মণ্ডিত বেদী ছিল, সেই বেদীর উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আপন মনে কি ভাবিতেছিলেন। বেহেস্তের পরীর ন্যায় দুই জন কৃষ্ণনয়না সুন্দরী যুবতী বাঁদী ফিরোজারঙ্গের ওড়নায় শরীর আবৃত করিয়া বাদশাহের পদসেবা করিতেছিল। এমন সময় আর একটি বাঁদী একটি কিশোরীকে সঙ্গে আনিয়া বাদশাহজাদার নিকট উপস্থিত হইল, এবং দস্তুর মত কুর্ণিস করিয়া পাদপদ্মে নিবেদন করিল,

"ইরাণের ক্রীতদাসীর প্রতি বাদশাহের কৃপাকটাক্ষ হইবে কি?"

বাদশাজাদা সহাস্যে বলিলেন, "কোথায় সেই ক্রীত সুন্দরী?"

'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র ন্যায় ইরাণী কিশোরী ধীরে—অতি ধীরে অগ্রসর হইয়া বাদশাহজাদার চরণপ্রান্তে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল। বাদশাজাদা দেখিলেন, নীল আকাশের মাঝে তারার ন্যায় ঘনকৃষ্ণ কেশদামে বেষ্টিত একখানি অতি সুন্দর ব্রীড়াবনত মুখ। তিনি প্রথমে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিয়া কিশোরীর রূপরাশি দর্শন করিয়া তাহার করধারণপূর্ব্বক নিজের কাছে বসাইলেন। বালিকার বিকাশোন্মুখ গোলাবের ন্যায় আরক্তিম গণ্ডস্থল, স্থির প্রশান্ত নয়ন ও কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম বাদশাহের চক্ষে অপার্থিব বলিয়া বোধ হইল। সাদরে কিশোরীর চিবুক ধারণ করিয়া চাঁদের

দিকে ফিরাইয়া অনেকক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরী! তোমার নাম কি?"

সুন্দরী চক্ষু নত করিয়া, কেন না;—এত দিন যাঁহার নাম শুনিয়া আসিতেছিল, যাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য এত দিন সে নৃত্য সঙ্গীত চিত্র প্রভৃতি সুকুমার কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিল, সেই বাদশাহজাদার সাক্ষাতে আজ কি চক্ষু তুলিয়া কথা কহিতে পারে?—তাই চক্ষু নত করিয়া অতি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে কহিল,

"আমার নাম মনে নাই। অতি শৈশবে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাদশাহের সেবার জন্য হিন্দুস্থানে আসিয়াছি। আমার কি নাম ছিল, জানি না; আমি কেবল জানি যে, আমি বাদশাহজাদার দাসী।"

"তুমি বাদশাহের বাদশাহ হইবে, তোমার নাম আমি দিব।" যে বাঁদী সুন্দরীকে আনিয়াছিল, সে করযোড়ে বলিল,

"শাহজাদা বাঁদীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। সুন্দরীর বর্ণ আনার পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল, তাই আমার ইচ্ছা, সুন্দরীর ঐ প্রকার একটা কিছু নাম রক্ষা করা হউক।"

বাদশাহ সহাস্যে বলিলেন, "তাহাই হউক, তোমার কথামত সুন্দরীর নাম রহিল 'আনারগোলে।'"*

এই বলিয়া বাদশাহ সুন্দরীর অনিন্দ্য বিম্বোষ্ঠে প্রেমচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

২

ছয় বৎসর পরে, একদিন—সেও এমনি পূর্ণিমা রজনী, এমনি চারি দিকে পাপিয়া ডাকিতেছিল, এবং ঐ বাগান হইতে বসোরাই গোলাপের সৌরভ আসিয়া পরিখাজলসিক্ত পবনকে মাতোয়ারা করিতেছিল,—বাদশাহ এই দৌলতখানায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তখন আর তিনি বাদশাহজাদা সেলিম নহেন, স্বয়ং ভারতেশ্বর বাদশাহ জাহাঙ্গীর। সঙ্গে কেহ ছিল না; তিনি একাকী কাননমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন। সে দিন বোধ হয় বাদশাহের

---

* পারস্য ভাষায় 'আনার' শব্দে দাড়িম্ব, এবং 'গুল্' শব্দে পুষ্প বুঝায়। আনার গুলের অর্থ দাড়িম্ব পুষ্প। ঐ আনার গুলে হইতে ক্রমে ক্রমে 'আনারগোলে,' 'আনারগালে', 'আনারকালে' এবং অবশেষে 'আনারকলি' হইয়াছে কি?।

মেজাজ সরিফ ছিল না। যিনি সমগ্র হিন্দুস্থানের অধিপতি, তাঁহার মেজাজ সরিফ থাকা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। বাদশাহ কিছু বিমর্ষ, কিছু বিরক্তমনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। বাদশাহ অনেক দিন লাহোরে ছিলেন। না; দুই বৎসর ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরিয়া নানা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া কিছু কালের জন্য শান্তি উপভোগের মানসে লাহোরের দৌলতখানায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

বাদশাহ পাদচারণ শেষ করিয়া প্রাসাদে ফিরিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে অস্পষ্ট কথার শব্দ প্রবেশ করিল। যেন কেহ অতি সাবধানে অতি সভয়ে কি বলিতেছে। সন্দিগ্ধচিত্ত সম্রাট অতি ধীরপদবিক্ষেপে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই মর্ম্মরবেদীর নিকট গিয়া দেখিলেন,— সর্ব্বনাশ!

দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী আনার গোলে এক জন তরুণ যুবকের হস্তধারণপূর্ব্বক স্নেহগদগদস্বরে বলিতেছেন, "ভাই! হতাশ হইও না, আমি তোমায় বিস্মৃত হই নাই। বাদশাহ সর্ব্বদাই নিকটে থাকেন বলিয়া তোমার সহিত সাক্ষাতের সুবিধা হয় না। তাই এত দিন তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই; আজ একটু অবকাশ পাইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, পাছে বাদশাহ জানিতে পারেন—"

বাদশাহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সরোষে বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দ্বিচারিণী!"

সিংহদৃষ্ট কুরঙ্গের ন্যায় তরুণ যুবক আনারগোলের হস্ত ত্যাগ করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে গাছের ছায়ার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আনারগোলে ভয়ে অজ্ঞান হইয়া ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় বাদশাহের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

বাদশাহ ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় উন্মত্তবৎ হইলেন। ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী ভুবনবিজয়ী রাজরাজেশ্বর জাহাঙ্গীর,—তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমার এই ব্যবহার? বাদশাহ উন্মত্তবৎ হইলেন, জ্ঞানশূন্য হইয়া করস্থিত অসি উদ্যত করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই অসি কোষবদ্ধ করিয়া আপনি বলিলেন,

"কলঙ্কিনীকে স্পর্শ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিব না। চণ্ডালিনীকে চণ্ডাল দ্বারাই এ জগৎ হইতে অবসৃত করাইব।"

জাহাঙ্গীর চরণপতিত সুন্দরীর প্রতি আর দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই প্রাসাদে ফিরিলেন ও একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,

"মর্ম্মরবেদীর উপর একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। তাহাকে এই দণ্ডেই ঐ বেদীর নীচে সমাধিস্থ করিতে হইবে।" মনে মনে বলিলেন, "যে বেদীতে আমাদের প্রথম সন্দর্শন, সেই বেদীতেই সমস্ত শেষ হউক।"

পূর্ণিমার সুধাকর তখন হাসিতে হাসিতে আনারগোলের মাথার উপর সুধাবর্ষণ করিতেছিল।

৩

দুই দিন পরে অপরাহ্ণে একখানি ক্ষুদ্র কাগজ বাদশাহের হস্তগত হইল। ক্ষুদ্র কাগজখানি আনারগোলের হস্তলিখিত একখানি পত্র। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অশ্রুজলে অঞ্জল মিশাইয়া অভাগিনী স্বামীকে লিখিয়াছেন,

"স্বামী যাহার চরিত্রে সন্দেহ করেন, তাহার মরণই শ্রেয়। স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার তাহার আর আবশ্যক কি? বিশ্বাস একবার বিচলিত হইলে কি আর দৃঢ় হয়? আমি গিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, যেন আমার স্বামী চিরসুখী হয়েন।

বাদশাহ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। আনারগোলে অবিশ্বাসিনী হইবেন? অসম্ভব। অথচ সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, স্বকর্ণে শুনিয়াছেন!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাদশাহ সেই মর্ম্মরবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দূরে এক জন পরম রূপবান যুবা এক রাশি পুষ্প লইয়া সেই বেদীর দিকে আসিতেছেন। যুবাকে দেখিয়াই বাদশাহ ক্রোধে আত্মহারা হইলেন—যুবা আনারগোলের সেই সহচর। কিন্তু যুবা বাদশাহকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, ধীরগম্ভীরপদবিক্ষেপে বাদশাহের নিকট আসিয়া মস্তক ঈষৎ নত করিয়া বাদশাহকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন; তাহার পর সেই ফুলরাশি দিয়া আনারগোলের সমাধি সজ্জিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ তাহার ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

যুবা নীরবে সমাধিসজ্জা শেষ করিয়া তথায় নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। বাদশাহ আবার অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

বাদশাহের দিকে মুখ ফিরাইয়া যুবক স্পষ্টস্বরে কহিলেন, "বিনা দোষে কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় দিয়াছ, যাহার উপযুক্ত প্রেমিক জগতে দুর্লভ, তোমার সেই পত্নী আনারগোলের সহোদর ভ্রাতা। আমার নাম সফিউদ্দিন আহম্মদ, ভগ্নী বাদশাহের বেগম হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট অর্থভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে

তোমার নিকট এই ভিক্ষা, আমাকে বিরক্ত করিও না। আমার কুসুমসুকুমারী সহোদরাকে পাষাণহৃদয় তুমি কঠিন পাষাণে ঢাকিয়াছ, আমি তোমার এই পাষাণকীর্ত্তি কুসুমে ঢাকিতে আসিয়াছি—”

বাদশাহ আর শুনিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষে আকাশের তারকামালা, অদূরবর্ত্তী উচ্চ সৌধশিখর, কাননের বৃক্ষলতা, সমস্তই যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়া কোথায় ভাসিয়া গেল; সফিউদ্দিনের বক্ষের উপর বাদশাহের জ্ঞানশূন্য দেহ পতিত হইল।

তন্ময়চিত্তে বন্ধুর গল্প শুনিতেছিলাম; হঠাৎ ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, আমার গন্তব্য ষ্টেশনে আসিয়াছি; গাড়ী আবার ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে। তাড়াতাড়ি ভিজা জামা চাদর জুতা একত্র পুটুলি বাঁধিয়া প্রায়চলনশীল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

সাঁওতাল পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাঁওতাল পরগণা প্রকৃতির রম্যভূমি। বঙ্গদেশের এই অংশে পর্ব্বত, বন ও স্রোতস্বতীর শোভা অনির্ব্বচনীয়। সাঁওতাল পরগণার সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও অল্প, এক তৃতীয়াংশের কিছু অধিক। অনেকে মনে করেন, সাঁওতালেরা অসভ্য, দুরন্ত, কুৎসিত, কদাচারী। কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা যেমন পরিষ্কৃত, তেমনি অমায়িক ও আমোদপ্রিয়। ইহাদের বাসগৃহাদি অতিশয় পরিপাটী, আচারব্যবহার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ ও মানভূমের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, ভূমির সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে এইখানে আসিয়া বাস করে। তখন এই স্থান ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর লীলাভূমি ও অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সাঁওতালগণ বলিষ্ঠ ও শিকারকুশল, সুতরাং সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে স্থানীয় ভাষায় দিকু কহে।

কালক্রমে দিকুর সংখ্যা বাড়িয়া গেলেও, সাঁওতালেরা আদিম অধিবাসী ও নিতান্ত নিরীহ বলিয়া, ইহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে,—সাঁওতাল পরগণা। যাহাতে দরিদ্র সাঁওতালের প্রতি উৎপীড়ন না হয়, এই উদ্দেশ্যে এখানকার শাসনপ্রণালীও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট বিধানের অধীন করা হয় নাই; এ নিমিত্ত ইহাকে 'বেবন্দোবস্তী মহল' কহে। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল এই স্থানটিই প্রাকৃতিক দৃশ্যে, অধিবাসীর বিশেষত্বে ও শাসনপ্রণালীর বৈচিত্র্যে সকল প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। স্থানটির পরিমাণ ৫৪৮৮ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—সাঁওতাল পরগণার উত্তর দিকে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া; পূর্ব্ব সীমা মালদহ, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম; দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও মানভূম; এবং পশ্চিম সীমা হাজারিবাগ ও ভাগলপুর। ভূমি সাধারণতঃ তিন প্রকার। পূর্ব্ব দিকে সাহেবগঞ্জ হইতে নয়াডুমকার দক্ষিণ-পশ্চিম-পার্শ্বস্থ নৌবিল নদী পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল ব্যাপিয়া অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ে জমী। সেখান হইতে পশ্চিম দিকে তরঙ্গায়িত, বন্ধুর ও উচ্চ ভূমিভাগ সমস্ত দেওঘর, পব্বীয়া ও গোড্ডার কিয়দংশে ২৫০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া মধ্যভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে ভালরূপ শস্য জন্মে না। অপরাংশ সমতল, জলাশয়ের সন্নিহিত ও পলিমিশ্রিত; সুতরাং এখানে প্রচুরপরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। পরগণাটি ক্ষুদ্র হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষে এরূপ সুন্দর স্থান অতি বিরল। এই জেলার মধ্যে এক স্থান হইতে দূরবর্ত্তী অন্য স্থানে যাইতে হইলে যে সকল নয়নানন্দকর, পরম রমণীয় বিচিত্র শোভা সকল নেত্রগোচর হয়, তাহা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কোথাও ধান্য, গোধূম, কলাই প্রভৃতি শস্যে ভূমি শ্যামবর্ণে শোভা পাইতেছে; কোথাও শ্বেত-কৃষ্ণ প্রস্তরের সন্নিহিত উচ্চ ভূমিভাগে কুর্ত্তি প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিয়াছে। সমতলভূমি হইতে চলিতে আরম্ভ করিলে কখনও ৮।১০ হাত উচ্চ পাহাড়ে জমী আরোহণ করিয়া পরক্ষণেই আবার ১৪।১৫ হস্ত নিম্নে নদীগর্ভে নামিয়া আসিবার পর পুনশ্চ উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে হয়। কোন স্থানে সুগন্ধিনির্য্যাসপূর্ণ শালবৃক্ষের শ্রেণী মনোহর উন্নত মস্তকে সৈন্যব্যূহের ন্যায় বহুপরিসর মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও বিস্তৃত পলাশবন লোহিতবর্ণ পুষ্প ও লাক্ষা প্রদান করিতেছে; কোথাও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণে নয়ন ও মন আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। অসংখ্য নদী শীত ও গ্রীষ্মকালে সুপ্ত ও

বৃহদাকার অজগর সর্পের ন্যায় বালুকাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে; পরে বর্ষার জলপান করিয়া গভীরগর্জ্জনসহকারে দ্রুতবক্রগতিতে উভয়তীরস্থ বহু দূর পর্য্যন্ত স্থান গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। পূর্ব্ব দিকে রাজমহলের পাহাড় ১৩৬৬ বর্গমাইল পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে। ইহার মরী ও সেন্দগর্স নামক দুই শিখর ২০০০ ফিট উচ্চ। দক্ষিণ দিকে মহুয়াশাড়ী শিলা ১৫০০ ফিট উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিউর, ফুলজুড়ি, সোণাতরী ও মালঞ্চ প্রভৃতি দশটি উচ্চ শিলায় ত্রিকোণমিতি জরীপের এক একটি ষ্টেশন আছে। ছোট ছোট পাহাড়ের ইয়ত্তা নাই। গঙ্গা উত্তর সীমার কিয়দংশ ও পূর্ব্বসীমার অধিকাংশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নদীর মধ্যে গুমানী, মরাল, বাঁশলয়, ব্রাহ্মণী, ময়ূর বা ময়ূরাক্ষী, নৌবিল, অজয় ও বরাকরের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালে প্রায় সকল নদীই শুকাইয়া যায়; বর্ষাকালে সমস্ত পরিপূর্ণ ও তাহাদের স্রোত অতিশয় প্রবল হয়; এ জন্য বৎসরের কোন সময়েই নৌকা চালাইবার সুবিধা নাই।

কুশদিয়া গ্রামের নিকট বাঁশলয় নদীতে ১২ ফুট উচ্চ একটি ও সিংহপুরের নিকট ব্রাহ্মণী নদীতে ১০ ফুট উচ্চ আর একটি ঝরণা আছে। মহারাজপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে "মতি ঝরণা" নামে যে জলপ্রপাত আছে, উহার জল সংবৎসর সমভাবে পড়িয়া থাকে। দামিনীকোহ পাহাড়ে শিরগাড়ী নামে এক গুহা আছে, উহা ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট গভীর। অত্রত্য শিবমন্দির দেখিবার জন্য চৈত্রমাসে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে প্রস্রবণেরও অভাব নাই। রাজমহলের অন্তর্গত দামিনীকো শিলায় রক্ষী নামক স্থানে একটি প্রস্রবণ আছে। দুমকার অন্তর্গত ভূড়ভূড়ি ও সিদ্ধ নদীতে এবং গোড্ডার ছয় মাইল দক্ষিণে নওডিহা বা ডাতেগুা নামক স্থানে এক একটি উৎস আছে। শেষোক্ত উৎসের নাম নির্ঝর।

পাথুরে কয়লা ও লৌহ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ১৮৫০ সালে শের-উইল সাহেব দেওঘর মহকুমায় তাম্র ও রৌপ্যের খনি হইতে কিয়দংশ মিশ্র-ধাতু বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন; উহার মধ্যে প্রায় ৭ সের ওজনের খনিজে ১৫৪ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল।

এই দেশ জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও মূল্যবান বাহাদুরী কাঠের একটিও অরণ্য নাই। দামিনীকোহ হইতে জ্বালানি কাঠ কাটিবার স্বত্ব ইজারা দিয়া গব-র্মেণ্টের বার্ষিক ৩০০৲ টাকা মাত্র আয় হইয়া থাকে। অন্যান্য জমিদারেরা

কুড়ালী প্রতি কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকেন। জঙ্গলে অধিকাংশই শাল, অন্যান্য বৃক্ষ যৎসামান্য। পলাশ, কুল ও অশ্বত্থ গাছে লাক্ষা জন্মে; শাল-নির্য্যাসে ধুনা হয়; মোম, মধু, সাবুই ঘাস, রবর, দড়ী-নির্ম্মাণের উপযোগী কুঞ্জু ও জম্বার লতা জঙ্গলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতা, হরিণ, বন্যশূকর ও নানাবিধ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বন্যহস্তী ও গণ্ডারও ছিল; এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

শাসনপ্রণালী।—এখানকার শাসনপ্রণালী অন্যান্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। ফৌজদারি মকদ্দমা ভাগলপুর ও বীরভূমের সেশন আদালতের অধীন। এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহলের রাজস্ব ভাগলপুর ও বীরভূমের কোষাগারে প্রেরিত হইয়া থাকে। আর যে সকল দেওয়ানী মকদ্দমার তায়দাদ ১০০০৲ টাকার উপর, তাহাদেরও উক্ত জেলাদ্বয়ের আদালতে বিচার হইয়া থাকে। এখানকার সর্ব্বোচ্চ গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারী ডেপুটি কমিশনর দুমকায় থাকেন; ইনি ভাগলপুরের কমিশনরের অধীন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য স্বতন্ত্র আদালত নাই; বিচারকর্ত্তাদের উভয়বিধ মকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার আছে। বন্দোবস্তী প্রদেশে প্রচলিত আইনানুসারেই অধিকাংশ মকদ্দমা মীমাংসিত হয়। মতভেদ হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারকগণের শাসনপ্রণালী ও সার্কুলার অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। জেলার ভূস্বামী গবর্মেণ্ট ও জমীদার। জমীদারীর অধিকাংশ প্রধানী জমী, অবশিষ্ট জমীদারের খাস, ঘাটওয়ালী, মোকররী ও মান প্রভৃতি। প্রধানী জমীতে প্রায় প্রতি গ্রামে এক এক জন গবর্মেণ্টের মনোনীত লোক আছে; তাহাকে প্রধান কহে। এই পদ পুরুষানুক্রমে চলিতেছে, জমীদারের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। এই প্রধান প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া জমীদারের তহশীলদারকে দিয়া থাকে, এ জন্য জমীদার ও প্রজা প্রত্যেকের নিকট হইতে আদায়ের টাকা প্রতি ⁄০ হিসাবে পাইয়া থাকে। স্থানবিশেষে গবর্মেণ্ট-প্রদত্ত নিষ্কর জোতও পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত জমীদারের কর্ম্মচারীও দৃষ্ট হয়।

তহশীলদার বা গোমস্তা বা নায়েব;—প্রধানের নিকট হইতে খাজনা আদায়, জমীর বন্দোবস্ত, কৃষি ও জমীদারীর উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পাটওয়ারী ;—জমীদারের খাসমহল ব্যতীত প্রায় সকল জমীদারীতেই ইহারা নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে জমাবন্দি, জমাওয়াশীলবাকী, তেরিজ বা খতিয়ান, খসড়া ও প্রজাগণকে রসিদ লিখিয়া দিতে হয়। ইহারা কোথাও মাসিক বৃত্তি, কোথাও টাকায় ৫ হইতে /০ আনা বা বার্ষিক ফসল পাইয়া থাকে। এই শেষোক্ত আদায়ের নাম হক্ পাটওয়ারী।

গোড়াইত ;—ইহারা প্রায়ই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কোন প্রজাকে ডাকিতে হইলে, কিংবা কোন উচ্চ গবর্মেণ্ট বা প্রাইভেট কর্ম্মচারী গ্রামে আসিলে, তাহার আহারাদির বা অন্য যে কোন প্রকার সাহায্যবিধানে ইহারা নিযুক্ত হয়। কোনও কোনও স্থানে ইহাদের জন্য গোড়াইতি জায়গীর আছে। কোথাও প্রধান বার্ষিক ১৲ বা ২৲ বেতন দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, ফসলের সময় প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে করস্বরূপ ইহারা কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চৌকিদার, মুকদ্দম, ডিহিদার প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট কর্ম্মচারী আছে।

সাঁওতাল গ্রামে যে সকল কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের নাম ;—

পরগণাই ;—ইহারা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত। প্রধান বা মাঝিদিগের নিকট হইতে ইহারা যাহা আদায় করে, তাহার উপর শতকরা ২৲ হিসাবে পাইয়া থাকে। ইহাদের অনেকপরিমাণে পুলিশ ইন্স্পেক্টরের ক্ষমতা আছে। ইহাদের অধীন দেশমাঝি ও চাকলাদারেরা দূতের কাজ করিয়া থাকে।

মাঝি ;—সাঁওতাল গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে মাঝি কহে। ইহারা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়, এবং কার্য্য বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। ইহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যাহা আদায় করে, তাহার উপর শতকরা ৮৲ হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকে। ইহারা গ্রাম্য পুলিশের কর্ত্তা। দেওঘরে পুলিশ কর্ম্মচারীর সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়া ইহাদিগকে পুলিশের কর্ম্ম করিতে হয় না। ইহারা মান অর্থাৎ নিষ্কর জমী পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য লোকেরা মিলিয়া যোগমাঝি ও লিয়ারি নিযুক্ত করে। উহারাও কিছু কিছু মান জমী পাইয়া থাকে। যোগমাঝিরা বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

পঞ্চাইত ;—সাঁওতাল মৌজায় পঞ্চায়েত বলিলে এক প্রকার সভা বুঝায়। উপরে যে সকল সাঁওতাল কর্ম্মচারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা সক-

সেই পঞ্চায়েত সভার সদস্য। যেখানে এই সভার অধিবেশন হয়, তাহাকে মাঝিথান (স্থান) কহে, এবং তথায় সামান্য দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিবাদের মীমাংসা হয়। যে সকল বিবাদ কিছু উচ্চ দরের, তাহা পাঁচ-জন মাঝি লইয়া যে সভা গঠিত হয়, তাহাতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পরগণাইত ইহাদের সভাপতিরূপে বৃত হয়। বিষয়টি ইহা অপেক্ষা বেশী জটিল হইলে সরকারী বিচারালয়ে প্রেরিত হয়। পঞ্চায়েত সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা ও অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকে। এই প্রকার স্বায়ত্ব-শাসন দ্বারা সাঁওতালদিগের মধ্যে একতা প্রভূতপরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন পাটওয়ারী, জেঠ, রাইয়ত, মাহাতো প্রভৃতি আরও অনেক গ্রাম্য কর্ম্মচারী আছে।

পাহাড়িয়া গ্রামে প্রধান ব্যক্তির নাম সর্দ্দার। ইহার ক্রিয়াকলাপ সাঁও-তাল মাঝির মত। ইহাকে মাঝিও বলিয়া থাকে। তাহার অধীনে নায়েব ও অন্যান্য ছোট ছোট কর্ম্মচারী আছে।

লোকসংখ্যা ;—সাঁওতাল পরগণার লোকসংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ১৩ লক্ষ। ১৮৭২ সালের আদমসুমারি দৃষ্টে জানা যায় যে, এখানে ২৩০৫০৪ গৃহে ১২৫৯২৮৭ জন লোকের বাস। ১৩৬৬ বর্গমাইল পরিমিত দামন পাহাড়ে কিঞ্চিদধিক ১ লক্ষ ১৭ হাজার লোকের বাস। ইহা গবর্মেণ্টের খাসমহল। ভাগলপুরের জমিদারদিগের অত্যাচার ও জমীর অপহরণ নিবারণের নিমিত্ত ৩০০ মাইল দীর্ঘ সীমানার উপর মধ্যে মধ্যে পাকা স্তম্ভ ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে তালবৃক্ষশ্রেণী গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছে। এখানে অধিকাংশই পাহাড়িয়া। অল্পবুদ্ধি সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদিগের জাতীয় প্রথা অনুসারে যে প্রকারে লোকগণনা হইয়াছিল, তাহা বড় কৌতুকজনক! গবর্মেণ্ট মাঝি ও সরদারগণকে চারি বর্ণের রঙ্গিন সূত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য যথাক্রমে কাল ও লাল রঙ্গের, বালকদের সাদা ও বালিকা-দের জন্য পীতবর্ণের সূত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। মাঝি ও সরদারেরা লোকগণনার সময় স্ত্রী, পুরুষ ও বয়স বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সূত্রে সংখ্যানুসারে এক একটি গ্রন্থি দিত। পরে গণনা শেষ হইলে এক এক রঙের সূত্রের গ্রন্থি গণনা করিয়া কত পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা ইত্যাদি নির্ণীত হইয়াছিল।

গোড্ডার সন্নিহিত দামন শিলার কয়েক গ্রামে আর এক প্রকারের গণনা চলিয়াছিল। সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের গণনার ভার আপন আপন মাঝি ও সরদারদিগের উপর ন্যস্ত ছিল; হিসাব রাখিবার নিমিত্ত তিন তিন জন সহকারী থাকিত। এক জন পুরুষের, এক জন স্ত্রীলোকের ও অপর ব্যক্তি বালক বালিকাদের হিসাব রাখিত। ইহারা ফলের বীচি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গণনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে ২২৯ জন লোকের বসতি। গোড্ডা পরগণায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও জামতারা পুলিশ থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পলোকের বাস। সমস্ত জেলাটিতে খাঁটী আদিম জাতির সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার। পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রধানতঃ সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া, বন্ধুর ও তরঙ্গায়িত অংশে অর্দ্ধ আদিম জাতি ও নদীধৌত সমতল প্রদেশে প্রায়ই আর্য্যসন্তান অধিবাসী।

জাতি, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম।—এখানে এত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ (caste) বা সম্প্রদায়ের (sect or race) বাস, যে বঙ্গদেশে এত অধিক কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি, এক শ্রেণীর মধ্যেও আত্মীয় বা বিশেষ ঘনিষ্ঠ না হইলে কেহ কাহারও অন্ন আহার করিতে চায় না। বঙ্গদেশে এক জাতির (caste) লোক অন্য সমজাতীয় লোকের অন্নভোজন বড় দোষাবহ মনে করে না। অনেক সময় ভালবাসার, অনুরোধে, বা অন্য কোন কারণে, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ভাতও খাইয়া থাকে; তাহাতে জাতিচ্যুত বা বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হয় না। কিন্তু এ প্রদেশের রীতিনীতি বড়ই কঠোর, পদ্ধতি-রেখার তিলমাত্র বিচলিত হইলে আর উদ্ধার নাই। ইহারা শাস্ত্রানুসারে অনেক কার্য্য করিতে পারে না, অথচ আপনাদিগকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগকে ইহারা বড়ই সম্মানের চক্ষে দেখিত, আজ কাল অহিন্দু বলিয়া প্রায়ই ঘৃণা করে। ঘৃণা করিবার কারণও আছে। বেহার প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আচারভ্রষ্ট, প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মে আস্থাশূন্য ও পাশ্চাত্যমতাবলম্বী।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে যে সকল বর্ণ (caste) আছে, তাহার কতক কতক বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট হিন্দুস্থানের নিজস্ব। কিন্তু সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। তবে,

যে সকল আদিম জাতির জন্য এ প্রদেশের নামকরণ ও আইন প্রভৃতি ভিন্ন রকমের হইয়াছে, তাহাদের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। নিম্নে কয়েকটি আদিম জাতির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে,—

ভড়—(রাজভড়) ;—কিংবদন্তী ও প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয়, ইহারা এক সময় অযোধ্যা ও কাশী প্রদেশের অধিবাসী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অনেকে রাখালের কার্য্য করিয়া থাকে।

ধাঙ্গড় ;—ইহারা ছোটনাগপুর হইতে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে বলিয়া ইহাদের উক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে; কারণ দাং বা ধাং অর্থে পাহাড়। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। বোধ হয়, ধান (ধান্য) শব্দ হইতে ধাঙ্গড় (ধান্ গড়) নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে।

কাঞ্জর ;—ইহাদের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় নাই, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে ঘাসের রজ্জু ও খস্‌খসের পর্দ্দা প্রস্তুত করে। এক শ্রেণীর লোকেরা চৌর্য্য-বৃত্তি করিয়া থাকে।

খাড়ওয়াড় ;—অধিকংশ মৎস্যজীবী।

কোল ;—মুণ্ড, হোস, ভূমিজ ও উরেয়ন জাতির সাধারণ নাম।

নৈয়া ;—দক্ষিণ পাহাড়িয়াদের পঞ্চম ও সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। ইহারা বহুপূর্ব্বে জাতীয় পুরোহিতগিরি করিত। কথিত আছে, ইহারা এক সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুরোহিত ছিল।

নট ;—ইহারা প্রায়ই কবীরপন্থী মুসলমান। সির্কা নামক বহনযোগ্য আচ্ছাদন বা কুটীর লইয়া এক এক স্থানে রাত্রিবাস করে। ইহারা সাধারণতঃ বাজিকর, খোদ্‌নেত বান্দরমারা, গোহি (গিরগিটিখাদক), সাপুড়িয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। নাচ, তামাসা, বন্যজন্তু দর্শান ও চুরী প্রভৃতি ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তদ্ব্যতীত আপনাদের মধ্যে অন্যের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সময় সময় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

সাহিত্যে উপার্জ্জন।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায়,—আপনি সাহিত্যসেবায় সর্ব্বপ্রথম কত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ? তবে বোধ হয় অনেকেই উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, মোট হিসাব করিয়া দেখিলাম, জমার ঘর অপেক্ষা খরচের ঘরের অঙ্ক অনেক অধিক। ইংলণ্ডে ব্যাপার স্বতন্ত্র। শুনিতে পাই, সেখানে এক একখানা পুস্তকে দরিদ্র গ্রন্থকার ধনী হইয়া উঠেন। আমাদের তাহা আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়া বোধ হয়। সংপ্রতি "পিয়ার-সন্‌স্ ম্যাগাজিন" পত্রে শ্রীমতী মড চার্টন অনেক লেখকের প্রথম উপার্জ্জনের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিবরণ-সংগ্রহ ব্যাপার কষ্টসাধ্য; সাহিত্যসেবীরা লাজুক, আবার সংবাদপত্রের লোকের অত্যাচারে তাঁহারা এখন এরূপ বিবরণ দিবার নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। কোনান ডয়েল বলেন, নিজের কোন কথা প্রকাশ করিলে লোকে মনে করে, লেখক বুঝি আপনাকে জাহির করিবার চেষ্টায় আছেন, সে কেবল গর্ব্বিত লেখকের প্রশংসালাভ-প্রয়াস। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে "চেম্বার্স জর্নালে" একটা গল্প লিখিয়া তিনি তিন গিনি (৪৫৲ টাকা) পাইয়াছিলেন। সেই সাহিত্যসেবায় তাঁহার প্রথম উপার্জ্জন।

শ্রীমতী ফ্লোরা আনি ষ্টিল্ বলেন, তিনি ভারতে দুইটি ভাষায় শিক্ষাবিভাগের জন্য সচিত্র পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া প্রায় ৭০ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। সেই তাঁহার সাহিত্যসেবায় প্রথম অর্জ্জিত অর্থ। তিনি ছয়টি গল্প রচনা করিয়া ছয়টি পত্রে প্রেরণ করেন। "ম্যাকমিলান্‌স্ ম্যাগাজিন" পত্রে প্রেরিত গল্পটি প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে সেই তাঁহার প্রথম উপার্জ্জন। তাঁহার সাহিত্যসেবা দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম নহে।

শ্রীমতী "জন ষ্ট্রেঞ্জ উইণ্টার" সে দিন তাঁহার পঞ্চাশৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি রচনা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়স যখন বিংশতি বৎসর, তখন তাঁহার একটা রচনা একখানা পত্রে প্রকাশিত হয়; তিনি পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন—দশ শিলিং। এই ছয় বৎসরে তাঁহার উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয় নাই! লোকে বলে, তিনি 'কপালে',—সাহিত্যচর্চ্চায় দুঃখ জানেন না। তাহার উত্তরে তিনি কয় বৎসরের আয়ের তালিকা দিয়াছেন; ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪ পাউণ্ড ৯ শিলিং, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৩৩ পাউণ্ড ৭ শিলিং, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৮৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিং, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১২৭ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৬ পেন্স, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৮২ পাউণ্ড ১০ শিলিং, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১৩২ পাউণ্ড ১০ শিলিং, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে

Bootles' Baby প্রকাশের জন্য "গ্র্যাফিক" পত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ। নয় বৎসরের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের এই ফল; আবার পূর্ব্বের ছয় বৎসর ত দুর্ভিক্ষই ছিল। যাহা হউক, তিনি ইহাতে বিরক্ত নহেন।

ম্যাডাম্ সারা গ্রাণ্ট চেম্বার্স জর্নালে চীনা রমণীদিগের পদবন্ধন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম ৩০ শিলিং পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর ছিল না। সে প্রবন্ধ এখন বিস্মৃত; ম্যাডাম বলেন, সেটা বিস্মৃত হওয়াই ভাল।

একখানা অষ্ট্রেলিয়ান পত্রে কতকগুলা রচনার জন্য মিষ্টার বুথবী প্রথম ২৫ শিলিং পাইয়াছিলেন, এই কথা তিনি শ্রুত আছেন। আসলে সে অর্থ তাঁহার হস্তগত হয় নাই। সাহিত্য-সেবায় প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি কিছু পান নাই; তাহার পর অদৃষ্ট খুলিয়াছে। সে বুঝি অধ্যবসায়ের ফল।

মিষ্টার জ্যাঙ্গউইলের সাফল্য অতর্কিত। একবার র্যামস্‌গেটে অবকাশ-যাপনের সময় তিনি সৈকতে একখানি পত্রের একখানি পাতা কুড়াইয়া পান। তাহাতে রচনার প্রতিযোগিতার পুরস্কারের বিজ্ঞাপন ছিল। তিনি সেই সৈকতে বসিয়াই সাপ্তাহিক প্রতিযোগী পরীক্ষার জন্য একটা গল্পরচনা করেন। তিনি তাহাতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহার পর অন্য প্রতিযোগী পরীক্ষার জন্য তিনি বহুবিধ রচনায় বিফল চেষ্টা করিয়া শেষে হাস্যরসবহুল গল্পই প্রেরণ করেন। তাহার পারিশ্রমিক ৫ পাউণ্ড।

মিষ্টার হল কেন প্রথমে সংবাদপত্রের লেখক ছিলেন; তখন বেতন পাইতেন। পরে পুস্তক রচনা করিলে প্রকাশক তাঁহাকে থোক টাকা দিতেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক কবিতা-সংগ্রহ; সেখানার কাটতি মন্দ হয় নাই, তবে তিনি কিছু পান নাই। তাহার পর তাঁহার পাঁচখানি পুস্তকের জন্য তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, এখন একটা ছোট গল্প লিখিলে তিনি তদপেক্ষা অধিক পান। সেটা যশের ফল।

মিষ্টার কোলসন কার্ণাহান "গ্রাফিক" পত্রে ডিকেন্সের প্রতি একটা কবিতা লিখেন। সম্পাদক পত্র লেখেন, সেই সঙ্গে দশ শিলিং মূল্যের পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইলেন। কিন্তু সেটা তিনি পান নাই; অধিকন্তু ভ্রমক্রমে কবিতায় অন্য এক জনের স্বাক্ষর প্রকাশিত হয়!

মিষ্টার পিনরো বলেন, সর্ব্বপ্রথম নাটক লিখিয়া তাঁহার এক সেট সার্টের বোতাম লাভ হয়।

মিষ্টার ক্রোকেট বলেন, গ্লাসগোর কোন পত্রে রচনা দিয়া তিনি স্তম্ভ প্রতি সাড়ে সাত শিলিং হিসাবে পাইতেন।

মিষ্টার রবার্ট বার বলেন, তাঁহার সব সংগ্রাম ইংরাজী ভাষার সঙ্গে। নহিলে তাঁহার সব রচনাই সকল পত্রে গৃহীত হইয়াছে। যশের জন্য এই চেষ্টার অভাবে তাঁহার মনে হয় বুঝি তিনি আসল সাহিত্যসেবী নহেন। যশোলাভের চেষ্টা ও তজ্জনিত কষ্ট হামেরই মত—প্রথম বয়সের। তিনি একবার উড়ুপযোগে ভ্রমণান্তে তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া দুইখানি প্রসিদ্ধ পত্রে প্রেরণ করেন। রচনাটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য। কোন পত্রেই গৃহীত হইবে না ভাবিয়াই তিনি একক লে দুইখানি পত্রে উহা প্রেরণ করেন। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! দুইখানিতেই উহা

প্রকাশিত হইল! উভয় পত্রের সম্পাদকই পরের অংশ চাহিয়া পাঠাইলেন। এ যেন এক জন লোক দুইটি রমণীকে বিবাহ করিবে—কথা দিয়াছে। যে পত্রে আর পরের অংশ প্রদত্ত হইল না, সে পত্রের সম্পাদক প্রথমে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, শেষে টেলিগ্রাফের শরণ লইলেন; উত্তর না পাইয়া তাঁহার বার্ত্তা এমনই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল যে, শেষে টেলিগ্রাফ বিভাগ সে বার্ত্তা বহন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন একখানি তীব্রগালিপূর্ণ পত্র লিখিয়া সম্পাদক শেষ করেন!

মিষ্টার রাইডার হ্যাগার্ডের প্রথম রচনাতেই হুলস্থুল হইয়াছিল। তিনি তখন নেটালের গভর্ণরের কর্ম্মচারী। তিনি "জেণ্টল্‌ম্যান্‌স্‌ ম্যাগাজিন" পত্রে ট্রান্সভালবাসী বুয়রদিগের বিবরণ বিবৃত করেন; সেরূপ বিবৃতি তাঁহার মত কর্ম্মচারীর পক্ষে বর্জ্জনীয়। তিনি বলিয়াছিলেন, ডচ রমণীরা মোটা। আফ্রিকার নানা পত্রে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বুয়রগণ ক্রোধে অস্ত্রব্যবহারেরও প্রস্তাব করিয়াছিল।

মিষ্টার ক্লেমেণ্ট স্কট প্রথমে সর্ব্বপ্রকার লেখার কাজে কোন সংবাদপত্রে কর্ম্ম পান; সপ্তাহে ৫ পাউণ্ড বেতন পাইবার কথা ছিল। কিন্তু আসলে তিনি তাঁহার অন্য আয় হইতে সত্ত্বাধিকারীকে ২৫ পাউণ্ড ধার দেন। টম হুডের "স্যাটারডে নাইট" নামক পত্রে একটা সমালোচনা লিখিয়া তিনি প্রথম উপার্জ্জন করেন। তিনি আনন্দবিহ্বলহৃদয়ে কাগজখানি জননীকে দেখান। জননী পুত্রকে চুম্বন করিলেন,—তাঁহার নয়ন বুঝি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে অশ্রু সুখের, না দুঃখের? বোধ করি, সে অশ্রু দুঃখেরই হইবে। কারণ, তাঁহার পিতাও অর্থাভাবে সংবাদপত্রের সেবায় হাড়ভাঙ্গা শ্রম করিতেন।

মিষ্টার মর্লে রবার্ট অপরের প্রবন্ধের প্রথমে ও শেষে আপনি কিছু লিখিয়া আপনার বলিয়া চালাইয়া প্রথম অর্থোপার্জ্জন করেন। তিনি বলেন, কার্য্যটা নীতিবিগর্হিত—বোধ করি, লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে।

কোন দোকানদার জিনিস-মোড়া কাগজে আপনার বিজ্ঞাপন দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহার সেই বিজ্ঞাপন রচনায় সাহায্য করিয়া তিনি কিছু পান। সেই মিষ্টার কাটক্লিফ হাইনের প্রথম উপার্জ্জন।

এখন যিনি দেশবিখ্যাত—সেই মিষ্টার আলফ্রেড হার্মসওয়ার্থ অতি অল্প বয়সেই সংবাদপত্রসেবায় রত হয়েন। তাঁহার প্রথম উপার্জ্জন "ইলাষ্ট্রেটেড লণ্ডন নিউসে"র সংগ্রহে রচনায়। সে অর্থ পাইয়া তিনি বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন; কারণ, তৎপূর্ব্বে অনেক লিখিয়া ও ছাপিয়া তিনি কিছু পান নাই। কিন্তু এখন তাহার সুফল ফলিতেছে।

মিষ্টার হোপ ও মিষ্টার জিরোম উত্তর দিতে চাহেন না। কুমারী কোরেলী বলেন—তাঁহার অভিজ্ঞতা নূতন ধরণের—বিবৃত করিয়া ফল নাই।

উইডার উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। তিনি কেবল লিখিয়াছেন, কুমারী চার্টন যদি সাহিত্যসেবায় সাফল্যলাভ করিতে না পারেন, তবে সে অসাফল্য অবিনয়ের অভাবে হইবে না। অর্থাৎ, অবিনয়টা তাঁহার প্রচুর আছে।

এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায়, য়ুরোপেও সাহিত্যে সাফল্য কষ্টসাধ্য, সহজে হয় না।

সাহিত্য।

সস্তা সংবাদপত্র।

বঙ্গদেশে সংবাদপত্র সে দিনের সৃষ্টি। কিন্তু এখন কাগজের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া যেমন আশা হয়, তেমনই আশঙ্কাও হয়। এ দেশে সংবাদপত্র সস্তার চূড়ান্ত, তাহার উপর আবার পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকের গাদা উপহার নহিলে গ্রাহকের মন উঠে না। সাধারণের রুচির এই বিকার আশাপ্রদ হওয়া দূরে থাকুক, ভীতিসঞ্চারকারী।

ইংলণ্ডে এক পেনি (এক আনা) মূল্যের কাগজই অধিক। এ দেশে কাগজের ফেরিওয়ালাদের ইহাও হাঁকিতে শুনিয়াছি,—"দাম আধা পয়সা, আধেলা হামারা পাশ হ্যায়।" ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষায় সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তর অবধি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; সেখানে শ্রমজীবিগণও সংবাদপত্র পাঠ করে। এই এক আনা মূল্যের সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে "ট্রুথ" পত্রের সম্পাদক মিষ্টার ল্যাবুশিয়ার বলিয়াছেন,—ইহার বিলোপ নিশ্চিত। ইংরাজের রক্ষণশীলতাও আর সেগুলিকে অধিক দিন জীবিত রাখিতে পারিবে না। তিনি স্বয়ং এক সময় একখানা ঐরূপ পত্রের অংশীদার ছিলেন। এখন ক্রমেই লোক এক পেনি মূল্যের কাগজ ছাড়িতেছে। এরূপ একখানি প্রধান পত্র কেবল বিজ্ঞাপনের আয়ে চলে। প্যারিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতির সহিত তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতে সংবাদপত্রের সংখ্যা লণ্ডনে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। ক্রমে লণ্ডনে অর্দ্ধ পেনি মূল্যের কাগজের সংখ্যা বাড়িবে। পুরাতন কাগজগুলা এখন বিজ্ঞাপনের বাজার; বিজ্ঞাপনের আয়েই সেগুলা কিছু কাল চলিবে।

কিন্তু ক্রমে বিজ্ঞাপনও উঠিয়া যাইবে; কারণ এখন লোকে ক্রমেই বুঝিতেছে যে, সংবাদপত্রের প্রভাব মূল্যের মুখাপেক্ষী নহে। পত্রের মূল্য অল্প হইলেও তাহার প্রভাব প্রচুর হইতে পারে।

ভবিষ্যতের এই সস্তা কাগজের বিশেষত্ব দেখা যাইবে—সংক্ষেপ-করণে। যাহা অর্দ্ধ স্তম্ভে লেখা যায়, তাহা আর স্তম্ভব্যাপী করা হইবে না। লেখকও অল্প অথচ সারবতী রচনায় অধিক পারিশ্রমিক পাইবেন। এই সকল পত্রে বিজ্ঞাপন-বিভাগের জন্য এক জন স্বতন্ত্র সম্পাদক থাকিবেন—তিনি বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক করিবেন। বাস্তবিক বিজ্ঞাপনদাতারা যেরূপ বিজ্ঞাপন দেন, তাহাতে তাঁহাদের বক্তব্য সম্যক্ প্রকাশিত হয় না; বিজ্ঞাপনও লোকের মনোযোগ আকর্ষণে অক্ষম হয়।

এখনকার সংবাদপত্রের আর একটা দোষ, টেলিগ্রাফে ব্যয়বাহুল্য। এখন অনেক সময় যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে সাধারণের কোন ইষ্টানিষ্ট নাই; অথচ সেই সংবাদ আনিতে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়!

তবে এ কথা সুনিশ্চিত, সস্তাদরের সংবাদপত্রের সাফল্য এক দিনে হইবে না। লোকে একখানা কাগজ লইতে আরম্ভ করিলে সহজে সেটা ছাড়িয়া আর একখানা লইতে চাহে না; বিজ্ঞাপনও সহজে পাওয়া যায় না। কাজেই সস্তা সংবাদপত্রের সাফল্য সময়সাপেক্ষ হইবে।

নিত্যকৃষ্ণ বসু।

১

নিষ্কলঙ্ক জীবনের মধ্যাহ্ন সময়
প্রতিভার দীপ্তরবি সংহরি কিরণ,
মৃত্যুর সাগরনীরে লয়েছে আশ্রয়!
জীবনের খেলা শেষ, এসেছে মরণ।
ভাবের রতন-খনি বহু সাধনায়
পেয়েছিলে। অসমাপ্ত সাঙ্গ গীত তব,
আর না শুনিব সেই মধু গীতরব—
গম্ভীর মধুর সিন্ধুকল্লোলের প্রায়।
পূত ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, পুণ্য পরশনে
আর না ঘুচাবে, বন্ধু, জীবনের মসী!
না হ'তে রজনী শেষ সুনীল গগনে
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভূমে পড়িয়াছে খসি।
মৃত্যু—সে ক্ষণিক সুপ্তি। সাধনা তোমার
আনন্দ আলোক রাজ্য মৃত্যু পরপার।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

২

কবি ওগো! তোমার সঙ্গীতে
আর্ত্ত সুর শুনিতে শুনিতে
ভাবিতাম মনে মনে,
শোক দুঃখ ব্যথা সনে
বিজড়িত চির যেন তুমি,
ভূমি অতৃপ্তির নিবাসের ভূমি!

যেন তুমি নিখিল ব্যথায়
গাঁথি লয়ে কণ্টকিত হার,
আদরে করেতে ধরি'
কণ্ঠে বেড়ি' আপনারি,
গেয়েছিলে, লয়ে ক্লান্ত হাস,
ছন্দে করুণার ললিত বিভাস!

মা'য়ে দিয়ে স্নেহের সান্ত্বনা
কে করিবে প্রসন্নবদনা? *
কে মিটায়ে মন-আশ
হে দ্বিতীয় চণ্ডীদাস!
দেখাইবে মর্ম্ম-গৃহে পশি'
স্নিগ্ধ প্রণয়ের রাহুগ্রস্ত শশী? †

কর্ণে যেন ধীরে আসে ভাসি'
জীবনের অন্তিম উচ্ছাসি'
তোমার সে সকাতর
মৃত্যু-আবাহন-স্বর
জাহ্নবীরে করুণ আহ্বান— ‡
ক্লান্ত অবসন্ন করিয়া পরাণ!

সে আহ্বান, হা অতৃপ্ত কবি!
সত্যই কি শুনিল জাহ্নবী?
মৃত্যু কি সে গীত শুনে
আসিল গো সঙ্গোপনে?—
নিশান্তের সুখ-স্বপ্ন-প্রায়
পিক গেল উড়ি' আধ-আলো-ছা'য়।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

---

* "বঙ্গের কবিতা";—সাহিত্য; ৮ম ভাগ; ৯৭ পৃঃ।

† "মোহ";—বীণাপাণি; ৪র্থ খণ্ড; ১০৩ পৃঃ।

‡ "উদ্দাম সঙ্গীত";—সাহিত্য; ৮ম ভাগ; ৩৮৭ পৃঃ।

শোকসংবাদ।

আমাদের পরমপ্রেমাস্পদ শ্রদ্ধাভাজন সখা সুকবি নিত্যকৃষ্ণ বসু গত ২৯শে আষাঢ় বিসূচিকা রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্রগৌরব, উদার সমবেদনা ও গভীর সখ্যপ্রেম এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার অকাল বিয়োগে বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষতিও সহজে পূর্ণ হইবার নহে। প্রতিভাশালী কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে বরণীয়। হায়! মধ্যগগনে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সেই প্রতিভারবি অস্তমিত হইল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। দুঃখের কবি তাঁহার চিরাভীষ্ট শান্তিলোকে নির্ব্বৃতিলাভ করুন, বন্ধুজনের এই আন্তরিক কামনা।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পন্থা। জ্যৈষ্ঠ। পন্থার ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের "পৌরাণিক কথা" বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। এই সংখ্যার 'সার' ও শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ "ভগবান বুদ্ধদেব।" উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্ত ও বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্বের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানগৌরব অসাধারণ। তিনি যে মাতৃভাষার সৌষ্ঠব-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সাহিত্যের পক্ষে ইহা সুসংবাদ। এরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গালা মাসিকে সচরাচর দুর্লভ। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"জীব পুনঃ পুনঃ অনন্তকোটি যুগ যুগান্ত ধরিয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতেছে; সুতরাং অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিতেছে; কিসে সৃষ্টির ললামভূত মানব এই কালচক্রের বাগুরা হইতে পরিত্রাণ পাইবে এই ভীষণ চিন্তায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া কপিল প্রভৃতি মহর্ষির ন্যায় ভগবান বুদ্ধ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলস্বরূপ এইগুলি তত্ত্ব তাঁহার দিব্যচক্ষুঃ-ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়; এগুলি সিদ্ধপুরুষের অনুভবসিদ্ধ তথ্য, অতএব শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে আমাদিগের গ্রাহ্য। বুদ্ধ জানিয়াছেন, তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা বা ইচ্ছা যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত নিদান; তৃষ্ণা তিন প্রকার;—কাম, ভব, বিভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত আসক্তি, জীবনের প্রতি আসক্তি, অর্থাৎ জন্মিবার ইচ্ছা; এবং বর্ত্তমান জগতের প্রতি আসক্তি। তাঁহার মতে সত্য চারি প্রকার, দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য এবং মার্গসত্য। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকাল-

স্থায়ী, তাহাই সত্য। সংসার দুঃখময়, ইহা একটি সত্য ; মনুষ্য নিজ নিজ কামনার অপরিতৃপ্তিহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সকল কামনার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে সচেষ্ট হয়, সুতরাং কামনার দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে অনবরত দুঃখভোগ করে, ইহা অপর সত্য। এই দুঃখনিবারণের উপায় আছে, ইহা তৃতীয় সত্য। সেই দুঃখদূরীকরণের পন্থা আছে, ইহা চতুর্থ সত্য। এই শেষোক্ত পন্থা আট প্রকার ; যথা—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাচঃ, সম্যক্‌কর্ম্ম, সম্যক্‌জীবিকা, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি। আবার এই অষ্টপ্রকার পথে বিচরণ করিতে গেলে দশরূপ গুণের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে হয় ; সেগুলি দান, শীল, নৈষ্কর্ম্য, প্রজ্ঞা, মৈত্রী, বীর্য্য, ক্ষান্তি, অধিষ্ঠান, সত্য, উপেক্ষা। উপরিউক্ত আট পথ এবং দশ পারমিতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায়। ভগবান বহু জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই দশটি পারমিতার প্রভু হইয়াছিলেন।

"বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'নাহং ভিক্‌খবে অন্নমেক ধম্মম্‌পি সমনুপস্‌সামি মহা সাবজ্জতরম্‌ যথা ইদম্‌ ভিক্‌খবে মিচ্ছাদিট্‌ঠি, মিচ্ছাদিঠ্‌টি পরামণি ভিক্‌খবে বজ্‌জানি।' কার্য্যকারণরূপ বিধির অপরিজ্ঞান নিবন্ধন যে সকল অগণনীয় দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আমি আর দেখিতে পাই না।

"ভগবান বুদ্ধের উদ্ভাবিত অতি সূক্ষ্ম, প্রসন্ন গম্ভীর মনোবিজ্ঞান পৃথিবীতে কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও শাস্ত্রে, কোনও জাতিতে নাই, ভ্রাতৃগণ! ইহা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। বিস্তারিতরূপে উহার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার স্থান, সময়, অথবা উপলক্ষ অদ্যকার উৎসব নহে, এবং হইতেও পারে না। একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ না লিখিলে উহার প্রকৃত পদমর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না। তবে, এ পর্য্যন্ত নির্ভীকচিত্তে বলা যাইতে পারে, বুদ্ধের মনোবিজ্ঞান চিন্তা এবং গবেষণার সাহচর্য্যে পরিশীলিত হইলে মানব-মন, মানব-হৃদয়, মানব-বুদ্ধি, মানব-জ্ঞান দেবোপম হইয়া উঠে।

"বুদ্ধের ধর্ম্মনীতি অতীব উচ্চকোটির। অহম্ভাব একেবারে বিস্মৃত হওয়া ; জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া ; সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা ; অপহরণ এবং অন্যায়রূপ ধনোপার্জ্জন হইতে বর্জ্জিত হওয়া ; ইন্দ্রিয়সেবা এবং মাদকদ্রব্যাদি পরিত্যাগ করা ; মিথ্যা কথা না বলা, পরুষ এবং মর্ম্মঘাতী বাক্য ব্যবহার না করা ; নীচ, কুৎসিত অপভাষা ব্যবহার না করা ; পরনিন্দা পরগ্লানি না করা ; দ্বেষ, হিংসা অসূয়া পরিত্যাগ করা ; স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দেওয়া ; সর্ব্ববিষয়ে সত্য এবং ভ্রমপ্রমাদশূন্য মতাবলম্বন করা ; অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম উপাসক, উপাসিকাদিগের প্রতি এই সমুদায় উপদেশ ভূরি ভূরি প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতিকে সমান পদবীতে স্থাপিত করা বোধ করি বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় অপর কোনও ধর্ম্মে নাই। সর্ব্বজীবে দয়া এবং সমভাব হিন্দুধর্ম্মে বুদ্ধের জন্মের বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে ছিল বটে, কিন্তু এ ভাবে উক্ত দুইটি মহান ধর্ম্মকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়া ধর্ম্মের মূলভিত্তিস্বরূপ করিয়া যাওয়া তাঁহার দ্বারা বিশিষ্টরূপে সাধিত হইয়াছিল।

"ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি সকল ধর্ম্মেই এক ; বেদে এবং উপনিষদে যাহা নাই, তাহা অন্যত্র নাই; কারণ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি প্রেম শক্তি সকলেরই মহাভাণ্ডার বেদ। কিন্তু বেদের

সত্য নিষ্কাশিত করা নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্ম ঈদৃশ বিশদ, অনায়াসগম্য, এবং আবর্জ্জনাবিরহিত করিয়াছেন যে, প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করিতে কাহাকেও আয়াস পাইতে হয় না।

"বুদ্ধ ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি দুরবগাহ কূট প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, আমি যে পথ দিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছি, তোমরা সকলে সেই পথে বিচরণ করিলে 'তুমি কে,' 'জগত কি,' 'জগতের অনন্তকোটি বিশ্বের কর্ত্তা কে,' 'বিশ্বের বিকাশের কারণ অথবা উদ্দেশ্য কি,' এ সকল অবগত হইতে পারিবে; সাধনার প্রারম্ভে এ সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলে তোমার অহম্ভাব বর্দ্ধিত হইবে, তোমার তপস্যা ভ্রষ্ট হইবে, তুমি কস্মিন্‌কালে জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারিবে না, সত্যের আলোকে তোমার হৃদয়ক্ষেত্র আলোকিত এবং উদ্ভাসিত হইবে না।

"তবে বুদ্ধ নিরীশ্বর, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কানু ছাড়া গীত নাই, ঈশ্বর ছাড়া ধর্ম্ম নাই। দেব দেবী হিন্দুরাও যেরূপ বিশ্বাস করেন, বুদ্ধও তাহাই করিতেন; তবে তিনি উপাসনা, বলিদান, দেব দেবীর আশ্রয়গ্রহণ, এ সমুদয় স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে মনুষ্যের মত দেবদেবীগণও নাশ্য, ব্রহ্ম ব্যতীত কেহই অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত, অনাদি নহেন; মনুষ্যের হৃৎপুণ্ডরীকে যে বস্তু আছে, দেব দেবীতেও তাহাই আছে, মনুষ্য যত্ন করিলে দেবগণ অপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারেন। আমাদিগের উপনিষদেও লিখিত আছে—'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।' * * *

"এ দিকে আবার প্রত্যূষে সর্ব্বজীবের মঙ্গলকামনা করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা, আহারকালে চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্যাদি ভোজনে শব্দ না করা, অপরের সহিত একত্র ভোজনে বসিলে তাঁহার পাত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করা, দ্বিপ্রহরের পর পেয় বস্তু ব্যতীত অপর কোনও দ্রব্য আহার না করা; ইত্যাকার সাধারণ স্বাস্থ্যের এবং নিষ্ঠাচারের নিয়মাবলী সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া ভগবান অনুপম বুদ্ধদেব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে অথবা পরে কোনও অবতার বা জীবন্মুক্ত পুরুষ আহার, ব্যবহার, শিষ্টাচার হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্য দিয়া কাষ্ঠাগত বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া যান নাই।"

আশা করি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি অভাব মোচন করিবেন।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষণিকের গান" হয় নিতান্তই ক্ষণিক, নয় আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার "কাব্যের উপেক্ষিতা" পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। উর্ম্মিলাচরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য লেখকের রচনায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির কবিতা ও ভাবুকতার পুণ্য সম্মিলনে এই রচনাটি পরম রমণীয় হইয়াছে। "বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যনির্ব্বাচন ও রাজনীতি" প্রবন্ধটি সাময়িক—যুক্তিপূর্ণ, পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বন্যশিশু" নামক ক্ষুদ্র গল্পটির আরম্ভ সুন্দর, কিন্তু উপসংহার উদ্ভট হইয়াছে। শেষকালে একবারে রক্তগঙ্গা।—লেখক সুকৌশলে গল্পটির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্রপটের একটি চিত্র—যদু বাবু অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সজীব। লেখক সিমলা শৈলে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। গল্পটিতে স্থানীয় বিশেষত্বের বর্ণপাত করিয়া কলানিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি গল্পরচনায় ও তাহার পরিণামের দিকে আর একটু অবহিত হন, তাহা হইলে সফলতালাভ করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "উড়িষ্যার মহাজন" একটি সুখপাঠ্য রচনা। "চিরকুমার সভা" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। "সব ভাল যার শেষ ভাল,"—আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি।



স্বর্গীয় নিত্যকৃষ্ণ বসু।

KUNTALINE PRESS

ধর্ম্মের প্রমাণ।

জীষনসংগ্রামে প্রবৃত্তির তাড়নায় বিড়াল তপস্বিব্রত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সে এই নিমিত্ত চিরদিন ভণ্ডামির উদাহরণ-স্বরূপে গৃহীত হইবে।

হিতোপদেশের ব্যাঘ্র গলিতনখদন্ত বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ দ্বারা অনেকগোমানুষভোজনের প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখাইয়াছিল, কিন্তু ব্যাঘ্রসমাজে যদি কোন মনুসংহিতা বর্ত্তমান থাকে, হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ ও হবিষ্যভোজন পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া তাহাতে কখনই কীর্ত্তিত হয় নাই।

ঈসপের কথামালায় বঞ্চনাপরায়ণতার জন্য জম্বুক পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়াছে; কিন্তু বঞ্চনাবৃত্তি নিন্দা বা প্রশংসার বিষয় হইতে পারে, জম্বুকসমাজ-মধ্যে বোধ হয় এই প্রশ্ন লইয়া কোন তর্কই আজ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই।

পুনশ্চ প্রভুভক্তির জন্য কুক্কুর উপাখ্যানের নায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমাধির উপর মনুমেণ্ট পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ ইতিহাসে লেখে; কিন্তু কোন চিত্রগুপ্ত তাঁহার পাপ পুণ্যের খাতায় কুকুরের এই প্রভুভক্তি পুণ্যের অঙ্কে জমা করিয়াছেন, তাহা শুনা যায় নাই।

একটা মোটা কথায় এক নিশ্বাসে বলা যাইতে পারে, মনুষ্যেতর জীবের জীবনে পাপ পুণ্যের কোন কথাই নাই। কুকুর অন্নদাতার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পুণ্যশীল হয় না, ব্যাঘ্র সারা জীবন ধরিয়া জীবহিংসা করিয়াও কাহারও নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয় না। প্রকৃতি প্রত্যেক ইতর জীবের জন্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; কোন মাষ্টার মহাশয় বা ধর্ম্মশাস্ত্রকারের নিকট কর্ত্তব্যবিচার শিখিবার জন্য ইতর জীবকে অপেক্ষা করিতে হয় না। সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান লইয়া জীবলীলা আরম্ভ করে; তাহার স্বভাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সে কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিহার করে; এ কাজটা ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, এরূপ দ্বিধা বা সংশয় তাহার মনের মধ্যে কখনই উদিত হয় না।

এই অংশের ইংরাজী নাম instinct; বাঙ্গালা নাম সংস্কার। 'সহজাত' বা 'সহজ' এইরূপ একটা বিশেষণ দিলে সংস্কারের অর্থটা আরও পরিষ্কার হয়। তাহার সংস্কার সহজাত অর্থাৎ জন্মসহকারে লব্ধ; তাহা শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয় না; প্রকৃতি যেমন তাহাকে হাত পা দাঁত রক্ত মাংস দিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি সংস্কার সমেত ভবলীলায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। এক জোড়া শিং ও চারি জোড়া খুর উপার্জ্জন করিতে যেমন বলীবর্দ্দের কোন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, ধারাল নখর ও তীক্ষ্ণ দশনশ্রেণী লাভ করায় বাঘের যেমন কোনই ব্যক্তিগত বাহাদুরি নাই, সেইরূপ পৃথিবীর সমুদয় মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের প্রতি আনুরক্তির জন্য গরুকে কোন স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হয় নাই,এবং হরিণমাংস ও মেষমাংসের উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্য ব্যাঘ্রশিশুও কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। আপনার সহজ সংস্কার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলদ চিরকাল যথানিয়মে ঘাস খাইয়া আসিতেছে, ও বাঘ চিরকাল মেষমাংসে স্পৃহা দেখাইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত তত্তৎ সমাজে কোন রিফর্ম্মার জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে সংশয় উৎপাদনের ও তাহাদের নৈতিক সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই।

এই সহজাত সংস্কারের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, যে ব্যক্তি এই সংস্কারের বশীভূত, তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই, সে সর্ব্বতোভাবেই এই সংস্কারের অধীন, এই সংস্কারের অধীনভাবে না চলিয়া তাহার উপায়ই নাই; এই সংস্কারের বশে না চলা যাইতে পারে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে কখনও স্থান পায় না। গরুর ঘাস না খাইলে ও রোমন্থন না করিলে উপায় নাই, বাঘের পক্ষে হিংসা পরিত্যাগ ও হবিষ্যভোজন একেবারে অসম্ভব; মৌমাছিকে ফুলের আকর্ষণে উড়িতেই হইবে ও মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাক নির্ম্মাণ করিতেই হইবে। পিপীলিকাকে অজ্ঞাতসারে বিনা কারণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেই হইবে,সে হয় ত জানেই না কি উদ্দেশ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা অন্ধভাবে আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট জীবনপ্রণালীর অনুসরণ করিতেছে। কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, না করিলে কি হয়, এই সকল তত্ত্বকথা তাহাদের মনে উদিত হয় না। প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথে তাহারা বিচরণ করে ও বিচরণ করিতে বাধ্য; রেখামাত্রমপি সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাহাদের উপায় নাই। বলা হয়,তাহাদের সংস্কার অন্ধ,

(ইংরাজিতে freedom of will) নাই; এবং তাহাদের দায়িত্ব (ইংরাজিতে responsibility) নাই; তাহাদের চেষ্টা অনেকটা যন্ত্রের মত নিয়মবদ্ধ (ইংরাজিতে mechanical) কাজেই তাহাদের জীবন-সমালোচনায় পাপ-পুণ্যের কথা, নীতির কথা (ইংরাজিতে moralityর কথা) উঠিতে পারে না। পশুজীবনে ধর্ম্মবিজ্ঞান (ethics) শাস্ত্রের প্রয়োগ নাই।

কিন্তু হতভাগ্য মনুষ্যের জীবন এইরূপ দায়িত্ববর্জ্জিত যন্ত্রের মত হইলে মনুষ্যজীবনে ক্লেশের ভার অনেকটা লঘূকৃত হইত সন্দেহ নাই। প্রকৃতিদেবী তাঁহার পশু সন্তানগুলির প্রতি যতটা মমত্ব দেখাইয়াছেন, অপোগণ্ড মনুষ্য-সন্তানগুলির প্রতি ততটা দেখান নাই। আধিব্যাধি জরা মরণ নৈসর্গিক বিপৎপাত হইতে ক্লেশ পশু ও মনুষ্য তুল্যরূপে ভোগ করে; হয় ত পশুজীবনে ঐ সকল অত্যাচারের মাত্রা মনুষ্যজীবনের অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু স্বকৃত কার্য্যের জন্য মনুষ্যের দায়িত্ব থাকায় মানবজীবন নৈতিক ক্লেশের ভারে একবারে প্রপীড়িত ও অবসন্ন হইয়া আছে, পশুজীবনে তাহার একবারে তুলনা নাই। প্রকৃতি পশুজীবনের বল্‌গা নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরাইতেছেন; কিন্তু মনুষ্যকে যথেষ্টপরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ও যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষমতা দিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন।

মনুষ্য সংস্কারের বশ নহে এরূপ নহে; জীবনরক্ষা ও সন্তানোৎপাদনার্থ যে সকল প্রবৃত্তির প্রয়োজন, সেগুলি মনুষ্য অন্যান্য জীবের মতই প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছে; এইগুলি তাহার সংস্কার। মানুষ সংস্কারবশে ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় প্রেরিত হয়, ভোজ্যপানীয় প্রভৃতির মধ্যে পথ্যাপথ্য-বিচার অনেক স্থলে সংস্কারবশেই স্থির করিয়া লয়, সংস্কারবশেই শত্রুর আক্রমণে ভীত হয়, শত্রুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, বংশরক্ষায় ও অপত্যপালনে প্রবৃত্ত হয়। অপত্যের প্রতি জননীর স্নেহ, যাহা অনেক ইতর জীবের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাহাও সংস্কার হইতে উৎপন্ন। জীবনরক্ষা ও বংশরক্ষা বিষয়ে এই সকল সংস্কারের এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি এ বিষয়ে মনুষ্যকে স্বাতন্ত্র্য দিতে সাহস করেন নাই। মৃত্যুর প্রতি যদি স্বাভাবিক ভয় না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য জাতি এত দিন সংসারমধ্যে দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ; যৌন-সঙ্গলিপ্সা যদি স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন ও তীব্রতাবিশিষ্ট না হইত,

সন্দেহের বিষয়। কাজেই এই সকল স্থলে মনুষ্যের সহজাত সংস্কারই প্রবল ; মনুষ্য এই সকল স্থলে ইতর জীবের সহিত এক পর্য্যায়ে দণ্ডায়মান ; মনুষ্যের এই সকল ধর্ম্মকে পাশব ধর্ম্ম ও এই সকল প্রবৃত্তিকে পাশব প্রবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। আহার নিদ্রা ভয়াদি কতিপয় জৈব ব্যাপারে পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিভেদ নাই। এই সকল স্থলে মনুষ্য সংস্কারের অধীন ও প্রবৃত্তির অধীন ; তাহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই।

সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই, কিন্তু কতকটা আছে স্বীকার না করিলে চলে না ; ইতরজীবে কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই ; মনুষ্যে কতকটা আছে, এবং তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এবং তাহাতেই পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিশেষ। এবং অন্তঃকরণের যে বৃত্তি লইয়া এই বিভেদ, তাহার ইংরাজী নাম reason, বাঙ্গালায় মাননীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পরিভাষামতে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা ও সংস্কারের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ, এমন কি বিরোধ বর্ত্তমান। প্রজ্ঞা ভূয়োদর্শন বা অতীতকালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যৎকালের ভরসার উপর স্থিরভাবে বর্ত্তমান। সংস্কারের সহিত এই অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের ভরসার কোন সম্পর্ক নাই। সংস্কার সম্পূর্ণভাবে অন্ধ, কিন্তু প্রজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় চক্ষুষ্মান্। গরু মাংস পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের আঁটির দিকে চলে ও বাঘ ঘাসের আঁটি ফেলিয়া মাংসের প্রতি দৌড়ায় ; উভয় এই প্রকৃতির প্রেরণায় ; খাদ্যবিশেষের ইষ্টানিষ্ট বিচার করিতে বসে না। মানুষ প্রকৃতির প্রেরণায় সচরাচর মাংস ও রসগোল্লা উভয়ের প্রতি সস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু সময়ক্রমে আবার প্রকৃতির প্রেরণার বিরুদ্ধাচারী হইয়া মাংস ও রসগোল্লা উভয়ই পরিহার করিয়া কুইনাইন গলাধঃকরণেও সম্মত হয়। কেন না, মানুষের অতীতকালের অভিজ্ঞতা তাহাকে শিখাইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় কুইনাইনই তাহার উপযোগী ; ও ভবিষ্যতের ভরসা যে কুইনাইনই তাহাকে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ করিবে। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ বিচার করিতে সামর্থ্য দেয় যাহা, তাহাই প্রজ্ঞা। কুইনাইন ভোজনের সমকালে মানুষ মনের মধ্যে একটা ন্যায়শাস্ত্রের বিতণ্ডা বাঁধিয়া ফেলে ; এবং ন্যায়শাস্ত্রের ইন্‌ডকশন ও ডিডকশন উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ সমাধান করিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য দার্শনিক পণ্ডিত সাজিয়া উঠে। ইন্‌ডকশন প্রক্রিয়া

বলে, তুমিও কুইনাইনে ফল পাইবে। তখন প্রজ্ঞা সবলে সংস্কারকে পরাভূত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে রসগোল্লার সম্পর্ক পরিহার করিতে বাধ্য করে; এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কুইনাইন উদরসাৎ করিতে পরামর্শ দেয়।

এরূপ বলিতেছি না যে, ইতর জীবেরা পীড়ার সময় পথ্য ও ঔষধ চিনিয়া লইতে পারে না। অথবা তাহারা সুস্থ ও অসুস্থ সকল অবস্থাতেই একই নিয়মে জীবনযাত্রা চালায়। অনেক পশুর গল্পে জানা যায়, তাহারা আপনাদের পীড়ার সময় ঔষধ চিনিয়া বাহির করে, ও অসুস্থ অবস্থায় এমন সকল নিয়ম পালন করে, যাহা সকল ডাক্তারের মাথায় আসে না। কিন্তু পশুর পক্ষে এই সকল শক্তিও স্বাভাবিক ও সহজাত ও সংস্কার হইতে উৎপন্ন; কাহারও নিকটে এই বিদ্যা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই; কোন ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হয় না; অথচ সংস্কারের নির্দ্দেশ একবারে অব্যর্থ অভ্রান্ত। সংস্কার ইতর জীবকে যে পথ্য ও যে ঔষধ দেখাইয়া দেয়, তাহা অমোঘ। মনুষ্য ডাক্তারের ব্যবস্থায় বা নিজের বিদ্যায় যে ঔষধ সেবন করে, অধিকাংশ স্থলে তাহা ব্যারাম বাড়াইয়া দেয়। পশুতে ও মনুষ্যে এইখানে বিভেদ; সংস্কার ও প্রজ্ঞা উভয়ের মধ্যে এইখানেই বিশেষ।

কথাটা শুনিতে যেমনই হউক, সংস্কারে ও প্রজ্ঞায় এই একটা সনাতন বিভেদ। সংস্কার একবারে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে; তাহার আর এ দিক্ ও দিক্ নাই; তাহাতে ভ্রান্তি নাই; তাহাতে শিখিবার ও ঠেকিবার কিছুই নাই; তাহাতে উন্নতির অবনতির কোন আশা নাই। প্রজ্ঞা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বহু যত্নে ও বহু কষ্টে শিখিতে হয়; শিখিয়াও আবার প্রয়োগকালে পুনঃ পুনঃ ঠেকিতে ও ঠকিতে হয়; এইরূপ ঠেকিয়া শিখিয়া ও পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া অভিজ্ঞতার প্রসার বৃদ্ধি ও উন্নতি করিতে হয়। সংস্কার কেবল একটা রাস্তা দেখায়, অন্য পথে চলিতে স্বাধীনতা দেয় না; প্রজ্ঞা হাজার দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে, সকলগুলিই অবারিত ও নিরর্গল; যে দিক ইচ্ছা চলিয়া যাও; স্বর্গে বা নরকে চলিতেছ, তাহা ঠেকিয়া ঠকিয়া আবিষ্কার কর।

প্রকৃতি মনুষ্যেতর জীবকে জীবনযাত্রায় স্বাতন্ত্র্য দেন নাই; আহার নিদ্রাদি অত্যাবশ্যক বিষয়ে মনুষ্যেরও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যত্র মনুষ্য স্বতন্ত্র। মানুষকে গন্তব্য পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; সংস্কার কোন কথা বলে না; প্রজ্ঞার সাহায্যে পথ খুঁজিতে হয়, কিন্তু প্রজ্ঞাও একেবারে

নিঃসন্দেহে পথ দেখান না ; পাঁচটা পথ দেখাইয়া দেন ; পাঁচটা পথে চলিতেই মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য থাকে ; কিন্তু কোনটায় চলিতে ঠকিতে হয়, কোনটায় চলিলে জিতিতে হয় ; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয় ; প্রজ্ঞাও ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া পুষ্টিলাভ করে। সংস্কার স্থিতিশীল কনসারবেটিব, চিরকাল তাঁহার এক দশা ; প্রজ্ঞা উন্নতিশীল, লিবারাল, তিনি ক্রমেই সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ ও বিকশিত হইতেছেন। সংস্কার বাদশাহের হুকুম, একমাত্র আইন, না মানিলে নিষ্কৃতি নাই ; প্রজ্ঞা প্রজাতন্ত্র রাজ্যের পার্লেমেন্টের বিতণ্ডার কচকচি ; ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, সংশোধনসাপেক্ষ, বিরোধসাপেক্ষ, অপোজিশনের সহিত সংঘর্ষনিরত।

পশুজীবন মুখ্যতঃ সংস্কারকর্তৃক চালিত ; মনুষ্যজীবন জীবনরক্ষায় আবশ্যক কতিপয় জৈবব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে মুখ্যতঃ প্রজ্ঞা কর্তৃক শাসিত। পশুজীবনে স্বাতন্ত্র্যের অভাব ; মনুষ্যজীবনে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্টপরিমাণে বর্ত্তমান। পশু যে কাজ করে, তাহার সে কাজ না করিলে উপায় নাই ; মনুষ্য অনেক স্থলে যে কাজ করে, তাহার সে কাজ না করিলেও চলিত। পশুর কোন দায়িত্ব নাই, মনুষ্যের স্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়িত্ব বর্ত্তমান নাই। পশুর সংস্কার সম্পূর্ণ অপ্রতিহত, মনুষ্যের প্রজ্ঞা সংস্কারকে সংযত করিয়া চলিতে পারে। পশু কোন কার্য্যের জন্য নিন্দিত বা প্রশংসিত হয় না ; মনুষ্য বহু স্থলে নিন্দিত বা প্রশংসিত হয়। প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রজ্ঞা যদি মনুষ্যকে কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করে, অথচ মনুষ্য সংস্কারের প্রেরণায় সেই কাজ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে নিন্দিত হইতে হয়। পশুর পক্ষে শিখিবার বিষয় অধিক কিছু নাই ; সে জীবনধারণোপযোগী সমস্ত শিক্ষা পিতা মাতার নিকট হইতে জন্মকালেই প্রাপ্ত হয় ; মনুষ্যের জন্মলাভের পর শিক্ষার আরম্ভ হয় ; পিতামাতার নিকট হইতে যে স্বাভাবিক সংস্কার প্রাপ্ত হয়,তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মানুষের চলে না। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে নূতন নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। সমস্ত বিশ্বসংসারটাই তাহার বিদ্যালয় ; জাতমাত্রই সে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

পাপপুণ্যের কথা পশুজীবন সমালোচনায় উঠে না, মানবজীবনের সমালোচনায় উঠে। পশু পাপপুণ্যবর্জ্জিত, মনুষ্যের পক্ষে এ কাজটা ভাল, এ কাজটা মন্দ, এ কাজটা পাপ, ও কাজটা পুণ্য।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে গোড়ায় দেখা যায়, প্রজ্ঞা ও সংস্কারের বিরোধী ভাব হইতে পাপপুণ্যের উৎপত্তি। প্রথম কথা সংস্কার মানুষকে যে পথে চলিতে বলে, প্রজ্ঞা সময় সময় সে পথ দেখায় না, সে পথে চলিতে নিষেধ করে। পশুদিগের জীবনে প্রজ্ঞার কার্য্যকারিতা আছে কি না, সহজে উত্তর দেওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ একটা দুরূহ সমস্যা। অনেকে বলেন, পশুজীবনে প্রজ্ঞার প্রভুত্ব আদৌ নাই, মনুষ্যেতর জীব প্রজ্ঞাবর্জ্জিত। প্রজ্ঞার শাসন থাকিলে পশুজীবনে কতকটা স্বাতন্ত্র্য থাকিত; এবং কালসহকারে পশুজীবনে উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত। স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এবং উন্নতির পরিচয়ও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তথাপি পশুমাত্রই একবারে প্রজ্ঞাবর্জ্জিত, এরূপ স্বীকার নিতান্ত দুঃসাহসের কথা। উন্নত জীবশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়; এমন এক একটা কাজ করিয়া ফেলে, এমন কি সময়ে সময়ে নূতন বিষয়ে শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয় যে, সেখানে প্রজ্ঞার কর্তৃত্ব একবারে নাই, তাহা বলিতে সাহস হয় না। যাহাই হউক, প্রজ্ঞার শাসন থাকিলেও সে শাসন এত ক্ষীণ যে, পশুজীবন মুখ্যতঃ সংস্কারাধীন ও স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না। সংস্কারই তাহার জীবনের শাসক ও উপদেষ্টা ও শ্রেয়ঃসাধক। মনুষ্যের পক্ষে অন্যবিধ অবস্থা। মনুষ্যজীবনে প্রজ্ঞা সংস্কারকে দমন করিয়া রাখে, সংস্কারকে পরাভব করিয়া নিজ প্রভুত্ব বাহাল রাখিবার চেষ্টা করে। সংস্কারগুলিকে যদি পাশব ধর্ম্ম বলা যায়, তাহার বিরোধী ধর্ম্মগুলি, যাহা লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিশেষ, সেইগুলিকে মানবধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

এইখানে একটা তুমুল সমস্যা আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই নিয়ম যে জীবনরক্ষার পক্ষে ও বংশরক্ষার পক্ষে, ব্যক্তিগত জীবন ও জাতিগত জীবনরক্ষার পক্ষে যাহা অনুকূল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সেই সকল ধর্ম্মই অভিব্যক্ত হয় ও ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। পশুগণের সংস্কারগুলি সর্ব্বত্রই তাহাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের অনুকূল; কাজেই তাহারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। হিংসাবৃত্তি ব্যাঘ্রজীবনের অনুকূল, তাই ব্যাঘ্র হিংস্রক; বঞ্চনাপরতা জম্বুকজীবনের অনুকূল, তাই জম্বুক বঞ্চক; ভণ্ডামি মার্জ্জার-

বা ঋজুস্বভাব শৃগালের ধরাতলে স্থান নাই। অভিব্যক্তির নিয়ম মনুষ্যমধ্যে ও পশুমধ্যে বিভিন্ন নহে। তবে প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে মানবজীবনে বিরোধ কেন? প্রজ্ঞা ও সংস্কার উভয়ই যদি জীবনরক্ষার অনুকূল হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্যের সংস্কারগুলি মনুষ্যজীবনের প্রতিকূল হইলে এত দিন তাহারা লোপ পাইত; আবার প্রজ্ঞা অথবা সংস্কারবিরোধী ধর্ম্মগুলি জীবনের অন্তরায় হইলে তাহারাও অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। উভয়ই যদি অনুকূল হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ কেন?

এই বিরোধের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে একবারে জীবস্তরের নিম্নতম পর্য্যায়ে যাইতে হয়। জীবন পদার্থটাই একটা সনাতন বিরোধ; জীবনের সংজ্ঞাই একটা চিরন্তন বিরোধ। মানুষই বল আর পিপীড়াই বল, আর একটা নগণ্য কীটাণুই বল, তাহার সমস্ত জীবনই একটা বিরোধের ও সংগ্রামের ইতিহাস। জীব যে জগতের মধ্যে বাস করে, সে জগৎ দয়ামায়া-বর্জ্জিত, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। বহিঃস্থ জগৎ সর্ব্বদা জীবমাত্রকেই সংহার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া নির্জ্জীব পদার্থে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছে। জল, বায়ু, শীতাতপ, পাঁচটা মহাভূতই একত্র জোট বাঁধিয়া জীবকে নির্জ্জীব জড়ে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে। বিশ্বজগতের সমগ্র বাহ্যশক্তি জীবের জীবনের অন্তরায়। জীবের আভ্যন্তরীণ শক্তি ক্রমাগত এই বহিঃস্থ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিরত। জড় চারি দিক হইতে জীবকে আক্রমণ করিয়া জড়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; জীব জড়ের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সেই তুমুল সমরে আপন অস্তিত্ব বাহাল রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঁচটা নির্জ্জীব মহাভূত যেমন একযোগে জীবকে পরাভূত করিয়া তাহার জীবত্বলোপে উদ্যত, জীবও তেমনি সেই পাঁচটা মহাভূতের উপর প্রভুত্ব চালাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনার জীবত্ব অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। জল বায়ু শীতাতপ, ক্ষিতি ব্যোম এক দিকে জীবকে সংহার করিতে ব্যস্ত, জীব অন্য দিকে সেই জল বায়ু, সেই শীতাতপ সেই ক্ষিতিব্যোমকে আপন কাজে লাগাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে বলসঞ্চয় করিয়া, তাহাদিগকে পরাভব করিয়া, আপন অস্তিত্ব স্থির রাখিতেছে। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম; এই সংগ্রামের বিরাম নাই। যত দিন

ধরিয়াই জীবের জীবন। যে দিন এই সংগ্রামের শেষ, এই বিরোধের বিরাম, সেই দিন জীবনেরও শেষ দিন, সেইদিন মৃত্যু। অথবা এই নিয়ত বর্ত্তমান সংগ্রামের নামান্তরই জীবন। জড় পদার্থে, ইটে পাথরে, জলে হাওয়ায়, এই সংগ্রাম নাই, তাই তাহারা নির্জ্জীব; মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই সংগ্রাম বর্ত্তমান, তাই তাহারা সজীব। সংগ্রামের অবসানের নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর জীবদেহে ও জড়দেহে কোন প্রভেদ নাই। এই বিরোধের ও সংগ্রামের তীব্রতা যেখানে যত অধিক, জীবনও সেইখানে ততটা অভিব্যক্ত ও পরিণতিপ্রাপ্ত।

জীবনের আরম্ভ এই সংগ্রাম ও বিরোধ লইয়া এবং জীবনের অভিব্যক্তি ও উন্নতি এই সংগ্রামে। জীবপর্য্যায়ে বিবিধ শ্রেণীর, বিবিধ বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি এই সংগ্রামের ফলে। জীবের সহিত সমগ্র জড়জগতের সংগ্রাম, এবং একটু উপরে উঠিলেই জীবের সহিত অবশিষ্ট জীবসমূহের সংগ্রাম। প্রত্যেক জীব, তাহার বহিঃস্থিত সমগ্র জীবজগৎ ও জড়জগতের সহিত সংগ্রামে নিরত, সমগ্র জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত, এই আত্মরক্ষার চেষ্টায় তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ; জীবপদবীতে তাহার উন্নতিলাভ; যে বিকাশ লাভ করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, সেই টিকিয়া যায়; যে টিকিতে পারে না, সে লোপ পায়। কেহ থাকে, কেহ যায়। যাহারা থাকে, তাহারা যোগ্য, সমর্থ, প্রকৃতির বাছাই করা জীব, জীবনসংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত।

জীবনের মূলে, জীবনের আরম্ভে যে বিরোধ, যে বিরোধে জীবনের উন্নতি ও অভিব্যক্তি, সেই বিরোধের পরিচয় জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ায় জীবের প্রত্যেক চেষ্টায় প্রকাশ পায়। বিরোধটা সনাতন, চিরস্থায়ী, ইহার নিবৃত্তি নাই বা পূর্ণতা নাই, তাই জীবনপ্রণালীটা একটা রফা বন্দোবস্ত। উভয় বিরোধী বিবাদী পক্ষের মধ্যে ক্রমাগত সন্ধিস্থাপনের ও সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, এই চেষ্টা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী চেষ্টামাত্র। উভয়কে পরস্পরকে হটাইবার ও ঠকাইবার চেষ্টায় অবস্থিত; যখন আপাততঃ সংগ্রামের বিশ্রাম, তখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানে উভয়ে শ্রান্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য উভয়েই বলসংগ্রহে প্রস্তুত হইতেছে মাত্র।

এরূপ সন্ধিবন্ধনে, এরূপ রফাবন্দোবস্তে কখনই স্থায়ী লাভ নাই,

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যত দিন বিরোধ চলে, তত দিনই জীবন, বিরোধের অবসানের নামই মৃত্যু। কিন্তু বিরোধের অবসান এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি ? জীবের মৃত্যু ঘটিয়াছে কি ? এক পুরুষে কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া অবসর গ্রহণ করিলে পরপুরুষে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। পিতা আপন জীবন ব্যাপিয়া সংগ্রাম চালাইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করেন ; পুত্র নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করেন। পিতার রক্তমাংস পুত্রের শরীরে বর্ত্তমান ; পুত্রের শরীর পিতার শরীরের অংশমাত্র। পিতা নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পুত্ররূপে আবির্ভূত হন মাত্র। জরাজীর্ণ ক্লান্তিক্লিষ্ট কলেবরটা বা আবরণটা পরিত্যাগ করিয়া উদ্যমপূর্ণ নূতন আবরণ আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে নিযুক্ত হন মাত্র। বাইসমান দেখাইয়াছেন, জীবের নিম্নতম পর্য্যায়ে মৃত্যু নাই। সেখানে চিরদিন একই মূর্ত্তি ধরিয়া সংগ্রাম ; মূর্ত্ত্যন্তরগ্রহণের, অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের নিয়ম নাই। উচ্চতর পর্য্যায়ে উঠিয়া ব্যক্তিগত মৃত্যু আছে, কিন্তু জাতিগত মৃত্যু নাই। এক ব্যক্তি কিছু দিন ধরিয়া লড়াই চালাইয়া পরাভূত হইয়া অবসন্ন হয়, ও তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাহার নিজ শরীরের একটা অংশ রণস্থলে রাখিয়া যায় ; সেই অংশটা নূতন বলে সংগ্রামে নিযুক্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম, এই ঘটনার নাম, বংশরক্ষা বা সন্তানোৎপাদন ; অপত্যের হস্তে কার্য্যভার দিয়া পিতার অবসরগ্রহণ। কিন্তু সেই অপত্য পৃথক্ জীব নহে, পিতারই মূর্ত্ত্যন্তরমাত্র। এই অর্থে মৃত্যু জীবনসংগ্রামে জীবের পরাভব নহে, নূতন করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্তিমাত্র। ব্যক্তির পক্ষে যেটা ক্ষতি, জাতির পক্ষে তাহা লাভ। উন্নত শ্রেণীর জীব এই মৃত্যুরূপ কৌশল বা উপায় আবিষ্কার করিয়া বহির্জগতের সহিত বিরোধটা চিরস্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং যখন মৃত্যু আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন যে সকল শক্তি সঞ্চিত হয় নাই, মৃত্যু আবিষ্কারের পর হইতে সেই সকল শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে। এককালে ধরাপৃষ্ঠে সামান্য কীটাণু বা তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতম জীব অবস্থিত ছিল ; আজ ধরাপৃষ্ঠ মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপাদি বিবিধ উন্নত পর্য্যায়ের বিবিধশক্তিসমন্বিত জীবশ্রেণীতে পূর্ণ হইয়া শোভান্বিত হইয়াছে। জীবজগতে এই অদ্ভুত অভিব্যক্তির, এই আশ্চর্য্য পরিণতির, এই বিস্ময়কর বিকাশের মূলে মৃত্যু। জীব যদি মৃত্যু স্বীকার না করিত, তাহা হইলে জীবনসংগ্রামের

বৈচিত্র্যের উদ্ভব ঘটিত না; ধরাপৃষ্ঠে জীবজগৎ এত বৈচিত্র্যবহুল হইত না।

ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু একটা ত্যাগস্বীকার। বহির্জগতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আপন অস্তিত্বলোপের অঙ্গীকার। কিন্তু এই ত্যাগস্বীকার একটা ক্ষণিক সন্ধিবন্ধনমাত্র; একটা অস্থায়ী রফাবন্দোবস্ত মাত্র। আমি পরাস্ত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িলাম মাত্র; কিন্তু যাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম, বা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া গেলাম, তাহারা আমা অপেক্ষাও যোগ্যতর; তাহারা বীরের মত লড়াই চালাইবে। জীবের ঝাড় রক্তবীজের ঝাড়; রক্তবীজ মরিয়াও মরে না; তাহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে উত্থিত হয়। এক জন যায়, দশ জনকে রাখিয়া যায়; দশ জন যায়, শত জনকে রাখিয়া যায়; শত জনের স্থল সহস্র জনে পূর্ণ হয়। সংগ্রামের ভীষণতা বাড়ে মাত্র; জীবনসংগ্রাম যুগের পর যুগ ধরিয়া ভীষণতর হয়; নূতন নূতন জীব নূতন নূতন শক্তি লইয়া নূতন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হয়। সমগ্র বিশ্বজগৎ জীবনকে বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, জীবন লুপ্ত হইতে চায় না; ব্যক্তিজীবন লুপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতীয় জীবন লুপ্ত হইতে চাহে না। ব্যক্তিজীবন জাতীয়জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে চরম ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত হয়, মৃত্যু অঙ্গীকার করে। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, জাতি বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্তি-জীবনের সহিত জাতীয়-জীবনের কাজেই বিরোধ; বংশরক্ষার জন্য ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু-অঙ্গীকার, পুত্রের অভ্যুদয়ের জন্য পিতার মৃত্যুস্বীকার, সুতরাং পিতাপুত্রে বিরোধ। কিন্তু এই বিরোধের মূলে অবিরোধ বর্ত্তমান। ইহা মূলে বিরোধ নহে, ইহা একটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বলসঞ্চয়ের চেষ্টায় আপাততঃ ত্যাগস্বীকারমাত্র, একটা রফা বন্দোবস্ত মাত্র।

প্রকৃতিতে জীবনের ব্যাপার বিরোধময়। জীবের সহিত জড়ের মূলগত বিরোধ; তাহার ফলে জীবের সহিত জীবের বিরোধ। আত্মরক্ষাই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তখন জীবে জীবে প্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? ইহারই ফলে মৃত্যুর উৎপত্তি, অর্থাৎ জগতের সহিত সংগ্রামটা ভাল করিয়া চালাইবার জন্য ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগস্বীকার ও মৃত্যুর অঙ্গীকার, পুত্রের উপরে আপনার কার্য্যের ভারার্পণ; এই জন্য আবার ব্যক্তি-

জাতীয় উন্নতি, জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টি, জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির সহিত আবার ব্যক্তিগত জীবনে বৈচিত্র্যবিকাশ, ব্যক্তির শক্তি-সঞ্চয় ও উন্নতিলাভ।

জীবনের প্রধান দুঃখ কি? আধি ব্যাধি, জরা মরণ। জীবনের প্রধান আনন্দ কি?—জীবনের স্ফূর্ত্তিলাভ; ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ। আধি ব্যাধি জরা মরণ ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্ত্তির অন্তরায়, উভয়ের মধ্যে বিরোধ। অথচ আশ্চর্য্য এই, একে অন্যের সহায়, একের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের অনুকূল। আধিব্যাধি জরা মরণ না থাকিলে ব্যক্তিজীবনে স্ফূর্ত্তিলাভ, বিকাশ-লাভ, আনন্দলাভ ঘটিত না। মৃত্যু না থাকিলে জৈবিক অভিব্যক্তি ঘটিত না। অভিব্যক্তির মুখ্যতম সাধন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের একমাত্র অবলম্বন মৃত্যু। জীবজগৎ হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দাও; প্রকৃতি নির্ব্বাচনে বিমুখ ও উদাসীন হইবে। ধরাধামে নূতন নূতন জীবের উদ্ভব ঘটিবে না।

জীবশ্রেণীমধ্যে অহিনকুলের বিরোধ, মূষিকমার্জ্জারের বিরোধ, ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের বিরোধ, নিষ্ঠুর সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী; কেন না, পুরা-কালের এই বিরোধ হইতেই অহি ও নকুল, মূষিক ও মার্জ্জার, ব্যাঘ্র ও মেষ-শাবক উভয়েরই বর্ত্তমান পরিণতি ও ভবিষ্যতের উন্নতি। বিরোধ লইয়াই জীবন; যেখানে বিরোধ অস্তিত্বহীন, সেখানে জীবন নাই। আশ্চর্য্য হইও না,—জলের সহিত বায়ুর কোন বিরোধ নাই, উভয়েই নির্জ্জীব, উভয়েই জড়। জড়ের অপেক্ষা জীবকে আমরা উন্নত বলিয়া থাকি। কিন্তু জীবের জীবত্ব বিরোধ লইয়া।

জীবশ্রেণীর উচ্চতম পর্য্যায় মনুষ্যজাতিতে পৌঁছিলে একটা নূতন ধরণের বিরোধের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে; এই বিরোধ সংস্কার ও প্রজ্ঞার মধ্যে বিরোধ। মনুষ্যের সংস্কার মনুষ্যকে এক পথে চলিতে বলে, প্রজ্ঞা অন্য পথে চলিতে বলে; মনুষ্য উভয়ের শাসনে থাকিয়া একটা পন্থা নির্ব্বাচিত করিয়া লয়; হয় ঠকে, নয় জিতে; এবং চরমে প্রজ্ঞার শাসন আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়ে। মনুষ্যজীবনের এই অভিনব ব্যাপারটা বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্যজীবনের সহিত পশুজীবনের একটা প্রধান পার্থক্য বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

সেই পার্থক্য এই যে, মনুষ্য জীব, অপিচ সমাজবদ্ধ জীব। মনুষ্য দল বাঁধিয়া থাকে। এই দল বাঁধিয়া থাকার মূল কারণ মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য। জীবন

সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল মোটা হাতিয়ারের দরকার, মানুষের সে সকল কিছুই নাই ; না আছে ধারাল দাঁত, না আছে ধারাল নখ, না আছে গায়ে প্রচণ্ড বল। প্রকৃতি দুইটা শিং পর্য্যন্ত দিতে কৃপণতা করিয়াছেন। গণ্ডারের মত পুরু চামড়াও নাই, হরিণ বা শশকের মত দ্রুতপলায়নসমর্থ চরণেরও অভাব ; তাহা থাকিলেও কায়ক্লেশে পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার উপায় থাকিত। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও তীক্ষ্ণতায় ও কার্য্যপটুতায় অনেক ইতর জীবের নিকট হারি মানে। বস্তুতঃ জীবসমাজে মনুষ্য বড়ই দুর্ব্বল। অপরকে আক্রমণ দূরের কথা, আপনাকে বাঁচানই মানুষের পক্ষে দুষ্কর। তবে মানুষের প্রকাণ্ড মাথাটার ভিতরে এক রাশি মস্তিষ্ক রহিয়াছে, সেই মস্তিষ্কের ভাঁজের পরদায় পরদায় বহুকালের বহু অতীত ঘটনার বিবরণ সাঙ্কেতিক চিহ্নে অঙ্কিত থাকে ; এবং প্রয়োজন মত মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় সেই ভাঁজগুলা ও পরদাগুলা উদ্‌ঘাটিত করিয়া সেই চিহ্নগুলির অর্থ আবিষ্কার করিয়া সেই বিবরণগুলি মানসপটে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ; এবং সেইগুলি বাছিয়া গুছিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া আপনার ভবিষ্যতের প্রয়োজনসাধনার্থ তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে চায়। ইতর জীবের এই শক্তিটার সম্পূর্ণ অভাব ; মনুষ্যের এই শক্তির অদ্যাপি পরিমাণ হয় নাই। ইহারই নাম প্রজ্ঞা। অতীতকালের অভিজ্ঞতায় ইহার প্রতিষ্ঠা ; ভবিষ্যতের দিকে ইহার দৃষ্টি। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর লইয়া কেবল আপন প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াও চলে না ; অপরের প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় ; এক জন মানুষের অভিজ্ঞতা অপরের জীবনযাত্রার আনুকূল্যে প্রদত্ত হয়। একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইবার জন্য মানুষ একটা বিস্ময়কর কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে ; তাহার নাম ভাষা। সকলে মিলিয়া একযোগে কয়েকটা ধ্বনির সহিত কয়েকটা ভাবের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্য দল বাঁধিবার পর ভাষার উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং ভাষার উদ্ভাবনে দল বাঁধিবার সুবিধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মনুষ্য একাএক দুর্ব্বল ; কিন্তু এইরূপে দলবদ্ধ সমাজবদ্ধ মনুষ্য প্রচণ্ড বলে বলীয়ান্। জীবমধ্যে কেহই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না ; মনুষ্য জীবজগতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর।

এইখানে একটা কথা আসিয়া পড়ে। মনুষ্যভিন্ন অন্য জীবের মধ্যেও সমাজের উদাহরণ আছে। পিঁপীড়া ও মৌমাছির সমাজপ্রণালী তন্মধ্যে

মাছি বংশ জীবনসংগ্রামে রক্ষা করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; এ বিষয়ে মানবসমাজের সহিত তাহাদের ঐক্য আছে। কিন্তু মৌমাছি-সমাজের ও পিঁপীড়াসমাজের মেম্বারগণ প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন না। স্বাভাবিক সহজাত সংস্কারই তাঁহাদের সমাজবন্ধনের মূল। যে অন্ধ সংস্কার মৌমাছিকে ঘুরাইয়া লইয়া বিচিত্রবর্ণ পুষ্পের সমীপে উপস্থিত করায়, ও সেই পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া আপন চাকের মধ্যে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি দেয়, সেই অন্ধ সংস্কারই তাহাকে দল বাঁধিতে বাধ্য করে, এবং দলবলে জুটিয়া মধূখের মশলায় বিচিত্র চক্র নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত করে। শুনা যায়, মৌমাছি সমাজে অদ্ভুত রকমের শ্রমবিভাগ বা কর্ম্মবিভাগের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে কেহ বা রাণী, কেহ বা মিস্ত্রী, কেহ বা মজুর, কেহ বা সৈনিক। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট এমন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়, যে মনুষ্যসমাজ তাহার নিকট চিরদিন হারি মানিবে ও লজ্জা পাইবে। সমাজের প্রত্যেক সভ্যের নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে ; কেহ মধু আনেন, কেহ চাক বানান, কেহ পাহারা দেন, কেহ শত্রুর গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করেন, কেহ বা কেবলমাত্র সন্তানপ্রসবরূপ বিরাট কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মৌমাছি-বংশ রক্ষা করেন। সকলেই আপন আপন কাজ শৃঙ্খলার সহিত অতি মনোযোগসহকারে সম্পাদন করেন ; কেহ কাহাকে বাধা দেন না, কেহ কাহারও সঙ্গে বিবাদ করেন না। অথচ এত বড় সমাজের মধ্যে একটা স্কুল নাই, একটা আদালত নাই, একটা উকীল নাই, একটা ধর্ম্মপ্রচারক নাই, একটা রিফর্মার নাই। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ; অথচ কেহই জানে না, কেন সে ব্যস্ত ; তাহাকে কাজ করিতে হয় তাই সে করে ; আমাদের যেমন খাইতে হয়, ঘুমাইতে হয়, জন্মিতে হয়, মরিতে হয় ; তাহাদেরও সেইরূপ পাহারা দিতে হয়, চাক বানাইতে হয়, সন্তান প্রসব করিতে হয়। আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যেমন আমাদের দাঁত ভাঙ্গে ও চুল পাকে ও দাড়ি বাহির হয়, তাহাদিগেরও সেইরূপ নিজ নিজ কাজের সহিত ইচ্ছার কোনও সম্পর্ক নাই। সমস্তই সংস্কারের প্ররোচনায় ; কুত্রাপি প্রজ্ঞার শাসন নাই, কুত্রাপি স্বাতন্ত্র্য নাই। মৌমাছি জানে না যে, এমনি একটা বিস্ময়কর কারিগরির কাজে সে ব্যাপৃত রহিয়াছে, মানুষের মত প্রকাণ্ড জন্তু যাহা দেখিয়া কখন বিস্মিত হয়, কখন লজ্জিত হয়। সে জানে না যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী মনুষ্যের নীতিকথায় ও পদ্যপাঠে

লইয়া তাহারা এতটা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু সহস্র স্কুলে সহস্র মাষ্টার মহোদয় অবিশ্রাম বেত্র চালাইয়া মনুষ্যশিশুকে তাহাদের উদাহরণের অনুবর্ত্তী করিতে আজ পর্য্যন্ত সমর্থ হইলেন না।

মানবসমাজে ও মৌমাছিসমাজে এই স্থানেই পার্থক্য। মৌমাছিসমাজে সংস্কারের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব, মনুষ্যসমাজে প্রজ্ঞার শাসন। মৌমাছিসমাজে ভুল ভ্রান্তি নাই, সকলেই বিনা শিক্ষায় ওস্তাদ, সকলেই বিনা পুলিশে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; মনুষ্যসমাজে ভুলভ্রান্তি পদে পদে, নৈপুণ্য জন্মাইবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন; কর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তনার জন্য পুলিশের দরকার। অপিচ মৌমাছি সমাজে উন্নতি নাই, চিরদিনই সমান ভাবে চলিতেছে; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে মৌমাছিজাতির যদি কখন উন্নতি হয়, তাহা হইলে তাহার চক্রনির্ম্মাণনৈপুণ্যেরও উন্নতি হইতে পারিবে, কিন্তু তাহা প্রকৃতির চেষ্টায় হইবে; মৌমাছির জ্ঞাতসারে তাহাদের আপন চেষ্টায় বা ইচ্ছায় ঘটিবে না। মনুষ্যের সমাজ উন্নতিশীল; মনুষ্যের নৈপুণ্য ক্রমশঃই মনুষ্যের জ্ঞাতসারে মনুষ্যের চেষ্টায় প্রকর্ষ লাভ করিতেছে ও ক্রমে করিবে। এক স্থানে অন্ধ সংস্কার; অন্যত্র চক্ষুষ্মতী প্রজ্ঞা। একে জানে না,—সে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, না করিলে দোষ কি, ক্ষতি কি। অন্যে জানে,—সে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, অকরণে ক্ষতি কি। একত্র পূর্ণ অধীনতা; অন্যত্র যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য।

মনুষ্য তাহার জাতীয় জীবনের প্রত্যূষকাল হইতে, হয় ত পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের পূর্ব্ব হইতেই সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ও সে জানে, সমাজে অবস্থিতিই তাহার পক্ষে জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রধানতম উপায়। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার তাহার ক্ষমতা আছে; মৌমাছির মত সে এ বিষয়ে অন্ধ সংস্কারের দাস নহে। কিন্তু এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাস তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল নহে, তাহা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে। সেই জন্য মনুষ্যের সামাজিকত্ব প্রায় মনুষ্যত্বের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যকে পূর্ণ মনুষ্যপদবী দিতে দ্বিধাবোধ হয়। মনুষ্যের শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মানসিক সবলতা হইতে এই সমাজবন্ধনের প্রবৃত্তি। সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য আত্মজীবনরক্ষা ও জাতীয়জীবনরক্ষা; সমাজবদ্ধ না হইলে মানববংশ এত দিন ইতরজীবের আক্রমণে ধরাধাম হইতে হয় ত বিলুপ্ত হইত। মানুষের

লাভ ঘটে, তেমনি কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতেও হয়। প্রকৃতিবিহিত স্বাতন্ত্র্যকে কতকটা সংযত ও নিয়মিত করিয়া চলিতে হয়।

জীবের জীবনে এই রফা বন্দোবস্তের উদাহরণ পদে পদে; মনুষ্যের সামাজিক বন্ধনস্বীকার তাহার অন্যতম একটা উদাহরণমাত্র। সমাজের অধীন হইয়া অবধি মনুষ্য আর আপন ইচ্ছামত স্বতন্ত্রভাবে বিহার ও বিচরণ করিতে পারেন না। যে স্বতন্ত্র বিহার আত্মজীবনের পক্ষে অনুকূল, তাহা অনেক স্থলে সামাজিক জীবনের পক্ষে প্রতিকূল। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধের ফলে মানবজীবনের একটা ভাগের সহিত অন্য ভাগের তুমুল যুদ্ধ। মনুষ্যের আত্মার মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, এবং এই সংঘর্ষ হইতে নীতির উৎপত্তি ও পাপপুণ্যের উৎপত্তি। মানুষ যদি বাঘ ভালুকের মত সমাজ না বাঁধিয়া বাস করিত, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে কেহ থাকিত না; তাহার জীবনে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার উপস্থিত হইত না। আপন সংস্কার ও প্রজ্ঞা উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সে কখনও সংস্কারের বশে, কখনও বা প্রজ্ঞার বশে চালিত হইত; কোন কাজ তাহার জীবনের পক্ষে অনুকূল হইত, কোন কাজ তাহার জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হইত। নিজ কর্ম্মের ফল সে স্বয়ং ভোগ করিত, একের কর্ম্মফল অপরকে স্পর্শ করিত না। নিজ কর্ম্মের জন্য অপরের নিকট তাহাকে দায়ী হইতে হইত না। কোন কর্ম্মের জন্য সে নিন্দাভাগী বা প্রশংসাভাগী হইত না। আবার তাহার সমাজতন্ত্র যদি মৌমাছির সমাজতন্ত্রের মত সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক সংস্কারের অধীন হইত, নিজ কার্য্যে যদি তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারে না থাকিত, অন্ধভাবে যদি সে প্রকৃতির নির্দ্দেশ ও প্রকৃতির প্রেরণা অনুসরণে সর্ব্বদা বাধ্য থাকিত, তাহা হইলেও তাহার জীবনে পাপপুণ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার উঠিত না; এ কাজটা ভাল কাজ বলিয়া কেহ প্রশংসা করিত না; এ কাজটা মন্দ কাজ বলিয়াও কেহ নিন্দা করিত না। মনুষ্যজীবন দুইয়ের বাহির। মনুষ্য সমাজমধ্যে বাস করে, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত করিতে বাধ্য হয়। আবার মনুষ্যের জীবন সহজাত সংস্কারের সর্ব্বতোভাবে অধীন নহে। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, সে প্রজ্ঞার উপদেশে শিখিতে পারে। তবে প্রজ্ঞা তাহাকে সরলভাবে একটা-মাত্র রাস্তা দেখাইয়া দেন না। পাঁচটা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া কোন্‌টা ভাল

ঠেকিয়া শিখিতে বলেন। এই স্থানে মনুষ্যজীবনে ও ইতর জীবের জীবনে বিভেদ, এই স্থানে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এইখানেই মানবজীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব।

উপরে যতগুলা কথা বলা হইল, তাহা সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে অনুবৃত্তি করিলে এইরূপ দাঁড়ায়।

১। ইতর জীবের জীবন মুখ্যতঃ সহজাত সংস্কারের অধীন। ইতর জীব যেখানে সমাজ বাঁধিয়া বাস করে, সেখানেও সংস্কারের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। ইতর জীব প্রাকৃতিক অন্ধ শক্তি কর্ত্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হয়; তাহাদের মধ্যে পাপপুণ্যের কথা উঠিতে পারে না।

২। মনুষ্য আহারনিদ্রাদি কতিপয় বিষয়ে সংস্কারের বশবর্ত্তী; কিন্তু অন্যত্র প্রজ্ঞা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। মানবজীবন কোন কোন বিষয়ে প্রাকৃত শক্তির অধীন; কিন্তু অপরত্র মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। প্রজ্ঞা যে পাঁচটা রাস্তা দেখাইয়া দেয়, মানুষ ঠেকিয়া শিখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার কোন একটা নির্ব্বাচন করিয়া লয়। প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ অনেক সময়ে সংস্কারনির্দ্দিষ্ট পথের বিরোধী হয়। একটা পথ নির্ব্বাচন করিয়া সেই পথে চলিলে যে ফল লাভ হয়, মনুষ্য সেই ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করে; ও তদ্দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে সাবধান হইতে শিক্ষা করে। প্রজ্ঞা এইরূপে জীবনকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট ও বলবান্ করে।

৩। মনুষ্য আত্মরক্ষার্থ সমাজ বাঁধিয়া বাস করে; এবং এই সমাজবন্ধন তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন উভয়েরই রক্ষণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে অনেক সময় বিরোধ ঘটে; যাহা একের অনুকূল, তাহা অন্যের প্রতিকূল। সামাজিক জীবনের বাহিরে মনুষ্যকে আপনার স্বাতন্ত্র্য সংযত করিতে হয়, ইচ্ছার নিরোধ করিতে হয়, প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হয়। মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনের অনুরোধে, গৌণতঃ ব্যক্তিগত জীবনের অনুরোধে, এই ত্যাগস্বীকার। এই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত না হইলে সমাজ তাহাকে আক্রমণ করে, তাহাকে শাসন করে, তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা পায়। মানুষের কার্য্যের ফলভোগী সে একা নহে, সমগ্র সমাজ তাহার ফলভোগী, সেই জন্য ব্যক্তির শাসনার্থ সমাজের প্রয়াস। আবার ব্যক্তিজীবন সমাজের মধ্যে রক্ষিত হয়; সেই জন্য ব্যক্তিজীবনের

ফল কেবল তাহার আপনার উপর দিয়াই যায়, সমাজকে কিছু না কিছু তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। কাজেই মানুষের প্রত্যেক কাজের উপরেই সমাজের শাসনবিস্তারে যত্ন; ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক চেষ্টার উপর সমাজের প্রভুত্বস্থাপনের চেষ্টা; নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা, দণ্ডবিধান ও পুরস্কারপ্রদান দ্বারা, ভয়প্রদর্শন ও প্রলোভন দ্বারায় সমাজ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যকেই শাসনে আনিতে চেষ্টা করে। যে সকল কার্য্য নিন্দিত, গর্হিত হয়, সেইগুলা পাপ, যেগুলা প্রশংসিত, পুরস্কৃত হয়, সেইগুলা পুণ্য। সমাজের বাহিরে, সামাজিক জীবনের বাহিরে পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব নাই। সমাজজীবন-রক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিগত কার্য্যের এই শ্রেণীবিভাগ। স্থূলতঃ যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল, তাহার নাম পুণ্য; যাহা সামাজিক জীবনের প্রতিকূল, তাহার নাম পাপ; পাপপুণ্যের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ামক মানবসমাজরূপী বিরাট্ পুরুষ। তজ্জন্য অন্য পুরুষের কল্পনার প্রয়োজন নাই।

৪। ইতর জীবের ব্যক্তিগত জীবনে, জাতীয় জীবনে, বা সামাজিক জীবনে কোন্ কার্য্য অনুকূল, সহজাত সংস্কার তাহা অভ্রান্তভাবে দেখাইয়া দেয়। প্রকৃতি স্বয়ং এই সংস্কারের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; সমগ্র জীবনব্যাপার-চালনার ভার আপনার হাতে রাখিয়াছেন; ইতর জীবের সমগ্র জীবন যন্ত্রের মত প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চলে। মনুষ্য-জীবনে প্রকৃতি এতটা প্রভুত্ব আপন হস্তে রাখেন নাই। জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহার নিদ্রা যৌন সম্বন্ধাদি কতিপয় ব্যাপারে প্রভুত্ব আপন হস্তে রাখিয়া মানুষকে প্রজ্ঞাবশে যথেচ্ছভাবে চলিবার ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছেন। মানুষের কতকটা লোকসান, কেন না এই স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেক জায়গায় ঠকিতে হয়, ও ঠেকিয়া শিখিতে হয়; কেন না প্রজ্ঞা সংস্কারের মত কেবল একটা মাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করেনা। অনেকটা লাভ, কেন না এই শিক্ষার ফলে প্রজ্ঞার পুষ্টিলাভ, ও তৎসহ মনুষ্যজীবনে ক্রমিক উন্নতি। ইতর জীবের জীবন স্থিতিশীল; মনুষ্যজীবন উন্নতিশীল; এবং সেই উন্নতিশীলতা অনেকাংশে আপনার ইচ্ছাধীন ও চেষ্টাসাধ্য।

৫। আত্মরক্ষার জন্য ও বংশরক্ষার জন্য সহজাত সংস্কার মনুষ্যকে এই এই পথে চলিতে বলে; মনুষ্যের প্রজ্ঞা অতীতের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তন্মধ্যে গন্তব্যনির্দ্দেশে সাহায্য করে। অনেক সময় সংস্কার যে পথে চলিতে

তাহাকে একটা পথনির্ব্বাচনে অধিকার দিয়া তাহাকে তাহার ফলাফলের ভাগী করে। প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে এই একটা বিরোধ মানবজীবনের অঙ্গীভূত। মানবজীবনে আর একটা বিরোধ ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক-জীবন মধ্যে। যে কার্য্য একের অনুকূল, তাহা হয় ত অন্যের প্রতিকূল। সংস্কার বা প্রজ্ঞা অথবা সংস্কার ও প্রজ্ঞা উভয়ে ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্ত্তির জন্য যে পথ দেখায়, তাহা কখনও কখনও সামাজিক জীবনের অন্তরায় হয়। তাই সমাজ জোর করিয়া তাহাকে সামাজিক জীবনের অনুকূল পথে, ব্যক্তি-জীবনের প্রতিকূল পথে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। এই আর একটা বিরোধ। এই বিরোধের ফলে মানবজীবনে নৈতিক সংঘর্ষ; পাপ পুণ্যের উৎপত্তি। দুইটা বিরোধ লইয়া মনুষ্য-জীবন। মনুষ্য-জীবন কেবল বিরোধ-ময়। পাপে ও পুণ্যে যে সনাতন বিরোধ, এইখানে এইরূপে তাহার উৎপত্তি।

৬। মনুষ্য-জীবনে এই বিরোধের অস্তিত্ব দেখিয়া, পাপ পুণ্যের ভয়াবহ সংঘর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না শুধু মনুষ্যজীবন কেন, জীবনমাত্রই কেবল বিরোধ। পরস্পর প্রতিকূল শক্তির পরস্পর সংগ্রামই জীবনের সংজ্ঞা। এই বিরোধের এই সংগ্রামের নামান্তরই জীবন। এই বিরো-ধেই জীবনের পরিপুষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই বিরোধেই জীবে ও জড়ে প্রভেদ। মানবজীবনে এই সনাতন বিরোধ যে নূতন আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাই মানবজীবনের উপাদান, তাহার ফলেই মানবজীবনের উন্নতি ও অভিব্যক্তি। তাহাতেই মানবজীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব। এই বিরোধের তীব্রতাসহকারে মানবজীবনের পরিপুষ্টি। পাপের অস্তিত্ব দেখিয়া ভীত হইও না; পাপের বিধাতা ও স্রষ্টিকর্ত্তার উপর, সেই বিধাতা ও স্রষ্টিকর্ত্তা যিনিই হউন, তাঁহার উপর বৃথা নিন্দাভার অর্পণে প্রয়াস করিও না। আঁধার আলোকের সমবায়ে পরিদৃশ্যমান জগৎ; পাপ ও পুণ্যের সমবায়ে মানবের জীবন। জগৎ হইতে আঁধার সরাইয়া ফেল, আলোকের শেষ রশ্মি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইবে; পরিদৃশ্যমান জগৎ সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ পাইবে। মানবজীবন হইতে পাপের অস্তিত্ব সরাইয়া ফেল, পুণ্য বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু থাকিবে না। পাপ ও পুণ্যের বিলোপে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার জীবন নাম দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহা মানবজীবন এই গৌরবময় আখ্যার অভিধেয় হইবে না।

পাপ পুণ্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল, কতকটা বোঝা গেল; কিন্তু একটা সমস্যার আলোচনা এখনও আবশ্যক। কোন্ কাজটা পাপ? কোন্ কাজটা পুণ্য? ইহার মীমাংসা করিবে কে? যাঁহারা এই মীমাংসার নিমিত্ত এক কাল্পনিক বিধাতা পুরুষের সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা এক নিশ্বাসে প্রশ্নটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। তাঁহাদের কৌশল প্রশংসনীয়, কিন্তু ফলপ্রদ নহে। সেই বিধাতা পুরুষ এক দিন অকস্মাৎ বলিয়া দিয়াছেন, এই এই কাজ ভাল, এই এই কাজ মন্দ। সেই দিন সেই শুভক্ষণে পাপ পুণ্যের তপশীল বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আর কোন সৌভাগ্যশালী মানব কোনরূপে সেই তপশীলটা হস্তগত করিয়া একখানা খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। এখন সেই খাতাটা খুলিয়া দেখ, আর কোন চিন্তা থাকিবে না।

একখানা পাকা খাতায় পাপপুণ্যের তপশীলটা লিপিবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে এইরূপ অনেকগুলি তপশীল বিভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ দেখা যায়; কোন্‌টা প্রকৃত ও কোন্‌টা জাল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। আপন সম্প্রদায়ের খাতার অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়মধ্যে ঘোর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং বিতণ্ডা ক্রমে তীব্র হইয়া শোণিতপাতের উৎপত্তি করিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন্ কেতাবখানা জাল ও কোন্‌খানা অকৃত্রিম, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে।

পাপ কি? না যাহা সমাজজীবনের প্রতিকূল। পুণ্য কি? না যাহা সমাজজীবনের অনুকূল। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ইউটিলিটি বলে, অনেকটা সেই ভাব আসে বটে, কিন্তু ঠিক্ সেই ভাবই আসে না। ইউটিলিটির তাৎপর্য্য যদি greatest good of the greatest number, অধিকসংখ্যক লোকের শ্রেয়ঃসাধনমাত্র হয়, তাহা হইলে ইউটিলিটি দ্বারা পাপপুণ্যের বিচার সর্ব্বত্র চলিবে না। কেন না প্রথমতঃ অধিকসংখ্যক লোকের শ্রেয়ঃসাধনই যে সর্ব্বত্র সামাজিক জীবনের শ্রেয়ঃসাধন, তাহা বলা যায় না; দ্বিতীয়তঃ, তাহা বর্ত্তমান কালে শ্রেয়ঃসাধন, তাহা ভবিষ্যতে হিতকর না হইতেও পারে, এবং সমাজজীবনে বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের হিসাবই অধিক গ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ, শ্রেয়ঃ শব্দের অর্থ কি, তাহা লইয়াই অনেক বিতণ্ডা

চলিতে পারে, উহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ অনেক সময় অসম্ভব। সচরাচর পণ্ডিতেরা যাহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা শ্রেয়ঃ না হইতেও পারে; শ্রেয়ঃ শব্দের ব্যবহারেই নানা আপত্তি আসে। যাহাই হউক, ইউটিলিটির কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেকটা আপত্তি কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মূলের কথা এখনও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। সমাজজীবনের যাহা অনুকূল, তাহাই যেন পুণ্য হইল; কিন্তু সমাজজীবনের অনুকূল কি, তাহা স্থির করিবে কে? এই কাজটা অনুকূল কি প্রতিকূল, এইরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে? এই মীমাংসার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি? মনুষ্যজাতির যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা বলিতেছে—পারা যায় না। প্রকৃতি মনুষ্যকে এমন কোন সংস্কার দেন নাই, যাহার সাহায্যে এই মীমাংসা অভ্রান্তভাবে চলিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতায় যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভিত্তি এত সঙ্কীর্ণ, তাহার দূরদৃষ্টি এত অল্প প্রসার, তাহার নির্দ্দেশ এত অস্পষ্ট ও এত দ্বিধাভাবযুক্ত, যে তাহার উপরও নির্ভর করা চলে না। ফলেন পরিচীয়তে, এই ব্যবস্থার উপর অনেক সময়ে নিরাপদে নির্ভর করা চলে। কোন্ কার্য্যটা সমাজজীবনের অনুকূল? না যাহা এত কাল পর্য্যন্ত, মানবজীবনের অতীত ইতিহাস ব্যাপিয়া, সুফল প্রদান করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্যসমাজ যুগযুগান্তরের শিক্ষালাভে যাহাকে ভাল বলিয়া, শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিয়াছে; যাহা ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল নহে, যাহা সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র মানবসমাজের কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জ্জিত, তাহার উপর নির্ভর করাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। মানবজাতির অতীতকালের সংগৃহীত, সঞ্চিত, বিশ্লেষিত, সমঞ্জসীকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। এই অভিজ্ঞতার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। কোন্ দিনে কোন্ ক্ষণে মানবজাতির এই জ্ঞানলাভ আরব্ধ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা জানে না। পুরুষপরম্পরাক্রমে এই পুরাতনী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে মাত্র; পুরুষের স্থান পুরুষান্তরে গ্রহণ করিতেছে। শত কোটি পিতার স্থান শত কোটি পুত্রে গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের মুখ হইতে পরপুরুষে সেই পুরাতনী বাণী শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু কবে কোথায় সেই বাণীর আরম্ভ, তাহা কেহ

তাহা কে জানে? প্রথমে সেই বাণীর কে রচনা করিয়াছিল, কে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা কে জানে? মানবের জাতীয় জীবনের যে দিন আরম্ভ, সেই দিনই বুঝি তাহার আরম্ভ। অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে সেই বাণী প্রচলিত আছে, সেই কথার সূত্র আরম্ভ হইয়া আছে। মানবজীবন বিশ্বমধ্যে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই; অকস্মাৎ ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব হয় নাই। বহু যুগের তপস্যার ফলে, বহু যুগের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ও যৌননির্ব্বাচনে ও অপরবিধ নির্ব্বাচনে পুরাকালের অমানুষ অদ্যকার মানুষে পরিণত হইয়াছে। মনুষ্যত্বের আরম্ভ কবে, কেহ বলিতে পারে না; মানবের জাতীয় অভিজ্ঞতারও আরম্ভ কবে, তাহা কেহ জানে না। এই পুরাণ কথার আদি অনুসন্ধান করিতে গেলে অতীতের মহান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয়; সেখানে মনুষ্যত্ব অবিকশিত, অস্ফুট, জীবত্বে বিলীন। জীবত্বেরই বা আদি কোথায়? আদি যদি কোথাও অনুমান করিতে পারা যায়, সেখানে জীবত্ব জড়ত্বে লীন হইয়া রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে বিভেদ দেখা যায় না। বিশ্বজগতের যিনি আদি পুরুষ, যিনি আদি মানব, যিনি আদি জীব, যিনি আদি জড়, তিনিই বুঝি সেই পুরাণ কথার আদি কথক; তদবধি সেই কথা জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। ঐতিহাসিক কালে মানবসমাজের যাঁহারা নেতা ছিলেন, যাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু অতীতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারিত; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন; অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইতেন। প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম ঋষি; তাঁহারা যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রুতি। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরা, তাঁহাদের নিকট শুনিয়া যাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নাম স্মৃতি।

বর্ত্তমান কালে সেই পুরাতন বাণীর, মানবজাতির সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার, শ্রুতি ও স্মৃতি যাহার ব্যবস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়া কে দিবে? ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করা চলে না; মনুষ্যমাত্র একদেশদর্শী; মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরাত্মা পাশবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম উভয়ের বিরোধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উদ্ভ্রান্ত ও ব্যাকুল। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে এক পথ দেখাইতেছে, সহজাত প্রাকৃতিক সংস্কার তাহাকে অন্য পথে চালাইতেছে; কোন্ পথে যাইতে হইবে, মনুষ্য ঠাহর পায় না; মনুষ্যের জীবনতরী কর্ম্মসাগরে ভাসিতেছে। তবে মনুষ্যের মধ্যেও আবার ইতর বিশেষ আছে;

মনুষ্যসমাজ এক বাক্যে যাঁহাদিগকে কাণ্ডারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, অগত্যা তাঁহাদিগের আশ্রয় লইতে হয়। সাধুসম্মতমার্গ আশ্রয় করিতে হয়। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, যখন তাহা হেঁয়ালির মত ঠেকে, তখন মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সংশয়সমাকুল মানবের নিকট শ্রুতি যখন নানা ধরণের কথা বলে, স্মৃতি যখন ভিন্ন ধরণের কথা বলে, ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন অন্ধকার গুহায় অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, তখন মহাজনসেবিত মার্গ অবলম্বন করিতে হয়; মহাজনের পন্থাই তখন পন্থা। সদাচার তখন ধর্ম্মের প্রমাণ।

তবে তোমাকে আমাকে কি চিরদিনই পরের হাত ধরিয়াই চলিতে হইবে? শ্রুতির অর্থ যখন বুঝিতে পারি না, স্মৃতি যখন হেঁয়ালিতে কথা কহে, তখন কি তোমার আমার মত প্রজ্ঞাবলহীন ব্যক্তিকে কেবলই সাধুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের অভ্যন্তরে এমন শক্তি কি কিছুই নাই? আমরা কেবল অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব? আমাদের মেরুদণ্ড কি এতই দুর্ব্বল যে, আমরা অপরের আশ্রয় না পাইলে সংসারের সমাজক্ষেত্রে আপনার চরণদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া বিচরণ করিতে পারিব না? যখন অন্যের সাহায্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে, তখন কি সেই মহাহবে আমাদিগকে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া দলিত পীড়িত পিষ্ট হইতে হইবে? প্রকৃতিদেবীর কি এই বিধান? জীবজগতের উন্নততম পদবীতে অবস্থিত মনুষ্যের পক্ষে কি এই ব্যবস্থা? প্রকৃতি আমাদিগকে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় ও দুর্ব্বল প্রজ্ঞা দিয়া এই সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন; আমরা কি তৃণের মত বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইব? আমরা কি নিজ যত্নে গন্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ হইব না? যে ধর্ম্মমীমাংসার সহিত আমাদের জীবনযাত্রার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ধর্ম্মমীমাংসায় আমরা স্বয়ং কি একবারে অক্ষম? অন্যে না চিনাইয়া দিলে কি আমরা ধর্ম্মকে চিনিতে পারিব না; অন্যে না বলিয়া দিলে কি আমরা অধর্ম্মকে পরিহার করিতে পারিব না? মনুষ্যের অবস্থা কি এমনই শোচনীয়?

প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবে—না? আমাদের প্রত্যেকের আত্মার অন্তস্তলে একজন সদা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া আমাদের কর্ত্তব্যমার্গের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; শ্রুতি স্মৃতি সদাচার যেখানে সাহায্য দেয় না, অথবা তাহাদের পরামর্শ যেখানে আমরা বুঝিতে পারি না বা আমা-

দের ভাল লাগে না, সেখানে সেই নীরব বাণী নিঃশব্দে আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভেদ দেখাইয়া দেয়, সেই নীরব বাণী কাহার? আমাদের হৃদিস্থলে কোন্ হৃষীকেশ অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সদা পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন? কোন্ কর্ণধার সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়া আমাদের জীবনতরীকে পথভ্রষ্ট হইতে দিতেছেন না? তাঁহার নাম অন্তরাত্মা—ইংরাজী ভাষায় যাহাকে বলে conscience—সম্প্রদায়বিশেষে যাঁহার নীরব বাণীকে তাঁহাদের মনঃকল্পিত ঈশ্বরবাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লজ্জিত হয়েন না। কিন্তু এই অন্তরাত্মা কোন কল্পিত ঈশ্বর নহেন; ইহা সেই অক্ষয় অব্যয়, অপ্রমেয়, এক এবং অদ্বিতীয়, মানবাত্মার সারভাগ।

মনুষ্যের এই অন্তরাত্মা, এই কন্‌সেন্স্, অনেকটা সহজাত সংস্কারের মত কাজ করে। মনুষ্য জন্মমাত্রই অন্তরাত্মার বিকশিত, বর্ত্তমান পরিণত অবস্থা লইয়া সংসারে উপস্থিত হয়; সহজ সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণা করে মাত্র; এই সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও সেইরূপ কোনরূপ কারণ দেখায় না; একবারে বাদশাহের মত হুকুম চালায় ও বলে,—এই কাজটা ভাল, এই কাজটা মন্দ; কেন ভাল, কেন মন্দ, তাহার কোন কৈফিয়ত দেয় না; ইউটিলিটির হিসাব বা অন্য কোন হিসাব দিতে চায় না; কোনরূপ পুরস্কারের প্রলোভন, কোন তিরস্কারের ভয় কিছুই দেখায় না। একবারে বলিয়া ফেলে, এই পথটা ভাল, এই পথে চল; এই পথটা মন্দ, এই পথে চলিও না। মনুষ্য যদি মন্দ পথে চলে, তখন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরে; মনুষ্য যখন ভাল পথে চলে, তখন নীরব উৎসাহধ্বনি দ্বারা তাহার পুরোগতির বেগ বাড়াইয়া দেয়। এই অদ্ভুত মানবধর্ম্ম, যাহার সহিত পাশবসংস্কারনিচয়ের এই অংশে সাদৃশ্য আছে, অথচ যাহার সহিত পাশবধর্ম্মের সংস্পর্শমাত্র নাই, পশুবংশ যাহাতে পূর্ণমাত্রায় বঞ্চিত, ইহার বর্ত্তমান বিকাশ কিরূপে হইল, তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা চিরকাল কোলাহল করিয়া আসিতেছেন; সেই কোলাহলে প্রবেশে আমাদের প্রবৃত্তিমাত্র নাই। আমরা এই বলিয়াই নিরস্ত হইব যে, মানবের সামাজিক জীবনে ব্যক্তিসমষ্টির সহিত ব্যক্তিসমষ্টির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের, সঙ্ঘের সহিত সঙ্ঘের, বর্ণের সহিত বর্ণের, জাতির সহিত জাতির, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের যে ভীষণ দ্বন্দ্ব, মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে ভীষণ দ্বন্দ্বের পরিণামফলে,

বর্ত্তমান অবস্থাপ্রাপ্তির, বর্ত্তমান অভিব্যক্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে সদুত্তর মিলিতে পারে। যে সনাতন বিরোধ জীবের জীবনের মূলস্থলে বর্ত্তমান, যে বিরোধে জীবের অভিব্যক্তি ও জীবনের উন্নতি, যে বিরোধে জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব, মনুষ্যসমাজে সেই সনাতন বিরোধের প্রকারভেদ হইতেই মনুষ্যের সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির, মনুষ্যের কন্‌সেন্সের অভ্যুদয়।

সে যাহাই হউক, শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি বা অন্তরাত্মার পরিতোষ সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রমাণ। আর পঞ্চম প্রমাণের কল্পনা অনাবশ্যক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাঁওতাল পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২

পাহাড়িয়া জাতি।

পাহাড়িয়া জাতির সম্বন্ধে যেরূপ কিংবদন্তী আছে, তাহা হইতে বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। উরাওনদিগের জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, তাহারা এই জাতির এক শাখামাত্র; ইহারা পশ্চিমঘাট হইতে আসিয়া রোটাস্ পর্ব্বতে অনেক কাল অবস্থিতি করিয়াছিল, পরে মুসলমান কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও দুই অংশে বিভক্ত হয়। এক ভাগ রাজমহল পর্ব্বতে ও দ্বিতীয় ভাগ ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুরের উচ্চ ভূমিতে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইহারা বলে, মনুষ্যজাতি সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত তাহারা পাহাড় পর্ব্বতে থাকিতে ভালবাসে। উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের যে কিংবদন্তী আছে, তাহা লেপ্টেনাণ্ট শ সাহেবের বিবরণী হইতে গৃহীত হইতেছে;—

লোকসৃষ্টির জন্য স্বর্গ হইতে সাত ভাই মর্ত্ত্যে প্রেরিত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পীড়িত হইলে, অবশিষ্ট ভ্রাতারা একটি ভোজের আয়োজন করিল, এবং

জন্মে, সে তাহাই খাইবে ও আপনার ঈপ্সিত স্থানে গিয়া বাস করিবে। এক জন ছাগমাংস আহার করিয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, এবং তাহার সন্তান সন্ততি হিন্দুনামে পরিচিত হইল। অপর এক জন শূকরমাংস ব্যতীত আর সকল মাংসই ভোজন করিয়াছিল, তাহার সন্তানেরা মুসলমান হইল। তৃতীয় কি করিয়াছিল,তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই; কিন্তু সে খারওয়ার জাতির আদিপুরুষ। চতুর্থ বরাহমাংসে তৃপ্তিলাভ করিয়া উত্তরদেশে কিরাতজাতির সৃষ্টি করিল। পঞ্চম ভ্রাতা কদির (? কোল) জাতির পূর্ব্বপুরুষ। ষষ্ঠ সর্ব্বজীবের মাংস ভক্ষণ করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল ; পরে কি হইল, অনেক কাল জানা যায় নাই ; অবশেষে ইংরাজদিগকে দেখিয়া ইহারা একেবারেই স্থিরসিদ্ধান্ত করিল যে, তাহারাই এই সর্ব্বভুক্ ভ্রাতার বংশধর। পীড়িত সপ্তম ভ্রাতার নাম মালেয়ার ; সে এক পুরাতন পাত্রে সর্ব্বপ্রকারের মাংস ভক্ষণ করার অপরাধে জাতিচ্যুত ও পাহাড়ে থাকিতে বাধ্য হইল। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় না দেখিয়া সসন্তান দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল।

শাসন।

মাননীয় ক্লীবলাণ্ড সাহেব হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ইহারা আপনাদের প্রাচীন শাসনপ্রণালী অনুসারে চলিত। ইহাদের দণ্ডবিধানপদ্ধতি অতি নিষ্ঠুর ছিল। কোন ব্যক্তি অন্যগ্রামবাসী ভিন্ন মাঝির (সর্দ্দারের) অধীনস্থ কোন অনিষ্টকারীর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিলে, সে স্বসম্প্রদায়ের সর্দ্দারের নিকট অভিযোগ করিত। দলপতি আপনার দলবল সহ অপরাধীর গ্রাম লুণ্ঠন ও তাহাকে বন্দী করিয়া স্বগ্রামে আনিয়া লুণ্ঠিতদ্রব্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইত। যে পর্য্যন্ত বন্দীর আত্মীয়েরা খরচ সহ টাকা ও অপহৃত দ্রব্যাদির ক্ষতিপূরণ না করিত, তাবৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিত না।

ধর্ম্মনীতি।

লেপ্টেনাণ্ট শ-এর মতে পাহাড়িয়ারা পুনর্জন্ম ও পরকাল মানে। "সদা সদ্ব্যবহার করিবে, কাহাকেও গালি দিবে না। চুরী, প্রহার ও হত্যা করা পাপ। স্ত্রীপুরুষ সকলেই দুবেলা ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। পরমেশ্বর সমস্ত দেখিতে পান, সুতরাং পাপের শাস্তি সকলকেই পাইতে হইবে। আত্মহত্যা মহা পাপ।" ইত্যাদি উচ্চ ধর্ম্মকথা শিক্ষিত পাহাড়িয়াদিগের মুখে শুনা যায়। ইহারা ঈশ্বরকে 'বিদো' বলে ; দেবতাদের সাধারণ উপাধি গোঁসাই, দেবতাদের নাম ;—

কোন বড় বৃক্ষের তলায় একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত করিয়া, তাহা রক্সী-(রক্ষী)-দেবজ্ঞানে পুরোহিতের দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

চাল বা চালনদ।—গ্রামে কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে, ইহাদের পবিত্র মুক্মুম গাছের তলায় একটা পাথর রাখিয়া পূজা করে। ইঁহার মন্দিরে প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে "চিতারীণ" উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে একটি গাভী বলি দিতে হয়।

পৌ গোঁসাই।—ইনি পথের দেবতা। যাত্রার সময় বিল্বমূলে বেদীনির্ম্মাণ করিয়া মোরগ বলি দিয়া ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে।

দ্বারা গোঁসাই।—গ্রামাধিপতি দেবতা। গৃহস্বামী ঘরের সম্মুখে মুক্মুম বৃক্ষের শাখা রোপণ করিয়া তাহার নীচে একটি ডিম রাখে এবং শূকর বলি-দান করিয়া সেই মাংস বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজন করায়। পরে ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে ও শাখাটি গৃহে রাখিয়া দেয়।

কুল গোঁসাই।—ধান্যবপনের সময় ছাগ, শূকর, বা পক্ষী বলিদান দিয়া ইহাঁর পূজা সম্পন্ন হয়।

ঔংগা।—শিকারের দেবতা। ইহাদের শিকার-আইন অতিশয় কঠোর। শিকারী কুকুর হত্যা করিলে ১২৲ টাকা জরিমানা হইয়া থাকে। বিড়াল হত্যা করিলে প্রত্যেক গ্রাম্য বালককে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছু কিছু লবণ দিতে হয়। হতজীবের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ স্ত্রীলোকদিগকে খাইতে দিতে হয়, না দিলে দেবতা রুষ্ট হন। শিকারের কিয়দংশ মাঝির প্রাপ্য। শিকার অদৃশ্য হইলে যাহারা খুঁজিয়া বাহির করে, তাহারা সেই পশু হত হইলে অর্দ্ধেক পাইয়া থাকে।

গুমু গোঁসাই।—কুল গোঁসাইর সহিত ইঁহার সৌসাদৃশ্য আছে।

চামদা গোঁসাই।—ইনি সর্ব্বপ্রধান দেবতা। ইহাঁর পূজায় এতাদৃশ ব্যয় হয় যে, কেবল ধনীরাই এই দেবতার পূজা করিতে সমর্থ। পূজক, পুরোহিত বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট নৈবেদ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই করিতে হইবে। প্রায়ই দ্বাদশ বরাহ, দ্বাদশ ছাগ, চাউল, তৈল ও লাল সীস দিতে হয়। তিনটি বাঁশ পুতিয়া তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন বর্ণে চিত্রিত অনেকগুলি নৌকা সংলগ্ন করিয়া দেয়। নৌকার পার্শ্বদেশ কাল ও লাল রঙে চিত্রিত, ও মধ্যভাগে কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ রাখা হয়।

হয়। অনেকে ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি সুন্দর পদার্থে বাঁশগুলি আরও সুশোভিত করে। পরে এক সঙ্গে সমস্তগুলিকে চামদা গোঁসাই জ্ঞানে পূজকের গৃহের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া পশু পক্ষী বলিদান দেয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে নৃত্যগীতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে; তিন তিন জন লোক পালাক্রমে চামদা গোঁসাইর সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে ধন-পুত্রলাভকামনায় আবার বলিদান হয়। রক্তরঞ্জিত মুকুমুম শাখা চিহ্ন-স্বরূপ বেদীর উপর রাখিয়া দেয় ও বাঁশগুলি পূজকের গৃহাভ্যন্তরে চালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। পূর্ব্বে মালেয়ারদিগের পুরোহিতকে নৈয়া (নায়ক) বা লৈয়া বলিত। বর্ত্তমান পুরোহিতদিগকে দইমনস ও তাহার পত্নীকে ক্ষিয়েন্দ্রী কহে। ইহাদিগকে চুল দাড়ি রাখিতে হয়, এবং একের শক্তির অতিরিক্ত কোন অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে হয়। সর্দ্দার সন্তুষ্ট হইয়া লাল সুতায় কড়ি বাঁধিয়া তাহার গলায় ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দিলে, তাহার উৎসবে অধ্যক্ষতা করিবার অধিকার জন্মে। তাহাকে উৎসর্গীকৃত পশুর শোণিত পান করিতে হয়।

পাহাড়িয়ারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—মালেয়ার মাল ও কুমার। ইহারা সকল প্রাণীর মাংস খায়, মৃতজন্তুও বাদ যায় না। পাহাড়িয়ারা সূর্য্যকে বিদো গোঁসাই-(পরমেশ্বর)-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বিদেশী লোকের সহিত মিশিতে ভালবাসে না, এ জন্য দুর্গম বৃক্ষসমাচ্ছন্ন স্থলে বাস করে। প্রত্যেক বাটীতে মাচান অর্থাৎ শস্যের গোলা থাকে। ইহাদের গৃহে মৃত্তিকার প্রাচীর নাই; কেবল বাঁশ ও খড় দিয়া ঘর প্রস্তুত করে। ইহারা উৎসবে প্রচুরপরিমাণে পাঁচওয়াই নামক মদ্য পান করে। নৃত্যের সময় এক ব্যক্তি মদের পাত্র লইয়া নর্ত্তনশীল প্রত্যেকের মুখে একটু একটু ঢালিয়া দেয়, তাহারাও তালভঙ্গ না করিয়া নাচিতে নাচিতে পান করে।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ দেখিতে সুন্দর। স্ত্রীলোকেরা কটীদেশের নিম্ন-ভাগে ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান, এবং শরীরের উপরিভাগে লাল রঙের চাদর ওড়নার ন্যায় ব্যবহার করে। কাণে কর্ণভূষা ও গলায় প্রচুরপরিমাণে বিবিধ বর্ণের পুঁতির মালা পরিধান করায় দেখিতে অতি সুশ্রী বোধ হয়। কিন্তু পুরুষেরা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কটীদেশে জড়াইয়া ও রুক্ষকেশ মস্তকের উপর খোঁপা বাঁধিয়া রাখায়, নিতান্ত অসভ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহারা

বিবাহ।

ইহাদের বিবাহে ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় কতকটা কোর্টশিপ চলিয়া থাকে। যুবক যুবতী একত্র কাজ করে, এক সঙ্গে হাটে যায়, একত্র আহার ও এক শয্যায় শয়ন করে। সম্মতিগ্রহণের সীমাতিরিক্ত অপরাধ করিলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়,পরে নিজ ব্যয়ে পশুর রক্তপাত করিয়া পাপ ধৌত করিলে সমাজে পুনর্গৃহীত হয়। বিবাহের দিনে বর সবান্ধবে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হইয়া মাদুর বা খাটীয়ার উপর উপবেশন করে। আহারান্তে কন্যাকর্ত্তা বালিকার হাত বরের হাতে দিয়া তাহাকে কন্যার প্রতি চিরকাল সদয় থাকিতে অনুরোধ করে। বর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বালিকার ললাটে সিন্দুর দেয়, এবং সেই অঙ্গুলি দ্বারা বালিকার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবারা স্বামীর ভ্রাতৃগণকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কোন ভ্রাতাই একাধিক ভ্রাতৃবধুর পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সৎকার।

পাহাড়িয়ারা মৃত ব্যক্তিকে গোর দেয়। পুরোহিত মরিলে তাহাকে জঙ্গলে লইয়া গিয়া বৃক্ষপত্র ও শাখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, পুরোহিতের প্রেতাত্মা গ্রামে থাকিলে অনেক দৌরাত্ম্য করে। কেহ সংক্রামকরোগে মরিলে তাহাকেও দূরে ফেলিয়া দেয়। দলপতি মরিলে তাহার কবরের উপর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া পাঁচ দিন ভোজ দিতে হয়। বৎসরান্তে পুনর্ব্বার লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরি ভোজন করাইতে হয়। এই দ্বিতীয় ভোজ না হইলে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে না, এবং ইতোমধ্যে সেই পরিবারের কাহারও পত্নীবিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিতে পায় না। মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্দ্ধ সম্পত্তির অধিকারী,অবশিষ্ট অর্দ্ধ অন্যান্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা কহে না; আপনাদের সামান্য জমী চাষ করে, ও বাগানে কলা, শাক সব্‌জি প্রভৃতির উৎপাদন করিয়া থাকে।

ধনী মাল পাহাড়িয়াদের পুরোহিত হিন্দু। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। দরিদ্রেরা কন্যাকে অনেক সময় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহে কন্যার সম্মতি গ্রহণ করে না। কন্যাকর্ত্তা বরের

পারে, কিন্তু সেই লোক চিরকাল উপপত্নীর ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। কুমারীর সন্তান জন্মিলে জন্মদাতাকে উহার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। কুলটারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয়, কিন্তু তাহারা অন্যের উপপত্নীরূপে থাকিতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারী, অন্য পুত্রেরা কিছু কিছু ভূমি পাইয়া থাকে; পিতার অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রেরা সমান অংশ পাইয়া থাকে। বিধবারা যতদিন বিবাহিতা বা অন্যের সঙ্গিনী না হয়, তত দিন পুত্রের দ্বারা প্রতিপালিতা হয়।

সাঁওতাল জাতি।

সাঁওতালদিগের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, ইহারা বহুকাল পূর্ব্বে হাজারিবাগ ও বীরভূমে আসিয়া আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; সেখান হইতে ক্রমশঃ সাঁওতাল পরগণায় আসিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান দামোদর ও কাঁসাই নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহারা এক স্থানে চিরকাল থাকিতে ভালবাসে না। বাসস্থান আরামজনক হইলেও সামান্য কারণে ইহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষসমাকীর্ণ জঙ্গলে বা অনুর্ব্বর স্থানে থাকিয়া বাঁশী, মাদোল ও তীর-ধনুক লইয়া সুখে কাল কাটায়, এবং যেখানে থাকে, আংশিকভাবে তথাকার ভাষা ও রীতিনীতির অবলম্বন করে। ইহাদের গৃহে মৃত্তিকার প্রাচীর ও সুন্দর বারান্দা আছে; তাহা লাল, সাদা ও কাল রঙে চিত্রিত; দেখিতে অতি সুন্দর। গৃহ যেমন সুন্দর, রাস্তা ঘাটও তেমনি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। ইহারা অন্যান্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু যে সকল হিংস্রজন্তুসমাকুল জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ইহারা পরিষ্কৃত করিয়া বাস করে, তথায় হিন্দুরা আসিয়া জমীদারকে বেশী খাজনা স্বীকার করিয়া বাস করিতে থাকে, সুতরাং সাঁওতালেরা অনন্যোপায় হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করে, তাহাদিগকে "ঝুটীয়া" সাঁওতাল ও যাহারা পৈত্রিক স্থানে বাস করে, তাহাদিগকে "বেদিয়া" সাঁওতাল কহে। ইহারা খুব কাল, কিছু খর্ব্ব ও স্থূল; মুখ প্রায় গোল, চেহারা অনেকটা কাফ্রিদের মত।

প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া (১) যোগ মাঝি আছে। বালকবালিকাদের বিবাহ ও ধর্ম্মনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। (২) পরামাণিক জমীর চাষ ও বণ্টনের কর্ত্তা। প্রত্যেককে ভালমন্দ দুই প্রকারের

কিছু চাঁদা আদায় করিয়া থাকে। ইহাদের কার্য্য পুরুষানুক্রমিক। (৩) গ্রাম্য পুরোহিতের নাম নৈয়া (নায়ক) বা লয়া। ইহারা বৃত্তিস্বরূপ কিছু জমী পাইয়া থাকে, তাহার উপস্বত্ব দ্বারা সকলকে বৎসরে দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়। চৈত্র মাসে শালের ফল (সরহাই) ও মহুয়ার ফুল ফুটিলে যে সরহুল উৎসব বা বহাপূজা হয়, তাহাতে প্রথম ভোজ, ও আশ্বিনমাসে ফসলের ভাবী মঙ্গলের জন্য ময়মুরি উৎসবে দ্বিতীয় ভোজ দিতে হয়। পৌষ মাসে সরাই বা সরহাই পর্ব্বে যোগমাঝি সকলকে আহারের নিমন্ত্রণ করে। গৃহপালিত পশুগণকে তৈল ও সিন্দূর মাখাইয়া হাঁড়িয়া নামক মদ্যপান করিতে দেয়। বন্-বনি ও হবি-অবি পরব যথাক্রমে শস্যবপন হইলে ও শস্য পাকিলে হইয়া থাকে। বন্ধুয়া উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ২৭ শে পৌষ হইতে ৩০ শে পর্য্যন্ত তিন দিন স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলে মিলিয়া অবিশ্রান্ত পান, ভোজন, নৃত্য গীতে অহোরাত্র যাপন করে; এই সময় যুবকযুবতীরা আপনাদের বিবাহের মনোমত পাত্রী পাত্র খুঁজিয়া লয়। প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে, কোথাও প্রত্যেক চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে, গৃহস্বামী পরিবারের মঙ্গলকামনায় জহরথানে অর্থাৎ পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট মুক্ত স্থানে সূর্য্যদেব সিংবঙ্গার সম্মুখে প্রাতঃকালে ছাগবলি দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা আরও অনেক দেবতা, এমন কি, পূর্ব্ব-পুরুষদিগেরও উপাসনা করিয়া থাকে। অনেক সাঁওতাল দুর্গাপূজা ও হোলির সময় হিন্দুদের সহিত যোগদান করিয়া মহোৎসব করিয়া থাকে।

সাঁওতাল পরবে যে ব্যক্তি পূজা ও বলিদানাদি সম্পন্ন করে, তাহাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ঢাকের বাদ্যে ধ্যানভঙ্গ হইলে দুলিতে থাকে,—যেন কোন দেবতা আসিয়া তাহার শরীরে আবির্ভূত হইয়াছে। পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে থাকে। ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠন ও এমন ছট্‌ফট করিতে থাকে যে, প্রায়ই তাহার দেহ রক্তাক্ত হয়। এ জন্য রক্ত রাখিবার পাত্র পর্য্যন্ত সম্মুখে সজ্জিত থাকে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে সিংবঙ্গা (সূর্য্যদেবতা) সর্ব্বপ্রধান দেবতা;—নিন্দা চান্দো বঙ্গা-(চন্দ্র দেবতা)-ও একজন প্রধান দেবতা। সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা জাহির এরা (জাহিরমানের দেবতা) মণিকা, মারাং বুরু (পর্ব্বত) মরেকো টুরেকো (পঞ্চ দেবতা ও এক দেবী এক সঙ্গে), মাঝি হারাম, গোঁসাইএর প্রভৃতি অপদেবতারা রোগ বা দুর্ভিক্ষের সময় পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলে

সেই পরিবারের কর্ত্তা বাঘভূত বা বনসিং দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-চর্ম্মে উপবেশন করিয়া শপথ করা সর্ব্বপ্রধান শপথ।

পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে সাঁওতালদিগের মধ্যে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী জলনিমগ্ন ছিল। সর্ব্বত্র জল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সিংবঙ্গা (সূর্য্য) ও চান্দো বঙ্গা (চন্দ্র) ঈশ্বরদ্বয় প্রথমে এক হংস-মিথুনের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্রামের স্থান না দেখিয়া দেবতা-দ্বয়ের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, এবং জলমগ্ন পৃথিবীকে উঠাইয়া তাহাদের আবাসস্থান করিয়া দিলেন। ভূমণ্ডলের আকৃতি কূর্ম্মাকার ও তদুপরি ঘাস ও শাক সবজিতে পরিবৃত ছিল। হংসী দুইটি ডিম্ব প্রসব করিলে একটির মধ্য হইতে "পিল্চু হারাম" নামক একটি পুত্র ও অপরটির মধ্য হইতে "পিল্চু বুধী" নামে এক কন্যা বাহির হইল। ইহারা পরস্পর ভাই ভগ্নী। কিন্তু শয়তান মারাং বুরু (পর্ব্বত দেবতা) 'হাড়ী' বা 'হাঁড়ীয়া' নামক মদ্যপান ও 'রাম্ু' নামক লতা আহার করাইয়া তাহাদের সে সম্পর্ক ভুলাইয়া দিলে, তাহাদের সাত পুত্র ও আট কন্যা জন্মিল। এই সপ্ত পুত্র সপ্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। ক্রমে তাহারা নানা দূরদেশে গেল, এবং তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইল। অষ্টম কন্যা বরাবর অবিবাহিতা থাকিয়া "মেদি মাই" নামে পূজিতা হইতে লাগিল।

রীতিনীতি।

সন্তান জন্মিবার পর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম দিবসে এক প্রকার ফেন প্রস্তুত করিয়া সিংবঙ্গা বা মারাংবুরুকে তদ্দ্বারা স্নান করাইয়া পুনরায় তাহা আহারের নিমিত্ত রাখিয়া দেয়। প্রসূতির স্নান ও শিশু সহ পরিবারস্থ সকলের ক্ষৌর-কর্ম্ম ও স্নান সমাপ্ত হইলে, সকলে মিলিয়া তাহা আহার করিয়া শুদ্ধ হয়। ইহাকে নর্ত্ত উৎসব কহে। পিতামহের নামানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হয়, অন্যান্য বালকেরা অপরাপর আত্মীয়ের নাম প্রাপ্ত হয়। শিশুসন্তান জন্মিবার পর এক বৎসরের মধ্যে তাহার কর্ণবেধ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বালক বালিকাদের বসিবার পৃথক স্থান নাই। বালিকারাও অবাধে হাটে যায়, উৎসব ও গ্রাম্যনৃত্যে যোগদান করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যুবক যুবতীর এক সঙ্গে ভ্রমণ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

নৃত্য।

যোগ মাঝির বাটীর সম্মুখে খানিকটা অনাবৃত স্থান থাকে। তথায় সাঁওতাল

ধ্বনি ও বংশীরব শুনিতে পাইলেই যুবতীরা কেশদাম বিন্যস্ত করিয়া ও তাহাতে ফুল গুঁজিয়া নৃত্যসভায় উপস্থিত হয়। মদিরামত্ত যুবকেরা বৃক্ষপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ বা পুষ্পস্তবক কেশে বাঁধিয়া মাদোল ও বংশী বাজাইয়া উল্লম্ফন, ভূমিলুণ্ঠন প্রভৃতি বিবিধপ্রকার নৃত্য করিতে থাকে, এবং যুবতীরা পাশাপাশি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া চক্রাকারে যুবকগণকে বেষ্টন করিয়া, পদ ও শরীর ঈষৎ দোলাইয়া, করতাল বাজাইতে বাজাইতে নৃত্যের সহিত মৃদুল মধুর সংগীত করিতে থাকে।

বিবাহ।

ধনী সাঁওতালেরা সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব সন্তানগণের বিবাহ দেয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বালক বালিকারা যৌবনে পদার্পণ করিয়া আপনারাই মনোমত পাত্র পাত্রী খুঁজিয়া লয়। পিতা মাতা পাত্র বা পাত্রী খুঁজিয়া বিবাহ দিলে ইহারা গৌরবজনক মনে করে। বর অবস্থাপন্ন হইলে পাত্রীর পিতাকে পণস্বরূপ ১৬৲ টাকা নগদ ও স্ত্রীলোকদের জন্য এগার হইতে বার হাত দীর্ঘ লাল পেড়ে সাদা রঙের শাড়ী দিয়া থাকে। শ্যালকের জন্যও পাঁচ হইতে সাত হাত পরিমিত মার্কিনের ধুতি ও কনের জন্য হরিদ্রারঞ্জিত সাড়ে নয় হাত মার্কিনের শাড়ী দিতে হয়। কনের শাড়ীর বহর বয়সানুসারে কমবেশী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় হাত হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, বরকে কিছু গহনাও দিতে হয়। তাহার মধ্যে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। নিতান্ত গরীব হইলে চারি আনা মূল্যের একটি রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক দিলেও চলিতে পারে। দরিদ্র সাঁওতালকে ৩৲ বা ৫৲ বা ৭৲ বা ৯৲ টাকা নগদ, তিন খানি শাটী, শ্যালকের জন্য একখানি ধুতি ও শ্বাশুড়ীর নিমিত্ত একখানি শাটী দিতে হয়।

দেনা পাওনা স্থির হইলে বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং সেই দিন হইতে যত দিন অবশিষ্ট থাকে, দুই গাছি রজ্জুতে সেই কয়টি গ্রন্থি দিয়া এক এক-গাছি পাত্র পাত্রীর নিকট রাখিয়া দেয়। তাহারা প্রত্যহ সকালে একটি গিরা খুলিয়া বিবাহের দিন ঠিক করিয়া লয়। গরীবের বরযাত্রী ৩।৪টী ও অবস্থা-পন্ন লোকের অনেক বেশী হইয়া থাকে। নির্দ্ধারিত দিনে বর বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ বাদ্যের সহিত কনের বাটীতে যাত্রা করে। গন্তব্য গ্রামের সন্নিহিত হইলে যোগমাঝি ও স্ত্রীলোকেরা পা ধুইবার জল লইয়া উপস্থিত হয়। পরে বর ব্যতীত অন্যান্য যাত্রীরা কন্যাকর্ত্তার বাটীতে গিয়া

নৃত্য, গীত, বাদ্য করিতে থাকে। রাত্রিশেষে বর কোন সঙ্গীর কোলে উঠিয়া কনের বাটীতে আইসে। পাত্রীকেও সেই সময় ভ্রাতা কি ভগ্নীপতি ঝুড়িতে তুলিয়া লইয়া আইসে। বর পূর্ব্বাস্য ও কনে পশ্চিমমুখী হইয়া আসনে উপবেশন করে। দুইটি জলপূর্ণ পাত্রে আম্রপল্লব রাখিয়া একটি বর ক'নের সম্মুখে রাখিলে, বর আম্রপল্লব দ্বারা ক'নের সর্ব্বাঙ্গে জল ছিটাইয়া দেয়, পরে কনেও সেইরূপ বরের গাত্রে জলসেচন করে। ইহার পরে অবশ্য-কর্ত্তব্য সিন্দূরদান। বর কনের ললাটে ও শিরোদেশে পাঁচবার প্রচুরপরিমাণে সিন্দূর মাখাইয়া দেয়, এবং সভাস্থ সকলে আনন্দধ্বনি করিতে থাকে। বর কনে সমস্ত দিন উপবাসের পর এই সময়ে এক সঙ্গে আহার করে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের আহার এই প্রথম।

পাত্রীকে বাটী লইয়া যাইবার সময় অবস্থানুসারে চতুর্দ্দোলে, পাল্কীতে বা পদব্রজে লইয়া যায়। ইহাদের বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তবে যোগমাঝি কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকে। সিন্দূরদান ও একত্রভোজন, এই দুইটিই বিবাহের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সাঁওতাল পুরুষ কোনও সাঁওতাল-কুমারীর ললাটে সিন্দূর দিলে তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য। অন্য জাতীয় কেহ ওরূপ করিলে, হয় তাহাকে বিবাহ করিবে, না হয় আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবে। বরকন্যার একত্রভোজনের অর্থ এই যে, কন্যা আর পিতার পরিবারভুক্ত রহিল না, বরের পরিবারভুক্ত হইল। রমণীরা ঘোমটা দেয় না। সাঁওতালেরা এক সময় তিনটি ভার্য্যা রাখিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বপত্নীর সন্তান না হইলে ভার্য্যার সংখ্যা ইচ্ছানুসারে বাড়াইতে পারে। ধনীরা অনেক সময় নিয়মভঙ্গ করিয়া ৬।৭টি স্ত্রীও গ্রহণ করিয়া থাকে। পত্নীকে ডাইনী বা ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ হইলে, গৃহের বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সাঁওতাল স্ত্রীর পক্ষে ভাসুরের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শিকার।

সাঁওতালেরা অনেক সময় আলস্যে দিন কাটাইলেও পরিষ্কার ঋতুতে বড়ই আমোদে কাল কাটায়। চাষ, বংশীবাদন, বালিকাদের সহিত নৃত্য ও মৃগয়ায় সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে। শিকারের সময় ইহারা দলে দলে তীর, ধনুক, টাঙ্গি ও কুকুর সঙ্গে লইয়া জঙ্গল ঘিরিয়া হরিণ, শূকর ও পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে অরণ্যের আবরণ শুষ্ক ও বিচ্ছিন্ন হয়, সুতরাং গ্রীষ্ম ঋতুই মৃগয়ার প্রশস্ত সময়। বাঘ ও ভালুক প্রায়ই এরূপভাবে শিকার করে না। যে

ব্যক্তি লক্ষ্যের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে আঘাত করে, সেই জন্তুকে অপর কেহ বধ করিলেও, উহা তাহারই প্রাপ্য। ইহারা প্রায় সর্ব্ব জীবের মাংস খায়। অনেকে কুকুর, শৃগাল, চিল ও বিষাক্ত সর্প খাইতে চাহে না। মুরগী, শূকর, গরু ও নির্ব্বিষ সর্প প্রভৃতি সমস্তই ইহাদের খাদ্য। অশ্বত্থ ও বটের পাতা, কচু গাছ ও নানা প্রকারের শাক রন্ধন করিয়া ভোজন করে। এমন কি, মৃত জীবের মাংসও ইহাদের পরিত্যজ্য নহে। কিন্তু অন্যজাতীয় লোকের প্রস্তুত অন্ন কিছুতেই আহার করে না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

সাঁওতাল মরিলে শবদেহ দগ্ধ করে। দাহ করিবার পদ্ধতি অনেকটা হিন্দুর মত। মুখাগ্নি, দামোদর নদে অস্থিনিক্ষেপ, শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় ভূতের দৃষ্টিনিবারণের নিমিত্ত খই ও তুলার বীচি চতুর্দ্দিকে ছড়ান প্রভৃতি হিন্দুর রীতি ইহারা অবলম্বন করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা পরকাল মানে না, সুতরাং অস্থি দামোদরে নিক্ষেপ ভক্তি ও ভালবাসার পরিচায়কমাত্র। এক বৎসরের অল্পবয়স্ক শিশু মরিলে তাহাকে সমাহিত করে। কোন সাঁওতাল বিসূচিকা বা বসন্তে মরিলে যত দিন সেই সংক্রামক রোগ গ্রামে প্রবল থাকে, তত দিন তাহাকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, পরে দেশে রোগের শান্তি হইলে, শবদেহ তুলিয়া দগ্ধ করা হয়।

কোনও সাঁওতালের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়। কন্যা পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী নহে, কিন্তু কন্যা প্রায়ই একটি গাভী পায়। পিতার জীবিতাবস্থায় কোন পুত্র পৃথক হইলে পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার থাকে না; অন্যান্য পুত্রেরা পিতৃ-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়। অন্য কেহ না থাকিলে পৃথগন্ন পুত্রই বিষয় পাইয়া থাকে। প্রথম উত্তরাধিকারী না থাকিলে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় না থাকিলে তৃতীয়, ইত্যাদিক্রমে দায়াধিকার চলিয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির পুরুষ জ্ঞাতি থাকিলে দৌহিত্র সম্পত্তির অধিকারী হয় না। সাঁওতালদিগের মধ্যে উইল করিবার প্রথা নাই।

ইহারা দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত; যথা;—

(১) হান্দসা, (২) কিস্কু (৩) মুর্ম্মু (৪) হোমরাও (৫) টুডু (৬) সরেম বা সারণ (৭) মারান্তি (৮) বস্কি (৯) বেসেরা (১০) চোরেন (১১) পাওরিয়া বা মলি (১২) সাঁওয়ালে বা করওয়ার। ইহাদের নামের শেষে উল্লিখিত কোন একটি পদবী (বা উপাধি) যোজিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ-নামের শেষে "মাঝি" উপাধিই অধিক প্রচলিত। প্রথমোক্ত সাত শ্রেণী বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদিগের সগোত্র বিবাহের ন্যায় ইহাদেরও এক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা।

উৎসর্গ।

প্রার্থনা।

১

এস হে ব্রজবিহারি, এস হে গোবিন্দ !
এস হে মধুসূদন ! অমৃত-অঞ্জন
নয়নের ! এস এস হে চির-আনন্দ !
ভকত জনের চিত্ত-নন্দন কানন,
(হরিচন্দনের যথা শত উপবন)
তুমি সেই কুঞ্জবন-পুষ্প-মকরন্দ !
এস হে সুন্দর শ্যাম, পলাশ-লোচন,
এস এস বনমালী, এস হে মুকুন্দ !
হেসে হেসে, মদনমোহন-বেশ ধরি,
এস হে ব্রজেশ ! তব অভিরাম ছবি
নিরখি, আমার চিত্ত-অরণ্য-অটবী
ভরি যাক্ পুষ্পে পুষ্পে ; এস, এস, হরি !
এ হৃদয়-বৃন্দাবন, কুসুমে কুসুমে
যাক্ ভরি, হরি ! তব পাদ-পদ্ম চুমে !

২

এস, এস, ব্রজেশ্বর ! এই "ব্রজাঙ্গনা"
তোমার বিরহে করে ঘোর হাহাকার !
শুভ্র আশীর্ব্বাদ-দানে, করিয়ে সান্ত্বনা,
কহ তার কাণে কাণে শুভ সমাচার !
মুছাও মঙ্গল-হস্তে অশ্রুধারা তার,
হোক্ সিদ্ধ, হে ব্রজেশ, তাহার সাধনা।
কর দেব, পূর্ণকাম তাহার অর্চ্চনা,
একান্তে, এস হে কান্ত দুঃখিনী রাধার !
দীনা হীনা কাঙালিনী আমার ভারতী ;
দেহে তার বস্ত্র নাই, নিতান্ত নগনা !
কবে তুমি শুন নাই করুণ উকতি
শোকার্ত্তের ? কর এরে শোভন-বসনা !
দ্রৌপদী কাঁদিল যবে, শত বস্ত্রে, হেসে,
ঢাকিলে সুতনু তার, চক্ষের নিমেষে !

৩

আমার মানসী সখী, এই "ব্রজাঙ্গনা",
তব দরশনে নাথ ! হোক্ পুলকিত ;
আবেশ-বিহ্বলা আর আনন্দ-মগনা,
মদির-লোচনা, অঙ্গে অঙ্গে মুখরিত
কাঞ্চন কঙ্কণ আর রজত-রসনা !
কুসুম-কুন্তলা আর লোহিত-বসনা,
সুন্দর ময়ূরকণ্ঠী বক্ষে বিজড়িত !
যেন কোন দেবকন্যা প্রফুল্ল-বদনা !
বসন্তের সমাগমে ধরণী যেমনি
হয়, নাথ, হাস্যময়ী, নবীন-যৌবনা !
কান্তের মিলনে যথা বঙ্গসীমন্তিনী
আশ্বিনে (পূজার দিনে) হয় গো তরুণা !
দোল-পূর্ণিমার দিনে ব্রজের নাগরী
হয় যথা লালে লাল, পরিয়া চুনরি !

৪

তোমার পদাঙ্ক-চিহ্ন করিয়া ধারণ,
পাইল গোপিনী যথা, তোমারে, শ্রীহরি !
তেমতি পদাঙ্ক-চিহ্ন, হে মধুসূদন !
অনুসরি ; হাব ভাব, লীলা, ক্রীড়া ধরি ;
এই নব "ব্রজাঙ্গনা", হে ব্রজমোহন,
করিছে আহ্বান তোমা, হাহাকার করি !
দাও দেখা, দাও দেখা ; মুছাও নয়ন
দুঃখিনীর ! কোথা হরি ? তুমি হে দয়াল !

মমচোর! চোর নহে এ ব্রজকুমারী—
আমিও গো চোর নহি, ওহে লীলাময়!
না হারায় নাম রূপ কোন্ নর নারী
প্রেমময়! তব প্রেমে হইয়ে তন্ময়?
তোমারি এ বিশ্বকাব্য, হে মধুসূদন;
আমার কি সাধ্য করি নূতন সৃজন! *

বাঁশরী।

১

থাক্ লাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহকাজ লো,
চলিনু সুন্দরি,
হ্যাঁলা তুই হ'লি কালা? ওই শোন্ ব্রজবালা
বাজিছে বাঁশরী!
শ্যাম-মূর্ত্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে!
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি!
যাই শ্যাম,যাই, যাই!—হে শ্যাম কিছু না চাই,
ও পদ-কমল চায় এ রাধা-ভ্রমরী।

২

হীরা, মতি, পান্না, চুণি মুকুতা প্রবালে লো
ওলো সহচরি,
সাজাবি রাধার অঙ্গ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ,
লাজে যাই মরি।
হ'ব তায় মনোচোরা?—ভুলিলি স্বজনি তোরা
তারা-রত্নে অমানিশা আধা দিগম্বরী।
হেরি সুধাংশুর হাস পরে সে কৌমুদীবাস—
শ্যাম মম পূর্ণচন্দ্র, এ রাধা শর্ব্বরী।

৩

কেন লো আনিলি ধাই' এ মধু-মালতী লো
প্রভাত-নলিনী?
সাজাবি রাধার অঙ্গ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ,
লো ব্রজ-গোপিনি!
হব তায় মনোচোরা? ভুলিলি স্বজনি তোরা
হেমন্তে কুসুম-রত্নে মলিনা অবনী?
পাইয়া গো ঋতুরাজে সাজে সে বাসন্তী সাজে;
শ্যাম মম ঋতুনাথ, এ রাধা ধরণী।

৪

শ্যামের বিরহ-যাগে রূপের আহুতি লো
দিয়াছি অনলে।
পুড়িয়া হয়েছে থাক্! সাজ সজ্জা তবে থাক্—
কাজ কি এ ছলে?
নিকুঞ্জে বাজিছে বাঁশী, আবার সে দেব-হাসি
হেরিয়া রূপসী হব—চল লো সরলে!
তখন গাঁথিয়ে মালা গলে দিস্ ব্রজ-বালা,
দিস্ ভরি রাধা-অঙ্গ মঙ্গলে মঙ্গলে।

৫

বাজিছে শ্যামের বাঁশী আবার আবার লো;
চল লো রূপসি!
তুলে রাখ ব্রজবালা তোর এ ফুলের ডালা
রতন আরসী!

---

* কবি এই মঙ্গলাচরণে শ্রীভগবানের শুভ-আশীর্ব্বাদ-উদ্বোধন-মানসে তাঁহার প্রার্থনা করিয়াছেন ও কতকটা ব্রজাঙ্গনাকাব্য-প্রণেতা অমর কবি মাইকেল মধুসূদনের স্তুতি করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বিশ্বে নূতন কিছুই নাই বটে, কিন্তু যিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা" পাঠান্তে কবির সবিনয় সরল উক্তির সমর্থন করিয়া বলিবেন,—

"চোর নহে এ ব্রজকুমারী—
এ কবিও চোর নহে, ওহে লীলাময়!"

আমরা আশা করি, সহৃদয়-সমাজে এই অভিনব মৌলিক কাব্যখানির যথেষ্ট আদর হইবে।—সম্পাদক।

বাঁশী কি বাজিছে হায়? বহিছে মলয়া বায়,
হিল্লোলিয়া কেঁপে উঠে এ হিয়া-সরসী।
রাধিকার চিত্ত-সরে ফুটে উঠে থরে থরে
শত-পদ্ম, জলে দোলে শত পূর্ণশশী!

৬

থাক্ লাজ, থাক সাজ, থাক গৃহকাজ লো
চলিনু সুন্দরি!
হ্যাঁলা তুই হ'লি কালা?' ওই শোন ব্রজ-বালা
বাজিছে বাঁশরী।
শ্যাম-মূর্ত্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে!
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি!
যাই শ্যাম, যাই, যাই, হে শ্যাম, কিছু না চাই,
ও পদ কমল চায় এ রাধা-ভ্রমরী।

সখী।

১

হৃদে তোর পায়ে ধরি, গাও, গাও, সহচরি,
সে গান আবার!
ফুটুক লো বনফুল, জুটুক্ লো অলিকুল,
করুক আকুল পিক বকুলে ঝঙ্কার!
যাক্ সখি জুড়াইয়া চিরবিরহিণী-হিয়া,
ফুটুক্ অধরে হাসি দুঃখিনী রাধার!

২

"জনম জনম আমি তোমায় হেরিনু স্বামী,
আঁখি না জুড়াল। *
"লাখ লাখ যুগে যুগে বঁধু হে ধরিনু বুকে,
"আকুলি ব্যাকুলি মোর তবু না ফুরাল,"—
আহা কি মধুর গান! জুড়া'ল তাপিত প্রাণ—
বিষাদ প্রমাদ সখি, সকলি লুকাল!

৩

"জনম জনম আমি জান হে অন্তরযামী
করিলাম মান!
"তোমার দর্শন পাই, মান রোষ ভুলে যাই।
"হে শ্যাম, তোমার প্রেমে নাহি অকল্যাণ!"
আহা কি মধুর গান! জুড়া'ল তাপিত প্রাণ—
আর সখি কাঁদিব না, মুছিনু নয়ান!

৪

"জনম জনম আমি, তোমারেই পাই স্বামী,
এই দাও বর!
"হে বঁধু যে কাজ কর, তাই হয় মনোহর!
"হে বঁধু যে সাজ ধর, তাহাই সুন্দর!"
আহা কি মধুর গান! জুড়া'ল তাপিত প্রাণ—
রূপে গুণে নাহি শ্যাম তোমার দোসর!

৫

"জনম জনম আমি পেয়েছি হৃদয়-স্বামী
কতই যাতনা!
"সুখ দাও সেও ভাল, দুঃখ দাও সেও ভাল,
"আমার স্বভাব সুধু ও পদকামনা!"
আহা কি মধুর গান! জুড়াইয়া গেল প্রাণ—
গোপীর ধরম সুধু ও পদ-বাসনা!

৬

"জনম জনম আমি চাই না হৃদয়স্বামী
কোনো পুরস্কার!
"চাই না রূপের কান্তি,সে সুধু আঁখির ভ্রান্তি!
"তুমিই প্রাণের শান্তি ব্রজগোপিকার!"
আহা কি মধুর গান! জুড়াইয়া গেল প্রাণ—
হে শ্যাম তুমিই মম মঙ্গল-ভাণ্ডার!

৭

"জনম জনম আমি করি গো হৃদয়-স্বামী,
এই সে বাসনা,
আমি থাকি ক্রোড়ে ধরি, তুমি যাও নিদ্রা হরি,
"আমি হেরি ওই মুখ, হইয়ে মগনা!"

---

* বলা বাহুল্য "————„ চিহ্নিত অংশগুলি সখীর গান ও বাকি সমুদয় রাধিকার উক্তি ও মন্তব্য।

আহা কি মধুর গান! জুড়াইয়া গেল প্রাণ—
আহা এ তো গান নয়, মধুর সান্ত্বনা!

৮

সাধে তোর পায়ে ধরি, গাও, গাও সহচরি,
এ গান আবার!
ফুটিল লো বনফুল, জুটিল লো অলিকুল,
করিল আকুল পিক বকুলে ঝঙ্কার!
গেল সখি জুড়াইয়া চিরবিরহিণী-হিয়া,
ফুটিল অধরে হাসি দুঃখিনী রাধার!

—

প্রতিধ্বনি।

১

শ্যামপ্রেমে উন্মাদিনী, আমি বিরহিণী,
ভ্রমি একাকিনী।
নগরের কোলাহলে, পরিহাস, রঙ্গচ্ছলে,
হায় আজি বিরাগিণী, আমি অনাথিনী।
তারা-শূন্য শশি-শূন্য যেন গো যামিনী!
যৌবনে যোগিনী যেন বিধবা ভামিনী!

২

আলুথালু কেশপাশ, কবরী এলায়ে
যেন গো শর্ব্বরী!
আইলাম এ বিজনে, ভাবিলাম, সঙ্গোপনে
জপিব হরির নাম, সরম পাশরি।
"শ্রীহরি" বলিনু আমি বিষাদে গলিয়া,
কে তুমি সাধিলে বাদ, "শ্রীহরি" বলিয়া।

৩

না পাই দেখিতে তোমা—নারীকণ্ঠধ্বনি
বুঝিনু আভাষে!
বীণা জিনি কণ্ঠধ্বনি তোমার, ওলো রঙ্গিণি,
কোথা থাক বরাননি? কোন্ সুখবাসে?
হায় ধনি কণ্ঠে তব বিষাদের সুর!
তুমিও কি রাধা সম বিরহে আতুর?

৪

শুনিয়াছি, হরিপ্রেমে হয়ে পাগলিনী,
রাজার নন্দিনী,
বিহ্বলা বিবশা সাজে, পূজে গো রাখালরাজে;
হরিনাম মুখে তার কি দিবা যামিনী।
সুধাই লো, সুধামুখি, তুমি কি রুক্মিণী?
তুমিও কি রাধা সম যৌবনে যোগিনী?

৫

কি ফল গোপনি' দেহ? বরাঙ্গ প্রকাশি,
আইস, রঙ্গিণি।
দুই জনে অবিবাদে, ডাকি তারে মন-সাধে
একান্তে, অবাধে হেথা আইস মোহিনি!
কি জপে কি তপে মোরা পেতে পারি তাঁরে,
পরামর্শ দাও তুমি দুঃখিনী রাধারে।

৬

ভেব না সপত্নীভাবে ভেটিবে তোমায়
ব্রজের গোপিনী।
শ্যামপ্রেমভিখারিণী, রাধা আজি তপস্বিনী,
তপোবনে ঘৃণা লেশ নাহি লো কামিনি!
এস বোন্ দুই জনে গলাগলি করি,
কাঁদি আর ডাকি উচ্চে "শ্রীহরি! শ্রীহরি!"

৭

একি ধনি? এত করি করিনু সাধনা,
কাকুতি মিনতি,
তবুও দিলে না দেখা! নাহি করুণার রেখা
তোমার পাষাণ প্রাণে, ধিক্ লো যুবতি!
এ গিরি-কন্দরে বাস করে নির্ঝরিণী,
তোমা সম লো পাষাণি নহে সে কামিনী।

৮

তারা চারি ধারে ধনি, মরমরে পাতা,
ফুটে উঠে ফুল!
বসি অশোকের শাখে কোকিল ঝঙ্কারে ডাকে,

গুঞ্জরি গুঞ্জরি ভ্রমে ভ্রমর আকুল !
আমি এত বিষাদিনী ; হেরি করুণারে,
শুভ্র হাসি দেখা দেয় অধর-দুয়ারে।

৯

হে রঙ্গিণি, এ বিজনে কেন তুমি বাস
কর অকারণে ?
যাও যাও, হাস্তমুখে, কর গিয়া সকৌতুকে
রঙ্গ-কেলি, দম্পতির বাসর-ভবনে।
পায়ে পড়ি, ছাড়ি মোরে যাও এ বিরলে—
কেন দাও এ আহুতি বিরহ-অনলে ?

১০

কি ভুল !—চিনেছি তোমা—শূন্স উপবনে
মুখরা সরসী !
যাহা শোন, দিবারাতি,বক্ষে তাহা লও পাতি,
কথার কহ্লার আর শব্দ-কুবলয়
ফুটে তব সলিলেতে ; মরি কি বিস্ময় !

১১

কি ভুল !—চিনেছি তোমা—দিগঙ্গনা-গেহে
মুখরা আরসী !
তব পাশে কথাগুলি, মুখের ঘোমটা খুলি,
দেখে নিজ প্রতিবিম্ব ; চপলা তরুণি,
নেচে উঠ চিরকাল পর-কথা শুনি।

১২

শ্যামপ্রেম-উন্মাদিনী, আমি বিরহিণী,
ভ্রমি একাকিনী।
নগরের কোলাহলে, পরিহাস, রঙ্গচ্ছলে,
হায় আজ বিরাগিণী, আমি অনাথিনী।
তারা-শূন্স, শশি-শূন্স, যেন গো যামিনী—
তার সঙ্গে এই রঙ্গ ? ছিঃ ছিঃ প্রতিধ্বনি !

শ্যাম যেন বলে হেন বধূ নাহি গোকুলে।

১

সখি রে,
সাজাইয়া দেলো আজি বাসন্তিয়া বসনে !
কানে কদম্বের দুল,
শিরে নাগেশ্বর ফুল,
অশোকে চম্পকে দেরে উজলিয়া বরণে,
মুখর কুসুমে দেরে নূপুরিয়া চরণে !

২

সখি রে,
ঝলকিয়া অলকেরে চামেলি ও বকুলে,
উজলিয়া দেলো মোরে মোহনিয়া দুকূলে !
গলে দে মালতীমালা,
সাজাইয়া দেলো বালা
মনোহরা পারুলে ও মোতিয়ার মুকুলে !
শ্যাম যেন বলে হেন বধূ নাহি গোকুলে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কৃতজ্ঞতা।

১

"আর ত সহ্য হয় না!"

"সহ্য না করিয়া কি করিবে? উপায় কি? জান ত, পলাইবার চেষ্টা করিলে হয় প্রহার, আর নয় জেল। রামাবতার কুর্ম্মীর অবস্থা দেখিলে ত?"

"সবই জানি। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে আর এত অত্যাচার সহে না।"

"ইচ্ছা হয়, বেটাকে খুন করিয়া না হয় নিজেও মরি। সেও ভাল, তবু আর সহিতে পারি না।"

"চুপ! চুপ! জমাদার শুনিতে পাইবে।"

"জমাদারই কি না বড় সুখে আছে!"

"সুখে ত নাই; কিন্তু সে যে কয় ঘা বেত খায়, তা'র দ্বিগুণ যে আমাদের পিঠে তুলে!"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "তোমাদের আর ভাবিতে হইবে না। যাহা করিতে হয়, আমিই করিব।"

সকলে ফিরিয়া দেখিল—জয়রাম সিং। সে অল্প দিন হইল বাগানে আসিয়াছে।

কয় জন একেবারে জিজ্ঞাসিল, "কি করিবে?"

জয়রাম উত্তর করিল, "তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু যাহা করিতে হয়, কালই করিব।"

তখন রাত্রি প্রায় দশটা। আসামের একটা চা-বাগানের কুলী লাইনে দুইটা গৃহশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী খালি জমিতে বসিয়া কয় জন কুলী এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল। আশ্বিন মাস; এখনই ঘাসের উপর শিশির জমিয়াছে; বাতাস একটু শীতলস্পর্শ। মধ্যস্থলে কতকগুলা ঘুঁটে জ্বালাইয়া কুলীরা তাহা ঘিরিয়া বসিয়াছিল। তাহারা দিবসের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের পর মধ্যে মধ্যে এইরূপে একত্র বসিয়া কখন বা গান বাজনা করে, কখন বা মদ্যপান করে সুতরাং ইহাতে অপরের সহসা সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ঘুঁটের স্তূপ ধীরে ধীরে পুড়িতেছিল, আর ঈষৎপীতাভ গাঢ় ধূসর ধূমরাশি উঠিয়া বাতাসে

ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে ;—চন্দ্রকিরণে সুপ্ত বাগানের মধ্যে দূরে চা-করের বাঙ্গ্লো দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে তুই একখানা লঘু মেঘ গমনপথে অল্পক্ষণের জন্য চন্দ্রকিরণ আচ্ছাদিত করিয়া ছায়ালোক-বৈচিত্র্যে যেন প্রেতলোকের আভাষ দিয়া যাইতেছে।

কুলীরা আরও কিছুক্ষণ কি পরামর্শ করিল। শেষে কি একটা প্রস্তাব করিয়া তুই তিন জন একেবারে জয়রামকে বলিল, "কেমন এই স্থির ত? ইহাই করিবে ত?"

উৎসাহসহকারে জয়রাম বলিল, "করিব।" আর কুলীরা বলিল, "কালই?"

জয়রাম বলিল, "কালই।"

তাহার পর কুলীরা যে যাহার গৃহে প্রবেশ করিল।

২

যে দিন কুলীরা এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল, সে দিন তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চা-করের অত্যাচারের একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত অভিনীত হইয়া গিয়াছে। যাহারা নিত্য শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, কোনও অসাধারণ অত্যাচার ব্যতীত তাহারা বিচলিত হয় না ; যে নিত্য পদাঘাত সহ্য করে, পদাঘাতে তাহার আর অপমান কি?

যে বাগানের কুলীরা এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল, সেই বাগান হইতে প্রায় তুই মাইল উত্তরে আর একখানা বাগানের চা-কর 'সাহেবের' বাঙ্গ্লোয় তাঁহার এক ভগিনীও থাকিতেন। চা-করেরা অনেকে অকৃতদার ; যাহারা বিবাহিত, তাহারাও প্রায়ই বাগানে পরিবার সঙ্গে আনে না। গার্হস্থ্য-জীবনের যে সুস্নিগ্ধ প্রভাব মানুষের উগ্রতাকে অল্প করিয়া আনে, ক্রোধাদির বিষময় দংশনবিষজ্বালার প্রশমন করে, মানবের পৈশাচিক প্রবৃত্তি দূর করে, সে প্রভাবের মধ্যে থাকিয়া মানুষ সহজে মনুষ্যত্ব হারাইতে পারে না। চা-করের জীবনে সর্ব্বদা সে পবিত্র প্রভাব থাকে না।

যে বাঙ্গ্লোতে চা-করের ভগিনী থাকিতেন, চারিদিকে নিকটবর্ত্তী অনেক-গুলি চাবাগান হইতে চা-করগণ দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর সেখানে মিলিতেন। সেখানে কফি হইতে আরম্ভ করিয়া উগ্রতর পানীয় পর্য্যন্ত চলিত ; গল্প গুজব হইত। মহিলাটির যৌবনের গর্ব্ব যেমন প্রবল, গল্প গুজবের ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ ছিল। চা-করদিগের পরস্পরের মধ্যে তর্কে তিনি প্রায়ই একপক্ষ

অবলম্বন করিয়া অপরপক্ষের সহিত তর্ক করিতেন। যাঁহার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তিনি সেদিন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহে ফিরিতেন।

আমাদের বর্ণিত চাবাগানের চা-কর যে দিন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিতেন, সে দিন তাঁহার ক্রোধ প্রথমেই তাঁহার নিরীহ সহিস ও নিরীহতর অশ্বের উপর প্রকটিত হইত। সর্ব্বদা অতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে রত থাকিয়া স্বাভাবিককোমলতাহীন হৃদয়, মদ্যপানহেতু আত্মসংবরণে অসমর্থ ব্যক্তির বিরক্তি স্বভাবতঃই ক্রোধে পরিণত হয়। তাহার ফলে প্রথমে সহিস সবুট পদাঘাত সহিত,—তাহার পর টমটমের অশ্ব অনাবশ্যক প্রহারের ভাগী হইত। অশ্ব যথাসম্ভব বেগে চলিলেও তাহার নিষ্কৃতি হইত না, কশাঘাত সমান চলিত; শেষে আঘাতে অস্থির হইয়া সে উন্মত্তবৎ ছুটিত। তাহা দেখিয়া কুলীদের মধ্যে কেহ যদি বলিত,—"গাড়ী হইতে পড়িয়া অপমৃত্যুই 'সাহেবের' অদৃষ্টে লেখা আছে", তবে আর সকলে বলিত,"পিশাচের আবার অপমৃত্যু কি? মানুষ হইলে এতদিন ও বাঁচিয়া থাকিত না।" গমনের সময় পথোপরি বা পথিপার্শ্বে ছাগ, মেষ বা মানুষ যাহা পড়িত, 'সাহেবের' চাবুক অকারণে তাহাকেই লাঞ্ছিত করিত।

আজ এইরূপে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আপনার বাঙ্‌লোয় ফিরিবার সময় 'সাহেব' যখন কশাঘাতে অশ্বটিকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিলেন,তখন কুলী-লাইনের ঠিক সম্মুখে এক অন্তর্বত্নী কুলীরমণী রাস্তা পার হইতেছিল। সে তখন রাস্তার পর পারে গিয়াছে। কিন্তু 'সাহেবের' চাবুক সশব্দে তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। চাবুক খাইয়া তাড়াতাড়ি আরও সরিয়া যাইতে সে রাস্তার পার্শ্বে জলনিকাশনালায় গড়াইয়া পড়িল। 'সাহেবের' গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

কুলীরা ছুটিয়া রমণীকে তুলিতে গেল। তখন রমণী মূর্চ্ছিতা—নালার শুষ্কভূমি শোণিতে আর্দ্র, তখনও তাজা রক্তের স্রোত বহিতেছে।

ঠিক এইরূপ দুর্ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে বাগানে আর ঘটে নাই। তাই ইহাতে কুলীরা কিছু অধিক বিচলিত হইয়া পরামর্শ করিতেছিল।

৩

পর দিবস যখন বাগানের চাগাছের চিক্কণ শ্যাম পত্রের উপর হইতে রবিকর সরিয়া গেল, দূরে পর্ব্বতের চূড়ায় সমুজ্জ্বলবর্ণরাজি একে একে ম্লান হইয়া মিলাইয়া গেল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চল আবরণের মত ধরণীর উপর পড়িল, তখন জয়রাম তৈলনিষেকচিক্কণ পক্ব বংশযষ্টিখানি লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। যেখানে বাগানের আরম্ভ, সেখানে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে। সেখানে

পথের পার্শ্বেই একটা অনতিবৃহৎ ঝোপ ছিল—গোটা দুই তমালে কতকগুলা লতা উঠিয়াছে। জয়রাম যাইয়া সেই ঝোপে লুকাইয়া রহিল।

সেদিন শরতের একখানা লঘুমেঘে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ভূমি কর্দ্দমাক্ত। জয়রাম সিক্ত ভূমিতেই বসিল। পবনে সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ;—বাগানে কেবল অশ্রান্ত ঝিল্লীরব ;—আকাশে কেবল তারকার দীপ্তি। জয়রাম বসিয়া রহিল। কিয়দ্দূরে কুলী-লাইন হইতে কচিৎ বা মাদোলের ধ্বনি পবনে ভাসিয়া আসিতেছে ; কখন বা শুনা যাইতেছে,—কেহ উচ্চকণ্ঠে কাহাকেও ডাকিতেছে।

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল ; সঙ্গে সঙ্গে দুই চার-খানা লঘুমেঘেরও খেলা আরম্ভ হইল। তাহারা পবনে ভাসিয়া কখন বা চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল গোলক ঢাকিতে লাগিল,কখন বা সরিয়া সহসা স্বচ্ছান্ধকার-ব্যাপ্তা নিশাকে রজতকিরণবিধৌতা করিয়া সদ্যঃস্নাতা সুন্দরীর মত সুন্দরতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

ক্রমে দুই ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। সেই সিক্তভূমিতে একাকী বসিয়া সেই ছায়ালোকক্রীড়ামধুর সন্ধ্যায় জয়রাম ক্রমে যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল ; তাহার উৎসাহ যেন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। উৎসাহ অগ্নিশিখারই মত; তাহাতে নিরন্তর ইন্ধন না পড়িলে তাহার লোলজিহ্বা শিখা আর উদ্ধত রক্তনাগিনীর মত ঊর্দ্ধে উঠে না। উত্তেজনাজাত উৎসাহ সেই উত্তেজনার কারণের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দীভূত হইয়া আইসে। জগতের ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে অর্থদান পর্য্যন্ত সহস্র ব্যাপারে ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই সময় জয়রামের মনে একটা প্রবল সংশয় উপজিল;—এ কাযটা কি ভাল হইতেছে ? চা-কর নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গৃহের দিকে যাইবে ; সে বিপদের সম্ভাবনামাত্র কল্পনা করিবে না,—আর জয়রাম হিংস্রজন্তুর মত অতর্কিতভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে ? কেন, আর কি উপায় নাই ? চা-করের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে সত্য ; কিন্তু সে যে কার্য্য করিবে বলিয়াছে,তাহাতে আপনার জীবনের মায়া করিলে চলে না। অথচ সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, আজই সে কার্য্য করিবে। সে যতই বিচার করিতে লাগিল, তাহার নিকট গোপন-আক্রমণটা ততই নিন্দনীয় বোধ হইতে লাগিল। সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; কেবল তাহার মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কি কর্ত্তব্য ?

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। জয়রাম কোলের উপর হইতে লাঠি-

খানি মাটিতে রাখিল। সহসা দূরে অশ্বের দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। জয়রাম উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। এত রাত্রে এ পথে আর কাহার পদশব্দ ধ্বনিত হইবে? উত্তেজনায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ন্যায়ান্যায়বিচারের লূতাতন্তুজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। জয়রাম পার্শ্বস্থিত লাঠিখানি তুলিয়া লইল। অশ্বের পদশব্দ ক্রমেই নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল। জয়রাম উঠিয়া দাঁড়াইল।

অশ্বের পদশব্দ ক্রমে আরও নিকটে ধ্বনিত হইল। জয়রাম পথের পার্শ্বেই একটা বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইল;—চা-করের গাড়ী সেই স্থানে আসিলেই বাহির হইবে। তাহার শিরায় শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল, হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার নাসিকায় ও চক্ষে যেন অগ্নির ঝাঁঝ বাহির হইতে লাগিল।

গাড়ী যখন সেই ঝোপের নিকটে আসিল, তখন সহসা চন্দ্রের উপর হইতে একখানা মেঘ সরিয়া গেল। কি একটা ছায়া দেখিয়া প্রহারে ক্ষিপ্তপ্রায় অশ্ব চমকিয়া গাড়ী লইয়া পথের পার্শ্বে জল-নিকাশ-নালায় লাফাইয়া পড়িল। চা-কর গাড়ী হইতে ছিট্‌কাইয়া দূরে ভূমিতে পড়িলেন; তাঁহার টুপিটা আরও একটু দূরে পড়িল। সহিস পূর্ব্বেই লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

জয়রামের হৃদয়ে সহসা যেন তাড়িতপ্রবাহ বহিয়া গেল। সে লাঠি ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া চা-করকে তুলিল। পতিত শত্রুকে প্রহার করিবে না, এই উপদেশের ফলে পতিত শত্রুর প্রতি যে দয়া অভ্যাসবশে ক্রমে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ কেন যে তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল, সে রহস্য কে ভেদ করিবে? যেমন চিত্রকরের তুলিকাপাতে সহসা চিত্রে কোনও ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তেমনই অনেক সময় এক একটা সামান্য ঘটনায় হৃদয়ের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব লুপ্তপ্রায় সুপ্ত ভাব সহসা জাগরিত হইয়া উঠিয়া আপনার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে।

জয়রামের ও সহিসের ডাকে বাঙ্গ্‌লো হইতে ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিল। চা-কর মস্তকে গুরু আঘাতে কাতর হইয়াছিলেন; ভৃত্যগণ তাঁহাকে ধরিয়া বাঙ্গ্‌লোয় লইয়া গেল। জয়রাম কি ভাবিতে ভাবিতে কুলী-লাইনে ফিরিয়া গেল।

৪

কুলী-লাইনে যেখানে কতকগুলি কুলী জয়রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, জয়রাম সেখানে উপস্থিত হইল। কয় জন এক সঙ্গে চাপা গলায় ব্যগ্রতাসহকারে তাহাকে ফলাফল জিজ্ঞাসিল।

জয়রাম ঘটনাটা বিবৃত করিলে কুলীরা হতাশায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। এক জন বলিল, "যে কায পারিবে না, সে কায করিতে গিয়াছিলে কেন? তখন ত খুব বড়াই করিয়াছিলে!"

আর এক জন বলিল, "ওটা মেয়ে মানুষের অধম। ওর কি সাহসে কুলায়?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "হয় ত ও গোয়েন্দা। আমাদের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের কথা লইয়া 'সাহেব'কে লাগায়।"

এই কথা শুনিয়া কুলীরা পরস্পরের মুখে চাহিল। তাহাদের দৃষ্টিতে ভীতি ও বিরক্তি জাজ্জল্যমান।

তাহার পর কুলীরা দণ্ডায়মান জয়রামের পক্ষেও অশ্রুত স্বরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। জয়রাম কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিল না যে, সে পতিত শত্রুকে মারিতে পারিবে না। সে চেষ্টা করিয়াও সে কাজ করিতে পারে নাই।

কুলীরা তাহার প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

কুলীরা তাহাকে গোয়েন্দা সন্দেহ করায় জয়রামের বড় কষ্ট হইল, কষ্টে যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে আর কিছু না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর একবার শিশুর মত কাঁদিল। বড় গুমটে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে যেমন ধরণী শীতল হয়, তেমনই এই ক্রন্দনের পর তাহার হৃদয়ের ভার যেন একটু লঘু হইল,—বুকফাটা যাতনা যেন একটু সহনীয় হইয়া আসিল। তখন সে আপনার কৃত কর্ম্মের কথা ভাবিতে লাগিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, পতিত শত্রুকে প্রহার না করিয়া সে কি অন্যায় করিয়াছে? কেন অন্যান্য কুলীরা কিছুতেই সেটা বুঝিতে পারিল না!

জয়রাম ভাবিয়া ভাবিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। যেমন বন্যার জল ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে শেষে যখন নদীগর্ভ ছাপাইয়া কূলে উঠে, তখন তাহার বেগ প্রশমিত হয়,তেমনই মানসিক উদ্বেগ বা যাতনা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে যখন সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে, তখন তাহার তীব্রতম যাতনাদায়ক অবস্থার অবসান হয়। কসিতে কসিতে বীণার তার ছিন্ন হইলে তাহাতে তীব্র সুর দূরে থাক, আর কোন সুরই বাজে না।

স্নেহশীলা জননীর মত নিদ্রা ধীরে ধীরে জয়রামের চিন্তাকুঞ্চিত ভ্রূমধ্য

হইতে চিন্তার রেখা অপসারিত করিয়া দিল। জয়রাম গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

৫

পর দিবস প্রভাতে কাহার ডাকে জয়রামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জয়রাম জাগিয়া বুঝিল, বেলা হইয়াছে; বাহির হইতে জমাদার তাহাকে ডাকিতেছে। সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল।

জমাদার বলিল, "এত বেলা অবধি ঘুমাইতেছিলে! 'সাহেব' তোমাকে তলব দিয়াছেন। তোমাকে বাঙ্গ্‌লোয় যাইতে হইবে।"

জয়রাম জিজ্ঞাসিল, "কখন?"

"এই এখনই। আমি লাইন দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় তোমাকে লইয়া যাইব। প্রস্তুত হইয়া থাক।"

জমাদার চলিয়া গেল। জয়রাম ভাবিল,—আমার আবার তলব কেন?

কিছু ক্ষণ পরে লাইন দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় জমাদার জয়রামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। জমাদারের সঙ্গে জয়রাম 'সাহেবের' বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। জমাদার সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; জয়রাম মস্তক নত করিল না। একখানা আরাম-কেদারায় হাতা দুইখানির উপর পা তুলিয়া দিয়া চা-কর শয়ন করিয়াছিলেন। মস্তকে যেখানে গুরু আঘাত লাগিয়াছিল, সেখানে পটি বাঁধা। জয়রামকে দেখিয়া 'সাহেব' সর্দ্দার খানসামাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এই লোক কি কাল রাত্রে আমাকে তুলিয়াছিল?"

খানসামা উত্তর করিল, "হাঁ, হুজুর।"

পার্শ্বে এক খানা ত্রিপদের উপর এক পেয়ালা চা, একটা রিভলভার ও দশটা টাকা ছিল। চা-কর টাকা দশটা লইয়া জয়রামকে বলিল, "এই লও—তোমাকে বক্‌সিস করিলাম।"

চা-করের এই অসাধারণ বদান্যতায় জয়রামের ও খানসামা কয় জনের চক্ষে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

জয়রাম এক পদ পিছাইয়া গেল। তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—কর মুষ্টিবদ্ধ হইল। সে বলিল, "আমি কাল তোমাকে বাঁচাইতে যাই নাই; পূর্ব্বরাত্রে কুলীরমণীর প্রতি তোমার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে গিয়াছিলাম। তুমি পড়িয়া বাচিয়া গিয়াছ; আমি পতিত শত্রুর উপর হাত তুলি নাই। কিন্তু সাবধান!"

মুহূর্ত্তের জন্য চা-করের হস্ত কম্পিত হইল; টাকা দশটা মেজেয় পড়িয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া গেল। চা-কর ত্রিপদের উপর হইতে রিভলভার তুলিয়া লইলেন। তিনি "পাকড়ো" বলিতে না বলিতে জমাদার ও খানসামারা জয়রামকে ধরিয়া ফেলিল।

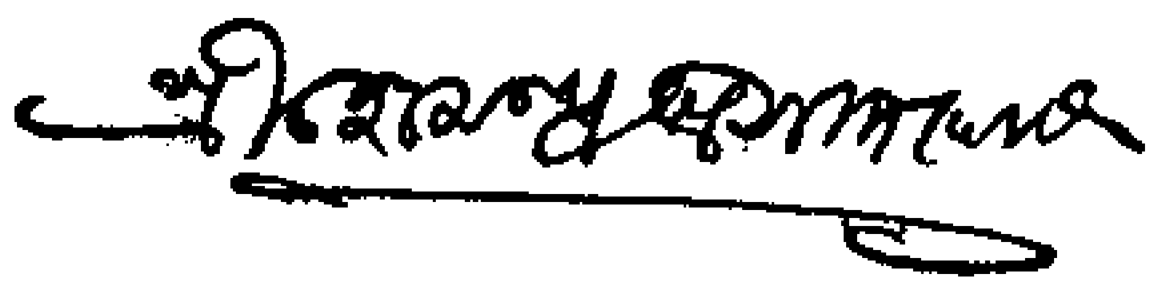
৬

সেই দিনই চা-কর পুলিশে এজাহার করিলেন, কুলী জয়রাম তাঁহার প্রাণ-নাশোদ্দেশে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—মস্তকে একবার আঘাতও করিয়াছিল;—জমাদার ও খানসামারা না ধরিলে সে তাঁহাকে হত্যা করিত।

পুলিশ চা-করের মাথায় পটিবাঁধা দেখিয়া গেল।

* * * *

তাহার পর সদরে জয়রামের বিচার হইল। জয়রাম চা-করের ব্যবহারে এমনই বিস্মিত—স্তম্ভিত হইয়াছিল যে, সে আপনার সমর্থনে একটি কথাও কহিল না। সে কাটরায় দাঁড়াইয়া যেন কি ভাবিত—আদৌ কোনও কথা কহিত না। কেবল যখন বিচারশেষে বিচারপতি তাহাকে কারাবাসের আজ্ঞা শুনাইবার পর প্রহরীরা তাহাকে কারাগারে লইয়া যায়, তখন সে একবার একটু মাথা নাড়িয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "দুনিয়াকা কোই মালিক নেই হ্যায়। সব ঝুটা হ্যায়,—সব ঝুটা হ্যায়!"



সহযোগী সাহিত্য।

শিল্প।

ভারতের শিল্পোন্নতি।

মিষ্টার বেন্‌স "সাহিত্যে"র পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতঃপূর্ব্বে একবার আমরা ভারতের শিল্পসম্বন্ধে তাঁহার রচিত একটি প্রবন্ধের সারসংগ্রহ পাঠকদিগকে উপহার

দিয়াছি।* সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডে ভারতে শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। নিম্নে তাহারই সারাংশ প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধারম্ভে প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, ভারতে শিল্পের অবস্থা না বুঝিয়া সহসা এ বিষয়ে ফয়তা দেওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক সমস্ত এসিয়া মহাদেশের মধ্যে শিল্পসম্বন্ধে ভারতের কিছু বিশেষত্ব আছে। ভারতবর্ষ জাপানের মত প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ অগ্রাহ্য করিয়াছে; কিন্তু আবার চীনের মত নিতান্ত নিশ্চলতাও অবলম্বন করে নাই। বাস্তবিক শিল্পাদিবিষয়ে জলবায়ুর প্রভাবসম্ভূত প্রভেদের কথা ছাড়িয়া দিলে বরং রুষিয়ার সহিত ভারতের প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কৃষকের দৈনন্দিন জীবনে, সহর ও আইন সম্বন্ধে তাহাদের মতে, সংসারে রমণীর স্থানসম্বন্ধীয় সংস্কার ও অন্যান্য সহস্র অভ্যাসে—দৈনন্দিনজীবনে ধর্ম্মের প্রভাবে, আপনার ক্ষেতের প্রতি আন্তরিক টানে—উভয়দেশবাসীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের শিল্পের বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে পল্লীগ্রামের বিষয়ই দেখিতে হইবে। প্রতীচ্যবাসীর নিকট শিল্পের উন্নতির কথা বলিলেই তাঁহার মানসনয়নসমক্ষে ধূমোদ্গারী, প্রাকৃতিকশোভাধ্বংসী কলের চিমনীর চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। কল কারখানা উন্নতির লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল সহরেই কলকারখানার কারবার; কাজেই অধিবাসীদিগের নয় দশমাংশেরও অধিকসংখ্যকের পক্ষে কলের ঘড়ঘড়ানি ও চিমনীর ধূম নিরর্থক। ইহার মধ্যে ভারতে অনেকগুলি কল সংস্থাপিত হইয়াছে; গতায়াতের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সংখ্যাও বাড়িবে। কিন্তু বর্ত্তমানে কলকারখানার উপর অত্যধিক আশার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা সুবুদ্ধির কর্ম্ম নহে। প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রধান অসুবিধা এই যে, ভারতে যখন কলকারখানার আরম্ভ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তখন কলকারখানা পুরাতন জিনিস; সে সব দেশের লোক কলের ব্যবহারবিশারদ—নানা রূপে জিনিসের ব্যবহারনিপুণ, অধিকন্তু তাহারা তখন বাজারে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত ভারতে ভৌগোলিক ও সামাজিক বিঘ্নও অতিক্রম করা আবশ্যক। ভারতে কলকারখানা দেশজ নহে—আমদানী করা; দেশজ উন্নতির কথা বুঝিতে হইলে পল্লীগ্রামে যাইতে হইবে। যত দূর জানা যায়, তাহাতে বহুকাল হইতেই ভারতে বিবিধ ধাতুর সদ্ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দেশের লোকের প্রধান লক্ষ্য কৃষি কার্য্য। বাস্তবিক কৃষিকার্য্যের এরূপ বিস্তার ও বৈচিত্র্য অন্যত্র লক্ষিত হয় না। যথার্থই ভারতবর্ষে বার আনা লোকের ভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভূমিসম্পত্তিই লোকের উচ্চাভিলাষের শেষ সীমা। গ্রাম্যসমিতিতেও এই ভূমি সম্পত্তির কথা—আর সব তাহার আবশ্যক সহায় বা সহচরমাত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষম ভ্রম, সে ভ্রমের পর হইতে ভূমিতে কৃষকের অধিকার দৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষ কৃষকের দেশ; রাজস্বের অধিকাংশ কৃষক কর্ত্তৃক প্রদত্ত। যে মালের রপ্তানী হয়, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রজ; যে মালের আমদানী হয়, তাহাও প্রধানতঃ

অবস্থা।

ভূমি।

---

* ১৩০৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায় সহযোগী সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

কৃষকের উপর নির্ভর করে। কৃষকের মতেই বিবিধ বস্তুর নির্ম্মাণ। কৃষকের কথাতেই বুঝা যাইবে, বৃটিশশাসনের ফল স্থায়ী হইবে কি শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে। কাজেই ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে পল্লীবাসীর রুচি ও আবশ্যকতাই প্রধান উপাদান। পল্লীবাসীর আবশ্যক বস্তুর আদর্শেও বিস্তার ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতেছে। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনায় তাহা লক্ষিত হইবে। ইংরাজ রাজত্বে শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান—ধন সম্পদ নিরাপদ। তাই সমাজেও পরিবর্ত্তনের প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের লোক গ্রামের গণ্ডীর বাহিরে যাইতেছে, শ্রমজীবী স্থানান্তরে যায়, কৃষক মহাজনের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার ফসল আপনি বিক্রয় করিতে পারে। নিম্নবর্ণের পক্ষে উচ্চব্যবসায়াবলম্বন চলিত হইয়াছে; বাস্তবিক বর্ণবিভাগ অবলম্বিত ব্যবসায়ের নিম্ন সীমার নির্দ্দেশ করে—উচ্চসীমা-রেখা বিলুপ্ত। লেখাপড়ারও উন্নতি হইতেছে। দেশে পরিবর্ত্তনের পক্ষে সহরের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক অধিবাসীর প্রভাবও যথেষ্ট লক্ষিত হইবে। কারিগরদিগের পক্ষে এখন অনেক সুযোগ সহজে অধিগম্য। ব্যবসায়ীদিগের ত কথাই নাই; বৃটনের নৌবাহিত বাণিজ্যের আধিক্য অসাধারণ, তাই "শতমুখে বাণিজ্যের স্রোত আনি ঢালে"—সহরের ব্যবসাদারেরা সেই স্রোতোবারিপুষ্ট; তাহাদেরই উদ্যমে আজ ভারতবর্ষে অতি দরিদ্রের ঘরেও মৃৎপাত্র ব্যতীত আর প্রায় সকল ব্যবহার্য্যই বিদেশী! এখন কথা, ভারতে এই শিল্পোন্নতি কোন্ পথে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য? বর্ত্তমানে যে প্রণালী অনুসৃত, তাহাতে, যাহা হইতেছে তাহাই হউক বলিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কলের প্রাদুর্ভাবে যেমন শ্রমবিভাগ হইয়াছে, কোন রাজনৈতিক বাধা ব্যতীত অনাহত নৌবাহিত বাণিজ্যে তেমনই বাণিজ্যের বিভাগ সাধিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে, ভারতে সস্তা মালেরই কাটতি অধিক। আবার ভারতের লোক কৃষিপ্রিয়, তাই কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা অমনই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে কৃষক বা ব্যবসাদার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইত না। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। দারুণ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও ভারতের জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। ব্রহ্ম ও আর কয়টি স্থান ব্যতীত অন্যত্র অন্ন লোকের দৈনন্দিন আহার্য্য নহে, কাযেই সে সকল স্থান হইতে যে চাউল রপ্তানি হয়, তাহাতে দেশের লোকের আহার্য্যের অভাব হয় না। পক্ষান্তরে আবার ভারতবাসীরা প্রধানতঃ যাহা আহার করে, বিদেশে তাহার উপযুক্ত চাষ নাই; কাজেই দুর্ভিক্ষকালে অন্য স্থান হইতে তাহা আনাইয়া ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর করিবার উপায় নাই। কাযেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য পতিত জমী উঠিত করিতে হইবে—আর যদি জমী পতিত না থাকে, তবে যে জমীর যে অংশে রপ্তানীর জন্য শস্য উৎপন্ন করা হয়—তাহারই কতকাংশে দেশের লোকের জন্য তাহাদের ব্যবহার্য্য শস্যের চাষ করিতে হইবে;—"চাচা আপনা বাঁচা।" কোন স্থানের জনসংখ্যা দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এখন দেশে আহার্য্যের পরিমাণবৃদ্ধি আবশ্যক হইতেছে। এই বৃদ্ধি যেমন অনিশ্চিত, বিদেশের সহিত ব্যবসায়েও তেমনই নিশ্চয়তার অভাব হইতে পারে। জগতের জলপথে ইংলণ্ডের প্রাধান্য অব্যাহত থাকাতেই ভারতের এই বাণিজ্য উদ্ভূত হইয়াছে। সে প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইলে এই বাণিজ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

পরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বে যাহা বিলাসসামগ্রী ছিল, এখন তাহা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তখন সে সকল দুষ্প্রাপ্য হইবে।

তবেই দেখা যাইতেছে, দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন ও দেশের যে অংশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়, সে অংশে দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে পরিবর্ত্তন যেমন আবশ্যক, কৃষি ব্যতীত অন্য কার্য্যে দেশের লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করাও তেমনই আবশ্যক। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, দেশের কৃষিকার্য্যে অনুসৃত প্রণালীর আমূল সংস্কার আবশ্যক, অংশবিশেষের সংস্কার নিষ্ফল হইবে। আশার কথা এই যে, দেশের কৃষক একান্ত রক্ষণশীল নহে, অবস্থায় কুলাইলে সে পরিবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ নহে। * আবার দেশের অনেক লোক যে এখন বার্ষিক ফসলের উপর নির্ভর করে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করা সহজসাধ্য সাধন নহে। কেবল গভর্মেণ্টের চেষ্টায় (অর্থাৎ সমাজের বাহির হইতে আগত চেষ্টায়) তাহা সহজে সম্পন্ন হইবার নহে; সমাজের মধ্যে সে স্পৃহার উদ্ভব হওয়া আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ চেষ্টা নহিলে হইবে না। কেহ কেহ ভারতের বিলুপ্ত বা বিলোপোন্মুখ শিল্পের উদ্ধারসাধনের কথা বলেন। প্রস্তাব সাধু হইলেও সে নিতান্ত অসাধ্য সাধন। দেশের যে অবস্থায় সে সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, সে অবস্থা আর নাই; কাজেই তাহাদের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। সেকালে মোগল বা রাজপুত রাজার আদরে পালিত শিল্প এখন আর উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত।

উপায় কি?

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল মাল সহজ অবস্থায় অর্থাৎ raw অবস্থায় বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, সেগুলি বিদেশে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতেই ব্যবহারোপযোগী সংস্কৃত অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে কি না, সে বিষয় বিবেচ্য। ভারতে কাপড়ের কলগুলি প্রায়ই ভারতবাসীর; অন্য কল প্রায়ই বিদেশীয়দিগের। কাযেই শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক ব্যতীত দেশে আর কিছুই থাকে না; সব বিদেশে যায়। চা, তামাক, চট্, সবই বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতের তুলার ব্যবসায় আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহজাত—ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে রুষিয়ার শোণের আমদানী বন্ধ হওয়াতে বঙ্গদেশে পাটের চাষের আরম্ভ হয়। এখন তুলার চাষ ও পাটের চাষ চলিতেছে। আমরা যে সব দ্রব্যজাতের কথা বলিতেছি, তাহা প্রধানতঃ বিদেশে ব্যবহৃত; কেবল দেশী কলের কাপড় দেশেও ব্যবহৃত হয়। ভারতে চামড়ার ব্যবসায়ে উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয়, এ ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর চামড়া রপ্তানী হয়; কিন্তু সেই চামড়া সুসংস্কৃত অবস্থায় প্রেরিত হয় না, কেবল নষ্ট না হয়, এইরূপ করিয়া চালান দেওয়া হয়। উত্তরভারতে ইংরাজের কারখানায় চামড়া পরিষ্কার করা হইতেছে; সুখের বিষয়, বোম্বাইবিভাগে এক জন পার্শী তাঁহার পুত্রকে যুরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কারখানা চালাইতেছেন। বর্ণবিভাগের জন্য চর্ম্মকারগণের পক্ষে অন্য কোন ব্যবসায় লিপ্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে; কাযেই চামড়ার ব্যবসায়ের উন্নতিতে তাহাদের যে মহদুপ-

ব্যবসায় উন্নতি।

---

* Famine commissionও ঠিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।—লেখক।

কার সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। উত্তর-ভারতে এখন মোটা পশমী কাপড়ও প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয়, চেষ্টা করিলে এইরূপ আরও ব্যবসায় চলিতে পারে।

এখন নানা দেশ হইতে ভারতে জিনিসের আমদানি হয়। বিদেশী জিনিসের পরিবর্ত্তে দেশী জিনিসের চলন সম্ভব কি না, তাহা বিবেচ্য। প্রবন্ধকারের মতে, ভারতে কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক, এখন শিল্পজাতের উৎপাদনে আরও লোক আসিলেই মঙ্গল। এখন কথা, দেশীয় মালে জিনিস প্রস্তুত করিবে, বা বিদেশ হইতে আমদানী অবিকৃত মালে জিনিস গড়িবে ; কিসে দেশীয়গণ অধিক কাজ পাইবে? মোটা কথায় বলা যাইতে পারে—জিনিষ যাহাতে সস্তা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত যে, যে সব দ্রব্য বহুদিন হইতে সংসারে ব্যবহৃত, সে সকলের সম্বন্ধে লোক কেবল দরই দেখে না, মালটা কেমন, তাহাও দেখে। উত্তর-ভারতের চাষা দেশী মোটা চাদর ছাড়িয়া কখনই কলের মিহি 'লং-ক্লথ' ব্যবহার করিবে না ; দেশীয় তন্তুবায় এখন বিদেশ হইতে আমদানী সরু সূতা যথেষ্ট ক্রয় করে। আবার লোহের পাত বিদেশ হইতে আসিলেও গৃহব্যবহার্য্য লোহপাত্র প্রধানতঃ ভারতেই প্রস্তুত হয়। কাচের চুড়ী ব্যতীত আর সব অলঙ্কারও দেশজ। মূল্যের তফাৎ অধিক না হইলে লোকে টেঁকসই জিনিস লইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেশী কারিকর দেশী লোকের রুচির ও পছন্দের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—সে ঠিক পছন্দসই জিনিষ করিতে পারিবে। তবে কথা এই, কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হাতের কায ক্রমেই পিছু হটিতেছে। কাজেই এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য—ভারতে কলের সংখ্যা বাড়াইলে কি হয়? তাহাতে অন্তরায় কি? ভারতে যে সব কল চলিবে, সেগুলি বিদেশ হইতে আনিতে হইবে ; দূরপথ হইলে কয়লা আনিতে হইবে—আবার জলবায়ুর জন্য পাশ্চাত্যদেশে যাহা সম্ভব, ভারতবর্ষে তাহার সবই সম্ভব হইবে না। ইহার প্রতিকূলে বলা যাইতে পারে, ভারতে যে সব কল স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলি চলিতেছে ; শ্রমজীবীরা সহিষ্ণু, শিষ্ট, শ্রমশীল,—মালসরবরাহের ভাবনা নাই। আবার কলকারখানা—রেলওয়ের মত বর্ণবিভাগের কঠোরতা দূর করে, লোককে একই উদ্দেশ্যের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করায়। পারিশ্রমিক সমানই পড়িবে ; কারণ, প্রতীচ্যে শ্রমজীবী অধিক কাজ করিতে পারে। এখন ভারতে যত অধিক কল কারখানা হইবে, নিত্যবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যার ততই সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে যাহারা কৃষিকার্য্য করিতে পারে না, তাহারা কলে কাজ করে ; যে কৃষকের ক্ষেত্রজাত পরিবারপ্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, সেও যখন ক্ষেত্রের কাজ না থাকে, তখন কারখানায় কায করিতে আসিয়া থাকে। ভারতে কলের প্রভাবে সহরে ব্যবসা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও নূতন বাণিজ্যকেন্দ্র উদ্ভূত হয় নাই। যে সব কল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়ের ; কাজেই শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক ব্যতীত লাভের কড়ি দেশে থাকে না। ভারতবাসীরা এ বিষয়ে অবহিত না হইলে উন্নতির আশা নাই। ভারতে কোন কোন সম্প্রদায় বংশপরম্পরাগত দায়াধিকারসূত্রে ব্যবসায়ে বিশেষ পটুতালাভ করিয়াছে ; কিন্তু তাহারা এখনও মূলধন একত্র করিয়া কারবার করিতে শিখে নাই। সে শিক্ষা এখন ক্রমে সমাজে প্রবেশ করিতেছে। এখন ভারতবর্ষের লোকে বুঝিতে পারিতেছে যে, সার যেমন

গাদা করিয়া রাখিলে লাভ নাই—ভূমিতে ছড়াইয়া দিলেই লাভ, তেমনই অর্থ জমাইয়া রাখা নিষ্ফল—ব্যবসায়ে খাটাইলেই লাভ। বাস্তবিক দেশীয়ের অর্থে কল কারবার না চালাইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না; কারণ, তাহা না হইলে শ্রমজীবীর সামান্য পারিশ্রমিক ব্যতীত আর সব অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইবে।

ভারতের পল্লীগ্রামের কারিগরদিগের কার্য্যে কোন অতর্কিত উৎকট পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। তাহা না করাই কর্ত্তব্য। প্রচলিত প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাই ভিন্ন দেশে ইংরাজশাসনের সাফল্যের কারণ। সুদূর পল্লীতে বহুকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত কারিকরগণ বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে; সহসা তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন বিজ্ঞজনোচিত হইবে না। আবার বর্ণবিভাগে এই একটা সুবিধা যে, বংশপরম্পরায় একই ব্যবসায় অবলম্বিত হওয়ায় ব্যবসায় শিখিবার লোকের অভাব হয় না—শিক্ষাপ্রার্থীরা শিল্পচতুর, সহিষ্ণু ও ব্যবসায়ে একান্ত অবহিত হয়। এখন কথা, ইহাদের মধ্যে উন্নতির সূত্রপাত করিতে হইলে কেবল উপদেশে হইবে না, যাহাতে তাহারা ঘরে বসিয়া অভিনব উন্নত উপায় শিখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রচলিত আর্ট-স্কুলে এ কায হয় না। কারণ, সে সব স্কুলে যে সব বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সে সব দেশের জনসাধারণের জন্য নহে। অথচ জনসাধারণের কৃত দ্রব্যাদিতেই পূর্ব্বে ভারতের গৌরব ছিল! বর্ত্তমান শিল্পশিক্ষার দোষ এই যে, ইহাতে ছাত্রগণ যেটুকু শিখে, তাহাতেই দক্ষ হয়—অন্য কোন কাযে সে দক্ষতা খাটাইতে পারে না; শিল্পচাতুরী বুদ্ধিবলে ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না।

ভারতে কেবল গভর্মেণ্টের সহায়তায় কোনও পরিবর্ত্তনসাধন সহজ নহে। কারণ, ভারত-বাসীরা অর্দ্ধসভ্যমাত্র নহে যে, সহজেই বিদেশীয় প্রথার অবলম্বন করিবে। তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা বহুশতাব্দী ধরিয়া বিজাতীয় রাজনৈতিক প্রাধান্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও টিঁকিয়া আছে। তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, তাহা তদ্দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী;—সমাজশরীরে শত দিকে তাহার শত মূল প্রসারিত। বিদেশী প্রথার প্রতি অবিশ্বাসই ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; এরূপ স্থলে সমাজ হইতে উৎপন্ন ও সমাজের রসপুষ্ট না হইলে কোনও পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করা সহজসাধ্য নহে।

এখন ধীরে ধীরে ভারতবাসীকে নূতন শিক্ষার নূতন প্রণালীর উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। অভাবনিবারণের উপায় যত সহজ হইবে, অভাবেরও ততই বৃদ্ধি হইবে। ভারতবাসী দরিদ্র, কিন্তু বর্ণবিভাগে ও আদর্শের প্রভাবে তাহার উচ্চাভিলাষ সীমাবদ্ধ; কাযেই সে আপনার দারিদ্র্য তেমন দুর্ব্বহ বিবেচনা করে না। যাহা হউক, এখন রেলের কল্যাণে দেশ-ভ্রমণ সহজসাধ্য ও সুলভ হইয়াছে; লোকে দেশ বিদেশে যায়, দেশবিদেশের বিষয় অবগত হয়, সহর দেখে। আবার ইংরাজের আদালতে ও ইংরাজের রেলগাড়ীতে সকলেই সমান, ব্রাহ্মণে শূদ্রে প্রভেদ নাই। ইহাতে বর্ণবিভাগের কঠোরতার হ্রাস হইতেছে ও হইবে।

প্রবন্ধকার মনে করেন, এই সকল প্রভাবের ফলে ক্রমে ভারতের শিল্পের যে উন্নতি হইবে, তাহা দেশের লোকের পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী হইবে। বিদেশের সহস্র চেষ্টায় সেরূপ স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা।

আরেশ্-ই-মাহাফিল্ নামক উর্দ্দু গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালা দেশের বিবরণ লিখিত হইল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌবাসী শের আলি জাফর নামক এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ্ নামক পারস্য পুস্তক হইতে অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার বিবরণ।

জাহাঙ্গীর নগর।—জাহাঙ্গীর নগর ঢাকার নামান্তর। জাহাঙ্গীর নগর অতি সুন্দর লোকপূর্ণ সহর। ইহার উপনগরগুলিও সুন্দর। এই নগরে সকল সময়ে নানা দেশের নানা দ্রব্য পাওয়া যায়। এই নগরে নানা-জাতীয় লোক বাস করে। ইহার আদি নাম বঙ্গ। তাহাতে আল-শব্দের যোগ হইয়াছে। আল শব্দের অর্থ বৃহৎ বাঁধ। উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রসমূহ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বে এই বাঁধ নির্ম্মিত হইত। পূর্ব্বে যে সকল জমিদার পর্ব্বতপার্শ্বস্থ নিম্নভূমিতে বাস করিত, তাহারা দশ হাত উচ্চ ও আট হাত প্রশস্ত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বাসগৃহ প্রস্তুত করিত। তাহাদের শস্যক্ষেত্রও বাঁধের উপর থাকিত। এই জন্য এই দেশের নাম বাঙ্গালা হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে শীত ও গ্রীষ্ম বড় অধিক ছিল না। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন এ দেশে গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়াছে। গত বৎসরের গ্রীষ্মে অনেক মনুষ্য ও ইতর প্রাণী মারা গিয়াছে। শীত এত অল্প যে, সামান্য চাদর গায়ে দিয়া থাকিলেও বিশেষ কষ্ট হয় না। শীতকালে অত্যন্ত কোয়াসা হয় ও আকাশ প্রায় ধূমে আচ্ছন্ন থাকে; অনেকক্ষণ পরে সূর্য্য দৃষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠমাস হইতে কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত বর্ষা থাকে। এত প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয় যে, প্রত্যেক প্রকারের এক একটি লইয়া ব্যাগে ভরিলেও ব্যাগ পূর্ণ হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে তিনবার ধান্য উৎপন্ন হয়। ধানের গাছ কখন কখন পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাত লম্বা হইয়া থাকে। জল যত বাড়িতে থাকে, ধানের গাছও তত বাড়িতে থাকে। অধিবাসিগণ শান্তস্বভাব। বৎসরের অষ্টমমাসে তাহারা খাজনা শোধ করিয়া দেয়। এ দেশের অধিকাংশ গৃহে খড়ের ছাউনি। অনেকের ঘর অতি

সুন্দর। কোন কোন গৃহের নির্ম্মাণে চারি পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইয়া থাকে। ঘরের চারি দিকে বাঁশের টাটী দিয়া থাকে। ইটের দেওয়াল এ দেশে টেঁকে না। যাহাদের প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহারাও পাকাঘর প্রস্তুত করে না। এ দেশের গ্রামগুলি বৃক্ষপরিবেষ্টিত। এখানকার শীতলপাটী, মহম্মুদি চাদনি (এক প্রকার শ্বেতবস্ত্র) অপেক্ষাও উত্তম।

দেশের উৎপন্ন প্রভৃতি।—মাছ, ভাত, দই, লাল লঙ্কা, শাকসব্‌জি এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য। দেশের কোন কোন অংশে লবণ দুষ্প্রাপ্য। এখানকার লোকে গম যবের রুটি, মুরগীর মাংস ও ঘি খাইতে ভালবাসে না। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতিন-গ্রন্থকার বলেন যে, ঐ সকল বস্তু উহাদের পরিপাক হয় না। এখানকার লোকের পোষাক পরিচ্ছদ ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে একপ্রকার। ইহারা ধুতি চাদর ব্যবহার করে, মস্তক অনাবৃত রাখে। খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ-গ্রন্থকার বলেন যে, এ দেশের স্ত্রী পুরুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে, কোনরূপ বস্ত্রপরিধান করে না। বোধ হয়, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রপরিধান করা বলে, এ দেশের লোকে সেরূপ করে না। তিনি বলেন, স্ত্রীলোকেরাই ঘরের বাহিরের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। হয় ত, তাঁহার সময়ে ঐরূপ রীতি ছিল। স্ত্রীলোকেরা কেবল একখানি শাড়ী পরিধান করে, মস্তক অনাবৃত রাখে; ইহারা জুতা পায় দেয় না। নৌকা দ্বারাই লোকের গমনাগমন সম্পন্ন হয়। নদীর ঘাটে সকল সময়ই ছোট বড় নানারূপ নৌকা পাওয়া যায়। দেশের সর্ব্বত্রই নৌকায় যাতায়াত করা যায়। শীত ও গ্রীষ্মকালে গরুর গাড়ী, চৌপাল ও পালকী পাওয়া যায়। ভাল ঘোড়ার দাম বড় বেশী। হস্তী বিস্তর। অন্য দেশ হইতে এ দেশে মণিমুক্তা আসিয়া থাকে। আঙ্গুর ব্যতীত নানাজাতীয় ফল প্রচুরপরিমাণে জন্মে। আম, কলা, আনারস এ দেশে যেমন জন্মে, ভারতবর্ষের আর কোথাও তেমন জন্মে না। ফুল নানাপ্রকার; তন্মধ্যে কেওড়া (কেতকী) ও মাধোলতা (মাধবীলতা) প্রধান। স্থানবিশেষে আদা ও গোলমরীচ জন্মে। পান অপর্য্যাপ্ত। রেশম প্রচুর। এ দেশে এমন সুন্দর রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত হয় যে, তেমন আর কুত্রাপি হয় না। এমন সুন্দর নানাবিধ শ্বেতবস্ত্র নির্ম্মিত হয় যে, অন্য দেশের কারিগরেরা জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও তাহার একখানি নির্ম্মাণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে এ দেশের [illegible] উপহার দিবার জন্য ও

বণিকেরা ভিন্নদেশে বিক্রয়ের জন্য এই সকল বস্ত্র প্রচুরপরিমাণে ক্রয় করিত। বাঙ্গালার নাজিম, সম্রাটকে উপহার দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে চেক্ পাগড়ি ক্রয় করিতেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সময় হইতে সে প্রথা রহিত হইয়াছে। বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সম্রাট্‌দরবারে রাজস্ব দেয় না। উহারা অহঙ্কারের প্রতিফলও পাইতেছে।

লক্ষৌতী (গৌড়)।—একটি প্রাচীন নগর। বাঙ্গালার প্রান্তসীমায় কুচনামক নগর আছে। এই নগরের নিকটবর্ত্তি-প্রদেশ-বাসী কোনও ব্যক্তি বাঙ্গালা ও বিহার জয় করিয়া লক্ষৌতীর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তথায় আপনার রাজধানী স্থাপিত করেন। এই নগর দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। তদনন্তর টাণ্ডা, জাহাঙ্গীরনগর ও মুর্শিদাবাদ ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। হুমাউন বাদশাহ যখন এই নগরে আগমন করেন, তখন ইহার মনোহর জলবায়ুতে প্রীতিলাভ করিয়া ইহার নাম জেন্নাতাবাদ (স্বর্গীয় নগর) রাখেন। এখন এই নগর নষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সহস্র সহস্র বন্য জন্তু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখন কেবল দুর্গের দরজা ও সোনা মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন ইহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না।

যেখানে সহস্র ছিল রম্য উপবন,
ফুটে না একটি ফুল সেখানে এখন।
যে নগরে ছিল পূর্ব্বে রাজসিংহাসন,
সেখানে ভিক্ষুক এবে না করে শয়ন।
নিষ্ঠুর কালের দংষ্ট্রা করিছে দংশন।
হায়রে গউড় (গৌড়) এবে শ্মশান বিজন!

লক্ষৌতীর পূর্ব্ব দিকে চট্টভট্ট নামক ঝিল্। বর্ষাকালে তাহার জল হইতে নগররক্ষার জন্য নগরের পূর্ব্ব দিকে একটি সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। নগরের পূর্ণ উন্নতির সময়ে ইহার মধ্যে কোনরূপে জল প্রবেশ করিতে পারিত না। ঝিলের সর্ব্বত্র নৌকা চলে। নগরের এক ক্রোশ অন্তরে একটি পুরাতন বাটী ছিল। উহার অভ্যন্তরে পিয়াজবাড়ী দীঘী নামক একটি পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীটি আজিও রহিয়াছে। এই দীঘীর জল এত জঘন্য ছিল যে, কেহ তাহা পান করিলে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। কয়েদীদিগকে এই জল পান করিতে হইত। আকবর শাহ এই প্রথা রহিত করেন।

মুর্শিদাবাদ।—ভাগীরথীতীরস্থ পুরাতন নগর। মুকস্সুদ্ খাঁ নামক কোন বণিক্ ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে সরাই নির্ম্মাণ করিয়া নিজের নামানুসারে তাহার নাম মুকস্সুদাবাদ রাখেন। যখন মহম্মদ আলমগির জাফর খাঁ নাসিরিকে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন, তখন তিনি এখানে রাজধানী স্থাপিত করেন। তদবধি, মুকস্সুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ হইয়াছে। আলমগির, জাফর খাঁকে মুর্শীদ কুলী খাঁ বলিতেন। ইহার দৈর্ঘ্য চারি ক্রোশের কিছু অধিক। এখানকার বুটাদার চেলী ও শাড়ী বিশেষ প্রসিদ্ধ। নগরটি মোটের উপর মন্দ নয়। মতি ঝিল উত্তম দালান, কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বাড়ী এখনও দাঁড়াইয়া আছে। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ দিল্লী নষ্ট হইলে সেখানকার অনেক লোক মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিয়াছে ; তজ্জন্য এখানকার ভাষা ভাল। নগরটি ভাগীরথীর জলসীমা হইতে নিম্ন। আকবরপুরের ঝিল হইতে নগররক্ষার জন্য একটি সুদৃঢ় বাঁধ আছে। নবাব মজঃফরজঙ্গের সময় একবার ভগবান্‌গোলার নিকট বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নবাব-বাড়ীর অনেক দালানে জল প্রবেশ করিয়াছিল। নবাব মহাবৎ জঙ্গের রাজত্বকালেও একবার নগরটি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

হুগলী ও সাতগাঁ বন্দর।—পরস্পর অর্দ্ধক্রোশ অন্তর। সাতগাঁ প্রকাণ্ড নগর, অসংখ্য অট্টালিকায় পূর্ণ। সমুদ্র-বন্যায় সাতগাঁ নষ্ট হইলে হুগলীর উন্নতি হইতে থাকে। এখানকার শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালার নবাব জাফরখাঁর সম্মান রাখিতেন না। তজ্জন্য জাফর খাঁ চেষ্টা করিয়া সম্রাটের দরবার হইতে এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। জাফর খাঁর বিচক্ষণতায় এই স্থানের প্রচুর উন্নতি হয়। ইউরোপ, ইরাণ, তুরাণ, চীন, আরব ও পারস্যের অনেক বণিক এখানে আসিয়া বাণিজ্যাগার স্থাপন করে। মোগলেরা ইউরোপীয়দিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিত না, তবে বাণিজ্যাগারস্থাপন নিষিদ্ধ ছিল না। এই নগরের শাসনকর্ত্তা অত্যাচার আরম্ভ করিলে লোকে কলিকাতায় পলাইয়া যায় ; তদবধি কলিকাতার উন্নতি হইতে থাকে।

কলিকাতা।—পূর্ব্বে সামান্য নগর ছিল। এখানে কালীদেবীর মন্দির আছে। কালীকত্তা শব্দ হইতে কলিকাতা নামের উদ্ভব হইয়াছে। জাফর খাঁর সময় পর্য্যন্ত হুগলীতে কোম্পানীর মালগুদাম ছিল। উহা গোলঘাটের সম্মুখ ও মোগলপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে ইংরেজেরা

ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ মাটী বসিয়া যাইতে লাগিল। প্রধান প্রধান লোক অতিকষ্টে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত জিনিসপত্র ও পশু জলমগ্ন হইল। অনেক মানুষও মারা গেল। এই ঘটনার পর জব চার্ণক বানারসি বাগান ক্রয় করিয়া তথায় দোতালা ও তেতালা কয়েকটি গৃহনির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন। দেওয়াল ও একতালা নির্ম্মিত হইলে এখানকার সম্ভ্রান্ত লোকেরা, বিশেষতঃ মোগল বণিকেরা, ফৌজদার মীর নাসিরকে বলিলেন যে, 'এই সকল বিদেশীয় লোক দোতালা তেতালায় চড়িয়া আমাদিগের অন্তঃপুরিকাগণকে দেখিবে। তাহা হইলে আমাদের সম্মানের লাঘব হইবে।' ফৌজদার নবাবকে জানাইলে, নবাজ ইংরেজ-দিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। ফৌজদারের ভয়ে কোন রাজমিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রী ইংরেজদের কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। চার্ণকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। চার্ণক মোগলবণিকদিগের সহ বিবাদ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু ফৌজদারকে তাহাদের পক্ষাবলম্বী দেখিয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। চার্ণক নিতান্ত ক্ষুব্ধহৃদয়ে নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় আগুন লাগাইয়া সমুদ্রাভিমুখে জাহাজ ভাসাইয়া দিলেন।

এই সময়ে সম্রাট্ আরঙ্গীব আপনার সুবিপুল বাহিনী সঙ্গে দক্ষিণাপথ-জয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। শত্রুগণ তাঁহার আসার প্রসার বন্ধ করিলে সম্রাট্-শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে কর্ণাটপ্রদেশস্থ ইংরেজেরা কতকগুলি জাহাজ পূর্ণ করিয়া শস্য আনয়ন পূর্ব্বক সম্রাটকে দান করে। সম্রাট ইংরেজজাতির প্রতি ইহাতে এত দূর প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তাহাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখিলেন না। ইংরেজেরা বঙ্গদেশে গুদাম-নির্ম্মাণের অধিকার পাইল। জব চার্ণক, বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বহুমূল্য উপহার সহ নবাবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাব আপনার পূর্ব্ব নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার করিলেন। এইরূপে প্রথমে এখানে যে গুদাম নির্ম্মিত হয়, তাহাই পুরাতন কেল্লা।

কলিকাতার অনেক দালান, চীন ও ইস্পাহানের দালান অপেক্ষাও সুন্দর। প্রত্যেক গবর্ণর ইহার উন্নতিকল্পে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। লর্ড ওয়েলেস্লির আমলে নগরের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তাঁহার সময়ে এখানকার রাজবাটী নির্ম্মিত হয়। কলিকাতায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও কার্ত্তিক পূজা ধুমধামের সহিত সম্পাদিত হয়। লোকে দুর্গাপূজায় বিস্তর টাকা উড়ায়।

কেহ কেহ মুসলমান, ইংরেজ, পর্ত্তুগিজ ও আর্ম্মেনিয়ানদিগকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, নৃত্যগীত দর্শন শ্রবণ করিয়া ও আতর পান পাইয়া পরিতোষলাভ করিয়া থাকেন।

চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গা।—কলিকাতা হইতে বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র সহর। এখানে ফরাসীদের একটি বাণিজ্যাগার আছে। এখানকার যাবদীয় কার্য্য ফরাসীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়; ইংরেজেরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। অনেক দিন ধরিয়া ইংরেজ ফরাসীতে বিবাদ চলিয়াছিল। একবার ইংরেজরা এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহা ফরাসীদেরই সম্পূর্ণ অধিকৃত।

চুঁচুড়া।—হুগলীর এক ক্রোশ দক্ষিণে। ইহা ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। ইহারা ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়াছিল বলিয়া একবার ইংরেজেরা এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

শিবরামপুর।—ভাগীরথীর অপর তীরে কলিকাতা হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে স্থিত। এই নগর দিনেমারদিগের অধিকৃত।

আচানক।—ইহা কলিকাতারই অন্তর্গত। লর্ড ওয়েলস্‌লি এখানে সুন্দর রাজবাটী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। এই উদ্যানের পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। নাস্তিক ও পৌত্তলিকেরাও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারে না।

সিলেট্।—একটি পার্ব্বত্য নগর। এখানকার গণ্ডারচর্ম্মের ঢালের ন্যায় সুন্দর ঢাল ভারতবর্ষের কোন স্থানে প্রস্তুত হয় না। এখানকার কমলা লেবু অতি প্রসিদ্ধ। পাহাড়ে অনেক মুসব্বর গাছ জন্মে।

রঙ্গপুর।—এখানে অপর্য্যাপ্ত রেশম জন্মে। এখানকার লট্‌কন ফল প্রসিদ্ধ তাহাতে তিনটি করিয়া বীচি থাকে। এখানকার লোকে পাহাড় হইতে ছোট ছোট ঘোড়া ধরিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। ক্রেতারা তাহা আবার অন্যদেশে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে।

বগুলা।—সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি নগর। এখানে একটি দুর্গ আছে। আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিংশ বর্ষে একদিন শেষ বেলায় একটি ভয়ঙ্কর বন্যা উপস্থিত হয়; তাহাতে এই স্থান জলমগ্ন হয়। সেই সময়ে আকাশে ভয়ঙ্কর ঘনঘটা হইয়াছিল। আকাশের মাপের বিদ্যুৎ বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল। এই ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ মনুষ্যের প্রাণাত্যয় ঘটে। রাজা

অতি কষ্টে পলায়ন করেন। এই জলপ্লাবন ও ঝটিকা পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল।

কামরূপ।—কামরূপের রমণীগণ বড় সুন্দরী ও সঙ্গীতনিপুণ। তাহারা বলে, 'আমরা লোক জনকে পাগল করিয়া রাখিতে পারি, ইচ্ছা করিলে অন্য জন্তুতেও পরিবর্ত্তিত করিতে পারি।' এখানকার বৃক্ষলতা অতি অদ্ভুত। এমন ফুল আছে, যাহা ছিঁড়িয়া রাখিলেও পাঁচ ছয় মাস তাহার গন্ধ থাকে। এমন লতা আছে, যাহা কাটিলে এমন সুন্দর রস নির্গত হয় যে, তাহা পান করিলে পিপাসাশান্তি হইতে পারে। এখানকার স্ত্রী পুরুষ কোচবিহারের লোকের ন্যায় কেবল এক একখানা লুঙ্গী পরিধান করে।

আসাম।—কামরূপের নিকটবর্ত্তী। এই দেশের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী প্রদেশের জলবায়ু সুন্দর, কিন্তু দেশের অভ্যন্তর-ভাগ বিদেশীয়দিগের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক। আট মাস বর্ষা ও চারি মাস শীত থাকে। শীতকালেও বৃষ্টি হয়। ধান্য প্রচুরপরিমাণে জন্মে। লবণ অল্প পাওয়া যায়। গম, যব ও মহুরের আদৌ চাষ হয় না। কিন্তু ভূমি এমন উর্ব্বরা যে, তাহাতে সমুদায় ফসলই হইতে পারে। এখানকার কুক্কুট এত যুদ্ধপ্রিয় যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া গেলেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় না। হস্তী দেখিতে অতি সুন্দর ও সংখ্যায় অধিক। হরিণ, বারাশিঙ্গা, নীল-গো ও মেষ অসংখ্য। নদীর বালুকায় স্বর্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ভাল সোনা নয়। তাহার তোলা আট টাকার অধিক নয়। এখানকার রাজা অতি উচ্চ অট্টালিকায় বাস করেন; কখনও মাটীতে পা দেন না। তাহা করিলে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। এখানকার রাজাদিগকে সরগি (স্বর্গীয়) বলে। রাজার বিশ্বাস, তাঁহার পিতৃপিতামহ স্বর্গে বাস করেন। যদিও তাঁহারা প্রয়োজন-বশতঃ সোনার সোপান দিয়া পৃথিবীতে নামেন, কিন্তু মাটীতে পা দেন না; কাজেই তিনিও মাটীতে পা দিতে পারেন না। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার শবের সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি অনুচর ও সহচরকেও জীবিত অবস্থায় প্রোথিত করা হয়।

আরাকান ও পেগু।—বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরাকান নামক বৃহৎ দেশ। ইহার নিকট চাটিগাঁ নামক বন্দর। এ দেশে হাতী অসংখ্য। ঘোড়া, গাধা ও উট অতি অল্প। লোকে গরু ও মহিষ পোষে না। গরু ও মহিষের সদৃশ

ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। ইহারা মাতা ভিন্ন, সকল স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। এখানকার স্ত্রী ও পুরুষ কাল। পুরুষের দাড়ি উঠে না। লোকে রাজার প্রতি ভক্তিশালী। সর্দ্দারগণের উপাধি ওয়ালি। আরাকানের নিকট পেগু। এ দেশের রাজার বিস্তর হস্তিসৈন্য। এ দেশে বিস্তর ধাতুর খনি আছে। সে সকলের অধিকার-লাভার্থ মগ, আরাকান ও পেগুর লোক সর্ব্বদা বিবাদে মত্ত থাকে।

বাঙ্গালা অতি বৃহৎ ও লোকপূর্ণ দেশ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এখানকার প্রধান নদী। ইহার দৈর্ঘ্য চাটিগাঁ হইতে তেলিয়াগড়ি পর্য্যন্ত চারি শত ক্রোশ। বিস্তার উত্তরের পর্ব্বত হইতে মাদারণ পর্য্যন্ত দুই শত ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে বিহার, উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বত। কিন্তু রিয়াজ্-উস্-সালাতিন-গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, 'ইহার দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে ও উত্তরে পর্ব্বত।' ইহার মধ্যে ৬৭টি বিভাগ, ১১০৯টি জেলা আছে। ইহার রাজস্ব ৪৬১১০০০০০ দাম। রিয়াজ্-উস্-সালাতিন বলেন যে, 'ইহাতে ২৮টি বিভাগ ও ৮৭টি জেলা আছে; ইহার রাজস্ব ১,৩৯,০১,৪৮২৸৶ সিক্কা টাকা।' ইহার সেনা ২৩৩৩ অশ্ব, ৮১১৫৮ পদাতিক, ৪২০০ গোলন্দাজ, ৪০০ যুদ্ধ-জাহাজ। ইতি।

শের আলী জাফর বাঙ্গালা বেড়াইয়া যে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। মনে হয়, তিনি স্বসময়ের ও স্বপূর্ব্বসময়ের বিবরণ একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার বগুলা, বোধ হয়, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ। ইনি আরেশ্-ই-মাহফিল গ্রন্থে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির প্রতি এই গ্রন্থকর্ত্তার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। অবকাশমত ভারতের অন্যান্য দেশের বৃত্তান্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। প্রথমেই শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি" ইতিশীর্ষক একটি ক্ষুদ্র কবিতা। মন্দাক্রান্তা ছন্দ শুনিলে কবির মনে হয়, যেন

বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছে, আর প্রিয়া আসিয়া বলিতেছেন, "ওগো দেখ, দেখ ওগো, একি মেঘ করা।" কবি বলিতেছেন,

"দুজনে দাঁড়ায়ে আছি আকুলতা ভরা
চারি চক্ষু মেঘ মাঝে নিমীলিয়া দিয়া।
ঝম্ ঝম্ শব্দে যেই আরম্ভিবে জল,
আমি তার মুখে দিব চুম্বন শীতল।"

সুতরাং 'শীতল চুম্বনই' কবিতাটির প্রাণ! তবে চুম্বনটি শীতল,—চুম্বনের শৈত্য সম্পূর্ণ মৌলিক, বোধ করি সে বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা নাই। লিরিকের এরূপ অধঃপাত শোচনীয়। বর্ষার বৃষ্টি দেখিলে ছেলেরা ভিজিতে যায়, কেহ গরম মুড়ি খায়, এবং দেখিতেছি, কবিরা প্রিয়ার মুখে 'শীতল চুম্বন' দেন। তাহাতে আপত্তি করিবার কথা নয়। কিন্তু পাঠকগণ কোন পাপে এই সব 'সেন্টিমেণ্টাল র‍্যাবিশ' পড়িয়া মরেন, তাহা ত বুঝিতে পারি না। দেবী স্বর্ণকুমারীর "ছোটখাট মিউটিনী" নামক রচনাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গল্পটির ভাষা যেমন অসংযত ও সৌন্দর্য্যহীন, আখ্যানবস্তুও তদ্রূপ,—অন্তঃসারশূন্য ও অকিঞ্চিৎকর। মেমসাহেবের ভয়, বড়সাহেবের সাহস, মিসিবাবার 'দেয়ালা', বা কালো সাহেবের চার পিয়ালায় প্রবল তরঙ্গ, সবই ছোট গল্পের বিষয়ীভূত হইতে পারে। কিন্তু আখ্যানবস্তু যতই সামান্য হউক, তাহা ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা না থাকিলে গল্প-রচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ঘোরালো রসালো গল্পের গঠন বরং ক্ষুদ্র ক্ষমতার আয়ত্ত হইতে পারে—কিন্তু চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ যে সব গল্পের উদ্দিষ্ট, তাহাদের সাফল্য বিশেষ ক্ষমতাসাপেক্ষ। মেমসাহেবের অকারণ ভয় তুচ্ছ বিষয় হউক, লিখিতে পারিলে ইহাও ছোট গল্পে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু দেবী স্বর্ণকুমারী এ ক্ষেত্রে সে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মোপাঁসার একটি ক্ষুদ্র গল্প মনে পড়িতেছে;—তাহার নায়ক ভূতের ভয়ে শেষে আত্মহত্যা করিল; প্রাণের ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল! এই অদ্ভুত আখ্যানবস্তুর পরিণতি কল্পে মোপাঁসা গল্পে যে তীব্র ভয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা যেমন রুদ্র, তেমনই স্বভাবসঙ্গত। কিন্তু মোপাঁসা বোধ করি, আগে 'হেলে' ধরিয়া পরে এই রকম 'কেউটে' ধরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ দেশে লেখকগণের সেরূপ বিচারশক্তি নাই। "সাহিত্যে আত্মহত্যা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সাহিত্যে আত্মহত্যার অবতারণা ক্ষমতাহীন লেখকের অব্যাহতিলাভের উপায়, বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ হইতে পারে। ক্ষমতাহীন লেখকের রচনায় আত্মহত্যা ও আত্মরক্ষা, উভয়ের মূল্যই যে সমান! গল্পে উপন্যাসে আত্মহত্যা যদি সঙ্গত, স্বভাবানুগত ও পাত্র পাত্রীর চরিত্রসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে সে রচনার উপসংহার কেন, আদ্যন্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। নিষ্ফল রচনার আদর্শ ধরিয়া বিষয়বিশেষের দোষ গুণের সমালোচনা চলিতে পারে না;—করিলেও তাহা নিষ্ফল; লেখক এই সাধারণ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক বলেন, "চরিত্রাঙ্কনক্ষমতা এখন বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছে। সাহিত্যে যে এত অধিক আত্মহত্যার সংখ্যা

দেখিতেছি, ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ।" যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহারা চরিত্রও আঁকিতে পারিবে না, আত্মহত্যাও স্বভাবানুগত বা চরিত্রসঙ্গত করিতে পারিবে না;— যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারাপ্রতিভার আদেশে উপসংহার গড়িয়া লইবেন, প্রবন্ধবিশেষের মতে পরিচালিত হইবেন না। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেরূপ প্রমাণ ও যুক্তি আবশ্যক, এ প্রবন্ধে তাহার সংস্থান নাই। "ঘোষাণী" অতি সুন্দর নক্‌সা। বামা পুরাতন বাঙ্গলার ছবি। বামার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি ঘোষাণীর দলের শেষ। লেখক Life হইতে ছবিখানি আঁকিয়া রাখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বৈদিক আমরা" নামটি অতি অদ্ভুত; কিন্তু বিষয়টি পাঠযোগ্য। লেখক বৈদিক যুগের বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয়ের সঙ্গে মৌলিক বৈদিক গবেষণার লোপ হইয়াছে; এখন যথালাভ! "ভারতে শিল্প-শিক্ষা" শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথের রচনা। বহু পূর্ব্বে সাহিত্যে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। "রামরাজ্য" বুঝিলাম না। "চিরকুমার-সভা" চলিতেছে। "সব ভালো, যার শেষ ভালো"—এখনও শেষ হয় নাই। "নববর্ষা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি কবিতা;—

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে স্নিগ্ধ কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি,
গরজে গগনে গগনে।"

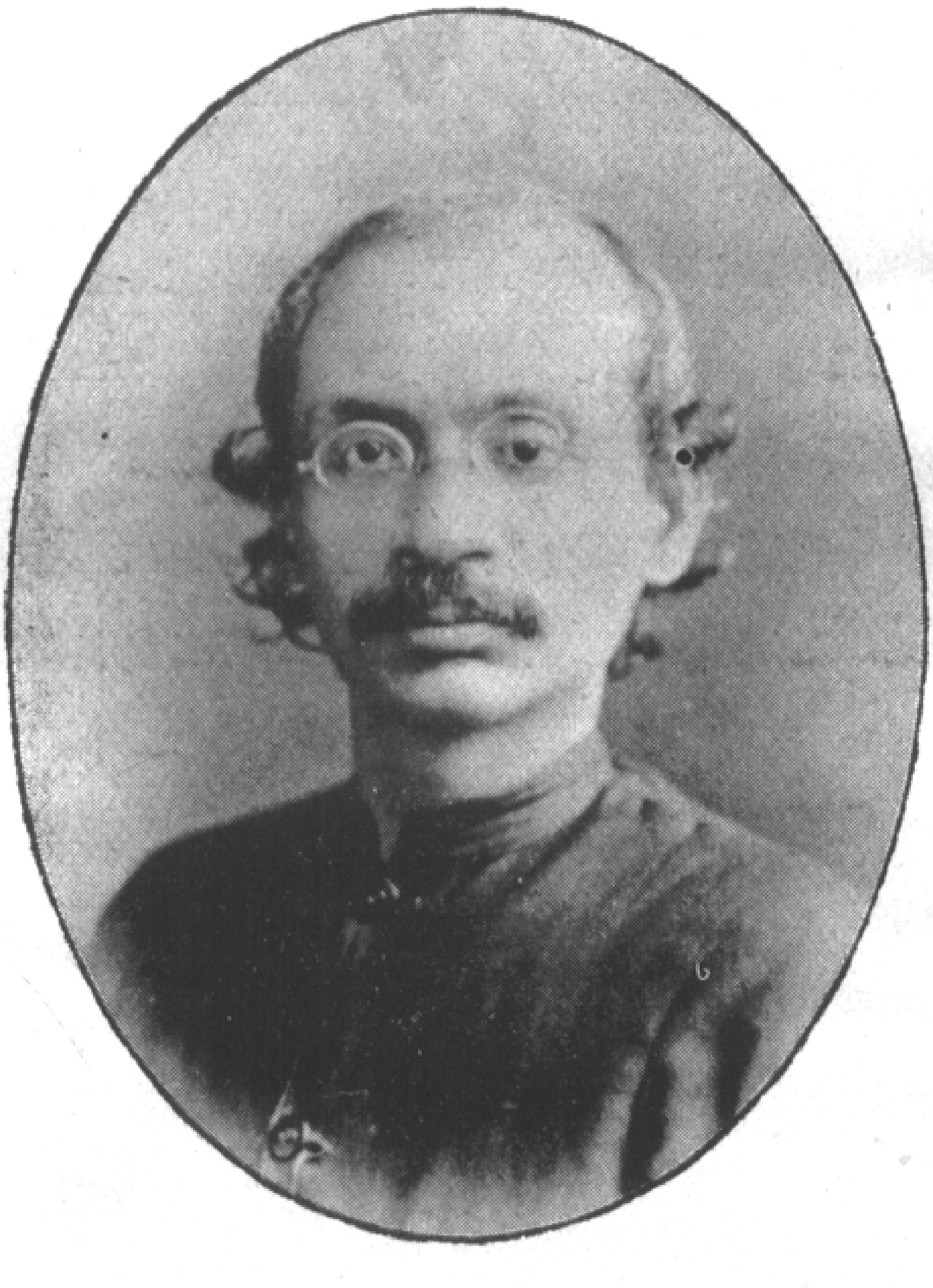
অতি সুন্দর। কিন্তু অবশিষ্ট ভাগ অত্যন্ত সাধারণ; কৃত্রিমতাদুষ্ট ও কেবল শব্দঝঙ্কারে মুখরিত। বিশেষতঃ হৃদয়-ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয়।

প্রদীপ। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "সদর ও অন্দর" গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "রস্কিন" প্রবন্ধই এবারকার প্রদীপের সার ও সৌন্দর্য্য। রস্কিনের মত রচনার কৌলীন্যগৌরব কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই সংখ্যায় প্রিয় বাবুর একখানি চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয় বাবুর প্রবন্ধে এবার যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, লেখকের ভাষায় তাহার সার মর্ম্ম এই—"কলা-বিদ্যার কার্য্য চিত্তরঞ্জন; সে চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা সাধ্য। সৌন্দর্য্য বলিলে আমরা সকল প্রকার সৌন্দর্য্যই বুঝিব—কেবলমাত্র রস্কিনের ন্যায় নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বুঝিব না, বা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবলমাত্র ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য্য বুঝিব না। কারণ, ললিতকলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র। বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে। যখনই যাহা তুমি সুন্দর করিয়া মানবের চক্ষে ধরিবে, তখনই তুমি ললিতকলার সৃষ্টি করিলে। সৌন্দর্য্যের জন্যই ললিত-কলা, ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ। এই সৌন্দর্য্য-সম্ভোগজনিত আনন্দের ন্যায় তীব্র মধুর অথচ পবিত্র আনন্দ জগতে

আর নাই। যদিও কলা-বিদ্যা মুখ্যতঃ ও স্পষ্টতঃ নীতি শিক্ষা দেয় না, কিন্তু ইহার বিশুদ্ধ আনন্দোপভোগে মানব-হৃদয়ের পবিত্রতা ও উন্নতি সাধিত হয়। সৌন্দর্য্য উপদেশ দেয় না, মধুর আকর্ষণে তোমাকে সুন্দর করিয়া তোলে। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জাতীয় গৌরব শুধু বাহুবলে নয়, সৌন্দর্য্য-অনুশীলনে বটে।"

"ডেভিড হেয়ার," "ছত্তিশগড়ে স্ত্রীশিক্ষা," "গাজিপুরে সুগন্ধ দ্রব্যের ব্যবসায়" প্রভৃতি প্রবন্ধে কোনও বিশেষত্ব নাই।

স্বাস্থ্য। আষাঢ়। "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ" সকলের আলোচ্য। "ব্যায়াম-চর্চ্চা," "দৌর্ব্বল্য" প্রভৃতি প্রবন্ধে অতি সহজ ভাবে সরল ভাষায় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় সাধারণের ও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "স্বাস্থ্যের" মত মাসিকপত্রের উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবু যে গৃহে গৃহে স্বাস্থ্য দেখিতে পাই না, তাহা দেশের দুর্ভাগ্য। সম্প্রতি "স্বাস্থ্যে" ইংরাজীতে যে সারসঙ্কলন প্রদত্ত হইতেছে, তাহা বাঙ্গলায় অনুদিত হইলে আরও উপাদেয় ও ফলোপধায়ক হইতে পারে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা কেন সারসংগ্রহপাঠের উপকার হইতে বঞ্চিত হইবেন?



শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন।

বৌদ্ধ যুগ।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটি বিষয় অগ্রে আমাদের মনে উদিত হয়। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। বোধ হয়, জানিবারও কোনও উপায় নাই। প্রথম বৈদিক যুগ। সে সময়ে আর্য্যসমাজে সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত হয়। বেদের পর উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রামায়ণ। রামায়ণে জানা যায় যে, বাল্মীকির সময়ে আর্য্যজাতি বিশেষরূপ সভ্য, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং বিদ্যার উৎসাহদাতা। কিন্তু ঋগ্বেদ ও রামায়ণ এই দুই গ্রন্থের মধ্যকালবর্ত্তী বিশেষ কোনও ইতিহাস নাই। মনুসংহিতা ও অপর দুই চারিখানি সংহিতা গ্রন্থ রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, তাহাদের ভাষা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি ঋগ্বেদের কাল হইতে দূরবর্ত্তী এবং রামায়ণ-কালের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী।

সেই প্রকার আবার রামায়ণ ও মহাভারত আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের মধ্যবর্ত্তী সময় নিতান্ত অল্প নহে ; অথচ এই দুই কাব্য-রচনার মধ্যবর্ত্তী কালের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস নাই। রামায়ণের কাল অপেক্ষা মহাভারতের কালে আর্য্যসমাজ অধিকতর সভ্য সমৃদ্ধ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু আচার ব্যবহারে কিছু বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, উভয় কালেই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র সমান শক্তিতে আর্য্যসমাজ শাসন করিয়া আসিতেছিল। সে যাহা হউক, ঋগ্বেদ হইতে রামায়ণ যত দূরবর্ত্তী, রামায়ণ হইতে মহাভারত তত দূরবর্ত্তী না হইতে পারে ; কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে যে বহু শতাব্দী বিগত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

মহাভারতের মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের সহিত যে আর্য্যসমাজের গৌরবরবি অস্তাচলগমনোন্মুখ হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর মতান্তর নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বাস্তবিকই ভারতবর্ষ শ্মশান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের অদ্ভুতধীশক্তিপ্রসূত কোন মহাগ্রন্থ বহুকাল পর্য্যন্ত আর উদ্ভূত হয় নাই। মহাপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় বীরগণ কুরুক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলে বহুদিবস পর্য্যন্ত আর তাঁহাদের

বংশধরগণের জ্যানির্ঘোষ জয়োল্লাস বা অসি-ঝনঝনা শ্রবণগোচর হয় নাই। নির্ব্বাণোন্মুখ চিতানলের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তে এখানে সেখানে দুই একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইতেছিল ও কয়েক বর্ষ মাত্র সামান্য আলোক বিকীর্ণ করিয়া আবার চির-অন্ধকারে লুক্কায়িত হইতেছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর বহুকাল ধরিয়া আর্য্যসমাজের এই দুর্ব্বল অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল।

অত্যধিক পরিশ্রমের পর যেমন প্রাণিমাত্রই কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া নবশক্তির সঞ্চয় করে, মহাযুদ্ধের মহাপরিশ্রমে আর্য্যসমাজ সেইরূপ কয়েক শতাব্দী নিশ্চেষ্ট মৃতবৎ পতিত ছিল।

এই অবসন্নতার সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ হয়। ভারতীয় আর্য্যগণের চিরশত্রু জাতি পারস্যবাসিগণ সুযোগ পাইয়া এই সময় প্রতিহিংসা লইবার জন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পারস্যসম্রাট "দারা" (Darius Hestaspes) অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহাকে আর ভারতবর্ষে অগ্রসর হইতে হয় নাই। সিন্ধুনদীতীরে আর্য্যগণের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; কিন্তু সে সময় কোন আর্য্যনৃপতি সিন্ধু দেশের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

দারার পর জগৎবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার (Alexander the Great) ভারত আক্রমণ করেন। পঞ্চনদের অধিপতি পুরুরাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পুরুরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেও গ্রীক সেনাগণ প্রথমতঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ-ভয়ে, দ্বিতীয়তঃ হিন্দুসেনার বীরত্বদর্শনে আর অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। অগত্যা সেকেন্দার ভগ্নমনোরথ হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন।

সেকেন্দারের পর আন্তিয়োকস, সিলিউকস প্রভৃতি দুই চারি জন গ্রীক ভারত আক্রমণ করেন, কিন্তু কেহই পঞ্চনদ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই।

এই সময়ে হিমালয়ের পাদস্থিত নেপাল প্রদেশের কপিলবাস্তুর রাজ-কুমারের নাম ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইতেছিল। সিদ্ধার্থপ্রচারিত ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম নামে ভারতকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণের নিকট বিদেশীয় আক্রমণ অপেক্ষা বিধর্ম্মীর আক্রমণ অধিকতর ভয়াবহ বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজ্যপালনের

ভার দিয়া নিজের হস্তে ধর্ম্মপালনের ভার লইয়াছিলেন। এত দিন পরে সেই ভারগ্রহণের যোগ্যতা দেখাইবার সময় উপস্থিত হইল। যে সময় পঞ্চনদবাসী ক্ষত্রিয়গণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া যবন ও ম্লেচ্ছের আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত ছিলেন, সেই সময়েই মগধ কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশের ব্রাহ্মণগণ বেদ বেদান্ত শ্রুতি লইয়া বৌদ্ধমতখণ্ডনার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা কত দূর, সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তাহা পরে দেখান যাইবে।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কপিলবাস্তু নগরীতে রাজকুমার বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থ অপেক্ষা তিনি বুদ্ধ নামেই অধিকতর বিখ্যাত। তিনি হিন্দু ক্ষত্রিয়কুমার, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মূল মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রচর্য্যা পরিত্যাগ করেন ও ব্রহ্মচর্য্যা গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়া আপন মতস্থাপনের চেষ্টা করাতে আর্য্যসমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সর্ব্বজনপূজ্য বেদকে তিনি অভ্রান্ত ও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সাধারণ বিশ্বাসের অনুকূল দেব দেবীর উপাসনায় মনুষ্যের মুক্তিলাভ হয়, এ কথা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। মানবমাত্রই যে কর্ম্মফল পাইবে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহার ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন, ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের সার মর্ম্ম। পরোপকার ও অহিংসাপরায়ণ হইয়া থাকাই তাঁহার মতে জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

এই সমাজবিপ্লবকারী মত প্রচারিত হইলে আর্য্যসমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারী প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এমন কি, অনেক পরাক্রান্ত নরপতিকেও বুদ্ধদেব স্বীয় মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

এই সময় সমাজে বড় এক কৌতুককর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়া গালি দিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবকেও ঈশ্বরের নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। ইহাতে তাঁহাদের আর কিছু হউক আর না হইক, বৌদ্ধদিগের নিকট তর্কে পরাজিত হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে ততটা অপমানিত জ্ঞান করিতেন না; কারণ, বুদ্ধদেব ত তাঁহাদেরই নারায়ণের অবতার।

ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ নেপালের দক্ষিণ দিকে বিশেষ রূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। এমন কি, বুদ্ধদেবের পর ভারতবর্ষে অশোক

প্রভৃতি সম্রাটগণও বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমান মান্য ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বত্রই হিন্দু দেবালয় ও বৌদ্ধ মঠ পাশাপাশি দৃষ্ট হইত।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ বিদ্যার বড় আদর করিতেন। এক একটা বৌদ্ধ-বিহারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিতে একত্রিত হইতেন। দুই এক জন বৌদ্ধ এমন পণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহাদের নিকট হিন্দুগণও নতমস্তক হইতেন। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অন্নসত্র, পশুচিকিৎসালয় ইত্যাদি শুভকর কার্য্যে বৌদ্ধদিগের অগাধ ব্যয় ছিল। বৌদ্ধ রাজগণ এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য যে প্রকার মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

বৌদ্ধগণ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। জাতিভেদ স্বীকার না করাতেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আরও আন্দোলন বাড়িয়া উঠিল। কারণ, যে সমস্ত পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহারা অতি যত্নে শূদ্রগণের নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন, এবং শূদ্রগণকে তাহার অনধিকারী জ্ঞান করিতেন, বৌদ্ধগণ অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত শূদ্রগণমধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যের দুর্গম শাস্ত্র-দুর্গমধ্যে এইরূপ শূদ্রসমাগম দেখিয়া তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ভারতব্যাপী সমাজবিপ্লবের এই সূত্রপাত।

বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া ব্রহ্ম ও চীন দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে চীনদেশবাসিগণ সাকার-উপাসনায় ব্রতী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ ও প্রগাঢ়জ্ঞানসম্ভূত মীমাংসাদি দেখিয়া চীনবাসিগণ এতই বিস্মিত ও মোহিত হইয়াছিলেন যে, রাজনিয়ম অতিক্রম করিয়া জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াও হোয়েন্থসাং, ফাহিয়ান প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আগমন করেন।

গ্রীক বীরগণের সহগামী বুধমণ্ডলীর ও এই সকল চীনদেশীয় পরি-ব্রাজকবর্গের নিকট আমরা তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিষয় অনেক জানিতে পারি। পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। উল্লিখিত দুই জন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ও Magesthenes ও Arrian নামক দুই জন গ্রীকের বর্ণনা আজকাল সর্ব্বলোকগ্রাহ্য।

গ্রীকবর্ণিত আর্য্যস্থান।

জগৎবিখ্যাত বীর সেকেন্দার ভারত আক্রমণ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়েন। তিনি ভারত ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু

তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী গ্রীক বীরগণ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহাদের অনুচর-বর্গের মধ্যেও দুই চারি জন এ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে নানাপ্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ আজকাল ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে, এবং অতি আগ্রহের সহিত পঠিত হইতেছে। আমরা সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের তৎ-কালীন অবস্থা জানিতে পারি।

যে সময় গ্রীকগণ ভারতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, সে সময়ে ভারতে জাতিবিভাগ বিদ্যমান ছিল, এবং জাতিভেদেরও বেশ বাঁধাবাঁধি ছিল। কিন্তু প্রায় সকল গ্রীক ইতিহাসলেখকই জাতিভেদ সম্বন্ধে একটি বড় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ণচতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তে ভারতে সাতটি কি আটটি জাতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার আশ্রমবাসের অবস্থাকেও তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বর্ণনা-লেখকগণের মধ্যে Magesthenisই সকলের শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ইতিহাসলেখক-গণের ন্যায়, তিনি পঞ্চনদ প্রদেশকে বা বর্ত্তমান আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশকে সমগ্র ভারতবর্ষ বিবেচনা করিয়া তদ্দেশবাসিগণের আচার ব্যবহার সমগ্র আর্য্যজাতির আচার বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু তিনিও বহুকাল চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে থাকিয়াও শ্রমণগণকে হিন্দুজাতির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে মেগেস্থিনিস মগধে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়ে তথায় বৌদ্ধগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব; এমন কি, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

মেগেস্থিনিস বলেন যে, শ্রমণেরা এত বিজ্ঞ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, রাজারা কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে হইলে শ্রমণগণকে সাদরে আহ্বান করিতেন। এই শ্রমণগণের মধ্যে হিলোবাই (Hylobii) নামক শ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইতেন। এই হিলোবাইগণ অরণ্যে বাস করিতেন, বনজ ফল মূলে উদরপূর্ত্তি করিতেন, বল্কলে অঙ্গাচ্ছাদন করিতেন। এবং প্রায় নিথর নিশ্চল হইয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হইয়া থাকি-তেন। ইহাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল।

এই হিলোবাইগণের পরই চিকিৎসকগণ গৌরবাস্পদ ছিলেন। মেগেস্থিনিস

ছিল। তাঁহারা নিতান্ত নিষ্কাম ব্রত অবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করিতেন; তবে হিলোবাইগণের ন্যায় তত অধিক কঠোর তপশ্চরণ করিতেন না। এই সকল চিকিৎসকগণ স্ত্রীলোকদিগকেও আপনাদের দলভুক্ত করিতেন। এই সময় হিন্দুনারীগণ কষ্টকর তপস্যা বা তথাবিধ কোন প্রকার কষ্টসাধ্য উপাসনায় ব্রতী হইতেন না। বৌদ্ধগণ বিনা আপত্তিতে মঠমধ্যে স্ত্রীলোকগণকেও শিক্ষার্থিরূপে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ঐ সকল স্ত্রীলোকের চরিত্রে কিছু দোষ থাকিলে তাহারা আশ্রম হইতে বিতাড়িত হইত। মেগেস্থিনিস বলেন, এই চিকিৎসকসম্প্রদায় কেবল দ্রব্যগুণের উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্তির চেষ্টা করিতেন না; তাঁহারা নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্রেরও ব্যবহার করিতেন; এমন কি, অনেকে ইন্দ্রজালবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন।

এই সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, মেগেস্থিনিস বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। প্রায় সকল গ্রীক ইতিহাসলেখকই বৌদ্ধধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেকেন্দারের দুই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল; অথচ কোন গ্রীকই যে তাহার উল্লেখ করেন নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিণয় প্রচলিত নাই, এবং এক জাতি অপর জাতির গৃহীত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত না, তবে মনে করিলে সকল জাতিই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিত। জাতিভেদ সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির বিশেষ বিবরণ কিছুই তাঁহারা দেন নাই। শূদ্র সম্বন্ধে তাঁহারা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, শূদ্রগণ এখন আর সমাজের তত নিম্নশ্রেণীতে অবস্থিত নহে।

এই শেষোল্লিখিত কথা হইতে বোধ হয় যে, বৌদ্ধকালে যখন বৌদ্ধগণ জাতিভেদপ্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রথমে সকল জাতিকে এক সমতলে আনিবার চেষ্টা করেন, তখন হইতেই শূদ্রগণের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার আরম্ভ হয় এবং তাহাদের কতকটা উন্নতি হয়। পরে মুসলমানদের সময়ে শূদ্রগণ আরও অধিক উন্নত হইয়াছিল।

আরিয়ান (Arrian) নামক অপর এক জন লেখক, ভারতবর্ষে দাসত্বপ্রথা নাই এবং প্রত্যেক লোকই স্বাধীন দেখিয়া, বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ক্রীতদাসপ্রথা গ্রীসের ন্যায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। কিন্তু

তিনি বলেন যে, Lacedemonionদিগের মধ্যে দাস রাখিবার প্রথা ছিল। কিন্তু তাহাদিগকে কেহ কখনও অপরের দাসত্ব করিতে দেখে নাই। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ কখনও অনার্য্যগণকে দাসরূপে (slave) রাখিতেন না, তা' অপরের দাসত্ব করা ত দূরের কথা। বোধ হয়, যে সময় সেকেন্দার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সময় মনুনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে সকল জাতিই কিছু কিছু বিচলিত হইয়াছিলেন। সেই সুযোগেই শূদ্রগণ উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তবে গ্রীকগণ যে ভারতে দাসত্বের অভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বোধ হয় যে, তাঁহারা নিজ দেশের ন্যায় নিষ্ঠুর দাসত্বপ্রথা দেখিতে পান নাই বলিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতে দাস জাতি একেবারে বিদ্যমান নাই। শূদ্রগণ দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত হইলেও তাহারা এত নিষ্ঠুররূপে ব্যবহৃত হইত না যে, কোন বিদেশী তাহাদিগকে ক্রীতদাস বলিয়া মনে করিতে পারেন।

মেগেস্থিনিস বলেন যে, তাঁহার অবস্থানকালে সমগ্র ভারতবর্ষে ১১৮ টি রাজ্য ছিল। সকলেই স্বাধীন। বলা বাহুল্য যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি নগণ্য রাজ্যও ছিল। অনেক রাজ্য আবার পঞ্চায়ত দ্বারা শাসিত হইত। গ্রীকগণ ইহাকে তাঁহাদের নিজধারণামত Republic অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আরিয়ন এ দেশের রাজাদিগের সৈন্যের ও যুদ্ধবিদ্যার বড়ই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুসৈন্য প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহী। ষ্ট্রাবো (Strabo) ইহার উপর নৌসেনা ও খাদ্যসংগ্রাহক নামধেয় আরও দুইটি শ্রেণীর অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আরিয়ন হিন্দুদিগের যুদ্ধনিয়ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতেন যে, যুদ্ধকালে গ্রাম লুণ্ঠিত হইত না ; শস্যক্ষেত্রে কৃষকগণ শান্তমনে কৃষিকার্য্য করিত, অথচ সেনারা যুদ্ধ করিত। পলায়িত বা আশ্রিত শত্রুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত নিষিদ্ধ ছিল। গ্রীকগণ এই প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তাঁহারা স্বদেশে কখনও যুদ্ধে এরূপ নিয়ম দেখেন নাই, এমন সংযম দেখেন নাই। যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রীক লেখকগণ বলেন, হিন্দুগণ পদ দ্বারা ধনুক ধারণ করিয়া প্রায় চারি হাত দীর্ঘ তীর বিষম বলে নিক্ষেপ করিত। বর্শা, তরবারী, চর্ম্ম ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। গ্রীকগণ স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া হিন্দুগণের নিকট যত ক্ষতিগ্রস্ত ও বাধাপ্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, পারস্ত প্রভৃতি দেশে তত হয়েন নাই। গ্রীকগণ হিন্দু বীরগণের সাহসেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

সে সময় ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গ বিশেষ ধনশালী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তাঁহারা গ্রীক বীরকে যে সমস্ত উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া লেখকগণ তাঁহাদিগকে ধনবান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেবল রাজারা কেন, মেগেস্থিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোকের গৃহই ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। পুলিস বা শান্তিরক্ষার বড়ই সুবন্দোবস্ত ছিল। দেশের লোকে চৌর্য্য জানিত না। উক্ত লেখক বলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের চারি লক্ষ অনুচরের মধ্যে প্রত্যহ যে সমস্ত চৌর্য্য সংঘটিত হইত, তাহার পরিমাণ গড়ে ত্রিশ টাকার অধিক নহে।

রাজকার্য্যাদি সমস্তই মনুর বিধান অনুসারে নির্ব্বাহিত হইত। ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যাদির এক-চতুর্থাংশ রাজা রাজকরস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। পৌরাণিক কালে এক-ষষ্ঠাংশ ছিল, বৌদ্ধকালে এক-চতুর্থাংশ হয়। গ্রীকগণের সময়েও মনুর প্রায় সকল নিয়মই পালিত হইত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের ধর্ম্মবিষয়ে কোনও গ্রীক লেখকই উল্লেখমাত্র করেন নাই। ষ্ট্রাবো কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণ হারকিউলিসের পূজা করে। তাহারা পূজার সময় বলিদান করে, এবং হন্তব্য জীবকে জবাই না করিয়া তাহার শিরচ্ছেদন করে। এই হারকি-উলিস পূজার কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীকগণ নিজের স্বভাব, ধর্ম্ম অথবা অন্য কোন বিষয়ে অপর কোনও জাতির সহিত ঐক্য দেখিলে বিদেশীয় প্রথাকে নিজেদের প্রথা বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য বোধ হয়, গ্রীকগণ ইন্দ্র (স্বর্গাধিপতি) বা কৃষ্ণ (হরিকুলেশ) পূজা দেখিয়া তাঁহাদের দেবতা হারকিউলিসের পূজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হিন্দুদিগের বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রীকগণ দন্তস্ফুটও করিতে পারেন নাই। তবে সকল হিন্দুকেই বিদ্বান এবং জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মেগেস্থিনিস বলেন যে, দর্শন ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রীকগণের সহিত হিন্দুগণের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী, যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অবশেষে তাঁহাতেই লয় পাইবে, হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস।

গ্রীকগণ হিন্দুদিগের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করেন নাই।

তাহার দুইটি কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ, ভাস্কর্য্যের জন্ম গ্রীকগণ জগৎবিখ্যাত, সুতরাং তৎকালপ্রচলিত ভারতীয় ভাস্কর্য্য তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই; দ্বিতীয়তঃ যে স্থানে অধিকাংশ গ্রীকলেখকগণ অবস্থান করিতেন, অর্থাৎ পঞ্চনদ প্রদেশ, তথায় আজি পর্য্যন্তও ভাস্কর্য্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। হিন্দু সঙ্গীতের বিষয়ে আজিকালি নব্য ইউরোপীয়গণ যে প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, গ্রীকগণও সেই প্রকার মন্তব্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীত পৃথিবীর সকল জাতির নিকটই দুর্ব্বোধ্য; এমন কি, উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত অর্থাৎ ধ্রুবপদ ইত্যাদি অনেক ভারতবাসীও বুঝিতে পারেন না, বিদেশীর কথা কি? নৃত্যসম্বন্ধেও তাঁহাদের ঐরূপ মত।

শস্যাদি আজকাল পঞ্চনদ প্রদেশে যাহা উৎপন্ন হয়, সে সময় তাহাই হইত। শর্করা, তুলা, নানাবিধ মশলা এখনকার ন্যায় তখনও উৎপন্ন হইত। অশ্ব, উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ ও কদাচিৎ যুদ্ধ সময়ে হস্তীও রথ বহন করিত।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত দ্বাপর যুগের ন্যায় ভোজনপাত্র সম্বন্ধে গ্রীকগণের সময়েও হিন্দুগণ তাম্রপাত্র প্রশস্ত বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতেন। ষ্ট্রাবো বলেন যে, দেশের চারি দিকেই রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত ছিল, এবং অধিকাংশ পথের পার্শ্বে দূরত্বসূচক প্রস্তরফলক (milestone) প্রোথিত ছিল।

ষ্ট্রাবো হিন্দুদিগের উৎসবাদি-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, রাজপথে অশ্ব-চতুষ্টয় দ্বারা চালিত রথ, গো-শকট, হস্তি-শকট ও নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ ফলশালী বৃক্ষ রথের উপর তুলিয়া শত শত লোকের দ্বারা চালিত হইত। বোধ হয়, এই প্রথার বিকৃতাবশেষ আজিও বঙ্গদেশে বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ফুলের ছড়ি বা শোলার বাগানরূপে বিদ্যমান আছে। গৃহপালিত সিংহ ও ব্যাঘ্রও রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উৎসবস্থলে আনীত হইত।

বিবাহে বরপক্ষীয় বা কন্যাপক্ষীয় কেহ কোনও প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতেন না। স্ত্রীলোকেরা সতীত্বকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। সহমৃতা হইবার প্রথা তখন দেশে প্রচলিত ছিল, তবে অনেক বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যও অবলম্বন করিতে দেখা যাইত। বাহুবলে বলীয়ান হইলে অনেক স্থলে অদৃষ্টে কন্যারত্ন লাভ হইত; বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই প্রথা বলবতী ছিল। বর কোথাও নিরস্ত্র যাইতেন না। এই সশস্ত্র বর আজ কাল বঙ্গদেশে "জাঁতি"-ধারী বররূপে পরিণত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ তখন দেশে প্রায়ই ঘটিত।

গ্রীকগণ বলেন যে, হিন্দু রাজগণ অন্তঃপুরে অসংখ্য দাসী রাখিতেন। তাঁহারা যুদ্ধে গমনকালে এই সকল দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; তবে তাহাদিগকে সাধারণ-নয়নের অন্তরালে রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। প্রজারা রাজাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত; এমন কি, রাজদর্শনকে তাহারা পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত, কিন্তু পারসীকগণের ন্যায় রাজসাক্ষাতে দণ্ডবৎ পতিত থাকিত না। ব্রাহ্মণগণ এবং শ্রমণগণ রাজাদিগেরও শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেন।

বেশ ভূষা সম্বন্ধে গ্রীকগণ যাহা বলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন ভারতবর্ষে পরিধেয় ও উত্তরীয় এই দুইখানি বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। অধিকাংশ বস্ত্রই কার্পাসনির্ম্মিত ও শ্বেতবর্ণ। কদাচিৎ কেহ বা উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রের ব্যবহার করিতেন। কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয়, কটিদেশে কিঙ্কিণী ও গলদেশে হার পুরুষেরাও ব্যবহার করিতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও রাজপুতানায় আজিও পুরুষগণের এই প্রকার অলঙ্কার-ধারণ দৃষ্ট হয়। এক জনের পাক করা অন্ন অপরে প্রায়ই ভক্ষণ করিত না। সকলেই নিজ নিজ খাদ্য স্বহস্তে পাক করিত। তাহাদের মধ্যে কোনও প্রকার মাদক, বিশেষতঃ সুরার প্রচলন ছিল না। ইতর জাতির মধ্যে ধান্যজ সুরার প্রচলন ছিল।

হিন্দুদিগের আকৃতি সম্বন্ধে গ্রীকগণ বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণ কাফ্রীগণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কেবল কাফ্রীগণের ন্যায় তাহাদের কুঞ্চিত কেশ স্থূল ওষ্ঠাধর ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহারা নিতান্ত দক্ষিণদেশবাসী কোনও অনার্য্যকে দেখিয়া এই প্রকার ধারণা করিয়া থাকিবেন। আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসিগণ শ্বেতকায় ছিলেন।

অবশেষে তাঁহারা ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে প্রত্যেকের গৃহপ্রাচীরে লিখিয়া রাখা উচিত। মেগেস্থিনিস বলেন;— "ভারতবাসিগণ দীর্ঘচ্ছন্দ, বলশালী এবং উন্নতমনা, সাহসী অথচ ক্ষমাশীল। তাঁহারা সংযত, মিতাচারী ও শান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে বা কৃষিকার্য্যে সর্ব্বত্রই তাঁহারা উৎকর্ষ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা এতই বিবেচক যে, প্রায়ই কেহ কখনও বিচারার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হন না। তাঁহারা এতই ধর্ম্মভীরু যে, কাহারও গৃহদ্বারে অর্গল ব্যবহৃত হয় না। কেহ কখন ঋণগ্রহণ বা দান করিলে কোন প্রকার লিপিবদ্ধ প্রমাণ রাখিবার প্রয়োজন

হয় না। কেহ কখনও কোন ভারতবাসীকে মিথ্যা কথা ব্যবহার করিতে দেখেন নাই!"

হায়! গ্রীকবর্ণিত হিন্দুচরিত্রে আর মেকলে-বর্ণিত বঙ্গবাসি-চরিত্রে এত প্বার্থক্য কেন? এ পার্থক্য কি বাস্তবিক না অমূলক? এ পার্থক্য কখন কি বিলুপ্ত হইবে না?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কমলেকামিনী।

সমালোচনা।

কবি কোথা হইতে নাটকের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। খোস্‌গল্প বা প্রচলিত কোনও প্রবাদের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া, কবির অমানুষী প্রতিভা এত বড় একখানি নাটক স্বচ্ছন্দে রচনা করিতে পারে, ইহাতে কাহারও সন্দেহ না থাকিলেও, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের কিন্তু বোধ হয়, এইরূপ কোনও গল্পই ইহার ভিত্তিস্থানীয় নহে। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে লুশাই যুদ্ধের আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে কবি ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত করিতে লুশাই অঞ্চলে গমন করেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, মানবচরিত্র-সন্দর্শনের ক্ষমতা, সামাজিক ও দৈশিক আচার ব্যবহার বুঝিবার শক্তি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে লুশাই, মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিহাসাভিজ্ঞ করিয়া দেয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই নাটক লিখিত ও প্রকাশিত হয়, তখনও যুদ্ধের ঘটনা তাঁহার মনে সম্পূর্ণ জাগরূক ছিল। সমরকেতুর স্পর্দ্ধার মধ্যে যখন আমরা পাঠ করি, "এই কৃপাণের কল্যাণে আমি নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে * * * বন্যপশুতুল্য লুশাইদিগের আক্রমণ রহিত করেছি," তখন তদানীন্তন যুদ্ধই যে সমরকেতুর উল্লিখিত যুদ্ধ, তাহা বোধ হয় কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

পক্ষান্তরে হয় ত কাছাড় মণিপুর অঞ্চলে এইরূপ কোনও প্রাচীন জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, কবি তথায় অবস্থানকালে তাহা অবগত হইয়াছিলেন। পরে স্বকীয় প্রতিভাবলে এই সামান্য ভিত্তির উপর এই নাটক গ্রথিত করেন।

মণিপুর রাজ্যের জ্যেষ্ঠা মহিষীর সন্তান প্রসূত হইলে, কনিষ্ঠা হিংসাবশে গোপনে ধাত্রীর সাহায্যে সদ্যোজাত কুমারকে সূতিকাগৃহ হইতে দূরীকৃত করেন। ক্ষণপরেই মহারাজের ক্রন্দনে কাতর হইয়া কুমারের পুনরানয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাকে আর তথায় দেখিতে পাওয়া গেল না; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই ত্রিপুরা নাম্নী জনৈক ভদ্রবংশীয়া বালবিধবা কর্ত্তৃক কুমার স্থানান্তরিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠামহিষী পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। কালক্রমে কনিষ্ঠার গর্ভে মকরকেতন নামক কুমারের জন্ম হইল। জ্যেষ্ঠা মহিষীর কুমার শ্রীমান শিখণ্ডি-বাহন সযত্নে প্রতিপালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মণিপুরের প্রধান সেনাপতির নিকট "শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায়" শিক্ষিত হইয়া মণিপুরের সহকারী সেনাপতির পদে উন্নীত হন। কাছাড়ের সিংহাসন শূন্য হইলে, শিখণ্ডিবাহন রাজপদে মনোনীত হইলেন। ব্রহ্মাধিপতি বীরভূষণ স্বীয় কনিষ্ঠা স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহার "অপদার্থ শ্যালককে" কাছাড়ের সিংহাসন দিবার মানসে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করায় মণিপুরাধিপতি ব্রহ্মাধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে ব্রহ্মাধিপতির পরাজয় ঘটে। তদীয় সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন কর্ত্তৃক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। পতনোন্মুখ শত্রুকে শিখণ্ডিবাহন সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজের শিবিরে আনিবার সময়ে ব্রহ্মাধিপতির কন্যা রণকল্যাণী "বীরত্বে ও মহত্ত্বে" মুগ্ধ হইয়া নিকটস্থ প্রাসাদের উপর হইতে তাঁহার মস্তকে "বীরত্ব ও মহত্ত্বের" পুরস্কারস্বরূপ মাল্য নিক্ষেপ করেন। শিখণ্ডিবাহন দর্শনমাত্রই ললনার রূপে আকৃষ্ট হইলেন। এই দর্শনমাত্রজ ভালবাসা ক্রমে গাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল। ঐ সময়ে কয়েক দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হয়, এবং মণিপুরের প্রাচীন পদ্ধতি মত রাসলীলা অভিনীত হয়। ইহাতে শিখণ্ডিবাহন শ্রীকৃষ্ণ ও রণকল্যাণী "ভাটবামনের মেয়ে" রাধিকা সাজেন। এই উৎসবের পরেই গান্ধর্ব্বমতে রণকল্যাণীর সহিত শিখণ্ডিবাহনের বিবাহ হয়। অবশেষে ব্রহ্মা-ধিপতি সন্ধিকাম হইয়া যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলেন, এবং বিবাহের বিষয় অবগত হইয়া পরম আহ্লাদিত হন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শিখণ্ডিবাহন কাছাড়ের রাজা মনোনীত হন। এই সময়ে তাঁহার যথার্থ ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় মণি-পুরাধিপতি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হন।

আখ্যায়িকার ইহাই সারাংশ। নায়ক নায়িকার প্রথমদর্শনজ আকর্ষণ প্রেমে পরিণত হয় এবং অবশেষে উভয়ে বিবাহপাশে বদ্ধ হয়েন, ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর কবি ইহা অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহা

ব্যতীত মকরকেতন গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্রঅঙ্কনে কবি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

নাটকের নায়ক শিখণ্ডিবাহন কবির অতি সুন্দর কল্পনা। তাঁহার "ভীম পরাক্রম, ভীমের ন্যায় বিক্রম, ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যপরায়ণতা, নারায়ণের ন্যায় বুদ্ধি * * * শিখণ্ডিবাহন যখন রণ-সজ্জায় তুরঙ্গমে আরোহণ করেন, বোধ হয় যেন ত্রিদিবেশ্বরের সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।" এই পরাক্রম এবং রণপাণ্ডিত্যের প্রমাণ আমরা যুদ্ধের আরম্ভমাত্রেই পাইয়াছি। শত্রুব্যূহভেদ পূর্ব্বক অসিমাত্র নির্ভর করিয়া শত্রু সেনাপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করা বীরত্বের পরিচায়ক বটে। আবার তাঁহার মহত্বও বীরত্ব অপেক্ষা ন্যূন নহে। পরাজিত পিপাসিত সেনাপতিকে জলদান ও রক্ষা করিয়া তিনি যে আর্য্যমহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার "বভ্রুবাহনের বংশে জন্মগ্রহণ করার" স্পর্দ্ধা আমরা অসঙ্গত বিবেচনা করিনা। আমরা ব্রহ্মসেনাপতির প্রতি ব্যবহারেও তাঁহার উদারতার উপলব্ধি করি। "সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে দোরে দোরে নিয়ে বেড়াবে; শিখণ্ডিবাহন বল্লেন, মৃত মৃগরাজকে পায়ে দলন করা শৃগালের কার্য্য, বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ;"—শিখণ্ডিবাহনের উদারতা বাস্তবিকই অপার্থিব। তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না, তাই যে শৈবলিনীর নামও মুখে আনেন না, যাহার পত্র পড়িতেও তিনি অসম্মত, তাহার উদারতাদর্শনেও তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক হয়। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "এমন চমৎকার লিপি কখনও দেখিনি!" কেবল তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিলেন, "শৈবলিনীর অতি উচ্চ মন। আগে যদি জানতেম তোমার সঙ্গে একদিন তার নিকট যেতাম।"

তাঁহার force of conviction এতই অধিক যে, তিনি গোপনে শৈবলিনীকে অর্থও প্রদান করিয়াছিলেন।

রমণীজাতির উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তিনি বলেন, "জগৎ সংসারে রমণীরত্ন সাররত্ন। রমণী না থাকিলে পৃথিবী অন্ধকারময় হইত। রমণী জীবন-ধারণের মূল।"

শিখণ্ডিবাহন কেবল যোদ্ধা নহেন, তিনি বিদ্বান, কাব্যামোদী। তিনি সমরকেতুর নিকট "শস্ত্র ও শাস্ত্র" উভয় বিদ্যাই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

স্বভাবতঃই প্রেমিক। অনেকে হয় ত তাহার প্রমাণ চাহিবেন। মকরকেতনেরও বুঝি সেই মত। তাই তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "দাদা, প্রণয় যে কি পদার্থ তা ত জানলে না, কেবল তলয়ার ভেঁজেই কাল কাটালে।" উত্তর আমরা শিখণ্ডিবাহনের মুখেই শুনি; তিনি বলিলেন, "স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়ে প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে, স্বজাতি-সূর্য্য-প্রভা পাবামাত্র বিকশিত হয়।" আসুন পাঠক, এই প্রেমিকের প্রণয়-পদ্ম-কলিকা-বিকাশ-কারণ-রূপ সূর্য্যপ্রভার জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা করি।

পৃথিবীতে প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক নর নারীই কোনও বিশেষ গুণ বা গুণাবলীর পক্ষপাতী। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের (individual difference) কারণনির্ণয়ে কত বিলাতী সমালোচক কতরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্রণয় complementary characterএর মধ্যে জন্মে—এক জনের কোনও গুণ আছে, অপরের তাহা নাই; উভয়ের প্রণয় হইবে; এই বিরুদ্ধস্বভাব ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রণয় প্রায়ই দর্শনমাত্র,—অন্ততঃ অতি শীঘ্রই সঞ্জাত হয়। মার্জ্জিতমস্তিষ্ক মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া নিম্নশ্রেণীস্থ পশুপক্ষিজগতেও বুঝি এই নিয়ম প্রবল। বিখ্যাত দার্শনিক মার্টিনিউ (Martineau) এক স্থানে বলিয়াছেন, বৃষ-ককুদ, ময়ূর-শিখা বা সিংহ-কেশর তত্তৎ স্ত্রীজাতিতে এই প্রণয়-উৎপাদনের কারণ। জানি না, ইহা কত দূর সত্য; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অনুকরণেচ্ছা বা অভাবনিবন্ধন দুঃখের অস্তিত্ব হইতেই এইরূপ সম্ভাবনার কল্পনা করিতে পারা যায়।

অপর, এক প্রকার প্রণয় আছে, যাহাকে 'Love between supplementary characters' বলে; আমার কোনও গুণ আছে, তোমার তাহা অধিক মাত্রায় আছে, সমভাবসম্পন্নতাবশতঃ আমাদের প্রণয় হইবে। এই প্রণয় জন্মিতে কিছু বিলম্ব হয়। কারণ, প্রেমিকের কোনও বিশেষ গুণাবলীর অস্তিত্ব ও আপেক্ষিক আধিক্য (relative greatness) নির্ণয় সময়সাপেক্ষ। Tennysonএর Enoch Ardenএ Enoch ও Annie পূর্ব্বভাবের প্রণয়ী, Annie ও Phillip শেষ প্রকারের।

প্রণয়সঞ্চারের যে ব্যাখ্যাই করা যাউক, আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, প্রেমিক একটি কোনও বিশেষ গুণের উপর অন্যান্য গুণাবলীর অপেক্ষা অধিক আস্থা প্রদর্শন করেন। যেন সেই একটি গুণ থাকিলেই যথেষ্ট। ইংরাজীতে যে বলে—প্রণয় অন্ধ,—তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও অনেকটা

ঠিক। আমাদের বোধ হয়, প্রণয় একদেশদর্শী। প্রেমিক প্রেমিকের সর্ব্ব-গুণাবলী না দেখিয়া একটি গুণের উপর অযথা প্রয়োজনীয়তার আরোপ করে। অনেক সময়ে এই ব্যক্তিগত ভাব-কলিকা অপরিবর্দ্ধিত এবং অজ্ঞাতভাবে হৃদয়ে নিহিত থাকে, "স্বজাতি-সূর্য্য-প্রভা পাবা মাত্র" বিকশিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই নাটকে আমরা অনেক স্থলে পাই।

শিখণ্ডিবাহন কাব্যামোদী। কাব্যে তিনি "ইন্দীবরনয়নার" বর্ণনা পড়িয়াছেন, তাই তিনি নীলাম্বুজনয়নের পক্ষপাতী। এ কথা বুঝি সকলেই জানেন, তাই কেবল মকরকেতন কেন, সুশীলাও বলিলেন, "দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আকর্ণবিশ্রান্ত নীলাম্বুজনয়ন যার, তা'কেই সহধর্ম্মিণী করবেন।" "আমাদের 'রাজবালার চক্ষু দুটি একটু ছোট,' সেই জন্য তাঁহাকে বিবাহ করবেন না।"

আমরাও ইহা অবিশ্বাস করি না। যুদ্ধারম্ভে শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্মসেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে যখন স্বীয় অশ্বে আরোহিত করাইয়া লইয়া আসিতেছেন, তাঁহার "বীরত্বে ও মহত্ত্বে" অভিভূতা হইয়া ব্রহ্মাধিপের কন্যা রণকল্যাণী নিকটস্থ প্রাসাদের উপর হইতে তাঁহার মস্তকে মাল্য নিক্ষেপ করেন। তিনি উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন,

> "ইন্দীবরবিনিন্দিত বিশাল নয়ন,
> মুখ-স্বপ্ন-সরোবরে ভাসিছে কেমন।"

তিনি কেবল দেখিলেন, এমন নহে; দেখিলেন, এবং মজিলেন। চণ্ডীদাসের কথায়—সেই রূপরাশি তাঁহার

> 'চখের' ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
> আকুল করিল বুঝি প্রাণ।"

এই দৃষ্টিবিনিময়—এই শুভদৃষ্টি বড়ই সুন্দর! বড়ই পবিত্র! কাব্যে বর্ণিত নয়ন দেখিয়া শিখণ্ডিবাহন বিমুগ্ধ হইলেন। সেই নীলাম্বুজনয়ননিঃসৃত সুষমাহিল্লোলে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তাই ব্রহ্মাধিপতি তাঁহাকে জারজ বলিলেও যখন প্রাণের বেদনা অতিশয় দুঃসহ হইয়াছিল, তখনও তিনি বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধে জলাঞ্জলি—জীবনেও বা দিতে হয়। নীলাম্বুজনয়নার অম্বুজমালা আমাকে জীবিত রেখেছে, হে ব্রহ্মেশ্বর! আমার পূজনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে নিপাতিত কর্‌লাম্, কাছাড় রাজ্য তোমাকে দিলাম, পৃথিবী তোমাকে দিলাম, * * * তুমি এক মুহূর্ত্তের

নিমিত্ত তোমার কল্যাণময়ী রণকল্যাণীর মুখচন্দ্রমা আমাকে দেখিতে দাও।” কবিবর্ণিত “ইন্দীবরাক্ষী সংসারে বিরাজমানা।” কবিকল্পনাময়ী প্রতিমার দর্শনের পর হইতেই বুঝি একটি আশাপ্রবাহ ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃসলিলভাবে বহিতেছিল। তাই তিনি ভাবিতেছেন, “ব্রহ্মসেনাপতি বল্লেন রাজা রাজপুত্র মনে ধরেনি, রণকল্যাণী অবিবাহিতা।” নয়ন! তোমার ভাষা কতই ভাবময়ী! মুহূর্ত্তমধ্যে তুমি কত কথা কহিয়া ফেলিয়াছ! নতুবা শিখণ্ডিবাহন—বুদ্ধিমান শিখণ্ডিবাহন অত আশা কেমন করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিলেন? এই কি তোমার শাস্ত্রপাঠ? এই কি তোমার বুদ্ধির পরিচয়?

এই দর্শনমাত্রজ প্রেম আমরা শকুন্তলায় দেখিতে পাই। তাহা আরও মধুর, আরও সুন্দর; কারণ, প্রকৃতিপালিতা শকুন্তলায় আমরা সহজাত স্বাভাবিক প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই।

যাহা হউক, শিখণ্ডিবাহন এই “সুনীল-নয়নার” কথা আর ভুলিতে পারিলেন না। “স্বজাতি-সূর্য্য-প্রভা” পাইয়া এই প্রেম-কলিকা তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। প্রেমিকের দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ, বড়ই সূক্ষ্ম। তাই সুরবালা দৌত্যকার্য্যে আসিয়া বৈষ্ণবীবেশেও ধরা পড়িলেন। শিখণ্ডিবাহন প্রেমিক, সুরবালা প্রেমিকা হইলেও, এখানে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে আসিয়াছেন। যাহা সম্ভব, তাহাই ঘটিল। শিখণ্ডিবাহন হারিলেন। পাঠক! এখানে বঙ্কিমবাবুর “কপালকুণ্ডলায়” বর্দ্ধমানে মতিবিবি এবং লুৎফউন্নিসার মিলন স্মরণ করুন। সেখানেও ঠিক এই কারণে লুৎফউন্নিসার মনের ভাব মতিবিবি জানিয়া গিয়াছিলেন, মতিবিবির মনের ভাব লুৎফউন্নিসা জানিতে পারেন নাই। সুরবালা সহজেই জানিয়া লইল সুশীলা কে, এবং শিখণ্ডিবাহন রণকল্যাণীতে আসক্ত। রণকল্যাণী সম্বন্ধে এরূপ কোনও কথা শিখণ্ডিবাহনের মনে আদৌ উদিত হইল না। বুঝি শিখণ্ডিবাহনের মন তখনও সংশয়দোলায় দোলায়মান, তাই তিনি ভাবিতেছেন, “কমলমালা পারিজাতমালা বা কালভুজঙ্গিনী।” বুদ্ধিমতী সুরবালা বুঝি তাঁহার প্রাণের বেদনা বুঝিয়াছিল, তাই সে অভয় দিল; বলিল, “রাজবংশে জন্ম হইলে রাজবংশী হয়, অনেক রাজবংশী নিরাশসাগরে নৌকার দাঁড়ি হয়েছেন। রাজবংশ স্রষ্টার করে প্রাণসমর্পণ।”

শিখণ্ডিবাহন বুঝি পুনর্জীবন পাইলেন; বলিলেন! “সুরবালা তুমিও মৃত-

"বিরস-বদনে, সজল-নয়নে, বসিয়া বিজনে নিরখি মনে
সে বিধুবদন, সে নীল নয়ন, সে মালা-অর্পণ সানন্দমনে।"

সুরবালাও হটিবার পাত্রী নহেন। তিনি ত "power of attorney" লইয়াই আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে "contract sign" করিয়া গেলেন; বলিলেন,—

"করিলাম পণ, পাবে দরশন, হইবে মিলন, বিবাহ-পাশে
পাগল হৃদয়, যার জন্ম হয়, সে হলে সদয় অমনি আসে।"

শিখণ্ডিবাহন "earnest money" দিলেন। কল্যাণ "জয়দেব" ভালবাসেন, তাই "জয়দেব" পাঠাইয়া দিলেন।

পাঠক এই দূতীসংবাদ আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, সমালোচনায় সব কথা লেখা চলে না।

ইহার পর রাসলীলামণ্ডপে আমরা নায়ক নায়িকার মিলন দেখিতে পাই, মঞ্চে রণকল্যাণী"ভাট বামনের মেয়ে" রাধিকা সাজিয়া উপস্থিত। বৃন্দা সুরবালা এবং নীরদকেশী প্রভৃতি সখীগণও সঙ্গে আছেন। মণিপুরাধিপতি পারিষদগণ-বেষ্টিত হইয়া রাসলীলার অভিনয় দর্শন করিতেছেন। সকলেই রাধিকার রূপে মোহিত।

শ্রীকৃষ্ণরূপী শিখণ্ডিবাহন রাধিকার সম্মুখীন হইলে চারি চক্ষে শুভদৃষ্টি হইল, প্রেমের তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল; মূর্চ্ছিতা হইয়া কমলিনী শিখণ্ডিবাহনের ক্রোড়ে পতিতা হইলেন। ইহার পর গোপনে নায়ক নায়িকার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল, শিখণ্ডিবাহনের বহুকালের আশা পূরিল। Ideal real হইল। নায়ক-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এইখানেই সম্পূর্ণ হইল, নায়কের চরিত্রগঠন এইখানেই শেষ হইয়া গেল। ইহার পর প্রসঙ্গক্রমে দুই এক কথা যাহা আছে, তাহাতে কেবল তাঁহার উদারতার পরিচয়। আর একবার গ্রন্থশেষে দেখিতে পাই, যখন ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর সত্য ইতিহাস বলিতে কষ্ট দেখিয়া তিনি স্বয়ং তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন।

প্রথম দর্শন হইতে প্রেমের এই ক্রমবিকাশ কবি কেমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, উপরে সংক্ষেপে আমরা তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। প্রেম অভিন্ন পদার্থ হইলেও পাত্রভেদে ইহার দুই পক্ষ, নায়ক ও নায়িকা।

ব্রহ্মাধিপতির কন্যা রণকল্যাণী কবির বড়ই সুন্দর সৃষ্টি। রণকল্যাণী সুন্দরী, প্রাপ্তযৌবনা। তিনি বীরকন্যা, বীরহৃদয়া। "পুরুষেরা যখন মাথায়

পাগড়ী, কোমরে কিরীচ, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায়," তাঁহার দেখে "বড় হিংসে হয়।" যুদ্ধ দেখিবার তাঁহার বড়ই সাধ, তাই ছাদের উপর সখীগণের সহিত যুদ্ধ দেখিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন।

Shakespeareএর Portiaচরিত্রের সহিত রণকল্যাণীর চরিত্র কতকাংশে তুলনীয়। Portia প্রত্যুৎপন্নমতি, বিদুষী, কর্ম্মক্ষমা; কল্যাণ কেবল ইহা নহেন, তিনি আবার বীরপুরুষোচিতগৌরবাভিলাষিণী। পুরুষের মত ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিবার তাঁহার বড়ই সাধ। এ সাধ হঠাৎ যে যুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার মনে সঞ্জাত হইল, তাহা নহে; আবাল্য তাঁহার এইরূপ স্বভাব—তাঁহার পিতা বলিতেছেন,"রণকল্যাণী যখন চার বছরের মেয়ে,তখন একদিন কিরীট মাথায় দিয়ে আমার তলয়ার দুই হাতে ধরে বলেছিল 'বাবা তোমার সঙ্গে আমি ললাই করি'।" বাল্যকালের এই ভাব যৌবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাই নানা স্থানের রাজা রাজপুত্র তাহার "মনে ধরেনি।" "দেবীপুরের রাজপুত্র মদ্যপায়ী" বলিয়া, "কুন্তলার রাজপুত্র ভীরুপ্রকৃতি" বলিয়া, এইরূপ আরও অনেককে তাঁহার পছন্দ হয় নাই। সে স্বয়ং সুভদ্রা, তাই অর্জ্জুন নহিলে প্রাণ সঁপিতে চাহে না।

উপক্রমণিকায় প্রণয়ের যে একদেশদর্শিতার কথা বলিয়াছি, এখানেও কবি তাহার কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। রণকল্যাণী বীরহৃদয়কে বরণ করিবে। তেজস্বিনী রাজপুত্র হইলেই যথেষ্ট মনে করে না। তাই সুরবালা যখন বলিয়াছিলেন, শিখণ্ডিবাহনের "রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়", তখন তিনি সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিলেন, "রাজবংশে সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না" এইখানে Henry V এর কথা মনে পড়ে; তিনিও Catherineকে এইরূপ ভাবের তেজের কথাই বলিয়াছিলেন।

তিনি কেবল বীরহৃদয়া নহেন,আবার অসামান্যা রূপসী। আবার "রণকল্যাণীর চখের মতন চখ দেখা যায় না—কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর, কেমন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; শাস্ত্রে যে বলে ইন্দীবরাক্ষী, রণকল্যাণী তাই।"

কবি কেমন সুন্দরভাবে ভবিষ্যতের অস্পষ্ট চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন! শিখণ্ডিবাহনের নীলাম্বুজনয়নপ্রীতির পর এই কয় ছত্র পাঠ করিয়াই আমরা যেন সব জানিতে পারি। "কপালকুণ্ডলার" দেবীপাদপদ্মে ত্রিপত্র-প্রদানের চিত্রটি স্মরণ করিবেন। সেই বিল্বপত্রপতনের সময়েই আমরা ঠিক এইরূপ ভবিষ্যতের চিত্র দেখিতে পাই। সেই ঘটনাতেই আমরা মৃণ্ময়ীর ভাগ্যাকাশের

ঘনান্ধকারের অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। এইরূপ চিত্র-অঙ্কনেই কবির কৃতিত্ব এবং কাব্যের উৎকর্ষের তারতম্য নির্ণীত হয়।

একটু বুঝি সন্দেহ রহিয়া যায়, কবি কেমন সুন্দরভাবে সেটুকু অপসারিত করিলেন। রণকল্যাণী ফুল ও মালা লইয়া ছাদে বসিয়া আছেন। যোগ্যা-যোগ্য বিবেচনা করিয়া বীরের মস্তকে নিক্ষেপ করিবেন। অবশ্য এ যোগ্যা-যোগ্যতার মধ্যে শত্রু-মিত্র-পার্থক্য নাই। ইহা অবশ্য সাধারণ উদারতার পরিচায়ক নহে। এই শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষ গুণপক্ষপাত রণকল্যাণী তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট আমরা শুনিয়াছিলাম, "বীরত্ব শত্রুতেই হউক আর মিত্রতেই হউক সমান পূজনীয়।" মালা লইয়া রণকল্যাণী বসিয়া আছেন। সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালা ছড়াটী দেবে কাকে?" রণকল্যাণী বলিলেন, "যাকে বিয়ে করব।" প্রজাপতি বুঝি এ কথা শুনিয়াছিলেন, তাই কবি শিখণ্ডিবাহনকে পরাজিত সেনাপতির পশ্চাদ্ধাবন-পরায়ণ করাইয়া সেখানে আনিয়া দিলেন। শিখণ্ডিবাহন পতনোন্মুখ সেনা-পতিকে জলপান করাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। বীরত্ব ও মহত্ত্ব উভ-য়েরই পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার মস্তকে রাজকন্যার মাল্য নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি উপরে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারই কবিকল্পনাময় "নীলাম্বুজনয়ন"। রাজকন্যা দেখিলেন, "মহত্ত্ব ও বীরত্ব" সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া ধরায় অবতীর্ণ। দৃষ্টিবিনিময়ে প্রাণবিনিময় হইয়া গেল। শিখণ্ডিবাহন এ কথা তখনই বুঝিয়া গেলেন। বুঝি কল্যাণের বুঝিতে একটু দেরী হইল।

শিখণ্ডিবাহনের মস্তকের উষ্ণীষ পড়িয়া গিয়াছিল, আনীত হইলে তাহাতে "সুশীলা" নাম দেখা গেল। রণকল্যাণী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এই দীর্ঘনিশ্বাসের প্রতিধ্বনির মধ্যে আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। হৃদয়ের বিনিময় হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনার পূর্ব্বে রাজকন্যা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এই চিত্রটি কেমন সুন্দর! কেমন স্বাভাবিক!

এই সময় হইতে রাজকন্যা তিল তিল করিয়া সেই স্মৃতিসুধা-হলাহল পান করিতে লাগিলেন। মণিপুরাধিপতির নিকট হইতে ব্রহ্মাধিপতি পত্র পাইলেন। কল্যাণ পিতার আদেশক্রমে তাঁহার সম্মুখে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কল্যাণ নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত পত্র পাঠ করিয়া নামটা পড়িতে পারিলেন না —"বড় জড়ান লেখা।" ছিঃ রাজকন্যা, এমন স্পষ্ট লেখা পড়িতে পারিলে

না? দর্শনমাত্রই যে হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় "বিজড়িত" হইয়া গিয়াছে, গুরুজনের সম্মুখে বুঝি তাহার নাম পড়িতেও নাই! কি সুন্দর অঙ্কন! কি স্বাভাবিক চিত্র!

পত্রে শিখণ্ডিবাহনের কাছাড় রাজ্যে অভিষেকের প্রস্তাবে ব্রহ্মাধিপতি মহা আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তা হউক, তাহাতে যায় আসে কি? কারণ কল্যাণ বলিলেন, "আমার কি রাজরাণী হ'তে বাসনা, তা হলে ত এত দিন হতে পারতেম্। আমার ইচ্ছা ধর্ম্মপত্নী হই।" পাঠক, প্রেমিকার প্রেমের প্রগাঢ়তা লক্ষ্য করিবেন। বিশুদ্ধ প্রেম প্রেম চাহে, প্রেমিক অর্থের লোভ করে না, রাজ্যও বুঝি প্রেমের তুলনায় নগণ্য। তাই কল্যাণের বড় ইচ্ছা, "ধর্ম্মপত্নী" হয়েন।

মণিপুরাধিপতি কিন্তু বড় বেহিসাবী লোক। অত বড় পত্রটা লিখিলেন, আর সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের কে, এ কথাটা বাদ দিলেন। কল্যাণ বলেন, এবং আমরাও বলি, এটা তাঁহার বড়ই অন্যায় হইয়াছিল। তবে বিগতযৌবন নরপতির আর অপরাধ কি? ঢাল তরবারির যুদ্ধের অতিরিক্ত এত বড় যে একটা কাণ্ড চলিতেছে, তা আর তিনি কেমন করিয়া জানিবেন।

সে যাহা হউক, রণকল্যাণী ত আর অপ্রেমিক রাজার পত্রের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি বৃন্দাদূতী সুরবালাকে পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য দুইটি;—প্রথম, শিখণ্ডিবাহনের মন জানা, দ্বিতীয়তঃ সুশীলা কে? দূতী পাঠাইয়া রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের চিন্তায় নিমগ্না আছেন, শিখণ্ডি-বাহনের "বীরত্ব, মহত্ত্ব, সহৃদয়তা, অশ্বসঞ্চালন" কেবলই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে; আর সেই "মালানিক্ষেপ শিখণ্ডিবাহনের মাল্যধারণ"—উপর দিকে দৃষ্টিপাত কল্যাণ বেশ বুঝিলেন, শিখণ্ডিবাহন তাঁহাকে ভাল-বাসিয়াছেন; তখনই মনে পড়িল—"সুশীলা",—সুশীলা কে?

দূতী আসিল; বলিল, সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের "বনিতা"; কিন্তু দুঃখিত-ভাবে না বলিয়া অনুপ্রাসের অবতারণার সহিত সহাস্যে বলিল। এত নিদারুণ কথা কি এমন করিয়া বলা যায়! কথা তবে সত্য নহে। দূতী পুনরায় বলিল, "সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।" কল্যাণ কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। শিখণ্ডিবাহন ওরূপ হইতেই পারেন না। এই অবিশ্বাসের মূল ও কারণ নির্ণয় করিতে আমরা অসমর্থ। কেহ হয় ত বলিবেন,—স্বার্থহানি। আমরা কিন্তু কারণনির্ণয় অত সহজ বিবেচনা করি না।

দূতী অবশেষে সত্য কথা বলিল। বলিল, শিখণ্ডিবাহন এখন,

"বিরসবদনে সজল নয়নে বসিয়া বিজনে, নিরখি মনে
সে বিধুবদন, সে নীল নয়ন, সে মালা-অর্পণ সানন্দমনে।"

আর সুশীলা সম্বন্ধে বলিল, সুশীলা কুব্জা নহেন, "শিখণ্ডিবাহনের ধর্ম্মভগিনী।"

কল্যাণ কৃতার্থ হইলেন। বুঝি তিনি আরও একটু ক্ষমতা দিয়া দূতী পাঠাইয়াছিলেন, তাই সুরবালা বলিয়া আসিয়াছিলেন,

"করিলাম পণ, পাবে দরশন, হইবে মিলন বিবাহপাশে"

ভক্ত শিখণ্ডিবাহনও মধুররসাশ্রিত জয়দেবখানি কল্যাণকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সুরবালা কিন্তু বলিল, শিখণ্ডিবাহনের একটু ভয় রহিয়াছে—"শিখণ্ডিবাহনের রাজবংশে জন্ম নহে বলিয়া।" কল্যাণ সে ভয়ে ভীতা নহে; সে সগর্ব্বে বলিল, "রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না।" আমরাও আশ্চর্য্য হই; কারণ মণিপুররাজবংশের আদিপুরুষের জ্যেষ্ঠ সহোদরই না বলিয়াছিলেন—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম করায়ত্তং তু পৌরুষম্?"

দূতী বড় পাকা লোক, তাই সে দুটি কাজের জন্য গিয়া তিনটি কাজ করিয়া আসিল। সে জানিয়া আসিল, শিখণ্ডিবাহন জারজ নহেন। মণিপুরের বড়রাণীর সন্তান, সপত্নী কর্ত্তৃক সূতিকাগার হইতে অপহৃত।

এ কথায় বিশ্বাস অবিশ্বাস, আনন্দ নিরানন্দ, কল্যাণ কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

ইহার পর নায়ক নায়িকা রাসমঞ্চে মিলিত হয়েন। কল্যাণ "ভাট্‌বাম্‌ণের মেয়ে" রাধিকা সাজিয়াছেন। শিখণ্ডিবাহন শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছেন। শিখণ্ডিবাহন কি পূর্ব্বে এ কথা কতকটা অবগত ছিলেন; তাই তিনি এবার মহা আনন্দিত। মন্ত্রী শশাঙ্কশেখর বলিতেছেন, "শিখণ্ডিবাহন রাসলীলায় আমোদ কর্‌তেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান।"

রাসলীলা অভিনীত হইতেছে। কল্যাণ "শিখিপুচ্ছচূড়া" বলিতে বলিতে বলিলেন না। 'শিখ' শব্দে বুঝি তাঁহার আর কাহারও কথা মনে পড়িল? হৃদয়ের প্রেমের তন্ত্রী স্পন্দিত হইল? পাঠক, কবির কৃতিত্বগুলি লক্ষ্য করিবেন। প্রাণে পরিপূর্ণ প্রেম—মুখে সঙ্কোচ! কি সুন্দর চিত্র!

রাসলীলার কথোপকথন কেমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক!

শ্রীকৃষ্ণ শিখণ্ডিবাহন আসিলেন। রাধিকাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত

হইলেন, পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ হইল। বুঝি শিখণ্ডি-বাহনের শরীরস্পর্শে কমলিনীর হৃদয়ে প্রেমের তড়িৎপ্রবাহের বেগ এরূপ বলবান হইয়াছিল যে, তাহার ঘাতপ্রতিঘাতের প্রবল তরঙ্গে কল্যাণের জীব-চৈতন্য ডুবিয়া গেল, কল্যাণ মূর্চ্ছিতা হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে পতিতা হইলেন।

ইহার পর রণকল্যাণীর অধ্যয়নকক্ষে উভয়ের গোপনে বিবাহ হইল। ইহাতে নায়ক নায়িকা সুখী, সখীবৃন্দ সুখী, আমরাও সুখী হইলাম।

এত বড় কাণ্ডটা হইল, মণিপুরাধিপতির শিবিরে প্রকাশ রহিল, তিনি "জয়ন্তীপর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্ত্তে" গেছেন। শিখণ্ডিবাহনের তীর্থদর্শনের সহিত আমরা নাটকের নায়িকার বিষয় সমাপ্ত করিলাম। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।

বশিষ্ঠাশ্রম।

প্রকৃতির লীলাভূমি আসামের মধ্যে গৌহাটী নগর প্রাকৃতিক শোভায় অদ্বিতীয়। ইহার উত্তরে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। যত দূর চক্ষু যায়, পর্ব্বত-মালা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গৌহাটী এই পর্ব্বতপুঞ্জে পরিবেষ্টিত। বশিষ্ঠাশ্রম গৌহাটীর প্রায় নয় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। বশিষ্ঠাশ্রম প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ চিরশান্তিময় নিভৃত কুঞ্জ। যখন প্রথম দেখি, তখন তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি নাই। কিন্তু তখন তরুণ হৃদয়ে বশিষ্ঠাশ্রমের যে মাধুর্য্যময় মোহন চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইবার নহে।

বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে হয় পদব্রজে নয় গোশকটারোহণে যাইতে হয়। পূর্ব্ব দিন আমরা একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিলাম। পর দিন আমরা সকলে বেলা ৮ টার সময় আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে বাহির হইলাম। গাড়ী ক্রমে সহরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। তখন আমাদের গাড়ী দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। অধিকক্ষণ গরুর গাড়ীতে থাকিতে না পারিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। এত পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিব না বলিয়া অনেকে আমায় নিষেধ করিতে লাগিলেন ; আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই অম্লানোজ্জ্বলরবিকরপ্রদীপ্ত মেঘ-কুহেলিকা-শূন্য প্রভাতের শোভা দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলাম।

দুই পার্শ্বেই অনতি-উচ্চ ধূসরবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী; আর মধ্যে সমতল উপত্যকা—উপত্যকা শ্যামলতৃণমণ্ডিত। কোথাও পর্ব্বতের গাত্রে দু চারখানা পর্ণকুটীর, তাহার চারি দিকেই কদলীবৃক্ষ। দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া সেতুপথে আমরা একটি নদী পার হইলাম। ক্ষুদ্র নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরে আমরা দুইটি পথের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। একটি পথ শিলংএর দিকে গিয়াছে; অপরটি বশিষ্ঠাশ্রমের দিকে। আমরা বশিষ্ঠাশ্রমের পথে চলিলাম। কিছু দূর গিয়াই আবার সেই নদীটির সাক্ষাৎ পাইলাম। দূরে কোলাহল শুনিতে পাইলাম। নিকটবর্ত্তী হইয়া জানিতে পারিলাম, বাজারের কোলাহল। সে দিন হাট-বার; হাট বসিয়াছে। বাজারটিতে একখানি ছোট চালা, তাহাতে ২।৩খানি দোকানের স্থান। অন্যান্য দোকানগুলি খোলা জায়গায় বসিয়াছে। তথা হইতে "বীচা কল" * আর "জহা চাউল" † ক্রয় করিলাম। আমাদের সঙ্গীদের ভিতর এক জন "গুয়া"-প্রিয় ‡ ছিলেন, তিনি উহা ক্রয় করিবার লোভ কোনও ক্রমে সংবরণ করিতে পারিলেন না। 'কেনা বেচা' হইয়া গেলে আমাদের সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা গাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পর এ দিক ও দিক দেখিতে দেখিতে প্রায় ১১।১২ টার সময় একটি পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া আমাদের গাড়ী থামিল। এই পর্ব্বতের উপর বশিষ্ঠাশ্রম। তথায় পঁহুছিবামাত্র আমরা উচ্চ ঝর্ ঝর্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। পূর্ব্বে এরূপ শব্দ আর কখনও শুনি নাই।

সেই পর্ব্বতের গাত্রে ২০।২১ ফিট উচ্চে অনতিবিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বশিষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা কেবল কবিত্বময়ী প্রকৃতির রাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে আশ্রমের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে যে সামর্থ্যের

---

* "বীচা কল"—ইহা একপ্রকার কদলী। আমাদের দেশের পক্ক "কাঁচকলার" ন্যায়। বীচিতে পূর্ণ। খাইতে খুব মিষ্ট। এই কদলী আসামীদের বড়ই প্রিয়।

† "জহা চাউল"—জহা চাউল এ দেশে চিঁড়ার কাজ করে। জলে ভিজাইয়া রাখিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই গলিয়া ভাতের মতন হইয়া যায়। দুগ্ধ চিনির সাহায্যে খাইতে বেশ লাগে।

‡ "গুয়া"—অর্থাৎ সুপারি। কাঁচা সুপারি পাড়িয়া মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখিতে হয়; তাহার পর উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ রীতিমত পচিয়া গেলে বাহির করিয়া বিক্রয় করে। উহার অত্যন্ত দুর্গন্ধ। আসামীরা পান ও চুণের সাহায্যে গুয়া খাইয়া থাকে। খয়েরের আবশ্যক হয় না। আসামীদের ইহা একটি প্রিয় বস্তু।

প্রয়োজন, যে উপকরণের আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। সম্মুখে ঝঙ্কৃতিময়ী উদার নির্ঝরিণী। তাহার মর্ম্মস্পর্শী চিরকলতান, বিহঙ্গমকুলের কমনীয় কণ্ঠস্বরের সুন্দর সম্মিলন, রবিকরসমুজ্জ্বল যৌবনস্বপ্নমগ্ন প্রস্ফুটিত বনফুল, শ্যামল পল্লবদলশালী সমুন্নতশীর্ষ বন্য বৃক্ষরাজি, আর সেই আশ্রমের নির্জ্জনতা ও পবিত্রতা কি সুন্দর, কি শান্তিপূর্ণ!

বশিষ্ঠাশ্রম আজকাল একটি তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছে। পুণ্যময় আশ্রম-তল প্রক্ষালন করিয়া একটি রজতসলিলা নগনদী অবিশ্রাম প্রবাহে ঝর্ ঝর্ শব্দে প্রবাহিত। অবিশ্রান্ত বারিপ্রবাহে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের উপরিস্থ মৃত্তিকা বিধৌত হইয়া প্রস্তর বাহির হইয়া তাহার উপরিভাগে অনেকগুলি নিম্নরেখা হইয়া গিয়াছে,—তাহার ভিতর দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তখন শীতকাল। নদীতে বেশী জল ছিল না। জলপ্রবাহ নানা পথে প্রবাহিত হওয়ায় অনেকগুলি ছোট বড় প্রস্তরদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি দ্বীপের উপর বসিয়া বশিষ্ঠ ঋষি তপস্যা করিতেন। সেই উপলখণ্ডের পার্শ্বেই একটি অনতিবিস্তৃত গহ্বর। তাহাতে সমস্ত জল আসিয়া মিশিতেছে, আবার তাহা হইতে উচ্ছলিত হইয়া হু হু শব্দে নিম্নে পতিত হইতেছে। মাঘ মাস—স্নানের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে যাত্রীদিগের সমাগম হয়। তীর্থযাত্রীদিগকে সেই গহ্বরে স্নান করিয়া, তীর্থক্ষেত্রে আহার করিয়া আসিতে হয়। সেই গহ্বরে স্নান করিলাম। এক জন পাণ্ডা আমাকে মন্ত্র পাঠ করাইলেন ও হস্তে একটি ফুল দিলেন। আমি তাঁহাকে দক্ষিণা দিলাম। এই জল বরফের ন্যায় শীতল; বেশীক্ষণ জলে থাকিলে শরীর অবশ হইয়া আসে।

বশিষ্ঠাশ্রমে দুই একটি ভগ্ন মন্দির আছে; তাহার ভিতর প্রস্তরখোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। সেগুলি মন্দিরের ভিতর বাহিরের সমতল ভূমি হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকার। দিবারাত্র ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে। একে একে দেবদেবীগুলি দর্শন করিলাম। তাহার পর আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া জলযোগ করিলাম। নির্ঝরিণীর মধ্যবর্ত্তী একটি প্রস্তর-দ্বীপের উপর উপবেশন করিয়া কল্লোলিনীর কলনাদ শুনিতে শুনিতে প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। রন্ধনাদি সমাপ্ত হইলে আমরা আহারাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

পথিমধ্যে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র রজতকিরণে জগৎ প্লাবিত করিয়া উদিত হইলেন। সেই জ্যোৎস্না-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বশিষ্ঠাশ্রমের মধুর স্মৃতি-ভারে হৃদয় পূর্ণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা।

বংশীধ্বনি।

১

কি মধু চাঁদনি রাতি! বাজিছে বাঁশরী রে
রাধা রাধা করি!
করি মোরে ধরাধরি, চল সখি ত্বরা করি,
যথায় শ্রীহরি।
আমিও লো কুঞ্জবনে, কদম্ব কুসুম সনে,
মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটিব লো, শিহরি, শিহরি!
আমিও লো পুলকিত, প্রফুল্লিত, সুরভিত,
সৌরভে গৌরবে হব, পেয়ে প্রাণহরি!

২

হাসিয়া পুষ্পিয়া উঠে অশোক-সুন্দরী রে,
এ চরণ ধরি!
শ্রীহরির পদস্পর্শে, আমিও ফুটিব হর্ষে,
অঙ্গ থরথরি!
মুখমধু পিয়ে মোর, বকুল আনন্দে ভোর,
তরুর তরুণ তনু ফুলে-যায় ভরি!
আমিও শ্রীঅঙ্গ ছুঁয়ে, ফল ফুলে ভুঁয়ে নুয়ে
পড়িব লো; চল চল, ডাকিছে বাঁশরী!

৩

শুনি মুরলীর ধ্বনি ধাইছে ছুটিয়া রে
নিকুঞ্জহরিণী!
মেঘ কোথা? হের, হাসি, ছড়াইয়া বর্হরাশি
নাচিছে শিখিনী!
যমুনার কালো জলে, তরঙ্গের নৃত্যছলে,
কালিন্দীর কটীতটে বাজিছে কিঙ্কিণী!
এ কি মুরলীর মন্ত্র! এ কি যাদুকর-তন্ত্র!
আমারো চরণে বাজে অদৃশ্য শিঞ্জিনী!

৪

অমৃতের প্রস্রবণ শ্যামের মুরলী রে
উঠিছে উছলি!
ভ্রান্তি নয়, সহচরি, এসেছে, এসেছে হরি,
এ ব্রজ উজলি!
আমার কবরীমূলে কেন কনকের ফুলে
সাজাইবি? এলোচুলে, চল্ যাই চলি!
শ্যাম মম কণ্ঠহার, শ্যাম মম চন্দ্রহার,
সিঁতি কাঞ্চী-আভরণে সাজে বনস্থলী?

৫

ধুপ ধুনা আয়োজনে, অগুরু চন্দনে রে,
কি কাজ স্বজনি?
গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে করিব লো কুতূহলে,
লো বিধুবদনি!
তরুতলে নিরুপম, ঝরন্ত শেফালীসম,
অর্চ্চিব শ্যাম-তরুরে কুসুম-যৌবনে!
শ্যামে শ্যামা অরপিব, তাঁরি রাধা তাঁরে দিব,
শ্যাম-চন্দ্রে জ্যোৎস্না সম পূজিব ললনে!

৬

ছড়ায়ে পড়িছে যুড়ি আকাশ ধরিত্রী রে!
এ স্বরলহরী!
রাধা-হৃদি-বৃন্দাবন তথা সখি অনুক্ষণ
বাজিছে বাঁশরী!
টানিয়া সঙ্গীত-ডোরে, বাঁধি লয়ে যায় মোরে
কুমুদ-বান্ধব যথা টানে কুমুদীরে!
ধৈরয গেল হারাই! ভেসে যাই, ভেসে যাই,
জোয়ারে তরণী সম কৃষ্ণ-প্রেমনীরে!

৭

কি মধু চাঁদনি রাতি! বাজিছে বাঁশরী রে
রাধা রাধা করি!

করি মোরে ধরাধরি, চল সখি ত্বরা করি
যথায় শ্রীহরি।
আমিও লো কুঞ্জবনে কদম্ব কুসুম সনে,
মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটিব লো, শিহরি শিহরি!
আমিও লো পুলকিত, প্রফুল্লিত, সুরভিত,
সৌরভে গৌরবে হব, পেয়ে প্রাণহরি!

ঊষা।

১

কনক-মুকুট পরি, গরিমায় জিনি
মদনমোহিনি,
এস জ্যোতির্ম্ময়ী সতি, এস এস হৈমবতি,
চির-বসন্তের উৎস, লাবণ্যের খনি!
এমনি মোহিনী কন্যা, নারীকুলে হ'ল ধন্যা!
ধরি রাঙা পা দুখানি, হাসিল ধরণী!

২

হেরি তোমা হে কমলা, ঝরিল শেফালি,
আনন্দে বিহ্বলা!
সর-সোহাগিনী ধনী, শত শত কমলিনী
হে রাণি, করিল তোমা কুসুমকুন্তলা!
ও অধরে মৃদু হাস, আনে নিত্য মধুমাস!
কোকিলা রসালকুঞ্জে কুহরি বিকলা!

৩

ঝুরু ঝুরু বহে বায়; অলকের দাম
উড়িতেছে কাঁপি!
করে শোভে শতদল, গলে শোভে নীলোৎপল
ফুলরত্নে ভরপুর তোমার ও ঝাঁপি!
এস এস ফুলরাণি, ধরি রাঙা পা দুখানি,
আবার হাসিছে আজি গোপিনী বিলাপী!

৪

ভূতলে নন্দনবন বৃন্দাবনে রচি
হে সুরসুন্দরি
পারিজাতে থরে থরে, সন্তানকে, নাগেশ্বরে,
রঙ্গে কল্পতরু-কুঞ্জ সৃজ যাদুকরি!
নমি কল্পতরুবরে, যাচি লব প্রাণেশ্বরে;
বাজাবে বাঁশরী আসি পীতাম্বর হরি!

৫

পাইয়ে রাখালরাজে, নাচিবে গোপিনী,
হয়ে উতরোল!
ব্রজে আজি পুনরায় বহিবে দখিণাবায়;
ঝুরু ঝুরু মিলনের মলয়-হিল্লোল!
সখীদের হুড়াহুড়ি, কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি,
কঙ্কণকিঙ্কিণীশব্দে কি সুখ-কল্লোল!

৬

কনকমুকুট পরি, গরিমায় জিনি
মদনমোহিনী,
এস জ্যোতির্ম্ময়ী সতি, এস এস হৈমবতি,
চির-বসন্তের উৎস, লাবণ্যের খনি!
এমনি মোহিনী কন্যা, নারীকুলে হ'ল ধন্যা!
ধরি রাঙা পা দুখানি হাসিল ধরণী!

কৃষ্ণচূড়া।

১

যদিও জর জর আলি, বরণ কালি, তনু দহে,
হাসি চাপিতে নারি, তবু আঁচল ধরি,
এ বিরহে!
কোন্ সে প্রেম-সারিকা,
রাস-রসের রসিকা,
আঃ মরণ করিল নামকরণ এ কানন-ফুলে?
মোহন চূড়া অতুলে
দেখেনি সে কি গোকুলে?
তিমিরে "বন-জোছনা" বলে, বলিহারি লো
এ ভুলে!

২

বাসব-ধনুকের লোভা শোভা খেলে চূড়াবদনে!
অতসী অশোকের দ্যুতি ঝলকে সে চূড়া-
রতনে!
সেই সে প্রেম-সারিকা,
রাস-রসের রসিকা,
দেখেনি শিখিনীর অতুলনা রূপরাশি বনভূমে?
দেখেনি ঝল্‌মলে
শ্যাম-যমুনা-জলে
সোনাকণা! জোছনা জলে পড়ে যবে
নিঝুমে?
শ্যামে সে অপমানে
সহে না রাধা-প্রাণে!
চল চল আন্ স্থানে "কৃষ্ণচূড়া" বলে এ
কুসুমে!

আহ্বান।

১

ফুল্ল এ চাঁদনি রাতি!
ফুল্ল তারকার ভাতি!
ফুল্ল বনরাজি!
বঁধু হে কোথায় তুমি আজি?

২

ফুল্ল মালতীর বন!
বন-বালা, ফুল্ল-মন,
ভরে ফুল সাজি!
বঁধু হে কোথায় তুমি আজি?

৩

ফুল্ল শিখিনীর প্রাণ!
ফুল্ল এ শ্যামার তান!
ফুল্ল এ ঝরণা,
রাসনৃত্য-আনন্দে মগনা!

৪

ফুল্লাধরা, ফুল্ল-বুক,
ফুল্ল প্রেমিকার মুখ,
ফুল্ল ফুলে সাজি!
বঁধু হে কোথায় তুমি আজি?

৫

এ আলোক, এই ছায়া,
স্বপ্নে ভায়! যেন মায়া
ফুল্ল বনরাজি!
মনে হয় সবি ভোজবাজি!

৬

মর্ম্মাহতা, ছুঁতে যাই,
সত্যের থাই না পাই,
মনে হয় খেদ,
এ গো যেন সকলি বিচ্ছেদ!

৭

আজি এ বাসন্তী রাতে,
প্রফুল্ল মলয়-বাতে,
চির সত্যধাম,
এস শ্যাম, এস অভিরাম!

৮

এ অনিত্যে নিত্যধন,
বিচ্ছেদে চির-মিলন,
এস এস সখা,
ডাকে তোমা প্রকৃতি রাধিকা!

ময়ূরী।

১

কদমের শাখেতে ময়ূরি,
কেন ঘুরি ঘুরি তুই নাচিস্ সঘনে?
বিরহ-পিঞ্জরে বাঁধা আজি লো শ্যামের রাধা,
তাঁর প্রিয় সুরী!

ঝুরি ঝুরি আঁখিতারা ম্লান দু' নয়নে।
তুই কেন ঘুরি ঘুরি নাচিস্ ময়ূরি?

২

এমনি এ অবনীর রীতি,
পরে বুঝিবারে নারে পরের বেদনা!
চক্রবাকী জলে ভাসে; নিশি রূপবতী হাসে,
ভালে পরি সিঁথি!
করি আমি শ্যাম-তপে কি ঘোর সাধনা!
শ্যাম কোথা? ধিক্ ধিক্ পরের পীরিতি!

৩

ভেবে তুই দেখ্ লো শিখিনি—
অম্বরে গরজে যবে নব জলধর,
পিয়ে নব জলধারা, নাচিস্ হইয়ে সারা,
কতই সুখিনী!
হেমন্তে কাঁপিস্ তুই অঙ্গ থর থর!
বিরহের শীতে কাঁপে রাধা-বিহঙ্গিনী!

৪

নাচ তোর ভাল নাহি লাগে!
রাম বিনা ভাল নাহি লাগে রামায়ণ!
করতালি দিয়া দিয়া শ্যাম তোরে নাচাইয়া,
কতই সোহাগে,
কনক-নূপুরে তোর মণ্ডিয়া চরণ,
শিখাতেন অঙ্গভঙ্গ নব অনুরাগে!

৫

সেই সব মনে পড়ে যবে,
ডুবিয়া তিমির ঘোরে কাঁদি লো নীরবে!
দীরঘনিশ্বাস-বায় কপোল শুকায়ে যায়,
স্মরিয়া মাধবে!
কত গো বর নাগর আছে এই ভবে,
শ্যামসম রূপে গুণে কে দেখেছে কবে?

৬

কদমের শাখেতে ময়ূরি,
কেন লো ঘুরিস্ তুই আনন্দেতে সারা?
বিরহ-পিঞ্জরে বাঁধা আজি লো শ্যামের রাধা,
তাঁর প্রিয় সুরী!
ঝুরি ঝুরি জ্যোতিঃহারা দুটি আঁখি-তারা!
তুই কেন ঘুরি ঘুরি নাচিস্ ময়ূরি?

বংশীধ্বনি।

১

কি বলিলি বৃন্দে? শ্যাম বাঁশরী
বাজায় আবার নিকুঞ্জে আসি?
একি ভ্রান্তি তোর! এ যে গুমরি
করিছে বিলাপ কোন উদাসী!
কৃতান্ত দিয়েছে বুকেতে দাগা,
বিপত্নীক বুঝি, আহা অভাগা!

২

কোরো না বারণ! গাহিতে দাও
শোকের কাহিনী বাঁশীর স্বরে!
দেহ গেছে ভাঙি! হিয়াটি—তাও
বিন্দু বিন্দু গলি পড়িছে স্বরে!
দাবদগ্ধ ওর ভগন প্রাণ—
অধীর অশান্ত উদাস গান!

৩

আভাষে বুঝিনু! বাঁশী কহিছে—
"মিছার সংসার," "অলীক ছায়া,"
"ভোজ বাজি সার;" বাঁশী ধ্বনিছে,
"নর-কায়া মিছে," "কেবলি মায়া,"
"সকলি পলায়," "আশা ফুরায়",
"এ কঠিন প্রাণ নাহি কি যায়?"

৪

"কি হবে থাকিয়া সে গেল যদি?
সোনার সংসার আঁধার করি!
কল কলে বহে কালের নদী;
বৈতরিণী-তীরে নাহি কি তরী?

নাহি কি কাণ্ডারী, লইতে পারে,
ছিন্ন-আশা এ অভাগারে ?"

৫

বৃন্দে ঠিক্ কথা ! মোরে লো ধিক্ !
কি হবে থাকিয়া, সে গেল যদি ?
মিছার সংসার ; প্রেম অলীক ;
কল-কলে বহে কালের নদী !
আইস শমন ! যাব ও পারে,
কৃষ্ণ বিনা থাকা মিছা এধারে !

শুকসারী।

১

শ্যামের আছিল শুক, মোর ছিল সারী।
—কহিলা গোবিন্দ,
"শোন চন্দ্রনিভাননে হোক্ এরা বর কনে,
শুভ লগ্নে দাও বিয়া, হউক আনন্দ !"
কথা শুনে মোর সব সহচরী-দল
হাসিয়ে পাগল হ'ল, আমোদে চঞ্চল !

২

কেহ বাজাইল শঙ্খ, কেহ ধরি বীণা
গাহিল রাগিণী !
কেহ বলে,"এই শাড়ী পরিবে রাধার সারী,
চরণে নূপুর দিব কটিতে কিঙ্কিণী !"
শ্যাম-নটবরে ডাকি বলে কোন আলি,
"শয্যাতোলানির কড়ি কোথা বনমালী ?"

৩

শুভলগ্নে শুভক্ষণে হইল বিবাহ ;
বাজিল বাজনা !
করি সবে হুলুধ্বনি, আনিল সে শুকমণি,
রাখিল সারীপিঞ্জরে যত গোপাঙ্গনা !
পাইল পরম সুখ সারী আর শুক ;
বাসর জাগিল সবে, বাড়িল কৌতুক।

৪

আমি সুধু নিরানন্দে, একেলা, শয্যায়
জাগিনু যামিনী !
নিশিতে আসিবে বলে গিয়াছিল শ্যাম চলে ;
এল না এল না শ্যাম ; আমি অভাগিনী !
কাটাইনু বিভাবরী, প্রতি পল গণি !
প্রভাতে আইলা হাসি, শ্যাম গুণমণি !

৫

শ্যাম বলে,"একি রাধে !"—আমি অভিমানে
মুদিনু নয়ান !
"ছি ছি ছিছি কেন রোষ ?
আমার নহেক দোষ ;"
বস্ত্রের অঞ্চল টানি, ঝাঁপিনু বয়ান !
"রাধে রাধে ! বলি শ্যাম যত মোরে সাধে,
ততই মানের বন্যা ছুটিল অবাধে !

৬

কতক্ষণে শুনিলাম, যেন গো স্বপনে—
"পায়ে পড়ি ধনি !"
শুনি সে করুণ স্বর, কাতর হ'ল অন্তর ;
বাঁধিনু বাহুর ডোরে শ্যাম গুণমণি !
একি হাসি ! ঢলি পড়ে এ উহার অঙ্গে
সখী সব ; গৃহ ভাসে হাসির তরঙ্গে !

৭

বুঝিনু আপন ভ্রান্তি ! "পায়ে পড়ি" বলি,
প্রিয় সারিকারে,
পিঞ্জরে সাধিছে শুক !—
কি অদ্ভুত ! কি কৌতুক
ভাঙিল মানের সেতু সে প্রেম-জোয়ারে !
ব্রজশুকে প্রাণ দিল ব্রজের সারিকা !
ব্রজেশ্বরে প্রাণ দিল ব্রজের গোপিকা !

৮

সুখ-কুঞ্জে ছিল আহা বন-বিহারিণী
শ্যামের সারিকা !

পুড়ি গেল বনস্থলী, লতাকুঞ্জ, তরুবলি,
সখি এ বিরহানল দাবাগ্নির শিখা।
কোথা শুক? কোথা কুঞ্জ? কোথায় সারিকা?
শূন্য কুঞ্জে কাঁদে আজি অনাথা রাধিকা।

সারিকা।

১

আমি যেন প্রলাপিনী, ঘোর বিলাপিনী রে,
বদ্ধ পাগলিনী!
শ্লথ বিলম্বিনী জটা, নাহি সে বেণীর ঘটা,
নাহি সে রূপের ছটা; ভূতল-শায়িনী!
বল্ সখি ও পাখীটি কোন্ মহা দুঃখে,
গান ভুলি, নাচ ভুলি, কাঁদে অধোমুখে?

২

"ললিতা" 'বিশাখা'"রাধা" গলে ছিল সাধা রে
এই বিহগীর!
"জয় জয় বংশীধারী" বলিত আমার সারী,
হাসিতেন রাধানাথ রঙ্গে রঙ্গিণীর!
"হরি" বলি অহর্নিশি সারিকা ডাকিত,
শত জনমের পাপ রাধার কাটিত!

৩

হরিনাম গুণ্‌গুলেতে ছিল ভরপুর রে
রাধিকার ধাম!
"জয় জয় বংশীধারী" বলিত আমার সারী,
অশান্ত রাধার প্রাণ লভিত বিরাম!
আবার ডাক্ নরে পাখী, জিনি কাশীধাম!
হোক্ দুঃখিনীর গৃহ, বল্ হরিনাম!

৪

কৃষ্ণের সহস্র নাম শিখাইনু যতনে রে;
ভুলিল কি সব?
রাধার এ অনুনয় অরণ্যে হইল লয়!
শব সম সারিকাও আজি লো নীরব;
সারিকাও শনিগ্রস্ত, বিহ্বলা, বিকলা!
জ্বালার উপরে জ্বালা, একি হোল বালা!

৫

হেরি বন্দিনীর দশা, একদা স্বজনি রে,
হয়ে বিষাদিনী,
পিঞ্জর বাহিরে আনি, কহেছিনু শুভ বাণী
"কোন্ পাপে কার শাপে হইলি বন্দিনী?
যা উড়ি নিকুঞ্জ-বনে, যা চলি সারিকা!"
সারিকা উত্তর দিল "যা চলি রাধিকা!"

৬

অবাক্ হইনু সবে, শুনিয়া উত্তর রে!
চিত্তে হ'ল ভয়!
"রাধা, তোর প্রিয় সারী
নহে লো সামান্যা নারী"
কহিলেন "শ্রীগোবিন্দ" প্রদানি অভয়!
পূর্ব্ব জন্মে ছিল সারী ঋষির বালিকা—
"ব্রত-ভঙ্গ-পাপে এবে কানন-সারিকা!"

৭

শ্যামের বচন শুনি, দ্বিগুণ সোহাগে রে,
পালি সারিকারে;
পাই' স্বাদু ফল বারি, নাচিত ঋষিকুমারী!
যেন মোর গৃহমণি সাঁঝের আঁধারে!
"শকুন্তলা" বলি ওরে, কতই সু-রঙ্গে,
ভাসিত ললিতা-সখী, হাসির তরঙ্গে!

৮

ছিল পুণ্য ঋষিকুলে পূরব-জনমে রে
সারিকা সুষমা!
তাই পূর্ব্বকথা স্মরি, শিখিল রে "হরি, হরি"
শিখিল সহস্র নাম বৈষ্ণবী পরমা!
পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলে তাই হরি-দরশন
পায় নিত্য, সারিকার অপূর্ব্ব জীবন!

৯

ঘোর জপে ঘোর তপে না পায় দর্শন রে
যে হরি-চরণ,
সে হরি রে এ সারিকা, সে হরি রে এ রাধিকা,
পাইল, ব্রজগোপিকা, জুড়াতে জীবন!
না, না, সখি; দোঁহে বুঝি স্বপ্ন দেখেছিনু?
জাগিয়া, অভাগী মোরা, হরি হারাইনু!

১০

রাধার কপাল-গুণে সকলি বিরূপ রে,
ওলো সহচরি!
শুনিতাম হরি-কথা, জুড়াতাম মনো-ব্যথা,
হরি! হরি! সারিকাও ভুলে গেল হরি!
না না সখি, হরি-প্রেম-সুধার প্রেমিকা,
ও-ও আজি উন্মাদিনী, অভাগী সারিকা!

১১

আমি যেন প্রলাপিনী, ঘোর বিলাপিনী রে,
বদ্ধ পাগলিনী!
শ্লথ বিলম্বিনী জটা! নাহি সে বেণীর ঘটা!
নাহি সে রূপের ছটা! ভূতলশায়িনী!
বল, সখি ও পাখীটি কোন্ মহাদুখে,
গান ভুলি, নাচ ভুলি, কাঁদে অধোমুখে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

রঘুবংশ।

রঘুচরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যে কয়েকটি অনুষ্ঠান ও ঘটনার উল্লেখ ও বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা এই :—(১) রঘুর যৌবরাজ্যে অভিষেক; (২) দিলীপের মুনিবৃত্তি; (৩) ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধ; (৪) দিগ্বিজয়; (৫) অর্থের সদ্ব্যবহার। গ্রন্থারম্ভেই কবি মনুর আদর্শকে শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলকর বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া এ স্থলে সেই আদর্শের পবিত্রতা চিত্রিত করিয়াছেন। যাঁহারা প্রাচীনতার প্রতি নিত্যশ্রদ্ধাশীল, তাঁহারা ভগবান মনুর নামমাত্রেই এগুলিকে পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। কিন্তু একালের অনেক শিক্ষিত লোকের নিকট এই চিরপূজ্য মহাপুরুষের পূজনীয়তা প্রতিপাদিত না করিলে নিস্তার নাই। একালের শিক্ষিতেরা নামের দোহাই-মাত্রেই কিছু স্বীকার করেন না, যুক্তি বা প্রমাণ চাহেন, এ কথা কিন্তু সত্য নয়। যদি স্পেন্সার বা হিগেলের দোহাই দিয়া কোন মত সমর্থিত হয়, অমনি একালের শিক্ষিত ব্যক্তি মস্তক অবনত করেন;—কিন্তু যদি পক্ষান্তরে উপনিষদ বা মীমাংসাশাস্ত্রের কথা বলা যায়, অমনি তাহার যৌক্তিকতার

বিচার আরব্ধ হয়। ইহা কালমাহাত্ম্যমাত্র। যাহাই হউক, কবিবর্ণিত বস্তুর গৌরব অনুভবের জন্য, মহাত্মা মনুর পবিত্র আদর্শের সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মুনিবৃত্তি ও যৌবরাজ্যাভিষেক।—পূজনীয় কমলাকান্ত শর্ম্মা হইতে ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভক্তিমান শিশু পর্য্যন্ত, কেহই বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন না। এ বিষয়ে আমি নিজে কিছু না লিখিয়া, বঙ্গগৌরব মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ পারিবারিক প্রবন্ধে ইহার যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতেছি।

"বৃদ্ধ হইলে লোক স্বভাবতঃ অক্ষম এবং অবুঝ হয়; তাঁহার সকল কথা মানিয়া চলিতে গেলে গৃহকার্য্য সুসম্পাদিত হয় না; গুরুজনের কথা লঙ্ঘন করিলেও ধর্ম্মহানি হয়। এরূপ অবস্থায় বৃদ্ধকে বঞ্চনা করিয়াই লোকে কাজ করে এবং তাহাতে ক্রমে গুরুজনের প্রতি যথার্থ ভক্তির হ্রাস হয়। এই জন্য বৃদ্ধের পক্ষে সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লওয়া কর্ত্তব্য। মুনিবৃত্তির যথার্থ তাৎপর্য্য এই।" আমি স্বীকার করি যে, যেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার আছে, অথবা পিতাপুত্রে একসঙ্গে থাকিবার রীতি আছে, সেখানেই ইহার প্রয়োজনীয়তা। নচেৎ যেখানে কৃতী হইলেই পুত্র আপনার স্ত্রী লইয়া স্বতন্ত্র হয়েন, এবং পিতাকে আপনার জন্য আপনি খাটিয়া খাইতে হয়, সেখানকার পক্ষে এ ব্যবস্থা নহে। মহাভাগ মনুও তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করেন নাই, মহাত্মা ভূদেবও তাঁহাদের জন্য এই ব্যাখ্যা করেন নাই। যেমন সমাজ, তেমনি ব্যবস্থা; কাজেই, মনুর আদর্শ, অবস্থা-হিসাবেই উপযোগী। যে জন্য মুনিবৃত্তি, সেই জন্যই যৌবরাজ্যাভিষেক। ইউরোপের একালের রাজা, অনেক স্থলেই নামমাত্র রাজশব্দ-ভূষিত;—রাজ্যশাসনভার সম্পূর্ণরূপে অন্যলোকের হস্তে অর্পিত। সে সকল স্থলে যৌবনের প্রাক্কাল হইতেই ভবিষ্যৎ রাজাকে রাজকার্য্য শিখাইবার প্রয়োজন হয় না; অথবা আদৌ রাজনীতি শিখাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে রাজা কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন, সেখানে এই শিক্ষার, এবং তদুপযোগী অনুষ্ঠানের উপযোগিতা বুঝাইতে হইবে না।

রঘুচরিত্রে দ্বিতীয় ঘটনা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ।—বহিঃস্থ শক্তিপুঞ্জের ও চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে, ক্ষুদ্রবলশালী মানব নিরন্তর পরাভূত হইতেছে; অথচ মনুষ্যের সকল উন্নতি এই বহিঃস্থ শক্তির নিয়মনে ও বিরোধী অবস্থার

সমীকরণেই সাধিত হয়। সত্য বটে যে, এই শক্তিসাগরের মধ্যে আমরা বুদ্বুদ-মাত্র; এবং প্রতিনিয়ত অবস্থা-তরঙ্গ-তাড়নায় আমরা প্রতিহত হইতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা "দৈবেন দেয়ং" বলিয়া হাত পা ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা কাপুরুষ। দৈববল পরাভূত করা মনুষ্যক্ষমতার অসাধ্য; কিন্তু তবুও যথাসাধ্য চেষ্টার নামই পৌরুষ। তাই পরাক্রান্ত অলক্ষ্য, অদৃশ্য, বা অদৃষ্ট-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া রঘু বলিয়াছেন;—

গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে
ন খল্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্।

এই যুদ্ধে আমরা নিরন্তর ভূপতিত হইলেও, পৌরুষের প্রভাবে স্বয়ং "দৈব" আমাদিগকে সুফলদান করেন। কবি তাহাই বলিয়াছেন,—

তথাপি শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থুষঃ।
তুতোষ বীর্য্যাতিশয়েন বৃত্রহা পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে।

ইউরোপে বিজ্ঞানশাস্ত্রে যেমন নিষ্কাম অধ্যবসায়ের সহিত তত্ত্বাদির আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, দর্শনশাস্ত্রে তাহা আদৌ দেখা যায় না। এখানে দুইটি দল দুইটি মত লইয়া উকীলের মত তর্ক করিতে বসেন। ইউরোপীয় দর্শন-রাজ্যে এই জন্য এক দিকে Free will, আর এক দিকে Necessity লইয়া তুমুল বিবাদ ও মনকষাকষি। এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সকল তত্ত্বেরই উভয় দিক দেখিতেন, এবং তাহার মীমাংসার ও সামঞ্জস্যের প্রয়াস পাইতেন। মনু এক দিকে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করিতে গিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে,—

যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥

অর্থ,—যেমন (বসন্তাদি) ঋতু আপন আপন অধিকারকালে (চূতমঞ্জরী প্রভৃতি) নিজ চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি শরীরধারী (পুরুষেরাও) আপন আপন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, অন্য দিকে আবার সমগ্র সংহিতায়, চেষ্টা ও পুরুষকারের কথা বলিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়া একটা দিক্ না দেখা রোগ পূর্ব্বকালে ছিল না। কালিদাসের বর্ণনাতেও তাই উভয়বিধ অবস্থার কথা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

তৃতীয়—দিগ্বিজয়। সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; একমাত্র রাজাকর্ত্তৃক সমগ্র দেশ কখনও শাসিত হয় নাই।

ইহা দেশের নৈসর্গিক ও প্রাচীন সময়ের বিশেষ অবস্থার ফলস্বরূপই হইয়াছিল। একছত্র রাজত্ব না থাকিলেও যাহাতে এক জন সম্রাট অন্যান্য রাজাদিগের উপর প্রভুশক্তিসম্পন্ন হয়েন, এরূপ ব্যবস্থা ছিল ; কারণ, তাহা না থাকিলে দেশের মঙ্গল সাধিত হয় না, একজাতীয়ত্ব ও জাতীয় প্রভুতা পরিবর্দ্ধিত হয় না। এই জন্যই দিগ্বিজয়ের ব্যবস্থা ; এবং সংহিতাদি গ্রন্থে যুদ্ধের গুণকীর্ত্তন দেখা যায়। সামরিক ভাব প্রদীপ্ত না থাকিলে যে দেশ চিরদিনের মত অধোগতি প্রাপ্ত হয়,এ কথা বোধ হয় আর আমাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। লর্ড রবার্টস্ তাঁহার ৪১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসংবলিত গ্রন্থে এ বিষয়ে এই দুর্ভাগ্য জাতির দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখন শান্তির নামে যে স্থিরতা লাভ করিয়াছি, তাহা মৃত্যুর নামান্তরমাত্র। কিন্তু জয়লাভ করিবার পর যদি বিজিত রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। এই প্রকার ভাবে দিগ্বিজয়াদি দ্বারা যত দিন জাতীয় একত্ব রক্ষিত হইয়াছিল, তত দিনই দেশের গৌরব ছিল। তাহার পর যখন যে যাহার রাজ্যে নিরুপদ্রবে শান্তির ক্রোড়ে শয়ান হইলেন, তখনই পরাধীনতা-পাশে দেশ বাঁধা পড়িল। সংহিতার বিধি ও কবির আদর্শ ভুলিয়া ভারতবর্ষ অধঃপতিত হইয়াছে।

রঘুচরিত্রের শেষ কথা, উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার।—ভৃগুব্যাখ্যাত মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে,

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥

রাজা অর্জিত ভূমি (ইউরোপীয় কথায় Res nullius) এবং ধনাদি লাভ ইচ্ছা করিবেন, জয়প্রাপ্ত ধন সযত্নে রক্ষা করিয়া বাড়াইবেন, এবং এই বর্দ্ধিত ধন সৎপাত্রে দান করিবেন। রঘুও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। তাহার পর,

তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতম্।
উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তুশিষ্যঃ॥

মহারাজ যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে দানাদি দ্বারা সমগ্র রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়াছেন, তখন বরতন্তুশিষ্য কৌৎস গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণাসংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ ; এবং সেই গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ

রাজা। কৌৎসও তাই রাজার আশ্রমকে "সর্ব্বোপকারক্ষম" বলিয়াছেন। কৌৎসের মত ব্রাহ্মণকে বিশেষভাবে দান করিবার ব্যবস্থা মনুর বিধি।

আবৃত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ
নৃপানামক্ষয়োহ্যেষ নিধিঃ ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে।

এই স্থানে মনুদ্বেষিগণ বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণেরা কি স্বার্থপর; তাঁহাদের সকল ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণের সুবিধার জন্য। বিদ্বেষপরায়ণ খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিদিগের কাছে আমরা শিখিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ জাতি সকলকে ঠকাইবার জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। যে পরমরমণীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পবিত্র ছায়ায় জগৎবাসী সকলকে বসাইবার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায় চেষ্টা পাইয়াছিলেন—যে ব্রাহ্মণ্যের মহিমা এই ফিরিঙ্গীকৃত নীচতানুরক্ত নব্যদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা যদি অপবিত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়, তবে কবির রচনাই সত্য যে, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

যাহা হউক, এই রঘু-কৌৎস-সংবাদ যত্ন করিয়া পাঠ করিলেই ব্রাহ্মণের নির্লোভতা প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষের যদি গৌরবের কিছু থাকে, তাহা অলোপ্য বিপুল শাস্ত্র ও সাহিত্য। তৎপ্রণেতৃগণকে নিরন্তর দানাদি দ্বারা পোষণ যদি ধন্য না হয়, তবে বুঝিতে পারি না, ধর্ম্ম বলিয়া কিছু আছে কি না।

ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মত নির্লোভ পরোপকারী কোথাও দেখা যায় কি? রাজার পদলেহনকারিগণ সংসারে শ্রেষ্ঠ ধনী ও শ্রেষ্ঠ শেঠ হইয়া গিয়াছেন, আর রাজারা যাঁহাদের পদসেবা করিতেন, তাঁহাদের দারিদ্র্য চিরপ্রসিদ্ধ।

মনুর আদর্শ-গঠিত রঘুচরিত্রে এই প্রকারে কবি সংহিতানির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার বিধানের অনুষ্ঠান দেখাইয়াছেন। আশা করি যে, প্রাচীনতার মধ্যে যাহা পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ ছিল, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে যেন আমরা তাহা বিস্মৃত না হই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আলোক—দৃশ্য ও অদৃশ্য।

আলো কি? চক্ষু রূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সঞ্জাত একপ্রকার অনুভূতি বা জ্ঞান। অন্ধকার ঘরে বসিয়াছিলাম, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না; ল্যাম্পটা জ্বলিল, অমনি ঘর আলোকময় হইল, যেখানে যে জিনিস সব দেখিতে লাগিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ব্যাপারখানা কি?

পদার্থ-বিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক পদার্থের অণু সর্ব্বদাই কম্পিত হইতেছে। এবং প্রত্যেক পদার্থই বিশ্বব্যাপী এক অত্যন্ত কঠিন অথচ অদৃশ্য পদার্থের মহা সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এই পদার্থের নাম 'ঈথর' বা আকাশ। পদার্থ সকলের অণুর কম্পনের ধাক্কায় 'ঈথর' বা আকাশ-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গান্দোলন সঞ্চালিত হইয়া অপর পদার্থে ধাক্কা দিলে সে পদার্থের অণুগুলি আন্দোলিত হইয়া উঠে, তাহাদের কম্পন-আঘাত পুনরায় ঈথর-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সে তরঙ্গাঘাত আবার অন্য পদার্থের পরমাণুতে কম্পন উপস্থিত করে। এইরূপ আণবিক কম্পন ও ঈথর-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সংঘাত, হ্রাস বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন পরাবর্ত্তন সর্ব্বদাই চলিতেছে। এই সকল ছোট বড়, ধীর দ্রুত, নানাজাতীয় ঈথর-তরঙ্গ আমাদের ইন্দ্রিয়ে আসিয়া প্রতিহত হইয়া স্নায়ু সকলকে আঘাত করে; সেই আন্দোলন স্নায়ু-যোগে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় ও সেই সঙ্গে মানসিক অনুভূতি জন্মে। মস্তিষ্কের আণবিক কম্পনের প্রকারভেদে মানসিক অনুভূতিরও প্রকারভেদ হয়।

ল্যাম্পের শলিতার উপরের তৈল বাতাসের অক্সিজেনের সহিত অতি-বেগে মিলিত হইতেছে, তজ্জন্য অণুগুলিও খুব কম্পিত হইতেছে। তাহার ধাক্কা ঈথরে লাগিয়া তাহাতে নানাপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। সেই সকল তরঙ্গ আমার দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিহত হইয়া তথাকার স্নায়ুসকলকে নানা প্রকারে কম্পিত করিতেছে, সেই সকল কম্পন মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ল্যাম্পের আলোকের অনুভূতি জন্মিতেছে। দীপ-শিখার নানাপ্রকার আণবিক কম্পন নানাপ্রকার ঈথর-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল; এই সকল তরঙ্গ টেবিল, চেয়ার, ছবি, গেলাস, বাক্স প্রভৃতির উপর পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে। এই সকল পদার্থ সকল প্রকারের তরঙ্গকেই ফিরাইয়া

দেয় না। প্রত্যেকে আপন আপন প্রকৃতি-অনুসারে বাছাই করিয়া কতক-গুলি ঢেউকে ফিরাইয়া দেয়। এই বাছাই-করা ফেরৎ-পাঠান ঢেউর প্রকারানুসারে আমাদের বর্ণবৈচিত্র্যের অনুভূতি হয়।

ঢেউ নানা প্রকারের হয়। সকল ঢেউ আমাদের সকল স্নায়ুকে সমান উত্তেজিত করিতে পারে না। কতকগুলি ঈথর-তরঙ্গ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে লাল, নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণের অনুভূতি জন্মাইতে পারে। অনেক ঈথর-তরঙ্গ আছে, যাহার আঘাতে আমাদের চক্ষুর স্নায়ু কম্পিত হয় না, তাহাতে আলোকেরও অনুভূতি হয় না। উত্তাপ, ঈথরের একপ্রকার তরঙ্গ-জনিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্নায়ু-কম্পনসঞ্চালিত মস্তিষ্কের আণবিক কম্পনবিশেষের আনুষঙ্গিক অনুভূতিবিশেষ। যে ঈথর-তরঙ্গে আমাদের উত্তাপের অনুভূতি জন্মায়, সে তরঙ্গে আলোকের অনুভূতি জন্মায় না। যে তরঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কম্পিত করিয়া আলোকের অনুভূতি জন্মায়, সে তরঙ্গ স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কম্পিত করিতে পারে না, সুতরাং তাপেরও অনুভূতি জন্মায় না।

দর্শনেন্দ্রিয়ে অসংখ্য স্নায়ু আছে। সকল স্নায়ুই ঈথরের সকল তরঙ্গে কম্পিত হয় না। একজাতীয় তরঙ্গে কয়েকটিমাত্র স্নায়ু কম্পিত হইয়া পীত বর্ণের অনুভূতি জন্মায়। আর একজাতীয় তরঙ্গে অপর কয়েকটি স্নায়ু কম্পিত হইয়া লাল বর্ণের অনুভূতি জন্মায়। অন্য একজাতীয় তরঙ্গে অন্য কয়েকটি স্নায়ু কম্পিত হইয়া নীল বর্ণের অনুভূতি জন্মায়, আবার পাঁচ রকমের তরঙ্গ আসিয়া এক সঙ্গে পাঁচ গোছা স্নায়ুকে কম্পিত করিলে পাঁচবর্ণ-মিশান এক বর্ণের অনুভূতি জন্মে। বিশেষ বিশেষ তরঙ্গমালা বা রশ্মির আঘাতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুচ্ছ "সাড়া" দেয় বলিয়া বিশেষ বিশেষ বর্ণানুভূতি জন্মে। তোমার চোখে যদি এমন স্নায়ু না থাকে, যাহা নীল আলোকতরঙ্গের আঘাতে কম্পিত হইতে পারে, তবে তোমার নীলবর্ণের অনুভূতি জন্মিবে না, তুমি "নীল-কাণা" হইবে। এইরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা "লাল-কাণা" বা "সবুজ-কাণা" যাহারা লাল ও সবুজ বর্ণে কোন প্রভেদ করিতে পারে না। যদি তোমার চোখের স্নায়ুগুলি ঈথরের কোনও প্রকার তরঙ্গের আঘাতে কম্পিত না হয় বা "সাড়া" না দেয়, তবে তুমি অন্ধ, তোমার কোনও বর্ণানুভূতি হইবে না। তোমার নিকট সবই অন্ধকার।

ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর ভিন্ন ভিন্ন কম্পনে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জন্মে। এমোনিয়া বা নিশাদল রসনায় ঠেকিলে তথাকার স্নায়ু সকল এক প্রকারে কম্পিত হয়,

তাহাতে লবণ-স্বাদের অনুভূতি হয়। সেই এমোনিয়া নাসারন্ধ্রে ঠেকিলে তথাকার স্নায়ুগুলি অন্য প্রকারে কম্পিত হয়, তাহাতে এমোনিয়ার তীব্র ঝাঁজাল গন্ধের অনুভূতি হয়। সেই এমোনিয়া চক্ষে বা কোন ক্ষতস্থানে ঠেকিলে তথাকার স্নায়ুগুলি আর এক প্রকারে কম্পিত হইয়া জ্বালারূপ অনুভূতি উৎপন্ন করে। কোন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু যদি পীড়া প্রাপ্ত হয় বা বিকৃত হইয়া যায়, যখন তাহাতে কোন 'সাড়া' দিবার ক্ষমতা থাকে না ; তখন সেই ইন্দ্রিয়পথে আমাদের মনের মধ্যে যে বিশেষ অনুভূতি জন্মিত, তাহা আর জন্মে না।

আমাদের ইন্দ্রিয় সকলই বস্তুগণের অস্তিত্বের প্রকাশক। পদার্থ সকলের আণবিক কম্পন ঈথরে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সেই তরঙ্গ আসিয়া আমাদের কোনও এক ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুকে কম্পিত করে, সেই কম্পন মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইয়া মনে এক বিশেষ অনুভূতি জন্মে, তাহাতেই পদার্থের অস্তিত্ব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এমন অনেক আণবিক কম্পন ও তজ্জনিত এমন অনেক ঈথর-তরঙ্গমালা বা রশ্মি থাকিতে পারে, যাহার আঘাতে আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুই কম্পিত হয় না, সুতরাং সে সকলের অস্তিত্বও আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

দুইটা তানপুরা বা সেতার আনিয়া এক সুরে বাঁধিয়া ঘরের দুই কোণে দুইটাকে মুখোমুখী করিয়া রাখিয়া দাও। একটা তানপুরা বা সেতারের কোনও একটা তার টানিয়া ছাড়িয়া দাও, তারটা কাঁপিতে থাকিবে ও শব্দ শুনা যাইবে। তারের কম্পনে ঘরের বায়ুতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে, সেই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে পরিচালিত হইতেছে। সেই বায়বীয় তরঙ্গ আঘাত আমাদের কর্ণের স্নায়ুকে কম্পিত করিলে শব্দের অনুভূতি জন্মে। তানপুরা বা সেতারের সব তার সমান কাঁপে না, সুতরাং তাহাদের কম্পনে বায়ুতে সমান বা একইরূপ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় না। আমাদের কর্ণেও অনেক স্নায়ুগুচ্ছ আছে। এক এক স্নায়ুগুচ্ছ এক এক প্রকার তরঙ্গে কম্পিত হয় ও এক এক প্রকার শব্দের অনুভূতি জন্মায়। মানুষ যেমন 'রংকাণা' হয় তেমনি আবার "সুর-কালা" হয়, তাদের কাণ এমনই ভোঁতা যে, নানা সুরের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিতে পারে না।

ঘরের এককোণের সেতারের একটা তার টানিয়া ছাড়িয়া দাও, শব্দ হইবে। অপর কোণে দ্বিতীয় সেতারের নিকট গিয়া দেখ, সে সেতারের একটি

তার আপনা-আপনি কাঁপিতেছে ও তাহা হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। অন্য সব তার স্থির আছে। এবার প্রথম সেতারের অন্য একটি তার বাজাও, দ্বিতীয় সেতারের আর একটি তার বাজিয়া উঠিবে। প্রথম সেতারের দুটি, তিনটি, বা সকল তারগুলি বাজাইয়া দাও। দ্বিতীয় সেতারেরও দুটি, তিনটি, বা সকল তারগুলি আপনা-আপনি বাজিয়া উঠিবে। এক সেতারের যে তার বাজাইবে, সেই তারের অনুরূপ বা সেই সুরে বাঁধা অপর সেতারের সেই তার বাজিয়া উঠিবে, অন্য তার বাজিবে না।

দ্বিতীয় সেতারটার যদি চেতনা থাকিত, তবে তাহার একটা তার বাজিয়া উঠিলেই সে বুঝিতে পারিত যে,ঘরের মধ্য হইতে এক রকম শব্দ আসিতেছে। পাঁচ সাতটা তার বাজিয়া উঠিলে বুঝিতে পারিত, পাঁচ সাত রকমের শব্দ আসিতেছে। যদি তাহার তিনটা তার ছিঁড়িয়া যায় বা ঢিল হইয়া যায়, তবে প্রথম সেতারে তদনুরূপ তার যতই কেন আন্দোলিত হইতে থাকুক না, তাহার শব্দে তোমার কাণ যতই কেন ঝালাপালা হউক না, সচেতন সেতার বেচারা তাহার কিছুই জানিতে পারিবে না। সে মনে করিবে, তিন রকম শব্দ আর হইতেছে না। যদি তাহার সব তার ছিঁড়িয়া বা ঢিলা হইয়া যায়, তবে তাহার আশে পাশে ভীষণ তরঙ্গান্দোলন,প্রচণ্ড বজ্রনিনাদ হইলেও, সে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেই বাস করিবে।

আমাদের কাণও ঐ সেতারের মত। গোটাকয়েক তরঙ্গাঘাতে সাড়া দেয়, সব তরঙ্গে সাড়া দিবার ক্ষমতা নাই। এমন ধীর গম্ভীর শব্দ আছে, যাহা আমরা কাণে ঠাহর করিতে পারি না। এমন তীব্র শব্দ আছে, যাহা আমরা কাণে ধরিতে পারি না। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বায়ুর তরঙ্গ-কম্পন এক সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম হইলে তাহার আর শব্দের অনুভূতি জন্মে না। আবার এক সেকেণ্ডে ৪০,০০০ হাজার বারের অধিক হইলেও শব্দ বলিয়া শুনা যায় না। সঙ্গীতে যে আওয়াজ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কম্পনসংখ্যা সেকেণ্ডে ৩২ বার হইতে ৪,০০০ বারের মধ্যে। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের অনুভূতি জন্মে। বায়ুশূন্য স্থানে শব্দের উৎপত্তি হয় না। ঈথরের তরঙ্গে আলোক, উত্তাপ প্রভৃতির উৎপত্তি।

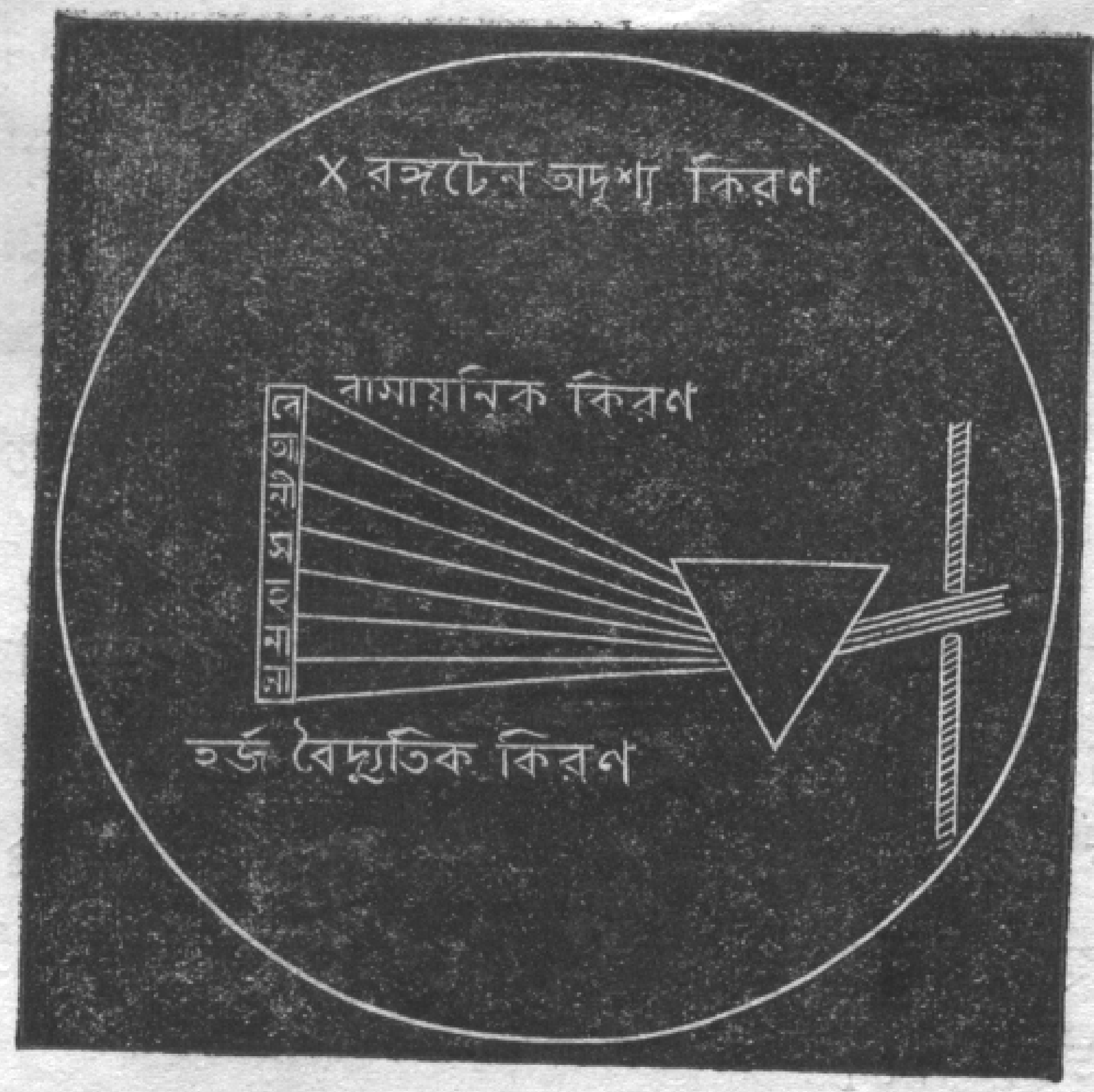
আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর এইরূপ অনেক ঈথর-তরঙ্গমালা, রশ্মি বা কিরণ আছে, যাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা অন্য প্রকারে পাই। সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মায় না বটে, কিন্তু সেগুলির রাসায়নিক পদার্থের

পরিবর্ত্তনের শক্তি আছে। তাহারা কোন কোন যৌগিক পদার্থের মূল উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া দিতে পারে, আবার একত্রসংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থকে সংশ্লিষ্ট করিয়া এক যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে পারে। অথবা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের উপর পড়িয়া তাহাদের অণুগুলিকে এরূপ ভাবে কম্পিত করিয়া দেয় যে, অন্ধকারে সেই পদার্থগুলি আপনা-আপনি জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে থাকে। চক্ষুর দ্বারা ঈথরের আলোকতরঙ্গের অনুভূতি হয়। ত্বক্ দ্বারা উত্তাপ-তরঙ্গের অনুভূতি হয়। তাড়িতও ঈথরের তরঙ্গভেদ। তাড়িত-তরঙ্গ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। তাড়িত-তরঙ্গ ধরিবার জন্য বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবশ্যক। সেই সব যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত-তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যায়।

উত্তাপ, আলোক, তাড়িত,সবই ঈথরের তরঙ্গ বা পদার্থকণার আন্দোলন। তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য বা অনুকম্পনের দ্রুততার পার্থক্য ভিন্ন ইহাদের মধ্যে অন্য কোনও বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সকলেই জানে, ত্রিপার্শ্ব কাচফলকের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিলে সেই শুভ্ররশ্মি বিশ্লিষ্ট হইয়া নানা রংবিশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়। সেই বর্ণচ্ছত্রের এক-প্রান্তে লাল রং, অপর প্রান্তে বেগুনি রং থাকে। পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, লালবর্ণোৎপাদক তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং বেগুনিবর্ণোৎপাদক তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। লাল আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য .,০০০০২৬ ইঞ্চ অর্থাৎ এক ইঞ্চের দশলক্ষভাগের ২৬ ভাগ বা প্রায় $\frac{১}{৩৯০০০}$ ইঞ্চ। বেগুনিরঙ্গের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য .,০০০০১৬ ইঞ্চ বা প্রায় $\frac{১}{৬০০০০}$ ইঞ্চ; অন্যান্য বর্ণোৎপাদক তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য এই দুই সীমার মধ্যে। লাল আলোর তরঙ্গ এক সেকেণ্ডের কোটী ভাগের একভাগে চল্লিশ কোটী বার কম্পিত হয়। হল্‌দে আলোর তরঙ্গ পঞ্চাশ কোটী বার কম্পিত হয়, নীল আলোর ষাট কোটী বার, ও বেগুনে আলোর তরঙ্গ সত্তর কোটী বার কম্পিত হয়।

বর্ণচ্ছত্রের লাল আলোর পর কি আছে, চোখে ঠাহর হয় না। বেগুনে আলোর পর কি আছে, তাহাও চোখে ঠাহর হয় না। তরঙ্গকম্পন সেকেণ্ডে ৪৫০,০০০,০০০,০০০,০০০ বার হইতে ৭২৭,০০০,০০০,০০০,০০০, বারের মধ্যে হইলে আমাদের চক্ষুর গ্রাহ্য হয়। আমাদের দর্শনযন্ত্র এমনই ভাবে গঠিত



যে,এই সীমার অতীত দ্রুততর বা ধীরতর কম্পন ধরিতে পারে না। বর্ণচ্ছত্রের লাল আলোর পরেও যে অপেক্ষাকৃত ধীরতর কম্পমান দীর্ঘতর তরঙ্গ সকল আছে, এবং বেগুনি আলোর পরও যে অপেক্ষাকৃত দ্রুততর কম্পমান ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ সকল বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উপায় না থাকিলেও, তাহাদের অন্যান্য অনেক পদার্থের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার যে ক্ষমতা আছে, তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে তাহাদিগের অস্তিত্ব অবগত হই।

সূর্য্যমণ্ডলের পদার্থ সকলের আণবিক কম্পন ঈথরসমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সেই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বেগে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং আমাদের চক্ষে লাগিয়া উজ্জ্বল শুভ্র আলোকের অনুভূতি জন্মায়। এই শুভ্রালোকের অনুভূতি কি মৌলিক, বিশুদ্ধ, বা অমিশ্র অনুভূতি? অর্থাৎ, শুভ্রালোকের অনুভূতি কি একই প্রকার তরঙ্গাভিঘাতের ফল, না বহুবিধ তরঙ্গের যুগপৎ আঘাতসঞ্জাত বহুবিধ অনুভূতির সমষ্টি বা যৌগিক ফল? ত্রিপার্শ্ব কাচ দ্বারা শুভ্রালোকের বিশ্লেষণ ঘটে। বিভিন্ন তরঙ্গমালা (অর্থাৎ বিভিন্ন মূলবর্ণ) তাহাদের কম্পনের সংখ্যানুসারে অথবা তরঙ্গের দৈর্ঘ্যানুসারে যথাক্রমে পৃথক হইয়া পড়ে। বর্ণ-চ্ছত্রের বিভিন্নবর্ণের সংযোগেই যে শুভ্রালোকের উৎপত্তি, তাহা নানা পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়। বিস্তৃত বর্ণচ্ছত্রকে যদি দৃষ্টিকাচ বা আতুসি কাচ, অথবা পুটাকার দর্পণ দ্বারা এক কেন্দ্রে সংনিপাতিত বা প্রতিফলিত করা যায়, তবে

সেই কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন বর্ণের সমাহারে শুভ্রালোক দৃষ্ট হইবে। একখানি মণ্ডলাকার সাদা কার্ড বোর্ড (কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে) বৃত্তখণ্ডাকারে সাত ভাগ করিয়া বর্ণচ্ছত্রের সাত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া যদি খুব বেগে চক্ষের সমক্ষে ঘুরান যায়, তবে চক্ষে আর বিভিন্ন বর্ণ দেখা যাইবে না, সব রং মিশিয়া সাদা রঙ্গের অনুভূতি জন্মিবে।

সূর্য্যের শ্বেত রশ্মি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ। সূর্য্য হইতে নানাপ্রকার তরঙ্গ আসিয়া এক সঙ্গে চক্ষে পড়ে; তাহাতে সাদা আলোর অনুভূতি হয়। সকল প্রকার তরঙ্গকে এক সঙ্গে পড়িতে না দিয়া এক এক প্রকার তরঙ্গকে এক এক সময়ে পড়িতে দিলে এক এক বর্ণের অনুভূতি জন্মে। চক্ষুর গ্রাহ্য বা বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ সকল, যাহা বর্ণচ্ছত্রের একপ্রান্তে লাল ও অপর প্রান্তে বেগুনি ও মধ্যস্থলে অপরাপর বর্ণের সৃষ্টি করে, তাহা ব্যতীত কি আর কোনও ঈথর-তরঙ্গ নাই?

ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

জষ্টিস্ রাণাড়ের বক্তৃতা।

বিগত ৯ই জুন পুণার ফ্রেগুস্ লিবারেল এসোসিয়েশন নামক সভায় মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়ের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। লেখক মহাশয় বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে মহারাষ্ট্রজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস-বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। (১) তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যকালে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, মহারাষ্ট্রপতিগণের রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে গত তিন বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, উল্লিখিত প্রবন্ধটি তাহারই স্থূল বিবরণে পরিপূর্ণ। মহারাষ্ট্ররাজ্যের অভ্যুদয় ও অধঃপতনের কারণনিচয়ও প্রবন্ধারম্ভে

(১) এই ত্রিংশ বৎসরের ফলস্বরূপ তিনি সংপ্রতি ইংরাজী ভাষায় Maratha History Vol I. নামক একখানি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠ করিবার জন্য প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ণিত সুহৃৎসভায় উহার কিয়দংশমাত্র পঠিত হয়। তৎপরে বিগত ৩১শে জুন বোম্বাইয়ের এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে উহার সমগ্র পঠিত হইয়াছে। রাও বাহাদুর রাণাড়ে মহোদয়ের প্রবন্ধের যে অংশ এদেশবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অভিনব-তত্ত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে পারে, সুখের বিষয়, তাহার কোনও অংশই তাঁহার পুণার বক্তৃতায় পরিত্যক্ত হয় নাই। এই কারণে বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা তাঁহার পুণাতে পঠিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম পাঠকগণের গোচর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

জেতৃজাতির রচিত ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া কেহ কখনও স্বদেশীয় ইতিহাসের মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে পারে না। মুসলমান ও ইংরাজ লেখকদিগের ইতিহাস-রচনাকৌশলে ভারতবাসীর অক্ষয়কীর্ত্তিসমূহ আমাদিগের নিকট বহুপরিমাণে অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় রহিয়াছে। আমরা মনে করি, বর্ত্তমান কালে রাজ-কার্য্যসমাধানের জন্য যেরূপ বিভিন্নবিভাগের (departments) সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যপরিচালন, পরিদর্শন ও সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশের জন্য বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন, প্রত্যেক বিষয়ের ব্যবস্থা বন্দোবস্তের যেরূপ পরিপাটী অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সেরূপ কিছুই ছিল না। ইংরাজেরাই এ দেশে এই সকল সুব্যবস্থার ও সুশৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুরাজন্যবর্গ বিলাসব্যসনে ও যথেচ্ছাচারিতার অনুবর্ত্তনে, ক্বচিৎ আত্মকলহে ও যুদ্ধাভিযানে সময়ক্ষেপ করিতেন; কর্ম্মচারীরা রাজার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপপূর্ব্বক স্বোদরপূরণ ও প্রজাপীড়ন করিয়া বিশৃঙ্খলার বাহুল্যে দেশটাকে রসাতলের সমীপবর্ত্তী করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত মহারাষ্ট্রীয় নরপতিগণ অর্দ্ধশিক্ষিত ও রাজ্যের সুশাসন-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই দেশের সর্ব্বত্র একটা ঘোর অরাজকতার বিস্তার হইয়াছিল।

স্বদেশীয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞতাহেতু যাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, রাণাড়ে মহোদয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহা-দিগের ভ্রান্তি বহুপরিমাণে অপনোদিত হইবে। তাঁহার সমস্ত মত সক-লের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ না হইতে পারে; তথাপি তাঁহার সংগৃহীত তত্ত্বগুলি যে সকলেরই পরিজ্ঞেয় ও আলোচ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশেষ স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্যের অধিপতি পেশওয়েগণ যে বর্ত্ত-

মান কালের ন্যায় রাজকার্য্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া উহা সুনির্ব্বাহিত করিতেন, প্রত্যেক বিভাগের কাগজপত্র ও হিসাব প্রভৃতি যে এখনকারই মত সযত্নে পরীক্ষিত ও সরকারি দপ্তরখানায় সংরক্ষিত হইত, রাও বাহাদুর রাণাড়ে মহোদয় তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, পেশওয়েগণের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব এখনও পুণার দপ্তরে অল্লাধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শিন্দে (সিন্ধিয়া), হোলকর, গায়কওয়াড় প্রভৃতি সর্দারগণ উত্তর ভারতে যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রের নকল, হিসাব-নিকাশের তালিকা প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক অদ্যাপি পুণার দপ্তরে রক্ষিত আছে। ঐ সকল কাগজপত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালে পেশওয়েগণের অজ্ঞাতসারে রাজ্যের কোনও স্থানে কোনও কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধির যথেচ্ছ কার্য্য করা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সামরিকবিভাগ, আরমার* (নৌসেনা বিভাগ), বিচারবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা-বিষয়ক বিভাগ, দেবোত্তর বিভাগ প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য কঠোর শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত। পেশওয়েদিগের রাজকার্য্যের মধ্যে শিক্ষা-বিভাগেরও সমাবেশ ছিল। বিদ্যাশিক্ষায় সাধারণকে উৎসাহদানকল্পে তাঁহারা প্রতিবৎসর বহুলক্ষ মুদ্রার ব্যয় করিতেন। রেলপথ, তারে সংবাদ-প্রেরণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক নবাবিষ্কার-মূলক কয়েকটি কার্য্যবিভাগ ব্যতীত আর সমস্ত বিভাগই মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, লবণবিভাগ, আবকারিবিভাগ ও আদমসুমারি (Census) বিভাগও সেকালে বিদ্যমান ছিল, এবং তাহাদের কার্য্য বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত সুনির্ব্বাহিত হইত। ফলতঃ রাজকার্য্যের এরূপ ব্যবস্থা-বিভাগ না থাকিলে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য কখনই দেড়শত বৎসর স্থায়ী হইতে পারিত না। রাওবাহাদুর রাণাড়ে মহোদয় পুণাদপ্তরের কাগজপত্র হইতে এই সকল বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, পুণাদপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র এখন পাওয়া যায় না। উহার অধিকাংশ কাগজপত্রই বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছে। পেশওয়েগণের নিকট হইতে যাঁহারা জাইগীর প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের

---

* আরমার—এই মারাঠা শব্দটী পোর্ত্তুগীজ আরমাড়া বা ইংরাজী আরমামেণ্ট শব্দজাত।

স্বত্বাদিনির্ণয়ের জন্য ও রাজ্যের আয়ব্যয়ের পরিমাণাদি অবগত হইবার নিমিত্ত 'ইনাম কমিশন' পুণাদপ্তরের যে সকল কাগজপত্র নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেবল সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই রাওবাহাদুর রাণাড়েকে ঐতিহাসিক তত্ত্বাদির নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছে। বোম্বাই গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে এই সকল কাগজপত্রের কতকগুলির মুদ্রণপূর্ব্বক প্রচার করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, এবং তদনুসারে সাতারা হইতে কতিপয় কাগজপত্র দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট যে স্বল্পসংখ্যক কাগজপত্র মুদ্রণের অনুমতি দিয়াছেন, সেগুলির সমুদায় প্রকাশিত হইলে তাহার পরিমাণ ১৬।১৭ খণ্ডের নূ্যন হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

রাণাড়ে মহোদয়ের প্রবন্ধের মুখবন্ধে এই কাগজপত্রের পরিচয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধারের যোগ্য। মহামতি রাণাড়ে বলেন,—"বিগত তিন বৎসর আমি আমার অবকাশকালের অধিকাংশ শাহু মহারাজের সিংহাসনারোহণাবধি শেষ বাজীরাওয়ের রাজ্যত্যাগ পর্য্যন্ত এক শত বৎসরের মধ্যে লিখিত রোজনামচার পাঠে অতিবাহিত করিয়াছি। এই রোজনামচাগুলি রাওবাহাদুর বাড় মহোদয় পুণাদপ্তরের কাগজপত্র হইতে বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। সেগুলি মুদ্রিত করিলে ফুলস্কেপ আকারের ন্যূনাধিক ২২ সহস্র পৃষ্ঠা হইবে। বাড় মহাশয় ঐ সকল কাগজপত্রের মর্ম্মার্থও ইংরাজীতে সংকলিত করিয়াছেন। এই দৈনন্দিনলিপিসমূহে ১৭০৮ খৃঃ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক বৎসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়কালের ইতিহাসরচনার পক্ষে এই সকল রোজনামচার কার্য্যকারিতা সামান্য নহে।

"গ্রাণ্টডফ প্রভৃতির ইতিহাসে ও আমাদিগের মারাঠী বখরনিচয়ে সেকালের রাজনীতিক অবস্থার চিত্রই সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে। সেকালের লোকের রীতিনীতির স্থিতি বিষয়ে ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় একরূপ মৌনাবলম্বী। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্ররাজ্যবাসীর গার্হস্থ্যপ্রণালী কিরূপ ছিল, কিরূপে তাঁহাদিগের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছিল, অবকাশকালে কোন্ কোন্ বিষয় তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিত, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগের সারল্য, ইষ্টদেবতায় ভক্তি, ধর্ম্মনীতির বল এবং রীতিনীতি আচারব্যবহার প্রভৃতি কিরূপ ছিল, তাহার বিবরণ প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থসমূহে দুর্লভ। কেবল তাহাই নহে, সেকালের রাজস্ব-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা, খাজনা আদায় করিবার

নিয়মাবলী, এবং লবণ, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য পদার্থের শুল্ক-আদায়-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, বিদেশ হইতে করাদানকালে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইত, কর্ম্মচারী-দিগের বেতনপ্রদান, জাতীয়ঋণগ্রহণ এবং তাহার ব্যয় ও পরিশোধের ব্যবস্থা, দেওয়ানি ফৌজদারী মামলার বিচারপদ্ধতি, সৈন্য-সংগ্রহ, দুর্গরক্ষার প্রণালী, নৌবিভাগের সৈনিকনির্ব্বাচন, পুলিশ বিভাগ, ডাক বিভাগ, টাঁকশাল, কারাগার, পূর্ত্তকার্য্য, ধর্ম্মার্থদান, বৃত্তিনির্দ্ধারণ (Pension), চিকিৎসাবিদ্যায় ও ঔষধক্রিয়ায় রাজসাহায্য, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎসাহ-দান, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিবিধান প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য কিরূপ ভাবে সংসাধিত ও সম্পাদিত হইত, তাহারও কোনও সংবাদ বর্ত্তমান ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই কারণে অনেকে মনে করেন, পূর্ব্বকালে মহারাষ্ট্র নরপতি-গণের এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইবেন যে, এই সকল বিষয়েই সেকালের পেশওয়ে সরকারের যথোচিত লক্ষ্য ছিল, এবং তাঁহারা বিশেষ দক্ষতাসহকারে এই সকল বিভাগের কার্য্যেরই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরন্তু আবশ্যক মত সামাজিক রীতিনীতির সংস্কারসাধনেও তাঁহারা বিমুখ হইতেন না। অধুনা অনেকে রাজার এই কার্য্যকে গর্হিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখনকার ন্যায় সেকালের লোকেরা সমাজসংস্কার বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ রাজার কর্ত্তব্যের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন না। সে যাহা হউক, এইরূপ নানা কথা পূর্ব্বোক্ত রোজনামচা পাঠে অবগত হওয়া যায়। এই দৈনন্দিনলিপিগুলি পেশওয়েগণের অধীন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যথাসময়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এই সকল কাগজপত্রে যে কোনও প্রকার ভ্রম বা ত্রুটি নাই, এ কথা আমি বলিতে পারি না। তবে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের অভ্যুদয়কালের শতবর্ষের দিনচর্য্যা ও কার্য্যানুক্রম জানিবার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান অন্যত্র দুর্লভ।”

এইরূপ প্রস্তাবনার পর রাণাড়ে মহোদয় মহারাষ্ট্র-সমাজের অভ্যুদয় ও অধঃপতনের কারণনিচয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের শতাধিক-বর্ষব্যাপী রাজ্যকালের প্রথমার্দ্ধে কোন্ কোন্ কারণে তাঁহাদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমান, শিখ, জাঠ, রোহিলা, রাজপুত, গুর্জ্জর, পোর্ত্তুগীজ,

নিজাম, হাইদার প্রভৃতি ভারতের বিবিধ শক্তি কোন্ কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট অবনতমস্তক হইতে বাধ্য হইয়াছিল, আর কি কারণেই তাঁহাদিগের রাজ্যকালের শেষ পঞ্চাশৎ বৎসরে তাঁহাদিগের ক্রমাগত শক্তিহ্রাস হইতেছিল, তাহার অনতিদীর্ঘবর্ণনায় প্রবন্ধের এই অংশ পর্য্যবসিত হইয়াছে। শিবাজী যেরূপে রাজ্যরচনা ও রাজমণ্ডলস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যরক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, সামন্তগণের সম্বন্ধে তিনি যেরূপ নীতির অনুসরণ করিতেন, এবং পরবর্ত্তী নরপতিগণ সেই সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া যেরূপে আপনাদিগের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর লেখক মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় সামরিক বিভাগের পরিচয় দান ও সমালোচনা করিয়াছেন।

অতঃপর মারাঠাদিগের রাজ্যপালনপদ্ধতির প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। এ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রাজ্যের আয়ব্যয়ের কথাই বলিতে হয়। রাওবাহাদুর রাণাড়েও সেই জন্য প্রথমেই সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রজাপালনবিষয়ে পেশওয়েগণ কখনও অমনোযোগিতা প্রকাশ করেন নাই। শেষ দশায় নানা বিষয়ে পূর্ব্ব ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাষ্ট্ররাজ্যে খাজনার জন্য প্রজার উপর কখনও জুলুম হয় নাই, খাজনার পরিমাণও প্রজার পক্ষে দুর্ব্বহ ছিল না। বরং মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রজাগণের পক্ষে বিশেষ সুখকর ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণে এ বিষয়ে পেশওয়েগণের প্রশংসা সকলকেই করিতে হইবে। জমীর খাজনার ন্যায় শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থাও লোকের পক্ষে আদৌ কষ্টকর ছিল না। দোকানদারদিগের ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে তামাক ও লবণ-ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে স্বল্পপরিমাণে কর গৃহীত হইত। লবণের শুল্ক কোনও স্থানেই প্রতি খণ্ডীতে বা বিংশতি মণে দুই টাকা দশ আনার অধিক ছিল না। কোনও কোনও স্থানে এক টাকা ছয় আনা দিয়াই ব্যবসায়ীরা নিষ্কৃতিলাভ করিত। সেকালের তুলনায় এখন আমাদিগকে ২০ গুণ হইতে ৩০ গুণ অধিক শুল্ক দিয়া লবণ ভক্ষণ করিতে হয়! তদ্ভিন্ন লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় পেশওয়েগণের একাধিকৃত ছিল না বলিয়াও সে বিষয়ে লোকের উপর অবিচার অত্যাচার ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তাল-খর্জ্জূরাদির রস প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর যে কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার পরিমাণও নিতান্ত সামান্যই ছিল। তথাপি

দেশের লোকে যাহাতে মাদকসেবী না হয়, তৎপ্রতি পেশওয়েগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। অবাধবাণিজ্যনীতি এদেশবাসীর নিকট অবিদিত থাকায় মহারাষ্ট্রভূপতিগণ বিদেশাগত সর্ব্বপ্রকার মালের উপর আমদানি মাশুল আদায় করিতেন। কিন্তু তাহার পরিমাণও যে অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় না। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বিষয়ে রাজা শুল্কগ্রহণ করিতেন না।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় সেকালেও সামরিক বিভাগের ব্যয়-বাহুল্যে রাজ-কোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় ও জাতীয়ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আপনাদিগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অব্যাহত রাখি-বার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অনবরত যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া রাজকোষে প্রায়ই অর্থের বিশেষ অনটন ঘটিত। প্রথম বাজীরাও প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-নেতৃবর্গও উত্তর-ভারতে অভিযান করিবার সময় ঋণগ্রহণে বাধ্য হইতেন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত বালাজী বাজীরাওকে শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত সুদে দেড়কোটী টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশেষ ক্ষতি ঘটায় প্রথম মাধবরাও জাতীয়ঋণপরিশোধের কোনও প্রকার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বরং তিনি যখন অন্তিমশয্যায় শয়ান, সেই সময়ে মহাজন-দিগের উৎপীড়নে মন্ত্রিসমাজকে ২॥০ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর নানাফড়নবীসের ব্যবস্থাগুণে প্রায় সমস্ত জাতীয় ঋণ পরিশোধিত হইয়া কয়েক লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। শেষ বাজীরাও যে সম্পূর্ণ ঋণশূন্য হইয়াছিলেন, তাহাই নহে, তাঁহার সময়ে রাজকোষে বহুপরিমিত অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল।

বিদ্যাশিক্ষায় লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য পেশওয়েগণ প্রতি বৎসর বহু অর্থের ব্যয় করিতেন। বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নকারীরা রাজকোষ হইতে বার্ষিক দক্ষিণা পাইতেন। বেদ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশ হইতে দক্ষিণাগ্রহণের জন্য মহারাষ্ট্রে সমাগত হইতেন। পুণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা দক্ষিণা-পুরস্কার লাভ করিতেন, ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের বিশেষ খ্যাতি হইত। এই কারণে পুণার দক্ষিণা পাইবার জন্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই দক্ষিণা-দান-কার্য্যে মহারাষ্ট্রপতিগণ বার্ষিক ৬০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন। শেষ বাজীরাওয়ের সময়ে সর্ব্বপ্রকার দানধর্ম্মের বার্ষিক চারি

লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভিন্ন যদিও আর কাহারও এই দক্ষিণালাভের অধিকার ছিল না, তথাপি পুরাণ-পাঠক, কথক, সঙ্গীত-বিশারদ, ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণও যথোচিত পুরস্কার ও বার্ষিক বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হইতেন না। ফলতঃ গুণিমাত্রেরই পেশওয়েদিগের দরবারে আদর ছিল। মারাঠা কবিগণও আপনাদিগের কাব্যগ্রন্থের প্রচারের জন্য রাজ-সাহায্য লাভ করিতেন। ষট্‌কর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণগণ যাহাতে অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জাইগীর ও বৃত্তি প্রদান করা হইত। ঐতিহাসিকগ্রাম্যগীতি-গায়কেরাও রাজার নিকট উৎসাহ পাইত। পেশওয়েগণ বেদ-বিদ্যালয় ও কাব্যদর্শনাদির অধ্যাপনার্থ পাঠশালাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনকল্পে আবশ্যক অর্থ ব্যয় করিতেন। যাঁহারা স্বীয় ব্যয়ে ঐরূপ বিদ্যালয়াদির স্থাপন করিতেন, তাঁহা-দিগকেও রাজকোষ হইতে 'গ্রাণ্ট' বা সাহায্য দেওয়া হইত। দরিদ্র বালক-দিগের শিক্ষার ও ভোজনাদির সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পিকুলের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য মহারাষ্ট্র-ভূপতিরা তাহাদিগের নির্ম্মিত শিল্পজাত বহুমূল্যদানে ক্রয় ও তাহাদিগকে অর্থদানে পুরস্কৃত করিতেন।

বিচারবিভাগের কার্য্য বিশেষ দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত যাহাতে সমা-হিত হয়, পেশওয়েগণ তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিচারকের পদে প্রায়ই ব্যবহার-বিশারদ বুদ্ধিমান্ পাপভীরু ও সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তির নিয়োগ হইত। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদীর মনো-নীত পঞ্চায়েত লইয়া বিচারক বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ বিচারে কোনও পক্ষেরই অসন্তোষের কারণ থাকিত না। তথাপি রাজ্যের সর্ব্বস্থানের মোকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্য পুণায় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামীর নিকট অর্থদণ্ড ও ফরিয়াদীর নিকট পুরস্কার গৃহীত হইত। নানা ফড়ণবীসের মন্ত্রিপদ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্ররাজ্যে আসামীদিগের প্রতি প্রায়ই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। ফাঁসী, শূলারোপ, শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কোনও প্রকার প্রাণান্তকর দণ্ড মহারাষ্ট্রে আদৌ প্রচলিত ছিল না। দুর্গোপরি দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখাই সেকালে চরম দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইত। কারাগারেও বন্দীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার পর মহারাষ্ট্রশক্তির অবনতির সহিত দেশে যে

পরিমাণে অরাজকতা বাড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে দণ্ডেরও কঠোরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালক্রমে দস্যুতার বাহুল্য ঘটায় দস্যুদিগের দণ্ডস্বরূপ হস্তচ্ছেদনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ফাঁসীর বিধান ও বন্দীদিগের প্রতি কঠোরতা-প্রকাশের ব্যবস্থাও প্রণীত হইল। রাজবিদ্রোহীকে হস্তীর পদে বন্ধনপূর্ব্বক নিহত করা হইত। [তবে সেকালে বিদ্রোহবিধির ব্যাপ্তি এখনকার মত প্রসারবিশিষ্ট ছিল না; সিংহাসন-অধিকারের চেষ্টা না করিলে কেহ রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইত না।] মদ্যপান রাজবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল। কেবল ইতর শ্রেণীর লোকেরা সুরাপানের অনুমতি পাইত। গোবধকারীর প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ আসামী-দিগের অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডে অব্যাহতি পাইবার ব্যবস্থা ছিল। ব্যভিচার-দোষে রমণীগণ দাসীরূপে বিক্রীত হইত। তাহাদিগের সন্তানসন্ততিগণও দাসশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইত। দাসব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইত। এতদ্ব্যতীত আর কাহাকেও দাসরূপে ক্রয় বিক্রয় করিবার আদেশ ছিল না।

যাঁহারা রাজকার্য্যসাধনে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে বিবিধ সম্মানকর উপাধিতে বিভূষিত করা হইত। মহারাজ শাহু প্রথমে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে অধুনাতনকালের ন্যায় যাহার তাহার ভাগ্যে উপাধিলাভ ঘটিত না, বিশেষ কার্য্যকুশলতা দেখাইতে না পারিলে সেকালে সহজে কেহই উপাধি পাইত না। সমরাঙ্গনে দেশের কার্য্যে যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিত, তাহা-দিগের স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়গণকে প্রভূত বৃত্তিদানে মহারাষ্ট্র ভূপতিগণ কখনও কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। সহরে-কোতওয়াল ও পল্লীগ্রামে পাটিল প্রভৃতির উপর শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত ছিল। পেশওয়েগণ বহুবার বহুপ্রকারে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে উৎসাহদান করিয়াছিলেন। দেবোদ্দেশেও বহু ভূসম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র ভূপতিগণের রাজ্যপালননীতির এইরূপে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া রাও বাহাদুর রাণাড়ে সেকালের সমাজশাসন সম্বন্ধে স্বকীয় মন্তব্য সহ কতিপয় তত্ত্বের প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

মানসিক বার্ত্তাবহ কৌতুক।

অনেক দিন পূর্ব্বে কোনও একখানি মাসিকপত্রিকায় মেণ্টাল টেলিগ্রাফি বা মানসিক বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নলিনীকান্ত বাবু সেই সময় হইতেই স্থিরসংকল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং ইহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; অনেকদিন ধরিয়া তিনি গোপনে ইহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার একদিনের পরীক্ষাফল তিনি জীবনে ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে একখান কেদারার উপর বসিয়া একটা কাগজ দেখিতেছেন, ঊর্দ্ধে কেরোসিনের উজ্জ্বল আলো, অদূরে একখান চৌকীর উপর বসিয়া তাঁহার পত্নী একটা ফ্রক শেলাই করিতেছিলেন।

নলিনী বাবু সহসা ভাবগ্রস্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "আশ্চর্য্য, অসম্ভব আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই, এতদিনে আমার শ্রম সফল!"

নলিনী বাবুর স্ত্রী প্রফুল্লকুমারী দেবী মাথা তুলিয়া তাঁহার স্বামীর মুখের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "কি অসম্ভব আশ্চর্য্য গো, ক' দিন থেকে তোমার হয়েছে কি?"

নলিনীবাবু বলিলেন, "শুনিলে তোমার মন আনন্দে নৃত্য করিবে! মানসিক বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে তুমি ত অনেক কথা শুনিয়াছ, আধঘণ্টা ধরিয়া তোমার উপর আমি তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলাম; পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফল হইয়াছি। তুমি যখন প্রথমে চৌকিখানার উপর আসিয়া বসিলে, তখন আমি মনে মনে এই ইচ্ছা চালাইলাম যে, তোমাকে পায়ের উপর পা দিয়া বসিতে হইবে, তুমি তাহাই বসিলে; তাহার পর ইচ্ছা চালাইলাম, তুমি ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিবে, তৎক্ষণাৎ তুমি ঘড়ির দিকে চাহিলে; একটু পরে আবার ইচ্ছা চালাইলাম, তুমি তোমার মাথা চুলকাইবে, অমনি তুমি বাঁ হাত দিয়া মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলে; তুমি যে একটু আগে হাঁই তুলিলে, তাহা আমারই ইচ্ছাচালনা করার ফলে, তাহা না বলিলে তুমি কিরূপে জানিতে পারিবে? আচ্ছা, আজ ঠিক পাঁচটার সময় তুমি এখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে রান্নাঘরের দিকে গিয়াছিলে কেন?"

"রাঁধুনীকে বলিতে গিয়াছিলাম, আজ রাত্রে যেন সে মাছের কালিয়া করে।"—প্রফুল্লকুমারী সহাস্যে এই উত্তর করিলেন।

"ঠিক, ঠিক, পাঁচটার সময় আমি তোমার উপর এই ইচ্ছা চালাইয়াছিলাম যে,আজ যেন তুমি মাছের কালিয়া করিবার বন্দোবস্ত কর! আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, এই যে ইচ্ছাশক্তিচালনার সত্য—এ যুগের ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার, আমাদের দেশে এখনও ইহার উপযুক্ত প্রচার হয় নাই, নূতন বলিয়া আমার কথায় নির্ব্বোধ লোকগুলা হাসিবে, কিন্তু সত্য কখনও গোপন থাকে না, শীঘ্রই ইহার শক্তির কথা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এই নূতন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করিলাম, শীঘ্রই আমি অনেক গুরুতর বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিব। এই দেখ, এখনি আমি ইচ্ছা চালাইয়াছিলাম যে, তোমাকে পিঠে হাত দিয়া পিঠ চুলকাইতে হইবে, যেমন ইচ্ছা করা, আর অমনি তুমি পিঠ চুলকাইতে আরম্ভ করিয়াছ।"

প্রফুল্ল বলিলেন, "এই সকল অসম্ভব ছাইভস্ম তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর?"

নলিনীকান্ত বলিলেন, "তুমি তেত্রিশ কোটী দেবতায় বিশ্বাস কর, আর এত বড় একটা পরীক্ষিত সত্যে তোমার বিশ্বাস হয় না! তোমার মন ত ভারি কুসংস্কারপূর্ণ!—এ বিষয়টা তোমার কাছে ছাইভস্ম হইল! কি আশ্চর্য্য! যাহাই হউক, আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমাকে বিশ্বাস করাইব যে, ইহা সত্যই ছাই ভস্ম নহে। পশুর উপর এ পর্য্যন্ত ইচ্ছাশক্তি চালনা করি নাই, ফল কি হয় পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই; আচ্ছা এখনই পরীক্ষা করা যাক্, ঐ ত কালো বিড়ালটা ওখানে রহিয়াছে, উহার উপরই পরীক্ষা করা যাক। বিড়ালটাকে এখানে আসিতে হইবে; এখন আমার দিকে তাকাও, আমি মাটীতে বসিলাম, উহার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিতেছি, 'রূপী, রূপী (বিড়ালের নাম) আমার কাছে আয়, তোকে আসিতেই হইবে', দেখ, তাহার ভিতর আমার ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে, রূপী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, লেজ নাড়িতেছে, আসে আর কি!"

হঠাৎ বিড়ালটা লাফ দিয়া নলিনীকান্তের পায়ের কাছে আসিল, এবং তাঁহার চটির উপর দুই থাবা বসাইয়া ছুটিয়া জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বামী স্ত্রীতে তর্ক উপস্থিত হইল। নলিনীকান্ত বলিলেন, "আমি ইচ্ছাশক্তি

প্রয়োগ না করিলে বিড়াল কখন আমার কাছে আসিত না।" প্রফুল্ল বলিলেন, ও তোমার একটা কথা, তুমি যে ভাবে মেজের উপর বসিয়া বিড়ালের দিকে চাহিয়াছিলে, ও ভাবিল,—তুমি বুঝি উহাকে আদর করিবে।" নলিনীকান্ত উত্তর দিলেন, "তোমার মন কুসংস্কারান্ধ, বিড়াল তোমার কাছে না গিয়া আমার কাছেই আসিল কেন?"

আধঘণ্টা ধরিয়া এই ভাবে তর্কবিতর্কের পর নলিনী বলিলেন, "তা না হয় স্বীকার করা গেল এ পরীক্ষাটায় আমি সম্পূর্ণ সফল হই নাই, তার কারণও আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে পারি; এমন করিয়া বুঝাইব যে, আমার কথা তোমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুমি অবশ্যই স্বীকার কর যে, বিড়ালের আত্মা নাই, আমার ইচ্ছাশক্তি সে নিশ্চয়ই অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু আত্মার অভাবে সে আমার ইচ্ছার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই।"

প্রফুল্ল তাঁহার স্বামীর যুক্তির অকাট্যতা স্বীকার অস্বীকার কিছুই করিলেন না, বলিলেন, "তুমি ত সকালে সময় নাই বলিয়া দাড়ীতে ক্ষুরস্পর্শ করিলে না, এখন ত একটু অবসর আছে, ও বাজে কাজ ফেলিয়া দাড়ীর সংস্কারটা সারিয়া ফেল না, সকালে আবার সময়ের অভাব হইবে।"

"দাড়ী? দাড়ী চাঁচিবার এখন আমার অবসর নাই, আমার আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি গজাইলেও আমি এ অমূল্য সন্ধ্যা তাহাদের ধ্বংসকার্য্যে নষ্ট করিতাম না; মানসিক বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে গুরুতর সত্যের আবিষ্কার এখন আমার একমাত্র ব্রত। (কিঞ্চিৎ থামিয়া) আমি জানি, আমি তোমার নিকট সাহায্য দূরের কথা, এই মহৎ কার্য্যে উৎসাহ পর্য্যন্ত পাইব না, সহস্র বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে আমাকে নিরস্ত্র, একাকী যুদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু উপায় নাই, বাঙ্গালীর স্ত্রী কোন মহৎ কার্য্যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী নহে, কেবল জ্বর হইলে মাথা টিপিবে, কলম কাটিতে হাত কাটিলে নিজের সাড়ী ছিঁড়িয়া আঙ্গুলে জলপটি বাঁধিয়া দিবে, আহারের পর পাতে বসিয়া প্রসাদ পাইবে, আর বিধবা হইলে মাছের সঙ্গে সঙ্গে হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর বর্জ্জন করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবে, এই ভিন্ন ত আর সম্বন্ধ নয়।"

প্রফুল্ল অপাঙ্গভঙ্গীতে স্বামীর দিকে চাহিয়াই মস্তক নত করিয়া ফ্রকের নূতন এক কোণের শেলাই আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "আর ব্যাখ্যানায় কাজ নাই, বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে; তা যাই বল

তোমার ও পাগলামী আমি কোনও কালেই বুঝিতে পারিব না, উহাতে আমার বিশ্বাসও জন্মিবে না।"

"এই দেখ অন্যায়, ইহার আগে এই পরম সত্যকে ছাইভস্ম বলিয়াছ, আবার এখনই পাগলামী বলিতেছ। ইহা পাগলামী নহে, তাহা এই দণ্ডেই আমি সপ্রমাণ করিতেছি। প্রমথকে (নলিনীর বন্ধু ও ব্যবসায়ে উকীল) এখনি মনে মনে ডাকিতেছি। আদালত অঞ্চলে আমাদের মানসিক বার্ত্তা-বহের চমৎকার ফল পাওয়া যায়।"

"কি ফল ? মক্কেল !"

"আঃ, তুমি যে উকীলের ভিতর মামলা আর মক্কেল ছাড়া অন্য কিছু জিনিষ দেখিতেই পাও না। কবিতা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, এমন কি, একটা প্রেমিক হৃদয় পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে আছে—

'ভাল হ'তে মন্দটুকু নিয়ে
মিছে, 'দেবি' তব এ ক্রন্দন'।"

প্রফুল্ল বলিলেন, "সকল জিনিসের নাম করিয়াছ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যে জিনিসটা বেশী পরিমাণে আছে, সেটা বাদ পড়িয়া গিয়াছে।"

কি ?"

প্রফুল্ল (গম্ভীরভাবে) "মানসিক বার্ত্তাবহ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর, অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার !"

নলিনী বাবু বলিলেন, "তোমার কথাটা ঠাট্টা না হইলে ঠিক কথাই বলা হইত। প্রমথ বোধ করি এতক্ষণ আসিতেছে।"

"প্রমথর ঘরে মানসিক বার্ত্তাবহ প্রবেশের পথ নাই, সাগর (প্রমথর স্ত্রী) বড় শক্ত মেয়ে, সন্ধ্যার পর তার ঘরের বাহির হওয়া 'অনধিকার প্রবেশ', তা বুঝি জান না ?"

"সেটা তোমার ভুল ;—অমন হাবা মেয়ে আর ছুটি নাই—মৈত্রীচর্চ্চা নহিলে প্রমথর সন্ধ্যা কাটে না ; তোমার শক্ত মেয়ে ত সন্ধ্যার সময় চির-কালই লাগাম ঢিল করিয়া থাকেন ! বিশেষতঃ আমার মানসিক বার্ত্তাবহ যদি অব্যর্থ হয়, তাহা হইলে দেখিবে, অবিলম্বেই প্রমথ সশরীরে উপস্থিত হইবে ; কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।"—পূর্ণ বিশ্বাসভরে নলিনীকান্ত এই কথা বলিলেন।

এই সময় সদর দ্বারে ঘা পড়িল। নলিনীকান্ত সোৎসাহে বলিলেন, "এই আসিয়াছে !"—তিনি স্বয়ং দ্বার খুলিতে গেলেন।

দ্বার খুলিতেই দুরস্থ একটা আলোকের ক্ষীণ আভায় দেখিলেন, একটা দীর্ঘাকার মনুষ্য, কাঁধে একটা মোট!

প্রমথর পরিবর্ত্তে এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া নলিনীকান্ত বসিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। লোকটা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ না দিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল,—

"মশায় নমস্কার, ব্রাহ্মণ হচ্ছি আমি, ঢাকার জেলায় আমার নিবাস, বন্দ্যঘাটি কুল, সাত পুরুষে আমরা কুলভঙ্গ, মাতামহ মহা ধনবান ছিলেন, আমার নাম শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্মণঃ, ঠাকুরের নাম—"

"আরে! ঠাকুরের নামে আর আবশ্যক নেই। কে হে তুমি ঠাকুর? বলা নেই কওয়া নেই দরজায় ধাক্কা—"

"আজ্ঞে ধাক্কা দেওয়ার পরই ত বলা সুরু করেছিলাম, তা আপনি শেষ কর্ত্তে দিলেন কৈ?"

"থামো থামো!—তোমার কথা কি?"

"তাই ত—বলছি!"

"দু' কথায় বল।"

"যে গাঁয়ে যাবার দরকার ছিল, সে গাঁয়ের পথ ভুলে এই গাঁয়ে এসে পড়েছি, সকলই অচেনা মানুষ, তাই রাত্রিটা এখানে বাস করবো।"

"গাঁয়ের মধ্যে আমাকেই চেনা মানুষ পেলে বুঝি? খুব চালাক লোক তো? এখানে কিছু হবে না।"

"আজ্ঞে তা হ'লে বড় অন্যায় হয়—দেখুন দিকি!"

"অন্যায় দেখবার আমার অবসর নেই, এখন বিদেয় হও, ঠাকুর।"

ঠাকুরের পশ্চাতে দরজা বন্ধ হইল।

অর্দ্ধপথে প্রফুল্লকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। নলিনীকান্ত কিছু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হইতেছিল?"

"হারা চাকরটার মুখে শুনিলাম, এক জন নূতন প্রমথবাবু বাহিরে আসিয়াছেন। আমাদের প্রমথবাবু ভিখিরী সাজিয়া কেমন চেহারা বদল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাই দেখিতে যাইতেছিলাম—মানসিক বার্ত্তাবহের ক্ষমতা অত্যন্ত অদ্ভুত!"

"ঐ ভিখিরীটে বোধ করি অনেকক্ষণ ধরে বাহিরের দরজাটায় দাঁড়াইয়া ছিল, আমার মানসিক বার্ত্তা তাহার দেহ ভেদ করিয়া প্রমথর কাছে পঁহুছিতে পারে নাই।"

"তাহা হইলে এবার হইতে তুমি মানসিক বার্ত্তার সঙ্গে এক একটা সূচ প্রেরণ করিও—কেহ পথে দাঁড়াইলে শরীর ভেদ করিয়া বার্ত্তার পথ করিবে।"

প্রফুল্লকুমারী দেবীর কথার সুর পরিষ্কার সোজা।

নলিনীকান্ত বলিলেন, "এখনই হারাকে 'বার্ত্তা' পাঠাইয়া এখানে আনাইতেছি, সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিবে, সকালে আমার স্নানের জন্য গরম জল করিবে কি ঠাণ্ডাজল রাখিবে? তোমাকে যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করাইতেই পারিলাম না। জজ সাহেবকে চোরের নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করান যে ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ কাজ!"

গৃহে হারার আবির্ভাব হইল।

নলিনীকান্ত পূর্ণোৎসাহে বলিলেন, "ঐ দেখ বার্ত্তা পাইয়াই হারা হাজির হইয়াছে।"

হারা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে নলিনীকান্ত বলিলেন,—"কি রে, গরম জলের কথা বুঝি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে আস্‌চিস্?"

হারা বলিল, আজ্ঞে না বাবু, লাট সাহেবের মজলিসের চাঁদার খাতা টেক্স আফিসের চাপরাসীর কাছে হ'তে আন্‌লাম, চাপরাসী বল্লে বাবু কুড়ি টাকা দেবেন—এনে দিস।" সেবার গ্রামে ছোট লাট আসিতেছিলেন, তাহারই চাঁদা।

এবার নলিনী বাবুর প্রগাঢ় ধৈর্য্য বিচলিত হইল; বলিলেন, "চাঁদার খাতা! চাঁদা! ফিরে দিগে যা, বলগে, বাবু বাড়ী নেই।"

প্রফুল্ল কহিলেন, "জল গরমের ইচ্ছাটা হঠাৎ চাঁদার খাতায় পরিণত হইল! কি বিচিত্র!—এখন চৈতন্যোদয় হইয়াছে ত? বুঝিয়াছ ত, তোমার মানসিক বার্ত্তাবহ কল্পনাবিকারমাত্র?"

"বড় দুঃখ যে,তোমাকে ইহা সত্য বলিয়া বুঝাইবার সুবিধা পাইতেছি না; তুমিও প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছ, কিছুতে ইহা বিশ্বাস করিবে না; যাক্, আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তা কখন আমি ত্যাগ করিব না,—বিড়ালটা কোথায় গেল?"

"তোমার পরীক্ষিত সত্য ত্যাগ কর না কর, বিড়ালটাকে ত্যাগ কর, তুমি যদি আবার মেজের উপর বসিয়া রূপী বেচারার দিকে সেরকম করিয়া চাহিয়া থাক,তবে সে ক্ষেপিয়া উঠিবে! আমাকেই ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছ—সে ত একটা বিড়াল!" প্রফুল্ল হাসিয়া এই উত্তর করিলেন।

নলিনী বাবু বলিলেন,—"তবে কি তুমি বলিতে চাও, যে মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি,তাহা ছাড়িয়া দিব্য ঠাণ্ডা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিব ?"

প্রফুল্লকুমারী প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "বসিয়া থাকিবে কেন, মানসিক বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া প্রমথবাবুকে আন।"

"ঠাট্টা!—আচ্ছা দেখ, এবার আমি এখানে প্রমথকে হাজির করিবই। তুমি এমন সত্যের উপরও শ্রদ্ধাবতী হইতে পারিলে না, তাহার কারণ, তুমি জ্ঞানহীনা বঙ্গরমণী, তুমি জান না যে, তোমার অজ্ঞতা কি শোচনীয়! এই যে মানসিক বার্ত্তাবহ, ইহা কত কালের পরীক্ষিত সত্য তা জান ? এই মেণ্টাল টেলিগ্রাফির বলে লঙ্কায় রামের পূজায় কৈলাসে ভবানীর আসন টলিয়াছিল, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে তাহার প্রমাণ আছে।"

প্রফুল্ল বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত অনেক মিথ্যা মকদ্দমাও তোমাকে করিতে হইয়াছে, প্রমাণের কখন অভাব হইয়াছে কি ?"

নলিনীকান্ত বলিলেন, "তুমি বসিয়া দেখ, এবার মানসিক বার্ত্তা প্রমথর কাছে পঁহুছে কি না, শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। এই আমি প্রমথর কাছে বার্ত্তা পাঠাইলাম,—আমার বার্ত্তা এত ক্ষণ তাঁহার নিকট পঁহুছিল, প্রমথ তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন—'একবার নলিন দা'র কাছে যেতে হচ্ছে, হঠাৎ তার কাছে যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে,' এতক্ষণ চটি পায়ে দিয়া চাদর কাঁধে ফেলিয়া প্রমথ ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন (পাঁচ ছয় মিনিট স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া) প্রমথ আমাদের সদর দরজায় এতক্ষণ আসিয়াছেন, এইবার দ্বারে ঘা পড়িবে।"

সদর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত আরম্ভ হইল।

বিজয়ী বীরের ন্যায় উঠিয়া, পত্নীর প্রতি চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক নলিনীবাবু দরজা খুলিতে চলিলেন, যাইতে যাইতে বলিলেন,—"এবার আর অবিশ্বাস করিবার পথ নাই।"

প্রফুল্ল নলিনীকান্তের অনুগমন করিলেন।

"প্রমথ! আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম"—বলিয়া নলিনী বাবু দরজা খুলিবামাত্র 'ঢাকার জেলা'-বাসী পূর্ব্বকথিত পথভ্রান্ত কুলীনপুত্রটি নলিনীকান্তের সম্মুখে পড়িল,- সে বলিল, "বাবু! এ রাত্রে আর ত কোথাও থাকবার একটু স্থান মিললো না, এখানেই রাত্রিটা থাকবো, গাঁটরিটা রাখি কোথা—বড্ড ভারি।"

এবার নলিনীকান্তের আর সহ্য হইল না। তিনি সুর আকাশে তুলিয়া বলিলেন—"কোথাকার বেহায়া লোক হে, বিদেয় ক'রে দিলেও যে আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আস, একবার বলেছি এখানে থাকবার যায়গা হবে না, আবার এসে দিক্ করচো ?" সে লোকটা যাহাতে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে নলিনীকান্ত দরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণনন্দন গতিক মন্দ বুঝিয়া গাঁটরী ঘাড়ে লইয়াই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, একবার ঠকিয়াছে কি না!

নলিনীকান্ত হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কে তুই বদমাস্, জোর ক'রে আমার ঘরে প্রবেশ করিস্, বেরো এখান থেকে, ট্রেসপাশের দাবীতে নালিশ ক'রে ছ' মাস তোকে জেল খাটাব, পাজী, হতভাগা, ছোটলোক!"

"গালই দেন, আর নালিশই করুন, শর্ম্মা আর আজ এখান হ'তে নড়চেন না, মশায়ের চাকর বাকর সব কোথায়, একটু তামাক খাবার ইচ্ছে হয়েছে।" —বিশেষ আত্মীয়তার ভাবে ব্রাহ্মণ এই কথা বলিল।

নলিনীকান্ত বলিলেন, "খাওয়াচ্ছি তোকে তামাক, বেরো এখান থেকে।"

নলিনীকান্ত ব্রাহ্মণের গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্র দান করিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিলেন। নীচেই ছিল সিঁড়ি, বেচারা সামলাইতে না পারিয়া তাহার উপর হুগড়ি খাইয়া পড়িল, নলিনীকান্ত সহসা তাহার পতনে ঝোঁক সামলাইতে পারিলেন না, ব্রাহ্মণের ঘাড়ের উপর সটান পড়িয়া গেলেন। অন্ধকারের মধ্যে দু' জনকে জড়াজড়ি করিয়া পড়িতে দেখিয়া ভোলা কুকুরটা ভাবিল বুঝি চোর, সে 'ভৌ'-'ভৌ' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে দু জনের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল অদূরে দাঁড়াইয়া সকল দেখিতেছিলেন, মানসিক বার্ত্তাবহের শোচনীয় ফল দেখিয়া তিনি অবিলম্বে হারাকে আলো আনিতে বলিয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ফ্রকটার শেলাই তখনও একটু বাকি ছিল, তিনি তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে যুদ্ধে পরাভূত সৈনিকের মত নিরুৎসাহচিত্তে নলিনীকান্ত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মাথা না তুলিয়াই প্রফুল্লকুমারী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভোলা অত চীৎকার করিতেছিল কেন? অন্ধকারে প্রমথ বাবুকে চিনিতে পারে নাই বুঝি! তা তাঁহাকে দরজা হইতেই বিদায় করিলে কেন? আমার যে দুই একটা কথা বলিবার ছিল।"

রোষকষায়িত দৃষ্টিতে নলিনীকান্ত একবার পত্নীর দিকে চাহিলেন, তাহার পর শার্টের ভিতর মাথা গলাইয়া ছড়িখানি হাতে লইয়া নীরবে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার পর নলিনীকান্ত তাঁহার স্ত্রীর নিকট আর কখনও মানসিক বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন নাই।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

মোক্ষমূলর-সদনে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বিদেশী হইয়াও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয়, সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া ফলের বিষয় বিচার করিলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তিনি প্রতীচ্যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পরিচিত করিয়াছেন; তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ইংলণ্ডও বুঝিয়াছে যে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য জগতের বিস্ময়—জ্ঞানের ভাণ্ডার—মাধুরীর খনি। সে দিন জীবন-সায়াহ্নেও তিনি তাঁহার ষড়দর্শনসম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সে কেবল Notes. উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি হিন্দু দর্শনের বিশেষত্ব ও সেই বিশেষত্বের কারণ বিবৃত করিয়াছেন। কিরূপ সামাজিক অবস্থায়, কিরূপ সভ্যতায়, কিরূপ কার্য্যের ফলে ষড়দর্শনের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি, তিনি সে সকলের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তপোবন-তরুচ্ছায়াতলে অনায়াসলভ্যফলমূলভোজী, বিলাসবিরাগী, স্বল্পতুষ্ট মুনিগণ কিরূপে দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের অসাধারণ আন্তরিকতার কারণ কি,—এ সকল বিষয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপক সুদীর্ঘজীবনব্যাপী অধ্যয়নের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার শেষাংশে তিনি মিষ্টার গাফকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন,—ছাব্বিশ বৎসরের যুবার প্রখর স্মৃতিশক্তি বা দৃষ্টি ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের থাকে না। তিনি অল্পবয়সে তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে বা গুরুদিগকে যেরূপে সাহায্য করিয়াছেন, আশা করি, এখন অল্পবয়স্কদিগের নিকট তাঁহার সেইরূপ সাহায্যপ্রার্থনা নিতান্ত দোষের বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ইহাই জীবনসায়াহ্নে বার্দ্ধক্যভারাবনতের কথা—প্রকৃত জ্ঞানীর বিশুদ্ধ বিনয়। ইহার উপযুক্তরূপ প্রশংসা করিবার ভাষা পাই না।

সংপ্রতি মিষ্টার ষ্ট্রং "টেম্পল ম্যাগাজিন" পত্রে অধ্যাপকের গৃহের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। চিত্রটি সমুজ্জ্বল ও সুন্দর।

প্রকোষ্ঠ।

প্রকোষ্ঠ পুস্তকে পূর্ণ। হর্ম্মাতল হইতে ছাদ পর্য্যন্ত কক্ষ-প্রাচীর পুস্তকাধারে পূর্ণ। সে পুস্তকাধারে যে কত ভাষায় লিখিত কত জাতির কত পুস্তক রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর। গৃহসজ্জা দেখিলেই গৃহস্বামীকে বুঝা যায়। জার্ম্মান কারিগরের এই কারখানায় কি শৃঙ্খলা! সর্ব্বত্র শৃঙ্খলার শ্রী। সকল পুস্তক নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত—সব জিনিস যথাস্থানে রক্ষিত, কাযেই সব জিনিসেরই স্থান হইয়াছে। অধ্যাপকের ছোট বড় সকল রচনাতেই যে উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার বিকাশ, গৃহসজ্জাতেই তাহা প্রকাশিত।

অনেকে মনে করেন, সর্ব্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলা প্রতিভাবানের চিরসহচর। কথাটা ঠিক নহে। বলা বাহুল্য, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন লেখক, বিশেষতঃ কবি, অনেক সময় আপনার ভাবে আপনি এমনই বিভোর হইয়া থাকেন যে, মানস রাজ্য ছাড়িয়া বাহ্য বস্তুতে চিত্তসংযোগের অবসর পান না। তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলার জন্য স্নেহময়ী ভগিনী, প্রেমময়ী পত্নী, ভক্তিমতী দুহিতা, অগত্যা অর্থলোভী ভৃত্য বা Land ladyর আশ্রয় লইতে হয়। এ বিষয়ে কোলরিজ পিতার রোগ পাইয়াছিলেন। কোলরিজের পিতা একবার স্থানান্তরে যান,—সেই সময় তাঁহার পত্নী যে কয় দিন স্বামীর অন্যত্র থাকিবার কথা, সেই কয়টা শার্ট বাক্সে দিয়াছিলেন। তিনি ফিরিলে দেখা গেল,—বাক্সে একটী শার্টও নাই। তিনি প্রতিদিন একটি করিয়া শার্ট ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বব্যবহৃতটি আর ত্যাগ করেন নাই, একটির উপর আর একটি চাপাইয়াছেন! কোলরিজ স্বয়ং কাহারও পুস্তক লইলে প্রায়ই হারাইয়া ফেলিতেন; আবার হয় ত একজনের পুস্তক আর একজনের গৃহে ফেলিয়া যাইতেন। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়—এই শৃঙ্খলার অভাব প্রতিভার গৃহিণীপণার অভাবের পরিচায়ক। যাঁহাদের এই অভাব থাকে, তাঁহাদের জীবনে সুখের সম্ভাবনা অল্প—সংসারে সুখের জন্য শৃঙ্খলার আবশ্যক, শৃঙ্খলার অভাবে সংসারের কল সুচালিত হয় না। প্রতিভার সহিত গৃহিণীপণার সুখসম্মিলনে রচনায়, অন্য কার্য্যে, সম্পদে কিরূপ সৌভাগ্য সমুৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডে টেনিসনের ও বঙ্গদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেই তাহার পরিচয়।

রচনার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে তিনি ছয় খণ্ডে ঋগ্বেদের ও পঞ্চাশ খণ্ডে প্রাচ্য-ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া তাঁহার জীবনের মহৎব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, পুরাণবিজ্ঞান, ষড়দর্শনের ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ মৌলিক রচনা ও বহু অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ছোট ছোট রচনাগুলি Chips from a German Workshop নামে সংগৃহীত হইয়াছে। এখন জীবনতরীর পাইল গুটাইবার সময় আসিয়াছে।

রচনা।

সম্ভবতঃ তিনি আর কোন বৃহৎ রচনায় হস্তক্ষেপ করিবেন না; কেবল তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি (Auld Lang Syne) লিপিবদ্ধ করিবেন। এখনও বহু ইংরাজ ও আমেরিকান পত্রের সম্পাদক তাঁহার রচনা চাহেন, কিন্তু তিনি প্রায়ই সে সকল অনুরোধ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না।

অধ্যাপক বলেন, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী অতি সরল। আর কোনও কায না থাকিলেই তিনি লেখেন। কাগজ, কলম ও পুস্তক সদাই তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সেই সব আর চিন্তা—তাঁহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহার কোন শ্রান্তিহর আরামের আবশ্যক হয় না। যখন অবসাদ বোধ করেন—বিশ্রাম করেন।

কার্য্যপ্রণালী।

অল্প দিন হইল, অধ্যাপক মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি মান্দ্রাজের কোনও প্রবীণ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের পত্রের কথা বলিলেন। পত্রে লেখা আছে,—"যখন জানিলাম, অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাংঘাতিক পীড়িত, তখন আমার অজ্ঞাতে আমার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমার যে কয় জন বন্ধু জীবন-সায়াহ্নে আমার সঙ্গে 'গীতা'দি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বলিলাম। গত সন্ধ্যায় মন্দিরে গমনের সময় তাঁহার রোগশান্তিকল্পে স্বস্ত্যয়ন করাইবার কথা হইল। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত পদচ্যুতি ও জাতিচ্যুতির ভয়ে অহিন্দুর জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। আমরা বলিলাম, ভট্টমোক্ষমূলর জন্মে ও বেশে য়ুরোপীয় হইলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সুহৃদগণ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে চাহিলে পুরোহিত স্বীকৃত হইলেন। পরদিবস নিশীথে আমরা ডাব, ফুল, পান সুপারী ও কর্পূর লইয়া মন্দিরে আসিলাম। পুরোহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সে সকল দেবতাকে নিবেদন করিয়া আমাদিগকে প্রসাদী দিলেন; ও তাহার কিয়দংশ অধ্যাপককে পাঠাইতে বলিলেন।"

অতিপ্রাকৃত।

অধ্যাপক বলিলেন,—ইহার পর তিনি সুস্থ হয়েন। বিশেষবিদ্ জর্ম্মান চিকিৎসকগণ তাঁহার রোগমুক্তি অসম্ভব স্থির করিয়াছিলেন। এখন পঞ্চমাসব্যাপী প্রাণান্তক বিবমিষার অবসান হইল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শরীর সুস্থ হইল। ইহাকে 'কাকতালীয়' বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ব্যাপার সত্য।

ব্রাউনিং—শেষজীবনে।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে ব্রাউনিং দম্পতি প্রতিভার অবতার। ব্রাউনিং টেনিসনের সমসাময়িক; কিন্তু টেনিসনের ন্যায় যশোলাভ ব্রাউনিংএর ভাগ্যে ঘটে নাই; তিনি Fit audience though few লইয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, তিনি টেনিসনের মত সময়োপযোগী বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন না, দার্শনিকভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন—এই সব কারণেই সাধারণ পাঠকসমাজে তাঁহার আদর ঘটে নাই। কালের প্রবাহে যখন টেনিসনের ব্যক্তিগত প্রভাব বিধৌত হইয়া যাইবে, যখন উভয়েরই কবিতার বিষয় নূতনত্ব

হারাইবে, তখন ব্রাউনিং অধিক আদৃত হইবেন। তখন লোকে বুঝিবে, টেনিসনের কবিতা সুসংস্কৃত ক্ষুদ্র খনি; ব্রাউনিংএর কবিতা খনি হইতে সদ্য-আনীত বৃহৎ রত্ন। এখানে আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না।

সম্প্রতি "সেঞ্চুরী" পত্রে শ্রীমতী ব্রনসন আসোলোর ব্রাউনিংএর শেষ জীবনের কথা লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

দৈনিক।

দৈনিক কার্য্যের সময়বিভাগে ব্রাউনিং কঠোর অঙ্কশাস্ত্রবিদের মত ছিলেন। সময় সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি প্রাতে ৭টার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন। কি শীতে কি গ্রীষ্মে তিনি শীতলজলে স্নান করিতেন। ৮টার সময় প্রাতরাশ। প্রাতরাশের পর তিনি তাঁহার ভগিনীর সহিত ভ্রমণে বাহির হইতেন। দুই জনে পর্ব্বতোপরি বেড়াইয়া—কবির যৌবনস্মৃতিবিজড়িত নানা স্থান দেখিতেন। ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরিয়া পাঠ ও রচনা। কখন বা ইংরাজী সংবাদপত্র, কখন বা কার্লোসোজ্জির বিবরণ-পাঠ; কখন বা কবির চিরপ্রিয় গ্রীক-নাটক-পাঠ।

প্রায় মধ্যাহ্নে আহার। আহারান্তে তিনি আবার লিখিতেন, বা পড়িতেন। বেলা ৩টার সময় তিনি La Murar চিত্রগৃহে উপনীত হইতেন। এ স্থানটি তিনি বড় ভালবাসিতেন। ৩টার পর তিনি শকটারোহণে বাহির হইয়া অনেকটা ঘুরিয়া আসিতেন। তিনি ভেনিসে নৌবিহারে যেমন আনন্দ পাইতেন, আসোলোর শকটে ভ্রমণে তেমনই আনন্দের উপভোগ করিতেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে এমনই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিলেন যে, নৌকা বা শকট ঠিক সময়ে আসিলে আর কখনও অপেক্ষা করিতে হইত না।

সঙ্গীত ও পাঠ।

আসোলোয় দেখা সাক্ষাতের হাঙ্গাম ছিল না, কাজেই একভাবে দিন কাটিত। রাত্রি-কালে আহারের পরই ব্রাউনিং তাঁহার স্পিনেট (বাদ্যযন্ত্র) লইয়া বসিতেন। যন্ত্রটি ১৫২২ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত। ব্রাউনিং যেন তন্দ্রালস-ভাবে বাজাইতেন। সাধারণতঃ তিনি যৌবনে শ্রুত সুর ও রুষিয়ান চলতি গানের ও ইংরাজী গাথার সুর বাজাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রায়ই করুণ সুর বাজিত। সময় সময় তিনি তাঁহার প্রিয় গানটি গাহিবার চেষ্টা করিতেন; পদ ভুলিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

তিনি অপর কবির কবিতাপাঠে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেন। অল্পক্ষণ বাজাইবার পরেই তাঁহার অনভ্যস্ত অঙ্গুলিগুলি শ্রান্ত হইয়া পড়িত; তখন তিনি যন্ত্র রাখিয়া বলিতেন, —"আমি এখন কিছু পড়িয়া শুনাইব। কি পড়িব?—আমার কবিতা?" তাহার পর হাসিয়া বলিতেন, "নাঃ, সে আর আজ কাজ নাই। আজ প্রকৃত কাব্যরসের উপভোগ করা যাউক।" তাহার পর তিনি শেলী, কীট্‌স, কোলরিজ বা টেনিসনের গ্রন্থাবলী লইয়া কোন কবিতা পাঠ করিয়া বলিতেন, "এই প্রকৃত কবিতা। নহে কি?"

কবিতার জন্মকথা।

একদিন কবি শকটে বসানোয় গমন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখিকা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেখা গেল, কবি বড় গম্ভীর। লেখিকার আশঙ্কা হইল, বুঝি তাঁহার শরীর সুস্থ নাই। কিছু পথ অতিক্রান্ত হইলে কবি বলিলেন, "আমি বসানো ত্যাগের পর একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

প্রশ্ন হইল, "কবিতা লিখিয়াছেন? কখন? কিরূপ?"

"এখনও মাথায় আছে। কাগজ পাইলেই লিখিব।"

"কি বিষয়ে লিখিলেন?"

"সে বলিব না। ছাপা হইলে দেখিতে পাইবে।"

"কিসে কবিতার উদয় হইল?"

কবি হাসিয়া বলিলেন, "যদি জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়, তবে বলি,—বৃক্ষশাখে বিহগের গান শুনিয়া। আমি মেয়েদের টুপিতে পক্ষ-ব্যবহারের বিরোধী।" সে কবিতা The Lady and the Painter.

পঞ্চাশ বৎসর পরে সেবার রোকা দুর্গ দেখিতে যাইয়া তিনি অদূরে কুটীরে দুর্গের প্রহরিণীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। সহসা প্রহরিণী বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, আপনি কে।"

কবি জিজ্ঞাসিলেন, "আমি কে?"

"আপনি একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি।"

"কেমন করিয়া জানিলে?"

"আপনার শার্ট দেখিয়া। গত সপ্তাহে যে ওটা ইস্ত্রী করিয়াছিল, তাহার সহিত আমার পরিচয় আছে। এখানে আর কাহারও ঐরূপ জামা নাই।"

কবি হাসিয়া বলিলেন, "ইহার পূর্ব্বে আর কেহ জামা দেখিয়া আমাকে সনাক্ত করে নাই।"

জামা দেখিয়া কবিকে চিনিবার এই দৃষ্টান্তটি বোধ হয় সম্পূর্ণ মৌলিক।

গ্রীক নাটকের মত একখানি নাটক-রচনার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কবির অভিব্যক্তিবাদ" একটি সুন্দর কবিতা। কবিতাটির প্রাঞ্জল ভাষায় একটু মধুর প্রবাহ আছে। ভাবটিও নূতন ও উপভোগযোগ্য। "উদ্ধার" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। রবীন্দ্রবাবুর গৌরী 'অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতাই' বটে। তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্তই ক্ষুদ্র,—গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জর-পিঞ্জরে তিনটি প্রাণী,—তেজস্বিনী মিতভাষিণী গৌরী, সন্দেহবিষদিগ্ধ ক্রুদ্ধ পরেশ ও সংযমভ্রষ্ট প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দ। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে তিন জনের স্থান পর্য্যাপ্ত নয়। কবি কেবল 'রেখায়' গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাসমাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোকসম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত। শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে "পূর্ব্বকালের সমাজশাসন" প্রবন্ধে উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রদেশে গত শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ পেশওয়েগণ সমাজের সংস্কার ও শাসনের ভার আপনাদের হাতে রাখিয়াছিলেন। "যদি সেকালে আমাদের স্বজাতীয় শাসনকর্ত্তৃগণ নূতন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার আবশ্যক অনুভব করিয়া থাকেন তবে এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাপরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আরও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।" আবার, "মুসলমান রাজত্বকালে আকবরও সামাজিক দোষসংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রেষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের সমাজসংস্কারের পক্ষেই মতি গতি ছিল।" এই ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়া লেখক সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পরিশেষে লেখক বলিতেছেন যে, "আজকাল যাঁহারা সংস্কারকার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা [illegible]

বক্তব্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বকালে রাজা সমাজের নিয়ামক ছিলেন, অতএব বর্ত্তমান কালেও রাজার হাতে সমাজসংস্কারের ভার দিতে হইবে, লেখকের কি ইহাই বক্তব্য? স্বীকার করি, পুরাতন সমাজের সংস্কার আবশ্যক ও একান্ত কর্ত্তব্য, এবং বিশ্বাস করি, তাহা অবশ্যম্ভাবী। কেন না, উন্নতির গতিরোধ কাহারও সাধ্যায়ত্ত বা প্রকৃতির অনুমোদিত নয়। কিন্তু প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও উপসংহারের সঙ্গতি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা 'সংস্কার'মাত্রের বিরোধী, তাঁহারাই যদি এই উপসংহারভাগের লক্ষ্য হন, তাহা হইলে এই 'হতাশের আক্ষেপে' আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা ইংরেজ রাজার হস্তে আমাদের সামাজিক মঙ্গলসাধনের ভার দিতে চান না, শ্রীযুক্ত রাণাড়ে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই উপসংহারের মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন। নতুবা উদাহরণের সহিত উপসংহারের উক্তির সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা সেকালে সম্ভব ছিল, তাহা একালে অসম্ভব হইতে পারে। সেকালের ইতিহাসে যাহার নজীর পাওয়া যায়, 'তাহাই' বর্ত্তমান যুগে অধুনাতন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। সমাজের যে অবস্থায় রাজশক্তি তাহার নিয়ন্তা ছিল, এখন সে অবস্থার ব্যতিক্রম হইয়াছে। যখন সে অবস্থা নাই, তখন সে ব্যবস্থাও চলিতে পারে না। রাণাড়ের মত বিজ্ঞ জনের রচনায় এইরূপ যুক্তিহীন মন্তব্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "উড়িষ্যার পাঠশালা" সুখপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ।" শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "গুলবদন বেগম" একটি সুখপাঠ্য সুন্দর ঐতিহাসিক রচনা।

নির্ম্মাল্য। আষাঢ়। "বিশ্রামঘাট" নামক পদ্যটি নিশ্চয় অমিত্রাক্ষর; কেন না, ইহাতে মিল নাই। "পিশুন নৃতান" কি পদার্থ? "নৃতান" কি "নৃত্য" ও "নর্ত্তনের" কোনও আত্মীয়?

> "উজান যমুনা—আর মুরলী নিস্বন,
> প্রতিশ্বাসে, দুরাশায়, করে আকিঞ্চন।"

লিখিয়া কবি নিজের কবি হইবার 'আকিঞ্চন' পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু হায়! পাঠকের অর্থ বুঝিবার 'আকিঞ্চন' কে পূর্ণ করিবে? শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের "বার ভুঞা" মন্দ নহে। এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ গুহ "যোগেশ" কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। লেখকের উদার সহানুভূতি ও সৌন্দর্য্যদৃষ্টি প্রশংসনীয়। সমালোচনার মতামত পর্য্যালোচনার এ স্থান নহে। কিন্তু লেখক "যোগেশে"র ন্যায় একখানি উপেক্ষিত কাব্যের প্রতি সাহিত্যসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। "আমার শিকারকাহিনী" প্রবন্ধে কবিত্ব ও 'সেন্টিমেণ্টালিটী' আছে, কেবল শিকারের কাহিনীই নাই। প্রবন্ধশেষে মহারাজ লিখিতেছেন,—"পর দিন প্রত্যূষে আপনাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরমুখো বাঙ্গালী ব্যাঘ্রশব্দে পরিতুষ্ট হইয়া সশরীরে মুক্তাগাছা প্রাসাদে ফিরিলেন।" মহারাজ তবু 'ব্যাঘ্রশব্দ' শুনিয়া ফিরিয়াছিলেন,—কিন্তু পাঠকগণ কি শুনিলেন? শিকারের কাহিনী শুনিবার জন্য আমরা অধিক উৎসুক হইয়া আছি। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের "শান্তি" গল্পটির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। "সভীত-কম্পিত-হৃদয়ে," "সভীত-কণ্ঠে" প্রভৃতি ভাষা বর্জ্জনীয়। নূতন লেখকগণের ভাষার প্রতি অবধান অত্যন্ত প্রার্থনীয়। "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও চন্দ্রনাথ বাবু" প্রবন্ধের লেখক এই প্রবন্ধে পৃথিবীর কোন বিষয়ই অসমালোচিত রাখিবেন না। এবার রবীন্দ্রবাবুর "সোনার তরী" রাং কি সোনা, তাই পরখ করিতেছেন! লেখকের ভাবুকতা দেখিয়া হাস্যরসের উদয় হয়। তিনি যদি এই ভাবে কাব্যসাহিত্যের সমালোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা 'হুতোমে'র দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিব। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"য় লেখক লিখিতেছেন, "বিশেষ আগ্রহের সহিত রবিবাবুর 'সদর অন্দর' ধরিলাম।" ইহার যোগ্য পুরস্কার এত দূর হইতে দেওয়া চলে না।



শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

বিদায়-মঙ্গল।

ওগো! যাও শুভক্ষণে! শুভ সমীরণে
নাচিছে তরণী সাগরে;
লেখ হৃদয়ে ভরসা, শিরে নারায়ণ,
জীবনের ব্রত অন্তরে!
নাহি ফলে সাধনায়,— নাহি হেন কাজ,
অমরত্ব মিলে সাধনে,
দেখ শ্রম-সফলতা সুবর্ণ অক্ষরে
অঙ্কিত মানব-জীবনে।
কি ভয়! পিতার আশীষ, মায়ের মমতা,
বালিকার প্রেম অমৃত,
ওগো! রক্ষিবে তোমারে বিদেশে বিপদে
কবচের মত সতত।
ওগো! যদি প্রলোভন করে আকর্ষণ
বলে পাপ-পথে তোমারে,
তুমি মনে ক'রো অশ্রু পিতার মাতার,
আশ্রয়বিহীনা লতারে।
ওগো! হাসিবে চাঁদনি, হাসিবে না তা'রা;
ফুটিবে কুসুম কাননে,
হায়! একটি কুসুম বিহনে তাহারা
রহিবে মরিয়া মরমে।
ওগো! এ তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর মত
বহিবে নীরবে অঝোরে,
তুমি জয়মাল্য পরি, আসি' মুছাইও,
জুড়াইও প্রাণ আদরে! *

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

---

* কবিবরের পুত্রের বিলাত-গমন উপলক্ষে লিখিত।—সাহিত্য-সম্পাদক।

কমলেকামিনী।

২

নায়ক নায়িকার পর মকরকেতন-চরিত্র আমাদের আলোচ্য। প্রেমপ্রবণ হৃদয়, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি সকল গুণে ভূষিত হইয়াও, এক দোষে তিনি সাধারণের চক্ষে হীন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, একটা না একটা গুণের অযথা-পক্ষপাত প্রেমের একটা বিষম দোষ। তাই সুশীলার ন্যায় রূপবতী গুণবতী স্ত্রী সত্বেও তিনি শৈবলিনীকে ভালবাসেন। "শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী।" মকরকেতন স্পষ্টই বলেন, "আমি কি রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি। তার বানান-শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্বশক্তিতে মোহিত হইচি।" আর সুশীলা রূপবতী হইলেও বানান ভোলেন; গুণবতী হইলেও কবিতা লিখিতে পারেন না; এমন লোকের সহিত কেমন করিয়া প্রণয় হইবে? মকরকেতনের দোষ নাই। প্রেম অন্ধ না হইলেও একভাবদর্শী, এ কথা বিস্তারিতভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি। Complementary loveএর কথা যে বলিয়াছি, এখানে বুঝি তাহাই। মকরকেতন স্বয়ং বানান ভোলেন—এ বিষয়ে সুশীলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছেন। কাজেই ও গুণের প্রতি পক্ষপাত ত তাঁহার স্বাভাবিক।

মকরকেতনের একটা গুণ বা দোষ তাঁহার স্পষ্ট বচন। শিখণ্ডিবাহনকে ছোটরাণী হিংসা করেন, এ কথা সত্য হইলেও অপ্রিয়, কিন্তু মকরকেতন তাহা গোপন করিবেন না। "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" এ নীতি তাঁহার স্বভাব-নিষিদ্ধ। তাঁহার মতে, মনে ও মুখে পার্থক্য থাকা উচিত নহে। যাহা বিশ্বাস, তাহা বলিতে এবং তদ্রূপ কার্য্য করিতে তিনি সদাই যত্নবান।

তাই তিনি শৈবলিনীকে বারাঙ্গনা-ভাবে দেখেন না; কারণ, তাহা হইলে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তিনি স্পষ্টই বলেন, "প্রমাণ করে দাও শৈবলিনীকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ করায় আমার দুষ্কর্ম্ম হয়েছে, আমি এই দণ্ডে তাহাকে পরিত্যাগ কর্‌চি।"

শৈবলিনীকে ভালবাসিলেও সুশীলার প্রতি তাঁহার কুব্যবহার সম্ভবে না। তিনি বলেন, "সুশীলার নিকট থাক্‌তে তিনি ভালবাসেন।"

অস্থৈর্য্য নাই। তিনি নিজের দোষ বুঝিয়াছেন, সুতরাং তদ্দণ্ডেই বিহিত কর্ম্ম করিয়াছেন। নিজের দোষ স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিতও নহেন। তাই শিখণ্ডিবাহনকে বলিয়াছিলেন, "দাদা, তুমিই আমার চরিত্রসংশোধনের মূল। তুমি যদি আমায় না ভালবাস্‌তে, তা হলে আমি ছারখারে যেতেম।"

মকরকেতনের চরিত্র-সংশোধন হইল, কিন্তু স্পষ্ট-উক্তি দোষ বা গুণ রহিয়া গেল। সভাস্থলে রহস্যপ্রকাশসময়ে তিনি নিজের মানসিক কষ্ট সত্ত্বেও সত্য গোপন করিতে পারিলেন না, কিন্তু মানসিক কষ্টের আধিক্যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই কষ্ট তাঁহাকে আত্মঘাতী হইতেও প্রণোদিত করিয়াছিল। মনের এইরূপ ভাব কিরূপ প্রকৃতির স্বভাব, তাহা চিন্তনীয়। সত্যের অনুরোধে স্বার্থহানি করিতে প্রস্তুত হওয়া সাধারণ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

মকরকেতনের চরিত্রের এইখানেই সমাপ্তি। মকরকেতনের চরিত্র-সংশোধনে মহারাজ মহারাণী সুখী। শিখণ্ডিবাহনের পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণতা আরও বুঝি বিশুদ্ধ।

হৃদয় হিংসাপ্রণোদিত হইলে জগতে কি ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, কবি গান্ধারী-চরিত্রে তাহার জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র প্রসূত হইল। সপত্নীপুত্র রাজ্যভোগ করিবে, বিমাতা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ধাত্রী-সাহায্যে সদ্যোজাত শিশু কনিষ্ঠা মহিষী কর্তৃক অপহৃতা হইয়া দূরীকৃত হইল। পুত্রশোকে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মৃত্যু হইল। মহারাজ শোকে অধীর হইলেন। মহারাজের ক্রন্দনে ও কাতরতায় রাজ্ঞীর হিংসাস্রোতের বেগ মন্দীভূত হইল। শিশুকে পুনরানয়নের চেষ্টা হইল, কিন্তু হায়! কুমারকে পাওয়া গেল না। কালক্রমে নিজের গর্ভে মকরকেতনের জন্ম হইল। যাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলাশায় পিশাচ-বুদ্ধিপ্রণোদিতা হইয়া রাজ্ঞী ঐ কুকার্য্য করিয়াছিলেন, সেই নয়ননন্দন নন্দনের মুখাবলোকনে তিনি সকল জ্বালা ভুলিলেন।

যুদ্ধাভিধানের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে বরণডালা স্পর্শ করিবার সময় তাঁহার কপালে রাজদণ্ড দেখিয়া গান্ধারী শিহরিয়া উঠিলেন। অতীতের কত কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেই "বড়রাণীর সদ্যোজাত রাজদণ্ডশোভিত রামচন্দ্র"—তাহার

নবকুমার-অপহরণের পরই শোকে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মৃত্যুর পর হইতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হইয়াছিল। "গর্ব্বিতা গান্ধারী"র গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল।

ক্রমে মকরকেতনের স্নেহ সব ভুলাইয়া দিল। কিন্তু পাপের কথা একেবারে ভোলা যায় না। স্মৃতি বুঝি বিস্মৃতভাবে হৃদয়ে রহিয়া যায়। তাই রাজদণ্ড দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—মকরকেতনের তীক্ষ্ণ শ্লেষ "পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম", তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। যাহার জন্য এত পাপ, সে বলিলে বুঝি কষ্ট দ্বিগুণ হয়। বরণসময়ে শিখণ্ডিবাহনের কপালে রাজদণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া গান্ধারীর প্রাণে যে হিংসার উদয় হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া মকরকেতন বলিলেন, "পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম।" গান্ধারীর কিন্তু অনেক কথা মনে পড়িল। "পাপীয়সী" কথাটা বুঝি তাঁহাকে অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া স্বকৃত পাপের কালিমামণ্ডিত ভীষণ চিত্র দেখাইয়াছিল। একবার তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ক্ষণপরেই আরোগ্যলাভ করিলেন। প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ হইল। তুষানলের ন্যায় ক্রমে ক্রমে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। স্বার্থ, হিংসা ও সন্তানের মঙ্গলাশায় যে পাপ আচরিত হইয়াছিল, তিল তিল করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল। বুঝি যুদ্ধে শিখণ্ডিবাহনের শৌর্য্য, বীর্য্য ও মহত্ত্বের খ্যাতি এই দাহনের সহায়তা করিল। স্বকৃত পাপ বুঝি ভুলিবার উপায় ছিল না। পুত্র মকরকেতন, যাহার জন্য এতটা পাপ আচরিত হইয়াছিল, সেই বলিত, "আমি বাবার ন্যায় সরল, তোমার মতন হিংসুটে নহি।"

এখানে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। মকরকেতন সমস্ত রহস্য অবগত ছিলেন কি না? আমাদের বোধ হয়, তিনি অনেকটা জানিতেন। কেবল তিনি কেন, অনেকেই জানিত। নতুবা সুরবালা আসিয়া "একটা বুড়ী দাসীকে" বশীভূত করিয়া ও কথা কেমন করিয়া জানিয়া যাইবে? বোধ হয়, অনেকেই জানিতেন যে, জ্যেষ্ঠা মহিষীর কুমার কনিষ্ঠা কর্তৃক অপহৃত ও দূরীকৃত হইয়াছে। কেবল শিখণ্ডিবাহনই যে সেই অপহৃত কুমার, এ কথা কেহই জানিত না। গান্ধারী কিন্তু বরণসময় হইতেই বেশ বুঝিয়াছিলেন, শিখণ্ডিবাহনই বড়রাণীর সেই অপহৃত কুমার।

গান্ধারীর পাগলের অবস্থাটা Lady Macbethএর Night walking sceneএর সহিত মেলে। এরূপ হৃদয়ভেদী অনুতাপের উক্তি আমরা সেখানেও শুনিতে পাই।

অচৈতন্য অবস্থায় গান্ধারী বলিতেছেন,—"পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর! —প্রাণ পুড়ে গেল, পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও, আরো জ্বলে। গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে, একেবারে ঢেলে দাও—ওমা! ও পরমেশ্বর, পাপানল নির্ব্বাণ হয় না, আরো জ্বলে। একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন! খাণ্ডবদাহনেও এত আগুন হয়নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না, কেবল পরিতপ্ত হয়—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল দাও—অনন্ত সীমা অতলস্পর্শ সমুদায় শীতল সাগর শুষ্ক করে জল দাও,পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্ব্বাপিকা শক্তি তিরোহিত হল।" কি হৃদয়বিদারক উক্তি!

পাঠক! Lady Macbethএর উক্তিগুলি স্মরণ করিবেন। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

Lady Macbeth ও গান্ধারী-চরিত্র তুলনীয় হইলেও, প্রধানতঃ দুইটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, Lady Macbeth মানবীরূপে পিশাচী; গান্ধারী পিশাচী হইলেও মানবী। Lady Macbeth স্বার্থের জন্য সব করিতে পারে, এমন কি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি সে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা হইলে অঙ্কস্থিত স্তন্যপায়ী শিশুকে স্তন ছাড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিচূর্ণ করিতে পারে। গান্ধারী কিন্তু পুত্রের স্বার্থ ও ভালবাসার মোহেই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্য কথায়, এক জনের হৃদয় বিশুদ্ধ adamantএ গঠিত, অপরের হৃদয়ে কঠিন লৌহের অভ্যন্তর দিয়া ভালবাসার স্নিগ্ধ শীতল স্রোত মৃদুমন্দ প্রবাহিত। তাই বলি, এক জন মানবীবেশে পিশাচী, অপরা পিশাচী হইলেও মানবী।

আর এক কথা, গান্ধারীতে অনুতাপের ভীষণ জ্বালা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। এই অন্তর্দাহ যে কেবল অচৈতন্য অবস্থায় প্রতীয়মান হয়, তাহা নহে। জাগ্রত অবস্থাতেও গান্ধারীর মনের অবস্থা যতটা অনুমান করিতে পারি, তাহাতেও যেন বিষাদকালিমা অঙ্কিত দেখিতে পাই। Lady Mecbethএ এই বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জাগ্রত অবস্থায় অনুতাপ বা গত পাপকার্য্যের কোনও কথাই তাহার মনে উদিত হয় না। কেবল নিদ্রিত অবস্থায় যখন তাহার হৃদয়ের উপর ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য টুটিয়া যায়, তখন তাহার

পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে, এবং অতীত পাপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকে। বুঝি পাপের কালিমা ধৌত করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়! অস্থিমজ্জার স্তরে স্তরে যে কালিমা অঙ্কিত, শতবার ধৌত হইলেও তাহা পরিষ্কৃত হয় না।

উপরি-উক্ত তুলনায় আমরা আরও বুঝিতে পারি, Lady Macbethএর হৃদয় প্রথম হইতেই পিশাচের ন্যায় কঠিন, গান্ধারীর হৃদয় অতি কোমল। হিংসাপ্রণোদিত হইয়া তিনি যে হঠাৎ কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি,সন্তান-অপহরণের পরই মহারাজের শোকে,আবার কুমার-আনয়নের ইচ্ছা তাঁহার এতই বলবতী হইয়াছিল যে, তিনি স্বয়ং ধুনী দাইয়ের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি হিংসাপরতন্ত্রা হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু Lady Macbeth বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধিমত পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া Duncanকে হত্যা করিবার জন্য স্বামীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই বলি, এক জনের "foolishness"এ একটা "mistake" হইয়াছিল, অপর এক জনের "bad principle"-এ একটা "misdeed" হইয়াছিল।

উভয়ের তুলনায় আমরা আরও দেখিতে পাই, গান্ধারীর পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত বুঝি এই পৃথিবীতেই হইয়া গিয়াছিল; Lady Macbethএর আর কোন্ অজানিত দেশে হইবে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল।

গান্ধারী এইরূপ অচৈতন্যাবস্থায় সমস্ত সত্য প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন; মহারাজ ও সমরকেতু সমস্তই জানিতে পারিলেন। শিখণ্ডিবাহনের যথার্থ ইতিহাস জানিবার এখান হইতে সুবিধা হইয়া গেল।

অবশেষে গান্ধারীর কি হইল, তাহা আমরা জানিতে পারি না; বোধ হয়, কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহা গোপন করিয়াছেন। কারণ দ্বিবিধ;—প্রথম, গান্ধারী নাটকের নায়িকা নহেন, সেই জন্য Lady Macbethএর ন্যায় তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে কবি বাধ্য নহেন। দ্বিতীয়তঃ, মিলনান্ত নাটকের মাধুরী-হ্রাস কবি ইচ্ছা করিয়াই বোধ হয় করেন নাই।

গান্ধারী-চরিত্রের বিভিন্ন ভাবের বলবতীবৃত্তিনিচয়ের কার্য্য প্রতিকার্য্য বিশ্লেষণের পর বক্কেশ্বরের চরিত্র বড়ই সুন্দর বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়।

বক্কেশ্বর কবির বিশেষত্ব—নিজত্ব। নীলদর্পণের গ্রাম্য চিত্র, নবীন-তপস্বিনীর জলধর, লীলাবতীর নদেরচাঁদ, জামাইবারিকের জামাতৃবৃন্দ, কমলেকামিনীর বক্কেশ্বর, কবির বিশেষত্বের পরিচায়ক। বক্কেশ্বর "অশ্ব-

বিদ্যায় অদ্বিতীয়” হইতে পারিলেন না, কেবল ঘোড়ার পিঠে গোঁজ নাই বলিয়া। তিনি মহাযোদ্ধা, যুদ্ধে তিনি না গেলে মহিলাশিবির রক্ষা করে কে? যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে তিনি ভীত নহেন। “তিনি নিজে লড়াক লড়াকের বংশে জন্ম,” যুদ্ধ হবে শুনিয়া অবধি তিনি “অহোরাত্র রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে আছেন, রণসজ্জায় আহার নিদ্রা সবই করিতেছেন।” তাঁহার বীরতেজ বড় ভয়ানক। ব্রহ্মাধিপতি লিপি অমান্য করেছেন শুনিয়া “তাঁহার নাকের ছিদ্রদ্বয় দিয়া বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল, নয়নকোণে আকাশবিহারী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগিল।” তাঁহার ক্রোধানল কি ভয়ানক! ব্রহ্মাধিপতির প্রস্তাবশ্রবণে তাঁহার “ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল * * * তাঁহার কেশদাম শজারুর কাঁটার মতন দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, এবং আপাততঃ যৎকিঞ্চিৎ বৈরনির্য্যাতন হেতু কদলীবনে গমনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা একটি কদলীবৃক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।” তাঁহার হস্তের দীর্ঘকায় অসিলতা যুবরাজ তাঁহাকে ফলার-দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। তিনি অবশ্য রাজপুত্রপ্রদত্ত অসির কখনও অবমাননা করেন নাই। পাঠক, এই অসিমাত্র নির্ভর করিয়া বীরত্বের কথা আমরা তাঁহার মুখেই শুনিব। তিনি বলিতেছেন, “এই অসিলতার মহিমায় আমি মদকালয়ে বিনামূল্যে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি * * * এই অসিলতার মহিমায় পুরমহিলারা আমাকে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, রাধা সরোবর, রসমাধুরী খাওয়া-ইতে বড় ভালবাসেন।” তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন, রণে “শাগাবাবুকে পরাস্ত করিবেনই করিবেন”, না পারেন ত “অসিলতাখানি মড়াৎ করে ভেঙ্গে ফেলে পাঁচি ধোপানীর চরকার টেকো গড়ে দিবেন।” পাঠক, লেখকের নাম না জানিয়াও যদি এইটুকুমাত্র পাঠ করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কাহার রসময়ী লেখনীনিঃসৃত রসের আস্বাদন করিতেছেন।

বক্কেশ্বর বীরত্বে যাহাই হউন, তিনি কিন্তু ন্যায়ের পক্ষপাতী; তাই মকর-কেতনের শৈবলিনীকলঙ্ক-অপনোদনের জন্য তিনি সদাই যত্নবান। এই জন্য সত্যবাক্য অপ্রিয় হইলেও তিনি বলিতে পরাঙ্মুখ নহেন। মকরকেতন গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, “আমি কি শৈবলিনীর রূপে মোহিত হইয়াছি, আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান-শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি।” বক্কেশ্বর কথাটা উড়াইয়া দিলেন; বল্লিলেন, তবে “চুড়িচন্দ্রহার পরাবার জন্য এক জন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি—তিনি স্বয়ং সাভভোম মহাশয়।”

বক্কেশ্বর সুশীলার শক্রনিপাতের সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ;—উপায় পাদুকাপ্রহার।

বক্কেশ্বর কিন্তু কিছু স্থূলদর্শী। Gratiamoর সহিত তাঁহার জাতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। এই স্থূলদৃষ্টিবশতঃ তিনি Sentimentalismএর ধার দিয়াও যান না। শৈবলিনীর ব্যবহারে শিখণ্ডিবাহন পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ; কিন্তু বক্কেশ্বর পূর্ব্ববৎ ; তিনি মতপরিবর্ত্তন করিবার পাত্র নহেন। মকরকেতন শৈবলিনীবিরহে ম্রিয়মাণ ; বক্কেশ্বর বলেন,

"বিচ্ছেদ বাঘের হাতে প্রাণ বাঁচানো ভার।
খাঁচা খুলে কাদার্খোঁচা পালিয়েছে আমার ॥"

তবে তিনি শৈবলিনীর সন্দেশ খাইতেন না,এমন নহে, সে ক্ষিদে পেত বলে। মকরকেতন টাটকারিতে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। গরীব ব্রাহ্মণ সরলহৃদয়ে ন্যায়ের অনুরোধে যে সকল অপ্রিয় কথা বলিলেন, তাহার দণ্ড কিছু গুরুতর হইল। শিকার করিবার ছলে লইয়া গিয়া সকলে তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইয়া আসিলেন। কতকগুলি সৈন্য বক্কেশ্বরের চক্ষুবন্ধন করিয়া ব্রহ্মশিবিরের নাম করিয়া মণিপুরশিবিরে লইয়া গেল। সেখানে তাঁহার লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইল।

বক্কেশ্বরের পেটে তলয়ার পুরিবার সময় তাঁহার প্রিয়বিরহভাবনা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আহা আমা অবর্ত্তমানে হৃদয়বিলাসিনী আমার কার মুখপানে চাইবেন ? আহা আমা অবর্ত্তমানে আদরিণীকে কে তেমন আদর করবে ?" গরীব ব্রাহ্মণের অন্তিমকালের এ বিচ্ছেদভাবনায় আমরাও ব্যথিত হই। কিন্তু পারিষদ আবার "মড়াঁর উপর খাঁড়ার ঘা" দেয়, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তার নাম কি ?" আমরা কোথায় ব্রাহ্মণীর নাম শুনিব মনে করিতেছি, না শুনিলাম, তাঁহার হৃদয়বিলাসিনী অপর কেহ নহেন, স্বয়ং চন্দ্রপুলি ! পাঠক, এখানেও কবির বিশেষত্ব।

লাঞ্ছনার পর চক্ষুবন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। বক্কেশ্বর দেখিলেন, তিনি মণিপুর-শিবিরে ; তাঁহাকে "কাকুণ্ডি" প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করান হইতেছে। তবে "পেটে খেলে পিঠে সয়"—তাই তিনি সহজেই চাপিয়া গেলেন ; কারণ, নয়নবন্ধনমোচনের পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু জলযোগ করান হইয়াছিল।

সুরবালার চরিত্রও পূর্ব্বোক্ত চরিত্রের ন্যায় বড়ই আনন্দময়। "সুমধুরহাসিনী মকরন্দভাষিণী" সুরবালা রণকল্যাণীর উপযুক্ত সখী। বঙ্কিমবাবুর

গিরিজায়ার সহিত ইহার অনেকটা মিল থাকিলেও প্রধান পার্থক্য এই যে, সুরবালা গিরিজায়া অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমতী। এ কথা উভয়ের দৌত্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এক জন ভুল বুঝিয়া ঠকিয়া আসিলেন, অপর এক জন ঠকাইয়া ঠিক বুঝিয়া গেলেন। যাক সে কথা। সুরবালা স্বয়ং প্রেমিকা, তাই শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে মাল্যপতনের সময়েই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মাল্যের সহিত শিখণ্ডিবাহন মাল্যরচয়িত্রীর নবীন হৃদয়ও লইয়া গেলেন। ছাদের উপর কথোপকথন বড়ই সুমিষ্ট। পাঠক, মূল গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় লইবেন। অনেক সম্বন্ধ আসিল, কল্যাণের কোনটিই পছন্দ হইল না ; তাই সুরবালা কিছু চিন্তিত হইয়াছেন। কারণ,—

"যৌবন যে যায়
"তাকে আটকে রাখা দায়,
"সোনার শিকল লোহার খাঁচা,
"এর বেলাটী বিষম কাঁচা।"

পাঠক, নবীনা কল্যাণীর নিকট ইহার যে প্রত্যুত্তর শুনিতে পাই, তাহাতেই উভয়ের শিক্ষা ও মনের তারতম্য বুঝিতে পারি। নবীনের নব যৌবন তরঙ্গভঙ্গে জীবনতরী কর্ণধারহীন হইয়া উদ্দেশ্যবিহীন পথে যাইতেছে, সুরবালার তাহাতে দুঃখ ও ভয়, পাছে যৌবনতরঙ্গবেগের হ্রাস হয়। কল্যাণ কিন্তু যৌবনকে অত সামান্য ক্ষণস্থায়ী পদার্থ মনে করে না ; তাই সে বলে,—

"মনে যৌবন যার,
"ভাবনা কোথা তার ?
"মাথায় পাকা চুল,
"খোঁপায় ঘেরা ফুল।"

সুরবালা কথাটার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। যৌবন অর্থে সে নবীন বয়সের দৈহিক পরিপুষ্টিই বুঝিয়াছে, মনের যৌবন সে তত বুঝিতে পারিল না।—রণকল্যাণীর মন অনেক উচ্চস্তরের, সে কথাটি আবার বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বলিল,—

"মনের মণি গুণমণি
"মনের দিকে মন,
"সমান বলে সকল কালে
"সুখসাধনের ধন।"

Shakespeareএর Nerissa এবং সুরবালা অনেকটা একজাতির

নায়িকা; উভয়েই সুরসিকা হইলেও উভয়েরই বুদ্ধি খুব উচ্চস্তরের নহে, এবং উভয়েই স্ব স্ব নায়িকা অপেক্ষা নিম্নস্তরের বুদ্ধি ধরে।

পাঠক এখানে Merchant of Venice স্মরণ করিলে দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত কথোপকথনটির প্রথমাংশ কেমন অনেকটা Portia এবং Nerissaর কথোপকথনের সঙ্গে মেলে।

প্রেমিকার তীক্ষ্ণচক্ষু আমরা তাঁহাতে বেশ দেখিতে পাই। শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীষে "সুশীলা" লেখা দেখিয়া কল্যাণের প্রাণে আঘাত লাগিল। চক্ষে জল আসিল। অপরের অগোচরে কল্যাণ জল মুছিয়া ফেলিলেন। অপরে বুঝিতে পারিল না; বলিল, "যুদ্ধে পরাজয় হওয়ায় অপমানে চক্ষে জল আসিয়াছে"; সুরবালা কিন্তু ঠিক বুঝিল।

তৎপরে দৌত্যকার্য্যে তাহার কার্য্যক্ষমতা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সে বিনাক্লেশে জ্ঞাতব্য জানিয়া গেল। হৃদয়ের পরিচয়ও সেইখানেই পাই। সে শিখণ্ডিবাহনের প্রাণের বেদনা বুঝিল, এবং আশাদানে সংশয়-উদ্বেলিত হৃদয়ে শান্তিদান করিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের যথার্থ ইতিহাস জানিয়া সে বুদ্ধির পরিচয়ও প্রদান করিল।

রাসমঞ্চের কথোপকথনে তাঁহার আমোদপ্রিয়তার পরিচয় পাই। রাসলীলার কথোপকথন কেমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক! সমালোচনায় সব কথা লেখা চলে না।

ঐখানে তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও পরিচয় পাই। রাসলীলার মধ্যে রাই কমলিনী অচৈতন্যা হইয়া পড়িলেন। মহা বিপদ! রহস্য বুঝি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুরবালার উপস্থিত বুদ্ধি সব ঠিক করিয়া দিল। সে বলিল, "উহাতে ভয় নাই, ভাট্ বাম্নের মেয়ে, গাছতলায় রাসলীলা করা অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে।"

মণিপুরাধিপতি সন্তুষ্ট হইয়া মুক্তার মালা দিতে ইচ্ছা করিলে সে অমায়িকভাবে বলিল, "মহারাজ, রাসলীলা আমাদের ব্যবসা নহে। মুক্তামালা-গ্রহণে অস্বীকার মার্জ্জনা করিবেন।"

ইহার পরে রণকল্যাণীর অধ্যয়নকক্ষে শিখণ্ডিবাহনের সহিত কল্যাণের বিবাহে সে কার্য্যতৎপরতার যথেষ্ট পরিচয় দিল।

গ্রন্থের শৈবলিনী-চরিত্র অতি অল্পবর্ণিত হইলেও অতি মধুর। বারাঙ্গনা শৈবলিনী তাহার একখানি পত্র ব্যতীত আমাদিগকে আর কোনও পরিচয়ই

দেয় নাই, কিন্তু সেই পত্রের প্রত্যেক অক্ষরে আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। বাহুল্যভয়ে পত্রখানি উদ্ধৃত হইল না।

যথার্থ প্রেম স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে না। হৃদয়ে হৃদয়ে মধুর মিলন অনেক সময়ে লোকাচার বা দেশাচার বিরূপ চক্ষে দেখিলেও, সময়ে সময়ে বড়ই মধুর, বড়ই কোমল বলিয়া বোধ হয়।

শৈবলিনীর মন অতি উদার, নতুবা সে মকরকেতনের মন ওরূপভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। বিদ্যায় সে সাক্ষাৎ সরস্বতী, কবিতায় তাহার প্রাণের গান সে ভাষায় প্রকাশিত করিতে পারিত, সে গানে প্রেমিক মকরকেতনের প্রাণ মাতিত, সে কবিত্বে শেষে শিখণ্ডিবাহনও বিমোহিত হইয়াছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে সে মকরকেতনকে ভালবাসিয়াছিল। এই ভালবাসার পূর্ণতায় সে কখনও সামাজিক আচারের কথা ভাবিবারও অবসর পাইত না। শিখণ্ডিবাহনের ভর্ৎসনায় তাহার চক্ষু ফুটিল,সে দেখিল,স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ প্রেমের স্থান এ জগতে সর্ব্বত্র নাই। সামাজিক ও লৌকিক কঠোর শাসনের প্রভাব অতিশয় প্রবল, তাই সে তাহার অন্ধ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিয়াছিল। তাই সে পত্রে লিখিয়াছিল, "সহৃদয় মহদাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভর্ৎসনা করেছেন,তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস,আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিতেছি।"—এ বিশ্বাস তাহার পূর্ব্বে ছিল না। হায় অভাগিনী শৈবলিনী, তোমার স্বর্গীয় প্রেমের স্থান এ পৃথিবীতে নাই।

তাই সে জন্মের মতন মকরকেতনকে ত্যাগ করিয়া চলিল, কিন্তু মহাপ্রস্থানসময়ে বলিয়া গেল, "আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী, বস্তুতঃ বারবিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি তোমায় বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম; আমি যে বারবিলাসিনী নই, এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি করিবে।" হায় অভাগিনী! Utility যাহার মূলমন্ত্র, এমন যে সমাজ, তাহাতে তোমার স্বর্গীয় প্রেমের স্থান হইল না। কিন্তু স্বর্গ বলিয়া যদি কোন স্থান থাকে, সেখানে এরূপ অকৃত্রিম ভালবাসার স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট; এ কথা অন্ততঃ ন্যায়ের অনুরোধে অনেকেই স্বীকার করিবেন।

কাব্যের চরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি দুই এক কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কাব্যের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নাটক বা উপন্যাস সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

১। উদ্দেশ্যমূলক (with a purpose) অর্থাৎ যাহাতে সামাজিক বা অন্য কোনও বিষয় বর্ণনার উদ্দেশ্যীভূত।

২। সৌন্দর্য্যমূলক ; যাহাতে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাই কবির অভিপ্রেত।

নীলকরপ্রপীড়িত বঙ্গের উদ্ধারমানসে "নীলদর্পণ" লিখিত। ঐরূপ অন্য কোনও কুপদ্ধতির নিবারণের জন্যই "জামাইবারিক" লিখিত। উক্ত পুস্তকদ্বয়ই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

অপর শ্রেণীর গ্রন্থে এরূপ কোনও উদ্দেশ্য কবির লক্ষ্যীভূত থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনই উহার উদ্দেশ্য।

হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্যরাশি-কবি অনুভব করেন, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করাই এই সকল পুস্তক-রচনার কারণ। কবি-হৃদয়ের এই সৌন্দর্য্যমন্দাকিনীধারা কোনও আখ্যায়িকা-বর্ত্মে প্রবাহিত হইয়া, অপূর্ব্ব নাটক উপন্যাসের সৃষ্টি করে। বঙ্কিমবাবুর "কপালকুণ্ডলা" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধ-সমালোচিত "কমলেকামিনী" এই শ্রেণীভুক্ত। নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য, এবং ইহাতে কবি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই শ্রেণীর মধ্যে আবার দুইটি উপশ্রেণীর কল্পনা করিতে পারা যায় ; প্রথম, সাধারণ গার্হস্থ্য চিত্র ; দ্বিতীয়, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Romantic writings.

বঙ্গভাষার "কমলেকামিনী" যে শেষ শ্রেণীর একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক, ইহাই এই সমালোচনায় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এখন শুধু কবির গ্রন্থগুলির মধ্যে "কমলেকামিনীর" স্থাননির্দ্দেশ করিলেই সমাপ্ত হয়।

কবির "নীলদর্পণে" যে পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাইয়াছি, ইহাতে আমরা সেই হৃদয়ের প্রেমপ্রবণতার নিদর্শন পাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ অপেক্ষা ইহার একটি প্রধান গুণ এই যে, গ্রাম্যচরিত্র অঙ্কনে অপরিহার্য্য এবং আধুনিক রুচির অননুমোদিত উক্তি ইহাতে অতি অল্পই পাওয়া যায়। আর এক কথা, নীলদর্পণের ন্যায় সংস্কৃতবহুল শব্দ ইহাতে অতি বিরল।

নীলদর্পণ হইতে কবির লেখা যে পথে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, "লীলাবতীতে"

সেই "প্রণয়মূলক গার্হস্থ্য" নাটকের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাই। কমলেকামিনীতে আমরা কবির প্রতিভার প্রথম বিভিন্নপথাবলম্বন দেখি। তাই আমাদের বিশ্বাস, জীবনের অবসান হইলেও তাঁহার প্রতিভা-সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই, কেবল হৃদয়ের বিভিন্নদেশ আলোকিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সেই জন্য বোধ হয়, তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহার হৃদয়ের তদ্দেশবর্ত্তী মানস-সরোবরে আরও এইরূপ কত কত সদ্ভাব-সরোজ প্রস্ফুটিত হইত, এবং তাহাদের সৌরভে বঙ্গোদ্যান আমোদিত হইতে পারিত।

গ্রন্থারম্ভের কথোপকথনগুলি কিছু অযথাদীর্ঘ এবং দুই একটি চুটকী কবিতা বাদ দিলে গ্রন্থের ভাষা অতি সুললিত। রাসলীলার কয়েকটি গান অতি মধুর, পাঠক এইগুলি পাঠ করিবেন, স্থানাভাবে উদ্ধৃত হইল না।

বলা বাহুল্য, কমলেকামিনী আমাদের বাঙ্গালীর চিত্র নহে, এবং রণকল্যাণী, সুরবালা প্রভৃতি বঙ্গরমণী নহেন। সেই জন্য স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি পুস্তকে বর্ণিত দেশাচার দূষণীয় নহে। পরন্তু মণিপুরের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, স্ত্রীস্বাধীনতা, পরিণত বয়সে বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যক্ষমতা এবং গান্ধর্ব্ববিবাহ মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। রাসলীলার বাৎসরিক অভিনয় পশ্চিমের রামলীলার ন্যায় মণিপুরে চিরপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান নাটকে অতিসুন্দরভাবে ঐ গুলির অবতারণা করা হইয়াছে। অলক্ষিতভাবে ঐতিহাসিকতার অবতারণা উচ্চ অঙ্গের artএর পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কোনও কোনও সমালোচক বলেন, ইংলণ্ডের প্রকৃত ইতিহাস Shakespeareএর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যত পাওয়া যায়, সেরূপ আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কমলেকামিনীর ঐতিহাসিকতা ইহার আর একটি গৌরবের কারণ; কিন্তু পুস্তকপাঠকালে অনেকেই এ কথাটি ভুলিয়া যান। আমাদের বিশ্বাস, এ কথাটি মনে রাখিলে পাঠক পুস্তকের সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধশেষে Merchant of Venice স্মরণে একটা কথা মনে পড়িল। আমাদের বোধ হয়, কবি "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" নীতিক্রমে সুরবালা বক্কেশ্বরকে বিবাহপাশে বদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে "ইতর জন" আমাদের অন্ত বন্দোবস্ত করিলেই, আমাদের অতিশয় আনন্দ হইত। কল্যাণ একবারমাত্র সেনাপতি-পুত্রের সহিত সুরবালার বিবাহের কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আর কোনও উল্লেখই আমরা পাই না; এবং গ্রন্থমধ্যে উক্ত সেনাপতি-পুত্রের রসিকতার বা আমোদপ্রিয়তার কোনও পরিচয়ই পাই না। তাই অজ্ঞাতশীল ও সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন যুবকের হস্তে রসিকা সুরবালাকে আমরা প্রাণ সঁপিতেও পরামর্শ দিতে পারি না।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা।

পৃথিবী।

১

হে ধরণি, তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
রূপবতী-মাঝে তবু রূপসী উজলা!
সম ইন্দ্রাণী-কমলা,
কুসুমদাম-কবরী, কুসুম-কুন্তলা,
নিতম্বিনী, জলধি-মেখলা,
রতন-শাটী-অম্বরা, প্রফুল্লিত-কলেবরা,
উল্লাসিনী, পতি-অঙ্কে যেন রে কামিনী!

২

না জানি সে প্রমোদ-ভবন
কেমন, যথায় তুমি সাজ বিলাসিনি!
কোন্ রতন-মুকুর
হাসে পাশে? কোন্ সখী চাঁচর চিকুর
বিনাইয়া দেয়, বিনোদিনি?
কোন্ শতদলদলে, কোন্ ফুল্ল নীলোৎপলে,
রাখি রাঙা পা দু'খানি, দেখ চন্দ্রানন?

৩

কোন্ বিম্বে অধর রঞ্জিত
কর ধনি? কোন্ নিশিগন্ধার নিশ্বাসে
শ্বাস কর সুরভিত?
কোন্ শেফালীর গন্ধে হয়ে প্রমোদিত,
উচ্ছ্বসিয়া উঠহ উল্লাসে?
কোন্ চম্পকের শাড়ী, পর তুমি বরনারি,
সারা বিশ্ব মোহে যেই মাধুরীবিলাসে?

৪

কৌটা খুলি, করিয়া যতন,
কে দেয় সীমন্তে তব অশোক-সিন্দূর?
কোন্ দেব-নাট্যশালে
রঙ্গমঞ্চে, বিলাসিনি! নাচ তালে তালে?
অঙ্গভঙ্গী মরি কি মধুর!
কাহার বীণার সনে, কণ্ঠ সাধি সঙ্গোপনে,
কোকিল-ঝঙ্কার-শব্দে মাতাও ভুবন?

৫

এমনি মোহিনী ধনী তুমি,
তোমার শ্যামলমূর্ত্তি হেরিলে স্বজনি,
চিররোগী ভোলে রোগ,
চিরদুঃখিনীর প্রাণে নাহি থাকে শোক,
তুমি দেবি করুণারূপিণী!
হেরি ও সুন্দর মুখ, চিরবন্দী ভোলে দুখ!
কি আনন্দ কবি-প্রাণে ঢাল তুমি, ভূমি!

৬

তাই মা তোমার কাছে আসি,
হেরি রম্য উপবন, শ্যামল কানন,
ঝরণার ঝর্ ঝর্,
পল্লবের মর্ মর্, সুখে থর্ থর্
তরুকোলে কুসুমের হাসি!
তব মুখ নিরখিয়া, শত বার জুড়াইয়া
গিয়াছে এ শ্রান্ত ক্লান্ত রাধার জীবন!

৭

বাণবিদ্ধ পক্ষিণীর প্রায়,
ধেয়ে আসি মাগো ওই শ্যামল কুলায়,
কাঁদিয়ে হয়েছি সারা!
তুমি মা আপন হস্তে, জননীর বাড়া,
বাণ টানি করেছ বাহির!
রুধির মুছিয়া দিয়া, অঙ্গে হাত বুলাইয়া,
চন্দনপ্রলেপদানে করেছ সুস্থির!

৮

পুড়ে মরি, প্রাণ ঝালা-পালা,
সর্পের আঘাতে যেন মর্ম্মান্তিক জ্বালা!
কাঁদিয়ে হয়েছি সারা!
তুমি মা আপন ক্রোড়ে, জননীর বাড়া,
এ দুঃখীরে দিয়াছিলে স্থান!
অগ্নিকুণ্ড হ'তে ছুটি, তোমার উৎসঙ্গে উঠি
লভেছি বিরাম মা গো; বাঁচায়েছি প্রাণ!

৯

মা গো আর ভাল নাহি লাগে
ক্ষণিক বিশ্রাম;—দাও সুচির বিরাম!
দেবতার এই শিক্ষা দীক্ষা
প্রভু, এ কেমন লীলা? এ অগ্নি-পরীক্ষা
কতবার করিবে শ্রীরাম?
ক্ষমা কর, দয়াময়, এ প্রাণে আর না সয়,
ক্ষমা কর, এ দুঃখিনী এই ভিক্ষা মাগে!

১০

মা গো আর ভাল নাহি লাগে
এই ব্যবধান, এই পান্থের বিশ্রাম!
তব অঙ্কে তুলে লও—
দুঃখিনী কন্যার দুঃখ কেমনে মা সও?
মার চিত্তে স্নেহ নাহি জাগে?
সেই পাতালের পুরে, অতি দূরে, অতি দূরে,
লয়ে যা মা; দে মা শ্যামা, অনন্ত বিরাম!

কৃষ্ণচূড়া।

১

শ্যাম মম যেই সাজ ধরে লো,
ঝরে তায় শোভা!
শ্যাম মম যেই ভূষা পরে লো,
তাই মনোলোভা!
আহা দেখাদেখি তাই,সে সাজে সাজে সবাই;
ধরণী সুন্দরী,
তাই কৃষ্ণচূড়া পরি, দোলাইল সুকবরী!

২

দেখাদেখি বাঁধি চুল তাই এ অতুল ফুলে,
আন্‌মনে গেলাম লো ধাই, সরসীর কূলে!
সরসীর পানে ধাই এ কি লো দেখিতে পাই,
নীরদ-বরণ?
কৃষ্ণচূড়া শিরে পরি, নিকুঞ্জবিহারী হরি
নাচিছেন জলকুঞ্জে চঞ্চল চরণ!

৩

হইলাম পাগলিনী-পারা হেরি শ্যামধনে!
দর দর বহে সুখ-ধারা দুঃখিনী-নয়নে!
সরসীর ধারে গিয়া, দুই বাহু পসারিয়া,
কহিনু কাতরে—
"এস নাথ, এস এস, মোর পাশে এসে বোস,
তেমতি গো কও কথা, সোহাগে আদরে!"

৪

মোর কথা শুনি শ্যামমণি, সরসীর জলে,
চাহি চারু অপাঙ্গে স্বজনি, অতি কুতূহলে,
জুড়াতে রাধার ব্যথা কহিলা কতই কথা,
হাসিতে হাসিতে!
ধৈরয গেল হারাই; রাধা আর রাধা নাই!
রঙ্গে দিনু ঝাঁপ জলে, ত্রিভঙ্গে ধরিতে!

৫

চন্দ্রাবলী ধরিয়া আমায় উঠাইল তীরে!
গালি আমি দিনু কত তায়,
ভাসি আঁখি-নীরে!
মিলন হইতেছিল, তাও প্রাণে না সহিল!
হায় লো স্বজনি,
সখী হয়ে তোরা সবে, বৈরিতা সাধিলি যবে,
বুঝিনু অনন্ত মোর বিরহ-রজনী!

সখী।

১

কি বলিলি চন্দ্রাবলি ! বল্ লো আবার
মধুর বচন—
"শ্যাম সম গুণনিধি গড়ে নি চতুর বিধি
অতুল সে বনফুল, অপূর্ব্ব রতন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, সুধা-বরিষণ !

২

কোন্ কোকিলার কুঞ্জে শিখিলি স্বজনি
এ মধু বচন ?
"শ্যামের মধুর প্রেম রতনে জড়িত হেম,
অনিলে সলিলে শশিকিরণে মিলন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, কোকিল-কূজন !

৩

কোন্ দোলপূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে মধুর বচন
শিখিলি লো চন্দ্রাবলী ? "তথা গুঞ্জরয়ে অলি,
পুষ্প হাসে ; পড়ে যথা হরির চরণ !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, নূপুর-শিঞ্জন !

৪

কোন্ চিরবসন্তের চির ঊষাধামে
শিখিলি বচন ?
"যে দেশে নাহিক হরি তথা ঘোর বিভাবরী !
ঊষা হাসে, রাজে যথা হরির বদন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, বীণার বাদন !

৫

কোন্ পিক কলকলে, জলের উছলে,
শিখিলি বচন !
"তথা সুধু অশ্রুবারি, যথা নাই বংশীধারী !
চিরহাসি, হাসে যথা হরির লোচন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ফুলের ভূষণ !

৬

কোন্ ঝরণার কাছে শিখিলি স্বজনি
এ মধু বচন ?
"হয় যথা হরিনাম, তথা চিরলক্ষ্মীধাম
কিসের বিষাদ তথা, কিসের রোদন ?"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, শিশির-পতন !

৭

কোন্ অনঙ্গের বধু মন্ত্র দিল কাণে
মধুর বচন ?
"ভাসায়ে যৌবন-তরী, বল্ বল্ হরি হরি
অকূলে কাণ্ডারী হরি, বিপদভঞ্জন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, চন্দন-লেপন !

৮

হরিদ্বারে, কনখলে, কোন্ হৃষীকেশে,
শিখিলি বচন ?
"হরি-নাম গঙ্গাজলে, ডুব দাও কুতূহলে,
কষিত কাঞ্চন আভা ধরিবে বরণ !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ভ্রমর-গুঞ্জন !

৯

কোন্ অলকার শৈলে শিখিলি সুভাগি ?
মলয়-স্বনন ?
"হরি ছাড়া মান মিছে, হরি ছাড়া দান মিছে,
হরি ছাড়া গান সে তো কেবলি ক্রন্দন !"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, বঁধুর চুম্বন !

১০

কি বলিলি চন্দ্রাবলি ? বল্ লো আবার
মধুর বচন !

"হরি ছাড়া ধ্যান মিছে, হরিছাড়া জ্ঞান মিছে,
হরি ছাড়া প্রাণ সে যে জীবনে মরণ!"
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া দিলি কাণ;
আহা ও বচন নয়, ফুল-বরিষণ!

মলয় মারুত।

১

এমন মধুর শ্বাস, সুগন্ধ সুবাস,
কোথায় পাইলে?
বল বল ছাড়ি ছল, কে দিল এ পরিমল?
কোন্ ফুল-যুবতীরে মজায়ে আইলে?
করি মিষ্ট আলাপন, পেলে এ সৌরভ ধন
কোন্ রসিকার কুঞ্জে? কি গান গাইলে?

২

গিয়াছিলে কোন্ ব্রজে মধুর-গতিতে
মলয়-পবন?
মধুর সে নব-বধূ, পতি চায় মুখ-মধু—
মধুর সে আকিঞ্চন, মধুর বারণ!
হেরিলে কি রসরাজ বধূর মধুর লাজ?
মধুর সে শিহরণ, মধুর কম্পন?

৩

ভাসি গেল লাজ-বাঁধ, ভাতিল অধরে
সুখের স্বপন!
মৃদু মৃদু হাসে বধূ, পতি পিয়ে মুখ-মধু,
সে বধূর অলকান্তে ছিলে কি গোপন?
যাপি রাতি সেই গেহে, মাখিলে কি সর্ব্বদেহে
প্রথম প্রেমের সেই অগুরু চন্দন?

৪

এত যদি ভালবাস, কুসুম-বিলাসি,
সুরভি সুবাস,
যাও যথা শ্যামমণি, শত পারিজাত খনি,
চির-লাবণ্যের উৎস, চির মধুমাস!
লুণ্ঠিও সে কলেবরে, বসিও সে কুন্তাধরে,
মাখিও মাখিও অঙ্গে সে সুখ-উচ্ছ্বাস!

৫

আর না থাকিবে রুচি কুমুদ কমলে
মৃদু সমীরণ!
পাইবে চির-আনন্দ, ঘুচিবে প্রাণের দ্বন্দ,
আর না লাগিবে ভাল মালঞ্চে ভ্রমণ!
যুবতী-অধরে আর চাবে না বিলাস!
শ্যামের দেহ-সৌরভে মিটি যাবে আশ!

৬

শুনিয়াছি, অলকায় ফোটে হেন ফুল,
হে বায়ু মলয়,
রূপেতে ইন্দ্রাণী জিনি, অলকার সীমন্তিনী,
রচে তাহে কণ্ঠমালা কঙ্কণ বলয়!
রঞ্জে তাহে বিলাসিনী শ্বেত ক্ষৌমবাস;
শত ধৌতে নাহি যায় সে গোলাপী বাস!

৭

হে মলয়, আমি শ্যাম-সৌরভ-সায়রে
আকণ্ঠ ডুবিয়া,
শেফালী-সৌরভে স্নাত গোলাপী-উষার মত
একেবারে চিরতরে গেছি সুরভিয়া!
প্রাণ মন কলেবরে রঞ্জিয়াছি থরে থরে—
অশ্রু পড়ে দিবানিশি; তবু এ গৌরব
শত ধৌতে নাহি যায়! হায় কি সৌরভ!

বসন্তে।

১

অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে ও কুরুবকে
এ কি লো বাহার!
আইলা কি বৃন্দাবনে, বন্ধু মদনের সনে,
বসন্ত আবার?
মাখি কুবলয়-গন্ধ, বহে বায়ু মন্দ মন্দ!
কি আনন্দ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,

২

বসাইল অলিকুলে মোহন পারুলে সই
কে লো থরে থরে ?
রসাইল পিককুলে, নাচাইল বুল্‌বুলে,
কোন্ যাদুকরে ?
শ্যামের মধুর তান কাড়িয়া লইছে প্রাণ !
কি আনন্দ ! কুঞ্জবনে, চল্ সহচরি,
আনি চল্ রূপজল, ভরিয়া গাগরি !

৩

কি মধু মাখানো আছে,কি সুধা লুকানো ওই
কোকিল-ঝঙ্কারে ?
নিশিগন্ধা নিশ্বাসিল, কে যেন গো আশ্বাসিল
দুঃখিনী রাধারে !
বনতুলসীর গন্ধ, ঘুচাইয়া দিল ধন্দ !
কি আনন্দ ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
প্রেম যমুনার জলে ভাসাইব তরী।

৪

আম্রমুকুলের গন্ধে আনন্দে নয়ন ঝরে !
এ কি রসাস্বাদ !
হাসি আসে এ অধরে, কত কথা মনে পড়ে,
কত জাগে সাধ !
তমালে কপোতবধূ পিয়াইছে মুখ-মধু
কপোতেরে !—কি আনন্দ ! চল সহচরি,
হেরিব সে মুখ-চন্দ্র, জাগি বিভাবরী !

৫

হের আজি বনস্থলী ! নবতপস্বিনী বেশা
মোহিনী রঙ্গিণী !
চিকণ বাকল দিয়া, তনুখানি আবরিয়া,
পরিয়াছে ফুল-সজ্জা কানন-নন্দিনী !
খোঁপায় চাঁপার ফুল, কাণে কদম্বের দুল,
ফুল-সিঁতি, ফুলের মেখলা ! পুষ্প ডালা

৬

এই বেলা চল কুঞ্জে ! গাঁথিয়াছ ফুলমালা ?
দিব তার গলে !
চিরবন্দী করি তারে, হৃদি-পুষ্প-কারাগারে
রাখিব সে চিত্তচোরে, বাঁধিব লো ছলে !
চিরতরে একেবারে বাঁধিয়া রাখিব তারে
রাধার এ বাহুযুগ-প্রেমের নিগড়ে !
হইবে উচিত শাস্তি, চল লো সত্বরে !

৭

ওই শোন !—"আয় রাধে, সোনার
সোহাগহারে বাঁধিব তুহারে !"
কে যেন বলিছে মোরে, "আয় রাধা ! বাঁধি
তোরে
পীরিতির ঝল্মল্ গজমতি-হারে !"
আহা কি মধুর স্বর ! জুড়াইল এ অন্তর !
চল্ ধনি, শ্যাম-মণি ডাকিছে আমারে ;—
বুঝিব স্বজনি আজি কে বাঁধে কাহারে !

৮

অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে ও কুরুবকে
এ কি লো বাহার !
আসিয়াছে বৃন্দাবনে বন্ধু মদনের সনে
বসন্ত আবার !
কুহরিছে শত পিক, শিহরিছে দশ দিক !
চমকি উঠিছে প্রাণ ;—চল লো আনন্দে,
এ বসন্তে কুঞ্জবনে পাইব গোবিন্দে !

বসন্তে।

১

সখি রে,
বনভূমি হাসে এত পেয়ে কোন্ মদনে ?
পরশ-হরষে সতী যথা পতি-মিলনে !
গোপি, তোর বিম্বাধরে হাসি উথলিয়া পড়ে !
ধরে না মাধুরী আজি পিক-কুল-কূজনে !

২

সখি রে,
ফলিল সুখ-স্বপন! চেয়ে দেখ সঙ্গিনি,
ধরণী সাজিল আজি রাস-রস-রঙ্গিণী!
কপোলে ফুলের হাস, অধরে ফুলের শ্বাস,
মধুমাসে এ কি রাস! কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী!
সকলি ফুলের সৃষ্টি! ফুলময়ী শিঞ্জিনী!

৩

সখি রে,
যেন কোন বনবালা সারানিশি জাগিয়া,
প্রভাতে পাইল তারে সতত চাহিত যারে!
ফুল-বালা ফুল-মালা ফুল-সিঁতি পরিয়া,
মাতিল কৌতুক-রঙ্গে বক্ষে তারে ধরিয়া!

৪

সখি রে,
কি উল্লাসে, কি সুবাসে, ধরা আজি রসিল!
কবরীতে রত্নরাজি, স্বয়ংবরা বধূ সাজি,
মুচকিয়া মৃদুহাসি ঋতুরাজে বরিল!
ধরা আজি উল্লাসের রাস-রসে রসিল!

৫

সখি রে,
এ বসন্তে আমিও লো ধরিব লো মোহনে!
বরিবারে শ্যামরাজে, সেজেছি বধূর সাজে
বর গুঞ্জমালা দিয়া, বনদেবী-ভবনে,
করি সবে হুলুধ্বনি, বরিব লো রমণে!

৬

সখি রে,
কুহরিছে মুহুর্মুহু কুহু কুহু কোকিলা,
মর্ম্মরিছে তরুদল, গুঞ্জরিছে অলিদল,
শিহরিছে ব্রজবালা উতলা ও বিভোলা,
চমকিছে থমকিছে পথে নীল-নীচোলা!

৭

সখি রে,
কি আপদ! গুঞ্জরিয়া অলি বসে অধরে!
এ লীলা-কমল দিয়া, দিনু এরে তাড়াইয়া,
তবু বারবার আসে! অঞ্চলের অম্বরে
ফাঁদ পাতি বাঁধ্ আলি এ কুসুম-নাগরে!

৮

সখি রে,
কি মধুর উপবন! চেয়ে দেখ এ ভূমে,
ভরি গেছে বনস্থলী কুসুমে ও কুসুমে!
বুকে ভরা পরিমল আমাদেরো বক্ষঃস্থল!
"ব্রজ নারী-পুষ্প-বিনা মধু কোথা কুসুমে?"

৯

সখি রে,
এ বসন্তে কুঞ্জ রাজা কুঞ্জমণি সাজিবে!
যৌবন-চন্দন দিয়া, অঙ্গ দিব সুরভিয়া;
চারি ধারে মঙ্গলের কলধ্বনি বাজিবে!
সাষ্টাঙ্গে নমিব সবে সে চরণ-রাজীবে!

১০

সখি রে,
বনভূমি হাসে এত পেয়ে কোন্ মদনে?
পরশ-হরষে সতী যথা পতি-মিলনে!
গোপি, তোর বিম্বাধরে!
হাসি উথলিয়া পড়ে!
ঝরে না মাধুরী সখি পিক-কুল-কূজনে!
চল-বনে, পাব আজি সে হারাণো রতনে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

আগন্তুক।

পিতৃমাতৃহীন ললিতমোহন কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া কোনও কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় হরিপুরের কন্যাদায়গ্রস্ত রামতারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক সাধ্যসাধনার পর, ললিতমোহনের মাতুলের সম্মতিক্রমে ললিতের কণ্ঠে স্বীয় দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা কমলিনীকে দোদুল্যমানা করিয়া নিজের ইহ ও পরলোকের পথ নিষ্কণ্টক ও জামাতার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই ললিতমোহন বি. এ. পাশ করিয়া সরস্বতীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর সেবা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বিলাত গিয়া সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দেওয়া অথবা ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের আশা নবপরিণীতা বধূর সামান্য দুই একটা সুখস্বচ্ছন্দতার নিকট নিতান্ত লঘু হইয়া পড়িল। অবশেষে ললিতমোহন আশী টাকা বেতনে পঞ্জাব প্রদেশে একটি গভর্মেণ্টের চাকুরি পাইয়া মাতুল মাতুলানীর চরণে প্রণাম পূর্ব্বক পশ্চিম যাত্রা করিলেন। পত্র দ্বারা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহধর্ম্মিণীকে নিজের পৈত্রিক গৃহে লইয়া যাইবেন, এমন কথারও উল্লেখ থাকিল।

কিন্তু মানুষে গড়ে, আর দেবতায় ভাঙ্গে। অল্প দিনে প্রত্যাবর্ত্তন করা দূরে থাক, বৎসরের পর বৎসর করিয়া ক্রমে পাঁচটি বৎসর অতীত হইল, ললিতমোহনের দেশে আর আসা হইল না। এই পাঁচ বৎসরে তাঁহার ৮০ টাকা বেতন ২৫০ টাকায় পরিণত হইল। তাঁহার ঈষৎগুম্ফের রেখা বেশ সুন্দর সংযত গুম্ফে পরিণত হইল। তাঁহার বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশে উপনীত হইল, কিন্তু তাঁহার দেশে আর আসা হইল না। কলিকাতা কলেজের সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কুঞ্চিতকেশ ঈষৎ-শীর্ণ বালক ললিতমোহন এক্ষণে মাংসল, বিস্তৃতবক্ষ সুন্দর যুবাপুরুষে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু দেশের কেহ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় নাই। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহার শ্বশুর তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে পশ্চিমে আসিয়া জামাতার বাসায় প্রায় ১৫ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাও প্রায় তিন বৎসরের কথা।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ললিত ২।৩ বার অবকাশ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তিনি অবকাশ লইবার ইচ্ছা করিতেন, তখনই হয় তাঁহার বেতনবৃদ্ধি কি পদোন্নতি, যাহা হউক, এই প্রকার একটা শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা হইত, সুতরাং তাঁহার অবকাশ লওয়া আর ঘটিয়া উঠিত না। এ দিকে তাঁহার মাতুল মহাশয় ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও যথার্থ সুবুদ্ধি বিষয়ী লোকের ন্যায় ললিতকে উপদেশ দিতেন, অনাবশ্যক অবকাশ লইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কোনও ক্রমে বিপদসঙ্কুল করা উচিত নহে। এই পাঁচ বৎসরে কমলিনীর সহিত তাঁহার অনেক আলাপ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু সে ডাকঘরের মধ্যস্থতায়। প্রতি সপ্তাহেই ললিতমোহনের নিকট তাঁহারই স্ব-হস্তলিখিত শিরোনামে একখানি করিয়া পত্র আসিত। তাহার মধ্যে আঁকা বাঁকা অক্ষরে কত মান অভিমান, কত বিরহ বেদন, কত সরল প্রণয়ের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইত, তাহা ললিতমোহনই জানিতেন। আবার প্রতি সপ্তাহে যখন গ্রাম্য ডাকপিয়ন সুন্দর বাঙ্গালা অক্ষরে "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামতারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু" এবং খামের এক কোণে ইংরাজী অক্ষরে "K. D." চিহ্নিত পত্র লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারে সমাগত হইত, তখন কমলিনী দেবীর নাড়ী পরীক্ষা করিলে স্বয়ং ধন্বন্তরিকেও বলিতে হইত যে, কমলিনীর বড় জ্বর হইয়াছে। তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইত, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামে সপ্তাহে একদিনমাত্র ডাকপিয়ন আসিত, সুতরাং প্রত্যহ এই বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া হইবার অবসর হইত না। সেই ফুল-শয্যার একদিন ভিন্ন স্ত্রী পুরুষে আর কখনও চাক্ষুষ সন্দর্শন হয় নাই।

২

একদিন পৌষমাসের মধ্যাহ্নে একটি পরম সুন্দর বলিষ্ঠ যুবা হরিপুরের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে এক জন বাহক একটা বড় পোর্টম্যাণ্টো মস্তকে করিয়া চলিয়াছে। রেল-ষ্টেশন হইতে হরিপুর প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ। বাহক গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া এই পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করাতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সমভিব্যাহারী যুবা এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াও কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হয়েন নাই।

কুঞ্চিত কেশকলাপ অসংযত ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই যুবা এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রামতারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী কোথা ?" সে ব্যক্তি অতি স-সম্ভ্রমে করযোড়ে বলিল, "পশ্চিম পাড়ায় আজ্ঞে।"

আগন্তুক বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চিমপাড়ায় উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং একটি কৃষকবালকের নিকট চক্রবর্ত্তীর বাটী জানিয়া লইয়া সদরবাটীর প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন।

প্রাঙ্গণটি বেশ পরিষ্কৃত, গোময়লিপ্ত। প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের পূর্ব্ব দিকে অন্দরমহল। যখন আগন্তুক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, সপ্তদশবর্ষীয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ প্রাচীরে "ঘুঁটে" দিতেছেন। যুবতীর লাল-পাড় শাড়ীর অঞ্চল তাঁহার মস্তকের পশ্চাৎভাগ দিয়া আসিয়া কটিদেশে জড়িত হইয়াছে; উভয় হস্ত গোময়লিপ্ত হওয়াতে আগন্তুককে দেখিয়াও বস্ত্র সংবৃত করিতে পারিলেন না। অপরিচিত আগন্তুক তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র যুবতী ব্রীড়াবনতবদনে অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পর মুহূর্ত্তে যুবা শুনিলেন, অন্তঃপুরে এক জন বামাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, তোর গোবর দেওয়া হল ?"

অন্য রমণী উত্তর করিলেন, "বাইরে কে এক জন বাবু এসেছেন।"

আগন্তুক শুনিলেন যে, যুবতীর নাম "কমল"। নাম শুনিয়াই আগন্তুকের মুখ যেন একটু লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি পর মুহূর্ত্তেই আত্মসংবরণ করিয়া বাহকের নিকট হইতে পোর্টম্যাণ্টো লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে রক্ষা করিলেন, এবং বাহককে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে বলিলেন। স্বয়ং চণ্ডীমণ্ডপের বারন্দায় বিস্তৃত মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। বেলা প্রায় এগারটা; প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক খণ্ড কাষ্ঠে ধান্য আছড়ান হইতেছিল। কাষ্ঠের নিকট ধান্যের স্তূপ, একপার্শ্বে একটি অসম্পূর্ণ মরাই, অন্য দিকে বিচালীর গাদা। আগন্তুক উপবেশনপূর্ব্বক নীরবে ধান্যস্তূপের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় বাটীর মধ্য হইতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায় গা ?"

আগন্তুক সচকিতে তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার

"ঠাকুর মশাই ও গাঁয়ে তাগাদায় গেছেন।"

"কখন আস্‌বেন ?"

"এবেলা কি আর আসতে পারবেন ? আসতে সেই বৈকাল বেলা।"

"কর্ত্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিতেই হইবে ; কি করব, আজ আমাকে থেকে যেতে হবে।"

"তা ব'স।"

প্রৌঢ়া অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলে আগন্তুক আবার নীরবে অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া অবশেষে আপন মনে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেই ভাল।"

এমন সময় তাঁহার বাহক হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে আসিয়া যে কৃষক ধান আছড়াইতেছিল, তাহার অনতিদূরে এক আঁটি বিচালীর উপর উপবেশনপূর্ব্বক তামাকুর চেষ্টায় মনোনিবেশ করিল।

কৃষক মুহূর্ত্তের জন্য নিজ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া একটি কলিকা বাহির করিয়া তাহাতে গৃহপ্রস্তুত তামাকু দিয়া অন্তঃপুরে অগ্নির সন্ধানে প্রস্থান করিল। শীতকালে বেলা এগারটার সময় পল্লীগ্রামে অনেক বাড়ীতেই অগ্নিদেব আবির্ভূত হন না, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তঃপুর হইতে ধূম-চিহ্ন দেখিয়া ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৃষক অগ্নির আবির্ভাব কল্পনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আগন্তুক বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা ?"

"এখান হতে তিন কোশ উত্তুরে।"

"তা' হলে এবেলা এইখানেই আহারাদি কর"—

"আজ্ঞে আমার বড় বেটার এই পাশের গাঁয়ে বিয়ে হয়েছেন। অনেক দিন এ বাগে আসিনি—আজ যদি এলুম তবে একবার বেই বাড়ী হয়ে ঘর যাব।"

"তবে আহারাদি কি সেখানে করবে ? এই রৌদ্রে এলে, আবার রৌদ্রে যেতে বড় কষ্ট হবে।"

"গরিবের আবার কষ্ট ! আর সে গাঁ এখানকার খুব কাছে, মাঠে আসতে সেই যে অশদগাছটা বাঁহাতি দেখা যাচ্ছেলেন, সেই যার তলায় তুমি ধুলো ঝেড়ে নিলেন, সেই গাছটা হতে এক রশি পথ হবেন। এখেনে চাট্টি জলপান নিয়ে সেখানে যাব।"

এমন সময় সেই কৃষক অন্তঃপুর হইতে তামাকু সাজিয়া আনিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তামাক খাওগা ?"

আগন্তুক অসম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলে বাহক ও কৃষক উভয়ে একত্র বসিয়া ধূমপানে নিযুক্ত হইল, এবং এ বৎসর কি প্রকার ফসল হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কয় বিঘা আবাদ আছে, পুব্ব্ মাঠে বড় জমীটা কার, কয়খানা লাঙ্গল আছে, ইত্যাদি গ্রাম্য বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল।

আগন্তুক বাহককে তাহার প্রাপ্য ও কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া বলিলেন, "যদি ও গাঁয়ে যাবে, তা' হলে আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক কি ? বাটীর ভিতর হইতে জলপান চাহিয়া লইয়া তোমার বেঁহাইবাড়ী যাও।"

ইত্যবসরে "তারার মা," সেই প্রৌঢ়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর পরিচারিকা বাহিরে আসিলে আগন্তুক তাহার দ্বারা মুড়ি ও একটু গুড় আনাইয়া বাহককে প্রদান করিলেন ; বাহকও মুড়ি খাইতে খাইতে প্রস্থান করিল।

৩

"কমল, বেলা হ'ল, খা'না এই বেলা, নেয়ে আয় না মা, মিছামিছি বেলা করিস কেন ? বাড়ীতে কুটুম এসে বসে আছে, যা মা যা !"

"যাই মা !"

অন্তঃপুরে মাতা-পুত্রীর উক্তরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া আগন্তুক অবিলম্বে পোর্টম্যাণ্টো হইতে নিজের গামছাখানি বাহির করিয়া প্রাঙ্গণস্থ কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ হাত ধুইব, পুষ্করিণী কোন্ দিকে ?"

কৃষক কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া তিনি পথে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বোক্তা কমলিনী পিত্তল-কলসী কক্ষে অন্তঃপুর-দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুষ্করিণীর অভিমুখে গমন করিতেছেন। যুবা নিঃশব্দে অথচ বেশ শান্তভাবে দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামের পথে এ সময় বড় একটা লোক জন থাকে না। একে ধান্যচ্ছেদনের সময়,তাহাতে বেলা প্রায় এগারটা। পুরুষমানুষমাত্রই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অথবা খামারে ব্যস্ত। স্ত্রীলোক পথে দুই চারি জন থাকিলেও কেহ অপরিচিত রূপবান যুবাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না। কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেও বোধ হয় আগন্তুক তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পথে যাইতে যাইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া দন্তধাবন করিতে লাগিলেন।

যে প্রদেশে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাস, তথাকার প্রথা এই যে, স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে যাইবার সময় গৃহে তৈলমর্দ্দন না করিয়া পুষ্করিণীতীরে গিয়া তৈল-

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে উক্ত প্রথা বিশেষ প্রবল ছিল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, আমাদের নায়ক পাঁচ বৎসরে আশী টাকা হইতে আড়াই শত টাকায় যখন উপনীত হইয়াছেন, তখন সে সময় আজকালকার অনেক পূর্ব্বে। কমলও প্রথানুসারে তৈলপাত্র হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া যুবতী তৈলপাত্র, কলসী ও গাত্রমার্জ্জনী রক্ষা করিয়া, নিকটস্থ এক গৃহস্থের বাটীতে, বোধ হয় সমবয়স্কার অনুসন্ধানে, প্রবেশ করিলেন। বোধ হয় যুবতী দেখিয়া থাকিবেন যে, ঘাটে কেহ নাই, একাকী নীরবে স্নান পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠীতে বড় লেখে না,সুতরাং কমল যে সঙ্গিনীর চেষ্টায় নিকটস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। কমলিনীর এই তৈলপাত্র-রক্ষা ও নিকটস্থ গৃহে গমন দেখিয়া আগন্তুক আপন মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভাল!"

যুবতী চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র যুবা শশব্যস্তে আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সেই তৈলাধার হইতে তৈল লইয়া স্বয়ং নিজ গাত্রে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি নিশ্চিন্তভাবে ধীরে ধীরে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন, এমন সময় কমলিনী সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখেন,—সর্ব্বনাশ!

কমলের মুখে আর কথা সরিল না। তাঁহার সখী তাঁহাকে বিস্ময়চকিতা দেখিয়া প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, পরে অদূরে পরমরূপবান যুবাকে দেখিয়া নিজেও একটু চকিত হইয়া কমলকে বলিলেন, "ও কে ভাই?"

আর "কে ভাই!" কমল নির্ব্বাক! অপরিচিত যুবা কোন্ সাহসে অপরিচিতা কামিনীর আনীত তৈল নিজশরীরে মর্দ্দন করিতেছেন, তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া সঙ্গিনীকে বলিলেন, "কি জানি ভাই! আজ আমাদের বাড়ীতে এসেছে, বাবার কাছে কি দরকার আছে; কিন্তু আমি ওর আক্কেল দেখে ভাই অবাক হয়েছি! আমি তেল মাখবার জন্য তেল আনলেম, আর ও আমার বাটী থেকে দিব্যি বসে বসে তেল নিয়ে মাখছে!" কথাটা বাস্তবিকই অন্যায়। এ প্রকার অন্যায় কোনও ভদ্রলোক করিতে সাহস করেন না, এবং কোনও রমণীও এ প্রকার অন্যায় ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহেন। আগন্তুকের এই উৎকট বেয়াদবি যে সখীদ্বয়ের পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। কমলের সঙ্গিনী কিছু মুখরা, কিন্তু বুদ্ধিমতী। সে যুবার এই অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমাযোগ্য বলিয়া মনে করিল না; কাজে কাজেই তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বেশ দুই

কথা আরম্ভ করিল। "অসভ্য," "চোয়াড়," "বেহায়া," এবং শেষে আগন্তুকের সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতি কিছুমাত্র দয়ামায়াপ্রকাশের চিহ্নপ্রদর্শন না করিয়া বরং সেই সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতি অগ্নিদেবের মনঃসংযোগের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং ধীরে ধীরে আসিয়া কমলের কলস ও গামোছা লইয়া সখীকে বলিল, "আয় ভাই! আমাদের খিড়কীতে যাই।"

তৈলপাত্র সেইখানে পড়িয়া রহিল। আগন্তুক নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন,কোনও প্রতিবাদ করিলেন না, অথচ ক্ষমাভিক্ষারও কোনও আয়োজন করিলেন না দেখিয়া, কমল সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

কমল প্রস্থান করিলে যুবা আর কালবিলম্ব না করিয়া স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিলেন, এবং তৈলপাত্র ধৌত করিয়া লইয়া চক্রবর্ত্তীর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া এক ধারে তৈলপাত্র রক্ষা করিলেন, ও সিক্ত বস্ত্র নিপীড়ন করিয়া পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক সিক্ত বস্ত্র বাতাসে ছড়াইয়া দিলেন, এবং পোর্টম্যাণ্টো হইতে একখানি তোয়ালে আরশি ও চিরুণী লইয়া কুঞ্চিত কেশপাশ সংযত করিলেন। তার পর বেশ লক্ষ্মী ছেলেটি হইয়া একখানা সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

৪

প্রায় দশ মিনিট পরে হঠাৎ শুনিলেন, অন্তঃপুরে গৃহিণী একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তুই গেছিস ত আজ নয়। নাওয়া কি আর শেষ হয় না?"

আগন্তুক বুঝিলেন, এইবার কমল নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য এবং তৈলপাত্রের তিরোধানের ব্যাখ্যার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহার নাম করিবেন। তাহা হইলে যাহা হয় একটা কিছু হইবে। কিন্তু আগন্তুক বেশ নিশ্চিন্তভাব দেখাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আকৃতিতে অপরাধজনিত কোনও প্রকার চাঞ্চল্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

আগন্তুক শুনিলেন, কমলিনী অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"মা চুপ কর, চেঁচিও না। আমাদের বাড়ীতে যে লোকটা এসেছে, ও মিন্সে ভালমানুষ নয়। আমার পিছনে পিছনে কখন ঘাটে গেছে আমি কি জানি? আমি ঘাটে তেল রেখে সইকে ডাক্‌তে গেছি, আর এসে দেখি, আমার তেলের বাটী থেকে তেল নিয়ে বসে বসে দিব্যি মাখছে। আমার ত রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। সই পোড়ারমুখো মিন্সেকে

গৃহিণী কন্যার কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। যুবতী কন্যাকে অপমান করিলে কোন গৃহিণী অগ্নিশর্ম্মা না হইয়া থাকেন ? গৃহিণী সরোষে বলিলেন, "ছোঁড়া ভালমানুষ হলে কি আর কর্ত্তা বাড়ীতে নেই শুনেও বসে থাকে ? আমি আড়াল থেকে দেখেছি ছোঁড়ার চোক যেন নাটাই ঘুরছে। তিনি আসুন, ওর সাদা কাপড় আর বাঁকা টেরি কেটে ভদ্র-আনা বার করব। যা' হক মা তুই আর বাড়ীর বার হস্‌নে। তারিণীর মা এলে ছোঁড়াকে ওর পিণ্ডি গেলবার ঠাঁই করে দেবে এখন।"

বলা বাহুল্য যে,গৃহিণী ক্রোধে এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে,আতিথ্য-সংকারের পবিত্র নিয়মগুলি তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছিল। অদূরে সদর-বাড়ীতে অপরিচিত পুরুষ উপবিষ্ট, এবং সেই অপরিচিতকে উদ্দেশ করিয়া যে সকল অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে, সেগুলি ভদ্রমহিলার ঠিক উপযুক্ত নহে, এবং সেই কথাগুলি অপরিচিতের শ্রবণপথে পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা, ইহা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। দিবা দ্বিপ্রহরে অভুক্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে অনাহারে প্রত্যাখ্যান করা মহা পাপ, বোধ হয়, এই মহাবাক্য তাঁহার হৃদয়ে অতি ক্ষীণভাবে বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার বাড়ীর কৃষককে দিয়া যুবাকে বহিষ্কৃত করেন নাই। আগন্তুক মাতা-পুত্রীর সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথা যখন উচ্চ সপ্তক হইতে নিম্ন সপ্তকে অবরোহণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারমাত্রাবশেষ অগ্নির ন্যায় 'গণ্ গণ্' করিতে লাগিল, এবং কন্যার গৌরবরক্ষণে সচেষ্ট মাতৃহৃদয় আপনা-আপনি গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতে লাগিল, তখন আগন্তুক আপন মনে সহাস্যে আবার বলিলেন, "হ'ল ভাল !"

অনেকক্ষণ পরে সেই প্রৌঢ়া দাসী তারিণীর মা একটা ঘটীতে পানীয় জল ও একটা বাটীতে কিছু মুড়ি ও একটু গুড় আগন্তুকের নিকট রাখিয়া গেল। তারিণীর মার ভাব দেখিয়া যুবা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যে উত্তাপে গৃহিণী মনে মনে দগ্ধ হইতেছিলেন, সেই উত্তাপে তারিণীর মা পর্য্যন্ত বিলক্ষণ গরম হইয়া উঠিয়াছে। কমলের কথা শুনিয়া তারিণীর মাও তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়াছেন। সে নিতান্ত হতশ্রদ্ধা করিয়া খাদ্যসামগ্রী তাঁহার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল। তিনিও অম্লানবদনে সেগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। জলযোগ শেষ করিয়া তিনি আবার সংবাদ-

বেলা দুইটার সময় তারিণীর মা চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে একখানা অনতিপ্রশস্ত পিঁড়া ও এক ঘটি জল ও একখানা পদ্মপত্র রক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং গৃহিণী, কেন না বাটীতে আর তেমন পুরুষ মানুষ নাই, আবক্ষ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া পত্রে অন্ন প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। আগন্তুক একবার অন্নদাত্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আবার সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন। ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন শেষ হইলে তারিণীর মা বলিল, "ভাত দেওয়া হয়েছে গো।"

আগন্তুক বিনা আড়ম্বরে গিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে অথবা তাঁহার অন্যায় ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আহার শেষ করিয়া স্বয়ংই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া তারিণীর মা অগত্যা বলিল, "থাক না গো, সকড়ি আমি নেবো এখন; বামুনের ছেলে কি আর সকড়ি পরিষ্কার করে?"

যুবা আচমন করিলে তারিণীর মা উচ্ছিষ্ট লইয়া চলিয়া গেল ও কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া তাঁহার নিকট একটা তাম্বূল রাখিয়া গেল। তিনি তাম্বূল-গ্রহণপূর্ব্বক সেই অনাবৃত মাদুরে শয়ন করিয়া আবার কাগজ দেখিতে লাগিলেন। বোধ হয়, যুবার দিবা-নিদ্রা অভ্যাস নাই।

হরিপুরের পশ্চিমপাড়ার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই একটু লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ; কারণ, তাঁহার চারিখানা লাঙ্গল এবং অন্দরমহল দ্বিতল। পূর্ব্ব-পাড়ায় পাঁচ সাত খানা দ্বিতল গৃহ ছিল, কিন্তু পশ্চিমপাড়ায় চক্রবর্ত্তীর দ্বিতল গৃহই "একোমেবাদ্বিতীয়ং"। গ্রামের পশ্চিম দিকের মাঠ হইতে তাঁহার আবাস বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া অনেক দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত।

বেলা ৪টার পর চক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরে নীচেকার বারান্দায় মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। প্রত্যহই এই প্রকার অধিবেশন হইত। পাড়ার ১২।১৩ জন স্ত্রীলোক এই সময় চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীর নিকট সমাগত হইয়া নানাপ্রকার সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিত। কোনও কোনও দিন কমলিনী দাশুরায়ের পাঁচালী বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেন, আর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তদ্গতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। যে দিন পুস্তক-পাঠ না হইত, সে দিন প্রৌঢ়ারা দলবদ্ধ হইয়া গৃহিণীর নিকট সাংসারিক কথা কহিতেন, এবং যুবতীরা অন্যত্র সমবেত হইয়া সখীগণের নিকট নিজের

ও দিক ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে বালক বালিকা কেহ না থাকিলেও প্রতিবাসী বালকবালিকাগণ তাহাদের কমল দিদির নিকট থাকিতে বড় ভালবাসিত। কারণ, কমল কাহারও পুতুলের বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিতেন, কাহারও মাথা বাঁধিয়া দিতেন, এবং সময়মত সকলকে কিছু কিছু মিষ্টান্ন দিতেন, এবং কমলদিদির নিকট বালক-বালিকার বড় অসদ্ভাব ছিল না।

আজও প্রচলিত প্রথা মত বামা ঠাকুরাণী, ঘোষগিন্নি, হারাণের মা ইত্যাদি পল্লীপার্লামেন্টের ব্রাইট, ফসেট, ব্রাডলা, সালিসবরীগণ সমবেত হইয়াছেন। বামা ঠাকুরাণী গ্লাডষ্টোন, কারণ একে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, তারপর বাল-বিধবা, এবং এই পশ্চিমপাড়াই তাঁহার জন্মস্থান। সকলেই তাঁহার "দেখ্‌তা"। তিনি সম্পদে বিপদে, আহ্লাদে বিষাদে, রহস্যে রসিকতায় সর্ব্বত্রই সম-ভাবে বর্ত্তমান। আবার সৌভাগ্যবশতঃ পল্লীস্থ যুবকযুবতীমাত্রেরই তিনি "ঠানদিদি"।

এ হেন ঠানদিদি ওরফে বামাঠাকুরাণী, ওরফে গ্লাডষ্টোন, কমলিনীর মাতার নিকট যখন আগন্তুকের ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইলেন, তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আহা! বউমা আমাকে ডাকতে হয়, আমি এসে ছোঁড়ার তেল মাখা বার করতুম। তার কানে পাক দিয়ে কান থেকে টস্ টস্ করে তেল বার করতুম না! এত রসিক? পরের বউ ঝির সঙ্গে রসিকতা করেন! ছোঁড়া কোথা গেল? একবার খবর নেব নাকি?"

গৃহিণী তাচ্ছীল্যভাবে বলিলেন, "বাইরে পড়ে বুঝি ঘুমুচ্ছেন।"

বলা বাহুল্য, কমলিনীর সখীও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,

"ঠাকুরমা তোমাকে আর সে কষ্ট করতে হবে না, মিন্সেকে যা বলবার তা আমি বলেছি, আমি তেমন মেয়ে নই।"

"বেশ করেছিস!"

* * * * *

গ্রামান্তর হইতে এক হাঁটু ধূলা মাখিয়া একটা মাছ ও একটা কপি হাতে করিয়া গৃহস্বামী চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কত ধান আছড়ান হইয়াছে, কত ধান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া [illegible]

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আগন্তুকের পাদুকা ও বস্ত্রাদি দেখিতে পাইলেন। চণ্ডী-মণ্ডপের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওখানে কে গা ?"

গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বরে আগন্তুক সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আহ্লাদে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"বাবাজী ? ললিতমোহন ? কত ক্ষণ ? কেমন আছ ?"

"আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে আছি ভাল। প্রায় বেলা ১০টার সময় আসিয়াছি।"

"তা এখানে কেন ? বাটীর মধ্যে না গিয়া বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে ?"

"এখানে নির্জ্জনে একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম—" চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে করিলেন, তবে বুঝি অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। বলিলেন, "বস বাবা, হাত পা ধুয়ে আসি।"

ব্রাহ্মণ বাড়ীর মধ্যে গিয়াই পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ললিত কখন এসেছে ? কি খাওয়া দাওয়া হ'ল ? আমি বাড়ীতে ছিলাম না—"

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে গৃহিণী বলিলেন, "কে ললিত ? জামাই ? কোথা ?"

"কেন, বাইরে,—চণ্ডীমণ্ডপে !"

"সে কি ? ও কি জামাই ? ও মা যাব কোথা ? কি অভাগ্‌গি !"

সকলের বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ! "পোড়ারমুখো বেহায়া ছোঁড়া" জামাতা ! একমাত্র কন্যা কমলিনীর স্বামী ! পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তিনটা পাস করা, ২৫০৲ টাকা বেতনের, কার্ত্তিকের সম রূপবান যুবা জামাতা !

কমলিনীর সই যখন শুনিল যে, ওবেলাকার সেই স্নানের ঘাটের সেই মিন্সে আর কেহই নহেন, তাঁহার প্রাণসখী কমলিনীর প্রাণেশ্বর ললিতমোহন, তখন আর তাহার লজ্জার সীমা রহিল না। কিন্তু সে সদাই সপ্রতিভ ; গৃহিণীকে বলিল, "সইমা ! আমরা মাখনচোরার কথাই জানিতাম, কিন্তু তেল-চোরার কথা ত জানতেম না। তা হলে ধরে ফেলতেম।"

এমন সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় জামাতার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আলোক—দৃশ্য ও অদৃশ্য।

২

বর্ণচ্ছত্রের লাল আলোর পরবর্ত্তী অন্ধকার স্থানে কোনও সূক্ষ্ম তাপমাপক যন্ত্র ধরিলে, তথায় যে তাপ-কিরণ বর্ত্তমান আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। দৃশ্য আলোক-কিরণ যেমন দর্পণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও আতুসিকাচ বা দৃষ্টিকাচ দ্বারা এক কেন্দ্রে সমাহৃত করা যায়, এই অদৃশ্য তাপ-কিরণও ঠিক সেইরূপ করা যায়। কোনও ধাতুখণ্ডের উপর এই কিরণ কেন্দ্রীভূত করিলে সেই ধাতুখণ্ড তাতিয়া লাল হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ সেই ধাতুখণ্ডের অণুগুলি অদৃশ্য ঈথর-তরঙ্গের কম্পন গ্রহণ করিয়া কম্পিত হইতে থাকিবে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত উপায়ে ইহাদিগের কম্পনসংখ্যা পূর্ব্বোক্ত তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা হইতে অধিকতর (ও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হ্রস্বতর) হইয়া যাওয়াতে আমাদের চক্ষুর গ্রাহ্য হইল ও লাল বলিয়া অনুভূত হইল।

বর্ণচ্ছত্রের বেগুনে আলোর পর কি কিছুই নাই? কুইনাইন জলে গুলিয়া বুটিং কাগজে মাখাইয়া লও; সেই কাগজখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের বেগুনি রঙ্গের পর অন্ধকার স্থানে ধর, দেখিবে, কাগজখানি জ্যোতিষ্মান হইয়া উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই বুঝা গেল, বেগুনের পর অন্ধকার স্থানে এমন কিছু আছে, যাহাতে কাগজে মাখান কুইনাইনের অণুগুলিকে কাঁপাইতে লাগিল; কিন্তু ইহাদের কম্পনসংখ্যা সেই কিরণের কম্পনসংখ্যা হইতে অল্পতর হওয়াতে দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া নীলবর্ণের অনুভূতি জন্মাইল। এই অন্ধকার অংশে রৌপ্যলবণ-মাখান ফটোগ্রাফের সাদা কাগজ ধরিলে তাহা কাল হইয়া যাইবে। জলে কুইনাইন গুলিয়া তাহা দ্বারা একখণ্ড সাদা কাগজের উপর কোন নক্সা বা আকৃতি অঙ্কিত কর। জল শুকাইয়া গেলে কাগজের উপর যে কিছু আঁকা আছে, তাহা একেবারেই বুঝা যাইবে না। কিন্তু ক্যামেরার সাহায্যে যদি ঐ কাগজখণ্ডের ফটো উঠান যায়, তবে সেই ফটোতে কাগজের সাদা জমির উপর পূর্ব্ব অঙ্কিত অদৃশ্য কাল রেখাঙ্কিত হইয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। চক্ষে যাহা অদৃশ্য আকৃতি ছিল, ফটোগ্রাফির সাহায্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। কুইনাইনাঙ্কিত রেখা হইতে এমন রশ্মি বাহির হইতেছিল,

না ; অথচ ফটোগ্রাফের রাসায়নিক পদার্থে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া আমাদের জ্ঞান-গোচর হইল। সূর্য্যের দৃশ্যকিরণের সহিত এই অদৃশ্যকিরণ জড়িত রহিয়াছে। ত্রিপার্শ্ব কাচের সাহায্যে তাহাকে পৃথক করা গেল। উজ্জ্বল শুভ্র সূর্য্যালোকে যে নীল বেগুনে বা বেগুনের পর অদৃশ্য কিরণ আছে, তাহাতেই ফটোগ্রাফের কাচফলকে মাখান রৌপ্যলবণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ফটোর ছবি উঠে। লাল ও হল্‌দে আলোকের ঐরূপ রাসায়নিক ক্ষমতা নাই, তাই লাল ও হল্‌দে আলো খুব উজ্জ্বল হইলেও তাহাতে ফটো উঠান দুষ্কর। সাধারণ ফটোগ্রাফের কাচের নিকট লাল আলো ও অন্ধকারে কোনও প্রভেদ নাই।

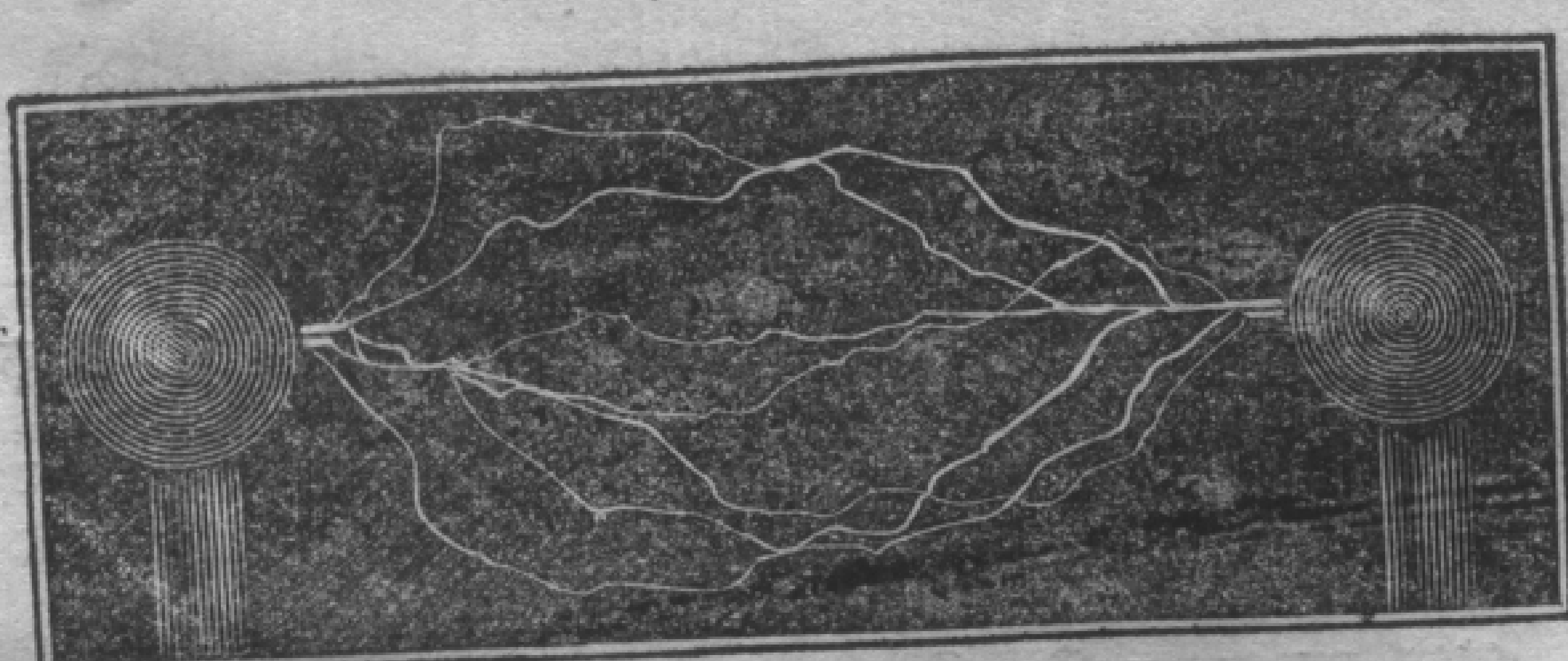
সাধারণ আলোক-রশ্মি জল, কাচ, প্রভৃতি পদার্থের ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, এই জন্য ইহাদের ভিতর দিয়া আলো দেখিতে পাই। ইহাদিগকে স্বচ্ছপদার্থ বলে। ধাতু, কাঠ, ইঁট, পাথর, মোটা কাল কাগজ বা চামড়ার ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে না, এই জন্য আলো ও চক্ষুর মধ্যস্থলে ধাতু বা কাষ্ঠফলক ধরিলে আলোক দেখিতে পাই না।

সূর্য্যালোকে স্থূল-মধ্যে দৃষ্টিকাচ বা আতুসিকাচ ধরিলে তাহার উপর যতটা সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, সমস্তটা সেই কাচ ভেদ করিয়া অপরপার্শ্বে এক মধ্যবিন্দুতে আসিয়া একত্রিত হয়। এই কেন্দ্রীভূত আলোকবিন্দু অতিশয় উজ্জ্বল। উজ্জ্বল বিন্দুতে হাত দিয়া দেখ কত উত্তপ্ত! ফট্‌কিরী জলে গুলিয়া সেই স্বচ্ছ জল যদি কোনও সমপার্শ্ব কাচপাত্রে পুরিয়া এই রশ্মিপথে ধরা যায়, দেখিবে, সেই কেন্দ্রীভূত উজ্জ্বল আলোকবিন্দু আর উত্তপ্ত নহে। সূর্য্যরশ্মির উজ্জ্বল আলোক কিরণের সহিত সংমিশ্রিত অদৃশ্য উত্তাপ-কিরণ যাহা কাচ ভেদ করিয়া আসিতেছিল, তাহা আর ফটকিরি-গোলা-জল ভেদ করিয়া আসিতে পারিল না। অথচ দৃশ্য আলোককিরণ তাহা অনায়াসে ভেদ করিয়া আসিল। 'বাইসলফাইড্‌-অব-কার্ব্বণ' নামক তরল পদার্থে 'আওডিন' গুলিয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ যদি ফটকিরির জলের পরিবর্ত্তে সেই রশ্মি-পথে ধরা যায়, তবে তাহার মধ্য দিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও আলোক নির্গত হইবে না। সুতরাং সেই মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রস্থানেও কোনও আলোক থাকিবে না, কিন্তু মধ্যবিন্দুর যে স্থানে পূর্ব্বে উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছিল, সেই স্থানে হাতখানি ধর, কেমন উত্তাপ অনুভব করিবে। সেই স্থানে এক খণ্ড কাগজ বা একখানা টিকে ধর, তাহা পুড়িয়া উঠিবে। পরীক্ষা

এবোনাইট অধিকতর স্বচ্ছ। আওডিন-যুক্ত বাইসলফাইড অব কার্ব্বন ও এবোনাইট উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। ইহারা দৃশ্যকিরণের পক্ষে অস্বচ্ছ, (লালের পর) অদৃশ্য উত্তাপকিরণের পক্ষে স্বচ্ছ। একের পক্ষে যাহা স্বচ্ছ, অপরের পক্ষে তাহা অস্বচ্ছ। দৃশ্যকিরণ নানা প্রকারের, অদৃশ্যকিরণও নানা প্রকারের। এক কিরণের নিকট যাহা স্বচ্ছ, অপর প্রকার কিরণের নিকট তাহা অস্বচ্ছ। নীল আলোকের নিকট নীলকাচ স্বচ্ছ; লাল বা হল্‌দে আলোকের নিকট লালকাচ অস্বচ্ছ। বেগুনের-পর-অদৃশ্য রাসায়নিক কিরণের নিকট যাহা স্বচ্ছ, লালের পর-অদৃশ্য উত্তাপকিরণের নিকট তাহা অস্বচ্ছ।

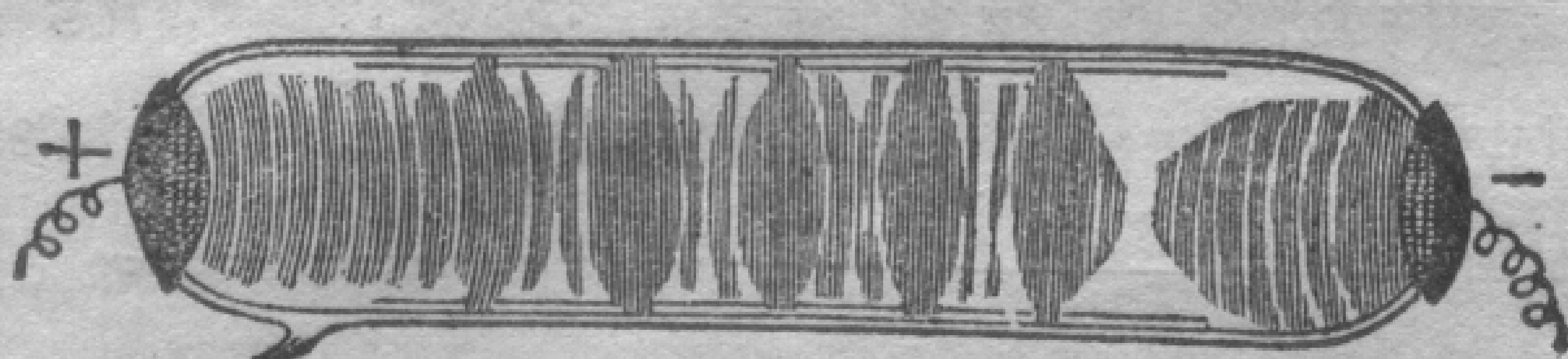
রুদ্ধ-দ্বার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছি, বাহির হইতে ভিতরে কোনও রশ্মি আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। হয় ত কত ঈথর-তরঙ্গ কাষ্ঠ-কপাট ও ইষ্টক-প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিতেছে, এমন কোনও ইন্দ্রিয় বা দিব্যচক্ষু আমাদের নাই, যাহা তাহাদের অভিঘাতে "সাড়া" দিতে পারে। যে চক্ষু আছে, তাহা ত ভোঁতা,—ক'টা কিরণই বা গ্রহণ করিতে পারে? আমাদের চক্ষু যদি এরূপভাবে গঠিত হইত যে, সেকেণ্ডে ৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০, বারের কম কম্পন গ্রহণ করিতে পারিত বা দেখিতে পাইত, তবে আমাদের ঘরের দরজা জানালায় কাচের সার্শির পরিবর্ত্তে এবোনাইটের সার্শি বসাইতে হইত।

তাড়িত যন্ত্রে প্রচুর তাড়িত উৎপন্ন করিলে সেই যন্ত্রের দুই কেন্দ্রের ব্যবধানস্থলে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হয়। ভল্‌টজ্‌ বা উইমস্‌হার্ট তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র বা রুমকর্ফ কুণ্ডলী যন্ত্র, যাহাতে উৎপন্ন তাড়িতপ্রবাহের উগ্রতা ও উদ্ধৃতি অত্যন্ত অধিক—এরূপ কোনও যন্ত্রের



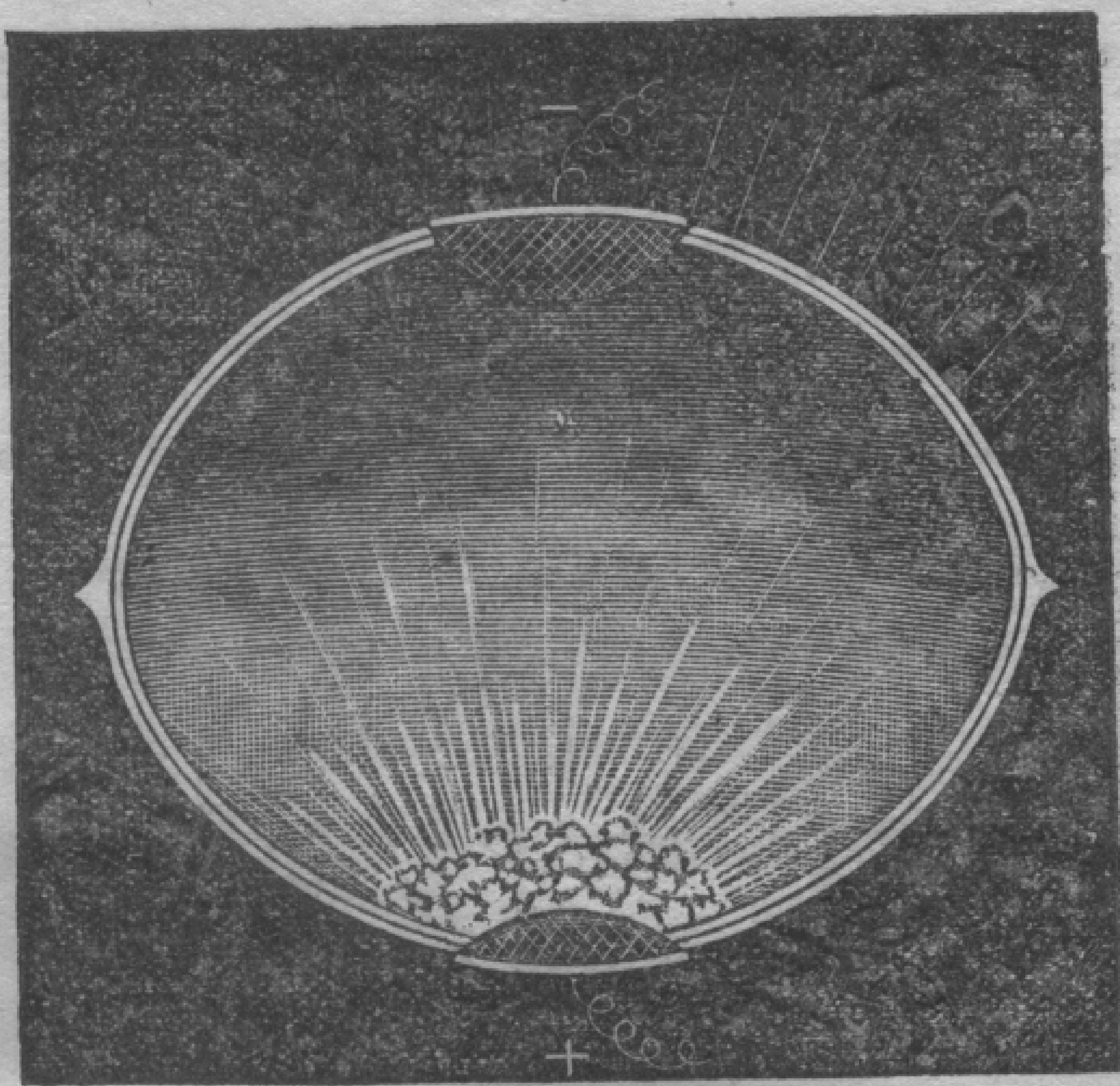
দুই কেন্দ্রের মধ্যে দুই ইঞ্চ দশ ইঞ্চ দীর্ঘ সূত্রবৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখা যায়। কিন্তু বায়ু-শূন্য স্থানে দুই কেন্দ্রের ব্যবধানস্থলে তাড়িত-

প্রবাহে সেরূপ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় না। দুই পার্শ্বে ধাতু-তার সংযুক্ত কাচের কোনও ফাঁপা গোলকের বা নলের ভিতর হইতে অনেকটা বায়ু বাহির করিয়া তাহার দুই প্রান্ত যদি উইম্‌সহার্ট বা রুমকর্ফ যন্ত্রের দুই কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাড়িতস্রোত প্রবাহিত করা যায়, তবে দুই তারের ব্যবধানস্থলে সেরূপ সূত্রবৎ উজ্জ্বল বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে না। আলোক-রেখা সরল ও রজ্জুবৎ প্রশস্ত হয়, এবং তাহার তেজেরও হ্রাস হয়। নির্গম-কেন্দ্র বা ঋণ-কেন্দ্রের নিকট (Cathode বা negative pole) একটু ফাঁক বা অন্ধকার অংশ দেখা যায়। নল বা গোলকের নিকট চুম্বক ধরিলে ভিতরের আলোকরেখা তাহার দিকে ঝুলিয়া পড়ে। আরও বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে আলোকের উজ্জ্বলতা আরও কমিয়া যায়। নির্গমকেন্দ্রের চতুর্দ্দিক এক ক্ষুদ্রায়তন ক্ষীণ নীলালোকের মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হয় ; এবং অপর পার্শ্বের প্রবেশ-কেন্দ্র (Anode বা positive pole) হইতে ঈষৎ গোলাপী রঙ্গের আলোকস্রোত বাহির হইয়া নল বা গোলকের প্রায় সমস্ত অংশকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। নির্গমকেন্দ্রস্থিত নীলাভ ক্ষুদ্রায়তন আলোক-মণ্ডল এবং প্রবেশকেন্দ্রোদ্গত প্রশস্ত লালাভ আলোকাংশের মধ্যে খানিকটা অন্ধকার ব্যবধান থাকিলেও, সমস্তটাকে এক অবিচ্ছিন্ন আলোকপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। আরও বায়ু বাহির করিয়া লইলে নির্গম-কেন্দ্রস্থিত নীলাভমণ্ডল ও তৎপরবর্ত্তী অন্ধকার অংশ আরও বিস্তৃত হয়, এবং প্রবেশ-কেন্দ্রোদ্গত স্ফীত আলোকাংশ কাটা কাটা বা বিচ্ছিন্ন হইয়া আলোক ও অন্ধকার পর্য্যায়ক্রমে থাক্‌বন্দী হয়। আরও যতই বায়ু নিষ্কাশিত করা যায়,

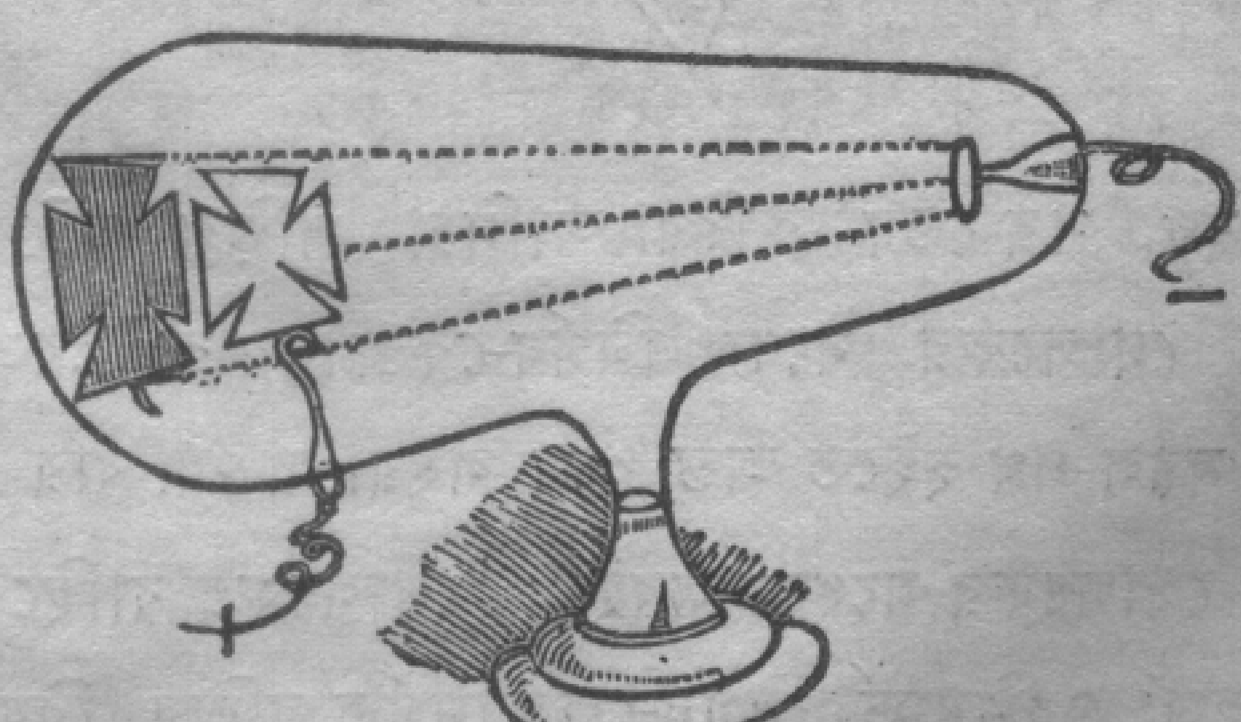


ততই অন্ধকার অংশ প্রবেশকেন্দ্রের দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং থাক্‌বন্দী আলোকাংশ প্রবেশ-কেন্দ্রের নিকটেই থাকে। অবশেষে প্রবেশ-কেন্দ্রের আলোক একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং নির্গম-কেন্দ্রোত্থিত প্রায়-অদৃশ্য অতি ক্ষীণ রশ্মি প্রবেশ-কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাচনল বা গোলকের যে অংশে বা দিকে প্রবেশ-কেন্দ্র স্থাপিত করা যায়, এই রশ্মিও সেই দিকে সেই পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। নলকে

আরও বায়ুশূন্য করিলে এই রশ্মি প্রবেশ-কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নির্গম-কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া সোজা ধাবিত হয় ও সম্মুখবর্ত্তী কাচ-প্রাচীরে পড়িয়া তাহাকে অতিশয় উজ্জ্বল করিয়া তুলে, এবং কাচের প্রকৃতি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিকাশ করে। নির্গম-কেন্দ্র হইতে যে অদৃশ্য-রশ্মি বাহির হয়, তাহাতে জ্যোতিষ্মান পদার্থ সকল দীপ্তিমান হইয়া উঠে। গোলকের মধ্যে নির্গম-কেন্দ্রের সম্মুখে হীরক ও অন্যান্য মণি, খড়ি, পোড়া

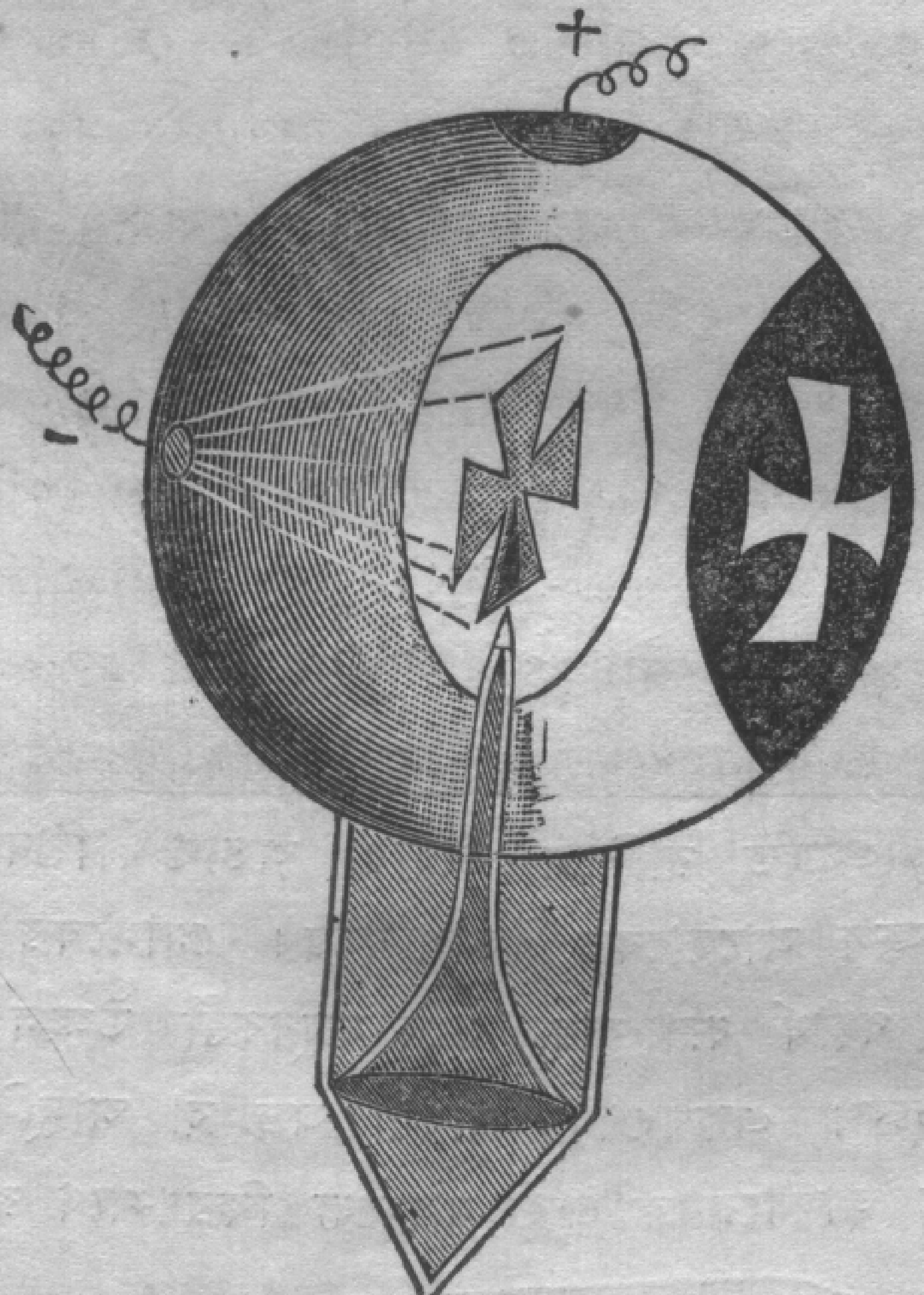


ঝিনুক বা শামুক প্রভৃতি রাখিলে তাহারা অত্যন্ত দীপ্তিমান হইয়া উঠে ও নানা বর্ণের উজ্জ্বল আলোকের বিকাশ করে। গোলকের ভিতর কিরণ-পথে যদি কোন পদার্থ ধরা যায়, তবে সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল কাচপ্রাচীরে তাহার ছায়া পড়িবে। একখণ্ড খুব পাৎলা অভ্র বা আলুমিনিয়ম পাত, ক্রস্ বা ত্রিশূলের আকারে কাটিয়া, নলমধ্যে কিরণ-পথে রাখিলে, উজ্জ্বল



কাচদেহে ক্রস বা ত্রিশূলের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়িবে। এই নির্গম-কেন্দ্রোত্থিত রশ্মির নিকট (kath ode rays) অধ্যাপক হর্জ দেখিয়াছিলেন, অভ্র অপেক্ষা

আলুমিনিয়ম ধাতুর খুব পাৎলা পাত অধিকতর স্বচ্ছ। একখণ্ড পাৎলা অভ্রের চাকৃতির মধ্য হইতে "ক্রস্" আকারে খানিকটা কাটিয়া বাহির করিয়া সেই স্থানে ঠিক এই আকারের একটা খুব পাৎলা আলুমিনিয়ম পাত বসাইয়া দিয়া সমস্তটা নলমধ্যে নির্গমকেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া তাড়িত পরিচালন করিলে সম্মুখবর্ত্তী কাচদেহে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার মধ্যে উজ্জ্বল 'ক্রস' আকার দৃষ্ট হইবে। নির্গম-কেন্দ্রীয় রশ্মি অভ্রপত্র ভেদ করিয়া যাইতে পারিল না বলিয়া, সম্মুখস্থ কাচদেহের যে অংশ অভ্রপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রহিল, সেই অংশ জ্যোতিষ্মান হইতে পারিল না, কিন্তু তন্মধ্যবর্ত্তী ক্রসাকার অংশে সে



রশ্মি আলুমিনিয়ম পত্র ভেদ করিয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল। গোলকের মধ্যে নির্গম-কেন্দ্রীয় রশ্মিকে চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সরল পথ হইতে অন্য পথে লইয়া যাওয়া যায়।

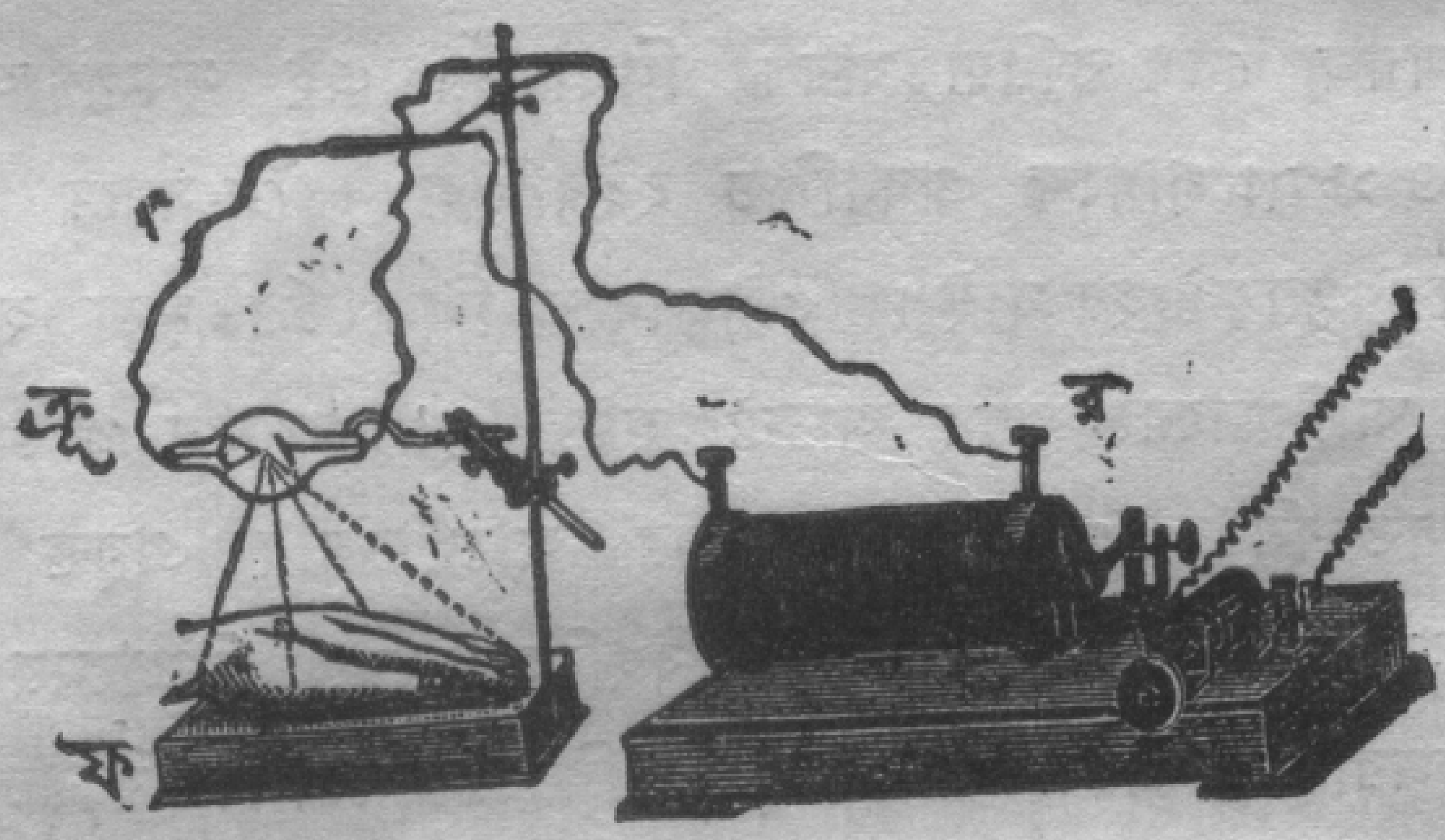
এই ত গেল গোলকের মধ্যের অবস্থা। গোলকের বাহিরেও ঐ অবস্থা। ক্রুকস, হিটর্ফ, হর্জ ও লিনার্ড, নির্গম-কেন্দ্রনির্গত রশ্মির বিষয় অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃঃ অধ্যাপক লিনার্ড নির্গম-কেন্দ্রের সম্মুখে কাচাংশের পরিবর্ত্তে একখণ্ড ১/১০০০ ইঞ্চ পুরু আলুমিনিয়ম পত্র বসাইয়া

এক ক্রুক্‌স নল নির্ম্মাণ করেন। তিনি দেখিলেন, যে নির্গম-কেন্দ্র রশ্মি কাচ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে নাই, তাহা আলুমিনিয়ম পত্র ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। একখণ্ড কাগজে "পেণ্টাডিসিল-পারাটোলিল-কির্টোন" নামক রাসায়নিক পদার্থ মাখাইয়া নলের বাহিরে রশ্মিপথে ধরিবামাত্র তাহা জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। এই বাহিরে নির্গত রশ্মি চুম্বক দ্বারা মার্গভ্রষ্ট করা যায়। এই রশ্মির দ্বারা ফটোগ্রাফের কাচফলক বিকৃত হইয়া যায়। এই রশ্মি কাঠের তক্তা ও পুরু কাল কাগজ ভেদ করিয়া যায়। লিনার্ডের এই সকল আবিষ্কারের ফল ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে সাধারণের দৃষ্টি সে বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। এই সময়ে লিনার্ডের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইঁহার এই আবিষ্কারের ফলে আকৃষ্ট হইয়া দু' এক জন পণ্ডিত ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য-নির্ণয় ও নূতন তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাভেরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত উর্জবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক উইল্গিয়াম কনরাড রোএণ্টেন ১৮৯৬ খৃঃ ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার ক্রুকস নলটি কাল কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অথচ নিকটস্থ বেঞ্চের উপর জ্যোতিষ্মান পদার্থ-মাখান কাগজখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ক্রুকসনলমধ্যে তাড়িত প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন, কাগজখানি নিভিয়া গেল। আবার তাড়িত সঞ্চালন করিলেন, আবার কাগজখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এইবার এক নূতন আবিষ্কার হইল। লিনার্ডের নির্গম-কেন্দ্রীয় রশ্মি কাচনলের বাহিরে আসিতে পারে না। আলুমিনিয়মের সূক্ষ্মপাতযুক্ত নল হইলে তবে সেই পাত ভেদ করিয়া বাহিরে আইসে। রঙ্গটেনের "ক্রুকস নল" ত সেরূপ নয়। এ ত সমস্তই কাচনির্ম্মিত। আরও পরীক্ষা করিলেন। এ রশ্মি ত চুম্বক দ্বারা বিপথে সরান যায় না। অন্যান্য অদৃশ্য রশ্মির ন্যায় ইহাকে দর্পণ দ্বারা পরাবর্ত্তিত করা যায় না, পুটাকার দর্পণ বা আতুসি কাচ দ্বারা কেন্দ্রীভূত করা যায় না। লিনার্ড রশ্মির তেজ নলের বাহিরে অতি অল্পদূরব্যাপী। রঙ্গটেনের অদৃশ্য রশ্মির তেজ অধিকদূরব্যাপী। রঙ্গটেন ইহার নাম দিলেন Xrays বা অজ্ঞাত রশ্মি।

এই অদৃশ্যালোকে ফটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠান যায়। কাঠের

কাচফলকে ছবি উঠাইতে পারে। এই আলোক শরীরের মাংস ভেদ করিয়া যায়, হাড় ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অধিকাংশ ধাতুদ্রব্যই ভেদ করিতে পারে না, বিশেষতঃ পুরু হইলে।

যাহার ভিতর দিয়া একেবারে আলো যায় না, তাহার ছায়া গভীর হয়; যাহার ভিতর দিয়া অল্পপরিমাণে যায়, তাহার ছায়া অপেক্ষাকৃত কম গভীর হয়; যাহার ভিতর দিয়া বেশ চলিয়া যাইতে পারে, তাহার ছায়া পড়ে না। এইরূপ নানা বস্তুর ভিতর দিয়া নানা পরিমাণে যাইতে পারে বলিয়া, এই



অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে ফটোগ্রাফের জন্য তৈয়ারি কাচের উপর বাক্স বা থলিয়ার বা শরীরের মধ্যস্থিত পদার্থের ছায়ার ছবি উঠান যাইতে পারে, ও স্থায়িভাবে তাহার একটা record রাখা যাইতে পারে।

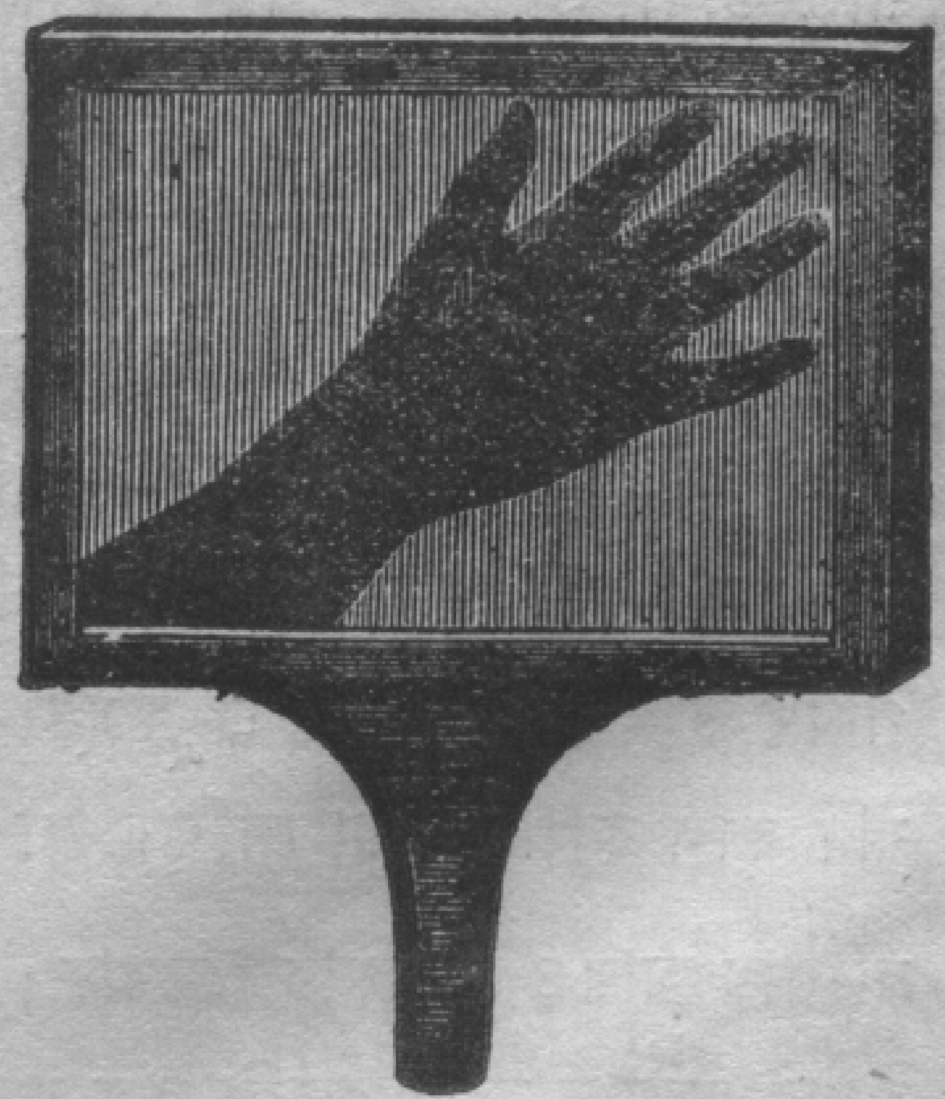
পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহাদের উপর বেগুনির পর অদৃশ্য রশ্মি পড়িলে তাহারা দীপ্তিমান হইয়া উঠে। ঐ সকল পদার্থের প্রকৃতিভেদে তাহাদের দীপ্তিমত্তা বা আলোক-বিকীরণ-ক্ষমতা অল্পাধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। কোনও কোনওটা যতক্ষণ সেই রশ্মি তাহাদের উপর পড়িতে থাকে, ততক্ষণই দীপ্তিমান হয়, রশ্মিপাত বন্ধ করিলেই দীপ্তিমত্তা চলিয়া যায়। কোনও কোনওটাকে উত্তেজক রশ্মির প্রভাব হইতে সরাইয়া লইলেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আলোক বিকীরণ করিতে থাকে। আবার কোনও কোনওটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলোক বিকীরণ করে।

এই পদার্থগুলির এরূপ ক্ষমতা আছে যে, যে সকল তরঙ্গকম্পন মানব-চক্ষুর গ্রাহ্য হয় না, সেই সকল তরঙ্গাভিঘাতে ইহাদের অণু সকল তদপেক্ষা এইরূপ ধীরতর বা দ্রুততর কম্পিত হইতে থাকে যে, মানবচক্ষুর গ্রাহ্য হয়। অনেক সময়ে এই জাতীয় অনেক পদার্থের অণুর কম্পনও বহুকালস্থায়ী হয়।

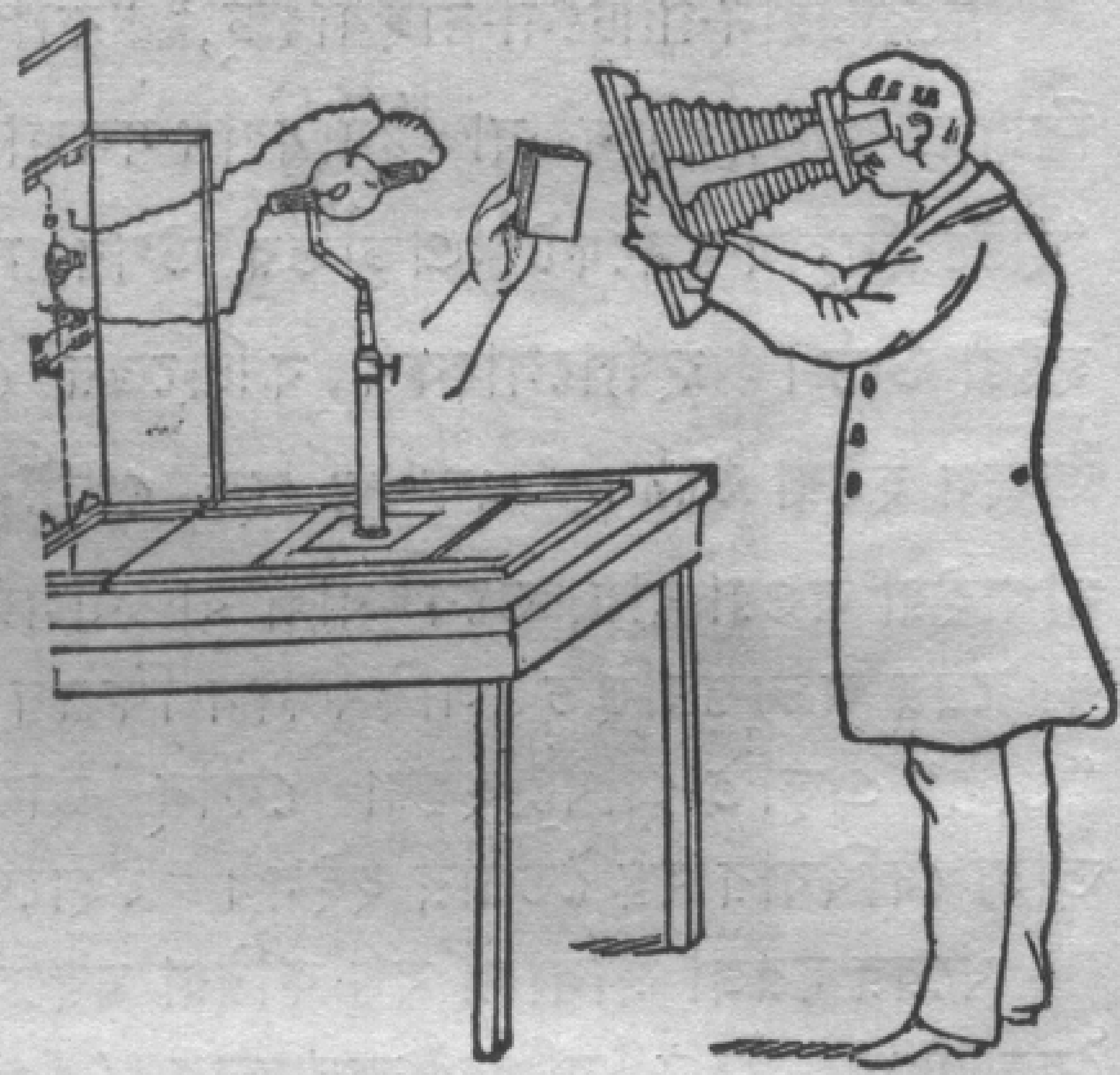
সলফাইড অব ক্যালসিয়াম (বা ঝিনুকের খোলা গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কোন পাত্রে পুরিয়া মুখবন্ধ করিয়া আগুনে লাল করিয়া পুড়াইয়া লইলেই হইল) বা "বাল্মেনস্ লুমিনাস্ পেণ্ট" কোন পদার্থে মাখাইয়া রৌদ্রে ধরিলে জ্যোতিষ্মান হয় ও রাত্রিতে বা অন্ধকার ঘরে উজ্জ্বল দেখায়। ইহার দীপ্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

"বেরিয়াম-প্লাটিনো-সাইনাইড্," "ক্যালসিয়াম প্লাটিনো সাইনাইড্," "পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম বা ষ্ট্রনসিয়াম সলফাইড্," "ইউরেনিয়াম ফ্লুবাইড্" ও "ইউরেনিয়াম-সলফেট" প্রভৃতির উপর সামান্য আলো পড়িলেই দীপ্তিমান হইয়া উঠে। সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্রের বেগুনের পর অন্ধকার কিরণে খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। একখণ্ড পুরু পোষ্টকার্ডে যদি পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থ মাখাইয়া লওয়া যায়, তবে বাক্স বা থলিয়ার ভিতর কি আছে না আছে, শরীরের অভ্যন্তরস্থিত অস্থিকঙ্কাল কিরূপ ভাবে আছে, বা শরীরে বন্দুকের "গুলি" প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া কোন্ স্থানে কি অবস্থায় আটকাইয়া আছে, তাহা দেখিবার যন্ত্র তৈয়ার হইল। ইহাকে দীপনক যবনিকা বলা যায়।

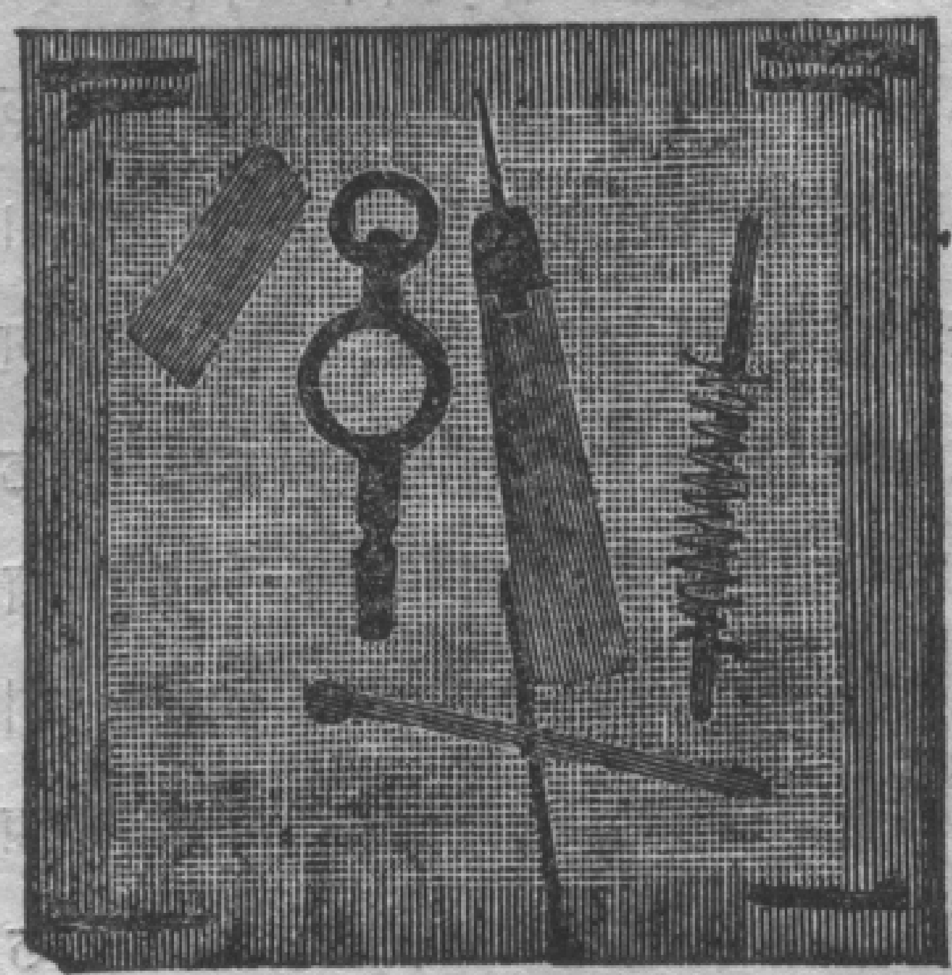
ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরকে অন্ধকার কর। এখন রুজকর্ফ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত ক্রুকসনল (foinstube) সংযুক্ত করিয়া তাড়িত সঞ্চালিত কর। ক্রূকসনলের নির্গমকেন্দ্র হইতে রশ্মি বাহির হইয়া সম্মুখস্থ কাচপ্রাচীরে লাগিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিবে ও সেই সঙ্গে রঙ্গটেন-আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মি বাহির হইবে। নলের সম্মুখে কিছু দূরে দীপনক যবনিকাখানি রাখিয়া দুইএর মধ্যে তোমার হাতখানি ধর। হাতের মাংসপেশী প্রায় স্বচ্ছ, হাড় অস্বচ্ছ, সুতরাং মাংসের অর্দ্ধকৃষ্ণ ছায়ার মধ্যে হাড়ের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়িবে। সমস্ত হাড়গুলির বাহ্যিক আকৃতি বেশ বুঝা যাইবে। বাঁকা বা ভাঙ্গা হাড় থাকিলে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মাংসপেশীর মধ্যে বাহিরের কোন বস্তু প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে ছায়াপাতে তাহাও বুঝা যাইবে। হাতের পরিবর্ত্তে যদি তোমার purse বা "মনি-ব্যাগটি" ধর, তবে যবনিকার উপর যে ছায়া পড়িবে, তাহাতে ব্যাগে কি আছে, বেশ বুঝিতে পারিবে।



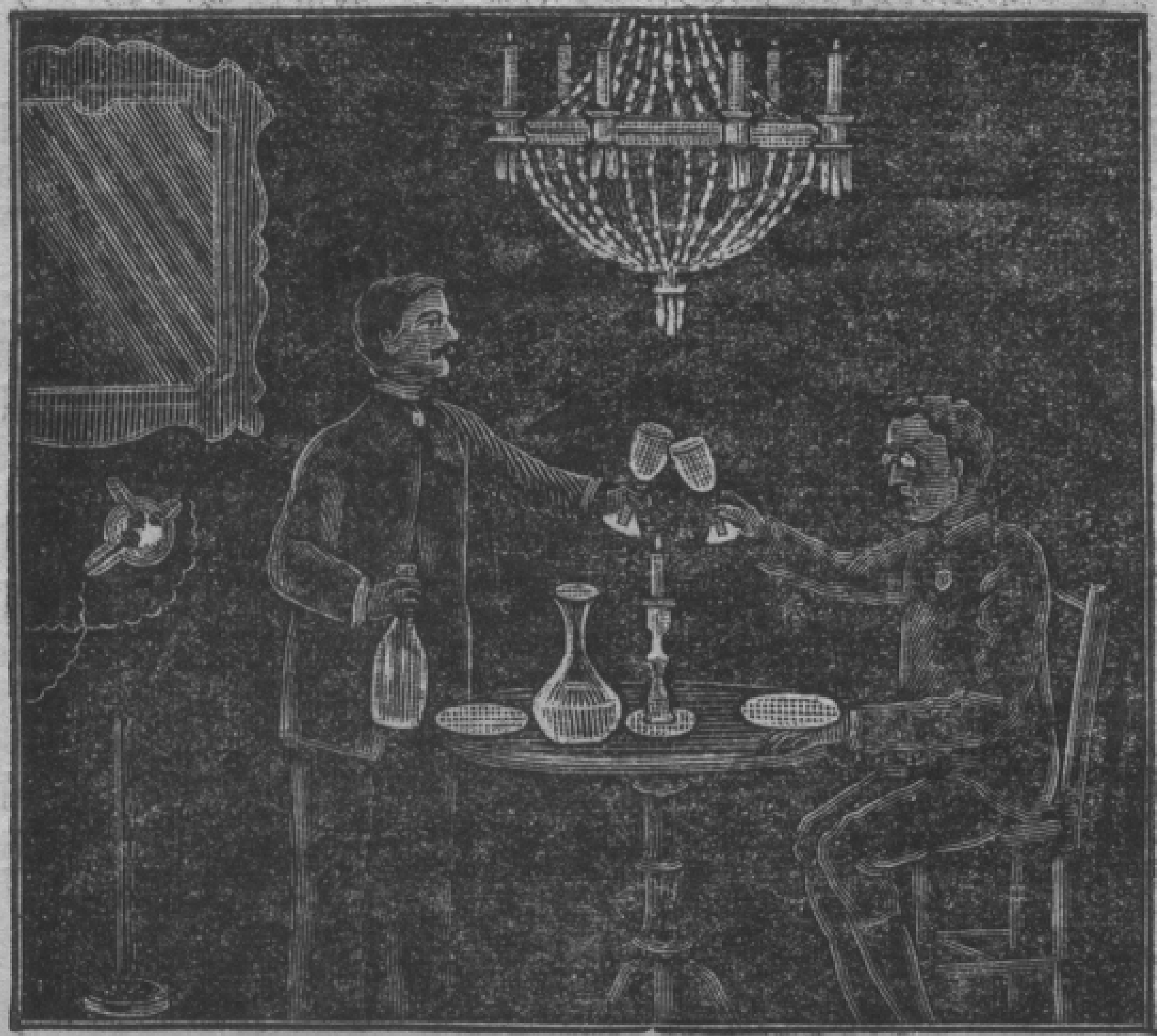
খোলা ঘরের ভিতর এত আলো থাকে যে, তাহাতে যবনিকা উজ্জ্বল হইল কি না, কিছুই বুঝা যায় না। এইরূপ যবনিকা অন্ধকার ঘরেই ব্যবহার করা চলে। একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই দিবালোকের মধ্যে দেখিবার উপযোগী হয়। কাল কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স করিয়া তাহার এক ধারের প্রাচীর কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে দীপনক যবনিকা বসাইয়া দাও, অথবা সেই প্রাচীরের ভিতরের দিকে কোন জ্যোতিষ্মান পদার্থ মাখাইয়া লও। এবং তাহারই সম্মুখস্থ প্রাচীরে একটা ছিদ্র করিয়া লও। বাক্সর ভিতরটা সর্ব্বদাই অন্ধকার থাকিবে, সুতরাং ছিদ্রপথে চক্ষু দিয়া বাক্সটাকে ক্রুকস নলের দিকে নির্দ্দেশ করিলে ভিতরের সম্মুখস্থ যবনিকা উজ্জ্বল হইল কি না দেখা যাইবে, এবং তাহাতে কোনও ছায়া পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।



রঙ্গটেন অদৃশ্যকিরণের নিকট কাচ ভারি অস্বচ্ছ, হীরক স্বচ্ছ। অন্যান্য মণিও স্বচ্ছ। এই কিরণ দ্বারা আসল বা নকল, সাচ্চা বা ঝুঠা জহরৎ অনায়াসে ধরা পড়ে। কাঠ, চামড়া, আলুমিনিয়ম ধাতু, মাংস, এবোনাইট, কাগজ, ইষ্টক প্রভৃতি সাধারণ অস্বচ্ছ পদার্থ এই অদৃশ্যকিরণের নিকট স্বচ্ছ। সীস, রাং, তামা, প্রভৃতি অনেক ধাতু অস্বচ্ছ, রঙ্গটেন অদৃশ্য-কিরণের প্রভাবে কাচ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। খুব অন্ধকার ঘরে ক্রুকস্ নলে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া রঙ্গটেন রশ্মি বাহির করিলে, নিকটস্থ যাবতীয় কাচ নির্ম্মিত পদার্থ উজ্জ্বল দেখায়। ক্রুকস্ নলকে যদি কাল কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও ত ব্যাপার আরও চমৎকার দেখায়। কোথায়ও কিছু নাই, হঠাৎ গেলাস ঝাড় লণ্ঠন, চষমার কাচ প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ কর,



আবার সব অন্ধকার। আবার তাড়িত সঞ্চালিত কর, আবার সব কাচদ্রব্য দীপ্তিমান হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন প্রকারের কাচ বিভিন্ন বর্ণে উজ্জ্বল দেখাইবে।



অধুনা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে,তাড়িতপ্রবাহের স্পন্দনের দ্রুততার তারতম্যে ও তাড়িতের বলের তারতম্যে, ক্রূকস-নলোদ্গত অদৃশ্য রশ্মির পদার্থভেদিনী প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ১৫০, ০০০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপে সঞ্চালিত তাড়িতপ্রবাহে উৎপন্ন অদৃশ্যরশ্মিতে যে দ্রব্য অস্বচ্ছ ছিল, ৩০০, ০০০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপ সঞ্চালিত প্রবাহের উৎপন্ন অদৃশ্যরশ্মির নিকট তাহা স্বচ্ছ হইয়া যায়। সুইন্টন ও পোর্টার সাহেব দেখিয়াছেন যে, ঘনীভূত ও কঠিনীকৃত কার্বণিক এসিড ঈথরের দ্বারা অতিশয় শীতলীকৃত ক্রুকস নল হইতে এরূপ অদৃশ্যরশ্মি বাহির করা যায় যে, তাহাতে মাংস অস্বচ্ছ ও হাড় স্বচ্ছ দেখায়। পোর্টার সাহেব এমন যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, ইষ্টকপ্রাচীরের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান মানুষের শরীরমধ্যস্থ কঙ্কালের ছবি অপর পার্শ্বে রক্ষিত দীপনক যবনিকার উপর স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখা যাইবে। রঙ্গটেন-আবিষ্কৃত অদৃশ্যকিরণ নানা প্রকারের বলিয়া x 1 rays, x 2 rays, x 3 rays, ইত্যাদি নাম রাখা হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বৌদ্ধ যুগ।

গ্রীকগণের ভারত আক্রমণের সময় পঞ্চনদ প্রদেশ যখন আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত, তখন মধ্যভারতবর্ষ কোনও প্রকার বিপ্লবে উপদ্রুত হয় নাই। বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের প্রভাবে বিষম বিপন্ন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থ মগধ সে সময়ে বদ্ধপরিকর। পঞ্চনদ বিদেশীয় আক্রমণ হইতে ভারতের রক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াছে। মধ্যভারত এ সময়ে কোনও প্রকার বিপ্লবে উপদ্রুত না হওয়ায় তথায় সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতির যথেষ্ট আলোচনা হইতেছিল। এই আলোচনার ফলে এককালে মধ্যভারত জ্ঞানজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আমরা যে সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া এত গৌরব করি, তাহার অধিকাংশ রত্নই এই সময় মধ্যভারত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় মধ্যভারতের যত দূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে কোনও রাজা তাঁহার ন্যায় বিদ্যার সমাদর করিতে পারেন নাই, বিদ্বানের সম্মান করিতে পারেন নাই। বিক্রমাদিত্যের সময় মধ্যভারত সকল বিষয়েই সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি কোন্ সময়ের লোক? খৃষ্টের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল? এই সকল বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী মহা তর্ক বিতর্ক করেন, কিন্তু আমাদের সে তর্কে প্রবেশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক গ্রন্থাবলী হইতে দেখিব যে, সে সময়ে সমাজ কিরূপ। তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। *

বিক্রমাদিত্যের সময়ে যে আর্য্যসমাজে বিদ্যার বড় গৌরব ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি বিদ্যায় পারদর্শী নয় জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে অতি সম্মানসূচক "নবরত্ন" আখ্যায় অলঙ্কৃত করিয়া

---

* যদি বিক্রমাদিত্যের কাল নিরূপিত হয়, তবেই তদানীন্তন সমাজের কাল নির্ণীত হইতে পারে। অতএব, কালনির্ণয় অনাবশ্যক নহে, বরং অনতিক্রমণীয় মনে হয়।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সমাদরে নিজ সভায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জগৎবিখ্যাত মহাকবি কালিদাস এই রত্ননিচয়ের অন্যতম।

কালিদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলেও তিনি তখনকার কোনও ঘটনার বর্ণনা করেন নাই। † তাঁহার সমস্ত বর্ণনাই প্রায় অতীত কালের, এবং তাঁহার নায়কনায়িকারা দেবভাবাপন্ন। তাঁহার নায়কগণ স্বর্গাধিপতির সাহায্যের জন্য রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়েন। মাতলির সহিত ত্রিদিবে অসুর-নাশ করিতে উপস্থিত হয়েন; তাঁহার নায়িকারা, কেহ বা অপ্সরঃ কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বলোকে নীতা হয়েন, কেহ বা যক্ষদেশে মণিময় কমলের মালা গাঁথেন; সুতরাং তাঁহার বর্ণনা হইতে তাঁহার সমসাময়িক বিবরণ অতিরঞ্জিতভাবে পাওয়া যায়। অতএব কালিদাসের বর্ণনাকে তাঁহার সমসাময়িক বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের স্বভাব এই যে, কোনও অতি প্রাচীন কালের কথা বলিতে হইলে, প্রায় সকল বিষয়ে কিছু না কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলি। তাহার উপর আবার যদি কিছু কবিত্ব থাকে ত কথাই নাই। একে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, তাহার উপর দেবভাবাপন্ন নায়ক নায়িকার বর্ণনা। সুতরাং তাঁহার সাধারণ বর্ণনাকে আমরা স্বপ্ন-রাজ্যের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া ত্যাগ করিতে পারি। তবে তাঁহার মালাবিকাগ্নিমিত্র অথবা ঐ প্রকার দুই চারিখানি গ্রন্থ, যাহার নায়ক নায়িকা কোনও দেবতা নহেন, কতকটা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত আছি।

মেঘদূতের প্রধান উদ্দেশ্যই স্বভাববর্ণনা। যখন বিরহী যক্ষ হিমালয়ের দক্ষিণের দেশসমূহের বর্ণনা করেন, তখন আমরা মাঝে মাঝে দেশের তদানীন্তন অবস্থা দেখিতে পাই; কিন্তু অশরীরী মেঘবরও হিমালয়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন, আর শরীরী আমরাও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হই। মেঘদূতে যক্ষের অবস্থানদেশ চিত্রকূট হইতে হিমালয়ে যাইবার বর্ণনা পাঠ করিলে সকল প্রদেশকেই মহাসমৃদ্ধি-শালী ধার্ম্মিক নৃপতি দ্বারা শাসিত দেখিতে পাই। উজ্জয়িনীর যে প্রকার বর্ণনা, তাহা আর স্বতন্ত্র না বলিয়া বর্ত্তমান কলিকাতার বর্ণনা করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর অতি উচ্চ হর্ম্ম্যনিচয়, স্বচ্ছসলিলা-পরিপূর্ণ সরোবর, পার্শ্বে ফলভারাবনতবৃক্ষরাজি, রঞ্জিতবস্ত্রপরিহিত নাগরিকের

† লেখকের এই সিদ্ধান্তের অনুকূল কোনও প্রমাণ নাই।—সাহিত্য-সম্পাদক।

হাস্যকোলাহলে নগরী প্রতিধ্বনিত, ইত্যাদি বর্ণনা দেখিয়া প্রাচীন উজ্জয়িনীকে বর্ত্তমান রাজধানী অপেক্ষাও শোভাময়ী বিলাসপুরী বলিয়া অনুমান হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের রচনা; সুতরাং এই ক্ষুদ্র নাটিকার বর্ণিত বিষয়ে তাঁহার সমকালীন ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, এই গ্রন্থ ও রত্নাবলী অনেক অংশেই একই ভাবে লিখিত। হইতে পারে। কিন্তু আমরা মালবিকা অপেক্ষা রত্নাবলীতে ছায়া অনেক অধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাই। আবার রত্নাবলী অপেক্ষা মৃচ্ছকটিকে আমরা এই ছায়া আরও স্পষ্টতর দেখিতে পাই। সুতরাং এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বল করিয়া আমরা তৎকালীন সমাজচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমোক্ত দুইখানি গ্রন্থের মূল ঘটনা কি, তাহা দেখা যাউক।

"যে প্রণয়ব্যাপার রত্নাবলী নাটিকার মূল ঘটনা, মালবিকাগ্নিমিত্রেও তাহাই। মহিষীর বৃথা সতর্কতা, নায়ক নায়িকার অবস্থা, গোপন মিলন ও তাহার ফলাফল, রাজার ভাব ভঙ্গি, বিদূষকের কার্য্যাকার্য্য, শেষ অঙ্কে দুই চারিটা যুদ্ধজয়ের সংবাদ, রাজকর্ম্মচারীর সমাগম ও বাঞ্ছিত মিলনে উপসংহার, উভয় গ্রন্থেই এক। তবে দুই একটি চরিত্র হয় ত এ গ্রন্থে আছে ও গ্রন্থে নাই, বা বিভিন্ন কবির হস্তে ঘটনার ঈষৎ পরিবর্ত্তনে একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পের পরিবর্ত্তনও এইরূপ। রত্নাবলীর পিতা বৎসরাজের সহিত বিবাহের জন্য কন্যাকে কৌশাম্বী নগরীতে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে যান ভগ্ন হইয়া রত্নাবলীকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়। পরিশেষে কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার পরিচারিকার পদ লাভ করেন। মালবিকার ভ্রাতা মাধব সেন ভগ্নীকে অগ্নিমিত্রের করে সমর্পণ করিবার জন্য বিদিশায় আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে পিতৃব্যপুত্র যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েন; সচিব সুমতি গোপনে মালবিকাকে অবরোধ হইতে মোচন করিয়া স্বীয় ভগিনী কৌশিকী সমভিব্যাহারে এক স্বার্থবাহের সহিত বিদিশাভিমুখে চলিলেন; অরণ্যেপথে রাত্রি হইল। সুমতি দস্যুহস্তে নিহত হইলেন। ধনরত্ন আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া, দস্যুগণ মালবিকাকে তৎপ্রদেশের দুর্গপাল বীর সেনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইল। মূর্চ্ছাপন্না কৌশিকীকে মৃতা মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল। বীরসেন শিল্পনিপুণা দেখিয়া

মালবিকাকে ভগিনী বিদিশা-রাজমহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মালবিকা ধারিণীর পরিচারিকা হইয়া থাকেন।”

তার পর গল্প প্রায় একই ভাবে চলিয়াছে। কোনও প্রকারে রাজা মালবিকাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে পাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। বিদূষক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া শেষে মিলন করিয়া দিলেন। পরিশেষে রাজ্ঞী যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় স্বপত্নী করিয়া লইলেন। রত্নাবলীতেও ঠিক এই কথা; তবে অপর প্রকারে রাজা রত্নাবলীকে দেখিতে পান ও অন্যবিধ উপায়ে তাঁহাদের পরস্পর মিলন হইল। রত্নাবলীরও শেষে সেই পরিচয়লাভ ও রাজ্ঞী স্ব-ইচ্ছায় তাঁহাকে স্বামিকরে অর্পণ করিলেন।

এই দুইখানি পুস্তকেই আমরা কেবল রাজপ্রাসাদের চিত্র দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাকে সাধারণ সমাজের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে রাজপ্রাসাদের প্রভাব যে রাজধানী ও সমাজমধ্যে কিছু প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদিগের কঠোর বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অভিনব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। প্রায় সকল নাটক ইত্যাদি আদিরসপ্রধান। তখন রাজারা একেবারে বিলাসস্রোতে শরীর ভাসাইয়াছেন। কোন যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা নাই। * বিশেষতঃ, রত্নাবলী যে সময়ে রচিত হয়, তখন বিলাসস্রোত ভারতবর্ষের রাজকুলে এমন কূলে কূলে বহিতেছে, এমন প্রবল বেগে চলিয়াছে, যে চরিত্রের দৃঢ়তা তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছে। আজ এ উৎসব, কাল সে উৎসব, প্রতিদিন নূতন নূতন বলহারী বিলাসের সহস্র উপায়-উদ্ভাবন। প্রাচীন ভারতের অযোধ্যা ও হস্তিনাপুরের রাজসভায় খুব জাঁক জমক আছে বটে, কিন্তু এমন বিলাস নাই। প্রমাণে কি দাঁড়ায়, জানি না, কিন্তু কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীর রাজসভায় যে বিলাসের কথা শুনা যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বলের চর্চ্চাও যথেষ্ট ছিল। পৌরুষেরও আদর ছিল। রত্নাবলী যে সময়ের গ্রন্থ, তখন মদন-উৎসব বই আর উৎসব নাই। নৃত্য গীত বই অন্য কোন আমোদের বড় প্রাধান্য নাই। কর্ম্মনিষ্ঠার স্থলে এখন অলস বিলাসিতারই একাধিপত্য। এই

---

* রত্নাবলী ও মালবিকায় প্রসঙ্গক্রমে যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ আছে। নাটিকায় যুদ্ধের অবতারণা অলঙ্কারশাস্ত্রসঙ্গত নহে। নাটিকায় যুদ্ধপ্রসঙ্গের অভাব দেখিয়া সেকালের সমাজে “যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল না” এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয়।

শ্রীহর্ষের সভা তাহার এক প্রধান আদর্শ। বিলাসিতার জন্য দেবমন্দিরের বহুমূল্য সামগ্রীর প্রতি হস্তপ্রসারণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই; শুনা যায়, এই কারণে নাকি প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং সেই বিদ্রোহেই তাঁহার ইহলীলা সমাপ্ত হয়।"

কিন্তু কেবলমাত্র কবিবিশেষের রচনা হইতে কিংবা ইংরাজী প্রবন্ধ-লেখকের উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলা চলে না। কালিদাসের সময়ে রত্নাবলীর সময়ে কিরূপ প্রভেদ, আমরা তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না।

"তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমাদের প্রাচীন অবস্থার যে একটা গুরুতর প্রভেদ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। কারণনির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে বলেন,অন্যান্য দেশের সভ্য বিলাসী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়াই প্রাচীন সমাজে কঠোর গাম্ভীর্য্যের স্থলে লঘু শৈথিল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নহিলে পৃথিবীর বিলাসে আমাদের মতি কবে? ইহা যে না হইতে পারে,অবশ্য এমন নহে; বাস্তবিকই বিলাস আমাদের তেমন স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাই বলিয়া পার্থিব বিষয়ে আমাদের একেবারে অনাসক্তি স্বীকার করা যায় না। দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত অবসর পাইলে, ব্যক্তিই কি আর জাতিই কি, ক্রমে লঘুপ্রকৃতি অলস এবং বিলাসী হইয়া উঠে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমাদের বৈরাগ্য অনেক সময় এই নিশ্চেষ্ট আলস্যেরই রূপান্তর। * * *

"এমনও হইতে পারে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের দারুণ কঠোরতার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে বিলাস এক সময়ে সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহুদিন বৈরাগ্যের প্রভাবে আমাদের অন্তরের অনেকগুলি বৃত্তি কেবলমাত্র চাপা থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণবেগে সহস্র বিলাস প্রমোদে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন হইয়াই থাকে; পিউরিটান্ রাজত্বকালে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ এক প্রকার বলপূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছিল; ফলে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বে বিলাস উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল; দুরাচার ভদ্রতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে সম্ভ্রান্ত পদবীতে উত্তীর্ণ করিল। গৃহে পরিবারে অন্তরে বাহিরে দুর্নীতি এত দূর প্রশ্রয় পাইল যে,কুল রহিল না, শীল রহিল না, প্রেম বিনষ্ট হইল, পরিবার ভাঙ্গিতে লাগিল; এবং অবশেষে একদিন লণ্ডনের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে অভিশাপ এবং হাহাকার উঠিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্তসাধন করিল।"

"রত্নাবলী যখন রচিত হইয়াছিল, সভ্যতা তখন কূলে কূলে। কলা-বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল; স্ত্রীকন্যাদিগকে এ বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইল। রত্নাবলীতে দেখা যায়—স্ত্রীলোকেরা চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী; রত্নাবলী মদনরূপে বৎসরাজের একখানি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছিলেন, এবং প্রিয় সখী সুসঙ্গতা তাহারই পার্শ্বে রতিরূপে রত্নাবলীর চিত্র আঁকিয়া দেন। তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান ইউরোপের অনেকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। তবে ভারতবর্ষের জনসাধারণমধ্যে এ সকল বিদ্যার কত দূর অনুশীলন হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। রাজকুলের সহিত সাধারণের অনেকটা প্রভেদ, তবে প্রভাবও কিছু না কিছু লক্ষিত হইয়া থাকে।"

"রত্নাবলী নাটকে যে সকল স্ত্রীচরিত্র দেখা যায়, সকলগুলিই বেশ সুচতুর এবং কলাবতী বলিয়া বোধ হয়।"

এই অবকাশে তৎকালপ্রচলিত মদন-উৎসবের পরিচয় দিলেও সামাজিক অবস্থা বোধ হয় কতকটা বুঝা যাইবে।

"কৌশাম্বী রাজধানীতে আজ মহা আনন্দ; ধারাযন্ত্র হইতে জল পড়িতেছে; প্রাঙ্গণে পথে নরনারী বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর মধুমাসে মধু সখার প্রতাপে দক্ষিণ পবনে বকুলসৌরভে যুবতী জনের বহু যত্নে পোষিত মান শিথিলীকৃত। মহিষী বাসবদত্তা প্রাসাদের প্রমোদ-উদ্যানে * * * রক্তাশোকতরুমূলে কুসুমায়ুধের পূজায় নিযুক্তা * * *। রাজা আসিলেন, আসিয়াই প্রিয়াকে সম্ভাষণ করিলেন, প্রিয়াও যথাযোগ্য সম্ভাষণে রাজাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। কাঞ্চনমালা পূজা উপকরণ লইয়া আসিল। মহিষী কুসুমায়ুধকে পুষ্প চন্দন দান করিলেন * * * এ দিকে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নেপথ্যে বৈতালিক সন্ধ্যার বন্দনা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। উদয়ন মহিষীর রূপের সহিত চন্দ্রকে তুলনা করিয়া চন্দ্রকে ম্লান দেখিলেন।"

"রত্নাবলী নাটকের মদনোৎসব ও কদলীগৃহ এই দুই অঙ্ক সমালোচনা করিয়া দেখিলে সে সময়ের অবস্থা অনেকটা বুঝা যায়। প্রথমতঃ সে কালের রাজচরিত্র। বৎসরাজকে আমরা অন্তঃপুর লইয়াই ব্যস্ত দেখিতেছি। রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিয়া তিনি বেশ নিশ্চিন্তমনে সুখে আছেন। অবশ্য রাজ্য তাঁহার মন হইতে একেবারে দূর হয় নাই, কিন্তু রাজ-কর্ত্তব্য-পালন অপেক্ষা অন্তঃপুরের কর্ত্তব্যপালনে তাঁহার মন টানে। রামচন্দ্রের মত

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সবল পুরুষ চরিত্র ত কই ইদানীন্তন রাজকুলে বড় একটা দেখা যায় না। রত্নাবলীর উদয়নের সহিত তুলনা করিলে দুষ্মন্তকে অনেক উচ্চ আসন দিতে হয়। তাঁহার চরিত্রের এক দিকে এমন তেজবল ক্ষমতার প্রকাশ পাইয়াছে যে, কোমল প্রণয় ব্যাপারে রাজভাব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। রত্নাবলীতে বৎসরাজের ক্ষমতার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। মহিষীর এখানে প্রবল প্রতাপ না হইয়া যায় না। রাজা গোপনে গোপনে আপনার সহিত প্রেমালাপ করেন, কাজেই মহিষীকে একটু বিশেষ ভয় করিয়া চলিতে হয়।”

“রাজচরিত্রের আর এক দিক চতুর্থ অঙ্কে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি এখন প্রণয়ীও নহেন; অসংযতও নহেন; রাজরূপে কৌশাম্বীর সিংহাসনে বসিয়া অমাত্য সেনাপতি প্রভৃতির সহিত রাজকার্য্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন * * * এখানেও কিন্তু আমরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতার কোনও প্রমাণ পাই না। কালিদাস বিবিধ ক্ষুদ্র ঘটনায় দুষ্মন্তের রাজকার্য্যে অসাধারণ পটুতার প্রমাণ দিয়াছেন। শ্রীহর্ষ সেরূপ কিছুই করেন নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন যে, এই ধীরললিত রাজার রাজ্য আছে, অমাত্য আছে, সেনাপতি আছে, এবং এই অমাত্য ও সেনাপতি কার্য্যকুশল ও সক্ষম। মোটের উপর রাজরূপে আমরা রাজার পরিচয় পাই নাই বলিলেও চলে।”

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

সিসিলি।

সিসিলি ইউরোপের অবসর-আশ্রম। মিঃ আলফ্রেড. ই. পি. রেমণ্ড ডাউলিং, একবার সিসিলিতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যদর্শনে এত দূর মোহিত হইয়াছিলেন যে,গত জুলাই মাসের আমেরিকান ক্যাথলিক কোয়ার্টারলি নামক পত্রে ‘ইউরোপের অবসর-আশ্রম সিসিলি’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন, “যাঁহারা কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া সেই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চিন্তায় অবসর সময় অতিবাহিত করিতে চান, তাঁহাদের নিকট সিসিলি অপেক্ষা [illegible]

বিদেশে ভ্রমণ করিতে গেলেই অল্পবিস্তর কষ্ট ও অসুবিধা সকলকেই সহ্য করিতে হয়; কিন্তু ভ্রমণশেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নিভৃত গৃহকোণে উপবিষ্ট হইয়া তাহার স্মৃতিচর্চ্চায় আর কোনও কষ্ট নাই—তখন আর পথশ্রমের অবসন্নতাও থাকে না; পথে ঘাটে ভ্রমণের নানা অসুবিধাও ভোগ করিতে হয় না। সিসিলি ভ্রমণে কোনও প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। বিদেশে যাইতে হইলেই যে সমস্ত কথা ভ্রমণকারীর মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা,—সিসিলি ভ্রমণে তাহার কিছুই নাই,—এখন লৌহবর্ত্মের প্রসাদাৎ দেশের সমস্ত সুন্দর সুন্দর স্থানেই অক্লেশে ও যথেষ্ট সুবিধায় গমনাগমন করা যাইতে পারে। পালার্ম্মো সহরে সর্ব্বপ্রকারের বিলাসোপকরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। সেখানে শীত ও বসন্তকালেও অতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করা যাইতে পারে, অন্যান্য স্থান পালার্ম্মোর ন্যায় না হইলেও, সে সকল স্থানে ভদ্রলোকের আবশ্যক সকল দ্রব্যই মিলে, সুতরাং ভ্রমণকারিগণকে কোনও প্রকার বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় না; তবে নিজের সুব্যবস্থিত গৃহ ত্যাগ করিলে যে সকল সামান্য অভাব বা অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী, তাহার পরিহার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঐতিহাসিক কার্য্যপরম্পরা, পুরাতন শিল্পকৌশলের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যপ্রবণতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিলে,এক ইজিপ্ট ব্যতীত অন্য কোনও স্থানই সিসিলির প্রতিযোগী হইতে পারে না;—কিন্তু আমার মনে হয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইজিপ্টও সিসিলির নিকট অবনতমস্তক।

সিসিলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

সিসিলি দ্বীপ পর্ব্বতবেষ্টিত; পশ্চিম দিকে এরিক্স হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব বেষ্টন করিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা এট্না পর্য্যন্ত আসিয়াছে; আর তাহারই মধ্যে নগর সকল শোভা পাইতেছে। প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত সুদৃঢ় উচ্চ ভিত্তি সকল দেশের দিকে সহস্রনয়নে চাহিয়া আছে; সিসিলি দ্বীপের রক্ষকস্বরূপ এই পর্ব্বতমালা দেখিতেও পরম রমণীয়। কবিদৃষ্টিতে বোধ হয়, যেন পাষাণময় ভূধর এই রমণীয় দ্বীপটিকে পরম যত্নে শীতল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এবং পক্ষিমাতার ন্যায় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া শিশুকে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিতেছে। এখানকার ভূমিও অতিশয় উর্ব্বরা; মাটীর সহিত অধিকপরিমাণে গলিত ধাতুদ্রব্য ও চূণ মিশ্রিত থাকায় জমির উর্ব্বরতাশক্তি এত সতেজ, আর তাহারই ফলে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রত্যেক স্থান শ্যামল পত্রপল্লবে সুসজ্জিত, মাঠ সকল শস্যরাজিপরিপূর্ণ; আর সমস্ত দ্বীপটি একটি সুরম্য উপবনের অতুল শোভায় উদ্ভাসিত। আর সেই এটনা—ইহার নাম যেমন ভীতিউত্তেজক, ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্য আবার তেমনি প্রীতিকর ও মনোমোহন।

সকলের উপরে, সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোক পর্ব্বত ও উপত্যকার উপর বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে হাস্য ও সঙ্গীততরঙ্গের সৃষ্টি করে। সে কি সৌন্দর্য্য! প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যভূমি কখনও নীলাভ শোভা ধারণ করে, কখনও বা দিবাকরের কনককিরণে পরিপ্লাবিত হইয়া যায়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইহা কখন কোন্ বর্ণ ধারণ করিতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। প্রস্ফুটিত কুসুমগন্ধে সমীরণ সুরভিত, সুলোহিত দাড়িম্ব-

ধূসরবর্ণ অলিভের ক্ষেত্র, সুদৃশ্য দ্রাক্ষালতাবিতানে সুপক্ব দ্রাক্ষার শোভনীয় শোভা, যাক্কা ও পেয়ারের কণ্টকময় বেড়া, চক্ষু জুড়াইয়া যায়, নানাজাতীয় শৈবাল, কত বিচিত্র ফুল, কত গুল্ম ভগ্নপ্রায় গিরিশৃঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সংক্ষেপতঃ, জননী প্রকৃতি এই সূর্য্যকরোজ্জ্বল,নীলাম্বুকল্লোলমুখরিত সৌন্দর্য্যময় দ্বীপটিকে নয়নতৃপ্তিকর স্বর্গীয় ভূষায় বিভূষিত করিয়াছেন।

সিসিলির উপকূলরেখা।

সিসিলির সমুদ্রোপকূলস্থ উচ্চ, অসমান পর্ব্বতশ্রেণীও অতি সুদৃশ্য। পালের্ম্মো উপসাগরের প্রবেশপথে সমুন্নত গিরি প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এট্‌না তাহার তুষারসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কাটেনিয়া উপসাগরের বক্ষে আপনার বিশাল ছায়া নিক্ষেপ করিতেছে—এ সকল সৌন্দর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু সুদীর্ঘ উপকূলভাগের সৌন্দর্য্য চক্ষু ভরিয়া দেখিলে তৃপ্তিলাভ হয়, সূর্য্যালোকে দীপ্যমান গিরিমালায় সমস্ত উপকূলভূমি সমাদৃত, গভীর গিরিগুহাসমূহে রৌদ্রধৌত সমুদ্রের বক্ষঃপ্রবাহিত অবাধ সমীরস্রোত প্রবেশপূর্ব্বক সমুদ্রতরঙ্গের সুগভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে।

জীবনচরিত।

কাউণ্ট টলষ্টি।

বাল্যকালে টলষ্টির বড়ই একটা মনোদুঃখ ছিল;—সে দুঃখ এই যে, তিনি সুপুরুষ ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার শরীরের গঠন অতি সুন্দর ছিল, কিন্তু তিনি নিজে সৌন্দর্য্যের এক বিন্দুরও অধিকারী ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই এই ভাব তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাঁহার সুন্দর চেহারার আকর্ষণ নাই—তাঁহার মুখ দেখিয়া, আকৃতি দেখিয়া কেহ তাঁহাকে ভালবাসিবে না; সুতরাং লোকের স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে সুশীল ও সুবোধ বালক হইতে হইবে। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত যে, তাঁহার বড়দাদা কেমন সুপুরুষ, আর তিনি কেমন কদাকার। তিনি বলিয়াছেন, "এক এক সময়ে আমার মনে ঘোর নিরাশার উদয় হইত। আমার মনে হইত, এমন চেপ্টা নাক, স্থূল ওষ্ঠ, কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু যার, পৃথিবীতে তাহার কোনও সুখই নাই। আমি সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম, 'হে দয়াময়, তুমি একদিন হঠাৎ আমার চেহারা বদল করিয়া দাও, আমাকে সুপুরুষ করিয়া দাও; পৃথিবীতে আমার যাহা আছে, এবং ভবিষ্যতে আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব, সে সমস্তই তোমাকে দান করিব।" এমন কি, কাউণ্ট টলষ্টী যখন যৌবনসীমায় উপনীত হইলেন, তখনও এ প্রকার মনের ভাব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি যখন তখনই দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া ঘৃণা ও ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইতেন। তিনি সেই সময়ের কথায় বলিয়াছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে,আমার চেহারা অতি কুৎসিত, কিন্তু আমার আরও দুঃখের বিষয় এই ছিল যে, আমার মুখের দিকে চাহিয়া

আশ্বস্ত করিব, তাহারও কিছু ছিল না। আমার মুখে সে সকলের কিছুই অভিব্যক্ত হইত না; আমার চেহারা কর্কশ, সাদাসিদে এবং সাধারণ রকমের। যখন দর্পণে নিজের মুখ দেখিতাম, তখন আমার নয়নদ্বয় যেন নিতান্ত বোকার চক্ষুর মতই দেখাইত, তাহাতে মনস্বিতার কোন পরিচয়ই ছিল না। যদিও আমি তেমন খাটো ছিলাম না, কিন্তু তবুও আমাতে যেন পুরুষোচিত একটা বলবীর্য্য ছিল বলিয়া আমার মনে হইত না; আমার শরীরে মহত্ত্বের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল না; বরঞ্চ আমাতে চাষার পূর্ণ অবয়ব মূর্ত্তিমান ছিল। আমার হাত পা চাষার মত বড়। ইহাতে আমার যেন বড়ই অপমান বোধ হইত।'

কাউন্ট টলষ্টি সমস্ত লোককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন;—একভাগ বিলাসী; অপর ভাগ সাদাসিদে লোক; সাধারণ লোকের হিসাবই তিনি রাখিতেন না। বিলাসিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলি অবশ্য থাকা চাই বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল; যথা,—ফরাসী ভাষা সুন্দর করিয়া উচ্চারণ করা; হাতের নখ পরিষ্কার রাখা, এবং নমস্কার করিবার কায়দা জানা, নাচিতে ও বেশ কায়দামাফিক আলাপ করিতে জানা। বিলাসীর এই কয়টি প্রধান গুণ ধরিয়া লইয়া তিনি সেই গুণগুলির অধিকারী হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার নমস্কারের কায়দা শিখিতেই অতিবাহিত হইয়া যাইত; অধিকাংশ সময় তিনি নাচিতে, কথা বলিতে, উচ্চারণ দোরস্ত করিয়া ফরাসী ভাষায় আলাপ করিতেই, কাটাইয়া দিতেন। আর হাতের নখগুলি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও সুগোল করিয়া কাটিবার জন্য প্রতিদিন তিনি গলদ্ঘর্ম্ম হইতেন। বিলাসী ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতেন না,—তা তিনি মহা পণ্ডিতই হউন, বা মহা শিল্পীই হউন।

"আমার কবুল জবাব" (My confession) নামক পুস্তকে কাউণ্ট টলষ্টি তাঁহার কলেজ-ত্যাগের পর দশ বৎসরের কার্য্যকলাপের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এই পরিচয় পাইলে সকলেই সেই সময়ের—শুধু তখনকার কেন, এখনকারও রুষ বড়মানুষের আচার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা জন্মিবে। টলষ্টি বলিতেছেন, 'সে দশ বৎসরের কথা মনে হইলে এখনও আমার মনে ভয়ানক কষ্ট ও ঘৃণার উদয় হয়। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে নরহত্যা করিতাম; অন্যের প্রাণবধের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতাম; জুয়া খেলায় টাকা নষ্ট করিতাম; কৃষকের উপর অত্যাচার করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতাম, তাহা যথেচ্ছ অপব্যয় করিতাম; কৃষকদিগের উপর অকারণ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতাম; কুচরিত্রা রমণীগণের সহিত হল্লা করিয়া বেড়াইতাম, আর লোক ঠকাইতাম। মিথ্যাবাদ, চৌর্য্য, পরদারগমন, মাতলামী, গুণ্ডামী, নরহত্যা, সবই তখন আমি করিতাম; ইহার একটিও সে সময়ে বাদ যায় নাই। কিন্তু তথাপি সে সময়ে আমার সমকক্ষ, সম-অবস্থাপন্ন লোকের নিকট আমি অন্যের অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম। কলেজ-ত্যাগের পর প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস এই।'

পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে তখন নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইত। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেন, 'এখন যাহা করিতেছি এবং ... কি লাভ হইবে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভের কোনও উপায় আছে কি ?" তিনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চাহিতেন ; দর্শনবিজ্ঞানে এই প্রশ্নের সমাধান অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু সকলেই এক-বাক্যে বলে, 'আমরা জানি না।' জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন ;— তাঁহার প্রশ্নের উত্তর মিলিল না ; তাঁহার নিরাশা আরও বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত মনস্বিগণই তাঁহাকে সেই এক জবাব দিতে লাগিল, 'সব মায়াময়, সকলই অসার। মানবজন্ম দুঃখের। মৃত্যুই পরমমঙ্গলের নিদান।' পুস্তকাদিপাঠে শান্তি না পাইয়া তিনি মনুষ্যজীবন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার পার্শ্বচরগণের জীবনের ঘটনাবলীর বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণের জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার চিন্তাই করে না ; সুতরাং তাহারা বেশ আনন্দে যৌবনের সুখই বল, আর অসুখই বল, উপভোগ করিয়া যাইতেছে। আর এক দল আছেন, তাঁহারা জীবনপ্রসঙ্গের সবই বোঝেন, অথচ চার্ব্বাক-ধর্ম্মাবলম্বী ; 'খাই দাই, আনন্দে দিন কাটাই ; তাহার পর যাহা হয় হইবে ; তাহার জন্য এখন হইতে সকল ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিব কেন ?' ইহাই সে দলের মূলমন্ত্র। আর এক দল আছেন, তাঁহাদের জীবনযন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়, ভোগবাসনা যখন ঘোর অতৃপ্তি ও অসহনীয় অনুতাপের অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বালিত করিয়া দেয়, তখন তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। আর সর্ব্বশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত কাউণ্ট টলষ্টয় নিজে। এত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার মত বড়মানুষ দিয়াই পৃথিবী গঠিত ; সেই জন্য তিনি বড়মানুষের রীতি প্রকৃতি,চরিত্র ব্যবহারের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। শেষে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে বিপুল বিস্তৃত পৃথিবী রহিয়াছে। তখন তিনি সাধারণ লোকের জীবন-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতেই টলষ্টয়ের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। আজ টলষ্টয়ের জীবন দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইতেছেন।

পরিচয়।

"তুমি কি আমায় ভালবাস ? আমি তোমায় ভালবাসি। সে দিন বাদামগাছের তলায় বসে গান করছিলে, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। তুমি আমায় দেখতে পাওনি, কিন্তু আমি তোমায় সমস্তক্ষণ দেখেছি। কাল আর বোধ হয় ওখানে বসবে না, কিন্তু তবুও আমি তোমায় দেখতে পাব।"

"কেমন তোমাদের বল্ লুকিয়ে রেখে জব্দ করেছিলুম ! আর এ দিকে বল্ ছুঁড়বে ? তুমি রোজ সিঁড়ির নীচে বসবে, আর চুল আঁচড়াবে ; আর অত দেরি করে ইস্কুলে আস কেন ? আর আমি রোজ বাড়ী গিয়ে জানালায় বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকি, কত লোক বেড়াতে যায়, তুমি তুমি

বেড়াতে যেতে পার না? আর বাসন্তী বলেছে, তুমি সবাইকে আমার লেখা দেখাও। এবার থেকে যে না পড়ে ছিঁড়ে ফেলবে তার সঙ্গে আমার আড়ি।"

কুড়ান কাগজের সাদা পিঠে যখন উল্লিখিত পত্রব্যবহার চলিতেছিল, তখন আমার পঠদ্দশা; সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। আমাদের স্কুলের অন্তর্গত একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এখানে ৫ বৎসরের মেয়ে হইতে ১১।১২ বৎসরের মেয়েরা পর্য্যন্ত পড়িতে আসিত। দুই স্কুলের মধ্যে একটিমাত্র প্রাচীরের ব্যবধান, তাও সর্ব্বত্র নহে। একই প্রাঙ্গণ লতামণ্ডিত জাফরী দ্বারা বিভক্ত করিয়া দুইজনদের খেলিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং বালক ও বালিকাদের মধ্যে সাক্ষাতের নিয়ম না থাকিলেও, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ চাক্ষুষ মিলনের পক্ষে কোনও বাধা ছিল না। সাহেবের স্কুল; মেম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাদের হেডমাষ্টারের নিকট আসিয়া সর্ব্বদাই গল্পস্বল্প করিতেন; নিয়মেরও বিশেষ কিছু বাঁধাবাঁধি ছিল না; বালিকাদিগের প্রাঙ্গণে আমাদের বল প্রভৃতি পড়িলে আমরা তাহা নিজেরাই কুড়াইয়া আনিতাম। উহারাও আমাদের প্রাঙ্গণে সাট্‌ল্‌কক ফেলিয়া দিয়া নিজেরাই আসিয়া লইয়া যাইত। তাহাতে উভয় পক্ষের অধ্যক্ষদিগের কোনও প্রকার আপত্তি ছিল না। সুতরাং আমাদের মধ্যে এই লতার ব্যবধান প্রায় নলিচার ব্যবধানের মতই হইয়া উঠিয়াছিল। এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন লতামণ্ডিত ব্যবধানের আড়ালে দুটি কিশোর-হৃদয়ের যে গোপন বিনিময় হইতেছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

ক্রমে ক্রমে বা একেবারে—কেমন করিয়া মানবহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহা বলা কঠিন। যে প্রকারেই হউক, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া দেখি, আমার কিশোর-হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণপ্রায়। বন্যার উদ্বেলিত প্রভাবে উচ্ছ্বসিত নদী যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, তেমনি কৈশোরের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া আমি অনুভব করিতেছিলাম যে, আমার ভালবাসা হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া পড়িতেছিল। সত্যই তাহা হইয়াছিল কি না, তাহা বোধ করি পাঠক আমার অপেক্ষা ভাল বুঝিবেন। তবে এই অবধি বলা যাইতে পারে যে, সে উচ্ছ্বাসের ফলে উর্ব্বর জীবনের অনেকটা ভাসিয়া গিয়াছিল। বিবাহের যখন প্রথম সম্বন্ধ হইতেছিল, তখন মার কানে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, স্কুলের সেই মেয়ে না হইলে বিবাহ করিব না। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ; তাহা হইল না। এখন

একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছি ও লোকে বলে, সংসারধর্ম্ম বেশ পালন করিতেছি। সময়ে সময়ে দূর-দৃষ্ট সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মত বাল্যপ্রেমের এই বিচিত্র কাহিনী মনে পড়ে; তখন সে কেমন আছে ও বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছে কি না, জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।

২

পূর্ব্ববর্ণিত অধ্যায়ে যে সময়ের কথা বলিলাম, সে সময় বিজয়ের সহিত আমার আলাপ ছিল না; সম্প্রতি আলাপ হইয়াছে। বিজয়ের সহিত এখন প্রতিদিনই দেখা হয়, এবং এই প্রতিদিনের প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা একত্র কাটে। তাহার কারণ আমারও সুদীর্ঘ ছুটী আছে, এবং বিজয়ও এখন বেকার ভদ্র-সন্তান। তবে পাঠক অনুগ্রহ করিয়া এক ব্যক্তির নিকট বেকার ভদ্রসন্তানের যেরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছিল, সেরূপ বেকার ভদ্রসন্তান মনে না করেন, এই অনুরোধ। উক্ত ব্যক্তিকে একদিন আমার একটি বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ম'শায়ের বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, আজ্ঞে আমি এখন বেকার ভদ্রসন্তান—অর্থাৎ গ্র্যামারটি পড়ি, গঞ্জিকাটুকু সেবন করি, বারোয়ারীর চাঁদাটি আদায় করি, পাড়ায় কেহ পটল তুলিলে কাঁধটি দি, এবং তাস দাবা পাশা খেলি।

বিজয়ের এ বেকার অবস্থার কারণ, সে ঊর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত অবনিবন্‌তা হওয়ায় চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মোটা বেতনের চাকরী এইরূপ Spirit দেখাইয়া এক কথায় ছাড়িয়া দেওয়াতে বিজয়ের অনেক বিজ্ঞ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, কিন্তু তাহার সহিত আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কেন না, উক্ত কার্য্যে আমিও বিলক্ষণ পটু ও হপ্তায় অন্ততঃ তিন দিন সাহেবের সহিত দ্বন্দ্ব আমার বাঁধা আছে; তবে পরম্পরায় শুনিতে পাই, তিনি নিজেকে বুনো ওল মনে করিলেও আমাকে বাঘা তেঁতুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ভোলেন না।

একে সমবয়স্ক, তাতে অনেক বিষয়ে একমতাবলম্বী, সুতরাং বিজয়ের সহিত আলাপ ক্রমে সৌহার্দ্যে, সৌহার্দ্য ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে বড় বিলম্ব হইল না। ক্রমে খুব মেশামিশি হইয়া গেল। তার পর লাহোরে বিজয়ের বিচিত্রঘটনাপূর্ণ ছাত্রজীবন, সে এক একটি আশ্চর্য্য রহস্যপূর্ণ কাহিনীর সমাবেশ। পার্শী পরিবারের মধ্যে অযাচিত আতিথ্যলাভ, ছাত্রজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনুরাগ, সংক্রামক রোগে আত্মীয়বিহীন প্রবাসে মারহাট্টা যুবতীর সস্নেহ-

মরা-সদৃশ স্নেহ যত্ন ও সেবা; কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার ও তাহার হতাশ্বাস পরিণামের কথা শুনিতে শুনিতে আমরা সন্দেহের হাসি হাসিতাম দেখিয়া বিজয় চটিয়া যাইত, এবং আমার ভবিষ্যতের আশা পুত্ররত্নের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও তাহার জ্যামের কৌটা ও বিস্কুটের বাক্স বাহির করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নব নব কাহিনীর অবতারণা করিয়া আমাদের অবিশ্বাস-প্রবণতাকে শাসিত করিত। তাহার এ সকল ঘটনা ভূপেন জানে, ব্রজেন জানে, সতীশ জানে, অতএব আমার অবিশ্বাস করিবার কোনও অধিকার নাই।

একদিন কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, বিজয়ের সহিত আমার কুটুম্বিতা আছে। কেবল তাহাই নয়, আর একটু অনুধাবন করিয়া দেখা গেল, বিজয় আমার কুটুম্বের সেরা। আমি মহা উল্লাসে বড় বউকে গিয়া বলিলাম। বড় বউ পান সাজিতেছিল, প্রথমে আমার কথা অবিশ্বাস করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার ত কেবল ঐ চেষ্টা, লোককে শালা বলতে পারলেই বাঁচ।" পরে যখন বিজয়কে কি সূত্রে ঐ মধুর ভাষায় সম্ভাষণ করা যাইতে পারে বুঝাইয়া দিলাম, তখন তাড়াতাড়ি পান ফেলিয়া আসিয়া দেখিয়া কহিল, "তাই ত, সত্যিই ত বিজয় দা'।" তাহাকে দেখিয়া প্রথম আলাপে বিজয় বলিল, "কি রে! এত বড় হয়েছিস, আমায় চিনতে পারিস্?"

৩

আমাদের এক মহারাণী আছেন—সম্পর্কে আমার ভ্রাতৃজায়া। ইনি আতিথ্যে আরবরমণী, শিষ্টাচারে ফরাসী রমণী, দৃঢ়তায় ইংরেজ রমণী, কোমলতায় স্বদেশিনী, রহস্যে জাপানী রমণী,এবং আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ অত্যাচার সহ্য করিবার তুলনায় সহিষ্ণুতায় বসুন্ধরা। একাধারে এত গুণ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে মহারাণী উপাধি দিয়াছি।

একদিন মহারাণীর অ্যালবাম দেখিতে গিয়া দেখি, আমার ফটোখানি সেখানে নাই। কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম, "ভয় নেই, আমার চেয়েও ভাল লোকের কাছে আছে।" তাঁহা অপেক্ষা কিসে ভাল জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, রূপে এবং বয়সে। এই সুন্দরী ললনা কে, লজ্জার খাতিরে, তাহা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন আমার স্ত্রীও মহারাণীর বাড়ী গিয়াছিল; রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করিল না। অনেক করিয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। মনে ভাবিলাম, মহারাণীর রহস্য ও কলহপ্রিয় যে দুইটি কন্যারত্ন আছে, তাহাদেরই রহস্যজালে আবদ্ধ হইয়া আমার সহধর্ম্মিণী আমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছেন। এক দিন দুই দিন করিয়া এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল ; তবুও দেখি, নিতান্ত দরকারী কথা ভিন্ন আমার স্ত্রী আমার সহিত পূর্ব্বের মত কথা কহে না। নানারূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া আমিও ক্রমে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

মহারাণীর মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা হাসিত ও বলিত,'কেমন জব্দ করেছি!' সম্প্রতি একবার তাহারা উহাদের দুই ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং উহাদের পশ্চিমে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিবার জন্য, মিথ্যাকে সত্যরঞ্জিত করিয়া, আমায় হিমক্লিষ্ট রজনীতে হাবড়া ষ্টেশনে যাতায়াত করাইয়া উহাদের সে উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার এই বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের বিনিময়ে উহারা যে কৌতুক লাভ করিয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করিতেছে। আমার স্ত্রীর সহিত কথাবন্ধ লক্ষ্য করিয়া যে বলিতেছে, তখন আমার মাথায় সে কথা প্রবেশ করে নাই।

একদিন অপরাহ্নে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তাহারা বলিল, "মা ও ঘরে আছেন।" আমি সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, দুই জন অপরিচিত রমণীর সহিত মহারাণী আলাপে প্রবৃত্ত। উঁহাদের দেখিয়া আমি সরিয়া আসিলাম। মহারাণী আমাকে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, 'এখনি যেন চলে যেও না, আমি আসছি,তোমার সহিত অনেক কথা আছে।' আগন্তুক রমণীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিলাম,তাহাতে বুঝিলাম,ইহাঁরা মহারাণীর কুটুম্বিনী, এবং অন্যপক্ষে বিজয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোক। ইহাঁদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধাটি মহারাণীর সমবয়স্কা হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। উক্ত রমণী মহারাণীর এক জন বিশেষ বন্ধু এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আসিয়া থাকেন।

৪

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়ী। কলিকাতায় তাঁহার বাড়ী থাকিলেও আমার শ্বশুর প্রধানতঃ দেশেই থাকেন ; কোন বিশেষ

সুতরাং আমার সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে বড় বৌ দেশেই থাকিত। বিজয়ের বিবাহের সময় তাহার অসুখ হওয়ায় সে আসিতে পারে নাই, আর সকলে আসিয়াছিল। বিজয়ের স্ত্রীর সহিত তাই তাহার আলাপ ছিল না। কিন্তু আমার সহিত বিজয়ের আলাপ ও সম্বন্ধ আবিষ্কারের পর হইতেই বড় বৌ কয়বার বিজয়দের বাড়ী গিয়াছিল। এখন তাহারা দুই জনে পরস্পরের বিশেষ বন্ধু, উভয়ে উভয়ের 'মনের কথা'। বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও বিজয়ের স্ত্রী তাঁহার 'মনের কথার' বাড়ী আসিতে পারেন নাই, কারণ তিনি তখন পুত্রসম্ভবা।

'মনের কথা'র সহিত মনের কথা কিরূপ হয়, জানি না; কিন্তু পেটের কথার যে কিছু বাকি থাকে না, সে কথাটা আমার স্ত্রী যেদিনই বিজয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিত, সেইদিনই অনুভব করিতাম। হঠাৎ একদিন আমার কাঁচির আবশ্যক হওয়ায় বড় বৌয়ের বাক্স খুলিতে গিয়া দেখি, একখানি চিঠি পড়িয়া গেল। হাতের লেখায় বুঝিলাম, এখানি বড় বৌয়ের 'মনের কথা'র লেখা। বড় বৌ তাহার 'মনের কথা'র সকল পত্রই আমাকে দেখাইত, সুতরাং এ পত্রখানি পাঠ করিতে আমি কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিলাম না। চিঠিখানি এই,—

"ভাই মনের কথা,

"তুমি আবার কবে আস্‌বে? অনেক ভাই কথা আছে, সে সব আর চিঠিতে লিখব? ভাই, ভালবাসলে কি দোষ হয়? কেউ যদি আমাকে ভালবেসে থাকে, তবে সেটা কি আমার দোষ? আর ত ভাই আমি গঞ্জনা সহিতে পারি না। এক একবার মনে হয়, আত্মহত্যা করি; কিন্তু আবার ভাবি,তাতে ফল কি? যে আমায় ভালবাসে,তার ত আর কোন লাভ হবে না,যে আমায় দেখ্‌তে পারে না, সে বাঁচবে। দেখ না ভাই, তোমার দাদা যখন তখনই কেবল খোঁটা দেন, 'আমায় পছন্দ হয় না, সে কথাটা ত বল্লেই হয়, তোমায় যে ভালবাসে, তার কাছ থেকে তোমার ভালবাসাটা কেড়ে নিচ্ছিনি।' আমি ভাই আবার কাকে ভালবাস্‌তে গেছি?

"তোমার ছেলে মেয়ে কেমন আছে লিখ। আর তোমরা এর মধ্যে বালিগঞ্জের বাগানে গেছলে কি? ইতি

তোমার মনের কথা।

"পুঃ। দেখ ভাই, ঠাকুরজামাই যেন এ চিঠি দেখেন না।"

পত্রখানি পড়িয়া কাঁচির কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পত্রখানি রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। পত্রের বিষয় আমার স্ত্রীর নিকট কোনও উচ্চবাচ্য করিলাম না।

একটু অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া বিজয় কিছু গোলে পড়িয়াছিল। আমা-

দের সমাজে লোকে প্রথম বয়সে স্ত্রীর নিকট হইতে স্বভাবতঃ যতটুকু আশা করে, বিজয় তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক আশা করিতে যাইত, এবং তাহার ফলে সেই পরিমাণে নৈরাশ্য ভোগ করিত। চাকরীস্থলে বিজয় একলা থাকিত, এবং আমিরী চালে চলিত, সুতরাং যাহা ইচ্ছা করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। মেজাজটাও কিছু সাহেবী রকমের হইয়া পড়িয়াছিল। স্ত্রীকে দস্তুর-মত সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী করিবার প্রবৃত্তি এই মেজাজের ফল। অসহায়া বালিকা বিদেশে দুর্দ্দান্ত স্বামীর সাহেবীয়ানা চরিতার্থ করিবার জন্য বাঙ্গালীর মেয়ের শিক্ষার বিরোধী স্বাধীন ইচ্ছাটুকু বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, শাঁসবিহীন খোলাটুকুর মত অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার ভান-টুকু বিজয়ের স্ত্রীর অজ্ঞতাটুকুকে বেশ শোভন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত রাখিয়া-ছিল। দেশে আসিয়া বিজয় দেখিল, তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শিক্ষার প্রতি তাহার স্ত্রীর অনুরাগ সাধারণ বঙ্গবালার শিক্ষার প্রতি অনুরাগের ন্যায় নগ্ন মহিমায় দাঁড়াইয়া আছে। ভানের শিথিল আবরণটুকু দেশে আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল। তবে বৌদিদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজয় প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে তাহার স্ত্রী আবার শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ দেয়। এত লোক থাকিতে বৌদিদির আশ্রয়গ্রহণ কেন? এ কথাটা পাঠকের মনে সহজেই উদিত হইতে পারে। কিন্তু বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বৌদিদিই জীবন-সমুদ্রে বিজয়ের একমাত্র কর্ণধার। পার্টি আছে, কিন্তু এদিকে বিজয়ের স্ত্রীর মুহুর্মুহু ফিট হইতেছে, বিজয় মুখ চুণ করিয়া শুশ্রূষায় মগ্ন; বৌদিদি আসিয়া উত্তর করিলেন,—"যাও যাও! বৌয়ের আর অত সেবায় কাজ নেই, নেমন্তন্ন যাও।" বিজয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুর্দ্দান্ত বন্ধুর দল অকস্মাৎ বাড়ী চড়াও হইয়া বলিল, এই দণ্ডে খাওয়াইতে হইবে, বাজারের খাবার খাইব না, তোমার স্ত্রীকে রাঁধিতে হইবে। অথচ তাহার স্ত্রী তার পিত্রালয়ে। কিন্তু সে কথা শোনে কে? বিজয় বেকারে পড়িয়া সভয়ে বৌদিদির নিকট প্রস্তাব করিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এই ব্যাপার, আমি বলি বুঝি বা আরো কি?" বিজয়ের মুখে হাসি ফুটিল। চাকরীতে জবাব দিয়া অবধি বিজয় বাড়ী থেকে এক পয়সা লইত না,—অথচ কলিকাতার বাজারে চাঁদা না দিতে পারিলে মান থাকে না; কথাটা কোনও গতিকে বৌদিদির কানে গেলে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিজয়কে টাকা দিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"চাকরি হলে কিন্তু শুদ্ধ সুদ্ধ দিতে হবে।" বিজয়ের মান বাঁচিল

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ তুফানে বিজয়ের জীবনতরী যখন তখন দোলায়মান হইত, কিন্তু বিজয়ের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় ছিল না। সে জানিত, হাল কেমন পাকা মাঝির হাতে। কিন্তু এবার বৌদিদিরও পরাজয় হইয়াছিল; বিজয়ের স্ত্রীকে শিক্ষার প্রতি অনুরাগিণী করিবার বিষয়ে তাঁর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। বিজয়ের ইহাতে মন উঠিত না। সে প্রতিকারের প্রত্যাশায় নানারূপ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিত; মনে করিত, অব্যর্থ শর সন্ধান করিতেছে। তাহার ফল কি হইয়াছিল, উপরের চিঠিখানি দেখিয়া পাঠক তাহা কতকটা বুঝিয়াছেন।

৫

এবারকার মত সে বৎসরও দুর্ভিক্ষের বৎসর। রিলিফকার্য্যের আনুসঙ্গিক তত্বাবধারণের জন্য ডাক্তার আবশ্যক হওয়ায় বিনা আবেদনে অযাচিত সৌভাগ্যলক্ষ্মী চাকরীরূপা হইয়া বিজয়কে দেখা দিলেন। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, বিজয়ের কপাল পাথরচাপা, তাঁরাই আবার বিজয়ের পাতাচাপা কপাল দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। নূতন কর্ম্মস্থলে যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যাইবার দিন রাত্রে বিজয় আমাদের একটি বিদায়ভোজ দিল। সেদিন অপ্রাহ্নের কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমরা বিজয়ের সেই চিরপরিচিত কোণের ঘরটীতে সমবেত হইতেছিলাম। ৮টার মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল।

আহারান্তে আমরা বসিয়া গল্প করিতেছি। বিজয়ের স্ত্রীর কথাই বেশী হইতেছে, এমন সময় বিজয়ের ছোট ভাই আসিয়া আমায় বলিল, "আপনি চলে যাবেন না, মা বলেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। একদিনও ত বাড়ীর ভিতর যান না।" বিজয় বলিল, "ষ্টেশনে যদি যাও ত দেখাটা এই বেলা সেরে এস।" বিজয়ের ভাইয়ের সহিত আমি ভিতরে গেলাম; তাহার মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে তিনি কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "বিজয়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাগে যা; নবৌমাকে পাঁন দিতে বল।" আমি উপরে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলাম, তিনি আরও বলিতেছেন,—"তাতে আর লজ্জা কি? তোমার ননদাই বই ত ভাসুর নয়—তাতে আবার বিজয়ের সঙ্গেই ওর বেশী ভাব।" বিজয়ের ভাই আমায় বিজয়ের কক্ষে ছাড়িয়া 'আমি আসছি' বলিয়া চলিয়া গেল। বিজয়ের ডেভেনপোর্টের উপর চিঠির কাগজ ছিল, তাই ছিঁড়িয়া গুলি পাকাইয়া আমি নীচে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছিলাম, পরক্ষণেই চুড়ির আওয়াজ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। শ্বশ্রূর আদেশমত

বিজয়ের স্ত্রী বিজয়ের এক অষ্টমবর্ষীয়া ভগিনীর সহিত আমাকে পান দিতে আসিয়াছিল। 'ননদাই বই ত ভাসুর নয়' কথাটা তখনও আমার কানে বাজিতেছিল; "ননদাইকে আর অত লজ্জায় কাজ নেই" বলিয়া আমি অকস্মাৎ বিজয়ের স্ত্রীর ঘোমটা খুলিয়া দিলাম। অবগুণ্ঠনমুক্তা বাধ্য হইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল,—কিন্তু এ কি!—আমার সমস্ত শরীরে একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল—এই সেই!—সমস্ত কিশোরজীবন যা'কে উৎসর্গ করিয়াছিলাম,যাহার সুখের আশায় উচ্ছ্বসিত যৌবনের তরঙ্গাঘাতেও অবিচলিত ছিলাম, যা'র কথা ভাবিয়া কালের এই চড়ায় বসিয়া সুখস্বপ্নোত্থিতের মত আজও ব্যথায় সুখ অনুভব করি, সেই এই!—আমার বন্ধুপত্নী বিজয়ের স্ত্রী!—আমার নিজের স্ত্রীর অপেক্ষাও সৌভাগ্যবতী, আমার নিকট আত্মীয়া—কিন্তু আমার নয়!

অসুখের ওজর করিয়া বিজয়ের সঙ্গে ষ্টেশনে না গিয়া বাড়ী আসিলাম। সেই রাত্রেই কি কথাপ্রসঙ্গে আমার স্ত্রী আমায় একখানা অ্যালবাম দেখাইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,কাহার? বলিল,আমার'মনের কথা'র। একখানা ছবি খুলিতে গিয়া দেখিলাম, রমণীহস্তের কাঁচা অক্ষরে কি লেখা। কালী পড়িয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়াছিল, অনেকক্ষণ দেখিয়া পড়িলাম—'আমার' বাকীটুকু পড়িতে পারিলাম না। আমার স্ত্রী জানিত না, সে ছবি কার; আমার বুঝিতে বাকি রহিল না, মহারাণীর অ্যালবাম হইতে আমার সে ছবি কে আনিয়াছিল।

তিনটি সনেট।

মালাবার।

তব শোভাতীর্থে আমি বিদেশী এ দেশে,
কি স্নিগ্ধ মধুর স্নেহে জুড়ালে জীবন!
উজ্জ্বল নিদাঘ নব;—বসন্তের শেষে
সৌন্দর্য্য প্লাবনে খেলে কনক কিরণ!
প্রফুল্লিত বনরাজী! সৌরভিত ফুলে
মালঞ্চে লবঙ্গ লতা কেতকী চন্দন!

কোন্ স্বর্গ-স্মৃতি প্রাণে জাগাইয়ে তুলে ?
গৃহ, পান্থশালা, মঠ, দেউল, কানন !
ঘন নারিকেল কুঞ্জ অভেদ বন্ধনে,
চিরপ্রেমে ও হৃদয়ে বদ্ধ-আলিঙ্গিত ;
অনিন্দ্য প্রকৃতি-কান্তি এ দূর বিজনে,
শ্যামল বঙ্গের ছবি করেছে অঙ্কিত ;
শতোচ্ছ্বাসে আরবের মহা পারাবার,
চুম্বনে ভরিছে তব মুখ মালাবার।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম।

হৃতসর্ব্বস্ব।

এত প্রেমে—এতদিনে এই পুরস্কার ?
আমার অজ্ঞাতে কবে হৃদয় আমার
তোমাতে করেছ পূর্ণ ; তোমা ছাড়া আর
আমার বলিতে কিছু রাখনি ধরার !
বিশ্ব খুঁজি করি জড় সহস্র উপমা,
তোমাতে মিলায় সব, অয়ি নিরুপমা !
শত যত্নে গাঁথি ছন্দঃ সরস-তরল,
সে তোমার নূপুরের গুঞ্জন কেবল !
নূতন সৌন্দর্য্যালোক চাহি রচিবারে,
যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি তোমারে !
তোমার কৌতুকদীপ্ত দুখানি নয়ন
অবহেলে রচি দেয় আমার ভুবন !
বিশ্বছাড়া করিয়াছ-দুঃখ নাই তা'র
যদি তব হৃদে রাখ কবিরে তোমার।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কোজাগর নিশা।

এস তবে, এস দেবি সৌন্দর্য্যরূপিনি !
শরতের পূর্ণচন্দ্র শোভে নীলাম্বরে ;

স্বর্ণশস্যে পরিপূর্ণ বঙ্গের প্রান্তর ;
স্নিগ্ধ-শ্যাম-তরুশিরে, লাবণ্যের দ্যুতি
ধীর সমীরণ সনে খেলিতেছে ধীরে।
শত শঙ্খস্বনে, আজি, বঙ্গ সুহাসিনী
গায় আগমনী তব, হে বিশ্বজননি!
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি, মৃদুমন্দ গতি,
ছড়াইয়া চারিদিকে আলোকের রাশি,
উদ্ভাসি আকাশতল, রঞ্জিয়া ধরণী,
সুবর্ণ-ঝাঁপিটি লয়ে উতর গো দেবি!
তব শ্রীচরণস্পর্শে সহস্র কমল
আশু বিকশিবে সতি, ঝঙ্কারি উঠিবে
ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ের তার সুমধুর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস "রাবণের ধর্ম্মদীক্ষা" প্রবন্ধে লঙ্কাবতার সূত্র নামক এক খানি প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া রাবণের ধর্ম্মদীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লঙ্কাবতার সূত্রে বাল্মীকির রাবণ অন্য বর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন। এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ লঙ্কা নগরীর মলয় শিখরে বিহার করিয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইলে,—"ভগবান্ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। রাবণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, 'ভগবন্, পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আপনার এই সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আজ হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের আশ্রয় লইলাম।' তদনন্তর রাবণ ভগবানের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ১০৮টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।"

"রাবণের প্রশ্নসমূহ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। রাবণের প্রশ্ন মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই অন্তর্নিহিত ছিল। রাবণের প্রশ্ন সমূহ ও ভগবানের উত্তরপরম্পরা পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

"এই লঙ্কাবতার গ্রন্থ কতকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে।

বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া লঙ্কাবতার সূত্র বিরচিত হইয়াছিল। চীনদেশীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায়, লঙ্কাবতার গ্রন্থ তিন বার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে গুণভদ্র, ৫১৩ খ্রীঃ অব্দে বোধিরুচি এবং ৭০৪ খ্রীঃ অব্দে শিক্ষানন্দ নামক পণ্ডিত সংস্কৃত লঙ্কাবতার চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

"খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ ভারত ও সিংহল দেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে লঙ্কামলয় শিখরে আসীন হইয়া ভগবান বুদ্ধ লঙ্কাবতার সূত্রের উপদেশ প্রদান করেন।

"৮ম শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে লঙ্কাবতার সূত্রের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন।

"১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বৌদ্ধ দর্শন পরিচ্ছেদে লঙ্কাবতার সূত্রের উল্লেখ ও ভগবান্ বুদ্ধের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসুর "প্রেম", শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "চৌধুরীর লড়াই" প্রবন্ধে নোয়াখালি জেলায় প্রচলিত একটি গানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "চৌধুরীর লড়াই" চিত্তাকর্ষক।

প্রদীপ। শ্রাবণ। এবার প্রদীপে সুপাঠ্য রচনার অত্যন্ত অভাব। কেবল শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা" নামক প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধটি এবার সমাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "গম্ভীরা"ও সুখপাঠ্য রচনা। "গম্ভীরা মালদহ জেলার সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব।" তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। "মেহের উন্নিসা" একটি "সচিত্র ঐতিহাসিক গল্প ;—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রচিত। হরিসাধন বাবু বঙ্গের সার ওয়াল্‌টার হইবার জন্য যে অসামান্য অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু গল্পটির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। গল্পটির যেমন আখ্যানবস্তু, তেমনই বর্ণনাভঙ্গী; লেখকের ভাষাও তদনুরূপ। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মথটের নিকট কবি যখন নৈষধ রচিয়া লইয়া আসিলেন, তখন মথট পড়িয়া বলিয়াছিলেন, 'বাপু হে! দু' দিন আগে যদি কাব্যখানি আনিতে, তাহা হইলে দোষ-পরিচ্ছেদের রচনা কালে উদাহরণ সংগ্রহের জন্য আমায় নানা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না; তোমার কাব্য হইতেই সব উদ্ধৃত করিতাম!" হরিসাধন বাবুর গল্প সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। গল্পটির প্রারম্ভেই দামোদরের "শ্বেতশুভ্র (!) ফেণ-বিমণ্ডিত আকাশপ্রমাণ তরঙ্গরাজির ভীষণ গর্জ্জন" শুনিয়া ভীত না হইলে, গল্পের আদ্যোপান্তে পাঠক অনেক মজা পাইবেন। ইহাতে 'শ্বেত শুভ্র' আছে, 'নৈশসঙ্গীত চিত্র' আছে, আর একটি সম্পূর্ণ মৌলিক ঐতিহাসিক কথা আছে ;—বৃদ্ধ ও বিলাসবিরাগী বাদশাহ আকবর মেহের উন্নিসার পাণিপ্রার্থিগণের "প্রতিযোগী" ছিলেন! সম্পূর্ণ মৌলিক বটে! চিত্রগুলি চমৎকার। মোগল সময়ের বেশ ভূষায় কি জ্ঞান! আর নুরজাহান ইসাবেলা হউন, ক্ষতি নাই ; কিন্তু তিনি "পট অব বেসিল"

ধরিয়া "জীবনদীপ আজিই নিবাইব" বলিতেছেন কেন? চিত্রখানি প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীমতী নরম্যাণ্ড (হেন্‌রিয়েটা রে) চিত্রিত ইসাবেলা চিত্র হইতে 'না বলিয়া গৃহীত' হইয়াছে।* কিন্তু কবি কীট্‌সের মানসদুহিতা সুষমাময়ী কৌমারবিধবা ইসাবেলার কি শোচনীয় বিকৃতি! ইতিপূর্ব্বে একই রচনায়, ইতিহাস, ভাষা, কবিত্ব, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বোধ করি আর কখনও খুন হয় নাই। হরিসাধন বাবুর জয় হউক! "বনপথে" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি শব্দঝঙ্কারময়ী কবিতা।

প্রদীপ। ভাদ্র। ভাদ্র সংখ্যার অবস্থাও পূর্ব্ব মাসের অপেক্ষা শোচনীয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "রস্কিন" ব্যতীত আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

নির্ম্মাল্য। শ্রাবণ। মহারাজার "শিকার কাহিনী" এবার মূল প্রসঙ্গে উপনীত হইয়াছে; পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। "কবিকঙ্কণে মুকুন্দরাম" প্রবন্ধের যাহা বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে দীনেশবাবুর 'বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে' পড়িয়াছি; লেখক প্রায় তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধের কোথাও দীনেশ বাবুর নাম দেখিলাম না "সৌন্দর্য্য ও শ্মশান" প্রবন্ধটি একবার নির্ম্মাল্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। তখন লেখক ব্যাধিশয্যায় শয়ান ছিলেন, তাই মনের মত করিতে পারেন নাই, এবার তাঁহার 'মনের মত' করিয়াছেন! এমন অপরূপ 'কাব্যি' সচরাচর দেখা যায় না। যেমন শ্মশান, তেমনই সৌন্দর্য্য! লেখক সৌন্দর্য্যকে শ্মশানসাৎ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্মশানের কি দুর্ভাগ্য। তবে "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" লেখক আমাদের বান্ধব বটেন, শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "ব্রহ্মচারিণী" গল্পটি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "বরোদার কাহিনী" সুখপাঠ্য সুন্দর সন্দর্ভ। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানশাস্ত্র" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। "কবিতাগুচ্ছে" শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ গুহের আন্তরিকতাপূর্ণ "প্রার্থনা" কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রার্থনা।

আমি কে, আমি কে নাথ, সকলিত তুমি!
পতিরূপে তুমি, প্রভু, শ্রীপতি আমার!
তুমি বিনা এই বিশ্ব মহামরুভূমি,
—ঘনান্ধ তমিস্রা-মগ্ন দীপ্ত সহস্রার!
প্রজাপতিবর লব্ধ অমূল্য মাণিক,
সাধনার সিদ্ধি তুমি—তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার
জীবন নিকুঞ্জ মাঝে মুখরিত পিক,—
আমি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী—তুমি পারাবার।
বিরাট বিশাল বুকে এ ক্ষুদ্র বাহিনী,
লও নাথ, লও প্রভু, লও মিশাইয়ে;
আশা মুগ্ধ, তাপদগ্ধ, রুদ্ধ কল্লোলিনী,
অসীমে সসীমটুকু দিবে গো ঢালিয়ে।
তারপর, দুই জনে মিলি এক সাথে,
ছুটিয়া চলিব সেই অনন্তের পথে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় নবরসের সমাবেশ আছে। সমালোচকের মতে প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শনী সার্টিফিকেট হোলডার!" ধৃষ্টতার এরূপ উদাহরণ উশৃঙ্খল বঙ্গসাহিত্যেও অতি বিরল।



শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল।

KUNTALINE PRESS.

১৩০৪ সালের ভূকম্প।

১৩০৪ সালে দেশের কি দুর্ব্বৎসরই গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছিল, তাহার উপর ৩০ জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্নে (১২ জুন ১৮৯৭) আসামের সেই প্রচণ্ড ভূকম্প। বঙ্গদেশের ঈশান কোণে এমন বাড়ী নাই, যাহা সেই ভূকম্পের উগ্রতার নিদর্শন প্রকাশ করে না। তদবধি তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। সে দিন কাগজে দেখিতেছিলাম, ব্রহ্মপুত্রের বন্যাতে গোয়ালপাড়া জলমগ্ন হইয়াছে; পূর্ব্বে গোয়ালপাড়া এত অল্পে জলমগ্ন হইত না। সেই ভয়ঙ্কর ভূকম্পে আসামের পৃষ্ঠভূমি প্রায় সর্ব্বত্র উচ্চনীচ হইয়া পড়িয়াছে।

ভূকম্পের পরে ভূবিদ্যাবিভাগের চারি জন কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ভূকম্পের নৈমিত্তিক পরিদর্শন নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। সরকারি আদেশে বহু স্থান হইতে ভূকম্পের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। ভূবিদ্যাবিভাগের জনৈক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওল্ডহাম সাহেব সেই বৎসর শীতকালে স্বয়ং পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং যাবতীয় বিবরণী, পত্র, পরিদর্শনফলের আলোচনা করিয়া তিনি উক্ত ভূকম্পের বৃত্তান্ত * লিখিয়াছেন। ভূবিদ্যাবিভাগ হইতে যে সমুদয় ভূকম্পবৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই প্রধান। এই প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃত্তান্ত হইতে কতিপয় প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সংক্ষুব্ধ প্রদেশ।

ভারতের কতখানি প্রদেশে উক্ত ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল, তাহা চিত্র হইতে বুঝা যাইবে। তথায় দেখা যাইবে, সংক্ষুব্ধ প্রদেশের চারি দিকের সীমা জানা নাই। উত্তরে হিমালয় ও তিব্বত, পূর্ব্বে শ্যাম ও চীন রাজ্যে এই ভূকম্পের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ওল্ডহাম সাহেব অনুমান করেন যে, উহারা সমুদয় সংক্ষুব্ধ প্রদেশের দুই তৃতীয়াংশ স্থান হইবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেও, ১২ লক্ষ বর্গমাইল প্রদেশে ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। গুজরাথের কিয়দংশে ঐ ভূকম্প জানা গিয়াছিল। বঙ্গোপসাগর জলময় না হইয়া স্থলময় হইলে, উহারও কিয়দংশে ঐ কম্পন

* Memoirs of Geological Survey of India, vol. xxix.

নিশ্চিত জানা যাইত। তিব্বত ও চীন হইতে সংবাদ পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু ঐ ঐ রাজ্যের কিয়দংশে নিশ্চিত কম্পন ঘটিয়াছিল। এই সমুদয় প্রদেশ একত্র করিলে দেখা যায় যে, প্রায় ১৭॥০ লক্ষ বর্গমাইল প্রদেশে উক্ত ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

ইহার তুল্য ভয়ঙ্কর ও বহুপরিসর ভূকম্পের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের লিস্‌বন নগরের ভূকম্প সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও বিস্তৃত বলিয়া এ পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে লিখিত হইতেছিল। কিন্তু ১৩০৪ সালের ভারতের ভূকম্প উহাকেও পরাজিত করিয়াছে। লিস্‌বনের ভূমি-কম্পের কেন্দ্রস্থল সমুদ্রে ছিল, এবং সেই কম্পনজনিত সমুদ্রতরঙ্গ লিস্‌বন নগরের ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহা স্থলভাগে হইলে ১০ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে অনুভূত হইত। লিস্‌বনের ভূকম্প ঘনবসতিপূর্ণ সভ্যদেশে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। তাই সাধারনের মনোযোগ এত আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আসামের ভূকম্প অল্পবসতিপূর্ণ দরিদ্র দেশে ঘটিয়াছিল, কেবল পর-স্পরদূরস্থিত দুই একটা নগরে বড় বড় অট্টালিকা ছিল, এবং ভূকম্পবিধ্বস্ত প্রদেশের অধিবাসীরাও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় কোন সভ্যদেশে হইলে ঐ ভূকম্পের উৎপত্তি স্থিতি লয় সমুদয় প্রকৃতির আলোচনা করিতে বিজ্ঞানসমিতিসমূহ ব্যগ্র হইত, এবং কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইত।

যাবতীয় ভূকম্প এক প্রকার নহে। সকলে সমান ভূভাগে ব্যাপ্ত হয় না, কিংবা সকলে সমান উগ্র হয় না। দুইটি ভূকম্পের প্রকোপের তুলনা করিতে হইলে, উভয়ের জাত শক্তির তুলনা আবশ্যক। প্রত্যক্ষভাবে এরূপ তুলনা সম্ভাবিত নহে, তবে ব্যাপ্তি দেখিয়া উভয়ের শক্তির তুলনা করা যাইতে পারে। যে প্রদেশে কম্পনের উগ্রতা সমান, তাহাকে একটি রেখা দ্বারা বেষ্টন করিলে সেই সীমারেখাকে সমোগ্রতা রেখা (isoseismic lines or isoseists) বলে। ওল্‌ডহাম সাহেব ১৩০৪ সালের আসামের ভূকম্পের সমোগ্রতা রেখা নিম্নলিখিত মত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। যে প্রদেশে ইষ্টকময় ও প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহাদি প্রায় সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহা প্রথম।

২। যে প্রদেশে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি প্রায় ভগ্ন হইয়াছিল, এবং কোন কোনটা ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয়।

৩। যে প্রদেশে প্রায় সমুদয় ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদির ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা তৃতীয়।

৪। যে প্রদেশে ভূমিকম্প বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল, এবং তৈজসপত্র নড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চতুর্থ।

৫। যে প্রদেশে ভূমিকম্প জানা গিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তাহা পঞ্চম।

৬। যে প্রদেশে কেহ কেহ কম্পন অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু সকলে করে নাই, তাহা ষষ্ঠ।

অবশ্য এই বিভাজন ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে। তথাপি এতদ্দ্বারা কম্পের উগ্রতা ও ব্যাপ্তি কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। চিত্রে ছয়টি সমোগ্রতা রেখা প্রদর্শিত হয় নাই। প্রথম রেখা এবং সংক্ষুব্ধ প্রদেশ-মাত্র দেখান গিয়াছে। দেখা যাইবে, প্রথম রেখার ভিতরে শিলং ও গোয়ালপাড়া ছিল। এই প্রদেশে ঘরবাড়ী কিছুই রক্ষা পায় নাই। এই প্রদেশের নীচে ভূত্বকের মধ্যে সংক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সংক্ষোভ একটি বিন্দুতে জাত না হইয়া অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া হইয়াছিল। এ জন্য সংক্ষোভকেন্দ্র না বলিয়া সংক্ষোভস্থল, এবং উহার ঠিক উপরিবর্ত্তী ভূপৃষ্ঠকে সংক্ষোভপৃষ্ঠ (epicentral tract) বলা যাইবে।

সংক্ষোভপৃষ্ঠেই ভূকম্প অতীব ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। উহার সন্নিকটে পশ্চিমে রঙ্গপুর ও কোচবেহার এবং পূর্ব্বে শিলেট ছিল। দ্বিতীয় রেখার ভিতরে আগড়তলা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দারজিলিং। তৃতীয় রেখার ভিতরে ভাগলপুর, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, চট্টগ্রাম। চতুর্থ রেখার ভিতরে বেহারের পশ্চিমাংশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বার্দ্ধাংশ ছোট নাগপুর ও বালেশ্বর। আলাহাবাদের নিকট দিয়া চতুর্থ রেখা এবং আগ্রার নিকট দিয়া পঞ্চম রেখা গিয়াছিল। এই পঞ্চমরেখার ভিতরে আগ্রা, সাগর, রাইপুর, গঞ্জাম, মান্দালে। ইহার পরেও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। দক্ষিণে ভিজিগাপত্তন, পশ্চিমে ভূপাল, আজমীর, পাতিয়ালা ছিল। য়ুরোপের সহিত সংক্ষুব্ধ প্রদেশের ক্ষেত্রফলের তুলনা করিলে দেখা যায়, উহা য়ুরোপের প্রায় অর্দ্ধাংশ। যে প্রদেশে পাকা ঘর বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাই গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় দ্বিগুণ।

কম্পনের বিবরণ।

এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

উহা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। শিলঙ্গে ভূবিদ্যাবিভাগের মিষ্টার স্মিথ লিখিয়াছিলেন, "সে সময় আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম এবং শিলঙ্গের স্কুলের নিকট জলের কলের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম। সাধারণ শিলঙ্গ সময়ের ৫টা ১৫ মিনিটের সময় বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটা গম্ভীর দীর্ঘনাদ আরম্ভ হইল। বোধ হইল, যেন উহা দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে আসিতেছে। ইহার অব্যবহিত পরেই কম্পন হইল। নাদের প্রায় দুই সেকেণ্ডের পরেই কম্পন, এবং দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই উহা প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। মৃত্তিকা প্রবলবেগে দুলিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইল, এবং আমাকে হঠাৎ রাস্তার উপরে বসিয়া পড়িতে হইল। কম্পন অনেকক্ষণ ছিল, এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকার উগ্র বোধ হইয়াছিল। সমুদ্রে জাহাজে যেমন বমনেচ্ছা হয়,কম্পনও ঠিক তেমনই ভাব জন্মাইয়াছিল। উহা একেবারে হঠাৎ আসিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল, যেন কেহ মাটিটা অত্যন্ত বেগে অগ্রপশ্চাৎ চালাইয়া দিতেছে। প্রত্যেক দিকে ভূপৃষ্ঠ স্পষ্টতঃ কাঁপিতে লাগিল, যেন উহা কোমল কর্দ্দমময়। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারে ধারে দীর্ঘাকার ছিদ্র উৎপন্ন হইল। পুষ্করিণীর ঢালু পাড় প্রায় ১০ ফুট উচ্চ ছিল; উহা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল, এবং এক স্থানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেল। রাস্তার কোথাও কোথাও দু' ফুট উচ্চ মাটির আ'ল ছিল। সেগুলা নড়িতে নড়িতে রাস্তার সমান হইয়া পড়িল। স্কুলের বাড়ীটি দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভূমিসাৎ হইল, এবং উপরের লোহার পাতের ছাদ বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া মাটীতে গিয়া পড়িল। কম্পনের পরে আমার বোধ হইল, উহা ১ মিনিটের কম স্থায়ী হইয়াছিল, এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে আসিয়াছিল। কম্পনের উগ্রতা সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহার আরম্ভের ১০।১৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই যত কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। শিলঙ্গের নিকটে অধিকাংশ সেতু লইয়া যত কিছু পাথরের বাড়ী ঘর ছিল, সমুদায়ই মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। রাস্তা মেরামতের নিমিত্ত পাশে এক ফুট উচ্চ পাথর সাজান ছিল, সে সমস্ত গোলাকার হইয়া ২।৩ ইঞ্চ উচ্চ হইয়া পড়িয়াছিল। কুইণ্টন কীর্ত্তি-স্তম্ভের চূড়া স্বস্থান হইতে কয়েক ফুট দূরে পূর্ব্বোত্তর কোণে পড়িয়া গিয়াছিল।"*

---

* স্থানে স্থানে অনেক বাদ দেওয়া গেল।

অপর অনেকে তথাকার ভূকম্পের বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই বলিয়াছেন, ভূপৃষ্ঠ তরঙ্গের আকারে স্পষ্টতঃ তুলিয়া উঠিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ঐ তরঙ্গ ৮ হইতে ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ বলিয়াছেন। বোধ হয়, গড়ে ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১ ফুট উচ্চ ধরা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সকলেই বলিয়াছেন, ভূমি উপর নীচেও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ঢাকের চামড়ার উপর কলাই রাখিয়া ঢাক পিটিলে কলাইগুলা উপর দিকে যেমন লাফাইয়া পড়ে, রাস্তার উপরের পাথরগুলা তেমনই শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের অগ্রপশ্চাৎ গতি ঘটিয়াছিল। বিড়ালে ইন্দুরকে যেমন নাড়া চাড়া করে, ঐ দুই গতিবশতঃ তেমনই অনুভব হইয়াছিল। উক্ত পার্শ্বগতি অন্যূন ৮।৯ ইঞ্চ হইয়াছিল। এই সংক্ষোভপৃষ্ঠ ছাড়িয়া তরঙ্গগুলি ক্রমশঃ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল। তথা হইতে দূরে কম্পনটা আর অকস্মাৎ ক্ষেপণের মত না হইয়া মৃদু দোলনের আকারে পরিণত হইয়াছিল। আরও অধিক দূরে, যেখানে ভূকম্প অল্প জানা গিয়াছিল, কিংবা আদৌ জানা যায় নাই, কেবল জল নড়িতে দেখা গিয়াছিল, সেখানে বোধ হয় তরঙ্গগতি-মাত্রটি গিয়াছিল।

কম্পনের শব্দ।

ভূকম্পের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনা যায়। কিন্তু এই ভূকম্প যেমন প্রচণ্ড, তাহার শব্দও তেমনই ঘোর হইয়াছিল। শিলঙ্গের কোনও ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন, ৫০।৬০ হাতের মধ্যে ঘরদরজা পড়িতেছিল, কিন্তু ভূকম্পশব্দে উহাদের পড়িবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সংক্ষোভপৃষ্ঠ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সকলেই ঘোর শব্দ শুনিয়াছিলেন। কলিকাতায় কেহ বলিয়াছেন, শব্দ শুনা যায় নাই; কেহ বলিয়াছেন, শুনা গিয়াছিল। যাঁহারা বলিয়াছেন, শব্দ শুনা যায় নাই, তাঁহারা নিশ্চিত অন্যমনস্ক ছিলেন। মেদিনীপুর, বালেশ্বর, এমন কি, আরও দক্ষিণে কোকানদে লোকেরা শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। পশ্চিমে সাঁওতালপরগণা, গয়া, পালামৌ, আলাহাবাদ, জব্বলপুর, ভরতপুরে গভীর দীর্ঘ নাদ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব দিকে ভামো হইতে ঐ প্রকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মান্দালে হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, কোনও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। উত্তরে দারজিলিঙ্গে শব্দ শুনা গিয়াছিল, উহার উত্তরের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে যেখানের লোকেরা শব্দ শুনিতে পায় নাই, সে সকল স্থলেই যে শব্দ না শুনিবার কারণ অন্ত-

মনস্কতা,এমন বলিতে পারা যায় না। হয় ত সেখানকার মৃত্তিকা শব্দ শুনিবার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। আবার রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কম্পন জানা যায় নাই, কিন্তু শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। রাণীগঞ্জের ভূপৃষ্ঠে অবশ্য কম্পন বিলক্ষণ প্রবল বোধ হইয়াছিল, এবং বাড়ীরও ক্ষতি করিয়াছিল।

কিন্তু কি প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল? কেহ বলিয়াছেন, যেন দূরস্থ বজ্রগর্জ্জনের ন্যায়; কেহ বলিয়াছেন, চলন্ত রেলগাড়ী বা গরুর গাড়ীর ন্যায়, ইত্যাদি। ফলে যে শব্দটি যাঁহার অধিক পরিচিত, তিনি সেই শব্দের সহিত ভূকম্পনের শব্দের উপমা দিয়াছেন।*

কিন্তু কোন কোন স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, শব্দটা দীর্ঘ ও গভীর নহে, হ্রস্ব ও উচ্চ, যেন বন্দুকের আওয়াজ। এইরূপ শব্দ শুনাও নূতন নহে।

১৮৬৯ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতেও বোম ফোটার মত শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ঐ শব্দ শুনিয়া ব্লেয়ার বন্দরের ষ্টেশন-ষ্টীমারকে জাহাজ-ডুবি ভাবিয়া খুঁজিতে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এবারেও এইপ্রকার শব্দ অধিক স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সকলগুলিই সংক্ষোভপৃষ্ঠ হইতে দূরে ছিল, এবং কম্পনের কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই প্রকার শব্দের সহিত ভূকম্পের সম্বন্ধ থাকিলেও কারণ অজ্ঞাত। বরিশালে

---

* উক্ত ভূকম্পের সময় আমি হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের নিকটস্থ কোন গ্রামে ছিলাম। গৃহ হইতে কিছু দূরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়াছিলাম। উত্তর দিক হইতে হঠাৎ একটা গভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ভূমিটা নড়িয়া উঠিল, এত জোরে নড়িয়া উঠিল যে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, বসিয়া পড়িলাম। বোধ হইতে লাগিল, যেন সমুদ্রের উপরে জাহাজে দুলিতেছি। পাশে পুকুরের পাড়ের তালগাছগুলার মাথা ঠিক ঢেউর মত দুলিতে দেখিলাম। সম্মুখের উন্মুক্ত মাটীও ঢেউর মত দুলিতে দেখিলাম। কিছু দূরের একটা আটচালার লণ্ঠনগুলাকে উত্তর দক্ষিণে দুলিতে দেখিতে পাইলাম। কম্পন প্রায় ৪ মিনিট ছিল। উহার পর আটচালার সম্মুখস্থ বৈঠকখানায় গিয়া দেখি, একটা ঝাড় পূর্ব্ব পশ্চিমে দুলিতেছে। সেখানে একটিমাত্র ছিল। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। কেন না, প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, কম্পনটা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়াছিল। আটচালার লণ্ঠনগুলাও তাহাই দেখাইয়াছিল। পরে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম, কম্পনটা তত সহজ নহে। নিয়ত যে ঠিক একই দিক হইতে আসে, এমনও নহে।

কামান দাগার যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই প্রকার। ওল্ডহাম সাহেব মনে করেন যে, বরিশালের শব্দের মূলে হয় ত ভূকম্প আছে।

উত্তর-কম্প।

শিলং, টুরা প্রভৃতি সংক্ষোভপৃষ্ঠের স্থানসমূহে এক দিনেই ভূকম্প শেষ হয় নাই। ৩০ জ্যৈষ্ঠ প্রধান ভূকম্প হইয়া যায়। তার পরদিন ঐ সকল স্থানে শতাধিক বার ভূকম্প হইয়াছিল। বস্তুতঃ উহাদের সংখ্যা করা দুষ্কর হইয়াছিল। কয়েক দিন ধরিয়া পৃথিবী স্থির ছিল না। বোরদ্বার চা-বাগানে টেবিলের উপর এক গেলাস জলকে সপ্তাহকাল নড়িতে দেখা গিয়াছিল। টুরাতে একটা লণ্ঠন তিন চারি দিন ক্রমাগত দুলিতে দেখা গিয়াছিল। ভূকম্পের সাত দিন পরে শিলঙ্গে দেখা গিয়াছিল, ৪॥০ ঘণ্টার মধ্যে ৩৩ বার ভূকম্প হয়। অর্থাৎ প্রতি ৮ মিনিটে একবার।

এই সকল ভূকম্পের মধ্যে অনেকগুলি অন্য বৎসর হইলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিত ; ৩০ জ্যৈষ্ঠের প্রবল ভূকম্পের নিকটে হওয়াতে তত প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে একটি ৩০ জ্যৈষ্ঠ রাত্রি প্রায় ১॥০ টার সময়, এবং আর একটি ইহার প্রায় ১১॥০ ঘণ্টা পরে ঘটিয়াছিল। সংক্ষোভপৃষ্ঠে উভয়ই এমন উগ্র হইয়াছিল যে, সেখানে ভাঙ্গিবার ফেলিবার কিছু থাকিলে সমস্তই নষ্ট হইত। দুইটিই কলিকাতায় জানিতে পারা গিয়াছিল। ৩১ জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১০টা ৪০ মিনিটের সময়, এবং পুনশ্চ রাত্রি ১২টা ৪৭ মিনিটের সময় কলিকাতায় পর্য্যন্ত ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। ইহার পর কম্পন ক্রমশঃ কম হইয়াছিল। কিন্তু ৯ আষাঢ় (২২ জুন), ১৬ আষাঢ় (২৯ জুন) কলিকাতায় আবার ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। ইহাদের পর ১৯ শ্রাবণ (২ অগষ্ট) এবং আরও পরে ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) কলিকাতায় কম্পন জানা গিয়াছিল। ইহার পর কলিকাতায় আর জানা যায় নাই। এই সকল ভূকম্প দূরবর্ত্তী কলিকাতায় তত অধিক হয় নাই, কিন্তু সংক্ষোভপৃষ্ঠ প্রদেশে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। এগুলিকে উত্তর-ভূকম্প (after shocks) বলা যায়।

ভূকম্পনের বেগ।

কোথায় কোন্ সময়ে ভূকম্প আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সূক্ষ্মরূপে না জানিলে কম্পনগতির বেগ নিরূপণ করিতে পারা যায় না। ঠিক সময় জানা তত সহজ নহে। দৈনিক কার্য্যে ঘড়ীর অল্প দোষ তত গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু

এরূপ গণনায় এক মিনিটের, এমন কি, এক সেকেণ্ডের প্রভেদ ঘটিলে নিরূপিত বেগে ভুল হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, ভূমি একবারমাত্র কম্পিত হইয়া থামে না; তরঙ্গের আকারে একটির পর আর একটি, তার পর একটি, এইরূপ ভাবে হইতে থাকে। কাজেই কোন্ সময়ে কোন্ তরঙ্গ আসিয়া পড়িল, তাহা জানিতে না পারিলে সময় দেখা প্রায় বৃথা হয়। প্রধান ভূকম্পের পূর্ব্বে ভূমি অল্প অল্প স্পন্দিত হয়, পরেও হয়। কোন কোন লোক এই সকল মৃদু স্পন্দন বুঝিতে পারে, অন্যেরা পারে না। সুতরাং একই স্থানের দুই ব্যক্তিকে দুইটি সূক্ষ্ম ঘড়ী দিলেও তাঁহারা সময় দেখায় ভুল করিতে পারেন।

যাহা হউক, এই ভূকম্পের আরম্ভকাল বিবিধ প্রকারে জানা গিয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বাইতে কোন কোন যন্ত্র আরম্ভ ও শেষকাল স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়াছিল। টেলিগ্রাফ আফিসে প্রায় সূক্ষ্মকাল জানিবার উপায় থাকে। ঐ বিভাগ হইতে বহু স্থানের সময় পাওয়া গিয়াছিল। রেলওয়ের ষ্টেশন-মাষ্টারদিগকে ঘড়ী প্রায় ঠিক রাখিতে হয়। তাঁহারাও উক্ত ভূকম্পকাল জানাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও পাওয়া গিয়াছিল।

এই সকল উপায় অবশ্য সমান বিশ্বাস্য নহে। যেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন কিংবা টেলিগ্রাফ আফিস আছে, সেখানে লোকের ঘড়ী মিলাইবার সুযোগ আছে। কিন্তু অল্প লোকেই এই সুযোগের ব্যবহার করেন। নিজের অন্যান্য জিনিসের মত নিজের ঘড়ী কখনও মন্দ হয় না। অনেকের ধারণা, ঘড়ীটি একবার মিলাইয়া চালাইয়া দিলেই উহা বরাবর ঠিক চলিতে থাকে। কোন কোন স্থানে ঘড়ী মিলাইবার কোনও উপায়ই নাই। দুই একটি স্থানে সূর্য্যঘড়ী আছে, কিন্তু উহার নির্ম্মাণ ও স্থাপনদোষ কেহ হয় ত কখন মনেও ভাবেন নাই। বিভিন্ন স্থানে যদি বিভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সময়ে কতখানি ভুল আছে, তাহাও জানা আবশ্যক। কিন্তু ঘড়ী ও কালনিরূপণের বিষয় কয় জন লোকে সবিশেষ জানেন? ইহার উপর, আর একটি গুরুতর বিঘ্ন আছে। টেলিগ্রাফ আফিসে মাদ্রাজের সময় রাখা হয়। কিন্তু দেশটি ছোট নয়; এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পূর্ব্বপশ্চিমে দুই ঘণ্টার অধিক সময়ের প্রভেদ ঘটে। ফলে, কোথাও কোথাও মাদ্রাজি সময় না রাখিয়া স্থানীয় সময় রাখা হয়। ইহাতে ক্ষতি ছিল না; কারণ মাদ্রাজি সময়ের সহিত কত মিনিটের প্রভেদ

জানিলে সময় ঠিকই জানিতে পারা যায়। কিন্তু কোথাও মান্দ্রাজি, কোথাও স্থানীয়, কোথাও বহুদূরবর্ত্তী কলিকাতা বা অপর নগরের সময় রাখিলে সকল সময়ের ঐক্য করা দুরূহ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে এ দেশে দুই একটি নগরে ব্যতীত অন্যত্র কোনও বিষয়ের নিমিত্ত সূক্ষ্ম কাল পাওয়া একেবারে অসম্ভব। *

যাহা হউক, কলিকাতায় জোয়ার ভাটার পরিমাণ ও জোয়ার ভাটার কাল নিরূপিত হইয়া থাকে। আলিপুর বেধালয়ে বায়ুচাপলেখন যন্ত্র আছে। বায়ুমান যন্ত্রের পারদের উর্দ্ধসীমা ফটোগ্রাফ হইয়া থাকে। ভূকম্পে ঐ পারদ উর্দ্ধাধঃ বিচলিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা ফটোগ্রাফ হইতে কতকটা জানিতে পারা গিয়াছিল। এইরূপ নানা উপায়ে দেখা গিয়াছে যে, মান্দ্রাজসময়ের অপরাহ্ণ ৪ ঘঃ ২৭ মিঃ ৪৯ সেঃ বা কলিকাতার সময়ের ৫টা ও ৫টা ১ মিনিটের মধ্যে কলিকাতায় ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। বোম্বাইতে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব-পরিমাণের নিমিত্ত একটি বেধালয় আছে। তথাকার কয়েকটি স্বয়ংলেখ যন্ত্র হইতে বোম্বাইতে ভূকম্পের কাল জানা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, তথায় মান্দ্রাজি সময়ের অপরাহ্ণ ৪ ঘঃ ৩৫ মিঃ ৪৫ সেঃ সময়ে ভূকম্প আরম্ভ হইয়াছিল। এই দুই স্থানের নিরূপিত সময় বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নির্দোষ। কিন্তু কেবল সময় জানিলেই বেগ গণিতে পারা যায় না। কলিকাতা হইতে বোম্বাইর দূরত্ব মাইল জানা আবশ্যক। অবশ্য কলিকাতায় সংক্ষোভকেন্দ্র ছিল না। এবং কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত এক ঋজু রেখায় কম্পনও যায় নাই। কম্পনের উৎপত্তিস্থল জানা আবশ্যক। এই গণনার নিমিত্ত ওল্‌ডহাম সাহেব ২০।৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০।১৫ (গ্রীণবিচ) দ্রাঘিমায় সংক্ষোভস্থল ধরিয়াছেন। তথা হইতে কলিকাতা ২৫৫·৫ মাইল এবং বোম্বাই ১২০৮·৩ মাইল দূরে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতি মিনিটে ১১৯ মাইল বেগে কম্পন ধাবিত হইয়াছিল। এই গণনার সহিত অন্যান্য স্থানের কালের প্রায় সামঞ্জস্য আছে। স্থূলতঃ মিনিটে ১২০ মাইল বেগে ভূপৃষ্ঠ দিয়া কম্পন চলিয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ।)

* অনেকে মনে করেন, ক্লক ঘড়ীর দোলকটি যে সময় থামিয়া যায়, ঠিক সেই সময়ে ভূকম্প হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভূকম্পের আরম্ভমাত্র দোলক থামে না। কখন থামে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

দণ্ডকারণ্যে।

কল্পনে, জাগাও আজি সুখদুঃখময়
অতীত করুণ স্মৃতি ; গাহিব বিজনে—
কাঁদিব একেলা হেথা জুড়াতে হৃদয়,
সীতার বিরহকথা স্মরি মনে মনে।

আজিও মা গোদাবরী ! কলধ্বনি তব
করিতেছে মুখরিত শূন্য জনস্থান ;
বিকাশিয়া মনোহর শোভা অভিনব
আজিও শোভিছে দূরে গিরি মাল্যবান।

দস্যুবন্ধ অধিষ্ঠিত, জনস্থানপারে
এই সে দণ্ডকারণ্য, চিত্র কুঞ্জবন ;
দূরে দূরে সুবিস্তীর্ণ বনের দু'ধারে
শোভে গিরি শত শত, শোভে প্রস্রবণ।

কলম্বের কলকণ্ঠে কোথা কর্ম্বিত
মনোহর পম্পাসর নয়নরঞ্জন ;
কোথা বা কীচকবন পেচকশব্দিত ;
নিকুঞ্জ-স্তিমিত কোথা সুগভীর বন।

এই সে দণ্ডকারণ্য শোভায় প্লাবিত,
সেই চারু জনস্থান, গিরি প্রস্রবণ ;
সেই মহারঙ্গভূমি—যেথা অভিনীত
অমিত বিরহদুঃখ, সৌহার্দ্দ্য,—মিলন !

হে শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি, দেখাও এ বনে
ফুটিল যে কুঞ্জতলে বাল্মীকি-ভারতী ;
যাপিলা সুদীর্ঘকাল বিরহরোদনে
যথায় ভারতলক্ষ্মী দেবী সীতা সতী।

ছায়াময়ী জানকী গো, কোন ছায়াতলে
জুড়াইতে তাপদগ্ধ জীবন তোমার ?
যেতে কি কালিন্দীতটে শ্যামবটমূলে
স্মরি পূর্ব্ব সুখকথা বিরহে অপার ?

রচিতে কি শয্যা, দেবী, প্রস্রবণ-শিরে
সৃজি প্রস্রবণ তব দুঃখ-অশ্রুধারে ?
ভ্রমিতে কি বিরহিণী গোদাবরীতীরে ?
কিম্বা সুখচিহ্নমাখা কুঞ্জের মাঝারে ?

ধ্বনিত কি কর্ণে নিত্য, কহ বিরহিণী,
"তব সহ রব আমি মধুগন্ধি বনে"—
"নয়নে কৌমুদী তুমি, জীবনসঙ্গিনী" ?
বাড়িত কি বড় ব্যথা সে সুখস্বপনে ?

লক্ষ্মী ছিলে গৃহে যার লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি, দেহের চন্দন,
সুখে দুঃখে ছিলে যার আনন্দদায়িনী,
কি করিতে, তার ব্যথা করিয়া স্মরণ ?

স্বকরকলিত তব শল্লকী-পল্লবে
পুষ্ট, করি-করভকবংশজাত করী
বিচরে পর্ব্বতে বনে যূথে যূথে সবে ;
কৃপাময়ী, কত দয়া গেছিলে বিতরি ?

তোমার পালিত সেই ময়ূরসন্তান
আজিও নাচিছে হেথা কানন উজলি ;
গাহিছে বিহগ তব করুণার গান ;
তোমারি স্নেহের কথা কহে বনস্থলী।

তোমারি রোপিত সেই কদম্ব এখন
করিয়াছে বনভূমি নীপগন্ধময় ;
সতীত্ব-সৌরভ তব যেন বা কানন
প্রসারিছে চারি ভিতে—কৃতজ্ঞহৃদয়।

আজিও কদলীকুঞ্জে হরিণের দল
তব-দত্ত-তৃণলুব্ধ, নির্ভয়ে বিচরে ;
কাননে কাননে লেখা রয়েছে কেবল
তোমার স্নেহের লিপি অক্ষয় অক্ষরে।

স্নেহময়ী বনদেবী বাসন্তী হেথায়
স্মরিয়া তোমার দুঃখ কাঁদে একাকিনী।
তমসা মুরলা আসি গোদাবরী-পায়
বরষে দুঃখের অশ্রু করি কলধ্বনি।

দুঃখান্তে মিলন তব করিয়া সূচিত
ব্রততীবেষ্টিত তরু বিকশিত ফুলে;
বিহগ বিহগী সাথে গাহে মধু গীত;
মৃগ সহ ভ্রমে মৃগী গোদাবরীকূলে।

তোমারি মঙ্গলকল্পে বিরহিণী সতী!
আজিও গাহিছে ওই সুমঙ্গলগীতি
অবনী, অমর সিন্ধু, দেবকুলপতি,
আদি কবি, সবশিষ্ঠ দেবী অরুন্ধতী।

অর্ঘ্য ঢালে মধুচ্যুত, ফল পুষ্পদল;
বহে মন্দ বনানিল কমলসুরভি;
প্রেমের আগ্রহে গায় বিহগ সকল।
সতীর মঙ্গলে আজি মাঙ্গলিক সবি।

জুড়াইতে জগতের বিরহের ব্যথা,
ভারতের পাপ তাপ করিতে মোচন,
অমৃতা অমৃতময়ী রামায়ণ-কথা
পত্রের মর্ম্মরে গাহে বনস্পতিগণ।

বাল্মীকির কাব্যকুঞ্জ প্রিয় জনস্থান!
ভারতীর রঙ্গক্ষেত্র চিরদিন তুমি;
তুমি পুণ্য তপোবন, শান্তির সোপান;
ঋষির তপস্যাপূত সুপবিত্র ভূমি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দার্জ্জিলিঙ্গের ইতিহাস।

লর্ড হেষ্টিংসের রাজত্বকালে নেপালীয়গণ অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠে ও বৃটিশাধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। এই সময়ে সিকিম-রাজের ক্ষমতাও অপ্রতিহত ছিল না; নেপালীয়গণ তাঁহার রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করে। সিকিমরাজ অনন্যোপায় হইয়া বৃটিশ গভর্মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও তদনুসারে ইংরেজ সেনাপতি অক্‌টরলোনি সিকিম-গমনে আদিষ্ট হন। তিনি নেপালের গুরখা সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলে, নেপালরাজ স্বীয় রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ গভর্মেণ্টের সহিত সন্ধি করেন; এবং সিকিম রাজ্যের যে সমুদয় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, সে সকল প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে পুনরায় নেপাল ও সিকিমের সীমান্তপ্রদেশ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ধি-অনুসারে ইংরেজরাজ বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত আহূত হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট Captain Lloydকে ঐ কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন। কাপ্তেন লয়েড মালদহের তদানীন্তন Commercial Resident

মিষ্টার জে. ডব্‌লিউ. গ্রাণ্টের সমভিব্যাহারে পর্ব্বতময় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া রিঙ্কিং পং পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। দার্জ্জিলিঙ্গের সুন্দর দৃশ্য ও অবস্থান প্রথম ইহাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাঁরা সিকিম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়কে জানাইলেন। ভারতরাজধানী কলিকাতার এত নিকটে এমন সুন্দর স্থানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস হওয়া উচিত। দার্জ্জিলিঙ্গের উচ্চতা ৬৫০০ হইতে ৭৫০০ ফিট, সুতরাং ইহার জলবায়ু প্রায় লণ্ডনের ন্যায়। ৮০০০ ফিট উচ্চ হইলেই ঠিক লণ্ডনের তাপপরিমাণের সমান হইত। সিমলা, মসূরী প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস থাকিলেও, সে সমুদয় কলিকাতা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আদেশে সার্ভেয়ার জেনেরাল মেজর হার্বাট দার্জ্জিলিং পরিদর্শন করিয়া মিষ্টার গ্র্যাণ্টের মতের অনুমোদন করেন।

সিকিমের মহারাজ সগ্‌ফড্‌ নামগ্যালের সহিত দার্জ্জিলিং বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। যদিও সিকিমরাজ দার্জ্জিলিং প্রদেশকে তত মূল্যবান বা আবশ্যক মনে করেন নাই, তথাপি তিনি সহসা ইহা ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন নাই। গভর্মেণ্ট উপযুক্ত মূল্য অথবা অন্য প্রদেশ হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের সমানপরিমাণ ভূমি দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সিকিমরাজ নানারূপ সন্দেহবশে সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৩৪ ও ৩৫ খৃষ্টাব্দে নেপালের দুর্দ্দান্ত গুরখা জাতি সিকিমের তিরাই জনপদ আক্রমণ করিল। সিকিমরাজের উপযুক্ত সৈন্য-বল না থাকায় তাঁহাকে বৃটিশ গভর্মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। গভর্মেণ্ট অতি আহ্লাদসহকারে এ প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কর্ণেল লয়েড বহুসংখ্যক সৈন্য সহ সিকিমে প্রেরিত হন, এবং নেপালীয়গণকে তথা হইতে বিতাড়িত করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সিকিমের মহারাজা দার্জ্জিলিং প্রদেশ গভর্মেণ্টকে দান করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্টের তদানীন্তন নেপাল রেসিডেণ্ট ডাক্তার ক্যাম্বেল দার্জ্জিলিঙ্গের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ হইতে গভর্মেণ্ট সিকিম-রাজকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা কর দিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কর দ্বিগুণিত হয়।

এই সময় হইতে দার্জ্জিলিঙ্গে মনুষ্যবসতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ ভূমি ক্রয় করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। বাজার বসান হইল। রুগ্ন ইউরোপীয় সৈন্যের নিমিত্ত ব্যারাক নির্ম্মিত হইল। দার্জ্জিলিঙ্গের ক্রমিক উন্নতিদর্শনে নেপাল, ভূটান ও সিকিম প্রদেশ হইতে অনেকে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। স্বাস্থ্যান্বেষী অনেক বাঙ্গালী ও পেন্‌সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ এখানে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে এখানে কোনরূপ বাণিজ্য ছিল না। কিন্তু এই সময় হইতে মৃগনাভি, স্বর্ণ, লবণ, খনিজলবণ, সোডা, পশমী বস্ত্র, তিব্বতীয় অশ্ব প্রভৃতির বাণিজ্য চলিতে লাগিল। ডাক্তার ক্যাম্বেল পর্ব্বতের পাদদেশে একটি বাৎসরিক প্রদর্শনী (মেলা) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহাতে দার্জ্জিলিঙ্গের সন্নিহিত বিভিন্ন দেশ হইতে বৎসর বৎসর বহুলোকের সমাগম হওয়ায় বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ডাক্তার ক্যাম্বেল ও তাঁহার বন্ধুগণ তত্তদ্দেশজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দার্জ্জিলিং একটি উৎকৃষ্ট নগরে পরিণত হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এখানে শতাধিক লোকেরও বসতি ছিল না। কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল, দশ সহস্রেরও অধিক লোকের বসতি হইয়াছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আদমস্নমারীর বিবরণে দার্জ্জিলিঙ্গের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সিকিমরাজের দেওয়ান দার্জ্জিলিঙ্গের এত উন্নতি সহ্য করিতে পারিলেন না। সিকিমের রাণীর নিকট-আত্মীয় বলিয়া ইনিই সিকিমের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সিকিমের লামা ও প্রধান প্রধান লোক তাঁহারই মত বিমর্ষ হইতে লাগিল। তখন নেপাল ভূটান সিকিম প্রভৃতি দেশের পরস্পর দাস-বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের সে ব্যবসায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। নেপাল ভূটান সিকিম প্রভৃতি দেশে যাহাদেরই উপর শাস্তির ব্যবস্থা হইতে লাগিল, তাহারাই পলাইয়া ইংরেজ-রাজ্য দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা নানা উপায়ে দার্জ্জিলিঙ্গের লেপচা অধিবাসীদিগকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে মানুষ চুরী হইতে লাগিল। ইংরেজরাজ্য হইতে লোকে খুন বা তদ্রূপ কোনও অপরাধ করিয়া সিকিমে পলাইলে সিকিমরাজ তাহাদের প্রত্যর্পণ কিংবা ধরিয়া দিতে সাহায্য করেন না। সিকিম ভূটান প্রভৃতির মধ্যে যেমন দাসবিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল,

সিকিমের মহারাজা ও তাঁহার দেওয়ান দার্জ্জিলিঙ্গের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ক্যাম্বেলকে ইংরাজ গভর্মেণ্টের সহিত সেইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গভর্মেণ্ট ঘৃণার সহিত তাঁহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হুকার ও ডাক্তার ক্যাম্বেল সিকিমরাজের অনুমতি লইয়া তদীয় রাজ্যে ভ্রমণ করিতে যান। হঠাৎ একদিন তাঁহারা সিকিম-রাজের বন্দী হইলেন। মহারাজের প্রধান অমাত্য বলিলেন যে, সিকিম হইতে যে সকল ক্রীতদাস ও অপরাধী ইংরেজ রাজ্যে পলাইয়া যায়, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, এবং পক্ষান্তরে ইংরেজ-রাজ্য হইতে যাহারা ঐরূপে পলাইয়া সিকিমে আসিবে, তাহাদের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ গভর্মেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মতি না দিবেন, তত দিন তাঁহারা সিকিমরাজের বন্দী থাকিবেন। ডাক্তার ক্যাম্বেল উক্ত প্রস্তাব গভর্মেণ্টকে জানাইলে অনতিবিলম্বে উত্তর আসিল যে, সিকিম-রাজের যদি বা কখনও কোন সাহায্য করা হইত, বর্ত্তমান আচরণের জন্য আর তিনি সে সাহায্যের আশা করিবেন না; আর ডাক্তার ক্যাম্বেল কিংবা ডাক্তার হুকারের মস্তকের একগাছি কেশের অপচয় হইলে সিকিম-রাজ তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইবেন। এই সংবাদ সিকিমে পঁহুছিলে, ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বন্দিদ্বয় মুক্তি পান।

অপমানের প্রতিশোধবিধানের নিমিত্ত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক দল সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য রঙ্গীত নদী উত্তীর্ণ হইয়া সিকিমে প্রবেশ করে। তাহারা সিকিমের তিরাই প্রদেশ অধিকার করিয়া উত্তরে রম্মন নদী, পূর্ব্বে রঙ্গীত ও তীস্তা নদী, আর পশ্চিমে নেপাল-সীমান্তের মধ্যস্থিত সমুদয় প্রদেশ বৃটিশ-রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়। দার্জ্জিলিঙ্গের নিমিত্ত যে বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা কর দেওয়া হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া, এই নবাধিকৃত দেশ দার্জ্জিলিঙ্গের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে রাখা হইল।

মহারাজ তাঁহার দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করায় কিছু দিন ইংরেজ গভর্মেণ্টের সহিত তাঁহার সদ্ভাবে কার্য্য চলিয়াছিল। কিন্তু মহারাজের নিকট-আত্মীয় বলিয়া দেওয়ানকে স্বপদে-পুনঃস্থাপিত করা হইল। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল, দার্জ্জিলিং হইতে আবার মানুষ চুরী হইতেছে। সহজ উপায়ে মহারাজের সহিত সদ্ভাবের আশা না থাকায়, ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির

মন্ত্রিসভা স্থির করিলেন যে, রম্মন নদীর উত্তর ও রঙ্গীত নদীর পশ্চিমস্থিত সমুদয় প্রদেশ অধিকার করা হউক, এবং যত দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, এবং পুনরায় এরূপ ব্যাপার করা হইবে না, এই প্রকার সুদৃঢ় সন্ধি না হয়, তত দিন উক্তদেশ ইংরেজরাজের অধীনে থাকুক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর দার্জ্জিলিঙ্গের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া রম্মন নদী পার হইয়া রিঞ্চিং পং পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিয়া আসিতে হয়। পুনরায় বহুসংখ্যক সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গাউলারের অধীনে সজ্জিত হইয়া সিকিমে যাত্রা করিল। অনরেবল্‌ অ্যাশ্‌লী ইডেন মহোদয় এই সঙ্গে দূত হইয়া গমন করেন। সৈন্যগণ তীস্তা নদী অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে সিকিমরাজ সংবাদ পাঠাইলেন যে, গভর্ণর জেনেরল যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব করেন, তিনি তাহাতেই সম্মত হইবেন। তদনুসারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে ত্রয়োবিংশতি-ধারা-বিশিষ্ট এক নূতন সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল। মহারাজা চুফো নামগ্যি পলায়িত অবস্থায় ছিলেন। তিনি মাননীয় ইডেন মহোদয়ের সম্মুখে আসিতে সম্মত না হওয়ায় তদীয় পুত্র যুবরাজ সিক্যং নামগ্যি উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। যুবরাজ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিকিমের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইংরেজ গভর্মেণ্টের সহিত ইহাঁর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। গভর্মেণ্ট ইহাঁর উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা পুনঃপ্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ৯০০০৲ টাকা ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০০০৲ টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু বলিয়া দেওয়া হয় যে, দিন দিন দার্জ্জিলিঙ্গের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই যে এই কর বর্দ্ধিত হইতেছে, মহারাজ যেন এরূপ মনে না করেন। এই করবৃদ্ধির কারণ মহারাজের উপর অনুগ্রহপ্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পদচ্যুত দেওয়ানকে স্বপদে পুনঃস্থাপিত করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধিপত্রের সপ্তম ধারা-অনুসারে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সিক্যং নামগ্যি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতির সহিত দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া তদানীন্তন ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। চোটাপ সিক্যং নামগ্যি এখন

সিকিমের রাজা। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর সার চার্লস্ ইলিয়ট মহোদয় ইহাঁকে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষা শিখাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই. মহাশয়কে নিযুক্ত করেন।

এক্ষণে সমুদয় সিকিমের একতৃতীয়াংশ ইংরেজের অধিকারভুক্ত; ইহাই সাধারণতঃ দার্জ্জিলিং প্রদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"দার্জ্জিলিং" * শব্দটির অর্থপর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে,এক্ষণে আমরা যাহাকে মহাকাল পাহাড় (Observatory Hill) বলিয়া থাকি, অতিপূর্ব্বে লেপ্‌চা জাতি উহাকেই দার্জ্জিলিং বিহার বলিত, এবং ইহা সিকিমের প্রধান দার্জ্জিলিং বিহারের একটি শাখা ছিল। ক্রমে ক্রমে সিকিমের দার্জ্জিলিং বিহার 'দলিং (Doling) বিহার' নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং এই বিহার দার্জ্জিলিং নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। এই বিহারে এক জন লামা বাস করিতেন। এ প্রদেশে যে ৭০।৮০ জন লোক বাস করিত, তাহারা এই বিহারে বুদ্ধের উপাসনাদি করিত। এখনও মহাকাল পাহাড়ে দৃষ্ট হয়, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এখানে লেপ্‌চা জাতি পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকে। পাহাড়টির দক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; তাহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি পতাকা উড়িতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য।

---

* Rdorji = Precious or sacred stone. Gling = place.

ইংরেজ-রাজত্বে দার্জ্জিলিং প্রদেশের পাহাড়, নদী ও গ্রাম প্রভৃতি অধিকাংশেরই নামকরণ হইয়াছে। ইংরেজ অধিকারে যে সকল লেপ্‌চা, নেপালীয় ভূটীয়া, পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতি দার্জ্জিলিঙ্গে আসে, তাহারাই ঐ সকলের নামকরণ করিয়াছে। জলা পাহাড় (লেপ্‌চা নাম—Kung-gol Hlo) মহাকাল পাহাড় (Observatory Hill), শিখ পাহাড় চৌরাস্তা, (Mal Road), কাক ঝোরা, ধোবী ঝোরা, পাগ্‌লা ঝোরা, ভূটীয়া বস্তি, জোর পথ্‌রি, কালা পথ্‌রি, বামন পথ্‌রি, জোর বাঙ্গলা, পুলবাজার, মাটিঘরা, সিপাহি ডুরা প্রভৃতি অনেক নাম নিতান্ত আধুনিক।

পীড়িত যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং বাম হস্তে দক্ষিণ কর ধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহা প্রহেলিকা নয়; আমি সত্য সত্যই বড় কষ্ট পাইতেছি।"

"আপনার বেদনা কোথায় ?"

"এই যে, মহাশয়, এইখানে"—এই বলিয়া তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট করভাগ দেখাইলেন। করতলের পশ্চাদ্ভাগ, যেখানে দু'টি বড় শিরা "আড়াআড়ি"ভাবে রহিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার স্থান ব্যাপিয়া তাঁহার দুর্ব্বিষহ প্রদাহ। ডাক্তার যখন সেই স্থান ধীরে অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিলেন, রোগীর সমস্ত দেহ কম্পান্বিত হইয়া উঠিল।

"ঠিক এই স্থানেই আপনার প্রদাহ ?"

"উঃ—অসহ্য !"

"যখন আমি আমার অঙ্গুলি উক্ত স্থানে রাখিতেছি, তখন কি ব্যথা অনুভব করেন ?"

আগন্তুক কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া আসিল—তাঁহার যন্ত্রণা এমনই তীব্র।

"আশ্চর্য্য ! আমি ত ওখানে কিছুই দেখিলাম না।"

"আমিও না; তথাচ আমি যে ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তাহা এমন ভয়ঙ্কর যে, আমার ইচ্ছা করে, 'মাথা খুঁড়িয়া মরি'।"

চিকিৎসক magnifying glass দিয়া পরীক্ষা করিলেন, এবং মাথা নাড়িয়া বলিলেন,

"ত্বক সম্পূর্ণ সুস্থ; ভিতরে প্রবহমান শোণিত নির্দ্দোষ; ত্বকের নিম্নে প্রদাহলক্ষণ বা ব্রণ কিছুই নাই; দেহের অপরাপর অংশ যেমন সুস্থ, উহাও তেমনই।"

"তথাপি আমার বোধ হইতেছে, উহা যেন অপেক্ষাকৃত রক্তাভ।"

"কোথায় ?"

তিনি আপনার "পকেটবই" হইতে পেনসিল্ লইয়া দোয়ানির আকারে একটী গোল দাগ পীড়িত হস্তে চিহ্নিত করিলেন। বলিলেন, "এখানে।"

ডাক্তার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, রোগী উন্মত্ত কি না। বলিলেন, "কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন; শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন।"

"আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। ভাবিবেন না আমি পাগল! তাহা হইলে আমাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন না। যে ছোট চক্রটি আমি অঙ্কিত করিয়াছি, উহার ভিতর তীব্র ব্যথা অনুভব করিতেছি; উহা কাটিয়া ফেলিতেই আমি আসিয়াছি।"

"তাহা আমি করিতে পারিব না।"

"কেন ?"

"কারণ, আপনার হাতে আমি কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ দেখিতেছি না। আমার নিজের হস্ত যেমন সুস্থ, উহা তেমনই।"

"দেখিতেছি, আপনি ভাবিয়াছেন, আমি সত্য সত্যই পাগল; এবং আপনার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া সেই নবাগত একখানি সহস্র মুদ্রার নোট টেবিলের উপর রাখি[illegible]

"এখন মহাশয়! আপনি দেখিতেছেন যে, শিশুর মত আমোদ করিতে আসি নাই; যে কার্য্যে আসিয়াছি, তাহা যেমন শীঘ্র সম্পাদনীয়, তেমনই অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার হস্তের এই অংশটুকু কাটিয়া দিন।"

"আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, পৃথিবীর সমস্ত ধনরাজি পাইলেও, আপনার নির্দোষ নীরোগ অঙ্গকে অসুস্থ ও বিকৃত করিয়া দিতে পারিব না। আমি কিছুতেই সুস্থ অঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগ করিব না।"

"কেন করিবেন না?"

"যে হেতু, এরূপ অসঙ্গত কার্য্যে আমার চিকিৎসা-জ্ঞানের লঘুতা প্রকাশ পায়, এবং ইহাতে আমার যশ কলঙ্কিত হইবে। সকলে বলিবে, আপনার মত উন্মাদকে পাইয়া আমি সুযোগ বুঝিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি; কিংবা বলিবে, আমি চিকিৎসা বিষয়ে অজ্ঞ।"

"বেশ, তাই যদি হয়, আমার সামান্যতম উপকার করুন। আমি স্বয়ং উল্লিখিত স্থান কর্ত্তন করিতেছি। নিশ্চয়ই বাম হস্তের দ্বারা স্বকীয় অঙ্গবিশেষে অস্ত্র-চিকিৎসা করিলে অত্যন্ত কদাকার হইবে; কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না। অনুগ্রহ করিয়া কেবল এইমাত্র করিবেন, যেন উক্ত স্থান কর্ত্তিত হইলে আপনার নিকট হইতে ক্ষত বাঁধিয়া দিবার সাহায্য পাই।"

ডাক্তার সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, লোকটি তামাসা করিতেছেন না। আগন্তুক মুহূর্ত্তমধ্যে উপরকার জামা খুলিয়া ফেলিলেন, ভিতরের জামার হাতা গুটাইয়া লইলেন, এবং বাম হস্তে অস্ত্র তুলিয়া লইলেন।

পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, তিনি পীড়িত অঙ্গের একাংশ গভীর করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

ডাক্তার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "থামুন! থামুন!" তাঁহার ভয় হইল, পাছে কোন প্রধান শিরা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

"যখন অস্ত্রপ্রয়োগে আপনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, দিন,—আমিই কাটিয়া দিতেছি।"

ডাক্তার অস্ত্র লইয়া স্বীয় বামহস্তে রোগীর পীড়িত হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি মুখ ফিরাইয়া লউন; অনেকে রক্তদর্শনে কাতর হইয়া পড়েন!"

"কোনও প্রয়োজন নাই। বরং কোথায় কাটিতে হইবে, তাহা আমিই আপনাকে ভাল করিয়া দেখাইয়া দিব।"

বস্তুতঃ, যতক্ষণ ডাক্তার তাঁহার হস্ত অস্ত্র করিলেন, তিনি বেশ প্রশান্তভাবে তাঁহাকে কত-দূর গভীর করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। অস্ত্রক্ষত বাহু একবারও কম্পিত হইল না। এবং যখন বর্ত্তুল মাংসখণ্ডখানি স্বীয় অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, তিনি অভূতপূর্ব্ব আরাম ও আনন্দসূচক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"এখন আর প্রদাহ-ক্লেশ নাই?"

সেই অদ্ভুত অপরিচিত আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন, "সমস্ত থামিয়াছে; যন্ত্রণা আর নাই—যেন ঐ ক্ষুদ্র মাংসখণ্ডের সহিত অসহ যন্ত্রণা জড়িত ছিল। রক্তপাতের জন্য যে সামান্য কষ্ট হইতেছে, তাহা পূর্ব্বযন্ত্রণার সহিত তুলনায় কিছুই নয়। এ যেন মৃদু মুক্ত সমীরণ—সে ছিল নারকীয় ঝঞ্ঝা! এই যে রক্তধারা বহিয়া যাইতেছে, ইহা আমি মঙ্গলই মনে করি; এই শোণিতপ্রবাহ?—ইহাতে আমার প্রভূত উপকারই হইতেছে।"

লোকটি হর্ষোৎফুল্লনয়নে দেখিতে লাগিলেন, নিজ দেহ হইতে রক্তস্রোত ধারায় ধারায় বহিয়া যাইতেছে। চিকিৎসক স্বকর্ত্তব্য অনুসারে তাঁহার অস্ত্রক্ষত বাঁধিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

ক্ষত-বন্ধন সমাপ্ত হইলে ডাক্তার দেখিলেন, রোগীর মুখ-ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। সে মুখে বিষাদকালিমা আর নাই। দৃষ্টি বেশ রহস্যমধুর—ডাক্তারের মুখের উপর স্থাপিত। আর যন্ত্রণায় ভ্রূকুঞ্চন নাই; নৈরাশ্য মন হইতে অপসৃত। আবার যেন জীবন-স্পৃহা ফিরিয়া আসিয়াছে; ললাট প্রশান্ত; কপোল-রক্তিমা পুনরাগত। সমগ্র মানুষটি যেন রূপান্তর ধারণ করিল!

হাতটি বন্ধনীর ভিতর রাখিয়াই, আগন্তুক সুস্থ দক্ষিণেতর হস্তে সহাস্যে ডাক্তারের কর-পীড়ন করিয়া, প্রীতিসরস কণ্ঠে বলিলেন, "আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে একবারে আরোগ্য করিয়াছেন। যে অকিঞ্চিৎকর পুরস্কার আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি, তাহা আপনার কৃত উপকারের অযোগ্য। আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ এই মহাঋণের পরিশোধে নিয়োজিত করিব।"

ডাক্তার তাঁহার প্রদত্ত অর্থরাশি গ্রহণ করিতে একবারেই অস্বীকৃত হইলেন। তিনিও না দিয়া ছাড়িবেন না। অবশেষে যখন দেখিলেন, তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ডাক্তার ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন, তিনি এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "আপনি যদি একান্ত না গ্রহণ করেন, উহা কোন চিকিৎসালয়ে দান করিবেন।"

যত দিন না রোগীর ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল, ডাক্তার নগরেই রহিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি জানিলেন যে, তাঁহার রোগী একজন ধীমান, প্রখরবুদ্ধিশালী, কার্য্যজ্ঞ ও ধনবান পুরুষ। তাঁহার হস্তের যন্ত্রণার নিদান ডাক্তার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেই অস্ত্রচিকিৎসার পর হইতে তাঁহার শারীরিক বা মানসিক কোন ক্লেশ লক্ষিত হয় নাই।

আগন্তুক আরোগ্যলাভ করিয়া আপনার পল্লী-গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

২

প্রায় তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইবার পর পুনর্ব্বার একদিন প্রত্যূষে—পূর্ব্বেরই মত অসময়ে—ভৃত্য আসিয়া ডাক্তারকে সেই অদ্ভুত রোগীর আগমনসংবাদ দিল।

ডাক্তার ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া দেখিলেন, তিনি পুনর্ব্বার দক্ষিণ হস্ত বন্ধনীতে ঝুলাইয়া, যন্ত্রণাপরিক্লিষ্টমুখে, বেপমানচরণে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দেখিয়া তাঁহাকে চেনা যায় না।

দুর্ব্বিষহ ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি অনুরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বসিয়া পড়িলেন, এবং একটিমাত্র বাক্য না বলিয়া যন্ত্রণাদিগ্ধ হস্ত ডাক্তারকে বাড়াইয়া দিলেন।

বিস্ময়মুগ্ধ চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

ক্ষীণকণ্ঠে সকাতরে তিনি বলিলেন, "যথেষ্ট গভীর করিয়া কর্ত্তিত হয় নাই। পূর্ব্বেকার অপেক্ষাও এবার যন্ত্রণা বেশী। আমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছি! আমার হাত 'কাঠ' হইয়া আসিতেছে। ইচ্ছা ছিল না—আপনাকে পুনরায় বিরক্ত করি। এই অদৃশ্য প্রদাহ ক্রমশঃ হস্ত হইতে মস্তিষ্ক অথবা হৃদয়ে উঠিয়া আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিবে—এই আশায় আমি

ক'দিন সহ্য করিয়াছিলাম ; কিন্তু আর পারি না। এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ঐ স্থানটুকু হইতে নড়িবে না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন, যদি কল্পনা করিতে পারেন যন্ত্রণা কি ভয়ঙ্কর !"

লোকটির দেহ মোমের মত বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার ললাট ঘর্ম্মসিক্ত। ডাক্তার পীড়িত অঙ্গ বন্ধনমুক্ত করিয়া দেখিলেন, চিকিৎসিত স্থান সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে ; একটি নূতন ত্বক উদ্গত হইয়াছে। তাঁহাতে অস্বাভাবিক কিছুই দৃষ্ট হইল না। তাঁহার নাড়ী বলবতী—কিন্তু জ্বর ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতেছিল।

ডাক্তার অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য ব্যপার ! এমন রোগ আমি কখনও দেখি নাই।"

"অদ্ভুত ! ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ব্যাপার ! ডাক্তার, ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন না—মিনতি করিতেছি, এ কষ্ট হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আপনার অস্ত্র লইয়া উহা আরও গভীর—আরও বিস্তৃত—করিয়া কাটিয়া দিন ; তাহা ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।"

পীড়িতের কাতর মিনতি ডাক্তার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হইল। তিনি পুনশ্চ দেখিলেন, প্রথমবারের ন্যায় রোগীর মুখে আরামজনিত উল্লাসচিহ্ন, শোণিতপ্রবাহ দেখিতে তেমনই আগ্রহ !

ক্ষতস্থান ধৌত ও আবৃত হইল, আগন্তুকের মুখমণ্ডলের মৃত-পাণ্ডুরতা আবার তিরোহিত হইল। কপোল-রক্তিমা ফিরিয়া আসিল—কিন্তু এবার তিনি হাসিলেন না—এবার বিমর্ষভাবে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিলেন। বলিলেন, "আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ; আবার আমি এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলাম। অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষত সারিয়া যাইবে। কিন্তু, মাসখানেক পরে যদি পুনরায় আপনার নিকট আসি, বিস্মিত হইবেন না।"

"ওঃ কি বলেন মহাশয় ! এরূপ চিন্তা মন হইতে বিদূরিত করুন।"

ডাক্তার এই অদ্ভুত পীড়ার কথা অনেক সহযোগীকে বলিয়াছিলেন। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু একটিও সন্তোষপ্রদ হয় নাই।

৩

কথিত মাসের পরিসমাপ্তির সময় ডাক্তার সোৎকণ্ঠে এই প্রহেলিকাময় রোগীর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু মাস অতিক্রান্ত হইলেও তিনি আসিলেন না।

আরও কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল। অবশেষে ডাক্তার একদিন তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। লিপিখানি ঘন-সন্নিবিষ্ট অক্ষরমালায় লিখিত হইয়াছিল। স্বাক্ষর দেখিয়া বোধ হইল, রোগী স্বহস্তে পত্রখানি লিখিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, নিশ্চয়ই সে যন্ত্রণা আর তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই ; তাহা না হইলে তিনি কেমন করিয়া লেখনীধারণে সক্ষম হইলেন ?

লিপিখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রিয় ডাক্তার মহাশয়, আমার এই অদ্ভুত পীড়া আমার জীবনের সহিত শীঘ্র সমাধিশয্যায়

অবসান প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আপনাকে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রকে ইহার প্রহেলিকার অন্ধকারে রাখিয়া যাইতে পারিব না।

"আমি এক্ষণে এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাধির মূল কারণ বিবৃত করিব। বিগত সপ্তাহ হইতে ইহা আমাকে তৃতীয়বার আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইহার সহিত আর আমি যুঝিব না। এক-খানি জ্বলন্ত ইন্ধন আমার ক্ষত স্থানে 'পুল্‌টিসে'র মত রাখিয়া আমি আপনাকে পত্র লিখিতে সমর্থ হইতেছি। যতক্ষণ ইহা জ্বলিতেছে, আমি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি না। অগ্নিটার দাহ আমার পীড়ার দাহ-যন্ত্রণার-তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

"ছয় মাস মাত্র পূর্ব্বে আমি এক জন সুখী পুরুষ ছিলাম। স্বোপার্জ্জিত অর্থে নির্ভাবনায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। সকলের সহিত আমার সদ্ভাব ছিল; এবং পঁয়ত্রিশ বৎসরের পুরুষের পক্ষে যাহা কিছু সুখ-প্রদায়ী, সে সকলই আমি উপভোগ করিতাম। আমি এক বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলাম—প্রেমে পড়িয়া। একটি যৌবনবিকশিতা সুন্দরী স্ত্রী। তাহার মন উন্নত ছিল—হৃদয় যত দূর ভাল হইতে পারে তত ভাল। আমাদের একটি প্রতি-বেশিনী কাউণ্টেসকে সে পড়াইত। তাহার মত দরিদ্রাকে আমি পত্নী বলিয়া হৃদয়ে লইয়াছি, এই কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তিনী হইয়াই যে সে আমার অনুরক্তা ছিল, তাহা নয়; বালিকা-হৃদয়ের অখণ্ড প্রেম দিয়া সে আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। আমাদের পরিণীত জীবনের ছয় মাস কি সুখেই কাটিয়াছিল! প্রত্যেক দিনই মনে করিতাম, আজিকার সুখ কালিকার অপেক্ষাও অধিক। যদি আমি কদাচিৎ নিজ পল্লী-গৃহ ছাড়িয়া কার্য্যানুরোধে নগরে যাইতে—একটিমাত্র দিনের জন্যও বাধ্য হইতাম, আমার পত্নী মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে পারিত না। পতিদর্শনতৃষার পরিতৃপ্তির জন্য সে তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিতে পারিত। যদি আমার ফিরিতে বিলম্ব হইত, সে রজনীভাগ অনিদ্রায় যাপন করিত—কেবল আমারই অভাবে। যদি আমি তাহাকে তার স্নেহশীলা কাউণ্টেসের নিকট যাইতে অনুরোধ করিতাম, সে কখনও সেখানে গিয়া দিবসার্দ্ধের অধিক থাকিতে পারিত না; ববং যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিত, ততক্ষণ আমারই অভাবে বিমনা থাকিত। আমার প্রতি তাহার এমন স্নেহভরা আসক্তি ছিল যে, সে নিমন্ত্রিতা হইয়াও অপরের সহিত নৃত্যগীতে যোগ দিত না; এবং যদি দ্বিতীয় কোন পুরুষ তাহাকে সৌন্দর্য্য বা অন্য সদ্‌গুণের জন্য প্রশংসা করিত, তাহার অসন্তোষের সীমা থাকিত না। এক কথায় বলিতে হইলে, আমার এই সরলা বালিকাবধূ আমা ভিন্ন অন্য কিছু জানিত না, বা ভাবিত না; যদি তার স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুও আমা ভিন্ন অপর কিছু হইত, তাহা হইলে পরদিন সে আমাকে জানাইত,—তাহার পাপের বোঝা বাড়িতেছে।

"জানি না, কোন দানব—কোন পিশাচ—আমার শ্রুতিমূলে চুপে চুপে মন্ত্রণা দিল, 'যদি এ সমস্ত ভান হয়?' হায়! মানুষ পূর্ণ সুখের মাঝে থাকিয়াও দুঃখকে ডাকিয়া আনিতে ব্যস্ত হয়!

"আমার স্ত্রীর একটি দেরাজ ছিল। তার টানাটি সে সাবধানে বন্ধ রাখিত। আমি ইহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে কখনও ইহা খুলিয়া রাখিত না, এবং চাবী আপনার নিকট রাখিতে কদাপি বিস্মৃত হইত না।

'সেখানে সে কি লুকায়িত রাখে?' এই প্রশ্নই আমার মনে অনবরত উদিত হইতে লাগিল। আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার মুখের সারল্যে, দৃষ্টির পবিত্রতায় আর আমার বিশ্বাস রহিল না—চুম্বন আদর আর ভাল লাগিত না। কপট প্রেমে আমার প্রয়োজন ?

"একদিন প্রভাতে কাউণ্টেস্ স্বয়ং আসিয়া আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা স্থির করিলাম, স্ত্রী তখনই তাঁহার সহিত যাইবে, আমি ঘণ্টা কয়েক পরে তাঁহাদের সহিত মিলিব।

"শকট দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র, আমি বাড়ীর সমস্ত চাবী সংগ্রহ করিয়া তাহার বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিলাম। একটি তাহাতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমি যেন এই প্রথম পাপকার্য্যে উদ্যত! আমি তস্করের মত আমার বালিকা স্ত্রীর গুপ্ত বস্তু দেখিতে প্রবৃত্ত! কম্পিতকরে অথচ সাবধানে বাক্সটি খুলিয়া উহার দ্রব্যজাত এক একটি করিয়া দেখিয়া, যে স্থানে যে জিনিষটি ছিল—রাখিতে লাগিলাম; অনভ্যস্ত হস্তে সে সকল যে বিপর্য্যস্ত করিতেছি, ইহা যেন ধরা না পড়ে। হৃদয় যেন গুরুভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। হঠাৎ একতাড়া পত্র পাইলাম। মস্তিষ্ক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎশিখা ঝলসিয়া দিল। অহো! দৃষ্টিমাত্রই জানিলাম—প্রেমপত্র!

"লিপিগুলি একটি গোলাপী রঙ্গের রেশমের ফিতায় বাঁধা ছিল।

"যখন আমি ফিতাটি স্পর্শ করিলাম, মনে হইল;—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? ইহা কি ভদ্রোচিত কার্য্য? সহধর্ম্মিণীর গুপ্ত দ্রব্য অপহরণ! হয় ত তার নিতান্ত বালিকা-বয়সের গোপনীয় পত্র। যখন আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই, তার তখনকার চিন্তা বা কার্য্যের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিবার আমার কি অধিকার? যখন আমি তাহার নিকট অপরিচিত ছিলাম, সে সময়কার কোন ঘটনা লইয়া হিংসা করিবার আমার কি অধিকার? অপরাধিনী বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করিতে কে পারে? কে? আমিই ত তাহাকে সন্দেহ করিয়া নিজে অপরাধী। সেই প্রেত—সেই দানব—সেই পিশাচ আসিয়া আমাকে পুনর্ব্বার যেন চুপি চুপি বলিল;—'কিন্তু, এ সকল পত্র যদি এমন সময়কার হয়, যখন তুমি তার সকল অভিপ্রায় জানিবার অধিকার পাইয়াছ, যখন তার স্বপ্নদৃষ্টকেও দ্বেষ করিবার তোমার অধিকার হইয়াছে, যখন সে তোমার—তাহা হইলে?' আমি ফিতা খুলিয়া ফেলিলাম। কেহই আমাকে দেখে নাই। সেখানে একখানি দর্পণও ছিল না—যাহাতে আমার প্রতিবিম্ব দেখিয়া লজ্জিত হইতে পারি। আমি এক এক করিয়া সমস্ত চিঠি পড়িলাম।

"উঃ——কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত!

"পত্রগুলিতে কি পড়িলাম? এমন ঘৃণাতম বিশ্বাসঘাতকতায়ও লোক পড়ে? এই সকল প্রেমলিপির লেখক, আমারই একজন প্রাণের বন্ধু! এ কি ভাষায় লিখিত! কি প্রগাঢ় অনুরাগ! কি সোহাগ! গুপ্ত রাখিতে কেমন উপদেশ! এবং আমি যখন গৃহীতদার ও এত সুখী, তখনকারই লেখা। তৎকালীন মনের অবস্থা আমি আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? প্রাণান্তকারী হলাহলের উত্তেজনা কল্পনা করুন। আমি সমস্ত পত্র পড়িলাম—প্রত্যেকখানি! পরে, তৎসমুদয় যেমন ছিল, তেমনই রাখিয়া চাবী বন্ধ করিয়া দিলাম।

"জানিতাম, আমি যদি দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাহার সহিত মিলিত না হই, সন্ধ্যার সময় সে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং যথাকালে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে সে আমাকে দেখিয়া, দ্রুতপদে আমার কাছে আসিল; এবং প্রণয়ভরে একটি সুকোমল চুম্বন দিল। আমাকে পাইয়া সে কত সুখী! যে প্রলয় আমার অন্তঃকরণ বিলোড়িত করিতেছিল, আমি সযত্নে তাহা দমন করিয়া রাখিলাম। উভয়ে আলাপ করিয়া, একত্র ভোজন করিয়া, রাত্রে পরস্পরের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম।

"একবারও আমি চক্ষু মুদ্রিত করি নাই। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত প্রহর বাজিতে শুনিয়াছি। যখন বারটা বাজিল, আমি উঠিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তা'র সুন্দর মনোরম মস্তক একটি শুভ্র বালিসের উপর ন্যস্ত—পয়োদশয্যায় যেন একটী দেবীচিত্র অঙ্কিত। এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র সুন্দর সারল্যের অন্তরালে অহি-বিষ! প্রকৃতির কি ভীষণ ছলনা! উন্মত্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—বিষে আমার মন জর্জ্জরিত হইতেছিল—আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, সুপ্তাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিব।

"এই হত্যাব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমি আপনাকে দিতেছি না। লোকে যেমন নিদ্রামগ্ন হয়, সে তেমনই শান্তভাবে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল—আমাকে সামান্যমাত্র বাধা প্রদান করে নাই। জীবনে সে কদাপি আমাকে বিরক্ত করে নাই—মৃত্যুমুখেও না। উচ্ছলিত শোণিতের একটিমাত্র বিন্দু আমার হস্তের পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়াছিল—কোথায় তাহা আপনি জানেন। পরদিন আমি তাহা দেখিতে পাই—তখন শুকাইয়া গিয়াছে।

"কেহ সন্দেহ করিবার পূর্ব্বেই আমরা তাহাকে সমাহিত করিলাম। আমি নির্জ্জন স্থানে বাস করিতাম। আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কেই বা পারিত? তাহার পিতা মাতা কেহই জীবিত ছিলেন না যে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন।

"এই পাপ কার্য্য করিয়াও আমার বিবেক অকলঙ্কিত—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—রহিল! আমি ঘোর নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাই তাহার যোগ্য পুরস্কার। তাহাকে ঘৃণা করিতেও আমার রুচি ছিল না—তাহাকে একেবারে ভুলিতে চাহিতাম। আমি তাহার বিষয় কদাচ ভাবিতাম। নরহত্যা করিয়া অপর কেহই আমার মত অননুতপ্ত হইয়া দিনযাপন করে নাই।

"পূর্ব্বকথিতা কাউণ্টেস তৎকালে পল্লী-প্রাসাদে ছিলেন। এমন বন্দোবস্ত আমি করিয়াছিলাম যে, তিনিও যথেষ্ট বিলম্বে আমার সহিত দেখা করিতে পারিয়াছিলেন। আশঙ্কা, সমবেদনা, দুঃখ, কিংবা এমন কিছু যাহা আমি বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না—তাঁহার সমস্ত আশ্বাসবাক্যের সহিত মিশ্রিত ছিল। আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য তিনি যে কি বলিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

"আমি কি তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম? কোন সান্ত্বনা-বাণী কি আমার প্রয়োজন ছিল? আমি ত শোকাভিভূত হই নাই। পরিশেষে তিনি মৃদুতর স্বরে বলিলেন, যদি তিনি আমাকে কোনও গোপনীয় কথা বিশ্বাস করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি যেন ভদ্রতার হিসাবে তাহা অমান্য না করি। তিনি আমার স্ত্রীকে এক তাড়া চিঠি রাখিতে দিয়াছিলেন;

এক্ষণে তাহা ফেরৎ চাহিলেন। যখন তিনি আমাকে এই কথা বলিতেছিলেন, আমার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতেছিল। বাহ্যিক ঔদাসীন্য সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্রগুলি কি সম্বন্ধে। এই প্রশ্নে রমণী চমকিয়া উঠিলেন, এবং সক্রোধে উত্তর দিলেন,

" 'মহাশয়! আপনার স্ত্রীর প্রকৃতি আপনার অপেক্ষা উদার ছিল। যখন তিনি আমার পত্রগুলি রাখিতে লইয়াছিলেন, একবারও এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি সরলচিত্তে বলিয়াছিলেন, আমার চিঠিগুলিতে দৃষ্টিপাত করিবেন না; এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তিনি একটি অক্ষরও পাঠ করেন নাই। তাঁহার উদার হৃদয় ছিল, তিনি প্রতিজ্ঞার অপলাপ করিতে লজ্জিতা হইতেন।'

"আমি বলিলাম, 'বেশ, কেমন করিয়া তাড়াটি চিনিতে পারিব?'

" 'সেগুলি একটি গোলাপী রঙ্গের ফিতায় বাঁধা আছে।'

"আমি উত্তর দিলাম, 'অনুসন্ধান করিতেছি!'

"আমি বেশ জানিতাম, সেগুলি কোথায় ছিল; কিন্তু অজ্ঞতার ভাণ করিয়া পত্নীর চাবীগুলি লইয়া খুঁজিতে লাগিলাম।

"তাড়াটি তাঁহাকে প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহাই কি আপনার?'

" 'হাঁ, হাঁ—উহাই আমার! দেখুন!—আমি স্বহস্তে যে গ্রন্থি দিয়াছিলাম, তাহা স্পৃষ্টও হয় নাই।'

"তাঁহার মুখে দৃষ্টিপাত করিতেও আমার সাহস হইতেছিল না; ভয় হইতেছিল, বুঝি বা আমার মুখ দেখিয়া তিনি ধরিয়া ফেলেন যে, আমি উহা খুলিয়াছিলাম, এবং আরও গুরুতর কিছু করিয়াছি।

"আমি সহসা তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ শকটে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"সেই শোণিতবিন্দু এখন অদৃশ্য হইয়াছে। বাহিরের কোনও লক্ষণ দেখিয়া যন্ত্রণার নির্ণয় হয় না। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়া এমন ক্লেশ যে, আমার মনে হয়, উহা বিষদিগ্ধ। যন্ত্রণা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি কদাচ নিদ্রা যাই, কিন্তু এই নিদারুণ যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরামও নাই। কাহারও নিকট দুঃখপ্রকাশ করি না—ফলতঃ কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিবে না। আপনি জানেন, আমার কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। দু'বার অস্ত্রচিকিৎসার পরই কেমন ইহা হইতে নিস্তার পাইয়াছিলাম, তাহাও জানেন। কিন্তু, ক্ষত শুষ্ক হইলেই আবার সেই যাতনা! অধুনা তৃতীয়বার আক্রান্ত হইয়াছি—আর আমি সহ্য করিতে পারি না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণপরিহার করিব। সম্ভবতঃ সে আমাকে পরলোকে মার্জ্জনা করিবে। ভবৎকৃত উপকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। প্রার্থনা করি, ভগবান আপনাকে পুরস্কৃত করুন।"

*   *   *   *

*   *   *

দিন কয়েক পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, S—নামে এক জন প্রধান জমীদার আত্ম-

হত্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিলেন, পত্নীবিয়োগ-শোকেই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন; যাঁহারা আরও বেশী জানিতেন, তাঁহারা বলিলেন, দুরারোগ্য ক্ষতযন্ত্রণাই তাঁহার এই দুষ্ক্রিয়ার কারণ; এবং যাঁহারা অপর সকলের অপেক্ষা অধিক জানিতেন, তাঁহারা বলিলেন, তিনি উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা কাল্পনিক ছিল! *

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

প্রভু ও ভৃত্য।

১

মকিমপুরের মফজ্জল্ হক মিঞা এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার। তাঁহার ভূসম্পত্তির আয় বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার ন্যূন নহে। মকিমপুর চব্বিশ পরগণায়, কিন্তু মিঞা সাহেবের অধিকাংশ জমিদারী মেদিনীপুর জেলায়। জমিদারী দেখিতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুর যাইতে হয়। মেদিনীপুর সহর হইতে ক্রোশাধিক দূরেই মফজ্জল হকের সম্পত্তি। মফজ্জল্ হক্ শিক্ষিত ও উদারচরিত্র। দেশে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি। তিনি এক জন অনরারি মাজিষ্ট্রেট; তাঁহার বয়ঃক্রম ৪২।৪৩ বৎসর হইয়াছে।

মিঞা সাহেবের এক ভৃত্যের নাম নবিবক্স। নবিবক্স্ ২২।২৩ বৎসরের যুবক। শৈশব হইতেই সে মিঞাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত। সে তাঁহাদেরই বাড়ীর এক বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। তিন বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মিঞা সাহেব মাতৃহীন শিশুকে আপন পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। নবিবক্সও তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রভুর ন্যায় সম্ভ্রম করিত। মিঞা সাহেব তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন, এবং অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। ষোল সতের বৎসর বয়স হইতেই মফজ্জল হক তাহাকে আপনার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, নবিবক্স তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। বাহিরের লোকে তাহাকে চাকর বলিয়া চিনিতে পারিত না। একমাত্র প্রভুর সমক্ষেই সে ভৃত্যের ন্যায় থাকিত। বাটীর বাহির হইলেই তাহার পায়ে

* Moritz Jokal রচিত একটি Hungarian গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

তিন চারি টাকার জুতা ও গায়ে ভদ্রের ব্যবহারোপযোগী জামা প্রভৃতি দেখা যাইত। মলিন বস্ত্র লইয়া অথবা হীনবেশে বাহির হইলে মিঞা সাহেবই তাহাকে তিরস্কার করিতেন। অনেক সময়েই তিনি তাঁহার নিজের ব্যবহৃত অর্দ্ধপুরাতন বস্ত্রাদি তাহাকে দান করিতেন।

বাড়ী হইতে ক্রোশাধিক দূরে যাইয়া মিঞা সাহেবকে বেঞ্চে বসিয়া অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে হইত। তিনি সাধারণতঃ পাল্‌কিতে উঠিয়া কাছারী যাইতেন। নবিবক্‌স ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। যতক্ষণ তিনি কাজ করিতেন, নবিবক্‌স বাহিরে ঘোড়া বাঁধিয়া দিয়া কাছারীতে তাঁহার আর্দালির ন্যায় কাজ করিত। কাজ শেষ হইয়া গেলে মনিব যেমন বাড়ী ফিরিতেন, নবিবক্‌সও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। মিঞা সাহেবের সহিত মেদিনীপুরে গেলে নবিবক্‌সই একরূপ প্রভুর কর্ত্তা হইয়া উঠিত। মকব্জল হকের মূল্যবান বস্ত্রাদি ও হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি সমস্তই তাহার জিম্মায় থাকিত। মিঞাকে সে যাহা খাইতে দিত, তিনি তাহাই খাইতেন। অধীনস্থ লোকের উপর তাহার প্রভুত্বও যথেষ্ট ছিল। কোনও প্রজা, অধমর্ণ বা কর্ম্মচারী বিপদে পড়িলে, প্রায়ই নবিবক্‌সের শরণ লইত। নবিবক্‌স মিঞাকে একটা অনুরোধ করিলে তাহা প্রায়ই উপেক্ষিত হইত না। সে তাহার জীবনে এ পর্য্যন্ত কখনও প্রভুর এই বিশ্বাস ও অনুগ্রহের অপব্যবহার করে নাই।

২

বার তের বৎসর বয়সের সময় হইতেই নবিবক্‌স মিঞা সাহেবের সহিত মেদিনীপুর যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি মেদিনীপুরে মকব্জল হকের জমিদারীর মধ্যেই তাহার বিবাহ হইয়াছে। বাঁদীর সন্তান বলিয়া দেশে কিছু গোল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মিঞা সাহেব স্বয়ং তাহার এই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। মিঞা সাহেবের বাসা মেদিনীপুর সহরেরই মধ্যে। নবিবক্‌সের শ্বশুরবাড়ী সেখান হইতে ক্রোশাধিক দূরে। মিঞার সহিত মেদিনীপুরে আসিতে নবিবক্‌সের বাল্যকাল হইতেই আগ্রহ ছিল। বিবাহের পরে সে আগ্রহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নবিবক্‌স যুবক, তাহার ভার্য্যা তরুণী ও রূপবতী। বংশ অতি হীন হইলেও মিঞা সাহেব কন্যাটি সুন্দরী দেখিয়াই এই সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের সময়ে বালিকার যে সৌন্দর্য্য ছিল, যৌবনে তাহা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবিবক্‌স সারাদিন বাসায় কাটাইয়া

সন্ধ্যার সময়ে শ্বশুরবাড়ীতে যাইত, এবং প্রত্যূষে আসিয়া প্রভুর কার্য্যে উপস্থিত হইত। ইহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, নবিবক্‌সকে শ্বশুরবাড়ীতে যাইবার জন্য বরং তিনিই উৎসাহিত করিতেন। যুবক ক্ষণকাল লজ্জার ভান করিয়া শেষে প্রভুর আজ্ঞাই প্রতিপালন করিত। রাত্রি অন্ধকার হইলে তিনি তাহাকে আলোক লইয়া যাইতে কহিতেন; আকাশে মেঘ থাকিলে তাহাকে ছাতা লইয়া যাইতে উপদেশ দিতেন। পিতা যেমন পুত্রকে আদর করিয়া শ্বশুরবাড়ীতে পাঠান, মিঞা সাহেব তাহাকে ঠিক সেই ভাবে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। ফলতঃ তিনি যেন সর্ব্বাংশেই তাহার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। নবিবক্‌সের শ্বশুর তাঁহার এক সামান্য প্রজা এবং জাত্যংশে অতি ক্ষুদ্র মুসলমান। নবিবক্‌সের খাতিরে মিঞা সাহেব অনেক সময়ে তাহাকে বৈবাহিক সম্বোধন করিতেন। সময়ে সময়ে তাহার সহিত হাস্যকৌতুক বা তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। চাষার প্রাণ এই আদরে গলিয়া যাইত। ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় সে মিঞাসাহেবকে তাহার গরুর দুধ বা গাছের আম ভূস্বামীর উপঢৌকন ভাবে না পাঠাইয়া বৈবাহিকের তত্ত্বের ন্যায় পাঠাইয়া দিত, এবং সময়ে সময়ে বাড়ীতে প্রস্তুত পিষ্টকাদিও তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইত না। উদারস্বভাব মফজ্জল হক্ সাদরে এই সমস্ত গ্রহণ করিতেন। শ্বশুর অথবা শ্যালক কোন দ্রব্যসামগ্রী লইয়া মনিবকে দিতে আসিয়াছে জানিতে পারিলেই, নবিবক্‌স বাসা হইতে নিরুদ্দেশ হইত, এবং যত ক্ষণ না তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যাইত, তত ক্ষণ মফজ্জল হক বা তাঁহার অন্য ভৃত্যগণ কোন মতেই নবিবক্‌সের সন্ধান পাইত না।

৩

সহসা নবিবক্‌সের শ্বশুরের সহিত ভূস্বামীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নবিবক্‌সের শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের এক মুসলমানই মফজ্জল হকের তহশীলদার ছিল। সে সৎপ্রকৃতির লোক ছিল না। প্রজার নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া সে নিজে আত্মসাৎ করিয়াছিল। মিঞা সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেন, এবং গ্রামান্তরের অন্য একটি লোককে তহশীলদার নিযুক্ত করেন। এই সময়ে অনেকগুলি প্রজার নামে তাঁহাকে বাকি খাজনার নালিস করিতে হয়। কর্ম্মচ্যুত তহশীলদারের গ্রামে বেশ প্রভুত্ব ছিল। সে প্রজাগণকে বুঝাইয়া দিল যে, মনিবই টাকা পাইয়া এখন

তাহা অস্বীকার করিতেছেন। গ্রামের অন্যান্য সমস্ত প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে এক দল বাঁধিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক নবিবক্‌সের শ্বশুরকে তাহাদের দলে মিশিতে হইল। গ্রামের সমস্ত প্রজা জমিদারের খাজনা বন্ধ করিল, এবং নূতন তহশীলদার গ্রামে আসিলেই তাহার প্রতি অত্যাচার করিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিল। নবিবক্‌সের উভয় সঙ্কট। এক দিকে তরুণী পত্নীর কথা মনে হইলেই তাহার শ্বশুরবাড়ী যাইবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়া উঠে; কিন্তু অন্য দিকে সে তৎক্ষণাৎ ভাবে যে, তাহার শ্বশুর এখন তাহার পিতার ন্যায় প্রতিপালক প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। প্রজাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইবার পরে দু'চারি দিনের মধ্যে নবিবক্‌স তাহার শ্বশুরবাড়ীর নামও মুখে আনিল না। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মিঞা সাহেব নিজের জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই আর শ্বশুরবাড়ীতে যাস্ না কেন? নবিবক্‌স কহিল, আমি ও বিবাহের কথাই ভুলিয়া যাইব। মিঞা কহিলেন, তোর শ্বশুরই যেন গ্রামের লোকের সহিত আমার বিরুদ্ধে যোট্ বাঁধিয়াছে, তার কন্যা কি অপরাধ করিল? তুই শ্বশুরবাড়ী যা। যতদিন তারা না তোর উপর কোনও অত্যাচার করে, ততদিন তুই পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত করবি। নবিবক্‌স দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনতমুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৪

দু'চারি দিনের মধ্যেই তাহার শ্বশুর শ্যালক এবং অন্যান্য সম্পর্কিত লোক নবিবক্‌সকে হাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রভুর বিরুদ্ধাচার করিতে হইবে, এই প্রস্তাব শুনিয়া নবিবক্‌স প্রথম দিন আহতফণ সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং কহিল, কাল হইতে আর তোমরা আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। তাহার শ্যালকেরা একটু নরম হইয়া বলিল, আমরা তোমার মন বুঝিবার জন্য ঐরূপ কহিয়াছিলাম; তুমি যেমন আসিতেছ আসিও, আমরা তোমার সাহায্যপ্রার্থী নহি। নবিবক্‌স তাহাদের কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিল, এবং তৎপরদিনও পুনরায় শ্বশুরবাড়ীতে আসিল। সেই দিন রাত্রে তাহার প্রতি বড় কঠিন ঔষধ প্রযুক্ত হইল। এবার শ্বশুর কিংবা শ্যালক নহে, নবিবক্‌সের তরুণী ভার্য্যা স্বয়ং ঔষধ প্রয়োগ করিল। যুবকের কর্ণে যুবতী স্ত্রীর অনুরোধ কিরূপ ফলপ্রদায়ক, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। নবিবকসের স্ত্রী এমন সাজাইয়া গুছাইয়া আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিল, এমন ভাবে যুবক পুরুষকে মোহের ফাঁদে ফেলিল যে, নবিবকস প্রথমতঃ তাহার প্রস্তাব

ক্রোধের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেও, অল্পক্ষণেই সুর নরম করিয়া আনিল,এবং স্ত্রীকে বুঝাইতে লাগিল। এমন নিমকহারামী কাজ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী এইবার কান্নার ধুয়া ধরিল, এবং কহিল, আমাকে কিছুমাত্র ভালবাসিলেও তুমি এমন কথা বলিতে পারিতে না। তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না ; কেবল তুমি সন্ধানটি বলিয়া দিবে,আর গ্রামের লোকদিগকে সামান্য সাহায্য করিবে, ইহাতে ভয় পাইতেছ কেন ? নবিবক্স পুনরায় তর্ক আরম্ভ করিল। কিন্তু স্ত্রীর সহিত বাক্‌যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজসাধ্য নহে। অনেক সময়েই "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" জানিয়াও অনেক শিক্ষিত এবং গঠিতচরিত্র লোকও সেই বুদ্ধির কাছে হার মানিয়া থাকেন, অশিক্ষিত নবিবক্স কোন্ ছার ? রাত্রিশেষে সে স্ত্রীর প্রস্তাবে প্রায় নিম্‌রাজী হইয়া শয্যাত্যাগ করিল।

৫

পরদিন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ আর শ্বশুরবাড়ীতে যাইব না। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে মিঞা সাহেবই যেন তাহার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। সন্ধ্যাসমাগমেই নবিবক্‌সের নিজের মন দোলায়মান হইয়া আসিতেছিল। মফজ্জল হক্ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই শ্বশুরবাড়ী গেলি না ? অমনই সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং শ্বশুরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, আমি ইচ্ছা করিয়া যোগ না দিলে কাহার সাধ্য আমার দ্বারা অন্যায় কার্য্য করায় ? সে জানিত না যে, আজ তাহার জন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা অতি কঠিন ফাঁদ পাতা হইয়াছে। আহারান্তে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া নবিবক্‌স দেখিল, আজ তাহার স্ত্রী অভিনব সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মনোহারিণী মূর্ত্তিতে তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। নবিবক্‌স দরিদ্র হইলেও প্রভুর অনুগ্রহে মূল্যবান আতর গোলাপ প্রভৃতির ব্যবহার জানিত, এবং সময়ে সময়ে সে স্ত্রীকে এই সমস্ত দ্রব্য উপহার দিত। স্ত্রী আজ সেই সমস্ত ব্যবহার করিয়া পরীর ন্যায় শয়নগৃহে দাঁড়াইয়া ছিল। নবিবক্‌স তাহার দিকে অগ্রসর হইলেই সে কহিল, আমার কাছে আসিও না, যদি আমার কথা রাখ তবেই এস। নয় ত যাও। নবিবক্‌স ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিল। তরুণী তাহার দিকে এক বিষময় কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তবে আমি চলিলাম। ইহাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইল। পতঙ্গ বহ্নিমুখে ঝাঁপ দিল। নবিবক্‌স জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল।

কহিল, বল, আমাকে কি করিতে হইবে। রমণী শিক্ষামত উত্তর করিল, গ্রামের কয়েক জন লোক তোমার সঙ্গে যাইবে। তুমি সন্ধান বলিয়া দিবে, উহারা তোমার মনিবের গৃহ হইতে তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া কতকগুলি ছাপানো দাখিলার সাদা ফারম্ চুরি করিয়া আনিবে। ঐ ফারম্ কোন ঘরে কোথায় আছে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জানো। নবিবক্স সম্মত হইল।

ধন্য মশারির বক্তৃতার ক্ষমতা! নবিবক্সের শ্বশুরালয়ে মশারি ছিল কি না, আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাহার প্রতি যে মশারি-বক্তৃতার শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬

নবিবক্স্ মফজ্জল হক মিঞার বাসার সমস্ত সন্ধানই জানিত। একটা বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে মিঞা সাহেবের একটি ছোট হাতবাক্স থাকিত। ইহারই মধ্যে টাকা কড়ি প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ ও ছাপানো দাখিলার ফরম্ ছিল। বড় বাক্সের চাবি যেখানে থাকিত, নবিবক্স তাহাও জানিত। গ্রামের দু'তিন জন লোকের সঙ্গে নবিবক্স সেই অন্ধকার রাত্রিতে আপনার অন্নদাতা প্রভুর অনিষ্টসাধন করিতে যাত্রা করিল। আকাশে মেঘ ছিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাইতেছিল। বিদ্যুৎ স্বর্গের আলোক। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে নবিবক্সের পাপসঙ্কল্পময় হৃদয় চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। আলোক দেখিলেই সে ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিল, এমন কাজ কখনই করিব না। কিন্তু দুর্বৃত্ত সহচরেরা তাহাকে যেন অন্ধের ন্যায় চালাইয়া লইয়া গেল, আর স্ত্রীর মূর্ত্তি মনে হইবামাত্রই তাহার সাধু সঙ্কল্প ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এ দিকে আকাশে মেঘের জমাট বাঁধিয়া আসিল। বিদ্যুৎ থামিয়া গেল। নবিবক্স ও তাহার সঙ্গিগণ আপনাদের সংকল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হইল। খ্রীষ্টানধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, মানবের আদিপুরুষ আদম তাঁহার স্ত্রী হবা কর্ত্তৃকই প্রথমতঃ পাপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাহারই অনুরোধে মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশলঙ্ঘন করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। নবিবক্স স্ত্রীর কথায় সামান্য মানব প্রভুর অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইবে, ইহা বিচিত্র কি?

রাত্রি দুই প্রহরের পর মফজ্জলহক্ মিঞার বাসায় চোর চোর বলিয়া একটা রব উঠিল। মিঞাসাহেবের বাসার অতিনিকটে মেদিনীপুর পুলিসের কোর্টসবইনস্পেক্টরের বাসা। সেই বাসাতে এক জন কনষ্টেবল শুইয়া থাকিত। চোর চোর চীৎকার শুনিয়াই সে জাগিয়া উঠিল, এবং তাহাদের বাসার উত্তর

দিকে জঙ্গলের নিকট একটা শব্দ শুনিতে পাইল। কনষ্টেবল সেই দিকে দৌড়াইল, এবং দেখিতে পাইল, তিনটি লোক একটি ছোট হাতবাক্স ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র ছু'টি লোক দৌড়াইয়া পলাইল। তৃতীয় ব্যক্তি ধরা পড়িল। ইহারা কেহই ব্যবসায়ী চোর নহে। বাক্সটি লইয়া দৌড়িয়া পলাইলে হয় ত তাহারা কেহই ধরা পড়িত না। কিন্তু সে বুদ্ধি তাহাদের আসে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, এই জঙ্গলে বসিয়া বাক্সটি ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া যাইবে। গ্রামের ছু'টি লোক দৌড়াইয়া গিয়াছিল। নবিবক্স সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচা বলিয়া পুলিসের হাতে ধরা পড়িল।

৭

মোকদ্দমা হইতে অধিক সময় লাগিল না। পর দিন প্রভাতেই নবিবক্স হাজতে প্রেরিত হইল, এবং তৎপরদিন সে বিচারালয়ে নীত হইল। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার নিকট হইতে তাহার সঙ্গী অন্য ছুইটি আসামীর নাম বাহির করিতে পারিলেন না। নবিবক্স কেবলই বলিতে লাগিল, সমস্ত অপরাধই আমার। আমি সন্ধান না দিলে তাহাদের সাধ্য কি যে, আমার মনিবের অনিষ্ট করে? পুলিস অগত্যা তাহাকেই চালান দিলেন।

বিচারক এক জন বাঙ্গালী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। তিনি মকজ্জল হক মিঞাকে জানিতেন। মিঞা সাহেবের এক জন ভৃত্য পুলিসে এজাহার দিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহার জবানবন্দী গৃহীত হইল। নবিবক্স মাথা হেঁট করিয়া কাট্‌-গড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, চেহারা ঠিক উন্মত্তের ন্যায়। সাক্ষীর পরীক্ষা শেষ হইলে হাকিম আসামীকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিবে? নবিবক্স অতি কষ্টে উত্তর করিল, "হুজুর, না।" দ্বিতীয় সাক্ষী মিঞাসাহেব স্বয়ং। তাঁহার নাম ডাক হইবামাত্রই আসামী অজ্ঞান অবস্থায় কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িল। কোর্টের কন্‌ষ্টেবল্ তাহাকে উঠাইয়া তাহার মস্তকে ও চক্ষে জল দিল। সে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে মিঞাসাহেব আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলেন। নবিবক্সের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি বিচারকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, হুজুর! আমি এ মোকদ্দমা চালাইতে চাহি না। ধর্ম্মাবতার দয়া করিয়া আসামীকে নিষ্কৃতি দিন। বিচারক কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই আসামী ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল,—হুজুর, আমাকে ফাঁসী দিন। ফাঁসী হইলেও আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। হাকিম বলিলেন, এ মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে

ইহা ছাড়িয়া দিবার মোকদ্দমাও নহে, * ফাঁসীর মোকদ্দমাও নহে। মিঞাসাহেবকে কহিলেন, আপনি হলফ করুন। নবিবক্‌স বলিয়া উঠিল, হুজুর! উঁহাকে হলফ করিতে হইবে না। আমি যাহা যাহা করিয়াছি, সমস্ত বলিয়া যাইতেছি। আর বাদীই ত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। ধর্ম্মাবতার! দয়া করিয়া আমাকে একবার মিঞার কাছে যাইতে অনুমতি দিন। হাকিম অনুমতি দিলে এক জন কনষ্টেবল আসামীকে কাঠগড়া হইতে আনিয়া মিঞার নিকটে দাঁড় করাইল। নবিবক্‌স ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর পাদুকা চুম্বন করিল, এবং পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না। মিঞাসাহেব কহিতে লাগিলেন, আমি তোকে ক্ষমা করিয়াছি। হাকিমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হুজুর ওকে ছাড়িয়া দিন ও কেবল মানুষের পরামর্শে পড়িয়া এমন কর্ম্ম করিয়াছে। আসামী জেদ করিতে লাগিল, হুজুর! আমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া দিন। আমি এমন মনিবের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমার এই গায়ের কাপড় পায়ের জুতা যাহা কিছু সকলই এই মনিবের দেওয়া। অনেক বাপেও পুত্রকে এত ভালবাসে না। এক দিন একটা ধমক্ খাই নাই,—" মিঞা সাহেবের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি হাকিমের নিকট শেষ প্রার্থনা করিয়া অতিশয় বিনয় অথচ আবেগের সহিত কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! দয়া করিয়া ইহাকে যে দণ্ড ইচ্ছা দিয়া দিন, আমি ইহার দণ্ডের জন্য প্রার্থী নহি। আসামী ফরিয়াদীর ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রই বিচলিত হইলেন। এক দিকে অকৃত্রিম অনুতাপ ও মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা, অন্য দিকে উদার ক্ষমা ও অসীম সহানুভূতি। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। হাকিম স্বয়ং রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। তিনিও ত মানুষ। সকলেই মিঞাসাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, আর কহিতে লাগিল, "যেমন বংশে জন্ম, তাহারই উপযুক্ত মহত্ত্ব।" এক জন বৃদ্ধ ব্যবহারাজীবী হাকিমকে কহিলেন, "হুজুর এ মোকদ্দমায় কেবল আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসামীর প্রতি সামান্য দণ্ডবিধান হয়, ইহা আমাদের সকলেরই প্রার্থনা। বিচারক এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি আসামীর প্রতি এক দিন কারাবাস ও কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া মোকদ্দমা

* ১৮৯৮ সালের নূতন কার্য্যবিধি আইনে ৫৬২ ধারায় এইরূপ অপরাধীকে প্রথম অপরাধে কেবল সচ্চরিত্রতার জামিন মুচলিকা লইয়া ছাড়িয়া দিবার বিধান হইয়াছে। পূর্ব্বে এমন বিধান ছিল না। আইনের একটি অভাব পূর্ণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শেষ করিলেন। অর্থদণ্ড মিঞাসাহেব কর্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল। নবিবক্স সেই দিনই মুক্তিলাভ করিল। তাহার মানসিক লজ্জা ও অনুতাপ কারাদণ্ড অপেক্ষা অধিকতর কঠোর বোধ হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে তাহাকে মিঞাসাহেবের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। "আমি হারাম, এমন পীরের কাছে আর যাইব না" বলিয়া নবিবক্স পুনঃপুনঃ কাতরভাবে রোদন করিয়াছিল।

উপসংহার।

নবিবক্সের শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের দুই চারি জন প্রজা কাছারীতে এই মোকদ্দমা দেখিতে আসিয়াছিল। নবিবক্সের সঙ্গী দু' জন চোরও কাছারীর নিকটেই ছিল। নবিবক্স ও তাহার মনিবের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা সকলেই বিস্মিত হইল। সেই দিনই তাহারা গ্রামে যাইয়া সকলে একত্র হইল; কিন্তু কর্ম্মচ্যুত তহশীলদারকে ডাকিল না। যে দুটি লোক নবিবক্সের সঙ্গে চুরি করিতে আসিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে তাহারাই কিছু গুণ্ডা গোছের যুবক। নবিবক্স তাহাদের নাম করে নাই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। মনিবের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা একবারেই সিদ্ধান্ত করিল, এমন মনিব কখনই আমাদের সর্ব্বনাশ করে নাই। যত কারসাজি এই তহশীলদারের। ও কেমন করিয়া গ্রামে থাকে, আমরা দেখিব। মনিবের সহিত বিবাদনিষ্পত্তি করে ভালই, নচেৎ আজই উহার ঘর পোড়াইয়া দিব। আমরা এখনই যাইয়া মনিবের পায়ে পড়িব। চাষার সিদ্ধান্ত একবার ঠিক হইলে আর কথা নাই। সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে তাহারা দলে দলে মিঞাসাহেবের বাসায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "না বুঝিয়া আমরা এমন জমিদারের সহিত কলহ করিয়াছি। প্রজা সন্তান। অবোধ সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।" মিঞাসাহেব সকলকেই অভয় দিলেন। প্রজার সহিত তাঁহার বিবাদ মিটিয়া গেল। অসৎ তহশীলদারের প্রতি কি ব্যবস্থা হইল, তাহা জানিবার জন্য পাঠক নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন নহেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

বিলাতের সংবাদপত্র।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের ইতিহাস ইতি-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মান্দ্রাজ রিভিউ নামক মাসিকপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে জানিবার ও কৌতূহল-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বিষয় অনেক আছে, এ কারণ আমরা প্রবন্ধটির সার-সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

স্পেনের রাজা আর্ম্মাডার সাহায্যে ইংলণ্ড জয় করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সেই সময়ে যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনাবলী ইংলণ্ডকে স্পেনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই সমস্ত ঘটনাবলীকে ইংলণ্ডে সংবাদপত্র-প্রচলনের কারণ বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড বার্লে স্পেন কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-আক্রমণ-বিষয়ে ইংরাজ-সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রথমে সংবাদপত্রের প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতদ্বৈধ আছে; কিন্তু ১৬২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Weekly Notes নামক পত্র যে ইংলণ্ডে প্রথম প্রচারিত সংবাদপত্র, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এই সময়ে 'সংবাদ-লেখক' নামক এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হন। তাঁহারা সেই সময়কার জ্ঞাতব্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া পাঠোপযোগী ভাষায় গ্রথিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রভুদিগের চিত্ত-বিনোদনার্থে নিয়মমত প্রেরণ করিতেন; এবং ইংলণ্ডের তদানীন্তন বিশিষ্ট ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ ও গ্রাম্য জমিদারগণ সংবাদ-লেখক সম্প্রদায়ের প্রতিপালন করিতেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব বজায় ছিল; এবং যাঁহারা প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাঁহাদিগকে এই সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। সংবাদপত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইত, এই কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংবাদপত্রের প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শন করিতেন। Weekly Notes নামক সংবাদপত্রের প্রকাশক ন্যাথানিয়েল বাটলার, সংবাদলেখক ও সংবাদপত্র-প্রকাশক উভয়ের কার্য্যই করিতেন; এই কারণে Weekly Notes প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভ করিতে সমর্থ হয়। Civil Warsএর সময়ে ও ক্রমওয়েলের শাসনাধীনে সংবাদপত্রের উন্নতি হয়; কিন্তু দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে সংবাদপত্রের অবনতি হয়। ষ্টার চেম্বারের অনুমতি ব্যতীত কেহ সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিতেন না ও ষ্টার চেম্বার সহজে কাহাকেও অনুমতি প্রদান করিতেন না; এতদ্ভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। তখনকার লোকের মনে সংবাদপত্র পাঠ করিবার প্রবৃত্তি বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; রাজবিধি এ প্রবৃত্তির বেগরোধ করিতে পারিল না। গভর্মেণ্ট দেখিয়া শুনিয়া ১৬৬২ খৃঃ অব্দে সার রজার লেস্‌ট্রেঞ্জের সম্পাদকত্বাধীনে Intelligencer নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের

সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্ঞী য়্যানের রাজত্বকাল সাহিত্যালোচনার জন্য সুবিখ্যাত, এবং তাঁহারই রাজত্বকালে ইংলণ্ডে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের নাম The Daily Courant এবং ইহা ১৭০২ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়; কিন্তু এই সংবাদপত্রে রাজনীতি আলোচিত হইত না। এই সময়ে কোনও সম্পাদক রাজনীতির আলোচনা করিতে সাহসী হইতেন না। সুপ্রসিদ্ধ 'রবিন্সন ক্রুসো'নামক গ্রন্থের লেখক ডানিয়েল ডিফো এই রাজবিধি অমান্য করেন ও এই নিমিত্ত তাঁহার কর্ণচ্ছেদন করা হয়; কিন্তু এই ঘটনাফলে ইংলণ্ডের লোক রাজনীতি আলোচনা করিবার অধিকার লাভ করে। ১৭২৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ কৌশলপূর্ব্বক এই বিধির লঙ্ঘন করিতেন; তাঁহারা হাউস অফ্ কমন্সে গিয়া বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেন, এবং কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে অন্য সকল বিষয়ের প্রসঙ্গে সেগুলি সংবাদপত্রে সন্নিবিষ্ট করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার ডাক্তার সামুয়েল জনসন এই কার্য্য অতীব সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন। একালেও হাউস অফ্ কমন্সের বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা আইনতঃ অন্যায়; কিন্তু সে বিধি কেহই গ্রাহ্য করে না। সুবিখ্যাত জন উইল্কজ ১৭৬২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে North Briton সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন; লর্ড নিউটের শাসন-সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; এই সংবাদপত্রে সর্ব্বপ্রথমে রাজার বক্তৃতার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের ৪৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিষয়ের জন্য গভর্মেণ্ট ওয়ারেণ্ট বাহির করেন; উইলকজ এই ওয়ারেণ্টের বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করেন। আদালতে তাঁহার জয় হয়। চিফ জষ্টিস প্রডাষ্ট রায়ের মধ্যে লিখিয়াছিলেন যে, "নামহীন ওয়ারেণ্টের সাহায্যে সাক্ষ্য-সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে কোনও লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করা Spanish Inquisition অপেক্ষাও ঘোরতর অত্যাচার, এবং এই প্রকার আইনের অধীনে কোনও ইংরাজ এক ঘণ্টার জন্যও বাস করিতে ইচ্ছুক হইবে না; এই প্রকার কার্য্য প্রজার স্বাধীনতার উপর অসমসাহসিক ও প্রকাশ্য আক্রমণ; Magna Chartaর ২৯শ পরিচ্ছেদে অনিয়মিত ক্ষমতা-চালন অন্যায় বলিয়া বর্ণিত আছে,এই কার্য্য সেই বিধি অতিক্রম করিয়াছে।" এবং এই জন্য উইল্কজ এক হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাইবেন, বিচারক ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন।

Public Advertiser সংবাদপত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ, এই সংবাদপত্রে সুপ্রসিদ্ধ 'জুনিয়াসের' পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জুনিয়াস' কে, এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই; কিন্তু 'জুনিয়াসে'র পত্রাবলী ইংলণ্ডের রাজা, আভিজাত-সম্প্রদায় ও প্রজাসাধারণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সংবাদপত্রে পত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষের উপর হইয়াছিল। ১৭৬৯ সালে The Morning Chronicle প্রকাশিত হয়; এই সংবাদপত্র Public Advertiserর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। এই সংবাদপত্রে পার্লামেণ্টের বাদানুবাদ অতীব সুন্দররূপে বর্ণিত হইত। জন প্যারী এই সংবাদপত্রের স্থাপয়িতা। এই পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদকের

নাম জন ব্ল্যাক; সুপ্রসিদ্ধ ম্যাকিণ্টস কোল্‌রিজ, পার্থনা হ্যাজলিট ও জন ক্যাম্বল এই সংবাদ-পত্রে রীতিমত লিখিতেন। জন ব্ল্যাক সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'ইংলণ্ডের লোকের মধ্যে কেবল আপনি ভুলিয়া যান যে, আমি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী; কই আপনি আমার নিকট এ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই!' ব্ল্যাক এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'আমি অনুগ্রহের প্রার্থনা করি না, পৃথিবীতে কাহারও নিকট আমি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি না, আপনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, আমি 'মর্ণিং ক্রনিকলের' সম্পাদক, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান লোকের সহিত আমি পদপরিবর্ত্তন করিতে চাহি না; এমন কি, আপনার সহিত পদপরিবর্ত্তন করিতেও আমি সম্মত নহি।'

প্রসিদ্ধ টাইম্‌স (Times) সংবাদপত্র পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী; ইহার ইতিহাস দেওয়া কর্ত্তব্য। জন ওয়াণ্টার নামক কোন কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান ও শ্রমপটু ব্যক্তি ১৭৮২ খৃঃ অব্দে এই সংবাদপত্রের প্রকাশ করেন। ১৮১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন; তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জন ওয়াণ্টার সম্পাদক হন। ডাক্তার ষ্টডার্ড ইহার প্রথম বেতনভোগী সম্পাদক। ষ্টডার্ড অবসর গ্রহণ করিলে, প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকার মিষ্টার রবার্টকে বাৎসরিক ত্রিশ সহস্র টাকা বেতনে সম্পাদক করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং টমস বার্ণস্‌ নামক এক ব্যক্তিকে সম্পাদক করা হয়। জন ওয়াণ্টার সর্ব্বপ্রথমে বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে টাইম্‌স মুদ্রিত করেন, এবং এই ঘটনার দ্বারা টাইম্‌স্‌ প্রসিদ্ধি ও প্রভাব লাভ করে। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ২৭শে নভেম্বর তারিখে টাইমস সর্ব্বপ্রথমে প্রুসিয়ান স্যাক্‌সনির সামান্য কৃষকের পুত্র ফ্রেডারিক কোয়িং কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত হয়। টাইম্‌স সংবাদপত্র যে রূপে এখন সম্পাদিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত কৌতূহলপ্রদ। ইহার বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক সম্পাদক আছেন; ধর্ম্মসম্বন্ধে লিখিবার জন্য এক জন লেখক, কৃষিলেখক, কলাবিদ্যার সমালোচক, যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য পাঁচ জন সমরজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমিতি, নৌ-সমিতি, ভৌগোলিক লেখক এবং নাটকের বড় সমালোচক, দেওয়ানী আদালতের মকদ্দমা বিবৃত করিবার জন্য ১৮ জন রিপোর্টার, একসাইজের জন্য ৮ জন রিপোর্টার, এবং পুলিশকোর্টের জন্য ১৭ জন রিপোর্টার। লণ্ডন সহরকে ১১টি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক জন রিপোর্টার আছে। এতদ্ভিন্ন, শ্রমজীবী-দিগের জন্য রিপোর্টার, ক্রিকেট ক্রীড়ার রিপোর্টার, গল্‌ফ্‌ ও ফুটবল খেলার রিপোর্টার, ঘোড়দৌড়ের জন্য দুই জন রিপোর্টার, এবং বাচ খেলার রিপোর্টার আছেন। অগ্নিকাণ্ড বিবৃত করিবার জন্য লেখক, রেলওয়ের লেখক এবং জ্যোতিষসম্বন্ধীয় লেখকও আছেন। পার্লামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচন করিবার জন্য গ্রেটব্রিটেনকে ৬৭০ কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রত্যেক কেন্দ্রে টাইম্‌সের এক জন প্রতিনিধি আছেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের প্রধান প্রধান সহরে টাইম্‌সের নিজের সংবাদদাতা বর্ত্তমান।

ঐতিহাসিক কাগজপত্র।

খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন-পূর্ব্বক মোসলমানদিগের শাসনশৃঙ্খল হইতে হিন্দুসমাজকে মুক্ত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার আভাস আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রপতিগণের শাসনব্যবস্থা ও প্রজাপালনী নীতি কিরূপ ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলীর প্রযত্নে, পেশওয়েদিগের ও মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার, জাইগীরদার ও সামন্তবর্গের বংশধরগণের দপ্তর হইতে ও অন্যান্য সূত্রে যে বিবিধ ঐতিহাসিক কাগজপত্রের সংগ্রহ ও প্রকাশ হইতেছে, তাহার বিবরণও সময়ে সময়ে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সংপ্রতি এই সকল দেশীয় ঐতিহাসিক উপকরণের স্বরূপ-যোগ্যতা কিরূপ, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আমরা কয়েকটি মূল কাগজপত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

কন্যা-বিক্রয়-নিষেধ।

জঘন্য কন্যাবিক্রয়-প্রথা রহিত করিবার জন্য মহারাষ্ট্রপতিগণ কিরূপ শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত তিনটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। পত্রগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি আশ্চর্য্যরূপে জনৈক গন্ধবণিকের গৃহে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পত্রাঙ্কিত রাজমুদ্রা ও হস্তাক্ষরাদির প্রতি মনোযোগ করিলে পত্রগুলি কৃত্রিম বা মূলের অনুলিপি বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথম পত্রে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের আদেশ ও পরবর্ত্তী পত্রদ্বয়ে রাজাদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হইত, তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। পত্রগুলি ১৮১১ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

(প্রথম পত্র)

"শ্রী॥

"বেদমূর্ত্তি, রাজশ্রী ধর্ম্মাধিকারী, জোশী, (১) উপাধ্যায় ও সমস্ত

(১) সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে বেদচর্চ্চাপ্রধান মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাপি "বেদমূর্ত্তি" পাঠ লিখিত হইয়া থাকে।

"রাজশ্রিয়া বিরাজিত" এই সংস্কৃত বিশেষণটি সংক্ষেপে "রাজশ্রী" রূপে লিখিত হয়।

জোশী—জ্যোতিষী। ইঁহারা এ দেশীয় গ্রহবিপ্রের সমস্ত কার্য্য করেন; কিন্তু এ দেশের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অবর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন না।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী, সাং নেওয়াসে (২) প্রভৃতি মহাল, গোসাঁই (৩) মহোদয়েষু—

"সেবক (৪) রাজীরাও রঘুনাথ প্রধানের নমস্কার। সুরুসন ইসনে অশর ময়াতেন ব অলফ (৫), ব্রাহ্মণসমাজে কেহ যেন বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যার নিষ্ক্রয়স্বরূপ ধন বা ঋণস্বরূপ কোনও প্রকারে অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া কন্যাদান করে,এই আদেশ আপনাদিগকে ও ঐ পরগণার দেশমুখ, দেশপাণ্ডে পাটিল, কুলকরণী (৬) ও মহাজন-প্রভৃতিদিগকে জ্ঞাপন করিবার জন্য পরগণামজকুরের মামলেদার (৭) রাজশ্রী লক্ষ্মণ আপ্পাজী মহাশয়ের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে। তিনিও সকলের নিকট তাহা ঘোষণা করিবেন। তাঁহার ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর, যদি কেহ কন্যার দান-পূর্ব্বক বরপক্ষ হইতে নগদ টাকা কড়ি বা ঋণস্বরূপ ধন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে সংবাদ বিবাহের অব্যবহিত পরে, বরপক্ষকে ও মধ্যস্থকে (ঘটককে) রাজ-সরকারে পরগণা মজকুরের মামলেদারের নিকট জানাইতে হইবে। সে সংবাদ পাইবামাত্র মামলেদার ঐ বিষয়ে তদন্ত করিয়া বরপক্ষ হইতে প্রাপ্ত অর্থ প্রত্য-র্পণ করিতে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করিবেন এবং কন্যাপক্ষ শুক্রবিক্রয় করিয়া যত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তত টাকা তাঁহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ আদায় করিবেন। মধ্যস্থ টাকা লইয়া থাকিলে, তাহা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি বরপক্ষ ও মধ্যস্থেরা এইরূপ বিবাহের বিষয় কর্তৃ-

---

(২) নেওয়াসে—অহম্মদনগরের উত্তরে গোদাবরী তীরে অবস্থিত।

(৩) সদাচারপরায়ণ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগকে মহারাষ্ট্রদেশে "গোঁসাই" বলিয়া বিশে-ষিত করা হয়।

(৪) যাঁহাদিগের নামে এই আদেশ-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ; এই কারণে স্বয়ং ব্রাহ্মণ ও মহারাষ্ট্রপতি হইয়াও বাজীরাও আপনার সম্বন্ধে "সেবক" পাঠের প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যান্য পেশওয়েগণও এইরূপ পাঠ লিখিতেন।

(৫) অর্থাৎ সুরু সন ১২১২। এই আরবী সন দাক্ষিণাত্যে কৃষকসমাজে বহুল প্রচ-লিত। জুন মাসের প্রারম্ভে সূর্য্য মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন করিলে এই বর্ষের আরম্ভ হয়। মহম্মদ তঘলক বোধ হয় এই অব্দের প্রবর্ত্তক। সুরু সনে ৫৯৯ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই আদেশ-পত্র প্রচারিত হয়।

(৬) দেশমুখ—পরগণার শাসক প্রধান কর্ম্মচারী। দেশপাণ্ডে—দেশমুখের অধীন মহালের কার্য্যপরিদর্শক কর্ম্মচারী। পাটিল—গ্রামরক্ষক। কুলকরণী—গ্রামলেখক।

(৭) মামলেদার—তালুকের শাসক ও রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্ম্মচারী।

পক্ষকে জ্ঞাপন করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করে, এবং রাজকর্ম্মচারীরা যদি অন্য-সূত্রে তাহা অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে কন্যাপক্ষের ন্যায় বরপক্ষ ও মধ্যস্থও দণ্ডভাজন হইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে মামলেদার মহাশয় কন্যাপক্ষকে পূর্ব্বকথিতরূপে দণ্ডিত করিয়া বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যাপক্ষের প্রদত্ত দণ্ডের দ্বিগুণ এবং মধ্যস্থের নিকট হইতে, তিনি যত অর্থ পাইয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড আদায় করিবেন। পরগণা মজকুরের মামলেদারকে এ বিষয়ে যথোচিত ক্ষমতাপ্রদানার্থ স্বতন্ত্র সনন্দ পত্র দেওয়া হইয়াছে। আপনাদিগকে এই পত্র দ্বারা তাহা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। অতএব বরপক্ষের নিকট হইতে নিষ্ক্রয় বা ঋণস্বরূপে অর্থ গ্রহণ না করিয়া অতঃপর সকলে কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের কেহ কন্যার বিবাহকালে বরপক্ষের নিকট হইতে নিষ্ক্রয় বা ঋণ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত রাজাদেশ অনুসারে মামলেদার কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ ও মধ্যস্থকে দণ্ডিত করিতে পারিবেন। ইহা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা গেল। তারিখ ২২শে জমাদিলাওয়ল।

আজ্ঞানুসারে

(লেখনসীমা) (৮)।"

(২য় পত্র)

"শ্রীরামপ্রসন্ন ॥

বেদমূর্ত্তি রাজশ্রী "ভীমভট দাতে" সাং ওয়াঈ (৯) পরগণা পূজ্যপাদেষু—

সেবক পরশুরাম খণ্ডেরাও (১০) সুভেদার (পরগণা ওয়াঈ) নমস্কার, নিবেদন—আপনি বর্ত্তমান বর্ষে কন্যার বিবাহকালে বিনিময়স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া রোকা (সমন) দ্বারা আপনাকে (এখানে) আনা হইয়াছিল। তাহার পর তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, আপনি কন্যাবিক্রয় পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে আপনাকে এই অব্যাহতিপত্র দেওয়া গেল। অতঃপর এ সম্বন্ধে আপনাকে আর কেহ

---

(৮) এই স্থানে লেখন-সীমা-বোধক রাজমুদ্রা অঙ্কিত আছে।

(৯) ওয়াঈ প্রদেশ সাতারা জেলার অন্তর্গত ও কৃষ্ণাতীরে অবস্থিত।

(১০) পরশরাম—পরশুরাম শব্দের প্রচলিত রূপ। খণ্ডেরাও—'খণ্ড' অর্থে তরবারি; শিবের অসিধারী মূর্ত্তি খণ্ডেরাও বা খণ্ডোবা নামে মহারাষ্ট্রে পূজিত হয়। এ স্থলে দেবনামানুসারে মানবের নামকরণ হইয়াছে।

উত্যক্ত করিতে পারিবে না। আপনি স্নানাহ্নিক অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাসুখে কালহরণ করুন। তাং ১৫ই জমাদিলাখর, সন সল্লাস আশর মৈয়াতন। (১২১৩ বা ১৮১২ খৃঃ) অধিক লেখা বাহুল্য, নিবেদন ইতি।"

(৩য় পত্র)

"শ্রী॥

শ্রীমন্ত রাজশ্রী বাবাসাহেব মহোদয়েষু—

আশ্রিত ত্রিম্বক জোশী কালে-র বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ। নিবেদন এই যে, আমি স্বীয় বিবাহকালে আমার শ্বশুর তীর্থস্বরূপ (পূজনীয়) রাজশ্রী গোপাল পন্ত রাজওয়াড়ে মহাশয়কে ছয় শত টাকা দিয়াছিলাম। তাহা আমাকে প্রত্যর্পিত করিবার জন্য সরকার হইতে শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি আদেশ হইয়াছিল। তদনুসারে তাঁহার নিকট হইতে আমি উল্লিখিত ছয় শত টাকা ফিরিয়া পাইলাম। তাঁহার নিকট আমার বিবাহ-সংক্রান্ত আর কোনও প্রকার প্রাপ্য রহিল না। মিতি (১১) ভাদ্রপদ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শকে ১৭৩৪ অঙ্গিরা নাম সংবৎসরে। অধিক কি লিখিব, নিবেদন ইতি।

(এই প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আমার) স্বহস্তাক্ষরে লিখিত। উল্লিখিত টাকা মোর দীক্ষিত ও চিন্তোপন্ত (১২) দেশমুখ, ইঁহাদিগের সমক্ষে প্রাপ্ত হইলাম। মিতি পূর্ব্বোল্লিখিত।

সাক্ষী

১। ধোণ্ডো পরশরাম।

মেঘঃশাম শাস্ত্রী পরর্ণীকর।"

(৪র্থ পত্র)

সংস্কৃত পত্র।

নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানি পেশওয়েগণের চিঠিনবীসের বংশধর রাজশ্রী ত্রিম্বকরাও জীবনরাও চিটনবীসের দপ্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

---

(১১) এই সময়-পরিমাণবোধক "মিতি" শব্দ আরবী "তারিখ" শব্দের পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১২) মোর দীক্ষিত=ময়ূরেশ্বর দীক্ষিত। চিন্তোপন্ত=চিন্তামণি পণ্ডিত। সেইরূপ ধোণ্ডো=ঢুণ্ঢিরাজ।

ইহা উদয়পুরের রাণা ভীম সিংহকে "সওয়াই মাধব রাও" বা মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়ে কর্ত্তৃক লিখিত পত্রের পাণ্ডুলিপি বলিয়া বোধ হয়। চিট-নবীস মহোদয়ের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত পত্রসমূহের অধিকাংশই স্বুবর্ণ-রজতাঙ্কিত-লতাপত্রবিচিত্র কাগজে লিখিত।

"শ্রী

"স্বস্তি শ্রীমন্দমন্দাকিনী-সন্দোহ-সম্পূরিতাশেষ-জটামণ্ডল-পরিলসচ্ছিব-চরণ-দ্বন্দ্ব-নির্দ্বন্দ্ব-ভজনাসাদিত-সমস্ত-পুমর্থ-সার্থ-সার্থকীকৃত-নিজবংশাবতারেষু, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-ধন্য-রাজন্য-মূর্দ্ধন্যাচরিত-ধর্ম্মাচরণ-প্রচারণ-চাতুরী-ধুরীণেষু, সৌজন্য-সিন্ধুষু, শ্রীমহারাজাধিরাজ-মহারাণা-শ্রীমদ্ ভীমসিংহ-নৃপবর্য্যেষু—

"শ্রীমন্মাধব-রায়-নারায়ণ-পণ্ডিত-প্রধান-বিহিতাশীরাশয়ঃ সমুল্লসন্তু। পৌষ-কৃষ্ণ—(১৩) বধি শ্রীমৎ-ত্রিলোচনকৃপয়া পরিবারাঃ ক্ষেমিণো বয়ং, ভবদীয়ং শমীহৈধমাসমানাস্মহে। বিশেষস্তু "মৌজে বাড়ী পরগণে মেওয়াড়া"-খ্যং গ্রামঃ শ্রীরাণাজীভিরস্মৎ-পূর্ব্বজৌ গদ্র্যপনামক-বিষ্ণুমহাদেব-সদাশিব-মহাদেবাখ্যা-বুভৌ ভ্রাতরৌ (১৪) একত্র স্থিতিমন্তৌ, তয়োর্জ্যেষ্ঠো বিষ্ণু মহাদেব ইতি তন্নামপুরস্কারেণ দত্তঃ। তদনন্তরং বিষ্ণুমহাদেবো সদাশিবমহাদেবস্য পুত্রো রঘুনাথরায়শ্চ উভৌ বিভক্তৌ জাতৌ। তদানীমেতদ্‌গ্রামস্যোপভোগ উভাভ্যাং সমেন কর্ত্তব্য ইতি নিশ্চয়ে জাতেঽপি একবিংশতিসংবৎসরপর্য্যন্তং গণপতরায়-বিষ্ণুনা একেনৈব সম্পূর্ণগ্রামস্যোপভোগঃ কৃতঃ। অস্মাকমর্দ্ধাংশো ন দত্তেতি সদাশিবরঘুনাথৈর্নিবেদিতং। অতঃ অধুনা যাবৎ সংবৎসরপর্য্যন্তং সম্পূর্ণ-গ্রামস্যোপভোগঃ গণপতরায়বিষ্ণুনা কৃতস্তথা বর্ত্তমান একবিংশতিসংবৎসর-পর্য্যন্তং সদাশিবরঘুনাথঃ সম্পূর্ণগ্রামস্যানুভবং করিষ্যতি। অগ্রে উভাবপি সমান-বিভাগাভ্যামনুভবিষ্যতঃ। গণপতরায় বিষ্ণুনুযায্যবরোধং করিষ্যতি চেচ্ছ্রী-মদ্‌ভিঃ শিক্ষণীয়ঃ—"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

(১৩) এইখানে মিতি বা তারিখ দিবার জন্য একটু জায়গা ফাঁক রাখা হইয়াছে।

(১৪) অর্থাৎ বিষ্ণু মহাদেব গদ্রে (গদ্রি) ও সদাশিব মহাদেব গদ্রে নামক ভ্রাতৃযুগল।

উদ্ভিদ-জীবন ও ফুল।

ভারতবর্ষে উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অধ্যয়ন যত সহজসাধ্য, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ নহে। অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসেই মোটামুটি শিক্ষা হইতে পারে। চাই কেবল দুইখানি লেন্স্, একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র, দু' একখানি সূক্ষ্ম ছুরিকা ও রং করিবার সামান্য দ্রব্যসামগ্রী। এক বৎসর কাল কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ফুল ফল প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইলেই প্রায় অধিকাংশ বিভিন্নশ্রেণীর (natural order) গাছগাছড়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল জানা যায়। তিন শত বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদের ভিতর দুই শত পঞ্চাশেরও অধিক এক ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়।

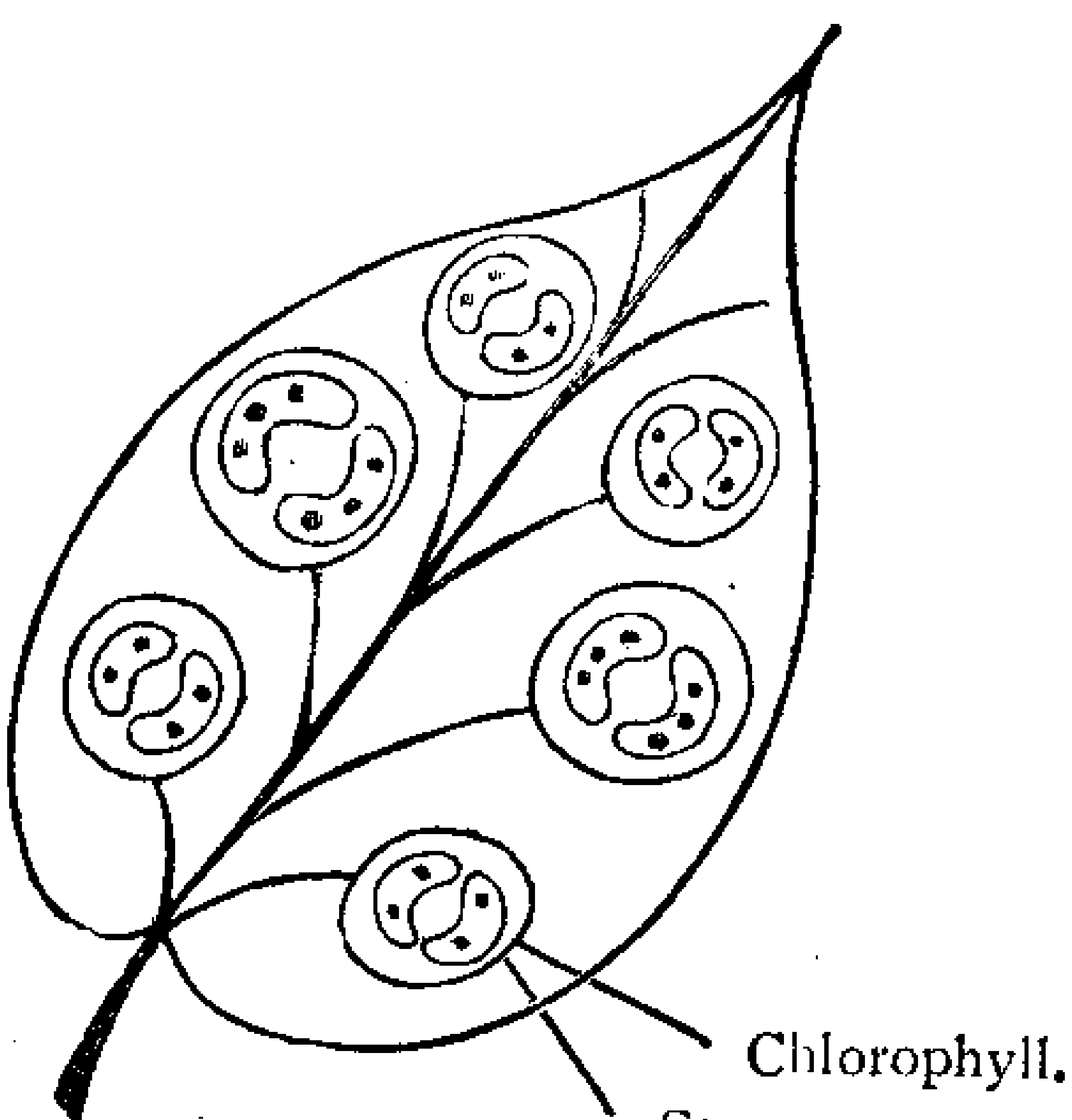
উদ্ভিদবিদ্যা জ্ঞানকরী এবং অর্থকরী। উদ্ভিদের সহিত প্রাণীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উদ্ভিদ ভিন্ন জীব-জীবন একান্তই অসম্ভব। জীবের খাদ্যই উদ্ভিদ। উদ্ভিদের কার্য্য বায়ু মৃত্তিকাস্থিত বিবিধ লবণ ও জল হইতে সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে পত্র ফল মূলাদি "গড়া" (constructive metabolism)। প্রাণিজীবনের কার্য্য এই সকল আত্মসাৎ করিয়া তাহা "ভাঙ্গিয়া" (destructive metabolism) পুনরায় বায়ু জল ও মৃত্তিকায় পরিণত করা। প্রত্নজীববিদ্যা পড়িয়া জানা যায়, জীব-জীবন সৃষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে উদ্ভিদ-জীবন সৃষ্ট হইয়াছিল। অঙ্গারবহ যুগে (Carboniferous age) উদ্ভিদের জাতীয় জীবনের চরম প্রাদুর্ভাব। তাহারই মৃত্তিকাপ্রোথিত অবশেষ এখন পাথর কয়লা নামে অভিহিত হইয়া মনুষ্যের উন্নতির সোপানস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ভাত ডাল রুটী প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া আমরা জীবনধারণ করি, সে সকলই উদ্ভিদজাত। মনুষ্যের সুখসম্ভোগের প্রয়োজনীয় ঔষধ বস্ত্রাদি অনেক দ্রব্যই উদ্ভিজ্জ, এবং এই সকল লইয়াই রাশি রাশি অর্থাগমের উপায় হইতেছে। বৃক্ষলতা ফুল ফল দেখিয়া আমাদের মনে কত বিমল আনন্দ হয়। কিছু দিন না দেখিতে পাইলে তবে বুঝা যায় যে, সামান্য তরুলতার দর্শনেই আমাদের কত আনন্দ। শেওলা মাখা পাথরের পার্শ্বে অর্দ্ধাবৃত একটি "ভায়লেট্" ফুলেই মন ভুলাইয়া দিতে পারে।

বৃক্ষলতাদি এত প্রয়োজনীয়, এত মনোরম। যদিও আমাদের অনেকেই প্রত্যহ দেখিতেছেন, কিন্তু কোন্ অংশকে কি বলে ও উদ্ভিদ-জীবনের কি

কার্য্যে ঐ সকল অংশ আবশ্যক, তাহা অনেকেরই অবিদিত। এরূপ মোটামুটি শিক্ষা অতি সহজ উপায়েই হইতে পারে। একটি সপুষ্প ছোট গাছ উৎপাটন করিয়া দেখিলেই শিক্ষার উপযোগী অনেক তত্ত্বই জানা যাইবে।

গাছের প্রধান অংশ দুইটি।—একটি ক্রমেই মাটী ভেদ করিয়া নিম্নগামী হইতে থাকে—মূল (root)। অপরটি উর্দ্ধগামী, মাটী হইতে ক্রমেই উচ্চ দিকে বাড়িতে থাকে—কাণ্ড (stem)। এই অধোগামী মূল বা শিকড় মাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গাছটির পোষণ করে, খাড়া রাখে ও ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকায় কৈশিক আকর্ষণে ও অন্তর্দ্ধাহ প্রণালী অনুসারে ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া গাছটিকে খাওয়ায় ও সজীব রাখে। শিকড় দিয়া তরল পদার্থ ব্যতীত কিছুই শোষিত হইতে পারে না—এই কারণেই বৃক্ষ সজীব রাখিতে হইলে জল দ্বারা ভূমির সেচন আবশ্যক।

উর্দ্ধগামী ভাগটি কাণ্ড,—শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পুষ্প ও পত্র ধারণ করে। যেমন শিকড় দ্বারা ভূমি হইতে তরল রস শোষণ করিয়া গাছ জীবনধারণ করে, সেইরূপ পাতার দ্বারা অঙ্গারাম্ল বাষ্প হইতে অঙ্গার আত্মসাৎ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পত্রের সবুজ রং (Chlorophyll)



সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে এই কার্য্য করিয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মির অভাবে অঙ্গারকাম্ল বাষ্প হইতে অঙ্গার লওয়া উদ্ভিদের পক্ষে অসম্ভব। পত্রের stoma ta নামক

পথ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপ chlorophyll দ্বারা সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে অঙ্গারাম্ল বাষ্প হইতে অঙ্গার লইয়া অম্লজান ছাড়িয়া দেওয়া যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলার মত দেখায়। সুতরাং পাতা যেন গাছের পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র উভয়ের মতই কার্য্য করে। অধিকন্তু অনবরত পাতা হইতে গাছের জলীয়াংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, তাই পত্রস্থ রস গাঢ়তর হয়; এই জন্য গাছের নিম্নদিকস্থ অংশ হইতে পাতলা রস টানে বলিয়া অনেক লবণ-মিশ্রিত ভূমির জলও শিকড়-পথে গাছে উঠিতে থাকে এবং পরিশেষে পাতায় পঁহুছে। এইরূপে মাটী হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকা ও জল ইহাদের সহিত পাতা দ্বারা বায়ু হইতে গৃহীত অঙ্গারের রাসায়নিক সংমিলনে শ্বেতসার (starch) প্রস্তুত হয়, এবং এই শ্বেতসারই উদ্ভিদজাত অপর সকল পদার্থের মূল।

এইরূপে গাছ সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে মৃত্তিকা জল ও বায়ু লইয়া তাহাদের রাসায়নিক সম্মিলনে জটিলতর (complex) পদার্থ "গড়িয়া" দিয়া প্রাণীদের তাহা "ভাঙ্গিয়া" জীবনধারণ করিবার উপায় করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী,সকলেরই জীবনধারণের প্রধান উপায় সূর্য্যরশ্মি। সূর্য্যরশ্মির গতিশক্তি (kinetic energy) উদ্ভিদ-জীবনে শ্বেতসার ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের স্থিতিশক্তিতে (potential energy) পরিণত হইয়া আবার শেষে জীব-জীবনের তাপ গতি ইত্যাদি রূপ গতিশক্তিতে পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সূর্য্যরশ্মিই সকল জীবনের আদিকারণস্বরূপ। সূর্য্যের অভাবই সৌর জগতের প্রলয়।

শিকড় ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভূমি হইতে রস শোষণ করে ও গাছকে খাড়া রাখে। পাতা বায়ু হইতে অঙ্গার লইয়া অম্লজান বাষ্প ছাড়িয়া দেয়, এবং পাতার উপর হইতে অনবরত জলীয় বাষ্প বহির্গত হইয়া গিয়া পত্রস্থ রস গাঢ় হওয়ায় নিম্নদিকস্থ পাতলা রস আকর্ষণ করাতে, ভূমি হইতে শিকড়-পথে রস প্রবিষ্ট হইয়া গাছের মধ্যে চলাচল করে। কাণ্ডের অন্তঃস্থ প্রদেশ দিয়া উঠে ও ছালের কাছ দিয়া নামে।

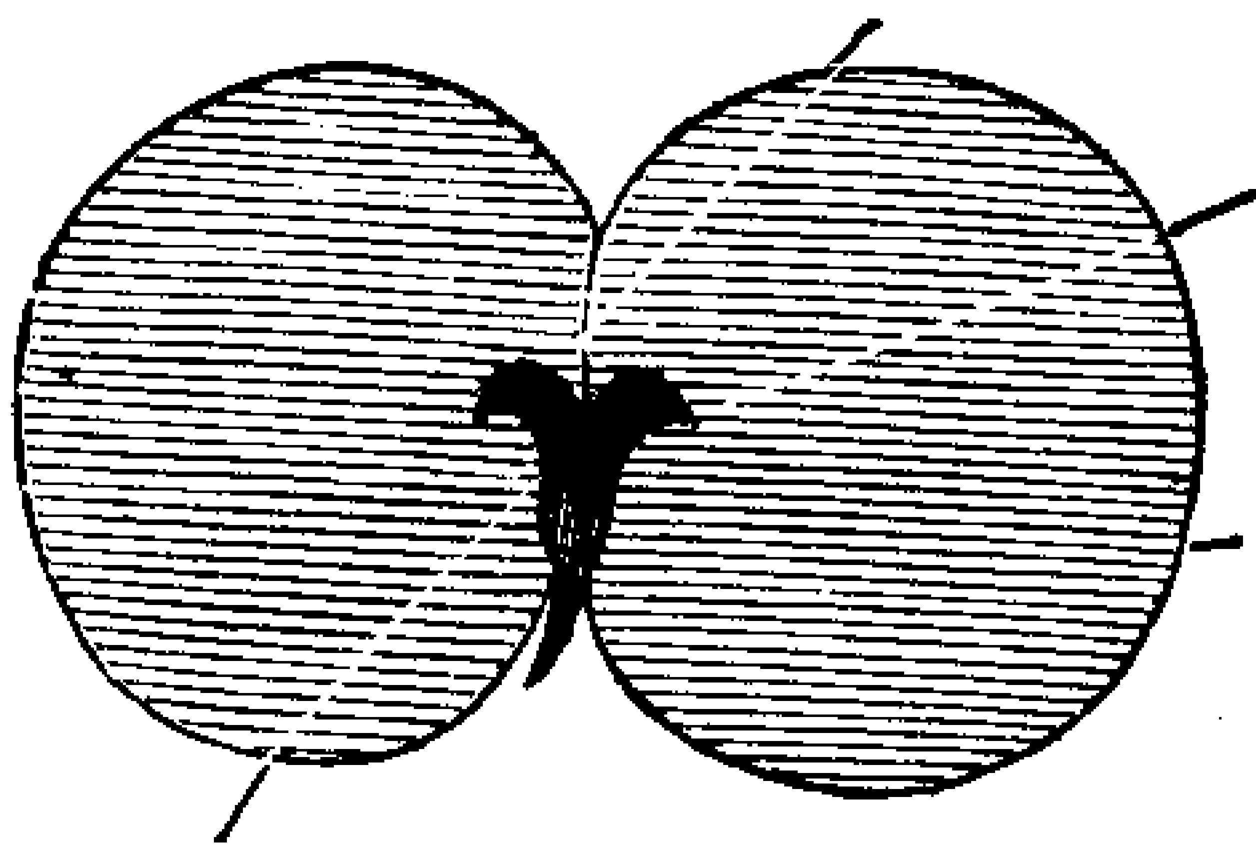
আর ফুল কি করেন ?

যেমন শিকড় ও পাতা গাছের জীবনরক্ষার যন্ত্র, সেইরূপ ফুল গাছের বংশরক্ষার যন্ত্র। ফুল হইতে ফল হয় ও ফলের ভিতর (seed) বীজ থাকে। এই বীজ হইতেই নূতন গাছ জন্মায়।

বীজ কিরূপ পদার্থ ও তাহা হইতে কিরূপেই বা গাছ জন্মাইয়া থাকে—

ইহা অবশ্যজ্ঞাতব্য ও বিস্ময়কর। একটি ছোলা বা মটরসুটী লইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। একটি মটরসুটীর বা ছোলার পাতলা ছালটি নখে

বৃক্ষভ্রূণ Embryo.



বৃক্ষভ্রূণ শিকড় Radicle.

করিয়া খুঁটিয়া পৃথক করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহার ভিতর ছোট মোটা মোটা পাতার মত দুইটি ভাগ আছে,এই গুলিকে cotyledon বা seed leaf বা বীজপত্র বলে। এবং এই দুইটা বীজপত্র পৃথক করিলেই তন্মধ্যে বৃক্ষভ্রূণ (embryo) দেখা যাইবে। বৃক্ষভ্রূণের পত্র ও বৃক্ষভ্রূণের শিকড় (Pleumule and Radicle) লেন্স্ দিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায়। এই বৃক্ষভ্রূণই বাড়িয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং বাড়িবার সময় বীজপত্রগুলি নিজমধ্যস্থিত সারপদার্থ যোগাইয়া শিশু বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে। পরে যখন বৃক্ষভ্রূণ কিছু বড় হয়, তখন ভূপ্রবিষ্ট শিশুবৃক্ষ শিকড় দ্বারা রস টানিয়াই স্বাধীনভাবে "মাই ছাড়িয়াই" যেন নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল গাছ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশেরই বীজ ফলের ভিতর নিহিত থাকে—ইহাদিগকে ছন্নবীজ বলা যায়—(Angiosperm phanerogamia। ইহাদের মধ্যে কোনওগুলির বীজপত্র একটিমাত্র, ইহারা monocot ; এবং কোনওগুলির দুইটি, ইহারা dicot। তাল খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের বীজপত্র একটি—এই সকল বৃক্ষ কেবল লম্বায় বাড়ে, শাখা প্রশাখা হয় না। আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষের বীজপত্র দুইটি—ইহারা উচ্চেও বাড়ে, এবং বেড়েও বাড়ে ; ইহারা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। বিলাতী খেজুর, অরোকেরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি গাছ আছে, তাহাদের ফল নাই, শুধুই বীজ,ইহাদিগকে নগ্নবীজ gymnosperm বলা যাইতে পারে। আবার কতক-

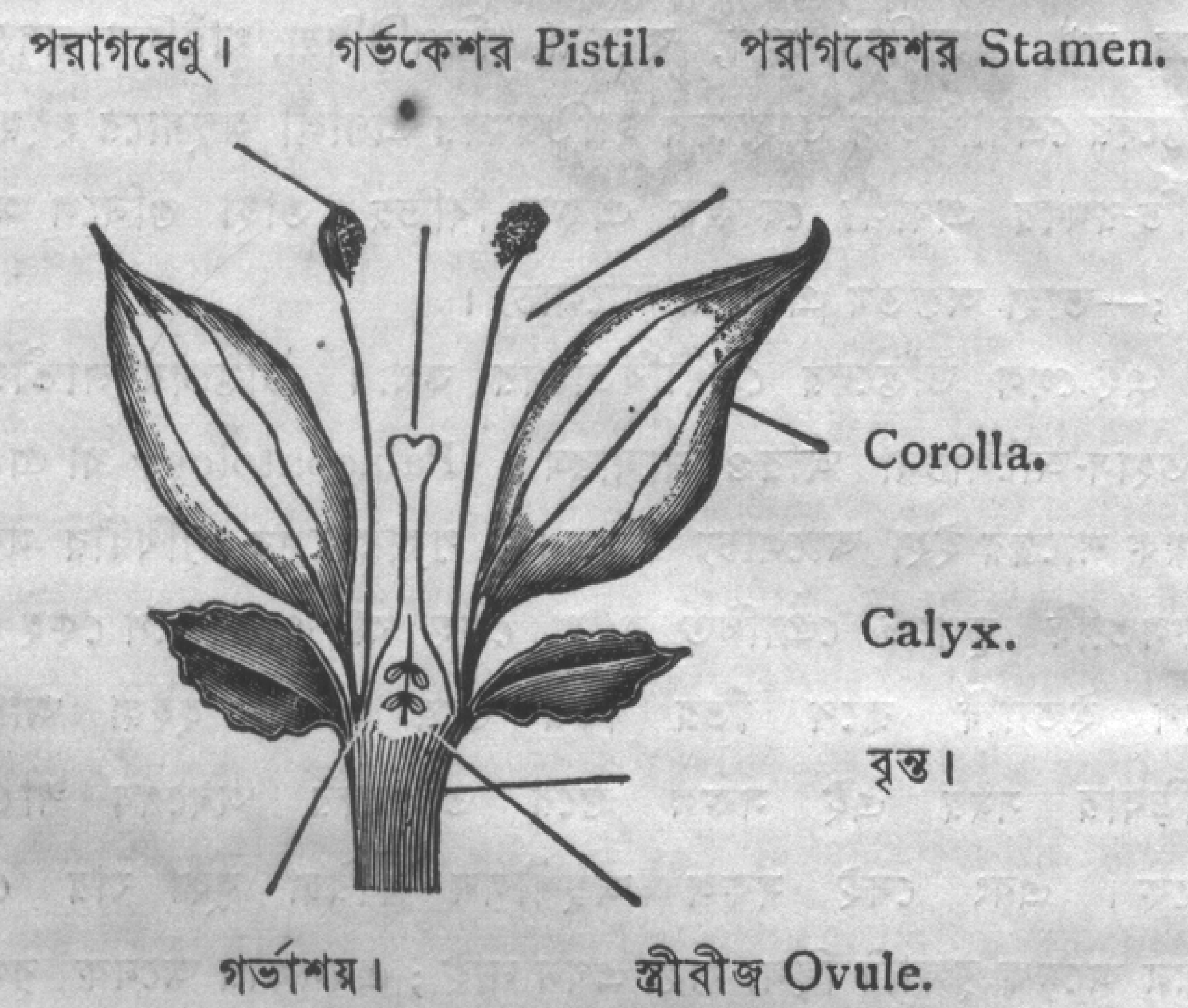
গুলি গাছ আছে, তাহাদের মোটে ফুলই হয় না Cryptogamia। ইহাদের বীজকে spore বলে, উহা সচরাচর ফুলের ভিতর না জন্মিয়া পাতার গায়েই হইয়া থাকে। সুসুনী শাক এই জাতীয় উদ্ভিদ বা fern। এই সকল "অপুষ্পলিঙ্গ" বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলিকে গাছ বলিয়াই মনে হয় না;—না আছে পাতা, না আছে শিকড়। ভূসকুমড়া, বেঙের ছাতি শেষজাতীয় উদ্ভিদ (Fungus)। এই শেষজাতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে ;—ইহাদের সবুজ রং অবধি নাই বলিয়া তাহাদের আহার করিবার যন্ত্রই যেন নাই বলিলেও চলে। সুতরাং তাহাদিগকে অপরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া প্রাণধারণ করিতে হয়,—অন্য উদ্ভিদ কি অন্য জীবের শরীরের সাররস শোষণ করিয়া বাঁচে। ইহারাই কেহ কেহ রোগজীবাণু (pathogenic organism)। ইহারা স্যাঁতস্যেঁতে অন্ধকার স্থান ভালবাসে। সূর্য্যরশ্মি ও নির্ম্মল বায়ু, অন্য উদ্ভিদের পক্ষে এত হিতকর, chlorophyll অভাবে ইহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না বলিয়া, ইহাদের পক্ষে বড় অনিষ্টকর ;—পাঁচ মিনিট সূর্য্যকিরণে থাকিলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হয়। এই কারণেই বঙ্গদেশে আর্দ্র ভূমিতে এত ম্যালেরিয়া, অন্ধকারময় বড়বাজারের গলিতে এত প্লেগ, ঘন বসতি ও জলনিকাশ পথহীন স্থানে এত ডিপ্‌থিরিয়া ও কলেরা।

সুতরাং দেখা গেল, মোটামুটি কত শ্রেণীর গাছ আছে। কাহারও ফুল হয় ; (phanerogam)—আম, তাল, অরোকেরিয়া। কাহারও ফুল হয় না;—(cryptogam)—সুসুনীর শাক, ভূসকুমড়া। যাহাদের ফুল হয় ; তাহাদের কারও বা ফলের ভিতর বীজ নিহিত থাকে (angiosperm) আম, তাল। কাহারও বা ফল নাই, সুধুই বীজ—(gymnosperm) অরোকেরিয়া। যাহাদের ফলের ভিতর বীজ হয়, তাহাদের কাহারও কাহারও বীজে একটি বীজপত্র—(monocot) যথা তাল। কাহারও বা দুটি বীচিপত্র—(dicot) যথা আম। যাহাদের ফুল হয় না, তাহাদের কাহারও বা গাছের মত আকৃতি থাকে (moss ও fern)—যথা সুসুনীর শাক। কাহারও বা কিছুই গাছের মত দেখিতে নয়—(algoe, fungus)—যথা ভূসকুমড়া, বেঙের ছাতি। Fungusদের সবুজ রং পর্য্যন্ত নাই—সুতরাং তাহারা নিজে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না—তাহারা পরভৃত (parasite) হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর উদ্ভিদই রোগজীবাণু,—প্রাণিদেহে প্রবেশ করিলে তাহাদের অনিষ্ট

করে, যথা, মেলেরিয়া, প্লেগ, কলেরা, ডিপথিরিয়া, থাইসিস, বসন্ত ইত্যাদি। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ তাহাদের জাতিরক্ষার প্রণালী অনুসারে হইয়াছে। এই জাতি-রক্ষার প্রণালী যে কত প্রকার বিভিন্ন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য মনে হয় ;—তাহা অন্যতম প্রবন্ধের আলোচ্য।

এই গেল উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের কথা। উদ্ভিদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস-আলোচনা আরও মনোরম। Palaeontology বা প্রত্নজীববিদ্যা নামক শাস্ত্রের ইহা আলোচ্য বিষয়। পুরাকালের পৃথিবীর নানা সময়ের বৃক্ষলতাদি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া কেহ বা প্রস্তররূপে কেহ বা কয়লা-রূপে ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রক্ষিত হইয়া আছে। খনি খুঁড়িবার সময় এই সকল স্তরে তাহাদের অবশেষ পাওয়া গিয়া থাকে। এবং সেই সকল অনুশীলন করিয়া বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে এমন অনেক বৃক্ষাদি ছিল, যাহা এখন নাই ; এখনকার অনেক বৃক্ষাদির মত বৃক্ষও পূর্ব্বে পাওয়া যাইত না। আর একটি অতি বিস্ময়কর ব্যাপার জানা যায় এই যে,—খুব নিম্নতম স্তরের বৃক্ষাদি এখনকার বৃক্ষাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং দেখিতে নিম্নশ্রেণীর শিকড়-পাতা-হীন উদ্ভিদের মত ;—যথা, Algauc Fungi। তদুপরিস্থ স্তরের বৃক্ষাদির শিকড় পাতা আছে, কিন্তু ফুল হয় না ;—যথা, moss, fern, higher cryptogam। এই সময়ে fern অশ্বত্থ বটের মত বড় বড় গাছ ছিল, এখনকার মত ক্ষুদ্র ছিল না। তারও উপরের স্তরে—gymnospermএর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এবং ইহারও উপর monocot একবীজ দল ও dicot দ্বিবীজ দল। যেন ঠিক উদ্ভিদের জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution) হইয়াছে। অঙ্গারবহ যুগে এই উদ্ভিদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভাব। Age of Ferns, Age of Palms চলিয়া গিয়াছে ; এখন age of dicot। প্রাণি-জীবন সৃষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে উদ্ভিদ-জীবন সৃষ্ট হইয়াছিল, দেখা যায়। তাহারও পূর্ব্বে উদ্ভিদও ছিল না, প্রাণীও ছিল না। কোনও একটি উদ্ভিদের জীবনে যেমন ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায় দেখা যায়, সমগ্র উদ্ভিদজাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলেও সেইরূপ ক্রমবিকাশের পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ফুল কিরূপে বংশরক্ষা করে,তাহা বুঝিতে হইলে ফুলের অংশ সমুদয় জানা আবশ্যক। একটি জবা ফুল লইয়া দেখিলেই এই সকল অংশ বেশ বুঝা যাইবে। ফুলের বোঁটার নাম বৃন্ত (Peduncle) ; তাহাদের ঠিক উপরিস্থিত ছোট ছোট



সবুজ পাত সমষ্টিকে calyx বলে। ইহা মুকুল অবস্থায় ফুলের অভ্যন্তরস্থ কোমল অংশ সকলকে ঢাকিয়া রাখিয়া রক্ষা করে। ফুটন্ত ফুলে ইহার বড় আবশ্যকতা নাই। ইহার ঠিক উপরেই ফুলের রঞ্জিত অংশটুকুকে corolla বলে—ইহাই ফুলের রূপ ও শোভা। ইহার মনোহর বর্ণে ও সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সুদূর হইতে "মত্ত মধুব্রত" মধু অন্বেষণে আসে—এইরূপেই ফুলের গর্ভাধান হয়। গর্ভাধান হইবার পরই এইগুলি ঝরিয়া পড়ে ও ফুলের রূপ বিলীন হয়। ইহার উপরেই ফুলের কেশর। কেশর দুই প্রকার—প্রথম পরাগকেশর (stamen) ইহাতেই হল্‌দে গুঁড়ার মত পুংবীজ (pollen) উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় গর্ভকেশর (pistil) ইহা ঠিক ফুলের মধ্যস্থলে থাকে; এবং ইহাই স্ত্রীবীজের (Ovule) আধার।

ফুলের নিম্নতম অংশ calyx—মুকুল অবস্থায় ফুলকে রক্ষা করে। সুতরাং ফুলের পক্ষে আবশ্যক। তদুপরিস্থিত রূপ-গন্ধ-মধু-যুক্ত corolla অলিকে আকর্ষণ করিয়া গর্ভাধানের আয়োজন করিবে বলিয়া আবশ্যক। পরাগ পুংকেশর ও গর্ভকেশর গর্ভাধানের জন্যই আবশ্যক; তবে গর্ভাধানের অব্যবহিত পরেই পরাগকেশরের আর আবশ্যকতা থাকে না—কিন্তু গর্ভকেশরের এখন বড় দরকার; উহাই পাকিয়া ফল হয়। এবং ইহার অন্তঃস্থিত বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত ফুলের অংশগুলি সকলই পাতার

রূপান্তরমাত্র, তবে ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

কি উদ্ভিদে, কি প্রাণীতে, জনন প্রসঙ্গ আজ কাল বিজ্ঞান-জগতে প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এই স্থলে উদ্ভিদ-জননপ্রণালীর সহিত প্রাণিজননপ্রণালী কত মেলে, দেখান উচিত। উদ্ভিদের ফুলরূপী জননেন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দরকার হয়, প্রাণিজননেন্দ্রিয়েও সেইরূপ দেখা যায়। ডিম্বকোষ (ovary) ডিম্ব (ovum) উৎপন্ন করিল; জরায়ুতে ভ্রূণ পরিবর্দ্ধিত হইল; এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্তন তাহাকে স্তন্যদানে পোষণ করিতে লাগিল। তার কিছু দিন পর অবধিও উচ্চ শ্রেণীর জীবের পিতা মাতার যত্ন ও লালনপালন আবশ্যক—তবে প্রাণী স্বাধীনভাবে জীবন-ধারণ করিতে সক্ষম হয়। ডিম্বকোষ, জরায়ু ও স্তন, এ সকলগুলিই জননেন্দ্রিয়ের অংশ—নীচ শ্রেণীর জীবে এ তিনটিই কাছাকাছি থাকে। নীচ শ্রেণীর জীবে স্তন উদরের নীচে অবস্থিত; শুধু উচ্চশ্রেণীর জীবে,—বানরে ও মনুষ্যে স্তন বক্ষে।

এ তিনটির বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যখন একটি কার্য্য করে, তখন অন্যটি কার্য্য করে না;—যদি জোর করিয়া দুইটিকেই এক সঙ্গে কার্য্য করান যায় ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন জরায়ুতে সন্তান পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তখন ডিম্ব-কোষে ডিম্ব উৎপন্ন হয় না—ঋতু বন্ধ থাকে। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্তন নিজের কার্য্য আরম্ভ করিল, তখন জরায়ু আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হয়, এবং ঋতুও সাধারণতঃ স্থগিত থাকে। তাই মৃতবৎসাদের সন্তান মরিয়া যাওয়ায় স্তন নিজ কার্য্য করিতে পায় না বলিয়া ডিম্বকোষ শীঘ্র শীঘ্র অকালেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়—সুতরাং আবার তাহাদের শীঘ্রই গর্ভ হয়। যাহা-দের সন্তানও স্তন্যপান করিতেছে, এবং আবার পুনরায় গর্ভও হইয়াছে —স্তনও কার্য্য করিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে জরায়ুও কার্য্য করিতেছে—তাহাদের সে বিষাক্ত স্তন্যপানে সন্তানের নিশ্চয়ই অসুখ হয়। আজ কাল কলিকাতায় যকৃৎ রোগে একতৃতীয়াংশ শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়,—এবং এই রোগের একটি প্রধান কারণ এইরূপ অকালগর্ভের বিষাক্ত দুগ্ধসেবন।

যদিও অধিকাংশ ফুলেই গর্ভকেশর ও পরাগকেশর এক সঙ্গেই উপস্থিত

থাকে, তথাপি এক ফুলের পুংবীজ পরাগরেণু সেই ফুলেরই গর্ভকেশরের গর্ভাধান করে না। কেন করে না, কে জানে? বোধ হয়, ভাই ভগিনী সম্বন্ধ বলিয়া এইরূপে উৎপন্ন বীজ নিস্তেজ হয়। অথবা বালক বালিকা সকলেই এক বয়সের বলিয়া হয় ত যখন গর্ভকেশরের বালিকার স্ত্রীবীজ পরিপক্ক হইয়া যৌবনবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, বালক পরাগকেশরের খেলিবার বয়স যায় নাই, তখনও ও সকল বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই। সুতরাং গর্ভকেশরের গর্ভাধান অন্য পুষ্পের পরাগরেণু দ্বারা সম্পন্ন হওয়া চাই। কে সে ঘটকালি করে—অন্য পুষ্প হইতে পরাগরেণু আনিয়া দেয়? বহুপুষ্পচারী সমীরণ ষট্‌পদ ও সলিল এই সকল কার্য্যে ও সাহায্যে ব্রতী।

সমীরসেব্য ফুলমাত্রেরই পরাগরেণু রাশি রাশি জন্মিয়া থাকে, এবং তাহারা বড় হালকা; সুতরাং বায়ু দ্বারা চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সকল ফুলের বোঁটা অত্যন্ত বড় হয় বলিয়া ফুলটি খুব উচ্চে ফুটে, সুতরাং হাওয়া লাগিবার সুবিধা হয়। এই সকল ফুলের বড় সৌন্দর্য্য নাই;—বায়ু ত আর রূপ খোজে না। তাহার অনন্ত গতির পথে উচ্চ হইয়া থাকিলেই হইল। জলজ ফুলের পরাগরেণু জলের দ্বারাই বাহিত হয়। পতঙ্গসেব্য ফুলমাত্রেরই সৌন্দর্য্য অধিক; সুগন্ধও আছে;—বহুপুষ্পে বিচরণকারী ভ্রমর দূর হইতে এই রূপে ও গন্ধে মুগ্ধ হইয়া মধু-অন্বেষণে আসিয়া বসে। এইরূপে এক পুষ্পের পরাগরেণু সেই জাতীয় অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত হয়। অস্থানে পড়িয়া বিস্তর রেণুর অপচয় হয় বটে, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য। অনেক আছে বলিয়া তাহার তাহাতে বড় যায় আসে না। গর্ভকেশরের ডগে পড়িলেই সার্থক হইল। গর্ভকেশরের ডগ (stigma) এই সময়ে এরূপ আটা আটা হয় যে, পরাগরেণুর একবার তাহাতে পড়িলে আর বিচ্যুত হয় না। এই গর্ভকেশরের গোড়াতেই গর্ভাশয়, তাহার ভিতর স্ত্রীবীজ নিহিত। পরাগরেণুর অংশবিশেষ ক্রমেই অগ্রসর হইয়া স্ত্রীবীজের সহিত মিশিলেই গর্ভাধান সম্পন্ন হইল। তখন হইতে উক্ত দুই বীজের সংমিশ্রণে এমন এক অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হয় যে, প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়িয়া বাড়িয়া স্ত্রীবীজ "বীচি" রূপে পরিণত হইল;—অর্থাৎ, এখন স্ত্রীবীজের ভিতর বৃক্ষশিশু আবির্ভূত হইল বলিয়া এখন তাহা হইতে বৃক্ষান্তরের সম্ভাবনা হইল।

এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

যখন গর্ভশয় বাড়িয়া ফলরূপে পরিণত হয়, এবং তাহার অভ্যন্তরে বীচি উৎপন্ন হয়, তখন ফুলের আর রূপ যৌবনের আবশ্যক কি? যে কাজের জন্য আবশ্যক, গর্ভাধানে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং corolla এবং কেশর এখন শুখাইয়া পড়িয়া যায়।

সেই জাতীয় পুষ্পের পরাগরেণু এত কাছে থাকিলেও, অধিকাংশ পুষ্পের গর্ভকেশরের যে তাহার দ্বারা গর্ভাধান না হইয়া পুষ্পান্তরের পরাগরেণু দ্বারা হইয়া থাকে, এ কথা পূর্ব্বে জানা ছিল না। ইহার আবিষ্কার অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারের মত আকস্মিক। শীতপ্রধান দেশে অত্যন্ত শীতে বৃষ্টি ও বরফ হইতে গাছ রক্ষা করিবার জন্য বড় বড় কাচের ঘরের মধ্যে বৃক্ষাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। কোনও সময়ে এইরূপ একটি বড় গৃহের কোনও স্থানে ফাঁক না থাকায় দেখা গেল, তাহাতে ফুল হয়, অথচ ফল হয় না। প্রথমে কেহই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে হঠাৎ এক স্থানে কাচ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অনেক পতঙ্গ প্রবেশ করিবার পর দেখা গেল যে, রীতিমত ফুল ও ফল উভয়ই উৎপন্ন হইতেছে। এই সূত্র অনুসন্ধান করিয়া পরে জানা যায় যে, বায়ু ও পতঙ্গ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া গর্ভাধান করায়। অধিকাংশ পুষ্পেরই নিজ নিজ পরাগকেশরের পরাগরেণু গর্ভকেশরের গর্ভাধান ঘটায় না।

অনেক স্থলে সেই পুষ্পেরই পরাগরেণু তাহার গর্ভকেশরের গর্ভাধান ঘটাইতেই অক্ষম। অনেক স্থলে গর্ভাধান হয়, কিন্তু তৎজাত বীচি নিস্তেজ হইয়া থাকে—তাহা হইতে গাছ হয় না। কোনও কোনও স্থলে তাহা হইতে গাছও হইতে পারে, কিন্তু সে গাছে আর ফুল ফল বীচি হয় না—অর্থাৎ তাহার জননশক্তি হীনবল হইয়া যায়। কিন্তু এমনও অনেক পুষ্প আছে, যাহাতে আত্মগর্ভাধান ঘটিয়া থাকে, এবং তদ্‌জাত বীচি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল। Gloriosa supurba নামক এক প্রকার ফুল আছে, তাহার গর্ভকেশর পরাগকেশরের পরাগরেণুর সন্ধানে আপনা-আপনি ঘুরিয়া বেড়ায় ও নিজে উপযাচক হইয়া পরাগকেশরের সেবা করে।

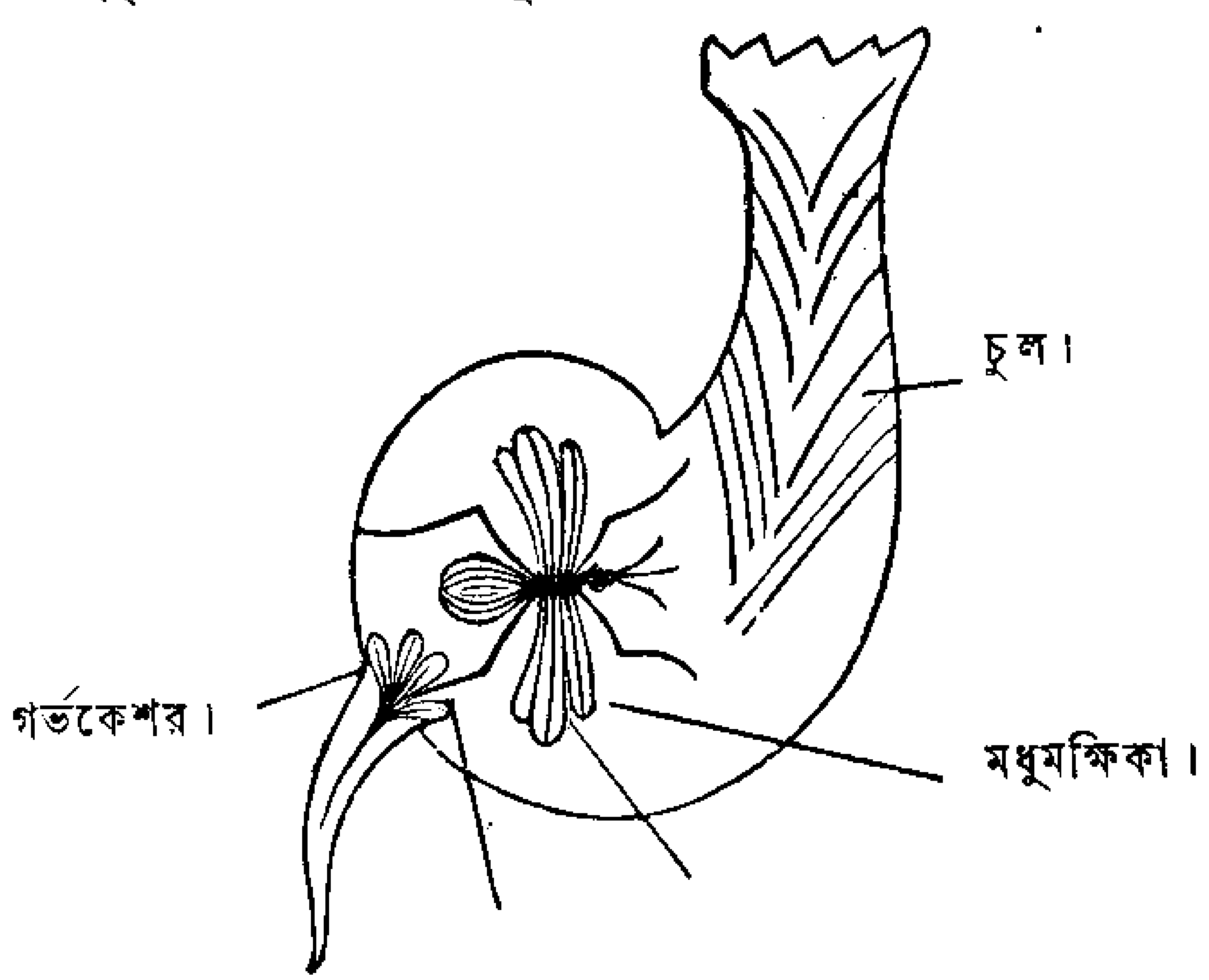
পরাগরেণু যদি সেই জাতীয় পুষ্পে না পড়িয়া ভিন্নজাতীয় কোনও পুষ্পের গর্ভকেশরে পড়ে, তাহা হইলে সেই গর্ভাধান ঘটে না। তবে নিকট-সম্বন্ধীয় কোনও জাতি হইলে hybrid বা বর্ণসঙ্কর জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বজয় (Cana Indica) আজ কাল সকল বাগানেই দেখিতে পাওয়া যায়—এই

সময়েই তাহার ফুল হইবার সময়। এই ফুলে বর্ণসঙ্কর বেশ দেখা যাইতে পারে। হল্‌দে কেনার (Cana) সঙ্গে যদি লাল কেনার বিবাহ হয়, হল্‌দে কেনার পরাগরেণু যদি লাল কেনার গর্ভকেশরে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই বীচি হইতে জাত গাছে দুয়েরই গুণ লইয়া হল্‌দে লালে ফুটকি ফুটকি একরূপ কেনা ফুল হয়। কিন্তু কিছু দিন থাকিতে থাকিতে এই বংশ ক্রমে ক্রমে মাতৃবংশ বা পিতৃবংশে ফিরিয়া যায়—অর্থাৎ ফুট্‌কি ফুট্‌কি রং গিয়া হয় লাল না হয় হল্‌দে ফুল বিশিষ্ট গাছে পরিণত হয়। বর্ণসঙ্কর কখনও স্থায়ী হয় না।

দুই একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইলে Cross fertilisatlon আরও ভাল বুঝা যাইবে।

Aristolochia ঈশের মূল। ইহা বহু দিন হইতে সর্প তাড়ানর ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ—ইহা থাকিলে কাছে সাপ আসে না। কিন্তু আজ কাল আবার ইহার আর একটি উপকারিতা আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহার Infusion প্লেগের মহৌষধ বলিয়া কথিত হইতেছে। বোম্বাই প্লেগে নাকি ইহার বড় উপকারিতা দেখা গিয়াছে, এবং তাই কলিকাতার প্লেগেও ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু বলা যায় না, নিম্বাদি অন্যান্য প্লেগের মহৌষধের মত ইহাও কিছু দিন পরে হতাদর হইবে কি না।

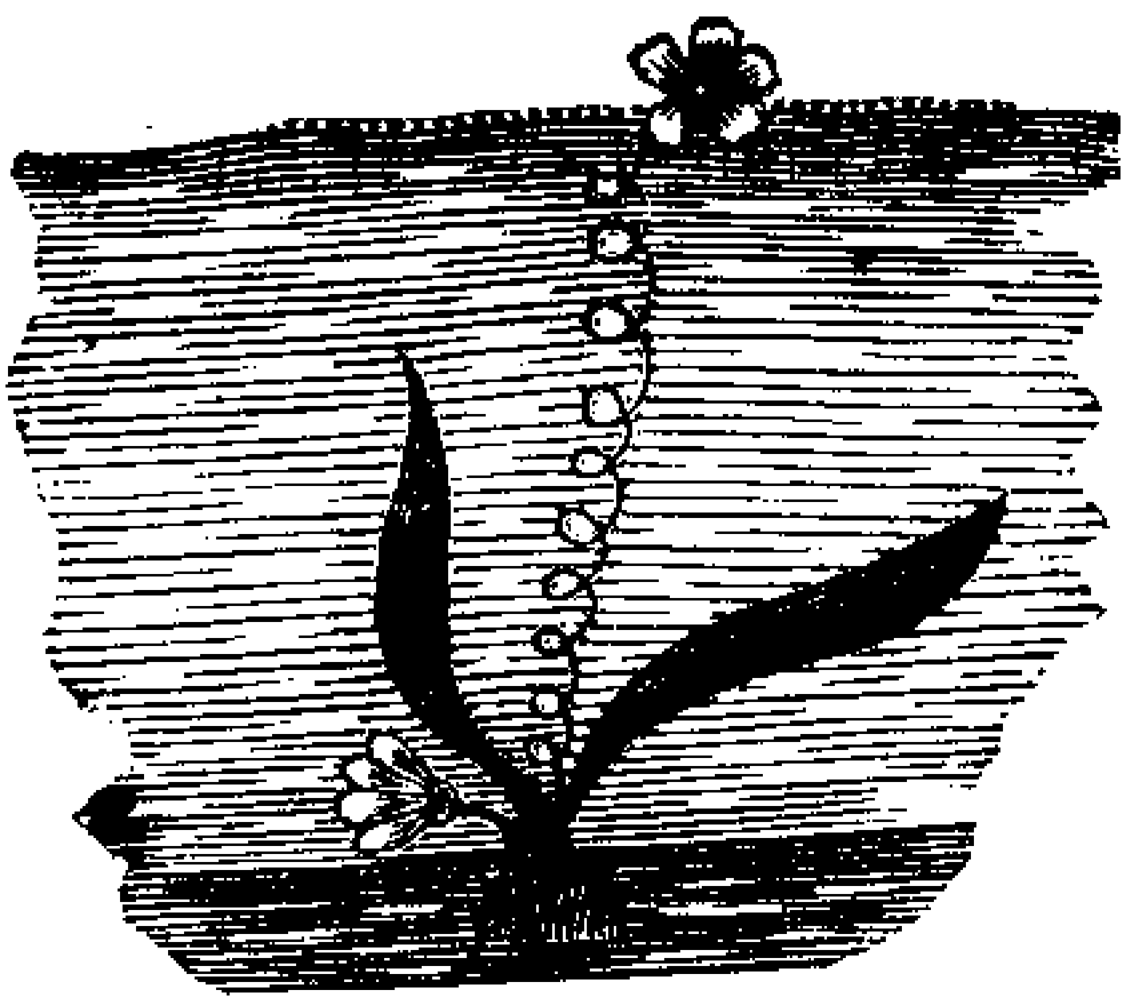
এই Aristolochiaর ফুল দেখিতে রংচঙে, এবং ঠিক মুরগীর মত



আকৃতি। ফুলের অভ্যন্তরে প্রবেশের একটিমাত্র পথ, এবং সেই পথে কতকগুলি চুল এরূপে সাজান আছে যে, কোন মক্ষিকা ভিতরে যাইবার সময় ইহা অনায়াসে যাইতে দেয়, কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসা অসম্ভব। মক্ষিকা এই রূপে ভিতরে আবদ্ধ হইয়া পলাইবার জন্য ছট ফট করে ও এই সময় অন্য পুষ্প হইতে আনীত পরাগরেণু ইহার গর্ভকেশরে লাগিয়া যায়, এবং এইরূপে গর্ভাধান ঘটে। গর্ভাধানের পর যেমন সকল পুষ্পে হইয়া থাকে— ফুলের লাল পাতাগুলি ক্রমে শুখাইয়া যায়—যে সকল চুল আসিবার প্রতিবন্ধক দিতেছিল, তাহারাও বিনষ্ট হয়। তখন এত দিন আবদ্ধ থাকার পর লব্ধবহির্গমন হইয়া ইহারা আবার পরাগরেণু মাখিয়া পুষ্পান্তরে গমন করে, এবং সেখানেও এইরূপে গর্ভাধান ঘটায়। গলিতদল রুদ্ধদ্বার নতমুখ ও শুষ্ক সেই ফুল দেখিয়া অন্য কোনও ভ্রমর আর আকৃষ্ট হইয়া তাহার ভিতর যায় না।

Valisnaria spiralis নামক এক রূপ ঘাসের মত জলজ দল গোলদিঘীতে আছে, তাহার গর্ভাধান ব্যাপার আরও বিস্ময়কর। এই সকল বৃক্ষের

পরাগরেণু। স্ত্রীফুল।



পুংফুল।

ভিন্ন ভিন্ন ফুলে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর আছে, যে ফুলে পরাগকেশর আছে, সে ফুলে বোঁটা অতি ছোট। সেগুলির পরাগরেণু যখন পরিপক্ক হয়, হালকা হইয়া জলের উপর হল্‌দে গুঁড়ার মত ভাসিতে থাকে। গর্ভকেশরবিশিষ্ট ফুলগুলির বোঁটা লম্বা, কিন্তু ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মত গুটান থাকে। যখন পরাগকেশরের এই সকল হল্‌দে পুংবীজ পরিপক্ক হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন গর্ভকেশর বিশিষ্ট ফুলগুলির বোঁটার

জড়ান ক্রমে আপনা হইতেই খুলিয়া যাওয়াতে তাহারা লম্বা হইয়া জলের উপরে পরাগরেণুর সন্ধানে আসে, এবং যত ইচ্ছা পরাগরেণু মাখিয়া গর্ভাধানানন্তর যেন আশ মিটাইয়া নানা রূপ বোঁটা গুটাইয়া আবার জলের নীচে যথাস্থানে চলিয়া যায়।

গাছের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া মনে হয়, গাছ যেন সব জানে, সব বুঝে,—এমনি রূপে কার্য্য করিতেছে। জীবনরক্ষা তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, পরে বংশ-রক্ষা। বাড়িতে হইবে এবং আলো আবশ্যক, অমনি লাউ গাছ লোকের অজ্ঞাতসারে শাখার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ জড়াইয়া নিজের সুবিধা করিয়া ধীরে ধীরে আলোর দিকে উঠিতে লাগিল, শীতকালের জন্য সঞ্চয় চাই। অমনি কাণ্ডে কিম্বা মূলে আলু মূলা শ্বেতসার জমা করিয়া রাখেন। ডাল বড় ভারী হইয়াছে—ভাঙ্গে ভাঙ্গে—অমনি বট গাছ জট নামাইয়া দিয়া আপনাকে ভূমিতে দৃঢ়বদ্ধ করিল। গর্ভাধানের জন্য মক্ষিকা আবশ্যক, তাই ফুল corolla সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিস্তার করিয়া দূর হইতে মধুমক্ষিকাকে আকর্ষণ করিল, এবং তাহাকে খুব কাছে আনিয়া তোষণ করিবার জন্য মধুভাণ্ডে কিছু মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিল। গর্ভাধানও হইল, ফুলের ভিতর বীচিও জন্মিল, কিন্তু সে বীচি ফলের ভিতর হইতে বাহির হইবে কিরূপে—কিরূপেই বা দূরদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া সুবিধার জায়গায় পড়িবে?—অমনি ফল পাকিয়া সুমিষ্ট আস্বাদনে প্রাণীদের লোভ বাড়াইয়া প্রাণী কর্ত্তৃক নীত হইল ও ভুক্তাবশেষ বীচি ভূমিতে পড়িল; অথবা দোপাটীর মত শুষ্ক ফল আপনিই সজোরে ফাটিয়া দূরে বীচি নিক্ষেপ করিল; অথবা কোনও রূপে হাল্‌কা হইয়া বাতাসে উড়িতে উড়িতে সুদূরে গিয়া পড়িল (উদাহরণ তুলা, কুকসিমে, মাধবীলতা)। বাড়িবার সময় অতি শিশু অবস্থায় কোথায় সার রস পাইবে—অমনি বীজপত্রের ভিতর সঞ্চিত মার স্তন্য দুগ্ধের মত শিশু বৃক্ষকে পোষণ করিতে লাগিল। ফল ফুল অকালে পাছে জীবজন্তুরা নষ্ট করে—তাই কাঁটা দিয়া তাহাদের রক্ষা করা হইল (যথা, গোলাপ, বেগুন)।

জীবের জীবন উদ্দেশ্য মাখান। যেন কার হাত জীব-জীবনের সকল কার্য্যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আস্তিকের পক্ষে যত যুক্তি আছে, ইহার মত উৎকৃষ্ট যুক্তি আর নাই। মাধ্যাকর্ষণ জড়জগতের একনিয়মাধীনতা প্রমাণিত করিয়াছে। উদ্দেশ্যবাদ প্রাণিজগতে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট দেখাইয়াছে। এখন এই উদ্দেশ্য কাহার? কোন অন্ধ জড়শক্তির না আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কোন

চৈতন্যময় পুরুষের? অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে সেটি জড়শক্তিমাত্র—তাহাতেই তাঁহাদিগকে লোকে নাস্তিক বলে। কিন্তু তাঁহাদেরই তর্কানুসারে চৈতন্যময় হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। কারণ, অংশতম লইয়াই তো পূর্ণ হয়—সুতরাং জগতের ক্ষুদ্র অংশ মানবজীবন যদি চৈতন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলে সমগ্র জগতে যে সে গুণ বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ডারুইন এই উদ্দেশ্যবাদ অস্বীকার করেন; তাঁহার মতে সমস্তই আকস্মিক অঘটনঘটনা। মনুষ্য খাইবে বলিয় ধান যব গম সর্ব্বত্র জন্মায় না—সকল জায়গায় জন্মায় বলিয়াই সকল স্থানের মনুষ্যেরা তাহা খাইয়া অভ্যস্ত হইয়াছে।

"Flower is love and love is flower like" ফুলের কথা বলিতে গেলেই কবিতা আপনি আসিয়া পড়ে। ফুলমাত্রেই ভাব মাখান—কবিতা এবং ফুল একই কথা। শ্রেষ্ঠের তুলনা ফুল। রূপে গন্ধে মধু-মক্ষিকা আকৃষ্ট হয়—ফুল নামেই মানবের মন আকৃষ্ট হয়—বিশেষতঃ বয়সবিশেষে। মুকুলই হউক আর প্রস্ফুটিতই হউক, সকল অবস্থাই ভাল, "তবে কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো।"

অধিকাংশ ফুলই লাল ও পাতা সবুজ—ফলও সবুজ। লাল ও সবুজ পরস্পর সান্নিধ্যে বেশী খোল্‌তাই হয়। নিজ গাছের পাতায় আবৃত ফুলই সুন্দর দেখায়—না ছিঁড়িলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তোড়ায় ফুলের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়—একা একাই ভাল। তবে যদি Maiden hair ferns কুমারী চিকুর নামক ফুলের সঙ্গে কেবল একটি ফুল একলা ছোট তোড়ায় আবদ্ধ থাকে ত কবিত্বের বিকাশ হয় বটে—আর যদি বুকের 'বটন-হোলে' কেহ গুঁজিয়া দেয় ত আরও সুন্দর। তরুতে লতা জড়াইলে সুন্দর দেখায়—বিশেষ তরুতে যদি ফল এবং লতায় যদি ফুল থাকে—চূত ও নবমালিকার মত। উদ্যান ফুল বন্য ফুলের চেয়ে কিসে ভাল? পরাগকেশর গিয়া পাপ্‌ড়ি বাড়িয়াছে বলিয়া? মধুপুরের বড় গোলাপ-গুলিতে কি কাট গোলাপের চেয়ে বেশী মক্ষিকা বসে? ফুলমাত্রই ভাল; বিশেষ যখন শিশির পড়ে, বা ভ্রমর বসে।

তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কীট পতঙ্গ বসিয়া থাকে। এক জাতীয় ফুলই সকল জাতীয় পতঙ্গের প্রিয় নহে। ঐ দেখ, প্রস্ফুটিত কমলিনীর পাশ দিয়া সচ্ছন্দে সুন্দরকান্তি প্রজাপতি উড়িয়া গেল—তাহাতে কমলিনীও চঞ্চল নহেন—প্রজাপতিও ফিরিয়া চাহিল না। কিন্তু ভৃঙ্গের আগমনে কত চঞ্চলতা, কত আগ্রহ। সাদরসম্ভাষণে অগ্রসর হইয়া দেখেন,—গায়ে কুমুদ্বতীর রেণু মাখা। অভিমানে অধীর হইলেন—"যাও ভ্রমর ফুলে ফুলে মধু আহরণ কর—ছেলে খেলা কর। কুমুদিনী! তুমি ভিখারিণীর ধনকে হরণ করিলে।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

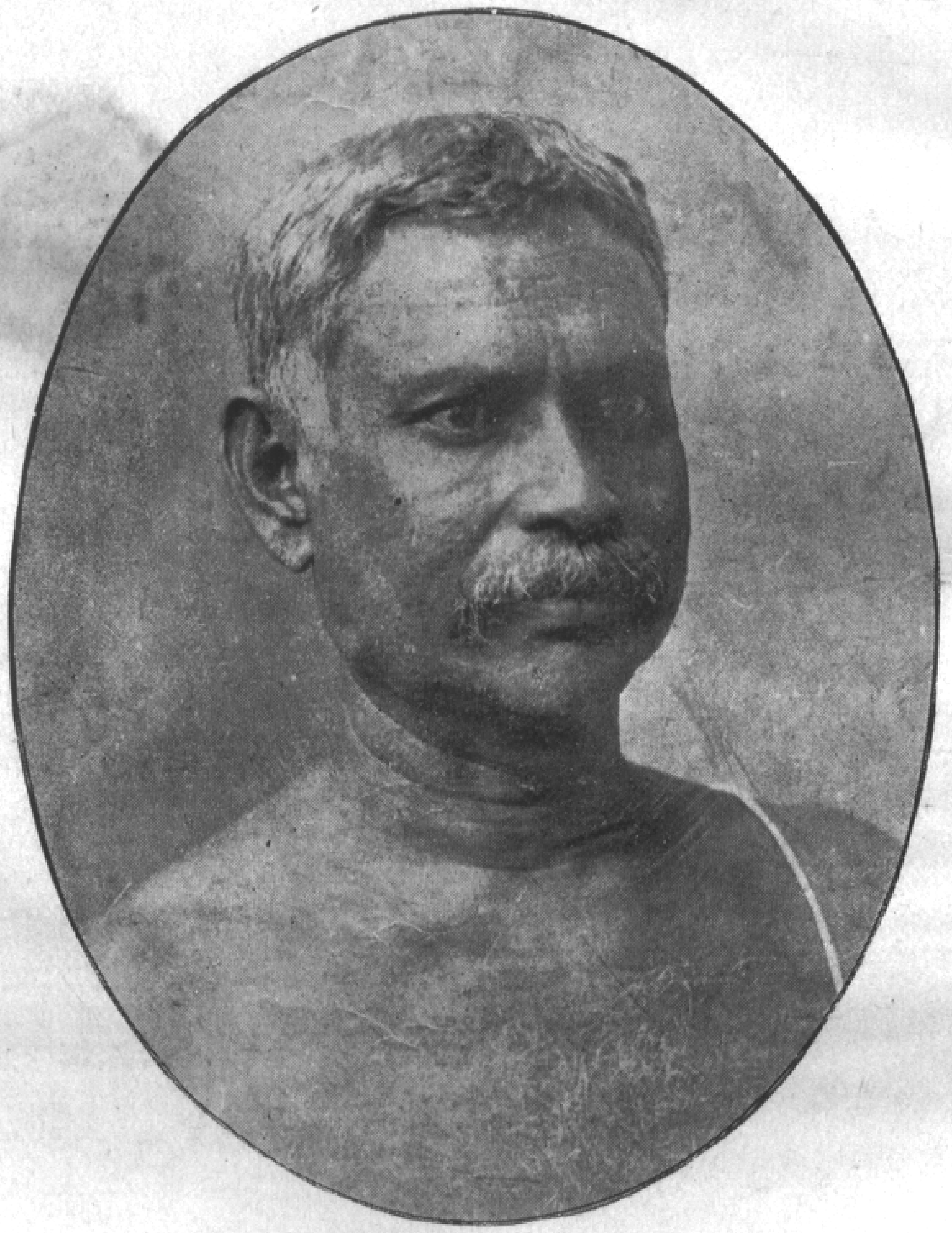
প্রদীপ। আশ্বিন। "কবির প্রতি কবিপ্রিয়া" শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কবিতাটির ছন্দের ঝঙ্কার ও ভাষার ঐশ্বর্য্য প্রশংসনীয়। কবিপ্রিয়ার কবিত্বসুরভি কামনায় যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "কাব্য ও কবিত্ব" নামক নিবন্ধটি উপাদেয়। উপসংহারে দেখিলাম, "হয় ত কেহ বলিবেন যে এই উদ্দীপনা মানুষকে জীবনের প্রতি অধিক আসক্ত করে—যাহা বেদান্তধর্ম্মের চক্ষে অতি নিন্দনীয়।" বেদান্তের এই সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে কাব্য ও কবিত্বকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় লেখক যে বাক্যব্যয় করিয়াছেন, বোধ করি তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।—"ফুলটিকে এই জন্য মধুতে পূর্ণ করিয়াছেন যে মধুকর তাহাতে বসিবে ও প্রাণ ভরিয়া মধুপান করিবে। সে যখন ফুলটির উপরে বসিতেছে তখন করতালি দিয়া তাহাকে তাড়ান যেমন, জগত ও মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষ যখন সুখী হইতেছে তখন তাহার পশ্চাতে বেদান্ত ধর্ম্মের তালি লাগাইয়া 'ওই আসক্তি ওই আসক্তি' বলিয়া তাহার সুখটুকু ভাঙ্গিয়া দেওয়াও তেমনি। দুই নির্দ্দয়তার কার্য্য।" উদ্ধৃত উক্তির উপমাটি মন্দ নয়, কিন্তু উপমা যুক্তি বা প্রমাণ নহে। বেদান্তের উকীলও বলিতে পারেন, মক্ষিকা যখন মধুর কলসীতে ডুবিয়া মরিতে যায়, বা পতঙ্গ যখন বহ্নিমুখে ঝাঁপ দিতে চায়, তখন কি 'তাহার পশ্চাতে বেদান্তধর্ম্মের তালি লাগাইয়া' তাহার সুখটুকু ভাঙ্গিয়া দিব না? এমন গুরুতর বিষয়ের বিচার উপমায় নিষ্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ বেদান্ত হইতে বঙ্গীয় কাব্য ও কবিত্বের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। প্রমাণ,—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার শুক্ল বেঞ্চের সম্মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শুভদৃষ্টি" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি মন্দ নহে। পশু পক্ষীর প্রিয় সঙ্গিনী কালা ও বোবা মেয়েটি সহজেই করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক করে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় "ঐতিহাসিক চরিত্রোদ্ধারে" প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এবার তিনি "জেব্‌উন্নিসা বেগমে"র চরিত্র উদ্ধার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক রচনায় হরিসাধন বাবুর প্রতিষ্ঠা আছে; "জেব্‌উন্নিসা" পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। গত বারে হরিসাধন বাবুর রচিত গুল্‌বদন বেগমের আমরা প্রশংসা করিয়াছি। পরে দেখিলাম, সে প্রশংসা মিসেস্ বেভারিজের প্রাপ্য। কলিকাতা রিভিউ পত্রে গত বৎসর মিসেস্ বেভারিজ "গুলবদন বেগম" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, হরিসাধন বাবুর প্রবন্ধে তাহার অতিরিক্ত কিছু নাই। আশা করি, এ প্রবন্ধটি সেরূপ নয়। "কুসুমে কণ্টক" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি কবিতা। প্রেমের 'রিয়ালিষ্টিক্' চিত্র কি এই? উপভোগ করিতে পারিলাম না। উপসংহারে—

"ভূধর দুরধিগম্য দূর হ'তে অতি রম্য
ধূম্র শ্যাম তুষারকিরীটী—
নিকটে বিকট শীর্ণ বন্ধুর কঙ্করকীর্ণ—
শুষ্ক যেন উকিলের চিঠী।"

দেখিয়া ক্যাম্বেলের

"'Tis distance lends enchantment to the view,
And robes the mountain in its azure hue."

মনে পড়ে;—কিন্তু "শুষ্ক যেন উকীলের চিঠী!" কবির নিজস্ব সুমিষ্ট বিদ্রূপ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "গীতিকা"র সমালোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার সব কুম্ভকার যদি কর্ম্মকারবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কোথায় কলসী কিনিব? অক্ষয় বাবু কি ইতিহাস ত্যাগ করিলেন? "বিচিত্র সংগ্রহ" বিলাতী কাগজের বস্তা-পচা। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর "পিপীলিকার যুদ্ধ" সত্য কাহিনী না রাজনৈতিক প্রহেলিকা? "হেসেই খুন" চমৎকার! ভাঁড়ামির উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে!



শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

KUNTALINE PRESS.

১৩০৪ সালের ভূকম্প।

অপ্রত্যক্ষ ভূকম্প।

বিনা যন্ত্রসাহায্যে যে প্রদেশে ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল,তাহাকে সংক্ষুব্ধ প্রদেশ বলা গিয়াছে। কিন্তু উহাই ভূকম্পের শেষ সীমা নহে। ঐ সীমার বাহিরে বহু দূরে যে সকল ভূকম্পন-লেখনাদি যন্ত্র স্থাপিত ছিল, তৎসমুদয়ে ১৩০৪ সালের ভূকম্প বিলক্ষণ জানা গিয়াছিল। ভূমির মৃদু স্পন্দন হইতে প্রত্যক্ষ-যোগ্য ভূকম্পপ্রদর্শন, বেগপরিমাণ, বলনিরূপণ করা এই সকল যন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সকল বিশেষ যন্ত্র ব্যতীত চৌম্বকত্ব ও তড়িত্ত্ব পরিমাণ করিবার নিমিত্ত য়ুরোপের অনেক স্থানে বহুবিধ যন্ত্রাদি আছে। ১৩০৪ সালের ভূকম্পের পর ঐ সকল যন্ত্রের লেখন আনীত হইয়াছিল।

ইটালীর দক্ষিণে ইস্‌চিয়া ও কাটেনিয়া হইতে উত্তরে পাভিয়া পর্য্যন্ত ভূকম্প-লেখন যন্ত্রসমূহ একে একে অপ্রত্যক্ষ কম্পন লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করে। ইটালী পার হইলে হলাণ্ড, রুসিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড প্রভৃতি বহুদূরবর্ত্তী দেশের যন্ত্রগুলি উক্ত ভূকম্পের নিদর্শন রাখিয়াছিল।

ইটালী হইতে সম্পূর্ণ লেখন পাওয়া গিয়াছিল। সেই সকল লেখনে ওল্‌ডহাম সাহেব কম্পনের তিন প্রকার অবস্থা অবগত হইয়াছেন। প্রথম অবস্থায় ভূমির তরঙ্গ হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে উহার পার্শ্ব দিকে গতি হইয়াছিল। সংক্ষোভপৃষ্ঠে কম্পন হইবার প্রায় ১২॥০ মিনিট পরে ইটালীতে ঐ পার্শ্ব-বিচলন লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ গতি থাকিতে থাকিতে প্রায় ৮॥০ মিনিট পরে দ্বিতীয় অবস্থা উপনীত হয়। এই সময়ের কম্পন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কম্পনে ভূমির উন্নমন অবনমন স্পষ্টতঃ ঘটিয়াছিল। শেষে প্রায় ২০মিনিট পরে দ্বিতীয় অবস্থা হইতে তৃতীয় অবস্থা ঘটে। এই অবস্থায় সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ভূমির মৃদু তরঙ্গ দেখা গিয়াছিল। য়ুরোপের উপর দিয়া এই সকল পৃষ্ঠতরঙ্গ চলিয়া গিয়াছিল। উহারা ৩৪ মাইল দীর্ঘ, ২০ ইঞ্চ উচ্চ, এবং এক একটি যাইতে ২২ সেকেণ্ড লাগিয়াছিল। এই অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল। কোন কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ কম্পনের বিরাম হয় নাই।

আসামের সংক্ষোভপৃষ্ঠ হইতে ঐ সকল স্থানের অন্তর মাইল জানা আছে। সুতরাং তথাকার কাল লইয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, যদি কম্পনগুলি

ঋজু রেখায় গিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমটি মিনিটে ৩৪৫ মাইল, দ্বিতীয়টি ২০০ মাইল, এবং তৃতীয়টি ১০৯ মাইল বেগে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু উহারা সম্ভবতঃ ঋজু রেখায় গমন করে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই বক্রপথে গিয়াছিল। তাহা হইলে উহাদের বেগ আরও অধিক ছিল। তৃতীয়টি ভূপৃষ্ঠ দিয়া গিয়াছিল। সুতরাং উহা মিনিটে ১০৯ মাইল না গিয়া ১১৫ মাইল বেগে ধাবিত হইয়াছিল।

ভূকম্পের দ্বিতীয় অবস্থাটি পূর্ব্বে জানা ছিল না। ওল্‌ডহাম সাহেব উহার আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং পরে অন্যান্য ভূকম্পেও উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। দেখা যায়, তৃতীয় অবস্থাটির বেগ ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব্বত্র এক ছিল। সুতরাং এই সকল পৃষ্ঠতরঙ্গ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সংক্ষোভপৃষ্ঠ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া এবং তথা হইতে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে ভূপরিধির চতুর্থাংশ দূরে সংক্ষোভপৃষ্ঠের ঠিক বিপরীত পৃষ্ঠে আবার একত্র হইয়াছিল। এখানে তরঙ্গগুলি পরস্পর ছেদ করিয়া পূর্ব্বদিকের তরঙ্গগুলি পশ্চিমদিকে এবং পশ্চিমদিকের পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত দেশের বেধালয়ের যন্ত্রসমূহকে তাহাদের আগমন জানাইয়া দিয়াছিল। এই তত্ত্বটি এইবারেই এই ভয়ঙ্কর ভূকম্পনে প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বার কম্পনের নিদর্শন অস্ফুট হইলেও নিশ্চিত। এডিনবরায় প্রথম কম্পনের মাদ্রাজি কাল অপরাহ্ণ ৪ ঘঃ ৪৯ মিঃ, তাহার ৩ ঘঃ ১ মিঃ পরে যন্ত্রে কম্পনের দ্বিতীয় আগমন জানা যায়। এইরূপ অন্যান্য বেধশালায় গড়ে ৩ ঘঃ ২ মিঃ পরে দ্বিতীয় আগমন ঘটে। গড়ে ব্যবধান ২০৩২১ মাইল। সুতরাং মিনিটে বেগ ১১১ মাইল।

সংক্ষোভপৃষ্ঠ হইতে এডিনবরা ভূপৃষ্ঠ দিয়া প্রায় ৫০০০ মাইল। ভূকম্পন সেখানে প্রথমে যে বেগে গিয়াছিল, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় ২০০০০ মাইল ঘুরিয়া সেই বেগে আসিয়াছিল। অতএব এই সকল তরঙ্গ নিশ্চয়ই পৃষ্ঠভাগ দিয়া ধাবিত হয়।

ভূকম্পের প্রকৃতি।

এই ভূকম্পের কিরূপ প্রকৃতি, তাহা উপরের বিবরণসমূহ হইতে কতকটা বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনার ফল সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করাইতে ওল্‌ডহাম সাহেব ভূকম্পের কার্য্যকারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচীনকাল হইতে ইটালীতে বিভিন্ন প্রকৃতির ভূকম্প পর্য্যালোচিত হইয়া

আসিতেছে। তথায় ভূকম্প চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কোন কোন ভূকম্পে ভূপৃষ্ঠকে পার্শ্ব দিকে ইতস্ততঃ নড়িতে দেখা যায়; কোন কোনটায় তরঙ্গের আকারে চলিতে দেখা যায়; কোন কোনটায় উপরনীচে নড়িতে দেখা যায়, এবং কোন কোনটায় ঘুরিতে দেখা যায়। শেষোক্তপ্রকার ঘূর্ণনগতি সকলে স্বীকার করেন না। কিন্তু এই ভূকম্পে ওল্‌ডহাম সাহেব ঐ প্রকার ঘূর্ণনগতির লক্ষণ পাইয়াছেন।

পূর্ব্বকালে ভূকম্পের গতি তত জানা ছিল না ; কারণ, স্থূল অনুমান ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। এক্ষণে ভূকম্পলেখন যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। জাপান ও ইটালী দেশেই এই সকল যন্ত্র সম্যক্ ব্যবহৃত এবং লেখনের অর্থ যথোচিত আলোচিত হইতেছে। তথাপি কোন প্রচণ্ড ভূকম্পের কেন্দ্রস্থলের গতি জানা নাই ; এমন কি, সংক্ষোভপৃষ্ঠের গতিও জানা নাই। কারণ, তত্তৎস্থলের যন্ত্রাদিসমেত গৃহ বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সংক্ষোভপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লেখন আছে। দেখা গিয়াছে, ভূকম্প প্রচণ্ড হইবার পূর্ব্বে দ্রুত কিন্তু মৃদু স্পন্দন হইতে থাকে, এবং উহা হঠাৎ দীর্ঘ হইয়া উঠে। তাহার পর কম্পন বিলম্বে বিলম্বে হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়।

তরঙ্গশব্দ অনেকবার ব্যবহার করা গিয়াছে। তরঙ্গগতি কিরূপ, তাহা একটু বলা যাইতেছে। পুষ্করিণীর স্থির জলে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে জলে সংক্ষোভ জাত হয়, এবং ঐ সংক্ষোভস্থল হইতে চারি দিকে সমান্তরে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল তরঙ্গ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পুষ্করিণীর পাড়ের দিকে ধাবিত হয়, এবং পুষ্করিণী বৃহৎ হইলে পাড়ের নিকট না আসিতে আসিতেই তরঙ্গগুলি মিশিয়া যায়। অবশ্য তরঙ্গে সংক্ষোভস্থলের জলকণা পাড়ের দিকে চলিয়া যায় না। প্রত্যেক জলকণা এক এক কক্ষায় নড়িতে থাকে, এবং শেষে স্থির হয়। এই সকল কক্ষা বৃত্তাভাস, কিংবা বৃত্তাকার হইয়া থাকে।

এই প্রকার তরঙ্গগতি পৃষ্ঠদেশেই উৎপন্ন হয়। গভীর জলে এইপ্রকার তরঙ্গ উৎপাদন করিলেও উপরের কিয়দংশ জল তরঙ্গায়িত হয়, নিম্নের জল অধিক নড়ে না, নড়িলেও শীঘ্র সাম্যভাবে আসে। একটি তরঙ্গের শিখর হইতে দ্বিতীয় তরঙ্গের শিখর পর্য্যন্ত উহার দৈর্ঘ্য এবং তরঙ্গের গর্ভ হইতে শিখর পর্য্যন্ত উহার উচ্চতা বলা যায়। এই প্রকার তরঙ্গের জলকণার গতির কারণ মাধ্যাকর্ষণ বা ভার। যে জলটা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ভারবশতঃ তাহা নিম্নগামী হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার শক্তি পরবর্ত্তী জলে প্রদান করে। উহা

আবার উৎক্ষিপ্ত ও নিপতিত হয়। এইরূপ সমুদয় জলের পৃষ্ঠভাগে হইতে থাকে। ভারবশতঃ এই প্রকার তরঙ্গের উৎপত্তি বলিয়া ইহাকে ভারতরঙ্গ (gravitational waves) বলা যায়।

রবর, বেত প্রভৃতি স্থিতিস্থাপক পদার্থে আর একপ্রকার তরঙ্গ জন্মে। রবর-সূত্র টানিয়া বেত বাঁকাইয়া ছাড়িয়া দিলে উহারা নড়িতে থাকে। কোন বল দ্বারা উহাদের আয়তন কিংবা আকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া বলটি অপসৃত করিলে উহারা পূর্ব্বায়তন ও পূর্ব্বাকৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এই গুণকে স্থিতিস্থাপকতা বলা যায়। রবরের ন্যায় কঠিন বস্তুর আয়তন ও আকৃতি উভয়েরই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু জল ও বায়ুর ন্যায় তরল বস্তুর স্বকীয় আকৃতি নাই, উহাদের কেবল আয়তন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়।

তবে, স্থিতিস্থাপকতা দুই প্রকার; আকৃতিগত ও আয়তনগত। এই দুই প্রকার স্থিতিস্থাপকতাগুণে দুই প্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। চাপে আয়তন কমাইয়া চাপ সরাইয়া লইলে কঠিন ও তরল বস্তুর কণাসমূহের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। রবর-সূত্র টানিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহাতে এইরূপ তরঙ্গ জন্মে। কোন এক স্থানের কণাসমূহ পরস্পর দূরগত হয়, এবং তাহার পরবর্ত্তী কণা-সমূহ পরস্পর নিকটস্থ হয়। এক স্থানে প্রসারণ, তার ঠিক পরবর্ত্তী স্থানে সংকোচন। পরম সংকোচনস্থলটি জলের তরঙ্গের শিখরের সমতুল্য। সুতরাং এক সংকোচনস্থল হইতে দ্বিতীয় সংকোচনস্থল পর্য্যন্ত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও সংকোচনবশতঃ এই প্রকার তরঙ্গের উৎপত্তি বলিয়া ইহাকে সংকোচন-তরঙ্গ (condensational waves) বলা যায়। বলা বাহুল্য, এই প্রকার তরঙ্গ যাবতীয় কঠিন দ্রব ও বায়বীয় পদার্থে উৎপাদন করিতে পারা যায়। দেখা যাইবে, যে দিকে কণাগুলি নড়িতে বা কম্পিত হইতে থাকে, সেই দিকেই বা রেখায় এক স্থানের তরঙ্গ অন্য স্থানে ধাবিত হয়। জলের তরঙ্গে এরূপ হয় না। জলকণা উপর নীচে নড়িতে থাকে, কিন্তু তরঙ্গ তাহার সমকোণে চলিয়া যায়।

কিন্তু একগাছি বেত মাঝে বাঁকাইয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা দুলিতে থাকে। বেতের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার ফল। অবশ্য কঠিন ভিন্ন তরল বস্তুতে এই প্রকার ঘটিতে পারে না। কিন্তু এখানে জড়কণা অগ্রপশ্চাৎ নড়িতে থাকে, এবং তরঙ্গ ঐ দোলনের সমকোণে চলিয়া যায়। প্রত্যেক জড়কণা

যেন ক্লকঘড়ীর দোলক হয়, এ দিক ও দিক দুলিতে থাকে, কিন্তু তরঙ্গটি উপর ও নীচের দিকে চলিয়া যায়। দুই দিকের পরম বিচলনের মধ্যবর্ত্তী অন্তর এই প্রকার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং কোন বস্তু বাঁকাইলে জাত হয় বলিয়া উহাকে বক্রণ-তরঙ্গ (distortional waves) বলা যায়।

সংকোচন ও বক্রণ-তরঙ্গ কোনও বস্তুর ভিতর হইতে পৃষ্ঠভাগে আসিয়া ভার-তরঙ্গের আকার ধারণ করিতে পারে। লর্ড রেলি প্রকৃত পৃষ্ঠতরঙ্গের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। এগুলি পৃষ্ঠতরঙ্গ বটে, কিন্তু স্থিতিস্থাপকজ তরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হয়। যাহা হউক, উগ্র ভূমিকম্পে পৃষ্ঠতরঙ্গ পুনঃপুনঃ লক্ষিত হইয়াছে। সেগুলি রেলির বর্ণিত তরঙ্গ হউক না হউক, তাহাদের অস্তিত্বে কোনও সন্দেহ নাই। এতদ্‌বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

যদি পৃথিবী সমজাতীয় পদার্থে গঠিত হইত, তাহা হইলে উহার অভ্যন্তরে কোন স্থানে কোন বিচলন হইলে, তাহার ফল উপরিলিখিত স্থিতিস্থাপকজ তরঙ্গের ত্রিবিধ আকারের কোন এক আকারে সর্ব্বত্র ধাবিত হইত। যদি তিন প্রকার তরঙ্গই জাত হইত, তাহা হইলে তাহারা ধাবিত হইতে হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িত। সংকোচন-তরঙ্গ প্রবলতম বেগে চলিয়া যাইত, তাহাদের পশ্চাতে বক্রণতরঙ্গ, এবং তাহাদের পশ্চাতে পৃষ্ঠতরঙ্গ যাইত। প্রথম দুই তরঙ্গ পৃথিবীর ভিতর দিয়া চলিয়া যাইত, এবং পৃষ্ঠতরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের চারি দিকে ব্যাপ্ত হইত, কাজেই অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগিত। কিন্তু পৃথিবী সমজাতীয় পদার্থে গঠিত নহে। কাজেই ভূকম্পজনিত তরঙ্গের প্রকৃতি সর্ব্বত্র এক থাকে না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, প্রত্যেক প্রচণ্ড ভূকম্পের পূর্ব্ব ও উত্তর কম্পন হইয়া থাকে। এগুলি ছাড়িয়া দিলেও ছোট বড় ভূকম্পের প্রকৃতি এক নহে। যে ভূকম্পে তাদৃশ আশঙ্কা হয় না, কিংবা কোন কিছু ক্ষতি হয় না, সেটি বোধ হয় সংক্ষোভকেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থিতিস্থাপকজ কম্পনমাত্র। প্রচণ্ড ভূকম্পে ঐ প্রকার গতি ব্যতীত স্থিতিস্থাপকজ পৃষ্ঠতরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেগুলির উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠে, সংক্ষোভপৃষ্ঠ স্থলের মধ্যে।

এই প্রত্যক্ষযোগ্য ভূকম্পনগতির বিশেষত্ব আছে। উহা যেমন চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, উহার স্থিতিকাল প্রথমে বাড়ে, এবং পরে কমে। ১৩০৪ সালের ভূকম্পে ইহা সবিশেষ দেখা গিয়াছিল। সংক্ষোভপৃষ্ঠস্থলের মধ্যে ঐ কম্পন ২ মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় নাই, কলিকাতায় উহা ৫।৬ মিনিট

ছিল, ৫০০ মাইল দূরে প্রায় ৭ মিনিট ছিল। এখানে স্থিতিকাল পরম হইয়া পরে কমিতে কমিতে আমেদাবাদে দুই এক সেকেণ্ড মাত্র ছিল। ইহার অর্থ এই যে, সেখানে কম্পন অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অদৃশ্য হয় নাই।

সংক্ষুব্ধ প্রদেশে এই কম্পনবশতঃ ক্ষতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ভূমির পৃষ্ঠভাগেই কম্পন থাকে। পরীক্ষা করিয়া জাপানে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের ২০ ফুট নীচেই উহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অধিক নীচে ত কথাই নাই। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্প রাণীগঞ্জের কয়লা-খনিতে প্রত্যক্ষ হয় নাই।

ভূকম্পের কারণ।

ভূমিতে আঘাত বা সংক্ষোভবশতঃ উহা কাঁপিয়া উঠে, এবং সেই কম্পনবশতঃ স্থিতিস্থাপকজ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পাহাড় ধসিয়া গেলে, ঘর পড়িয়া গেলে,খনি ফাটিয়া উঠিলে, বারুদখানায় আগুন লাগিলে,চারি দিকের মৃত্তিকা কাঁপিয়া উঠে। এই প্রকার সংক্ষোভ বা আঘাত ভূমির পৃষ্ঠে ঘটে। ভূকম্প শব্দে এই প্রকার কম্পন বুঝায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে নৈসর্গিককারণবশতঃ যে সংক্ষোভ জন্মে এবং তাহাতে পৃথিবীর যে কম্পন অনুভূত হয়, তাহাকেই সচরাচর ভূকম্প বলা হইয়া থাকে।

নৈসর্গিক কারণগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১) ভূগর্ভস্থ গহ্বরের ছাদ ও পার্শ্বের পতনবশতঃ ভূমি কাঁপিয়া উঠে। এই কারণে কম্পন কিন্তু ক্ষীণ হয়; এমন কি, উহার শব্দমাত্র শুনা যাইতে পারে, কিন্তু কম্পন আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। (২) আগ্নেয় গিরির উৎক্ষেপের সময় ভূমি কাঁপিয়া উঠে। ভূপৃষ্ঠনিম্নে জলীয় বাষ্প হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ-বিবরপথে বহির্গমনের চেষ্টাতেও ভূকম্প হয়। এ সকল কারণে যে ভূকম্প হয়, তাহাও তাদৃশ বহু দূরে অনুভূত হয় না। (৩) যে সকল ভূকম্প প্রচণ্ড ও বহুদূরব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়, সেগুলির কারণ পৃথিবীর গঠনের সহিত সম্বদ্ধ। একটি খিলানের উপর ভারী ছাদ আছে। ছাদের ভারবশতঃ খিলানটি এমন অবস্থায় থাকে যে, উহার মধ্যভাগ বিস্তৃত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় খিলানটি বহুকাল থাকিতে পারে। কিন্তু উহা টান বা তান অবস্থায় নিয়ত থাকে। ভূপৃষ্ঠের নিম্নে কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা এই প্রকার তান অবস্থায় থাকে। সেই তানের হঠাৎ শান্তি হইলে ভূকম্প হয়। আগ্নেয়

গিরির উৎক্ষেপচেষ্টাতে তান হঠাৎ উৎপন্ন হয়, প্রকৃত ভূকম্পে সঞ্চিত তানের হঠাৎ শান্তি হয়। সুতরাং উভয়ের কারণে বিস্তর প্রভেদ।

মূল কারণ ছাড়িয়া দিলে ভূবিদ্যায় দেখা যায় যে, ভূত্বক্ প্রায় সর্ব্বত্রই বিকৃতাকার হইয়াছে। কোথাও উহার কিয়দংশ এক দিকে উঠিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বাঁকিয়া গিয়াছে, কোথাও কুঞ্চিত হইয়াছে। সমান হইয়া পূর্ব্বে যতখানি স্থানে বিস্তৃত ছিল, এইরূপ বক্রণ কুঞ্চনের ফলে তাহার অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যত্র, ভূত্বকের প্রস্তরসমূহ মাঝে এমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, একটা পাশ হইতে অন্য পাশ শত বা সহস্র ফুট উপরে উঠিয়াছে। অবশ্য প্রচণ্ড বল ব্যতীত ভূত্বকের এরূপ বৈরূপ্য সম্ভাবিত হয় নাই। যেখানের প্রস্তর সমধিক দৃঢ়, সেখানে সেই বলবশতঃ প্রস্তরসমূহে তান জন্মিয়াছে। সেই তানের হঠাৎ শান্তিতে ভূ কম্পিত হইয়া উঠে।

এই তানাবস্থার কারণ প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। কেন না, ভূগর্ভের নিসর্গ চিরকাল অজ্ঞাত। তথাপি বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর অতীব উচ্চ। উপরের কিয়দংশ নিয়ত প্রায় এক প্রকার উষ্ণ বা শীতল দেখা যায়; সুতরাং তাপবিকীরণবশতঃ এখানে আর সংকোচন হইতেছে না। কিন্তু ইহার নীচের প্রস্তরসমূহ এখনও শীতল হয় নাই; সেখান হইতে তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; এবং ফলে সেখানটা ক্রমশঃ হ্রস্বায়তন হইতেছে। এই দুই অবস্থার ক্রিয়ায় উপরের শীতল অংশটা কতকটা যেন নিরবলম্ব হইয়া আছে। কাজেই ভূত্বকের স্থানে স্থানে তান জন্মিয়াছে।

তানের এই আনুমানিক কারণ প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত জটিল। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, সকলেরই শেষফল ভূত্বকের বিদারণ। বিদারণও এক প্রকার নহে। বিদীর্ণ প্রস্তরের অংশদ্বয় উর্দ্ধাধঃ স্খলিত (fault) হইতে পারে, কিংবা একটি অংশের উপরে অপরটি সরিয়া পড়িতে পারে (overthrust) ইত্যাদি। এইরূপে ভূত্বকের নববিধান হয় বলিয়া জাত ভূকম্পকে বৈধানিক ভূকম্প (lectonic earthquake) বলা যায়। ইহাদের সহিত আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের বা উৎক্ষেপচেষ্টার কোনও সম্বন্ধ নাই। ১৩০৪ সালের ভূকম্পের পর আসাম ও উত্তরবঙ্গে একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, কালে সেখানে আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইবে। বর্ত্তমান জ্ঞানে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

১৩০৪ সালের ভূকম্পের কারণ, ভূত্বকের নিম্নে প্রস্তরসমূহের হঠাৎ স্ফোটন (explosion) কিংবা দীর্ঘাকার বিবরের বিদারণ নহে। এত বহু স্থানে ভূপৃষ্ঠের এত স্থায়ী বিচলন দেখা গিয়াছে যে,তদ্দ্বারা বোধ হয়, ভূত্বকের বিদীর্ণ অংশদ্বয়ের একটি অপরটির উপরে খসিয়া পড়িয়াছে।

তাহাও এক ক্ষুদ্র স্থানে কিংবা এক রেখায় নহে। বহুবিস্তৃত স্থানে ভূমির বিচলনের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। এ জন্য ওল্‌ডহাম সাহেব মনে করেন যে, উক্ত ভূকম্পের কেন্দ্র একটি না হইয়া অনেক ছিল, এবং অনেকগুলি ভূকম্প যুগপৎ ঘটিয়াছিল। কিংবা গভীর স্থানের একটি সংক্ষোভকেন্দ্র হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়াছিল।

বাস্তবিক যে ভূপৃষ্ঠ পার্শ্ব দিকে বিচলিত হইয়াছিল, তাহা নানা লক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের পরস্পর স্থিতি নির্ণীত ও পরিমিত হইয়াছিল। ভূকম্পের পরে তত্তৎস্থানে পুনর্ব্বার নিরীক্ষিত ও পরিমিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বতন স্থিতির ও উচ্চতার প্রভেদ ঘটিয়াছে। বোধ হয়, আসামের পাহাড়গুলি হিমালয় ও আল্পস্‌ পর্ব্বতের ন্যায় পার্শ্বস্থ সংপীড়নে (lateral compression) জাত না হইয়া এইরূপ তির্য্যক্‌ স্খলনে উৎপন্ন হইয়াছে।

যাহা হউক, এই ভূকম্পের যে কারণ অনুমিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উহার অনেকগুলি নৈমিত্তিকের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বহুবিস্তৃত স্থানের স্থায়ী বিচলন, স্থানীয় স্খলন, বিদারণ, এবং পৃষ্ঠবিষমতা, বুঝিতে পারা যায়। যে বিস্তৃত স্থানে সংক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বের মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য ঠিক সীমা রেখার নির্দ্দেশ করা অতীব দুষ্কর। তথাপি উহা যে স্থূল সীমা, তাহা বলিতে পারা যায়। উহার ক্ষেত্রফল প্রায় ৬।৭ সহস্র বর্গ মাইল, দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল, এবং পরম বিস্তারে প্রায় ৫০ মাইল ছিল।

ভূপৃষ্ঠের কত নিম্নে সংক্ষোভকেন্দ্র ছিল, অন্যান্য উপায়ের মধ্যে কম্পন-বেগ হইতে তাহার গণনা করিতে পারা যায়। এতদ্দ্বারা দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ মাইল নিম্নে সংক্ষোভকেন্দ্র ছিল। কিন্তু সূক্ষ্মকালনির্দ্দেশের অভাবে ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে ওল্‌ডহাম সাহেব উপরি-উক্ত গভীরতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভূগর্ভের আনুমানিক নিসর্গ বিচার করিয়া ওল্‌ডহাম সাহেব মনে করেন যে, ভূপৃষ্ঠের ৫ মাইল নিম্নের এ দিকেই সংক্ষোভ ঘটিয়াছিল।

১৩০৪ সালের ভারতের ভূকম্প।



ছায়াবৃত অংশ—সংক্ষুব্ধ প্রদেশ।

স্বল্পছায়া—সংক্ষোভপৃষ্ঠের আনুমানিক সীমা।

ভূকম্পের নৈমিত্তিক।

১৩০৪ সালের আসামের ভূকম্পে বহুবিধ নৈমিত্তিক দৃষ্ট হইয়াছিল। উহা যেমন প্রচণ্ড হইয়াছিল, উহার নৈমিত্তিকগুলিও তেমনই ভয়ানক হইয়াছিল। ভূকম্প আরম্ভের দুই এক মিনিটের মধ্যে শিলঙ্গের সমুদয় বড় বড় বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছিল, পাহাড় বিদীর্ণ হইয়াছিল, কোথাও ধসিয়া গিয়াছিল, সমস্থলীর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া দীর্ঘ বিবরের উৎপত্তি করিয়াছিল, কোন কোন বিবর হইতে জল ও বালুকা নির্গত হইয়াছিল, সংক্ষোভপৃষ্ঠের স্তম্ভাদি ঘুরিয়া পড়িয়াছিল। এই সমুদয় নৈমিত্তিকের কারণ সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করাইতে হইলে, জড়বস্তুর ধর্ম্মব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সকলগুলির কারণও অদ্যাপি অজ্ঞাত। ওল্‌ডহাম সাহেব যে সকল কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কয়েকটি বলা যাইতেছে।

পূর্ব্ববর্ণিত ভূকম্পন-গতি স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সংক্ষোভপৃষ্ঠের উপরের বড় বড় বাড়ী ভূকম্পে কখনই স্থির থাকিতে পারে না, এবং প্রচণ্ড ভূকম্পে নিশ্চয়ই সেগুলি ভূমিসাৎ হইবে। দূরবর্ত্তী কলিকাতার অনেক বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছিল। সাহেব মহলের বাড়ীই অধিক ফাটিয়াছিল, দেশী মহলের তত বাড়ী ফাটে নাই। বাড়ী ফাটিবার অনেক কারণ ছিল, তন্মধ্যে বাড়ীর নির্ম্মাণক্রম প্রধান। সাহেবী বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীবারান্দা এবং পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা দোতালা বা তেতালা খোলা বারান্দা প্রায়ই থাকে। এই প্রকার নির্ম্মাণের ফলে, সমগ্র বাড়ীটি এক প্রকার ভারী, দৃঢ় বা উচ্চ হয় না। বস্তুতঃ বিভিন্ন অংশের ভার ও পরিমাণ বিচার করিলে ঐ প্রকার বাড়ীকে তিন ভাগ করিতে পারা যায়। দুই দিকের বারান্দা এবং মধ্যের অংশ,—এই ভাগ তিনটি অসমান। সুতরাং ভূকম্পে যখন বাড়ীটি দুলিতে থাকে, উহার উক্ত তিন অংশ তিন প্রকার বেগে এদিক ওদিক হইতে থাকে। কোন অংশ অধিক দূরে, কোন অংশ বা অল্প দূরে যাইতে থাকে; ফলে উহারা একবার পরস্পর নিকটস্থ এবং পরক্ষণে দূরস্থ হইতে থাকিলে নিশ্চয়ই ফাটিয়া যাইবে। এইরূপে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে দুই পাশে দুইটা লম্বা ফাট দেখা গিয়াছিল। যে বাড়ীর মধ্যের গৃহগুলির এবং বারান্দার ছাদের কড়ি একই দিকে উত্তর-দক্ষিণে ছিল; সেগুলি বেশী ফাটে নাই। কিন্তু যে সকল বাড়ীর ঘরের কড়ি পূর্ব্ব-পশ্চিমে এবং বারান্দার কড়ি উত্তর দক্ষিণে ছিল, সেগুলি বেশী ফাটিয়াছিল।

পূর্ব্বকালের নির্ম্মিত বাড়ীর আলিশা ও কার্ণিশ প্রায়ই ভারী ও দুর্ব্বল ছিল। ভূকম্পে এরূপ মাথাভারী আলিশা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিংবা বালি শুরকির পুরু পলস্তারা খসিয়া পড়িবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জড়বস্তুর প্রধান ধর্ম্ম, তাহার নিশ্চেষ্টতা ; যেখানে রাখ, উহা সেইখানেই থাকিতে চায়, দোলাইয়া দাও, উহা দুলিতেই থাকে। এই কারণে সবলের সহিত দুর্ব্বলের, দৃঢ়ের সহিত অদৃঢ়ের, কঠোরের সহিত কোমলের যোগ কখনও স্থায়ী হয় না। একটি নড়িলে, অপরটি ঠিক তেমনই বেগে নড়ে না, কাজেই যোগস্থল বিয়োগে পরিণত হয়। উহারা পৃথক্ থাকিলে বরং ক্ষতি হয় না, কিন্তু পরস্পর যুক্ত থাকিলে ক্ষতি অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। বিষম পদার্থের যোগই ভূকম্পের অধিকাংশ নৈমিত্তিকের কারণ।

প্রায় সমুদয় উগ্র ভূকম্পে ভূমিতে দীর্ঘাকার বিবরের উৎপত্তি এবং রন্ধ্র-পথে জল বালুকা কর্দ্দমের নির্গমন ঘটিয়া থাকে। গভীর ও অগভীর বিবরের উৎপত্তির কারণ এক নহে। অগভীর বিবরগুলি কম্পন-গতির ফল ; উপরের মাটি ফাটিয়া কিছু দূর নীচে পর্য্যন্ত সেই ফাট বিস্তৃত হয়। গভীর বিবরগুলির কারণ ভিতরের প্রস্তরসমূহের স্খলন। তাহারই চিহ্নস্বরূপ উপরে ফাট দেখা যায়। সুতরাং গভীর বিবরগুলিকে বরং ভূকম্পের কারণ বলিতে পারা যায়। যেখানে এরূপ বিবরের উৎপত্তি হয়, সেখানে ভূকম্প অবশ্য প্রচণ্ড হয়।

যদি ভূপৃষ্ঠের সকল স্থলের মৃত্তিকা সমান দৃঢ় বা সমান শিথিল হইত, যদি উপরের ও নীচের মৃত্তিকা এক প্রকার হইত, তাহা হইলে লম্বা লম্বা ফাট সহজে উৎপন্ন হইত না। মনে করুন, কোন স্থান দিয়া নদী গিয়াছে এবং তাহার পাড় শিথিল বালুকা বা কর্দ্দমময় স্তরের উপরে আছে। এরূপ হইলে যখন নদীর পাড় নড়িতে থাকিবে, তখন উহার কিয়দংশ একবার নদীর দিকে এবং পরক্ষণে বিপরীত দিকে নড়িতে থাকিবে। নীচের মৃত্তিকা তত সংহত নহে। কাজেই উপরের পাড় তাহার উপর দিয়া সহজে নড়িতে পারিবে। অবশেষে নদীর সমান্তরে পাড়ের মাঝে ফাট দেখা যাইবে। তবে, ভূমির পার্শ্বগতির ফলে এই প্রকার ফাট উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু কেবল পার্শ্বগতি দ্বারা ফাটের ভিতর দিয়া নীচের জল ও বালুকা নির্গত হইতে পারে না। এ জন্য ভূমির উর্দ্ধাধঃগতি আবশ্যক। উপরের লিখিত শিথিল স্তরের নীচের স্তর যদি উপর দিকে আসিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার গতি শিথিল স্তর দিয়া উপরের দৃঢ় মৃত্তিকায় চালিত হইবে বটে,

কিন্তু এই দৃঢ় মৃত্তিকা সহজে নড়িবে না। ফলে শিথিল স্তরটি উপর নীচে চাপ পাইতে থাকিবে। শিথিল স্তর পর্য্যন্ত কোন ফাট থাকিলে, চাপের ফলে সেই ফাট দিয়া জল ও বালুকা বহির্গত হইতে থাকিবে। কোন পদার্থ একবার বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে তাহার স্রোত সহজে বন্ধ হয় না। কাজেই ভূকম্পে ভূপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধাধঃগতি সবিরাম হইলেও বালুকানির্গমন অবিরাম হইতে থাকে। বিবরের দুই পার্শ্বের চাপে সবিরাম নির্গমন অবিরাম হইয়া পড়ে। ভূকম্পের পর শিথিল স্তরের উপরের চাপ আর থাকে না, তখন উপরের নির্গত জল ভিতর হইতে যেন টান পাইয়া আবার তথায় প্রবেশ করে।

কিন্তু সকল স্থলেই নদীর পাড়েই ফাট হয় নাই। নদী ও পুকুরের পাড়ে অধিক হইলেও অন্যত্রও হইয়াছিল। এই সকল ফাটের কারণ প্রায় অজ্ঞাত। বোধ হয়, যখন ভূপৃষ্ঠ জলের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তখন কোন স্থানের মৃত্তিকা সঙ্কুচিত এবং অপর কোন স্থানের মৃত্তিকা প্রসারিত হইতে থাকে। ফলে ভূপৃষ্ঠ বাঁকিয়া গিয়া কোথাও গর্ত্ত এবং কোথাও শিখরে পরিণত হয়। এরূপে ঘটিলে উপরের মৃত্তিকা সহজে ফাটিয়া যাইতে পারে।

নদী ও পুকুরের দূরের ফাটগুলি রাস্তা ও বাঁধের সমান্তরে সমান্তরে দেখা গিয়াছিল। সে সকল স্থলে, দুর্ব্বলের সহিত সবলের, বা লঘুর সহিত গুরুর বিষম যোগ ঘটিয়াছিল। ফল, যোগের পরিবর্ত্তে বিয়োগরূপ বিবরের উৎপত্তি। রাস্তা ও বাঁধ প্রস্তুত করিতে দুই পাশের মাটি কাটা হওয়াতে উক্ত প্রভেদ আরও অধিক হইয়াছিল। এই সকল ফাট যে তরঙ্গগতির সমকোণে ছিল, এমনও নহে। ফাটের দিকের সহিত তরঙ্গগতির ফাটের সম্বন্ধ অজ্ঞাত আছে। বোধ হয়, মৃত্তিকাভেদে ফাটগুলি বিভিন্ন দিকে হইয়া থাকিবে।

এই ভূকম্পে আর এক প্রকার বিবর উৎপন্ন হইয়াছিল। খাসিয়া ও গারো পাহাড়ের পাদ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পললময় মৃত্তিকা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ভূকম্পের পর পাদদেশের পরেই ১০।১২ হাত বিস্তৃত নালা বা খাত হইয়া খাতের এদিকের মাটি বাঁধের মত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল খাতের কারণ পাহাড় ও সমস্থলীর পরস্পর ঠেল। পুনঃ পুনঃ পাহাড়ের ঠেল পাইয়া পাদদেশের মৃত্তিকা সরিয়া পড়িয়াছিল।

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ধারে যে সকল টেলিগ্রাফ তারের খুঁটি ছিল, ভূকম্পের পরে তাহাদের অনেকগুলি পূর্ব্বের রেখায় না থাকিয়া ৭। ৮ হাত দূরে চলিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, স্থানীয় মৃত্তিকার গুণে খুঁটিগুলি দূরে সরিয়া

গিয়াছিল। হয় ত নীচে শিথিল মৃত্তিকা ছিল, তাহার উপর দিয়া খুঁটি সহ উপরের মৃত্তিকা সরিয়া গিয়াছিল। এইরূপ, উত্তর বঙ্গে, নিম্ন আসামে ও ময়মনসিংহের সমান ধান্যক্ষেত্রসমূহ তরঙ্গের আকারে কোথাও গর্ত্ত ও কোথাও বা শিখরে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকার কারণে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথের মনশাই প্রভৃতি নদীর স্তম্ভ পার্শ্ব দিকে বিচলিত হইয়া থাকিবে। কোন কোন নদীর পাড় গর্ত্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়াতে নদীর বিস্তার কম হইয়াছিল। রেলপথের লৌহ রেলগুলা কোন কোন স্থানে পাশে বাঁকিয়া গিয়াছিল। রেল বাঁকার অর্থ দুই প্রান্ত চাপে নিকটস্থ হইয়াছিল। দেখা গিয়াছিল, যে স্থানে রেল বাঁকিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতএব বোধ হইতেছে, স্থানে স্থানে মৃত্তিকা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এদিকে বা ওদিকে সরিয়া গিয়াছিল।

এই সকল নৈমিত্তিকের কারণ ভূপৃষ্ঠের পার্শ্বগতি, উহার সহিত উর্দ্ধাধঃ গতি যুক্ত হইলে অন্যবিধ নৈমিত্তিক ঘটে। বালুকা ও জল নির্গমনের কারণ এই। কিন্তু কোন কোন স্থানে ভূকম্পের পরে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্গমন বন্ধ হয় নাই। এত ঘণ্টা না হউক, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্গমনের সংবাদ অনেক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থানে জলমিশ্রিত বালুকা ১০ ১২ হাত উচ্চ হইয়া নির্গত হইয়াছিল। কামরূপ, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে জলময় বালুকার উৎস দেখা গিয়াছিল। এ সকলের কারণ অজ্ঞাত।

কোন কোন স্থানে কূপ, পুষ্করিণী ও নদীর গর্ভ উচ্চ হইয়াছিল। বালুকার উৎক্ষেপে কূপাদি পূর্ণ হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নহে। কোন কোন নদীর উপরে বাঁশের সেতু ছিল। দেখা গিয়াছে, মাঝের খুঁটা উপর দিকে উচ্চ হইয়াছে। অতএব নদীর গর্ভই উপরে উঠিয়াছিল।

গারো পাহাড় ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে অনেক স্থান নিম্ন ছিল। মধ্যে মধ্যে খাল বা নালা ছিল। গ্রীষ্মকালে এই সকল খালে বেশী জল থাকিত না বটে, কিন্তু বন্যার সময় বিস্তর জল ঐ সকল খালপথে চলিয়া যাইত। ভূকম্পে ১০। ১২ গভীর খালগুলা পাড়ের সমান উচ্চ হইয়াছিল। ফলে সেই বৎসর বর্ষাকালে তথাকার চারি দিকের ভূমি জলমগ্ন হইয়াছিল। বহুনিম্ন হইতে মৃত্তিকা আসিয়া নদীগর্ভ উচ্চ করে নাই। নদীর পাড়ের মাটি নিম্নগত হইয়া নদীগর্ভকে উচ্চ করিয়াছিল। বস্তুতঃ ভূকম্পের একটি সাধারণ ক্রিয়া এই দেখা যায় যে, নিম্নভূমি উর্দ্ধগত এবং উচ্চভূমি নিম্নগত হইয়া ভূপৃষ্ঠ সমান হয়।

ভূপৃষ্ঠের বিবর বা বালুকোদ্গীরক ছিদ্র সকল অবশ্য পার্ব্বত্য প্রদেশে হইতে পারে নাই; যেখানে পুরাতন সুসংহত পলিন ছিল, সেখানেও হয় নাই। ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী মধুপুর জঙ্গলে, গঙ্গার উত্তর এবং আসাম উপত্যকায় লালবর্ণ পুরাতন পলিন দেখা যায়। সুসংহত বলিয়া উহাতে ফাট উৎপন্ন হয় নাই। নূতন পলিনেও শিথিল বালুকান্তর সর্ব্বত্র নাই। এই সমস্ত প্রদেশ ব্যতীত, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, এবং নঁওগা, শিলেট ও কাছাড়ের অধিকাংশ স্থানে, বঙ্গদেশের মধ্যে রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ, পূর্ণিয়া, পাবনা, বগুড়া, এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকার অনেকাংশে বিবর দেখা গিয়াছিল। স্থূলতঃ পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৪০০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩৫ মাইল স্থানে ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছিল। এই সকল ফাট লম্বায় ২। ৩ শত হাত, প্রস্থে দুই এক আঙ্গুল হইতে ২। ৩ হাত পর্য্যন্ত ছিল।

ভূকম্পে গারো ও খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্ব ধসিয়া পড়িয়াছিল। পাহাড় ধসার অর্থ গায়ের শিথিল মৃত্তিকার অপসরণ। ভূকম্পে যখন পাহাড় এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে, তখন কঠিন প্রস্তরময় পর্ব্বত এবং উপরের শিথিল মৃত্তিকা এক সঙ্গে দুলে না। একত্র না দুলিলে একটি অপরটি হইতে পৃথক্ হয়। যে পাহাড় যত ঋজু ও উচ্চ, এবং যাহাতে যত মৃত্তিকা থাকে, তাহা তত ধসিয়া পড়ে। শিলং ও গৌহাটী পথে পাহাড়গুলা ১৪।১৫ মাইল পর্য্যন্ত বেশ উচ্চ, সেখানে ধসা পাহাড়ও অধিক। চেরাপুঞ্জীতে অল্প পাহাড় ছিল, যাহার গাত্র মৃত্তিকাবিহীন হয় নাই। তাহার নিকটবর্ত্তী একটা উপত্যকা ভগ্নপ্রস্তরমৃত্তিকায় এবং বৃক্ষাদির স্তূপে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, পুরাতন নদীটি বিলুপ্ত হইয়া উপরে একটি পথ হইয়াছিল।

আর একটি নৈমিত্তিকের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। চেরাপুঞ্জী, শিলঙ্গ, গৌহাটি, তেজপুর, দারজিলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে কোন কোন স্তম্ভাদি আবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছিল; ভূকম্পের পূর্ব্বে যে স্তম্ভ যে দিকে ছিল, ভূকম্পে তাহা হয় ত ১২, ২০, ৩০, ৪০, ৯০ অংশ পর্য্যন্ত বামে বা দক্ষিণে ঘুরিয়া গিয়াছিল। সংক্ষোভপৃষ্ঠের নিকটস্থ চটক নামক স্থানে একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল। উহা টালি ইট দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। নীচে উহা লম্বে চৌড়ায় ৮ হাত এবং উচ্চতায় ৪০ হাতেরও অধিক ছিল। ভূকম্পে ঐ স্তম্ভ চারি খণ্ডে ভাঙ্গিয়া যায়। উপরের ৪ হাত ও ৯ হাত লম্বা দুই খণ্ড ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের নীচের প্রায় ১৪ হাত একটা খণ্ড নীচের অবিচলিত

খণ্ডের উপরে প্রায় ৩০ অংশ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইরূপ, তেজপুরে ডাক্তার সাহেবের একটা লোহার ছোট সিন্দুক কাঠের চৌকীর উপর বসান ছিল, ভূকম্পে তাহা বাম দিকে ৪০ অংশ ঘুরিয়া গিয়াছিল।

অন্যান্য কোন কোন ভূকম্পে স্তম্ভাদির এইরূপ আবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। এই আবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ওল্‌ডহাম সাহেব এই সকল মতের আলোচনা করিয়া ভূকম্পে পৃষ্ঠভূমির ঘূর্ণন স্বীকার করিয়াছেন, এবং বলেন যে, ভূকম্পের সংক্ষোভ একই দিক্‌ হইতে আসে না, ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ হইতে আসে বলিয়া স্থানে স্থানের পৃষ্ঠভূমি ঘুরিয়া যায়।

ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া যে সকল বিবরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগকে পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে। উহাদের কতকগুলি গভীর। অগভীর বিবর বা ফাটগুলি ভূকম্পের ফল, গভীর বিবরসমূহ ভূকম্পের কারণ। টুরা হইতে প্রায় ৩৫ মাইল পূর্ব্বোত্তরে চেদরাং উপত্যকায় ১২ মাইল দীর্ঘ একটা বিবর উৎপন্ন হইয়াছে। এই ফাট উত্তর দক্ষিণে লম্বা, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট নদী। ঐ ফাট পার হইয়া যাইতে যাইতে কোথাও পুষ্করিণী কোথাও জলপ্রপাতে পরিণত হইয়াছে। ফাটটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা; উহার পূর্ব্বদিকের অংশ পশ্চিমদিকের অংশাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে। এক স্থানে পূর্ব্বদিকের অংশ প্রায় ২৪ হাত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে! এইরূপ অন্যান্য স্থানে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ ও স্খলিত হইয়া পূর্ব্বের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভূত্বকের স্খলন (fault) ভূকম্পের স্থায়ী নৈমিত্তিক। এইরূপ, কোথাও বা ভূপৃষ্ঠ উচ্চ নীচ হইয়া জলতরঙ্গের শিখর ও গর্ভের ন্যায় দৃশ্য হইয়াছে। উচ্চ শুষ্কভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে বাঁশের ঝাড় ছিল, সেখানে গভীর জল; যেন দুই পার্শ্ব হইতে ভূপৃষ্ঠ নত হইয়া খালের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় শত মাইল পর্য্যন্ত আসামের পাহাড়গুলির উত্তর প্রদেশে স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূকম্পের কয়েক মাস পরে শীতকালে সেখানে পুনর্ব্বার ভূমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা পরিমিত হইয়াছিল। ভূমিরেখা (base-line) ঠিক নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই। এ জন্য পরিমাণ দ্বারা স্থায়ী পরিবর্ত্তন সবিশেষ নিরূপিত হইতে পারে নাই। তথাচ জানা গিয়াছে যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম পরিমাণ হইয়াছিল, এবং তখন সেখানকার ভূপৃষ্ঠ যেমন ছিল, ভূকম্পের পরে আর সেরূপ নাই।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। এই বিষয় সম্বন্ধে ওল্‌ডহাম সাহেব তাঁহার ভূকম্পবৃত্তান্তে কিছু

লেখেন নাই। এ দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল উগ্র ভূকম্প অনুভূত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের কম্পনপৃষ্ঠজ্ঞাপক একখানি মানচিত্র তিনি যোজিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, ১৮০৩, ১৮১৯, ১৮৩৩, ১৮৫৮, ১৮৬৯, ১৮৮১, ১৮৮৫, এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ, আসাম ও বেহারে উগ্র ভূকম্প হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, ১৮৪২ ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর প্রদেশে দুইবার ভূকম্প হইয়াছিল। তবে, ১০০ বৎসরের মধ্যে এ দেশে দশবার উগ্র ভূকম্প হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের দুইটি ভূকম্প ছাড়িয়া দিলে, অপর আটটি ভূকম্পের সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ প্রায়ই আসাম হইতে পাটনা পর্য্যন্ত কোন না কোন স্থানে ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ভূকম্পের কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরে এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মালবপ্রদেশে ছিল। কিন্তু কোনটির কেন্দ্র দক্ষিণাপথ বা পশ্চিমভারত ছিল না। মধ্যভারতে একটির মাত্র কেন্দ্র ছিল। সুতরাং বোধ হইতেছে, ভূগর্ভের যে নিসর্গবশতঃ দক্ষিণাপথের জন্ম হইয়াছিল, তাহার শান্তি হইয়াছে, কিন্তু যদ্দ্বারা আসামের পাহাড় ও হিমালয়ের উৎপত্তি, তাহার এখনও বিরাম হয় নাই। ইহার ফলে বঙ্গদেশকে এখনও অনেক বার কম্পিত হইতে হইবে। এই শতাব্দীতে যে সকল ভূকম্প ভারতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেগুলির কেন্দ্র যেন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে। আসামের পাহাড়গুলিও অত্যন্ত পুরাতন নহে। ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলিতে অদ্যাপি উহাদের ত্রিবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে যে পুরাতন পৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সেই পুরাতন পৃষ্ঠ সহিত ভূত্বক স্খলিত হইয়া পাহাড় হইয়াছে। সমভাবে সর্ব্বত্র এক সঙ্গে স্খলিত না হইয়া এখানে ওখানে বিদীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উহাই পাহাড়গুলির দ্বিতীয় অবস্থা। তার পর, নদীসমূহ উহাদের পরিবর্ত্তনসাধন করিতে করিতে উহাদিগকে তৃতীয় অবস্থায় আনিয়াছে। যখন পূর্ব্বাবস্থার লক্ষণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তখন উহাদের বয়ঃক্রম অধিক নহে। সুতরাং যে কারণে উহাদের উৎপত্তি, তাহাদেরও বোধ হয় অবসান হয় নাই। তাই বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভাগ্যে এখনও অনেক বিপত্তি লিখিত আছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

রেণু। *

কাব্যখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই চতুর্দ্দশপদী—সনেট্-জাতীয়। বঙ্গের কাব্যামোদী বিদ্বজ্জন রচয়িত্রীর প্রতিভার সহিত একেবারে অপরিচিত নন। মাসিকপত্রে তাঁহার রচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়; কিন্তু এই নব-প্রচারিত পুস্তকখানি পাইয়া তাঁহারা যে তদীয় প্রতিভার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ লাভ করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং অপরিমিত আনন্দের বিষয় এই যে, "রেণু" এই বিনয়-ব্যবহৃত নামটি, সারমাধুর্য্যে ও প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে, আপনার দীন অর্থ সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা করিয়াছে। বস্তুতঃ, "রেণু" পুষ্পপরাগ—সুকোমল ও সৌরভময়; তুচ্ছ ধূলি নহে।

ছন্দোময়ী শব্দমালিকায় যদি ভাব-সৌরভ না থাকে, যদি তাহাতে একতম রসেরও আস্বাদ না পাই, চিত্তরঞ্জিনী সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি তাহার সামর্থ্যের বহির্ভূত হইলে, তাহা বাস্তব পক্ষে ব্যর্থ। অবশ্য, সুনিপুণ শব্দসমাবেশ রচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; যথাস্থানে যথাযোগ্য কথাটির প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ "রচনা-রসিক"গণেরই সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু, ললিত কোমল শব্দবৃন্দের অন্তরালে ভাব বা রস না থাকিলে, রচনা নিষ্ফল, প্রাণহীন, শুষ্ক। সুন্দরতম মানবদেহ যদি মনোহীন বা জীবনবিরহিত হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যরাশি বৃথা নয় কি?

ইহা অতি পুরাতন ও সুধীসম্মত কথা। কিন্তু, আজিকালিকার কবিতায় শব্দ-ঝঙ্কারই বেশী শুনিতে পাই। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অনেকেই রবিবাবুর শব্দ-সম্পদের সুষমায় মুগ্ধ হইয়া, কেবলমাত্র ভাল ভাল শব্দ গাঁথিয়া মিলাইয়া জোর করিয়া কবি হয়েন। কি বিড়ম্বনা! যদি তাঁহারা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রবি বাবুর অসাধারণ ভাব-বৈচিত্র্য ও নবনব রসোদ্ভাবনশক্তির কণামাত্র অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেন! তাঁহাদের লেখা পাঠককে তন্ময় করে না; কারণ তাঁহারা স্বয়ং বিষয়বিশেষের শোভায় বা কল্পনার ধ্যানে পরমানন্দ পাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন না। এরূপ চেষ্টা-রচিত রচনায় ছন্দ ভাষা থাকিতে পারে, কবিত্ব থাকে না। সুখের বিষয়, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে, সুনির্ব্বাচিত শব্দের ও বিবিধ প্রকার মনোহর ভাবের একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে। ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া ভাষা অনাদৃত হয় নাই, এবং ভাষাকে লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লেখিকা ভাবকে হারান নাই।

আমাদের অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি সুখ বা বেদনা, আনন্দ বা অবসাদ, তৃপ্তি বা অভাব অনুভব করি, যাহার নাগাল কোন ভাষাই সহজে পায় না, হৃদয় নিজেই সেই বিচিত্র সুখানন্দের বা ব্যথাবসাদের সম্পূর্ণ সত্তাটুকু আপনার আয়ত্ত করিতে পারে

* শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বিরচিত।

না—তাহা grasp করিতে পারে না। হৃদয় যখন এইরূপ সুখে অভিভূত, বা বেদনায় নিপীড়িত, তখন আমরা বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি, আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলি; কবির তখন লিখিবার সময় নয়। তার পর, যখন পুনর্ব্বার আপনাদিগকে ফিরিয়া পাওয়া যায়, প্রকৃত কবি প্রতিভাবলে তখন সেই অনুভূতিকে ভাষায় মূর্ত্তিমতী করেন। যে বিচিত্র সুখ দুঃখ বাসনা আমাদের চিরপরিচিত, অথচ সম্যক ধারণার অতীত, যাহা, আমরা মনে করি, ভাষার বন্ধনে ধরা দিবে না, কবি তাহাই সোনার ছন্দে বাঁধিয়া পাঠকের নয়ন-সম্মুখে আনিয়া দেন। ইহাতে যে নিপুণতা ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, রেণু-রচয়িত্রীর তাহা যথেষ্ট আছে। পাঠক নিম্নের কবিতাটি পড়িলেই কবির ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন :—

প্রত্যাগমন।

একদা বাদলঘেরা শ্রাবণ-নিশীথে,
আজন্মের ব্যর্থ সাধ বাঁধিয়া আঁচলে
গিয়েছিনু একাকিনী বিসর্জ্জন দিতে
পরিপূর্ণা জাহ্নবীর সর্ব্বগ্রাসী জলে।
অজানা আঁধার-পথে, দুঃস্বপ্ন-বিহ্বল
কম্পিতহৃদয়ে শেষে উতরিনু আসি
জনশূন্য নদীতটে, খুলিয়া অঞ্চল
যেমনি ফেলিতে যাব, বিদ্যুতের হাসি
উঠিল চমকি; আমি দেখিনু চাহিয়া
সব ব্যথা সব দুঃখ মিলিয়া মিশিয়া
এঁকেছে উজ্জ্বল করি তোমারি আনন;
ফেলিতে নারিনু তাই, সজল নয়ন,
তাহারে চাপিয়া ধরি বক্ষের উপরে,
শ্রান্তপদে সিক্তদেহে ফিরে এনু ঘরে।

এই কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধুনা বহুতর মাসিকে অনেক কবিতা প্রচারিত হইতেছে, অগণ্য নূতন পুস্তকেরও প্রকাশ হইতেছে। অধিকাংশই পড়িবার সুযোগ পাই, কিন্তু প্রায় সকলগুলিই পরক্ষণে চিত্তগৃহ হইতে "বেমালুম" অপসৃত হয়! এই কবিতাটির সৌন্দর্য্যরেখা কিন্তু এত দিনেও চিত্তপট হইতে মুছিয়া যায় নাই, ইহার সুরের রেশ তদবধি কাণে বাজিতেছে। আজ পুনরায় উহা পড়িয়া পূর্ব্ববৎ নিবিড় প্রীতি অনুভব করিতেছি। কবি স্বয়ং যেমন তন্ময়চিত্তে লিখিয়াছিলেন, পাঠক উহা পাঠ করিয়া তেমনই উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কবিতাটি পাঠকের মনে একটি সুন্দর স্থায়ী ভাব রাখিয়া যায়। শব্দগুলি কেমন যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট—যেখানে যে বিশেষণটি বসাইলে জিনিসটি ক্ষিপ্রগতিতে পাঠকের মনোরাজ্যে প্রবেশ করে, লেখিকা অনায়াস নৈপুণ্যসহকারে তাহা বসাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, ভাবটি মৌলিক, রচয়িত্রীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে।

বহু চেষ্টা করিয়া, বহু বাক্যব্যয় করিয়া সাধারণে যে মনের কথাটি ব্যক্ত করিতে না পারে,

ক্ষমতাশালী কবি তাহা সহজেই স্বল্প কথায় প্রকাশ করিতে সমর্থ। লেখিকা এ বিষয়েও বেশ সফল হইয়াছেন। তিনি দু'টিমাত্র ছত্রে আপনার মনের ভাব কি সুন্দর তুলনাত্মক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

সম্পূর্ণ রাগিণী তুমি, শুধু ক্ষণতরে
আমি তারি মাঝখানে মূর্চ্ছনার মায়া।

বস্তুতঃ, ভাব ও ভাষা উভয়ে মিলিয়া যে অলৌকিক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, তাহাতে হৃদয়বান জনকে মোহিত হইতেই হইবে। ইঁহার কাব্যখানির দ্বারা পাঠক-হৃদয়ে যে স্নিগ্ধতা, যে কারুণ্য, যে অনাবিল স্ত্রীজনোচিত কোমলতা সঞ্চারিত হয়, তাহা বস্তুতই শান্তিপ্রদায়ক, প্রাণস্পর্শী, এবং বিচিত্র সুখ-বেদনার উৎপাদক। কবিতার একটি যে প্রধান গুণ,—suggestiveness, তাহাও "রেণু"তে যথেষ্ট আছে।

রচনাবিশেষে কতকগুলি শুদ্ধ আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিলাম বলিয়া যে ভাবকে স্ফুটতর করিবার জন্য তাহাদের সহিত কথিত শব্দ নিবিষ্ট করিতে পাইব না—এই বিধি মানিয়া চলিতে অক্ষম। যে কোন রসাত্মক শব্দ অন্তরের ভাবটি ব্যক্ত করিতে পারে, তাহাই সংস্কৃত লিখিত কথার সহিত একত্র বসিবার সর্ব্বথা যোগ্য—প্রচলিত কথিত শব্দ হইলই বা। লেখিকা যে বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয় না রাখিয়া এইরূপে শব্দাবলী সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতার ভাব বিশদ হইয়া উঠিয়াছে—ভাষা অন্তরের অনুভূতিময় মৌন বাণীকে পরিস্ফুট করিয়াছে। বঙ্গের মহাত্মা কবি ৺ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ইহা ঠিক বুঝিয়াছিলেন ; তাই তাঁহার রচনা এমন মনোগ্রাহিণী—ভাবের আভিজাত্য তাঁহার লেখায় ত আছেই।

একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি বলিয়া, কেহ ভাবিবেন না, কেবলমাত্র একটিই উল্লেখ-যোগ্য। "রেণু"র অধিকাংশ কবিতাই এইরূপ সুন্দর। কল্পনার মায়াময় করস্পর্শে কবিতাগুলি সঞ্জীবিত, লেখিকার ভাষায় উৎফুল্ল ; ইহারা পাঠকের হৃদয়কে প্রীতি-উৎসারিত করিতেই যেন উন্মুখ। "ম্লানিমা", "প্রেমের অবনতি", "মমতা", "অন্বেষণ", "অবিচার", "আশঙ্কা", "তুমি ও আমি", "প্রেম-কোজাগর", "চিরবিস্ময়", "স্মৃতিলোপ" "লজ্জা" প্রভৃতি কবিতাগুলি সুধাসিক্ত। কাব্যানুরাগী সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এই অমৃত উপভোগ করিতে অবহেলা করিবেন না।

সমস্ত বহিখানিতেই যে চিত্তাকর্ষণী প্রতিভার বিকাশ দৃষ্ট হইল, তাহা শান্ত, সরল, সংযত। সুরটি যথার্থই অঙ্গনাজনসুলভ। কবিতাগুলির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সব ক'টিই মানসিকবেদনা-ব্যঞ্জক, একান্ত করুণরসাত্মক, পাঠকের মন বিগলিত করে। পড়িয়া মনে হয়, কবি যেন প্রিয়জনবিরহে "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং" দেখিতেছেন। যেটি দেখিতেছেন, যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই সেই মুখ সেই হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে—অথচ ভিন্ন ভিন্ন বেশে এবং অলৌকিক কিন্তু পরিচিত রূপোচ্চয়সংঘাতে নিরুপম। তিনি "যে নামে যে ছলে" প্রাণের বীণাটি বাজাইতে গিয়াছেন, আপনার দুর্লভদর্শনেরই "সাড়া সারা ভুবনে" পাইয়াছেন। তচ্চিন্তামগ্ন হইয়া নিজের তুলিটি ধরিয়া যেমন একখানি চিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, অমনই তাহাতে তাঁহারই মূর্ত্তি

সহসা জাগিয়া ওঠে বিদ্যুৎ আকারে,

বিস্তারি' সকল বিশ্বে, জীবনের পরে
অসীম সুন্দর শোভা———।

করুণাবিমুখ মৃত্যু যে সুমহান ক্ষতি করিল, বঙ্গগৃহলক্ষ্মী তজ্জন্য ঈশ্বরে অবিশ্বাস না করিয়া, কিংবা অভিশপ্ত জীবনের প্রাণান্তকরী বিষকণিকাগুলি দেবলোকোদ্দেশে বা মর্ত্ত্য-গৃহে না ছড়াইয়া, সকরুণকণ্ঠে আপনার হৃদয়ের নিকট—বা অদৃশ্যবপু হৃদয়াধিকের নিকট তাহার গুরুত্ব প্রশ্নে উত্তরে ভাবে ভাষায় জানাইয়াছেন। দুর্ব্বল হৃদয়ের সেণ্টিমেণ্টালিটি নাই—আছে শুধু নম্র গভীর ভালবাসার পরিচয়, হারাণ প্রেমের জন্য সুকঠোর তপশ্চরণস্বীকার। এই কাতর সুরের জন্য "রেণু" সমধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে। প্রমথ বাবু "গীতিকায়" গাহিয়াছেন,

"যে গানটি লাগে কাণে অতি সুমধুর
তারি মাঝে বাজে কোন অশ্রুসিক্ত সুর।"

ইহা বড়ই সত্য। ভীরু কোমলস্বভাব বাঙ্গালী বলিয়া যে "অশ্রুসিক্ত সুর" ভালবাসি, তাহা নয়; সহৃদয় মানবমাত্রেরই নিকট অশ্রুসিক্ত সুর মধুরতম। এ কথা শূরী পাশ্চাত্যেরাও স্বীকার করেন।

ইহাতে বীরাঙ্গনার অস্ত্রঝঞ্ঝনাধ্বনি বা অম্বর-বিদারী স্বদেশ-হিতৈষণার চীৎকার নাই সত্য —নাই বা থাকিল। প্রেম যদি বর্ণে চিত্রে ছন্দে গীতে কণ্ঠে যন্ত্রে নব নব মোহিনী মূর্ত্তি, অলোকসামান্য কলাশ্রী, বিচিত্র লাবণ্য-প্রভা লইয়া, মানস কাননে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে, দিগ্বিদিকে গন্ধামোদ বিকীর্ণ করে, মানবকে পঙ্কিল পার্থিব চিন্তা হইতে আলোকময় মহান্ ভাব-রাজ্যে লইয়া যায়—তাহা হইলেই জীবনের মুহূর্ত্তগুলি স্পৃহনীয়, মধুময়। প্রেম সকলই দিতে পারে, জাতীয় উদ্দীপনা দিতে কি অসমর্থ? যদি বাঙ্গালী জাগে, প্রেম-মন্ত্রেই জাগিবে। বক্তৃতার কশাঘাতে বা কলমের খোঁচায় "more than dead" এই জাতিটি জাগিবে কি? অতএব, হে মাতৃভূমিসেবাব্রত আর্য্য! এ কাব্যে জাতীয় সঙ্গীতরব নাই বলিয়া ঘৃণা করিও না, খুঁজিয়া দেখ, উজ্জ্বলতম মহার্ঘ রত্ন ইহার ভিতর রহিয়াছে। আজ কাল কতকগুলি Puritan বঙ্গীয় "প্রেম" নামে, প্রেমাত্মক কবিতায় শিহরিয়া উঠেন; তাঁহারা চান, গম্ভীরনাদী "জাতীয় সঙ্গীত," "বীররসাত্মক কবিতা-দুন্দুভি" ইত্যাদি! তাঁহারা যেন এ সকল কবিতা পড়িয়া লেখকগণকে অনুগ্রহ না করেন।

প্রেম আর লালসা এক নহে, love এবং lust দু'টি বিভিন্ন জিনিস—উভয়ের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা অনেকে ভুলিয়া যান, বা দেখিতে পান না। প্রেমের বিরাট স্বরূপ সাধারণের সঙ্কীর্ণ ভোগাবিল জীবনে সহজে প্রতিভাত হয় না। "রেণু"-রচয়িত্রী যে শুদ্ধ উদার সুনিপুণ ভাষায় প্রেমের মহিমাময় প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:—

ব্যর্থ চেষ্টা।

শুধু চতুর্দ্দশ পদে বাঁধানিতে চাই
যে প্রেমের অন্ত নাই, নাহি যার শেষ;
প্রতি ছত্রে, প্রতি ছন্দে, তাই বাধা পাই,

তাই মোর কবিতার হেন দীন বেশ।
এ যেন মুকুরতলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে.
নিত্য নব রূপময়ী প্রকৃতির মায়া
গড়িয়া রাখিতে চাই মর্ম্মর আকারে।
সব পড়ে নাক চোখে ; কত থেকে যায়
চঞ্চল জীবনলীলা নাহি দেয় ধরা ;
হাসিটি ফুটিলে, অশ্রু ফোটেনাক হায় ;
হেরি যদি নভঃস্থল, শ্যাম বসুন্ধরা
পড়ে থাকে বহুদূরে ; নির্ঝর নিক্কণে
সমুদ্রের বজ্রনাদ জাগে না স্মরণে।

কবি-কণ্ঠে, ভক্ত-স্তোত্রে, মহতের হৃদয়ে চিরদিনই প্রেম গীতাঙ্কিত।

লেখিকা সভয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে "উৎসর্গে" আরম্ভ করিয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠে দেবের বাস, স্মরিয়া তাঁহারে,
ভক্ত দিয়ে যায় পূজা এই পৃথ্বী পরে ;
গঙ্গাতীরে, তীর্থস্থানে, মন্দির-দুয়ারে,
আনন্দে পূরিত প্রাণ, নমি ভক্তিভরে।

পায় না তাঁহার দেখা, জানেনাক হায়
সার্থক হ'ল না হ'ল সে পূজা তাহার,
তবু লয়ে আসে পূজা, তবু তৃপ্তি পায়
উদ্দেশে চরণ বন্দি পূজ্য দেবতার।

তুমি আজ বহুদূরে, দুর্লভ-দর্শন !
তবু তুমি একমাত্র উপাস্য আমার,
এই স্নেহ, এই প্রীতি, ধেয়ান-ধারণ
এই গীতগুলি মোর সেই উপহার।

এই প্রাণের ভাষা, সকাতর আবেদন, যত দূরেই কেন বাঞ্ছিত থাকুন না, তথায় পঁহুছিবে। প্রীতির বন্ধনই দৃঢ়তম—সোদরে সোদরে, স্বামীতে স্ত্রীতে, বা ভক্তে উপাসিতেই হউক ; জাতিতে জাতিতে, দেশে বিদেশে, বা লোকে লোকান্তরেই হউক।

আমরা এই আন্তরিকতাপূর্ণ, স্বচ্ছন্দহৃদয়জাত, প্রজ্ঞা-মহিমাদীপ্ত পেলব কাব্যখানি পড়িয়া প্রচুর প্রীতি পাইলাম। যদি "রেণু"র সহিত আর কোনও বাঙ্গলা কাব্যের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য থাকে, তাহা "মাধবিকা" ও "শ্রাবণী"র। "রেণু"র উপাদেয় ভাষা বলেন্দ্র বাবুর কাব্য দুখানিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৯ আশ্বিন, ১৩০৭।

প্রমথনাথের পিতার মৃত্যুর পর পিতার কন্যাদায়গ্রস্ত বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত আত্মীয়তার আবরণে তাঁহার নিকট বিবাহ করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। বিবাহ করিবার কথাটা সেই প্রথম প্রমথনাথের মাথায় উঠিল। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইল না।

২

প্রমথনাথের পিতা বেশ গুছাইয়া গিয়াছিলেন; অর্থাৎ পুত্রকে নিষ্কর্ম্মা থাকিবার যথেষ্ট সুবিধা দিয়া গিয়াছিলেন। পুত্রও সে সুবিধা অবহেলা করা যুক্তি-যুক্ত মনে করে নাই।

কবিতা রোগটা প্রমথনাথের বাল্য-সঙ্গী। তবে পিতার ভয়ে তরুণ কবিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কবিতা লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ইহাতে দুইটা উপকার হইয়াছিল—প্রথমতঃ, পাঠকসম্প্রদায়কে তাহার 'ছেলেখেলা' পড়িবার যন্ত্রণা পাইতে হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, কলমের গাছের মুকুল প্রথম দুই একবার ভাঙ্গিয়া দিলে যেমন পরে পরিপুষ্ট মিষ্ট ফল পাওয়া যায়, তেমনই সে তাহার প্রথম উদ্যমের রচনাগুলি নষ্ট করায় তাহার শেষের রচনার পাক অতি মিষ্ট ও মধুর হইয়া আসিয়াছিল।

এইবার প্রমথনাথ কতকগুলা গীতিকবিতা একত্র করিয়া প্রকাশ করিল। যুবকের কবিতা—সুতরাং বলা বাহুল্য—প্রেম-ঘটিত। সংবাদপত্রের সম্পাদক-গণ কেহ কেহ মুরুব্বির চালে বলিলেন,রচনা বিশেষ আশাপ্রদ; চর্চ্চা রাখিলে লেখক কালে সুকবি হইতে পারিবেন। প্রমথনাথ প্রথমেই ভাল জিনিস লইয়া আসিয়াছিল। পাঠকসমাজে বোকার অভাব নাই;—তাঁহারা বলিলেন, অতি অল্প লেখকই এমন জিনিস লইয়া প্রথম আসরে দেখা দেন।

এই সময় এক জন ব্রাহ্ম প্রমথনাথের বাটীর ঠিক পার্শ্বের বাড়ী ভাড়া লইলেন। তাঁহার যুবক পুত্রদিগের সহিত অল্প দিনেই প্রমথনাথের পরিচয় হইল। পরিচয় ক্রমে সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইল। প্রমথনাথ দেখিল, কবিতাটা তাহাদের পরিবারের রোগ,—তাহারা সকলেই অল্পবিস্তর কবি। কবিতা ও সমালোচনা উভয়ই তাহাদের অভ্যস্ত ছিল। বিদেশী কবিদের আলোচনায় ও সমালোচনায় তাহাদের সঙ্গে প্রমথনাথের দিন বেশ কাটিত।

তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিত, শুনিয়াছি, কেহ কেহ মরিবার ভয়ে এতই ভীত হইয়া পড়ে যে, সেই ভয়েই মরিয়া শেষে নিষ্কৃতিলাভ করে। আমরা

বাড়ীতে আপনার প্রশংসার জ্বালায় অস্থির হইয়া আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়া শেষে উদ্ধার পাই। আপনার অনেক কবিতাই শৈলের কণ্ঠস্থ। সে কবির চিড়িয়াখানায় আপনাকে সিংহ প্রমাণিত না করিয়া ছাড়িবে না।

শৈলবালা তাহাদের ভগিনী। সে বিদ্যালয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর তাহার পিতা একরূপ জোর করিয়া তাহাকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়াছিলেন। প্রমথনাথ প্রায়ই দেখিতে পাইত, সে ছাতে টবের গাছে আধফোটা ফুলটি ফুঁ দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে, বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থপাঠ করিতেছে, বা রং মিলাইয়া উল বুনিতেছে। তাহার চলন এমন নিঃসঙ্কোচ, তাহার ব্যবহার এমন রমণীসুলভ, তাহার ভাব এমন নির্ভীক, তাহার ভঙ্গী এমন মধুর যে বোধ হইত, যেন তাহাতে জলভরা মেঘ আর চঞ্চল বিদ্যুৎ একত্র সমাবেশে পরস্পরকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। লাবণ্য ও সরলতার সমাবেশ তাহাকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশ্রীতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সৌন্দর্য্যশ্রী প্রমথনাথের নিকট প্রথম সাগরযাত্রায় যাত্রীর চক্ষে শ্যামায়মান তটশোভার মত রমণীয় বোধ হইত। তাহা তাহার নিকট যেমন নূতন, তেমনই মনোহর।

৩

ক্রমে শৈলের সহিত প্রমথনাথের পরিচয় হইল। পরিচয়ের ফলে প্রমথনাথ বুঝিল যে, কেবল দূরত্বের কুহেলিকাই শৈলকে বিচিত্রবর্ণচ্ছটায় শোভাময়ী করিয়া তুলে নাই। তাহার ব্যবহার এক দিকে যেমন নিঃসঙ্কোচ, অপর দিকে তেমনই গম্ভীর। সে অনায়াসে প্রমথনাথের সহিত নানা বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইত—কবিতার আলোচনা করিত, উপন্যাসের নায়কনায়িকা-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিত, রচনাপ্রণালীর সমালোচনা করিত, কিন্তু উচ্ছ্বসিত আবেগেও এমন ব্যবহার করিত না, এমন কথা বলিত না, যাহাতে ঘনিষ্ঠতার ইতরবিশেষ হয়। তাহার ব্যবহার প্রমথনাথকে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের সীমারেখায় আনিয়াছিল; কিন্তু সে সামান্য ব্যবধানটুকু অতিক্রম করিতে সাহসী করে নাই। সে আপনার আচরণে আপনার প্রতি সম্মান অটুট রাখিত।

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, একটা নূতন কবিতার রচনা করিলেই প্রমথনাথ খাতাখানি হাতে করিয়া শৈলবালাকে শুনাইতে যাইত। শৈল কবিতা শুনিত, আর নিঃসঙ্কোচে সমালোচনা করিত;—এটুকু সুন্দর হইয়াছে,

এ স্থানটা কষ্টকল্পনাদুষ্ট, এ উপমাটি চমৎকার, এ মিলটা কানে লাগিতেছে, এ ভাবটি নূতন,এ কথা পুরাতন,—বিশেষ বার্ণস যেমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই ভক্ত সমালোচকের প্রভাবে প্রমথনাথের হৃদয়ের যাহাই হউক,কবিতার যে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সময় বিবাহের কথা হইলেই প্রমথনাথের মানসপটে শৈলবালার মুখ ফুটিয়া উঠিত; সে মনে করিত—,"অমনটি হইলে বিবাহ করা যায়।" ফুল যেমন ধীরে ধীরে ফলে পরিণত হয়,তেমনই কবে যে এই 'অমনটি'—'ঐটি'তে পরিণত হইয়াছিল, প্রথমে প্রমথনাথ আপনিই তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে আপনি যখন তাহা বুঝিতে পারিল,তখনও আপনার কাছে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত—ভয়, পাছে বাস্তবের মেঘমুক্তগগনে কল্পনার ইন্দ্রধনু বিলুপ্ত হয়—জাগরণে সুপ্তির স্বপ্ন নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৪

একদিন প্রভাতে শৈলবালাকে গোটা দুই নূতন কবিতা শুনাইতে যাইয়া প্রমথনাথ দেখিল, তাহার দুই ভ্রাতার সহিত শৈলবালার বিষম তর্ক বাধিয়াছে; বিষয়—প্রতিভা। কোন পক্ষই কোন পক্ষের কোন কথা মানিয়া লইবে না; সুতরাং তর্কের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা অল্প। বহুক্ষণ তর্কের পর শৈল বলিল, "তোমরা যাহাই বল, আমি বলি, যাহারা ইট কাঠের ঘরে বাস করে, স্নানাহার করে, দিন গুজরাণ করে—তাহাদের মধ্যেও প্রতিভাশালীদিগের মধ্যে গঠনপার্থক্য আছে কি না সন্দেহ। জগতের সাধারণ বৈষম্যেরই মত সামান্য প্রভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, প্রতিভার যে সামান্য বীজ মানব-হৃদয়ে নিহিত থাকে, সময়, সুবিধা ও চেষ্টার ফলে তাহা বিকশিত হয়। কেবল সময়, সুবিধা ও চেষ্টার অভাবেই অনেক সময় 'সাধারণ লোক' প্রতিভাশালী হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।"

এক ভ্রাতা বলিলেন, "ধর—এই প্রমথবাবু। তুমি কি মনে কর যে, কেবল সময়,সুবিধা ও চেষ্টার অভাবেই আমি প্রমথবাবুর মত কবিতা লিখিতে পারিতেছি না? আমাদের দু' জনের মধ্যে কি কোন বিশেষ প্রভেদ নাই?"

শৈল বলিল, "সামান্য প্রভেদ থাকিতে পারে। বিশেষ প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ। আমার কথা, প্রমথবাবু এমন সময়, সুবিধা ও চেষ্টার ফলে যেরূপ কবিতা লিখিতে পারিতেছেন, তোমার পক্ষেও সেই তিনের ফলে

সেইরূপ কবিতা-রচনা অসম্ভব নহে। সে তিনের সেরূপ সম্মিলন ব্যতীত তাঁহার পক্ষেও সেরূপ রচনা সম্ভব হইত না। প্রমথবাবু কি ইহা স্বীকার করেন না ?"

প্রমথনাথ বলিল, "করি।"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে বলুন, আপনার কবিতার উৎস কোথায় ? সে উৎসমুখ কিরূপে বাধামুক্ত হইল ? তাহা হইলেই আমি দাদাকে আমার কথা বুঝাইয়া দিতে পারিব।"

কথাটা শৈলবালা যেমন সহজভাবে বলিল, প্রমথনাথ তেমন সহজভাবে লইতে পারিল না। সে কথায় তাহার পক্ষে একটা সম্ভাবনার পথ মুক্ত হইয়া গেল।

তখন বেলা হইয়াছে। "কথাটা একটু চিন্তা করিয়া বলা আবশ্যক। আমি পরে বলিব," বলিয়া প্রমথনাথ শৈলবালাকে কবিতার খাতাখানা দিয়া গমনোদ্যত হইল। শৈল বলিয়া দিল, "যদি কথাটা প্রকাশ করিতে আপনার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকে, তবে কায নাই।"

৫

সমস্ত মধ্যাহ্নটা প্রমথনাথ চিঠির কাগজ সম্মুখে করিয়া মাথা চুলকাইল ; কিরূপ লিখিলে ভাল হয়,—ভাবটি ব্যক্ত হয়, অথচ ভদ্রতার সীমা অনতিক্রান্ত থাকে ? শেষে অনেক ভাবিয়া—লিখিয়া, কাটিয়া, কাগজ ছিঁড়িয়া সে লেখা শেষ করিল। সাজাইয়া, গুছাইয়া, ঘুরাইয়া লিখিল—তাহার ভাবার্থ—শৈলই তাহার কবিতার উৎস।

লিখিয়া সে পত্রখানা পাঠাইয়া দিল।

রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে তাহার দৃষ্টি শৈলদের গৃহের সেই ছাতের দিকে। যে ছাতে শৈল প্রায়ই সকালটা কাটাইত, অন্য সহস্র কাজ থাকিলেও তাহাকে যে ছাতে বিশবার দেখা যাইত, সে দিন সকালে প্রমথনাথ আর তাহাকে সে ছাতে দেখিতে পাইল না।

মধ্যাহ্নে শৈলবালার মধ্যম অগ্রজ আসিয়া প্রমথনাথকে তাহার কবিতার খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, শৈল মাসখানেকের জন্য দমদমায় মাসীর কাছে যাইতেছে।

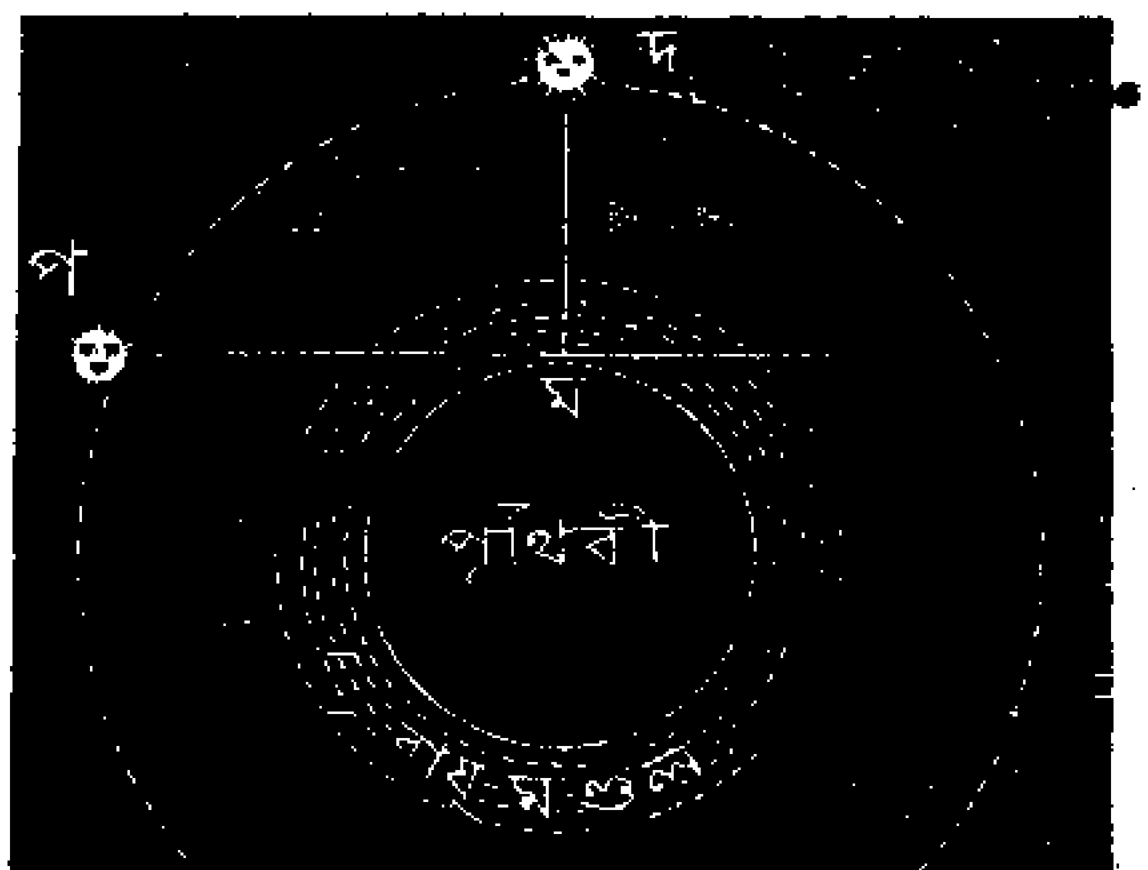
প্রমথনাথ বুঝিল, সে তাসের ঘর গড়িতে গড়িতে অসাবধান হইয়া জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল,—ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। এক দিনের

অনবধানতায় জীবনের সুখস্বপ্ন নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সে আপনার উপর আপনি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল। তখন হৃদয়ে বেদনাটা এমনই তীব্র বোধ হইল যে, সে কিছুতেই বুঝিল না যে, অনিশ্চিতের উদ্বেগের পরিবর্ত্তে নিশ্চিতের যে স্বস্তি পাইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক অধিক ;—বাস্তবের ছুরিকায় তাহার কল্পনাদুষ্ট হৃদয়ের চিকিৎসা হইয়াছে, এইবার সে নির্বৃতি লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

উদয় ও অস্তের সময় সূর্য্যমণ্ডল বড় দেখায় কেন?

এই বিষয় লইয়া য়ুরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখনও আলোচনা চলিতেছে ; নিত্য নূতন উপায়ে এই সমস্যার মীমাংসা-চেষ্টা হইতেছে। সেই সকল তর্ক-সমুদ্র মন্থন করিলে যে সারটুকু পাওয়া যায়, তাহা এই যে, এই প্রশ্নের এখনও কোন সন্দেহাতীত সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। তন্মধ্যে যে উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বোধ হইতেছে, তাহা এই :—



পার্শ্বস্থ চিত্রে সকলের মধ্যস্থানীয় বৃত্তটি পৃথিবী ; তাহার বাহিরে বায়ুমণ্ডল ; ও সকলের বাহিরের বৃত্তটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্য্যের অবস্থান জ্ঞাপক। ম = একটি মনুষ্য।

প্রাতঃকালে সূর্য্য প চিহ্নিত স্থানে থাকে, আর দ্বিপ্রহরের সময়ে দ চিহ্নিত স্থানে থাকে। সুতরাং মধ্যাহ্নসময় অপেক্ষা প্রাতে সূর্য্যোদয়সময়ে রবিমণ্ডল বেশী দূরে থাকে, কারণ ম প রেখা ম দ রেখা অপেক্ষা বৃহত্তর। এবং আশা করা যাইতে পারে যে, প্রাতেই সূর্য্যকে

বরং মধ্যাহ্ন অপেক্ষা ছোট দেখাইবে; তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত হয় কেন? (এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, কেবল চর্ম্মচক্ষে না দেখিয়া দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে সূর্য্যকে সর্ব্বদাই সমান দেখায়।)

যদিও প্রাতঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অধিক দূরবর্ত্তী, তথাপি পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব উভয় সময়েই এত বেশী যে, ঐ দূর-তারতম্যে কিছু আসে যায় না; অর্থাৎ উভয়ত্রই ম নামক দর্শক হইতে সূর্য্যের দূরত্ব সমান বলিয়া ধরা যাইতে পারে; যেমন দুই জন লক্ষপতির মধ্যে একের সম্পত্তির আয় পাঁচ লক্ষ ও অপরের পাঁচ লক্ষ এক শত টাকা হইলেও উভয়ের আয় সমান বলা যাইতে পারে, এ স্থলেও তদ্রূপ।

যাহা হউক, বুঝা গেল যে, অরুণদেবের যৎকিঞ্চিৎ দূরাধিক্যনিবন্ধন তাহাকে মার্ত্তণ্ড অপেক্ষা ছোট দেখাইবার কোনও কারণ নাই। আচ্ছা, তবে সমান দেখায় না কেন? এইখানেই বিভ্রাট।

কোন অট্টালিকার বৃহৎ একটি কক্ষের মেজেয় যদি আমরা চিৎ হইয়া শয়ন করি, আর যদি আমাদের চক্ষু হইতে কক্ষের ছাদ ও দক্ষিণের বামের দেয়াল প্রকৃতপ্রস্তাবে সমানদূরবর্ত্তীও হয়, তবে এরূপ স্থলে ঘরের ছাদটি দেয়াল অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বোধ হইবে; কক্ষটি বড় হইলেই এই দৃষ্টি-বিভ্রম সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, এরূপ হইবার কারণ এই যে, দেয়ালের দিকে চাহিবামাত্র গাড়ু, ঘড়ি ছাতা জুতা প্রভৃতি কতকগুলি চির পরিচিত জিনিস আমাদের চোখে পড়ে; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের আয়তন বর্ণ আদি আমাদের পূর্ব্বেই জানা আছে। এক্ষণে শুইয়া শুইয়া এই সকল জিনিসের দিকে তাকাইতে গিয়া যদি দেখিতে পাই যে,জিনিসগুলির আয়তন পূর্ব্বজ্ঞাত আয়তন অপেক্ষা একটু ছোট বোধ হইতেছে,অথবা তাহাদের বর্ণের একটু পরিবর্ত্তন বা আকারের একটু অস্পষ্টতা অনুভূত হইতেছে, তবেই আমরা দূরত্বসম্বন্ধীয় পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ঐ ঐ জিনিষগুলিকে ও সেই সঙ্গে তাহাদের সমীপবর্ত্তী দেয়ালকে একটু দূরবর্ত্তী মনে করি। কিন্তু ছাদের দিকে চিৎ হইয়া চাহিয়া এমন কোন পরিচিত জিনিস দেখিতে পাই না, যাহার আয়তন বর্ণাদি আমাদের ভালরূপ জানা আছে। সুতরাং ছাদকে দেয়ালের মত দূরবর্ত্তী বোধ হয় না।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ও প্রাতঃসূর্য্যের বেলাও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। আমরা দিবারাত্রির কত সময়ে কতবার আকাশের দিকে ও ক্ষিতিজের দিকে চাহিয়া

থাকি। কিন্তু ক্ষিতিজের দিকে চাহিলেই আমরা ঐ সুদূরবর্ত্তী তাল দেবদারু জমীদারবাড়ীর ত্রিতল অট্টালিকা বা শ্মশানঘাটের মঠ—কত কি দেখিতে পাই। এই সকল জিনিসের সকলের না হউক, কতকের আয়তন বর্ণাদি অন্ততঃ আমাদের জানা আছে। এক্ষণে সেই পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের সহিত এই সকল বস্তুর বর্ত্তমান-প্রত্যক্ষ হ্রস্বতর আয়তন, বর্ণ-পরিবর্ত্তন আকারের অবিস্পষ্টতা প্রভৃতি বিষয় নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের মনে আলোচনা করিয়া ক্ষিতিজ প্রদেশটা যে বহুদূরে, তাহা আমাদের একটা বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়। শেষে ক্ষিতিজের দিকে চাহিয়া যদি কখন সূর্য্য ব্যতীত আর কোন দ্রব্য (বৃক্ষ অট্টালিকাদি) নাও দেখিতে পাই, তথাপি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ক্ষিতিজ প্রদেশকে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়াই মনে করি। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের নিকট কোন পরিচিত পদার্থ না থাকায় আমরা তাহার তদানীন্তন অবস্থানপ্রদেশকে ক্ষিতিজ প্রদেশের মত সুদূরবর্ত্তী মনে করি না। সংক্ষেপে —আমাদের একটি বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, এই সুবিশাল আকাশ-গুম্বজের ঊর্দ্ধবিন্দু অপেক্ষা উহার প্রান্তরেখা বেশী দূরবর্ত্তী। সুতরাং ঐ ঊর্দ্ধ-বিন্দু ও ঐ প্রান্তসংলগ্ন দুইটি পদার্থ প্রকৃতপ্রস্তাবে সমানায়তন হইলেও, উভয় স্থানের দূরত্বের কথাটা স্মরণ করিয়া মনে মনে একটা ঘরাও রকমের হিসাব করি, ও তাহার ফলে প্রাতঃসূর্য্যকে মধ্যাহ্নসূর্য্য অপেক্ষা বড় মনে করি। "মনে করি" বলাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি; কারণ, উভয় স্থলেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব চোখে সমান আকারেই পড়িয়া থাকে। তবে যে দেখিতে অসমান দেখি, সেটা কেবল পূর্ব্ব-সংস্কার-পরিপুষ্ট অন্তঃকরণের দোষে।

একটা কথা এই—অপোগণ্ড শিশু, জড়-বুদ্ধি হাবা, চিন্তাশক্তিবিবর্জ্জিত আফ্রিকার 'বুশ-ম্যান্' ও পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতরপ্রাণী, ইহারাও কি আমাদের মত দৃষ্টি-বিভ্রমে পতিত হয়, না পূর্ব্বসংস্কাররাহিত্যবশতঃ সর্ব্বদাই সূর্য্যকে সমানায়তন দেখে? এই প্রশ্নর উত্তর কে দিবে?

আর একটি কথা;—দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে সূর্য্যকে সকল সময়েই সমান দেখায় কেন? ইহার উত্তর এই যে, উক্ত যন্ত্রসংযোগে যখন সূর্য্যকে দেখা হয়, তখন আর তাহাকে আকাশ-গুম্বজের প্রান্ত-প্রদেশ বা মধ্যবিন্দুতে দেখা যায় না; আমাদের চক্ষু হইতে অত্যল্প দূরে দেখা যায়, সুতরাং সে স্থলে পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি-বিভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

দৃষ্টিবিভ্রমের (illusion of the eye) উদাহরণ জগতে বিরল নহে। দশ

হাত দূরে ৯।১০ বৎসর বয়স্ক একটি বালক ও ২০ হাত দূরে পূর্ণবয়স্ক একটি যুবক দণ্ডায়মান থাকিলে বিজ্ঞানের হিসাব মতে বালককে যুবক অপেক্ষা বড় (অর্থাৎ উচ্চতায় বড়) দেখিবার কথা ; কিন্তু তাহা দেখি কই ? যুবকের শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত পরিপক্ক বদন ও বালকের নির্ম্মল কাঁচা মুখ দেখিলেই আমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়, আমরা দৃষ্টিবিভ্রমে পতিত হইয়া যুবককে বালক অপেক্ষা বড় দেখি ।

একটি প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রাকে আমাদের চোখের সাম্‌নে খানিক দূরে এমন ভাবে ধরা যাইতে পারে, (একটি চোখ মুদ্রিত করিয়া অপর চোখে দেখিতে হইবে,) যে তাহা দ্বারা পূর্ণিমার চন্দ্র ঢাকা পড়ে, অর্থাৎ চন্দ্রমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু ঐ মুদ্রাটি সেই স্থান হইতে নামাইয়া আমাদের কোলে, আমাদের চোখ হইতে পূর্ব্ববৎ সমান দূরে, রাখিলে, এবং তখন মুদ্রা ও চন্দ্রের দিকে চাহিলে, চন্দ্রকেই বড় দেখায় ; অথচ ঐ মুদ্রা চক্ষু হইতে ঐ পরিমাণ দূরে থাকিয়াই চন্দ্রমণ্ডলকে আবৃত করিয়াছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে, মুদ্রাকে চন্দ্রের সমান বা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় দেখা উচিত ; কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ আমরা তাহা দেখিতে পাই না। কারণ, আমরা বহু দিন হইতেই জানি যে, মুদ্রা ও চন্দ্রের মধ্যে, আকারগত আকাশ পাতাল প্রভেদ ; সেই পূর্ব্বসংস্কার কোন রূপেই ত্যাগ করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধযুগ।

মৃচ্ছকটিক ;—প্রজাচিত্র।

রত্নাবলী হইতে আমরা তৎকালপ্রচলিত অথবা আদর্শ রাজচরিত্র ও রাজচিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। এক্ষণে মৃচ্ছকটিক হইতে আমরা সাধারণ প্রজাচিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব।

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত ও নায়িকা বসন্তসেনা। নায়ক দয়ালু, সর্ব্বগুণবান, সুপুরুষ অথচ (সর্ব্বস্ব দান করিয়া) দীন ; নায়িকা কলাবিদ্যায় পণ্ডিতা বারাঙ্গনা। কিন্তু এই বারাঙ্গনায় কিছু বিশেষত্ব আছে। ইনি

সামান্যা বারাঙ্গনা নহেন, ইনি অতুল ধনের অধিকারিণী। এমন কি, দুই চারিটি হস্তীও ইঁহার প্রতিপাল্যমধ্যে দেখিতে পাই। বসন্তসেনা বারাঙ্গনা বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় আছে। রাজশ্যালক শকার তাঁহাকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু বসন্তসেনা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দরিদ্র চারুদত্তকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন। বসন্তসেনার দানশীলতা ও চারুদত্তের মহত্ত্ব-প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। রাজশ্যালক শকারের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে বোধ হয় যে, তখন রাজা রাজড়ার ঘরে ঐরূপ মূর্খ দুর্ব্বিনীত অত্যাচারী দুই একটি শ্যালক প্রতিপালিত হইত। রাজা পালকও যে নিজে বড় ভাল লোক ছিলেন,তাহা বোধ হয় না। কারণ,তাহা হইলে রাজশ্যালক প্রকাশ্য রাজপথে কোন অসহায়া রমণীর উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। শর্ব্বিলক এক জন ব্রাহ্মণতনয়, কিন্তু প্রণয়িনীর প্রীতিসম্পাদনে, তাহার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ; তাঁহার প্রণয়িণী মদনিকা বসন্তসেনার দাসী, সুতরাং সে ব্রাহ্মণেতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শর্ব্বিলক যখন তাহাকে প্রাপ্ত হইল, তখন বসন্তসেনা তাঁহার দাসী সেই মদনিকাকে প্রণম্যা বধূ বলিতেছেন। কারণ, সে এখন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বধূরূপে গৃহীতা। সে সময়েও ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতেন না। সমাজে তখনও অসবর্ণ বিবাহ চলিত ছিল। শর্ব্বিলক বেশ্যার দাসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে, সেই বেশ্যার দাসী আবার ব্রাহ্মণপত্নীরূপে প্রণম্যা হইল।

বসন্তসেনা বারাঙ্গনা, কিন্তু মাতা ও ভ্রাতাদির সহ গৃহস্থ সংসারী। তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী বসন্তসেনার বাটীতেই প্রতিপালিত। তাহার বিলাস দেখিয়া চারুদত্তের সখা বিদূষক রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি করিলে বসন্তসেনার ভ্রাতা হওয়া যায়?" বসন্তসেনার স্থূলকলেবরা মাতাকে দেখিয়াও বিদূষক রহস্য করিতে ছাড়িলেন না।

তখনকার ঐশ্বর্য্যশালীর গৃহবর্ণনা দেখিয়া কতকটা সে সময়ের গৃহসজ্জার আভাষ পাওয়া যায়। চেটী বিদূষককে বসন্তসেনার গৃহদ্বার দেখাইলে বিদূষক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"অহো! বসন্তসেনার ভবনদ্বারের কি রমণীয়তা! ইহা জলসিক্ত, মার্জ্জিত ও গোময়লিপ্ত; নানাবিধ সুগন্ধ কুসুমোপহারে চিত্রিত গগনতল অবলোকনের জন্য কৌতূহলেই যেন শীর্ষ

উন্নমিত করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে ঐরাবতের শুণ্ডের ন্যায় প্রকাণ্ড মল্লিকা-মালা দোলায়মান; গজদন্তনির্ম্মিত সমুন্নত তোরণ শোভিত। ইহাতে কুসুম্ভ-রাগরঞ্জিত পতাকা সকল পবনবেগে কম্পিত হওয়ায় যেন অগ্রহস্ত দ্বারা 'এই দিকে আসুন' বলিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছে" * * চেটী তাঁহাকে প্রথম প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইলে তথায় এই প্রকার সমৃদ্ধির পরিচয় পাইলেন। এই প্রকারে প্রথম প্রকোষ্ঠে "শ্রোত্রিয়ের ন্যায় সুখোপবিষ্ট দৌবারিক;" দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে "শকটবাহী বলীবর্দ্দ সকল, মহিষ মেষ অশ্ব ও হস্তী;" তৃতীয় প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রগণ ও বৃদ্ধ বিটগণের উপবেশনস্থান; চতুর্থ প্রকোষ্ঠে যুবতীকর-তাড়িত মৃদঙ্গ সকল হইতে নিঃসৃত জলধর সকলের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি, মধুকররবের ন্যায় মধুর বংশীধ্বনি ও নৃত্যকরীগণের গান শ্রবণ করিলেন। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে পাকশালা; ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে নীলায়ত শোভিত সুবর্ণময় তোরণ সকল ইন্দ্রধনুর ন্যায় দেখাইতেছে। এই স্থানে শিল্পকারগণ বৈদূর্য্য মুক্তা প্রবাল পুষ্পরাগ ইন্দ্রনীল কর্কেতর পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি রত্ননিচয়ের দোষগুণের বিচার করিতেছে। কেহ রক্তসূত্র দ্বারা স্বর্ণালঙ্কার সকল গ্রন্থন করিতেছে। কোথাও বা স্বর্ণ দ্বারা মাণিক্য গ্রথিত হইতেছে। কেহ মৌক্তিকাভরণ গাঁথিতেছে। কেহ বৈদূর্য্যমণিসমূহ ধীরভাবে ঘর্ষণ করিতেছে, কেহ শঙ্খ ছেদন করিতেছে, কোথাও প্রবাল সকল শাণ-যন্ত্র দ্বারা ঘর্ষিত হইতেছে, কোথাও আর্দ্র কুঙ্কুম শুষ্ক করা হইতেছে * * *" ইত্যাদি দেখাইয়া তৎকালপ্রচলিত বিলাস ঐশ্বর্য্যের চরম দেখাইতেছে। সপ্তম প্রকোষ্ঠে নানাবিধ পক্ষী, ময়ূর-ময়ূরী দেখিয়া বিদূষক বলিয়াছিলেন, "এই গণিকা-গৃহ আমার নিকট নন্দনকাননের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

যে রাজ্যে ও যে সময়ে বারাঙ্গনার গৃহবর্ণনা এইরূপ, তখন যে রাজ-প্রাসাদ বর্ণনাতীত বিলাসে মগ্ন থাকিত, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এক কালে আর্য্যগণের মধ্যে সকল বিদ্যারই চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল, চৌর্য্য-বিদ্যারই বা না হইবে কেন? "কঠিন ইষ্টক টানিয়া বাহির করিবে, আমা ইষ্টক কাটিয়া, অপক্ক ইষ্টক জলসিক্ত করিয়া ও কাষ্ঠপ্রাচীর কাটিয়া ফেলিতে হইবে।" ইহাও কনকশক্তি নামক প্রাচীন ঋষি দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

এখন যেমন সামান্য গৃহস্থগণ কোন প্রকার দারুণ অপমানে অপমানিত হইলে (অনেক স্থলেই রাজদণ্ডভয়ে) আত্মগোপন জন্য ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী হয়, তখন কেহ কোন প্রকার দারুণ লজ্জা বা মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলে

মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিত। সম্বাহক দ্যূতে পরাজিত হইয়া যখন সভিক কর্ত্তৃক প্রহৃত হইল,তখন বলিল "আর এ মুখ দেখাইব না, আমি মস্তক মুণ্ডিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবু।" (১)

মৃচ্ছকটিক-পাঠে আমরা প্রধানতঃ কয়েকটি বিষয় জানিতে পারি। প্রথমতঃ, তখন আর্য্যসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। নীচজাতীয়া কন্যা উচ্চ জাতীয় কর্ত্তৃক পরিণীতা হইলে উচ্চ জাতির ন্যায় সম্মানার্হা হইত। দ্বিতীয়তঃ, এখন যেমন উত্তর-পশ্চিম, মান্দ্রাজ, ও বোম্বাই প্রদেশে এক শ্রেণীর নর্ত্তকী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ভ্রাতা ভগিনী পিতা মাতা দ্বারা পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে,তখনও বোধ হয় কতকটা সেই প্রকারই ছিল। কারণ, বসন্তসেনা ধনবতী বারাঙ্গনা, ভ্রাতা ও মাতার সহিত এক বাটীতেই বাস করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিয়া বিদূষক প্রথমে একটু রহস্য করিয়া ঈর্ষ্যাপ্রকাশ করিলেও, পরক্ষণে শ্মশান-ভূমির চম্পকবৃক্ষের ন্যায় তাহাকে অপবিত্র বলিতেছেন; সুতরাং ঐ প্রকার নৃত্যকারিণীর পিতা বা ভ্রাতা অতুল ধনের অধিপতি হইলেও তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা অধিক ছিল না। তৃতীয়তঃ, রাজার প্রতিপাল্য কয়েকটি কুঞ্জের জীব; তাহারা মূর্খ, দুর্দ্দান্ত,অত্যাচারী, অথচ রাজার ভয়ে কেহ তাহা-দিগকে কিছু বলিতেও সাহসী হইত না। চতুর্থতঃ,সমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। তখন বৌদ্ধগণের প্রভাব-স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। নাগরিকগণ কোন বিপদে পড়িলেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিত। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চমতঃ, নগরীর সমৃদ্ধিশালিতা, বসন্তসেনার ভবন হইতেই আমরা তাহা কল্পনা করিয়া লইতে পারি।

এই প্রকারে বৌদ্ধ যুগের সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, প্রধানতঃ দুইটি কারণে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ বহুকাল-প্রচলিত শাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রথম, বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে শাস্ত্রে সকলের সন্দেহ ও সকল জাতির শাস্ত্রে অধিকার ব্যাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের অপ্রতিহত প্রভাবের বিনাশ। এবং

(১) লেখকের এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মানসিক নির্ব্বেদেও সম্বাহ-কের চিত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে শান্তিলাভের কামনা জাগিতে পারে—সেই অবস্থায় এরূপ উক্তি কিছু অসম্ভব নয়।—সাহিত্য-সম্পাদক।

দ্বিতীয়তঃ, এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের কঠোরতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজে বিলাসের প্রবেশ। শাস্ত্রাদেশ সম্যক পালন করিতে হইলে আর বিলাসী হইবার প্রবৃত্তি বা সুযোগ থাকে না; সুতরাং, বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহ বা অসম্মান প্রদর্শন। এই যুগে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিদ্যার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল, এবং এই যুগ হইতেই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ হইতে জনসাধারণ স্খলিত হইতে থাকে।

চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত আর্য্যসমাজ।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রহ্ম চীন প্রভৃতি দেশে স্বীয় বিমল প্রভা বিকীর্ণ করিল, তখন তত্তদ্দেশবাসিগণ চমকিত হইয়া বিস্মিত নেত্রে এই ধর্ম্মের জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার তাহাদের পক্ষে অনন্ত হীরকমণিমুক্তাদিপূর্ণ রাজভাণ্ডাররূপে প্রতীয়মান হইল। অনেক জ্ঞানপিপাসু চীনবাসী ভারতবর্ষে আসিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন, কিন্তু তৎকালপ্রচলিত রাজনিয়ম-অনুসারে কেহই সহজে স্বরাজ্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ফাহিয়ানং, চিতাওয়েন, হোইসিং ইত্যাদি অনেক পরিব্রাজক ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে বড় উচ্চবাচ্য করেন নাই। তাঁহারা কেবল বুদ্ধ-দেবের জন্মস্থান, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় লইয়াই আলো-চনা করিয়াছেন।

অবশেষে এক জন যুবা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া রাজনিয়ম উপেক্ষা করিয়া স্বীয় জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য গভীর নীরব যামিনীযোগে সুখময় গৃহ, স্নেহময়ী জননী, প্রেমাস্পদ ভ্রাতা ভগিনী ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলেন। প্রহরিগণ গভীর রাত্রে এই প্রকারে পলায়মান যুবাকে অন্যের অলক্ষ্যে ধাবিত হইতে দেখিয়া তস্কর-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু যুবা সে বিপদে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া আপন মনে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" "সংঘং শরণং গচ্ছামি" এই মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখে তিব্বত দেশের অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। যখন মনে হয়, প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে তখনই তিনি বৌদ্ধমন্ত্র জপিতে জপিতে দ্বিগুণবেগে গমন করেন। ভারতের অসামান্য ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া এক কালে বিদেশীয় জ্ঞানপিপাসুগণ এই প্রকারে

প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে ধাবিত হইতেন। এই যুবা জগৎ-বিখ্যাত হো-য়েন্-থ্সাং। হোয়েন্থসাঙ্গই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে বিশেষরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সময় উক্ত পরিব্রাজক ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন, তখন কান্যকুব্জ ও মগধই বিশেষ পরাক্রমশালী রাজ্য। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও ধনবান। তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন কোন বৌদ্ধরাজার হস্তে নিহত হইলে ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধন বৈশ্যবংশজ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

যে সময় গ্রীকগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন ভারতবর্ষকে বলশালী রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষকে জ্ঞানপ্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, গ্রীকগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বাহুবলপরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চীনবাসিগণ জ্ঞানপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভারতবর্ষে জ্ঞানলাভের জন্য আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, কল্পতরু ভারতবর্ষে যিনি যে আশায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আশাই ফলবতী হইয়াছিল। গ্রীকগণ পুরু রাজের নিকট যুদ্ধে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তবে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রীকগণ যখন যেখানে গিয়াছেন, তখনই সেই রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, নৌবল, যুদ্ধ-প্রণালী লইয়াই অধিকাংশ বর্ণনা করিয়াছেন। আর হোয়েন্থসাঙ্গ প্রমুখ বৌদ্ধগণ যখন যে দেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই সেই দেশের মঠসংখ্যা, মঠধারীর সংখ্যা, তাঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাপ্রণালী, ধর্ম্মপ্রণালী ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত করিয়াছেন। এই প্রকার বিপরীত বর্ণনার কারণ এই যে, যে সময়ে গ্রীকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন মহাযুদ্ধের পর হিন্দু রাজগণ বহু শতাব্দী নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আবার নূতন উৎসাহে সৈন্যবল বর্দ্ধিত করিয়াছেন; তখন হিন্দুর বাহুবলই অগ্রে বিদেশীর চক্ষে পতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে সময় চীনগণ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষের কোন বহিঃশত্রু নাই। দেশে শত্রুর মধ্যে বৌদ্ধগণ; তাঁহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য বাহুবল অপেক্ষা জ্ঞানবলের, যুক্তিবলের, তর্কবলের অধিক প্রয়োজন হইত। সেই জন্য এই শেষোক্ত সময়ে বিদেশীর চক্ষে বাহুবল অপেক্ষা হিন্দুগণের মানসিক বলই অধিক প্রতিবিম্বিত হইত।

হোয়েন্থসাঙ্গের বর্ণনায় বোধ হয় যে,সেই সময় ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলতর ছিল। কেবল বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল।

সে সময়ে ভারতবর্ষে সংস্কৃত আর চল্তিত ভাষা ছিল না। তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত হইয়াছে; তবে অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃত ভাষা চলিত ছিল। এখন বঙ্গভাষার সহিত গুজরাথী বা মারাঠীভাষার যতটা প্রভেদ লক্ষিত হয়,তখন বোধ হয় এতটা প্রভেদ ছিল না। কারণ,আর্য্যাবর্ত্তের সকল ভাষাই সংস্কৃতের দুহিতা। তখন এক দুহিতা অপর দুহিতা হইতে ভিন্ন হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, নাটকাদি ভিন্ন সমস্ত গ্রন্থই তখন সংস্কৃতে রচিত হইত, এবং বিদ্বান ব্যক্তিমাত্রই সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতভাষা-ভাষী ছিলেন। ভিন্নদেশীয় লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য সংস্কৃতই প্রধান সাধন ছিল; সেই জন্য হোয়েন্থসাঙ্গ বহুবর্ষ ধরিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হোয়েন্থসাঙ্গের সময় অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহার অনেকগুলিই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

গ্রীকগণের নিকট হইতে আমরা পঞ্চনদ প্রদেশের বিবরণই অধিক শুনিতে পাই। কিন্তু চীনদিগের নিকট হইতে আমরা বঙ্গ বিহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নেপাল ও অযোধ্যার বিবরণ অধিক শুনিতে পাই। তাহার কারণ,বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের পর পঞ্চনদ প্রদেশ বাহুবল ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এককালে মধ্য-ভারতবর্ষ বাহুবলে ও জ্ঞানবলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর পৌরাণিক সময়েও পূর্ব্বভারত নিতান্ত নগণ্য দেশ ছিল না, তাহাও কথিত হইয়াছে। পঞ্চনদে সভ্যতার সৃষ্টি বটে, কিন্তু মধ্য-ভারত ও পূর্ব্ব-ভারতে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

যে সময় হোয়েন্থসাঙ্গ্ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। হোয়েন্থসাঙ্গ্ তাহার বহুদূরবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ-মাত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি সপ্তক্রোশব্যাপী স্থান প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাব-শেষে পূর্ণ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয়, প্রাচীন পাটলিপুত্র বর্ত্তমান কলিকাতার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। হোয়েন্থসাঙ্গ্ নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বৌদ্ধদিগের বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় আসিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর বিদ্যা-

শিক্ষার পর সে স্থান ত্যাগ করিয়া হিরণ্যপর্ব্বত (বর্ত্তমান মুঙ্গের) অভিমুখে আগমন করেন। হিরণ্যপর্ব্বতে দশটি বিহারে অন্যূন চারি সহস্র বৌদ্ধ বাস করিতেছিলেন। হিন্দুদিগের কুড়িটি মন্দির ছিল; তাহাতেও নানাপ্রকার সন্ন্যাসী বা যোগী বাস করিতেন। তিনি একটি পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ঐ পর্ব্বতোত্থিত ধূম গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল"; বোধ হয়, সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণপ্রস্রবণ দর্শনে তিনি অতিরঞ্জিত করিয়া ঐ প্রকার বর্ণনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে আসামে (কামরূপে) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ-লাভ করে নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সুদূর পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ ও চীন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু আসামে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে নাই। তাহার কারণ, বোধ হয়, কামরূপ পীঠস্থান বলিয়া তথায় তান্ত্রিকের সংখ্যা কিছু অধিক হওয়ায় বৌদ্ধগণ সে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ভাস্কর বর্ম্মা নামক কোন ব্রাহ্মণ তখন আসামের রাজা ছিলেন। তাঁহার উপাধি "কুমার"। তিনি বৌদ্ধ না হইলেও, হোয়েন্থসাঙ্গকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া যথেষ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আসাম যে এক কালে বিশেষ সভ্য ও সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হোয়েন্থ-সাঙ্গ আসাম ত্যাগ করিয়া তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমলুকে) গমন করেন। তাম্রলিপ্তিতে তিনি অসংখ্য বিপণিশ্রেণী দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তাম্রলিপ্তি সে সময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। স্থলপথে ও জলপথে অগণ্য মহাজন নানা-বিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদি আনিয়া তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাম্রলিপ্তিকেই বাস্তবিক বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর রূপে দেখিতে পাই।

তাম্রলিপ্তি ত্যাগ করিয়া হোয়েন্থসাঙ্গ্ উড়িষ্যার মধ্য দিয়া সেতুবন্ধাভিমুখে প্রস্থান করেন। উড়িষ্যার অধিবাসিগণ কৃষ্ণকায়, দীর্ঘচ্ছন্দ ও অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উড়িষ্যার অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। চীন পরিব্রাজক উড়িষ্যায় এক শত বিহারে দশ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পঞ্চাশটি মন্দির দেখিতে পান। সে সময়ে উড়িষ্যায় হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অধিক ছিল। বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তি উড়িষ্যায় যত বিদ্যমান আছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও তত নাই। উড়িষ্যার পর হোয়েন্থসাঙ্গ্ আবার হিন্দুপ্রধান কোশল, অন্ধ্র প্রভৃতি জনপদে উপনীত হইলেন। ঐ

সমস্ত প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, কিন্তু অধিবাসীরা অধিকাংশই অনার্য্য-বংশসম্ভূত।

মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে হোয়েন্থসাঙ্গ্ অনেক বিষয় লিখিয়াছেন; তিনি বলেনঃ—

"মহারাষ্ট্র দেশ উর্ব্বর ও বহুজনাকীর্ণ। অধিবাসিগণ সভ্য, গর্ব্বিত, সাহসী ও যোদ্ধা। তাহারা কাহারও দ্বারা উপকৃত হইলে জন্মে সে উপকার বিস্মৃত হয় না। কিন্তু কাহারও দ্বারা অপমানিত বা অপকৃত হইলে প্রতিহিংসা না লইয়া নিরস্ত হয় না। শত্রুকে কখনও অকস্মাৎ আক্রমণ করে না; তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া বর্ষা হস্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কান্যকুব্জরাজ শিলাদিত্য সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই মহারাষ্ট্রবাসিগণের নিকট পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। যদি তাহাদের কোন সেনাপতি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বা পরাজিত হয়েন, তবে তাহারা তাঁহার কোনরূপ শারীরিক দণ্ডের বিধান না করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করাইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপ অপমান দণ্ড অধিকাংশ স্থলেই আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত হইত। সেনারা উত্তেজিত হইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয়। এবং হস্তীকেও মদ্যপানে উন্মত্ত করিয়া রণে লইয়া যায়। তাহাদের রাজার নাম "পুলকেশ"; তিনি ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত।

মহারাষ্ট্র অতিক্রম করিয়া তিনি বরদা রাজ্যে উপনীত হয়েন। বরদাবাসী-দিগকে তিনি বিশ্বাসঘাতক ও সমুদ্রগমনকুশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর তিনি মালবরাজ্য অভিমুখে গমন করিয়া তথায় বিদ্যার আদর দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মালবে হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমান প্রভাব ছিল। অন্যূন বিংশতি সহস্র বৌদ্ধ শত শত বিহারে পালিত হইতেন। পূর্ব্বভারতে মগধ ও পশ্চিমভারতে মালব বিদ্যাস্থান বলিয়া বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি মালব হইতে বহির্গত হইয়া নানারাজ্যে ভ্রমণ করেন। সকল রাজাই সমৃদ্ধিশালী; অধিকাংশ রাজাই ক্ষত্রিয়, এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা। হোয়েন্থসাঙ্গের সময় বৌদ্ধধর্ম্মে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে শত শত বিহার ছিল, এখন সে স্থলে স্বল্পসংখ্যকমাত্র। অধিকাংশ স্থলেই বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম অধিক প্রবল। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় বোধ হয় যে, বৌদ্ধগণ তখনও বিদ্যাচর্চ্চাকেই জীবনের

তেন। কোন রাজ্যেই একধর্ম্মাবলম্বী অপরধর্ম্মাবলম্বীর উপর দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার করিত, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের আর্য্যগণ কখনও ধর্ম্মের জন্য সম্প্রদায়বিশেষের উপর অত্যাচার করেন নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এই আর্য্যশাস্ত্র হইতে উদ্ভূত ও অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া বৌদ্ধগণও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যাচার বা বলপ্রকাশে বিরত থাকিতেন। এই পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতাই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

হোয়েন্থসাঙ্গ্ ভারতবর্ষের দেবদেবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা করেন নাই; তবে তাঁহার পশ্চিমভারতভ্রমণকালে যেখানে সেখানে মহেশ্বরমন্দির দেখিতে পাইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র হইতে মূলতান পর্য্যন্ত প্রায় সকল দেশে পশুপতি ও মহেশ্বরের পূজা প্রচলিত ছিল।

ঐক দেশের আচার ব্যবহার অপর দেশ হইতে বড় ভিন্ন দেখিতে পান নাই। কারণ, তখন পর্য্যন্ত সেই অদ্বিতীয় মানবধর্ম্মশাস্ত্র আর্য্যসমাজকে প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে শাসন করিতেছিল। এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশের ভাষাগত পার্থক্য যতটা লক্ষিত হইত, আচারব্যবহার-গত পার্থক্য ততটা লক্ষিত হইত না।

হোয়েন্থসাঙ্গের শিষ্যগণ বলেন যে, হোয়েন্থসাঙ্গ ভারতভ্রমণ করিয়া আবার কিছু দিন নালন্দায় গিয়া বাস করেন। কিন্তু "সি-উ-কি" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের কিছু উল্লেখ নাই। উক্ত গ্রন্থে হিন্দুস্থান শব্দের পরিবর্ত্তে "ইন্-টোল্" শব্দ ব্যবহার করায় কেহ কেহ বলেন যে, উহা হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ। সে যাহা হউক,ঐ গ্রন্থে আর্য্যগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক বিষয় লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের মতে (হোয়েন্থসাঙ্গের সময়ে) আর্য্যগণ জাতিচতুষ্টয়ে বিভক্ত ছিলেন; তন্মধ্যে বৈশ্যগণ বণিকবৃত্তি ও শূদ্রগণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। গ্রীকদিগের বর্ণনার ন্যায় ঐ গ্রন্থেও আর্য্যদিগের সত্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মভীরুতা ইত্যাদির যথেষ্ট বর্ণনা আছে। চীন শ্রমণ বলেন, আর্য্যদিগের রাজ্য-সমূহের রাজস্ব চারি ভাগে বিভক্ত হইত। এক ভাগ রাজকার্য্যে অর্থাৎ রাজ ভৃত্যদিগের বেতন দিতে, অপর ভাগ অধীনস্থ সামন্ত নৃপতিগণের ব্যবহারে, তৃতীয় ভাগ বিদ্যাচর্চ্চায় ও ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-প্রতিপালনে, এবং অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ দানে ব্যয়িত হইত। কৃষিকার্য্যোৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশে রাজার অধিকার; কিন্তু রাজা কৃষকগণকে বীজ দান করিতেন। বর্ত্তমান কালে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাহারও কিছু জমি থাকিলে, তাহা কৃষকগণের সহিত অর্দ্ধেক

উৎপন্নের বিনিময়ে প্রদান করা হইয়া থাকে ; সে সময়ে এক-ষষ্ঠ অংশমাত্র দিতে হইত।

আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি যে, গ্রীকগণ ভারতবর্ষের শারীরিক বল এবং চীনীয়গণ আর্য্যগণের মানসিক বলের বর্ণণা করিয়াছেন। সেরূপ করিবার কারণও আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। চীনবাসিগণ কিন্তু সর্ব্বত্রই বৌদ্ধদিগকে আর্য্য অপেক্ষা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ; যেখানে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধে তর্ক,সেই স্থলেই বৌদ্ধ জয়ী হইয়াছেন ; ইহার প্রধান কারণ, বৌদ্ধগণের আত্মপক্ষে গৌরবগানমাত্র। বৌদ্ধদিগের বিদ্যাচর্চ্চায় অধিক যত্ন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; তবে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহারা যে সকল সময়েই ও সকল দেশেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে যাহার প্রবৃত্তি হউক, আমাদের কিন্তু দ্বিধা আছে।

পৌরাণিক কালের পর বৌদ্ধ কাল। আমরা সেই বৌদ্ধ কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া দেখাইলাম যে, প্রথম কালে গ্রীকগণ ভারত আক্রমণ করেন ; সেই প্রথম ভারতবর্ষের কথা ইউরোপখণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইউরোপ প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানিত বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় কালে অনেকগুলি ভাল ভাল সংস্কৃত পুস্তকাদি রচিত হয়, এবং সেই সকল পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিলাসস্রোতে তখন ভারতবর্ষ ভাসমান। সভ্যতা কূলে কূলে প্রবাহিত। প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত বিকৃত হইয়া প্রাকৃত ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তৃতীয় কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

চীনদেশীয় কয়েক জন পরিব্রাজক এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া বিদ্যাচর্চ্চার আধিক্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্ম আবার নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া মস্তক উত্তোলন করিবার উপক্রম করিতেছে। দেশে বন্যা হইলে যেমন বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সেই বন্যার চিহ্ন কোন না কোন প্রকারে রহিয়া যায়, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে হিন্দুধর্ম্ম অনেক বৌদ্ধ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মুষ্টিভিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে প্রচলিত দেখিতে পাই। ব্রহ্ম দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে গৃহস্থগণ ভিক্ষুকে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশে পক্বঅন্নাদি অশুচি বলিয়া চাউল দিবার প্রথা দেখিতে

পাওয়া যায়। পৌরাণিক কালেও ভিক্ষাগ্রহণের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, বৌদ্ধকাল হইতেই ঐ প্রথা বলবৎরূপে আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

সহযোগী সাহিত্য।

ইতিহাস।

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ।

আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইংরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী মন্দ পবনে আন্দোলিত। ভারতে ইংরাজের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ইতিহাসের কথা। ঐতিহাসিক তৎসমসাময়িক অবস্থাদির সম্যক আলোচনা করিয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিবেন; তাহার বিকাশ দেখাইবেন। তিনি বুঝাইবেন, কি কারণে কিরূপ ঘটনার কি ফল ফলিয়াছে। এখন সে ইতিহাসের উপাদান—চেষ্টায় বা নিশ্চেষ্টায় সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে আনন্দিত হইবার কথা। সম্প্রতি মিসেস পেনি Fort, St. George পুস্তকে এ দেশে ইংরাজের প্রথম অধিকৃত স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি ভ্রমপ্রমাদশূন্য না হইলেও সুখপাঠ্য ও ঐতিহাসিকতত্ত্বপূর্ণ। "এথিনিয়ম" পত্রে কোন সুযোগ্য সমালোচক তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। সেই সমালোচনার অবলম্বনে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

মান্দ্রাজে ইংরাজের ইতিহাস এই প্রথম নহে। মিষ্টার হুইলার "প্রাচীন কালের মান্দ্রাজ" গ্রন্থে বহু মূল্যবান উপাদানের সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপনের বিপুল শ্রমের লাঘব করিয়াছেন।—মিষ্টার পিঙ্গল চারি খণ্ডে সমাপ্ত প্রাচীন কাগজপত্রের সংগ্রহ প্রকাশিত করিয়া প্রাচীন কালে মান্দ্রাজে ইংরাজ-সমাজের সামাজিক ও ঐতিহাসিক কথার আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী যদি তাঁহাদের সেই সব লইয়া ও নূতন উপাদানের সংগ্রহ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ইতিহাস লিখিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত।

পূর্ব্বালোচনা।

ভারতবর্ষের সহিত স্পাইস দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য লইয়া ইংরাজ, পোর্টুগিজ ও ডচ—এই ত্রিশক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব পোর্টুগিজ কর্ম্মচারী দুই জন বণিক দক্ষিণ ভারতের প্রধান বন্দর পলিকট্ট হইতে বাণিজ্যোদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁহারা বঙ্গোপসাগরে মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী মসলিপট্টম পর্য্যন্ত আসেন। তাঁহারা এই স্থানে একটা আড্ডা স্থাপন করেন। ইহার পর বৎসর সুরাটে ইংরাজের কুঠী স্থাপিত হয়। দেশীয় শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ মসলিপট্টম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। পরে কেহ কেহ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া-

স্থাপনা।

ছিলেন বটে, কিন্তু তখন এ কথা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে সহজে রক্ষা করা যায়,এমন একটি স্থানের আবশ্যক। তদুদ্দেশে মিষ্টার ফ্রান্সিস্ ডেকে পর্টুগিজ উপনিবেশ সেণ্ট টমাসের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান দেখিতে পাঠান হয়। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিদ্রোহের ঠিক পূর্ব্বাহ্নে ডে দেশীয় শাসনকর্ত্তার নিকট সেণ্ট টমাসে কুঠী-স্থাপন ও দুর্গনির্ম্মাণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন, এখানে স্থানগত সুবিধা কি ছিল, বলা কঠিন। এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নরঞ্জন নহে, অধিকন্তু বন্দর নাই। বিজন বালুতটে সাগরতরঙ্গমালা সফেন আবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ স্থানে লোকের চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। তীরেই সাগরের সহিত সমান্তর রেখায় একটি নদী অলসপ্রবাহে বহিয়া যাইতেছে; তাহাতে সুবিধার মধ্যে এই যে, দস্যুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সহজসাধ্য হয়। ইহাতে জাহাজ থাকিবার সুবিধা নাই; অধিকন্তু সে লবণাক্ত জলে কৃষিকার্য্যের সাহায্য অসম্ভব। সেই অলস প্রবাহে পচনশীল শৈবালাদি হইতে সময় সময় অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হইত।

লেখিকা এই কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সার মণ্ট ষ্টুয়ার্ট গ্রাণ্ট ডফ Manual of Madras Administration গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—এই স্থানটি কুয়াম নদীর দুইটি শাখার মধ্যবর্ত্তী; দ্বীপোপম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি শত গজ ও প্রস্থে প্রায় এক শত গজ। এই স্থানে দেশীয় দস্যুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা সহজসাধ্য।

ডে এই দ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন; পথে রক্ষার বন্দোবস্ত করেন ও উত্তর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্রায়তন দুর্গের নির্ম্মাণ করিয়া দ্বীপটি সুরক্ষিত করেন। দ্বীপ-মধ্যে কেবল য়ুরোপীয়গণের বসবাসের অধিকার ছিল। সেই হেতু ক্রমে স্থানটি White Town নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। দ্বীপের বাহিরে ক্রমে দেশীয় তন্তুবায় প্রভৃতি অনেকে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে স্থানে বাস করিত, সে স্থানটি ক্রমে Black Town নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এই দুই স্থান একত্র মাদ্রাজপত্নম বা মান্দ্রাজপত্তম নামে পরিচিত হুইল। ইহার অর্থ মান্দ্রাজ সহর। কিন্তু মান্দ্রাজ শব্দের অর্থ কি, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। মোটের উপর ইহা নিশ্চিত যে, ডে নীরস মরুমাত্র নির্ব্বাচন করেন নাই। এই স্থান হইতে তিন মাইল দক্ষিণে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ময়নাপুর সহর; ইহা এক্ষণে বর্ত্তমান মান্দ্রাজের উপকণ্ঠে স্থিত। ইংরাজের আগমনের সার্দ্ধ এক শতাব্দী পূর্ব্বে (১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) পর্টুগিজগণ ময়নাপুরে একটি কুঠী স্থাপিত করে। যে স্থানে তাহারা কুঠী নির্ম্মিত করে, সে স্থানে পূর্ব্বে কতকগুলি ভারতবাসী খৃষ্টান বাস করিত। তাহারা স্থানটির সেণ্ট টোম নাম দেয়।

একটা কথা গ্রন্থকর্ত্রী বলেন নাই, কিন্তু মিষ্টার হুইলারের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এই নব করতলগত স্থানটি এতই আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল যে, মসলিপট্টমের কর্ত্তারা Court of Directors হইতে অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই দুর্গনির্ম্মাণের জন্য ডেকে আদেশ প্রদান করেন। যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ হইতে ইংলণ্ডে কোম্পানীর আফিসে প্রথম

পত্র লেখা হয়। করমণ্ডল উপকূলে বাণিজ্যসৌকর্য্যার্থ যে একটি দুর্গের আবশ্যক, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই পত্রে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সার জর্জ্জ বার্ডউড India office হইতে যে সকল কাগজপত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ডে তাঁহাদিগের বিনানুমতিতে দুর্গনির্ম্মাণে অর্থব্যয় করাতে ইংলণ্ডে কর্ত্তারা রুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডের প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছিল—মোট তেইশ হাজার টাকা। সে দুর্গ বর্ত্তমান দুর্গের উত্তরপূর্ব্ব কোণে দৈর্ঘ্যে সিকি মাইলেরও কম ও প্রস্থে এক শত গজ মাত্র স্থান অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। তখন ইহাতে কেবল এক শত সৈনিক থাকিবার স্থান ছিল।

শত বৎসরে সে দুর্গে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। তৎপরে এই দুর্গ ফরাসীদিগের হস্তগত হয়। ফরাসীরা চার বৎসর ইহা দখলে রাখিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের মধ্যে দুর্গে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করেন। অরম্‌ বলেন, ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ পুনরায় এই দুর্গ অধিকৃত করেন। সেই হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাতে আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজের সহিত ফরাসীর যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হয়, এবং সংবাদ আসে যে, ফরাসীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছেন। ইহাতে ইংরাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন তাঁহারা আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণরোধী করেন।

এই সকল পরিবর্ত্তনের শেষ হইতে না হইতেই বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। তখন লালীর অধীনস্থ ফরাসী সেনাদল এই দুর্গ আক্রমণ করে।

সে যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। তাহার ফলের উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। সে সুদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার স্থান আমাদের নাই।

এই সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গই এ দেশে ইংরাজের প্রথম অধিকার। ইহার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন অংশ, এবং যে বণিকদিগের "রাজা রাজ্য ব্যবসায়, বিপণী সমরক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়"—এই দুর্গই এ দেশে সেই বণিকদিগের প্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

বিবিধ।

সম্পাদকের পত্নী।

সম্পাদকের অবস্থা সর্ব্বদেশেই সমান, অর্থের বিষয়ে নহে—অবসরের কথায়। এ দেশে সম্পাদকের কার্য্য অনেক সময়—ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ; য়ুরোপে ও আমেরিকায় অবশ্য তাহা নহে। সে সব দেশে অর্থলাভ আছে ; কিন্তু অবসর সে দেশেও অল্প। এ দেশে অনেক স্থলে সম্পাদক স্বয়ং প্রবন্ধরচনা হইতে আরম্ভ করিয়া হিসাবরাখা ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সবই করেন। অন্যত্র তাহা না হইলেও সম্পাদককে এক পণ্টন লেখকাদির খবরদারী করিতে হয়। সে দায়িত্ব বড় সহজ নহে ; শ্রম অত্যন্ত অধিক।

সম্প্রতি নভেম্বর মাসের Woman at Home পত্রে কোন সম্পাদকের পত্নী সম্পাদক-

দিগের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধের কোন কোন স্থলের সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখিকার উপদেশ, রমণীর পক্ষে সম্পাদককে বিবাহ করা বড় অবিবেচনার কার্য্য। লেখিকা সম্পাদকদিগের গার্হস্থ্যজীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে সম্পাদকদিগের পক্ষে অকৃতদার থাকাই বিধেয়। কিন্তু কথা এই যে, অধিকাংশ সম্পাদকই সম্পাদক-পদপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়েন। লেখিকা বলেন, যদি কোন কিশোরী দেখেন যে, তাঁহার প্রণয়প্রার্থীতে সম্পাদকত্বের বিকাশসম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে পরিণয়-প্রস্তাবে 'ইতি' দেওয়াই সঙ্গত। অবশ্য যে স্থানে প্রণয়ের অরুণরাগে সকল কষ্টই অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে, সে স্থলে কথা স্বতন্ত্র। সম্পাদকের পত্নীর পক্ষে সহিষ্ণুতার আতিশয্য আবশ্যক; তাঁহাকে গৃহকর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিতে হইবে। আপনার কলানৈপুণ্য তাঁহার পক্ষে অবশ্যত্যজ্য। কারণ, তিনি যখন অতি মধুর সঙ্গীতচর্চ্চা করিবেন, তখন হয় ত তাঁহার স্বামী নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবেন। ক্রমে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, সঙ্গীত নিদ্রাকর্ষক ভেষজ-মাত্র। স্বামী যদি তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে একবারও ভাল করিয়া কথা না কহেন, তবুও পত্নী ক্রুদ্ধ হইলে চলিবে না। তাঁহার নিকট আদর আবদারের আশা সুদূরপরাহত।

সম্পাদকের পত্নী পেন্সনপ্রাপ্ত কেরাণীর দশ কন্যার এক জনই হউন, বা গভর্ণরের এক-মাত্র দুহিতাই হউন, তিনি রমণীমাত্র। দুর্ব্বল নারী "আদর, সোহাগ প্রেম"—না চাহিয়া থাকিতে পারে না। সম্পাদক স্বামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তের ঘণ্টা বাহিরে কাটাইবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আহার নিদ্রা বা ভ্রমণ কিছুই নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় না। যদি সহসা একদিন শেষ রাত্রে তিনি কোন আসন্ন সমরের সম্ভাবনায় চিন্তাকুলহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহার পত্নীকে তখনই সান্ত্বনা দিতে হইবে।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। লেখিকা বলেন, সম্পাদকের পত্নী যেন নিজের কায লইয়া ব্যস্ত থাকেন; স্বামীর কাযে সহায়তা করিবার আশা না রাখেন। তিনি মোজা শেলাই হইতে স্বামিসেবা পর্য্যন্ত করিবেন, কিন্তু যেন নিজে সাহিত্যসেবার কাযে না যান। যদি নিতান্তই সাহিত্যসেবা করেন, তবে যেন স্বামীকে বাদ দিয়া অন্য সম্পাদকের শরণ গ্রহণ করেন। অন্য সম্পাদকের ছাড় না পাওয়া পর্য্যন্ত কেন যে সম্পাদকের পত্নী স্বীয় স্বামীর সাহিত্যসেবায় সাহায্য করিতে পাইবেন না, তাহা বুঝা দুষ্কর। দেখা যাইতেছে, সম্পাদকের পত্নীর জীবন বিষম কষ্টকর। এবং এই জীবনে সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ কিছু অতি-রিক্তমাত্রায় প্রয়োজন।

একবার এক জন বিদেশী সংবাদপত্রলেখক ইংলণ্ডের কোন সম্পাদকের পত্নীকে বলিয়াছিলেন,—মহাশয়া, আপনার জন্য আমি দুঃখিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সে কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

বর্ত্তমান লেখক সম্পাদক নহেন, তাঁহার সম্পাদক হইবার যোগ্যতা যেমন অল্প, সম্ভাবনাও সেই রূপ সুদূরপরাহত। সুতরাং তাঁহার কথা স্বার্থপ্রণোদিত নহে।—স্বার্থত্যাগেই মানবের মনুষ্যত্ব। সম্পাদকদিগের জীবনে স্বার্থত্যাগে সেই মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়।

সাঁওতাল পরগণার মালজাতি।

রাজমহল পর্ব্বতের নিম্নদেশে কতিপয় গ্রামে একজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা আপনাদিগকে "মাল" বলিয়া থাকে। বীরভূমস্থ রামনগর পাহাড়ে এই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহাদিগকে পার্ব্বত্য জাতি মনে করিয়া ইহাদিগকে 'মাল পাহাড়ীয়া' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাদের আকৃতি ও ভাষা পাহাড়িয়াদিগের ন্যায় নহে, স্বতন্ত্র। ইহারা কদর্য্যভাবে বঙ্গভাষার উচ্চারণ ও শব্দের বিপর্য্যয় করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। বঙ্গদেশের চণ্ডালজাতীয় মাল সম্প্রদায়ের এবং সর্‌গুজা ষ্টেটের মার বা মালজাতির চেহারা, ভাষা ও আচার ব্যবহার দৃষ্টে উহাদিগকে আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, জাতিতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের মতে সাঁওতালপরগণাস্থ মালজাতি দুই প্রকার,—এক দল বিমিশ্র আর্য্য ও অপর সম্প্রদায় অনার্য্য। রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকাবাসী মাল-জাতিকে লোকে দ্রাবিড়ীশাখাভুক্ত অনার্য্য ও মাল পাহাড়ীয়াদিগের সম-শ্রেণীস্থ বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাদের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই প্রায় পাহাড়ীয়াদিগের মত। কিন্তু ইহারা, আপনাদিগকে পাহাড়ীয়া-দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, "মাল" নামে পরিচিত হইয়াছে, এবং পাহাড়ীয়া-জাতীয় মালেয়ার সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দুর অপবিত্র দ্রব্য আহার বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে না। ইহারা অরণ্য ভালবাসে, এবং অনেকে পাহাড়ের উপর বাস করে। বিটপিরাজি-সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্য দেখিলে ইহাদের অন্তঃকরণে স্বতঃই ভক্তিরসের উদ্রেক হয়, ইহারা আপনা হইতে বনদেবতার চরণে নত হইয়া পড়ে, ইহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে। কোন অনিবার্য্য কারণে কেহ কোথাও অরণ্যের ধ্বংস করিলে ইহাদের পরিতাপের সীমা থাকে না। যাহারা পাহাড়ে বাস করে, তাহাদের বাসস্থান অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতীয়ের ন্যায় উদ্যানে পরিবেষ্টিত থাকে। সে উদ্যানে শাকসব্‌জি, সর্ষপ, তামাক, কদলী, খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ শোভা পাইতেছে; এবং পল্লীর মধ্যভাগে সতেজ তেঁতুল, অশ্বথ, আম, কাঁঠাল, বাঁশের ঝাড়, কদলী ও তালবৃক্ষ গৃহসমূহ আবৃত করিয়া দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। সিমুরিয়া ও গোপাড়া নামক পল্লীদ্বয় এইরূপ

বৃক্ষাচ্ছাদিত হইয়া, বহু নরনারী বক্ষে ধারণ করিয়া, পরমরমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তথায় বহিঃশালা, শূকরের খোঁয়াড়, গোশালা, শস্যপূর্ণ মরাই প্রভৃতি সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিচয় দিতেছে। অপদেবতা না আসিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাটীর সম্মুখে, তাড়িতসঞ্চালক লৌহদণ্ডের ন্যায়, এক একটি লম্বা বাঁশ প্রথিত আছে। গ্রামে মনুষ্য বা পশুর মড়ক উপস্থিত হইলে, প্রেতাত্মাদিগকে উহার হেতু মনে করিয়া ইহারা "রোগ পিগোয়া" নামক স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করে; এবং পুরাতন অস্ত্র, রক্তরঞ্জিত মৃৎপাত্র, পুরাতন ঝুড়ি, বাতাস করিবার পাঁখা প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা দেবতার পূজা করিয়া থাকে। পৃথিবী ও সূর্য্য ভিন্ন ইহাদের অন্য কোন দেবতা আছে কি না, তাহা জানা যায় নাই। কেহ কেহ ইহাদের হস্তী দেবতার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাদের দেব দেবীর কোন মন্দির বা প্রতিমূর্ত্তি নাই।

ইহারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—কুমার পলি, দাঙ্গর পলি ও মার পলি। রাজমহল পাহাড়ের উত্তরাংশের লোকদিগকে ইহারা সুমার পলি কহিয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে জাত্যংশে আপনাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে। পূর্ব্বোক্ত তিন পলির আচার ব্যবহার ও ভাষা এক; এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদিও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বংশমর্য্যাদানুসারে ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোকেরা রাজা, ভূম্যধিকারী বা তাহাদের বংশধর, এবং তাহাদের উপাধি সিংহ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে "গৃহী" কহে। ইহারা এক সময়ে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং দরিদ্রদিগকে টাকা ধার দিত, কিন্তু রাজকীয় কর্ম্ম কখনও করে নাই। তৃতীয় শ্রেণী মাঝি, রাজকার্য্য ইহাদিগের একচেটিয়া ছিল। চতুর্থ শ্রেণী আহেরি নামে অভিহিত, এবং শিকার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। পঞ্চম শ্রেণীর লোকদিগকে নৈয়া কহে। ইহারা পূর্ব্বে পুরোহিতগিরি করিত, অধুনা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হিন্দুরা তথ্যানুসন্ধান না করিয়া সমস্ত জাতিকে নৈয়া নামে অভিহিত করেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। পুরাকালে রাজা মাঝি (পুরোহিত), দেওয়ান (মন্ত্রী), ও ফৌজদার (সেনাপতি) মনোনীত করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভাত সহ্য হয় না বলিয়া মাল-জাতীয়েরা তাহা কখনও আহার করে না; রুটী ও অন্যান্য আহার্য্য বস্তু খাইয়া প্রাণধারণ করে। ইহারা অন্যান্য পাহাড়ীয়াদিগের ন্যায় উরাওন জাতির দৃষ্টান্তে

এক অভিনব প্রথার অবলম্বন করিয়াছে। ইয়ুরোপে বিদ্যালয়সমূহের সংলগ্ন বোর্ডিং হাউসে যেরূপ বহু পরিবারের পুত্র বা কন্যাদিগকে পাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত বাস করিতে হয়, এবং প্রাচীন স্পার্টান জাতির মধ্যে যেরূপ বিভিন্ন পরিবারের যুবক বা যুবতীগণকে এক একটি শিক্ষামন্দিরে নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত থাকিতে হইত, ইহাদের পল্লীতেও বালকবালিকাদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঐরূপ কয়েকটি গৃহ আছে; তথায় এক গ্রামস্থ কুমার বা কুমারী-দিগকে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয় দেওয়া হয়।

ইহাদের পুরুষেরা খুব দৃঢ়কায় ও কর্ম্মকুশল, অধিকাংশই লাল পাগড়ী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকদিগের বর্ণ গৌর, গঠন সুন্দর, মুখশ্রীতে কমনীয়তা বিদ্যমান। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই লালবর্ণের দুই খণ্ড বস্ত্র পরিধান করে,—একখানি কটি হইতে জানুর নিম্ন পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করে, অপরখানি দ্বারা কটিদেশ হইতে বক্ষের উপরিভাগ বা গলদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করে; গলায় লাল, নীল ও শুভ্রবর্ণের পুঁতির মালাগুলি স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হইয়া দর্শকের নয়ন আকৃষ্ট করে। সাঁওতাল-রমণীরা এক এক জন এক সের হইতে ১৬ সের বা ততোধিক পরিমাণ নিকৃষ্টধাতুর অলঙ্কার পরিধান করে, কিন্তু মাল-রমণীদিগকে কচিৎ ধাতুদ্রব্যের গহনা ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

নৃত্য।—প্রতিবৎসর পৌষমাসে "ভুঁইদেও" (ভূমিদেব) নামক পর্ব্বে ইহারা কোলদিগের ন্যায় মহোৎসব করিয়া থাকে। উরাওণদিগের "কর্ম্মা" উৎসবের ন্যায় ইহারা নৃত্যের অঙ্গনভূমিতে শালবৃক্ষের দুইটি শাখা পুঁতিয়া তাহার চারি পার্শ্বে তিন দিবস নৃত্য করিয়া শাখা দুটি নদীতে নিক্ষেপ করে। এই সময় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শ্রেণী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নৃত্য করে, বাদ্যকরেরা তাহাদের মধ্যভাগে থাকিয়া মাদোলের তালে নৃত্যকলায় উৎসাহ দিতে থাকে। পুরুষেরা এক পংক্তিতে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দুই হস্তে উভয়পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের বাম ও দক্ষিণ হস্তের কনুইএর উপরিভাগ ধরিয়া ও প্রত্যেকে ঐরূপে ধৃত হইয়া, রণশিক্ষার্থী সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় কখনও অবনত হইয়া এবং কখনও সোজা হইয়া, একবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে, এবং কখন চক্রাকারে চলিতে থাকে। স্ত্রীলোকেরাও পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া ঐরূপে নৃত্য করে। এই নৃত্যকে "ঝুমুর নাচ" কহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং জন্ম, বিবাহ ও পূজাদিতে এইরূপ নৃত্য হইয়া থাকে।

শবদেহ মৃত্যুদিবসেই সমাহিত হয়। অবস্থাপন্ন লোকের মৃত্যু হইলে পুরোহিত আসিয়া তাহার ভাবী মঙ্গলের জন্য মন্ত্রপাঠাদি করিয়া থাকে। জ্ঞাতিরা পাঁচ দিন অশৌচের পর স্বজাতীয়গণকে ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হয়। ধনী মালেরা কন্যাগণের অল্পবয়সে বিবাহ দেয়, কিন্তু দরিদ্রের ঘরে কন্যা বহুবর্ষ অবিবাহিতা থাকে। পিতামাতাকে বরের নিকট হইতে কন্যার পণ গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু উহা এত অল্প যে, বিবাহের সাধারণ খরচও কুলায় না। সমোধ (উপপত্নী) রাখিতে হইলে কোন প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধ দম্পতির ন্যায় আজীবন থাকিয়া যায়। ইদানীং জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার কুলমর্য্যাদা ও স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী। অন্যান্য সমস্তই পাহাড়ীয়াদিগের অনুযায়ী, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

বিদেশী গল্প।

যাত্রা-পথে।

Cannes পরিত্যাগ করিবার পর গাড়ী যাত্রিপূর্ণ হইল; এবং সকলে পরিচিত ছিলাম বলিয়া কথোপকথনে রত হইলাম। যখন আমরা Tarascon অতিক্রম করিয়াছি, এক জন বলিলেন, "এই স্থানেই নরহত্যা ঘটে।" যে গুপ্তঘাতক এতগুলি পথিকের প্রাণনাশ করিয়া অদ্যাবধি ধৃত হইল না, তাহার সম্বন্ধে আমরা কথা কহিতে লাগিলাম। প্রত্যেকেই নানারূপ অনুমান করিতে লাগিলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত জানাইতেছিলেন। ভয়কম্পিতা রমণীগুলি সাসি দিয়া তিমিরকুটিল রজনীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন; তাঁহাদের ভয় হইতেছিল, দ্বারদেশে হঠাৎ যদি কোন মানুষের মস্তক দেখা যায়! আমরা ভীষণ বিপদাবলীর ভয়াবহ গল্প করিতেছিলাম—দ্রুতগামী যানে উন্মাদের সহিত একত্রাবাসের গল্প, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় সন্দিগ্ধদৃষ্টি লোকের সম্মুখে ঘণ্টা কয়েক ধরিয়া যাপনের গল্প।

সকলেই আপনার আপনার গল্প করিলেন; তাঁহারা বিস্ময়কর ঘটনাচক্রে

পড়িয়া প্রশংসার্হ সাহস ও মানসিক বলের সহিত দুষ্ক্রিয়াকারীকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রহৃত করিয়াছেন, এবং গলা টিপিয়া মারিয়াছেন। এক জন চিকিৎসক—তিনি প্রত্যেক শীত ঋতু দক্ষিণ ভূভাগে যাপন করিয়াছেন—একটি গল্প বলিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলিলেন;—

"উক্ত প্রকার কোন কার্য্যে সাহসের পরিচয় প্রদান করিবার সুবিধা আমার হয় নাই; কিন্তু, আমি এক সময়ে একটি রমণীকে জানিতাম, যাঁহার জীবনে একটি অত্যন্ত অলৌকিক রহস্যপূর্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা ঘটিয়াছিল। অধুনা তিনি লোকান্তরিত—জীবিতাবস্থায় আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন।

"তিনি রুশ্-বংশীয়া, কাউণ্টেস্ Marie Baranow, একটি ধনবতী এবং নিরতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী স্ত্রী। আপনারা জানেন, রুশ্ রমণীরা কেমন সুন্দরী, অন্ততঃ আমাদের চক্ষে কেমন সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়—তাহাদের সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, তাহাদের সুকোমল মুখগুলি; তাহাদের নয়নযুগল কেমন পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী, কি অবর্ণনীয় রঙ্গের, কেমন নীলাভ ধূসর; আর, তাহাদের স্নিগ্ধ সুষমা—ঈষৎ পুরুষোচিত। কেমন একটু দুষ্টামি এবং লোভোৎপাদিকা শক্তি, গর্ব্বিত এবং মৃদু, কোমল ও কঠোর ভাব তাহাদের যে আছে—এক জন ফরাসীকে তাহা একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ, হয় ত, জাতি এবং শোণিতের পার্থক্যই তাহাদিগকে আমাদের চক্ষে এত সুন্দর করিয়া তুলে।

"কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা আছে; শীতকালে দক্ষিণ ফ্রান্‌সে থাকিতে তাঁহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃতা। অবশেষে, গত শরতে, ডাক্তার তাঁহার জীবনে নিরাশ হইয়া, তাঁহার স্বামীকে জানাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে Mentoneএ যাইতে আদেশ করিলেন।

"বাষ্পীয় যানের একটি কক্ষে তিনি একাকিনী বসিয়াছিলেন, ভৃত্যাগণ স্বতন্ত্র কামরায় ছিল। কথঞ্চিৎ বিষাদের সহিত তিনি জানালার পার্শ্বে বসিয়া জনপদ ও পল্লীবৃন্দ দেখিতেছিলেন। নিজের জীবনটা এমন নির্জ্জন, এত অসহায় মনে হইতেছিল; সন্তান নাই, আত্মীয় বান্ধব নাই বলিলেই হয়; স্বামী আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমও আর নাই—সামান্য ভৃত্য পীড়িত হইলে যেমন

তাহাকে হাঁস্‌পাতালে পাঠাইয়া দিতেন, তাঁহাকেও তেমনই যেন পৃথিবীর কোন্ সীমান্তে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহার সহিত আসিলেন না।

"প্রত্যেক ষ্টেশনে ভৃত্য আইভান স্বীয় কর্ত্রীর নিকট যাইয়া সন্ধান লইতেছিল, প্রয়োজন মত তিনি সমস্ত পাইয়াছেন কি না। ভৃত্যটি পুরাতন, একান্ত অনুগত, স্বামিনীর যে কোন আদেশ পরিপালন করিতে প্রস্তুত।

"নিশাগম হইল, শকট পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল; শিথিলতন্ত্রী বীণার মত তিনি শক্তিহীনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। যাত্রামুখে, তাঁহার স্বামী যে ফরাসীদেশীয় স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, সেগুলি গণিয়া দেখিবার ইচ্ছা হঠাৎ তাঁহার মনে জাগিল। তিনি ছোট ব্যাগটি খুলিয়া আপনার উৎসঙ্গে সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশি ঢালিয়া দিলেন।

"কিন্তু সহসা শীতল বায়ু তাঁহার মুখ স্পর্শ করিল। সবিস্ময়ে তিনি মস্তক তুলিলেন। দ্বার অচিরোন্মুক্ত। ভয়বিহ্বলা কাউণ্টেস্ অঙ্কস্থ ধনরাশির উপর শাল বিছাইয়া দিয়া, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই এক জন পুরুষ প্রবেশ করিল—শিরস্ত্রাণহীন, আহতহস্ত, এবং সান্ধ্য-পরিচ্ছদ-পরিহিত। সে হাঁপাইতেছিল।

"সে দ্বারটি পুনরায় রুদ্ধ করিল, এবং আসনগ্রহণ করিয়া তীব্রদৃষ্টিতে কক্ষস্থিতাকে দেখিল; পরে, রুমালের দ্বারা আহত প্রকোষ্ঠ আবৃত করিল।

"মহিলাটি ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। এই লোকটা নিশ্চিতই তাঁহাকে মুদ্রা গণিতে দেখিয়াছে, এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া উহা অপহরণ করিতেই আসিয়াছে।

"সে নিস্পন্দভাবে তাঁহার উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিল—যেন তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িবার প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আগন্তুক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,

"'আর্য্যে! ভীত হইবেন না।'

"কাউণ্টেস্ কোন উত্তর দিলেন না, ওষ্ঠাধর বিভিন্ন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি স্বীয় হৃদয়ের স্পন্দনশব্দ স্পষ্ট শুনিতেছিলেন, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ আসিতেছিল।

"সে পুনর্ব্বার বলিল, 'আর্য্যে! আমি দুষ্ক্রিয়াকারী নই।'

"তথাপি তিনি কিছু বলিলেন না; কিন্তু, অকস্মাৎ তাঁহার জানুদ্বয় কম্পান্বিত হওয়াতে সমস্ত মুদ্রা ছড়াইয়া পড়িল—যেন নলের মুখ হইতে জলস্রোত বেগে নির্গত হইল।

"এই সুবর্ণপ্রবাহ দেখিয়া লোকটি সবিস্ময়ে চাহিল, এবং তৎক্ষণাৎ উহা কুড়াইতে অগ্রসর হইল।

"কাউন্টেস্ ভয়চকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং সমস্ত মুদ্রাগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দ্বারের নিকট ছুটিয়া গেলেন—ইচ্ছা, পথে লাফাইয়া পড়েন। কিন্তু সে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অচিরে তাঁহার মণিবন্ধ দুটি সবলে ধরিয়া আসনে বসাইয়া দিল, এবং বলিল,

"'আর্য্যে! আমার কথা শুনুন। আমি চোর নই। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি আপনার মুদ্রাগুলি কুড়াইয়া আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি। কিন্তু, আপনি যদি আমাকে সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করিতে সাহায্য না করেন, আমার আর আশা নাই, আমি মৃতকল্প। ইহার অধিক আর কিছু আপনাকে বলিতে পারিব না। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা রুশিয়ার শেষ ষ্টেশনে পঁহুছিব; এক ঘণ্টা বিশ মিনিটের মধ্যে সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিব। আপনি যদি আমাকে না উদ্ধার করেন, আমার আর উপায় নাই। এবং ইহাও সত্য, আর্য্যে, আমি হত্যাও করি নাই, অপহরণও করি নাই, কিম্বা অভদ্রোচিত কোন কায করি নাই। ইহা আমি আপনাকে শপথ করিয়া বলিতেছি। আর কিছু আপনাকে বলিতে পারিব না।'

"জানুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া, আসনগুলির তলদেশ হাতড়াইয়া, এবং কক্ষের প্রতি কোণ অন্বেষণ করিয়া, সে মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিল।

"তার পর, যখন ছোট চর্ম্মথলিটি পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ হইল, সে উহা কাউন্টেসের হস্তে দিয়া একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, অপর কোণে গিয়া বসিল।

"তাহাদের মধ্যে কেহই আর নড়ে নাই। তিনি নিঃস্পন্দ ও নির্ব্বাক, তখনও শঙ্কায় অভিভূত, কিন্তু ক্রমশঃ সাহস ফিরিয়া পাইতেছিলেন। পুরুষটীরও একটি অঙ্গ নড়ে নাই, সে সোজা হইয়া বসিয়াছিল, তাহার রক্তহীন চক্ষু পুরোভাগে বদ্ধদৃষ্টি—যেন সে মৃত। কাউন্টেস্ ক্ষণে ক্ষণে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, এবং চকিতে অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছিলেন। সে এক জন প্রায় ত্রিংশ বৎসরের পুরুষ, অতিশয় সুন্দর, তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, নিশ্চয়ই সে ভদ্রবংশীয়।

"শ্রুতিবিদারী বংশীরবে রজনীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া, তিমিরপুঞ্জ ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল—কখন গতিবেগ মন্দীভূত করিয়া, পুনরপি দ্রুততম

গতিতে চলিতে লাগিল। পরে, তাহার গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইল, বার কয়েক বাঁশী বাজিল, এবং একেবারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

"আইভান আদেশ জানিবার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কাউণ্টেস্ মেরি শেষবার তাঁহার অদ্ভুত সহযাত্রীর বিষয় ভাবিয়া লইলেন, এবং কম্পিত ও বিজড়িত স্বরে ভৃত্যকে বলিলেন,

"আইভান! তোমাকে কাউন্টের কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নাই।"

"বিস্মিত হইয়া ভৃত্য আপনার বিশাল ছুটি নয়ন প্রসারিত করিল, এবং অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'কিন্তু—কিন্তু—'

"কাউণ্টেস্ বলিতে লাগিলেন, 'না, তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, তুমি রুশিয়াতেই থাক। এই—এই নাও তোমার পাথেয়। আমাকে তোমার টুপী ও ক্লোকটা দাও।'

"আদেশানুবর্ত্তী বিস্ময়বিমূঢ় বৃদ্ধ পরিচারক আপনার শিরস্ত্রাণ ও উত্তরাসঙ্গ উন্মোচন করিল—স্বামিনীর আকস্মিক চিত্তচাঞ্চল্য ও অনিবার্য্য খেয়ালে সে অভ্যস্ত ছিল। কষ্টে সে নয়নের জল সংবরণ করিয়াছিল।

"সীমান্ত অভিমুখে শকট আবার চলিতে লাগিল।

"তখন কাউণ্টেস্ মেরি সহচরকে বলিলেন, 'মহাশয়! এইগুলি আপনার জন্য; আপনি আইভান—আমার পরিচারক। আমি কেবলমাত্র এই সর্ত্ত করিতেছি, আপনি আমার সহিত একবারও কথা কহিবেন না, কোন উপকার-প্রাপ্তির ছল করিয়া আমাকে ধন্যবাদও দিবেন না।'

"অপরিচিত একটিমাত্র কথা না বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

"শীঘ্রই গাড়ী পুনর্ব্বার থামিল; এবং সসজ্জ রাজকর্ম্মচারিগণ গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। কাউণ্টেস্ তাহাদিগকে কাগজপত্র দিলেন, এবং কক্ষের একপার্শ্বে উপবিষ্ট পুরুষটিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'আমার ভৃত্য, আইভান; এই উহার—ছাড়পত্র (Passport)।'

"গাড়ী পুনরায় চলিতে লাগিল।

"সমস্ত রাত্রি তাহারা একত্র কাটাইলেন—উভয়েই নির্ব্বাক।

"প্রাতঃকালে, অপরিচিতটি একটি German stationএ অবতরণ করিল, এবং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিল, 'ক্ষমা করুন আর্য্যে! আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতেছি। কিন্তু আপনাকে ভৃত্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছি; তাহার স্থান অধিকার করা আমার কর্ত্তব্য। আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি?'

"তিনি উদাসীনভাবে বলিলেন, 'যান, আমার পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিবেন।'

"সে চলিয়া গেল। অদৃশ্য হইল। যখনই তিনি বিশ্রামগৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, দেখিয়াছেন দূর হইতে সে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

"যথা-সময়ে তাঁহারা Mentoneএ উপস্থিত হইলেন।"

ডাক্তারটি মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন;—

"একদিন আমি পাঠাগারে রোগী দেখিতেছি, এমন সময় একটি দীর্ঘাকার পুরুষকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

"সে বলিল, 'ডাক্তার মহাশয়! আমি Countess Marie Boronowর সংবাদ লইতে আসিয়াছি। তিনি আমাকে জানেন না, আমি তাঁহার স্বামীর এক জন বন্ধু।'

"আমি বলিলাম, 'তাঁহার আর কোন আশা নাই। রুশিয়াতে আর তাঁহাকে ফিরিতে হইবে না।'

"লোকটি ক্রন্দন করিতে লাগিল; এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় আমি কাউণ্টেস্‌কে বলিলাম, একটি অপরিচিত লোক তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল। তিনি যেন ব্যথিত হইলেন; এবং আমি আপনাদের এইমাত্র যে গল্প বলিলাম, তাহাই আমাকে তিনি বলিলেন।

"তিনি আরও বলিলেন, 'এই লোকটি, যাহাকে আমি আদৌ জানি না, ছায়ার মত আমার অনুসরণ করে। বাহিরে যাইলেই আমি তাহাকে দেখিতে পাই। আশ্চর্য্যভাবে সে আমার প্রতি চাহিয়া থাকে, কিন্তু কদাপি আমার সহিত কথা কহে না।

"তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন, 'দেখুন—আমি বাজি রাখিতেছি, সে আমার জানালার নিম্নে আছে।'

"আসন হইতে উঠিয়া, তিনি পর্দ্দা সরাইয়া আমাকে দেখাইলেন যে, যে লোকটি আমার নিকট আসিয়াছিল, সে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া হোটেলের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে আমাদের দেখিয়া দাঁড়াইল, এবং পুনর্ব্বার মুখ না ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

"এইরূপে আমি এই অসামান্য বিস্ময়কর ও দুর্ব্বোধ্য ঘটনায়, পর-

স্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত এই দুটি প্রাণীর মৌন প্রেমে, বিজড়িত হইলাম।

"মুক্তি-লব্ধ জন্তুর মত সে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত—আমরণ কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত ছিল। সে প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'তিনি কেমন আছেন?' এবং তাঁহাকে পাণ্ডুতরা ও অধিকতর কৃশা দেখিয়া সকাতরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত।

"কাউণ্টেস্ আমাকে বলিলেন, 'আমি একবারমাত্র এই অদ্ভুত লোকটির সহিত কথা কহিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয়, তাহাকে যেন কুড়ি বৎসর ধরিয়া জানি।'

"যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইত, তিনি গম্ভীর অথচ মনোরম হাস্যের সহিত তাহার অভিবাদনের প্রতিদান করিতেন।

"আমি দেখিতে পাইতাম, তিনি সুখে ছিলেন—সেই পরিত্যক্তা, মরণাপন্না রমণীটি। আমি বুঝিতে পারিতাম, এমন ধৈর্য্য ও মান্যে বিমণ্ডিত উদ্দাম কবিত্বময় প্রেমে, এই সর্ব্বকার্য্যসাধনোদ্যত অনুরাগে তিনি সুখিনী হইতেন। তথাপি, তাঁহার অচল অথচ উন্নত প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিতে, তাহার নাম জানিতে, বা তাহার সহিত কথা কহিতে একেবারে অস্বীকৃতা ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'না না, তাহা হইলে আমাদের এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব মাটী হইয়া যাইবে। পরস্পরের নিকট আমরা অজ্ঞাতই থাকিব।'

"সেও ত নিশ্চয়ই Don Quixoteএর মত ছিল। কারণ সে তাঁহার নিকট আসিবার কখনও চেষ্টা করে নাই। গাড়ীতে বসিয়া সে যে বিসদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অক্ষরে অক্ষরে তাহা পরিপালন করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় ছিল।

"কাল-ব্যাপী রোগে ক্ষীণা কাউণ্টেস্ সময় সময় সোফা হইতে উঠিয়া জানালার আবরণ সরাইয়া দেখিতেন, সেখানে সে আছে কি না। সেই কাষ্ঠাসনে তাহাকে যথাপূর্ব্ব বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি অধরে হাসিটি লইয়া শয্যায় ফিরিতেন।

"একদিন প্রভাতে দশটার সময় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি হোটেল হইতে বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময় সে আমার নিকট আসিল—মুখ বিষাদ-বিকৃত, পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিল।

"সে বলিল, 'আপনার সাক্ষাতে আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে দেখিতে চাই।'

"আমি তাহার হস্তধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

"সে মৃতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শবের হস্ত গ্রহণ করিল, এবং উহা চুম্বন করিল—একটি বিলম্বিত, চিরায়মান চুম্বন। তার পর উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।"

ডাক্তার পুনরায় নীরব হইলেন। তাহার পর বলিলেন,

"নিশ্চয়ই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর রেলওয়ে ঘটনা যাহা আমি জানি। ইহাও বলা অবশ্য কর্ত্তব্য যে, লোকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল মত কার্য্য করে।"

এক জন মহিলা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন,

"আপনারা যেমন ভাবিতেছেন, লোক ছুটি তেমন উন্মাদ ছিলেন না। তাঁহারা—তাঁহারা—"

কিন্তু তিনি আর বলিতে পারিলেন না—এত ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমরা অন্য কথা পাড়িলাম। তিনি কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আর জানিতে পারি নাই। *

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

কবিতা-কুঞ্জ।

বঙ্গ-লক্ষ্মী।

কে আছে অধিনী হেন অবনী-মাঝারে?
হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে
স্বর্ণতনুখানি মা গো! তপ্ত অশ্রুজলে
সপ্ত কোটী শিশু কা'র করে হাহাকার?
কিন্তু অয়ি জন্মদাত্রী জননী আমার,
আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে
স্মরি' কীর্ত্তিরাশি তোর;—প্রেমপুণ্য বলে
আজিও অজেয় তুই, গর্ব্ব বসুধার।
যে মহিমা-শৈল-শিরে, রাজরাজেশ্বরী,
আছিস্ বসিয়া, দেবভোগ্য সে বিভব
আর লভিয়াছে কেবা এ মর-ভুবনে?
কি ছার সম্পদ-সুখ?—চঞ্চল লহরী
কাল-সিন্ধু-নীরে যথা নশ্বর সে সব!—
অনশ্বর স্বর্গ মা গো তোর ও চরণে।

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

* গী দে মোপাসাঁর রচিত একটি ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

বসন্তে।

মধু ঋতু এসেছে আবার—
ধরণীর নবীন যৌবন।
ধীরে ধীরে বহে মধুময়
গন্ধমদে অলস মলয়,
কোকিলের অশ্রান্ত কূজনে
মুখরিত বকুলকানন।
বসন্তের সরস পরশে
পুলকিত জাগ্রত ভুবন।

দিকে দিকে উঠিছে উচ্ছ্বসি'
নব নব আনন্দের গান ;
রাশি রাশি প্রস্ফুটিত ফুলে
গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন মুকুলে
লুব্ধ অলি ফিরে গুঞ্জরিয়া
কুঞ্জে কুঞ্জে সারা দিনমান।
শান্ত সুপ্ত তটিনীর নীরে
জাগিয়া উঠিছে কলতান।

আজি তুমি আসিবে না ফিরে ?
আসিয়াছে জ্যোৎস্নাময়ী রাতি,
নব-আশা-প্রদীপ্ত-হৃদয়ে,
হেথা মম নিভৃত নিলয়ে
আজি আমি তোমার লাগিয়া
পুষ্পশয্যা রাখিয়াছি পাতি',
কণ্ঠে তব পরা'ব বলিয়া
বরমাল্য রাখিয়াছি গাঁথি'।

এস তুমি বসন্তের মত,
আজি মম মনঃকুঞ্জবনে ;
মুঞ্জরিবে বিশীর্ণ বল্লরী,
মধুব্রত আসিবে গুঞ্জরি,
পল্লবিত শ্যাম তরুরাজি
মর্ম্মরিয়া উঠিবে পবনে।
এস তুমি বসন্ত নবীন !
হিমজীর্ণ আমার জীবনে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া।

কত ক'রে সাধিলাম, কত ব'সে কাঁদিলাম,
লুটে লুটে পড়িলাম রাঙ্গা চরণে,
তবুও হলো না দয়া পাষাণ প্রাণে।
কেন যাও তেয়াগি, কেন এত বিরাগী ?
কি ধারা বহিয়া যায় বাঁকা নয়ানে !
কিসে এত উতরোল, মুখ-ভরা হরিবোল,
দিন কাটে রাতি কাটে কার ধেয়ানে ?
আমি দাসী—চিরদাসী, চির শুভ-অভিলাষী
নির্নিমেষে চেয়ে আছি ও মুখ পানে ;
কি বুঝিব হরি হরি ! কিসে এত ছাড়াছাড়ি,
আমি ত ও পদ ভাবি ধ্যানে জ্ঞেয়ানে।
প্রিয়, অতি প্রিয় তুমি, কোথা চলে যাও স্বামী,
কিছু কি হয় না দয়া পাষাণ-প্রাণে ?

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

এসো।

নিভে গেছে বাসনার অনল ভীষণ,
অনাসক্ত শান্তিময় হৃদয়-কাননে
অনূঢ়া ভকতি-বধূ, তোমার কারণে
বসে আছে, প্রাণসখা কর দরশন।
তুমি চক্ষুময়—তুমি প্রতিভা-আলয়,
তব মহিমার জ্যোতি, আলোক-আঁধারে,
নীলিম আকাশবক্ষে, অসীম পাথারে,
ছড়ায়ে মঙ্গলদীপ্তি সতত উদয়।
এসো বঁধু, এসো সখা, এসো প্রাণেশ্বর,
এ মঞ্জু হৃদয়-কুঞ্জে, মধু অভিসারে,
তোমারি রচিত এই প্রাণ-পুষ্প-হারে,
যতনে সাজায়ে তোমা দেখিব সুন্দর।
নিরাবিল প্রেমজলে করায়ে সিনান
মাধুরীতে নিশিদিন জুড়াইব প্রাণ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

হৃদয়ের আলো।

আঁধার যেতেছে সরি',
আলোক আসিছে ফিরে,
আবার আলোক সরি'
আঁধার আসিছে ঘিরে;

আঁধারে আলোকে খেলা
এ ধরায় পরে পরে,
হৃদয়ের আলো কেন
নিভে যায় চিরতরে?

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কার্ত্তিক। "গ্রামের পিসিমা" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের অঙ্কিত একটি মনোজ্ঞ নক্সা।—কিন্তু অতিবিস্তৃতিদোষে রসভঙ্গ হইয়াছে; উজ্জ্বল রচনাটির স্থানে স্থানে অনবধানতার কলঙ্কস্পর্শে সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে। নগরের খেজুর-রসে যেমন জলের আধিক্য—কেবল ফেনার বাহার, নক্সাটিও কতকটা সেইরূপ। এই দোষ না থাকিলে "গ্রামের পিসিমা" বরেণ্য হইতেন। দীনেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে পল্লীচিত্রে 'জীরেন কাটের' তাজা রস ঢালিয়া দিতেন, এখন খাঁটি রসে জল ঢালিয়া 'পান্সে' করিতেছেন কেন? শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "পঞ্চায়তের বৈঠক" উড়িষ্যার সমাজচিত্র—গল্পের ন্যায় সুখপাঠ্য। যতীন্দ্রবাবু এক একটী চিত্রে উড়িষ্যার পল্লী-জীবনের এক একটি অধ্যায় সজীব করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু অন্তঃপুরচারী মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় শ্লীলতার দিকে লেখকের আর একটু অবধান প্রার্থনীয়। ৫৯৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চম পংক্তি হইতে সপ্তম পংক্তি পর্য্যন্ত মার্কণ্ড পধানের উক্তি উড়িয়া কৃষকসমাজের যোগ্য হইতে পারে, "ভারতীর" ন্যায় মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার নহে। শিক্ষার সহিত শালীনতার বিরোধ দেখিলে আমরা মর্ম্মাহত হই। এ সকল বিষয়ে বর্ষীয়সী ভারতীর এরূপ অনবধান কোনও মতে শোভন বলিয়া মনে হয় না। "কবিতার ছন্দ ও মিল" একটি উল্লেখযোগ্য সন্দর্ভ,—কবিতা-লেখকগণের আলোচনার যোগ্য। এবারকার ভারতীতে আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা দেখিলাম না।

পূর্ণিমা। কার্ত্তিক। এবারকার পূর্ণিমা সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ রচনায় পরিপূর্ণ। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের "যজ্ঞ" একটি উপাদেয় সন্দর্ভ। লেখকের পাণ্ডিত্য ও বুঝাইবার প্রণালী প্রশংসনীয়। "মধুযশা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান" একটি বিদ্রূপাত্মক রচনা; সেকালের রসিকতা,—একালের ইয়ারকি বা ইংরাজী রসরচনার অনুকরণাত্মক রূপান্তর নহে। স্নিগ্ধ, শান্ত, সহজ,—পড়িয়া তৃপ্তি হয়। "অমৃতসরের গুরুদরবার" একটি সুমিষ্ট ভ্রমণকাহিনী;—কেবল বাক্যের ফোয়ারা নয়, লেখক অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। আজকাল বঙ্গীয় পরিব্রাজকগণ গড়পার, বালিগঞ্জ, চিৎপুর প্রভৃতির ভ্রমণকাহিনী রচিয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণে কাণ ঝালাপালা করিতেছেন, প্রতিষ্ঠাশালী ভ্রমণবৃত্তান্তকারের হস্তেও পাঠকের পরিত্রাণ নাই। এ অবস্থায়, সাদা ভাষায়

সহজ কথায় একখানি সাদা-সিধা ছবি দেখিয়া আমরা নির্বৃতি লাভ করিলাম। "মৃত্যু" এখনও চলিতেছে। শাখাপল্লবের ঘটায় "মৃত্যুর" স্কন্ধ কাণ্ড আচ্ছন্ন—সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রায় গোলকধাঁদা। লেখক এই 'মুস্কিলে'র একটা 'আসান' করেন ত পাঠকগণ মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, তাঁহার রচনা-শ্রমও সার্থক হয়। এখন যে ভাবে চলিতেছে, তাহা অনধিকারীর অনধিগম্য। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়" গুণগ্রাহী লেখকের উজ্জ্বল মন্তব্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ও অমূল্য ইঙ্গিত যেমন হিতকারী, তেমনই মনোহারী। লেখকের উৎসাহবাণী যেমন রসাল, সাহিত্যবিড়ম্বনার প্রতি তাঁহার লঘুগামী অন্তর্ভেদী ধিক্কার-বাণ তেমনই ধারাল। মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিক হিন্দু লেখক গোঁড়ামির পরিচয় দেন;—সাহিত্যের হিসাবে তাহা সাংঘাতিক। অপর সর্ব্বত্র তিনি আপনার ক্ষমতায় আপনি দীপ্যমান সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক,—সাহিত্যের বন্ধু, লেখকের মন্ত্রী ও অপচারের জুজু!

ত্রিস্রোতা। প্রথম ভাগ, ১ম সংখ্যা। আশ্বিন। এই মাসিকপত্রখানি জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অবতরণিকায় প্রকাশ, "সাহিত্য-চর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ আনন্দলাভ এবং আনন্দবিতরণ। * * * এই পত্রিকায় দর্শন, বিজ্ঞান, ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকা[র প্র]বন্ধ প্রকাশিত হইবে।" ত্রিস্রোতার সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। প্রথম সংখ্যায় কবিতার বড় বাহুল্য; কবিতা-লক্ষ্মী কেবল পদ্য-রচনায় তৃপ্ত হন নাই, গদ্য রচনার অধিকাংশেও তাঁহার প্রসাদচিহ্ন প্রকটিত দেখিতেছি! প্রবন্ধের মধ্যে "কাব্য",—একটি সমালোচনা; তাহাও ভাবুকের কবিত্বে উদ্বেল বলিয়া মনে হয়। আর একটি প্রবন্ধ "চা", তাহাও জাপানী ক্ষুদ্র পেয়ালার এক বিন্দু। কবিতার রাজ্য সঙ্কুচিত করিতে হইবে। সমালোচনা,দর্শন, নিবন্ধ,সবই যদি কাব্য-গন্ধে আমোদিত হয়, তাহা হইলে কাব্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইতে পারেন, কিন্তু রচনাবিশেষের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য না থাকিলে ত্রিস্রোতার 'বহতা' থাকিবে না। অনেকগুলি শিক্ষিত সুলেখককে ত্রিস্রোতার সেবায় প্রবৃত্ত দেখিতেছি; আশার বিষয় বলিয়াই এ কথা বলিলাম। তাঁহাদের শক্তি সুপ্রযুক্ত হইলে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির আশা করা যায়। জলপাইগুড়ির,—রাজসাহীর বিবিধ তথ্য, ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা চলুক। জেলায় প্রচলিত ভাষার সহিত প্রাচীন ও আধুনিক প্রাদেশিক ভাষার তুলনা করুন। গ্রামের, নগরের, নদীর, বিলের খালের নাম-তত্ত্বের অনুসন্ধান হউক। স্থানীয় পত্রকে কতক অংশে এ সব ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সহিত কাব্য কবিতার সংযোগ হউক, সোনায় সোহাগা হইবে। আর দুই এক সংখ্যা না দেখিয়া আমরা আর কিছু বলিব না।

স্বাস্থ্য। কার্ত্তিক। "উপবাস", "সুনিদ্রা", "মৎস্যাহার," "সর্দ্দি" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য, বিবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ। বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী, সহজ সরল ভাষায় লিখিত। কিন্তু "পাঠশালার ছেলেদের আহার" ও "স্ত্রীদিগের স্বাস্থ্য" প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য। ইহার এক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিলে যে উপকারের সম্ভাবনা,—সহস্র ভারতগানে তাহা সাধ্য হইবার নহে। কিন্তু এ দিকে প্রবৃত্তি কাহার? আমাদের দেশে বড়লোকের সংখ্যা হয় না, কিন্তু বড় মন বুঝি দেশ হইতে তিরোহিত হইল।



স্বর্গীয় ত্রৈলক্ষ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

KUNTALINE PRESS.

এ সঙ্গীত।

১

জীবনের এ সঙ্গীত—পবিত্র মহান্,
করিতেছে প্রতিজনে আকুল আহ্বান।
তবু নর অন্যমনে
তুচ্ছ সুখ দুঃখ গণে,
প্রাণপণে রুদ্ধ করি নিজ মনঃপ্রাণ।
ক্ষণতরে স্বার্থ ভুলি
হৃদি-শঙ্খ লহ তুলি,
শুন কি ওঙ্কার ধ্বনি—নাহি পরিত্রাণ!
কি ধীর গম্ভীর শব্দ
ধরণী ধূসর স্তব্ধ,
সুর নর থর থর, বিশ্ব কম্পমান।
মূর্চ্ছিত মলিন ভানু,
শ্লথ অণু পরমাণু;
বাজিছে পিনাকি-করে প্রলয়-বিষাণ!
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্।

২

জীবনের এ সঙ্গীত—পবিত্র ভীষণ,
ডাকিতেছে জনে জনে গর্জ্জি' অনুক্ষণ।
তবু নর—একি ভ্রান্তি,
ল'য়ে তুচ্ছ কড়া ক্রান্তি,
ল'য়ে পাপ ঈর্ষ্যা দ্বেষ সদা অচেতন।
ভ্রমে মত্ত দৈত্য সব,
কি ভীষণ জয়োৎসব!
দেব-নর-রক্তে বিশ্ব রক্তিম-বরণ।
কুলকুণ্ডলিনী মা গো!
উঠ উঠ, জাগো জাগো,
ধর ধর হৃদি-চক্র, রক্ষ ত্রিভুবন।
রণে নাচে কে রূপসী-
করে ছিন্ন মুণ্ড, অসি,

উলঙ্গিনী, মুক্তকেশী, পদে ত্রিলোচন!
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র ভীষণ।

৩

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর।
বেহাগে আলাপে কার বাঁশরী সুদূর!
আবেশে অবশ প্রাণ,
মুদে আসে দু' নয়ান,
ঘুমে আলুথালু ধরা সোহাগে বিধুর!
পাপিয়া ডাকিয়া সারা,
যমুনা আপনা-হারা,
কানন কুসুমে ভরা, পবন মেদুর।
জীবনের এ পয়ার
কিছুতে মিলে না আর,
দেখি দেখি দেখিনা সে মু'খানি বঁধুর!
আকুল ব্যাকুল আশা,
কি পিপাসা—নাই ভাষা,
হৃদয় ভ্রমিছে কোথা—কোন্ স্বর্গ দূর!
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর।

৪

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর।
প্রকৃতির অসম্বৃত বক্ষঃ নীলাম্বর।
সুমেরু চুচুক পাশে
সুকুমারী ঊষা হাসে,
বিসর্পী হোমাগ্নি-ধূমে মরুত কাতর।
নীবার তুষার দলি
ঋষিকন্যা যায় চলি,
চরে সরস্বতী-তটে কপিলা নধর।
আহরি' সমিধ-ভার
আসে শিষ্য সুকুমার,
যজ্ঞকুণ্ডে ঢালে হবিঃ ঋত্বিক ভাস্বর।
সোম-গন্ধে সামচ্ছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজলি অম্বর!
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ইহারা নানা কারণে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ ইউ-রোপীয়দিগের নিকট সুপরিচিত। ইহাদের কতিপয় লোক, স্বদেশে কর্ম্ম না থাকিলে, ভাগলপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, দিনাজপুর ও সুদূর আসাম প্রদেশে যাইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। কৃষ্ণ, বলিষ্ঠ ও প্রায় উলঙ্গ দেহ দেখিয়া ও নূতন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিয়া তাহাদের প্রতি সহজেই সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয়। অপিচ, পুলিসের উচ্চ কর্ম্মচারিগণের মুখে সাঁওতাল কনষ্টেবল-দিগের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী না হইলেও, ডাকাইতের অনুসরণ বা আক্রমণকার্য্যে তাহাদের সমতুল্য কেহ নাই। জঙ্গলের ধারে বাস করে বলিয়া ইহাদের শরীর ম্যালে-রিয়ার দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডের মারাত্মক আরণ্য প্রদেশে ইহারাই প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সাঁওতাল পল্লীর ত কথাই নাই, সাঁওতাল পল্লীতে যে সকল অভিনব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না। গৃহগুলির উচ্চ ভিত্তি, চালের অতি পরিপাটী ছাউনি, ও প্রশস্ত গৃহ ও বারান্দাগুলি অতি সুন্দর এবং আরামজনক। মেটে দেওয়াল রুচি-অনুসারে লাল, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে বিভিন্নরূপে চিত্রিত। গ্রামে কুত্রাপি ময়লা বা আবর্জ্জনা নাই; গরু, শূকর, মহিষ বা মুরগী দ্বারা ময়লা সঞ্চিত হইবামাত্রই তাহা ঝাঁটাইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। প্রত্যেক বাটীর সংলগ্ন জমীতে তামাক, সর্ষপ, কপি, লঙ্কা প্রভৃতি সতেজ শস্য সকল নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করে। প্রৌঢ়া ও যুবতীরা লাল পেড়ে ৬ গজি মোটা শাড়ী পরিধান করিয়া অনাবৃতকেশে সুন্দর সুন্দর ফুল, মনো-হর পাখীর পালক ও বিচিত্র পাতা গুঁজিয়া সানন্দচিত্তে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত। কোন বিদেশীয় লোক পল্লীভ্রমণে বহির্গত হইলে বালক বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই অনিমেষলোচনে আগন্তুকের অভিনব পরিচ্ছদ ও মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে। কোথাও কর্ম্মস্থল বা মাঠ হইতে প্রত্যাগতা যুবতীর দল শ্রেণীক্রমে পরস্পর হাতধরাধরি ও পরিধেয় বস্ত্র যথেচ্ছ বিন্যস্ত করিয়া, অনাবৃত বা অর্দ্ধাবৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তালে তালে নাচাইয়া মৃদু মধুর গীত গাহিতে গাহিতে পথে চলিয়া যায়। কোন স্থলে বালিকার দল খেলাচ্ছলে যুবতী বা প্রৌঢ়াগণের ঝুমুর নাচের অনুকরণ করিতেছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত সমভাবে চলিতেছে; খ্রীষ্টিয়ান ও মহারাষ্ট্র দেশ ভিন্ন এরূপ প্রথা আর কোথাও নাই। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও মহারাষ্ট্র দেশেও এত

দূর স্ত্রীস্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত মাঠে শস্যারোপণ বা শস্য-কর্ত্তন করিতেছে, বড় বড় বোঝা লইয়া গৃহে বা বাজারে যাইতেছে, ভোজের নিমন্ত্রণে স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে দলে দলে রাস্তা চলিতেছে। যুবতী একাকিনী কোন উৎসব দেখিতে গিয়া রাত্রিকালে কোন যুবকের সহিত আপনার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে কেহ কোনরূপ আপত্তি করে না। আবার নৃত্যের সময় স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া এক সঙ্গে নৃত্য, বাদ্য ও অশ্লীল গানে রত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যুবক যুবতী দুই জন একত্র হইয়া নিভৃত পথে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতেছে। পর্ব্ব-সময়ের ত কথাই নাই, তখন স্ত্রী পুরুষের স্বেচ্ছাচার অদম্য বেগে চলিতে থাকে। পাহাড়ীয়াদিগেরও ঐরূপ রীতি আছে বটে, কিন্তু তাহারা দুর্গম পাহাড়ে থাকে বলিয়া সর্ব্বদা তাহা লোকের নেত্রগোচর হয় না। বিশেষতঃ,তাহারা বিদেশীদের সঙ্গে সহসা মিশিতে চায় না; এ জন্য তাহাদের কার্য্যকলাপ লোকে অল্পই দেখিতে পায়। সাঁওতাল-রমণীদিগের চরিত্র প্রশংসাযোগ্য না হইলেও উহাদিগকে লজ্জাহীনা বলা ঠিক নহে; কারণ, মদোন্মত্তা-না হইলে ইহারা রমণী-সুলভ নম্রতা কখনও পরিত্যাগ করে না। তবে, ইহারা লজ্জা কাহাকে বলে, তাহা ভালরূপ জানে না। ইহারা সতীত্বের মর্য্যাদা এখনও শেখে নাই। কুমারীরা যৌবনে পদার্পণ করিয়াও দীর্ঘকাল অবিবাহিতা থাকে বলিয়া অনেক সভ্যতাভিমানী উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ইহাদের ক্ষণিক বা স্থায়ী সাহায্যে চিরকুমার-ব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। স্বধু সাঁওতাল কেন, সাঁওতাল পরগণার অধিকাংশ স্ত্রীলোকের চরিত্র যেরূপ নিন্দনীয়, পৃথিবীতে আর কোথায়ও সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। পিতা মাতা বা ভ্রাতা কন্যা বা ভগ্নীগণকে অসৎপথে চলিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেয় ও সাহায্য করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতীয়ের মধ্যে কুৎসিত ব্যাধি যত অধিক, এত অন্য কোথাও নাই। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডায়েরী দেখিলে এ বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। আবার বিধবাবিবাহ প্রচলিত। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈদ্য, কায়স্থ এবং আরও ২।১টী উচ্চ শ্রেণী ব্যতীত সকল বর্ণের মধ্যেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত। গোয়ালা, কুম্ভকার, নাপিত, ধানুক, কাহার, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি সৎশূদ্রজাতীয়েরা প্রাণান্তেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন আহার করে না; কিন্তু তাহারা অনায়াসে স্বজাতীয়া বিধবা বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে। বিধবার গর্ভজাত পুত্র

পিতার উত্তরাধিকারী হইতেছে; কেহই তাহাকে ঘৃণা করে না। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, নাপিত, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতীয় অনেক পরিবারে দম্পতীর মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী ৮।১০ বৎসরের বড়। ১৪।১৫ বর্ষীয়া মধ্যজাতীয়া হিন্দু যুবতীর সহিত ৮।৯ বর্ষীয় বালকের বিবাহ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায়শঃ মধ্যবর্ত্তী হিন্দুঘরের এই প্রকার কুলবধূগণ নিশীথে দূরতর সঙ্কেতস্থলে উপস্থিত হইয়া, বিভিন্নজাতীয় ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কুচরিত্র যুবকগণের সহিত মদ্যমাংসাহারে বিভোর হইয়া হাস্য কৌতুকে রজনী যাপন করিয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর হিন্দু পরিবারে যখন এইরূপ প্রথা প্রচলিত, তখন নীচজাতীয়ের মধ্যে কত দূর বীভৎস কাণ্ড চলিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সাঁওতাল যুবতী স্বামী কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে সময়ে সময়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে। এইরূপ বিবাহে যুবতীর পিতাও কিছু পণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

সুবা সাজাহানাবাদ।

[আরেশ্-ই-মাহ্ফিল্ অবলম্বনে লিখিত।]

হিন্দী ও পারসীক গ্রন্থকারদিগের মতে, গঙ্গাতীরস্থ হস্তিনাপুর ভারতীয় প্রাচীন রাজগণের রাজধানী ছিল। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সময়ে ইহার সমৃদ্ধির ও সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না। এই উভয় দলে বিবাদ উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা পশ্চিম মুখে গমন করিয়া, যমুনাতীরস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। বহুকাল এই নগর পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ, কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর সংগ্রামে কৌরবেরা বিনষ্ট হইলে পাণ্ডবেরা পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করেন। হস্তিনার অধিকাংশ গঙ্গাস্রোতে বিলীন হইলে পাণ্ডবেরা কৌশাম্বী নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। শেষ পাণ্ডব রাজার নাম ক্ষেমক। ইহার অনেক পরে রাজা অটক পাল প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে নিজের নামে একটি নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কুতবউদ্দিন আইবক ও সামস্উদ্দিন আলতমাস্ এই নগরে বাস করেন। সুলতান গিয়াস্উদ্দিন্ বুলবন্ ৬৬৬ হিজিরাতে ইহার

নিকটে মার্ঝান নামে দুর্গ নির্ম্মিত করেন। মীর্জাউদ্দিন কৈকোবাদ ৬৮৬ হিজিরায় যমুনাতীরে কৈলুগড় নামক একটি স্বতন্ত্র নগর নির্ম্মাণ করেন। আমির খস্রু কৈলুগড়ের সৌন্দর্য্যের সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জেলাল্ উদ্দিন খিল্জি কুস্কী লাল-নগর ও আলাউদ্দিন খিল্জি কুস্কী সব্জ-নগর নির্ম্মাণ করেন। গিয়াস্উদ্দিন তোগলক ৭২৫ হিজিরায় তোগলকাবাদ নগর নির্ম্মাণ করেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন, দিল্লীর অশান্ত হিন্দু অধিবাসীদিগের নিকট হইতে কিছু অন্তরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তোগলকাবাদ নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র মহম্মদ মইজ্ উদ্দিন জোয়ান্, সহস্র-স্তম্ভ-শোভিত সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও লাল পাথরের বহুসংখ্যক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ফিরোজ শাহ ৭৫৫ হিজিরায় বহুসংখ্যক-হর্ম্ম্যশোভিত প্রকাণ্ড ফিরোজাবাদ নগর নির্ম্মাণ করেন। ফিরোজ শাহ, যমুনা হইতে খাল আনিয়া নবনির্ম্মিত নগরের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত করেন। এই নগরের তিন ক্রোশ অন্তরে ফিরোজ শাহ একটি উচ্চচূড় মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। সাধারণ লোকে তাহাকে ফিরোজ শাহের স্তম্ভ বলিয়া থাকে। মোবারক শাহ মোবারকাবাদ নগর নির্ম্মাণ করেন। হুমায়ুন বাদশাহ ৯৩৮ হিজিরায় প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণসংস্কার করিয়া তাহার নাম দীন পান্না অর্থাৎ বিশ্বাস-নিলয় রাখেন। এই স্থানে হুমায়ুনের রাজধানী ছিল। পাঠান শের শাহ কুস্কী সব্জ ধ্বংস করিয়া স্বনামে একটি নগর স্থাপিত করেন। শের শাহের পুত্র, সলিম শাহ নিজ নামে সলিমগড় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহা এখন সাজাহানাবাদের ভিতরে পড়িয়াছে। এই দুর্গ অর্কগড়ের সম্মুখে যমুনাতীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদিও পৃথক্ পৃথক্ নরপতি নিজ নামে পৃথক্ পৃথক্ নগর নির্ম্মিত করিয়া রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, তথাপি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই সমুদায় নগরের সমষ্টি দিল্লী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১০৪৫ হিজিরায় স্বরাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে সাহজাহান সাহেবি কিরাণ দিল্লীর নিকটে সাজাহানাবাদ নগর নির্ম্মাণ করেন। যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নামহীন ও রূপশূন্য হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত সমুদায় নগর সাজাহানাবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার লাল পাথরের দুর্গ অতি দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য। ইহার উদ্যানের ন্যায় সুন্দর উদ্যান পৃথিবীতে নাই। ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিশ্বকর্ম্মাও স্বর্গোদ্যাননির্ম্মাণ হইতে বিরক্ত হইয়াছেন।

মোবারকাবাদের চারি দিকে একটি বিস্তৃত গভীর জলপূর্ণ পরিখা আছে। ইহার জল এত নির্ম্মল যে, ইহার তলায় একটি মটর পড়িলেও অন্ধকার রাত্রিতে তাহা দেখা যায়। যে কোন অন্ধ ব্যক্তি ডুব দিয়া তাহা উঠাইতে পারে। যমুনা ইহার সৌন্দর্য্যদর্শনে উৎসুক হইয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরিয়া ইহার নিকটে আসিয়াছে। নবাব আলিমর্দ্দান খাঁ সিরমুরের পাহাড়ের নিকট যমুনা হইতে একটি খাল কাটিয়া আনিয়া নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করায় নগরের সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য দ্বিগুণিত হইয়াছে। এই খালের তীরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। সুশীতল নির্ম্মল জল পান করিয়া ধনী ও দরিদ্র তৃপ্তিলাভ করিতেছে। আলিমর্দ্দান এক জন বিহস্তী * অর্থাৎ স্বর্গবাসী হইয়াছেন।

সাজাহানাবাদ, দুর্ভেদ্য প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। নগরের ভিতরে ও উপনগরসমূহে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও বড় বড় নগর অপেক্ষা বৃহৎ। নগরের সমুদায় পথ লোকপরিপূর্ণ। নগরের বাজারগুলি অতি সুন্দর। এই সকলের মধ্যে চাঁদনি চক যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি সুন্দর। পৃথিবীর সমুদায় দোকান একত্র করিলেও ইহার এক একটির সমান হয় না। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের সমুদায় কাপড়ের দোকান একত্র করিলেও চাঁদনি চকের একটি কাপড়ের দোকানের সমান হয় না। ইরাণের সমুদায় ব্যাঙ্ক অপেক্ষা চাঁদনি চকের কোন একটি ব্যাঙ্ক বৃহৎ।

সাজাহানাবাদের পশুবিক্রয়ের স্থানটি অতি প্রকাণ্ড। প্রত্যহ নানাজাতীয় পশু বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। নানাজাতীয় অশ্ব প্রত্যহ এত অধিকপরিমাণে বিক্রীত হয় যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঘোড়ার দালালেরা অত্যন্ত ধনী। নগরে যোগী, সন্ন্যাসী, ফকির ও ঐন্দ্রজালিকের সংখ্যা নাই। নগর ও উপনগরে মস্‌জিদ্ ও বিদ্যালয়ের গণনা করা যায় না।

সাজাহানের রাজত্বের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে ১০৬০ হিজিরায় লাল পাথরের

---

* জলদান মহা পুণ্যকার্য্য। জলদাতা বেহস্তে অর্থাৎ স্বর্গে গমন করে। যাহারা বেহস্তে গমন করে, তাহাদিগকে বিহস্তী বলা যায়। পূর্ব্বকালে যাঁহারা বিনামূল্যে জল দান করিতেন, তাঁহাদিগকে বিহস্তী বলা হইত। এই বিহস্তী শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ভিস্তী শব্দ আসিয়াছে।

জামি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার চূড়া গগনস্পর্শ করিয়াছে। ইহার চতুস্পার্শ্বে আমীরগণের ও পূর্ব্বতন নরপতিগণের এত সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে যে, দেখিলে এই স্থানকে মৃতদিগের একটি নগরী বলিয়া বোধ হয়। সেই সকল সমাধি-মন্দিরের মধ্যে কৈলদুর্গস্থ হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির অতি সুন্দর।

নারনল।—এই নগর দিল্লী হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। নগরের অধিকাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত। নগরের নিকটে হেনা-গাছের প্রকাণ্ড ক্ষেত্র আছে। ইহার পাতা দিয়া এখানকার লোকে হাত পা রঞ্জিত করিয়া থাকে। এখানে শিকারের জন্য অনেক পাখী পাওয়া যায়। কখন কখন এক পয়সায় চারিটি পাখী মিলে। সুস্বাদ ও সুগন্ধ ফল ফুলের অভাব নাই। এখানকার শেখ ও সৈয়দেরা অত্যন্ত জ্ঞানী। মহম্মদ শাহের সময় পর্য্যন্ত ইহাদের এত দূর প্রভুত্ব ছিল যে, রম্‌জানের সময় কেহ দিবসে খাদ্যপাক ও তামাক সেবন করিতে পারিত না। তাহা করিলে পুলিশ কর্ত্তৃক অত্যন্ত অপমানিত হইতে হইত। নগরের ভিতরে বাহিরে অনেক মস্‌জিদ্ ছিল। নগরের বাহিরে সাধু সৈয়দ্ মহম্মদ তুর্কের সমাধি-মন্দির আছে। প্রায় সহস্র বৎসর হইল, এই ব্যক্তি এক কাফেরের হস্তে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। সাধুর সম্মানার্থ, প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। নগরের চতুস্পার্শ্বে কোন হিন্দু তাহাদের দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে পায় না। আহম্মদ শাহের রাজত্বকাল হইতে শেখ ও সৈয়দ্‌দিগের সম্মান ও জীবিকার লাঘব হইয়াছে। যাঁহার যে দিকে সুবিধা, তিনি সে দিকে চলিয়া গিয়াছেন। এখন এই নগর প্রায় লোক-শূন্য হইয়াছে।

পাণিপথ।—এই নগর দিল্লী হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পাণিপথ অতি প্রাচীন নগর। শেখ বুয়ালি কলন্দর এখানে জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি দিল্লীতে গমন করিয়া খাজা কুতুব্-উদ্দিনের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার পর কুড়ি বৎসর তাঁহার পার্থিব জ্ঞানোপার্জ্জনে অতিবাহিত হয়। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে স্বর্গীয় বিমল জ্ঞান সমুদিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে তিনি আপনার সমুদায় পুস্তক যমুনাজলে বিসর্জ্জন করিয়া পরিব্রাজকত্ব অবলম্বন করেন। তিনি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিয়া তথাকার মৌলবীগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হন। অতঃপর তিনি নিজের দেশে

আগমন করিয়া আমরণ তথায় বাস করেন। তাঁহার সমাধিস্থান সকলের নিকট তীর্থের ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে।

সরহিন্দ।—একটি প্রাচীন নগর। ফিরোজ শাহের সময় হইতে এই নগরের ক্রমাগত উন্নতি হইয়া আসিয়াছে।

ভবনঘাট।—সরহিন্দ হইতে বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখানে মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির আছে। আমির ফেদাই খাঁ কোকা আলমগিরের রাজত্বের চতুর্থবর্ষে এই নগরে আসিয়া নগরের নাম বিজনৌর রাখেন। তিনি এখানে একটি সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। এই উদ্যানে অপর্য্যাপ্ত গোলাপ ফুল জন্মিত। খোলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি একদা বসন্তকালে এই উদ্যান হইতে চল্লিশ মণ গোলাপপুষ্প, আতর ও গোলাপজল প্রস্তুত করিবার জন্য গৃহীত হইতে দেখিয়াছেন।

থানেশ্বর।—সরহিন্দের তিন ক্রোশ দক্ষিণ। থানেশ্বরের নিকট প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র। হিন্দুদের বিশ্বাস, ইহা পৃথিবীর মধ্যস্থান। এখানকার জলাশয়ে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়। সূর্য্যগ্রহণের সময় এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। কুরুক্ষেত্র হ্রদের চতুষ্পার্শ্বস্থ চল্লিশ ক্রোশ স্থান, বিশেষতঃ সরস্বতীতীর, অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

সম্ভল।—দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে এই প্রাচীন নগর অবস্থিত। এখানকার হরিমন্দির অতি বিখ্যাত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, এখানে ভগবানের শেষ অবতার কল্কীর জন্ম হইবে।

নানকমাতা।—সম্ভলের নিকট নানকমাতা। এখানে বাবা নানকের মতাবলম্বিগণ তীর্থযাত্রায় আগমন করেন।

কমায়ুন—নানকমাতার নিকট কমায়ুনের পাহাড়। এই পাহাড় নানাবিধ ধাতুর আকরে পরিপূর্ণ। এখানকার জমিদারেরা রাজকর প্রদান করে না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"আমি মৃত নবাব আসফ্ উদ্দৌলার সঙ্গে ছিলাম। আসফ্ উদ্দৌলার এক জন লোকও কমায়ুনে প্রবেশের সাহস পায় নাই।" এই দেশের প্রধান নদী গঙ্গা ও যমুনা। পর্য্যটকেরা বলেন, যমুনা চীন দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। যমুনা, দিল্লী, মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন, আগ্রা, ইটোয়া ও কাল্পী দিয়া আকবরপুরের নিকট আসিয়াছে। এই নগরে রাজা বীরবলের জন্ম হয়। ইহার পর যমুনা, চম্বল, বেতোয়া ও দশানকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদের নিকট গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুদের বিশ্বাস, গঙ্গা স্বর্গ হইতে প্রথমতঃ কৈলাস পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে। অনন্তর চীন দেশের পার্শ্ব দিয়া হৈমবত প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুদের বিশ্বাস, হিমাচলে গঙ্গার বরফজলে দেহত্যাগ করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়। পাণ্ডবেরা এই বিশ্বাসে হিমাচলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গঙ্গা বদরীনাথ দিয়া শ্রীনগরের পার্শ্ব হইয়া হৃষীকেশ উত্তরণ পূর্ব্বক হরিদ্বারের নিকট সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়।

গঙ্গার জল অতি পবিত্র। অন্যান্য নদীর জল অপেক্ষা গঙ্গার জল লঘু। ইহার রোগনাশ করিবার শক্তি অসাধারণ। ইহার জল পরিপাকশক্তির সহায়তা করে। ইহাতে শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়।

গঙ্গা নানা নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া এলাহাবাদে যমুনাকে গ্রহণ করিয়াছে। ৭২টি নদী দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ হইতে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, মীরদাদপুর ও হিজরাটি দিয়া ঢাকার নিকট আসিয়াছে। অনন্তর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভাগের নাম পদ্মাবতী ও পশ্চিম ভাগের নাম ভাগীরথী। পশ্চিম ভাগ সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা নামে বিভক্ত হইয়া চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই তিন শাখা হইতে সহস্র সহস্র শাখা নির্গত হইয়াছে। গ্রন্থকার আবার বলিয়াছেন, বাস্তবিক গঙ্গা রাজমহল অতিক্রম করিয়া কাজীহাটীর নিকট দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভাগের নাম পদ্মা ও পশ্চিম ভাগের নাম ভাগীরথী। বাস্তবিক পদ্মাই প্রাচীন গঙ্গা। ইহা চাটিগাঁর নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। এখন পদ্মা ঢাকা হইতে তিন ক্রোশ দূরে আছে, কিন্তু কোন সময়ে ঢাকার নিকটেই প্রবাহিত হইত। ঢাকার নিকট গঙ্গার পরিত্যক্ত অংশের নাম বুড়ীগঙ্গা। গঙ্গার তীরে বিস্তর চোর, দস্যু ও দুষ্ট লোকের বাস। খোলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখ-কার কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন, গঙ্গার জল দেহ হইতে যে পাপরাশি দূরীভূত করে, সেই সকল পাপ মূর্ত্তিধারণ করিয়া লোকের মুক্তিপথে বাধা জন্মায়।

চাটগাঁ অঞ্চল নোয়াখালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধরিয়া লইলে, আরেশ্-ই-ম্‌হাফিলের গঙ্গা-প্রবাহ-বর্ণনা যথার্থ হয়। সাজাহানাবাদের বর্ণনায় যে অত্যুক্তি আছে, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

একখানি ফরাসী উপন্যাস।

গত বৈশাখের রৌদ্রসিক্ত প্রভাত আমার পক্ষে সুপ্রভাত হইয়া উদিত হইয়াছিল। সেই দিন এই জনসমাকীর্ণ ধূলিপরিপূর্ণ কলিকাতা মহানগরীর একটি বাড়ীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া এক জন বিজ্ঞ সমালোচকের সহিত দেশীয়সাহিত্যালোচনার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই মধুর বৈশাখী প্রভাত সাহিত্যচর্চ্চার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। ঘরের ছায়াকে অবাধ প্রচুর আকাশের আলো আসিয়া যেন ভাসাইয়া ধুইয়া মগ্ন করিয়া দিতেছিল; সম্মুখে ইংরাজী বাঙ্গলা বিস্তর কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত ছিল, এবং সেই শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যরথী একখানি মরক্কোচর্ম্মপরিবৃত হাফেজ হইতে সেই সময়কার সমালোচনার অনুকূলে মধুর শ্লোকোদ্ধার করিয়া শুনাইতেছিলেন। সেই দিনের প্রহরব্যাপী সাহিত্যসমালোচনার ফলে অনেক নূতন কথা শিখিয়াছিলাম। গৃহে যে রকমটি প্রবেশ করিয়াছিলাম, কতকটা যেন নূতন হইয়া বাহিরে আসিলাম—সেই জন্য এবং সেই শ্রদ্ধাস্পদ সমালোচকের সহিত পরিচয়ে গৌরবাভিমানী আমি যথার্থই মনে করিয়াছিলাম, সেদিনকার প্রভাত সুপ্রভাত।

কথা হইতেছিল, আজকালকার বাঙ্গলা কবিতার উন্নতি অবনতি লইয়া। অনেক কথার পর রবীন্দ্র বাবুর "উর্ব্বশী" কবিতার উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 'উর্ব্বশীতে' একটি বড় সুন্দর কথা ব্যক্ত হইয়াছে—সেটি কবির আকুল সৌন্দর্য্যপিপাসা। যাহা কিছু শোভন, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু সমতানময়, ইহার সকলের মধ্যেই এমন এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যসূত্র গোপনে নিহিত আছে, যাহা সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচর, কিন্তু তাহা কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে বঞ্চনা করিতে পারে না। ইহা বিশ্বসৌন্দর্য্য। কিন্তু নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য বুঝি তরুণী রূপসীর কল্যাণী মূর্ত্তিতেই সম্যক পরি-পুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়াছে। নারীর গঠনে যে কমনীয়তা, কৃষ্ণ কেশদামে যে রমণীয়তা, কটাক্ষে যে বিদ্যুৎ, কপোলে যে অরুণিমা, বর্ণে যে লালিত্য, লঘু গমনে যে মাধুরী, বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গীতে যে মৃদু হিল্লোল আছে, তাহার সকলগুলিই যেন প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ স্থলে পরি-

পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য চুনিয়া চুনিয়া যেন নারী-প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমগ্র প্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য্য মৌন ও মূক, রমণীর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সর্ব্ব অবয়বে তাহা যেন চঞ্চল মুখর হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির পূর্ণ সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হইলে স্বতঃই নারীর পূত সৌন্দর্য্যে মনঃপ্রাণ নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই সংজ্ঞাবিহীন অনন্ত সৌন্দর্য্যকে কবি সুইনবর্ণ্ Eternal sex সংজ্ঞা দিয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক থিওফিলি গতিয়ে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে তাঁহার এই সৌন্দর্য্যপ্রাণতার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সে অমর গ্রন্থের নাম—মাদ্‌মোজ্‌ল দি মোপ্যাঁ।

গ্রন্থখানির প্রকৃত সমালোচনা করিতে গেলে অনেক গোলে পড়িতে হইবে। তাই কয়েকটিমাত্র কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই গ্রন্থ একখানি উচ্চদরের উপন্যাস, কিন্তু প্রকৃত উপন্যাসের উপাদান ইহাতে অল্পই আছে। মানব-প্রকৃতির ছবি বা কোন সমাজচিত্রের সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ নাই। মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমগ্র গ্রন্থখানি গদ্যে লিখিত একখানি উপাদেয় কাব্য, এবং গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের উন্নত আদর্শের উদ্দেশে প্রীতিপূর্ণ উদার স্তোত্র ধ্বনিত হইয়াছে। সে আদর্শ—শুধু সৌন্দর্য্য। গ্রন্থের আখ্যানবস্তু অতি সামান্য, এমন কি অংশবিশেষে তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কেবল এই কারণে গ্রন্থের নিন্দা করিলে পুস্তকের উচ্চ আদর্শের প্রতি যথেষ্ট অবিচার ও অনাদর প্রকাশ করা হইবে। প্রথমেই গল্পের নায়কের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। কবির যত কিছু অনুরাগ বিরাগ ও পাগ্‌লামী লইয়া তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাহার একটা বাতিক, এবং অসুন্দরমাত্রই তাহার চক্ষুঃশূল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে তাহার তরুণ হৃদয়ের উদ্দাম কল্পনা, অপার আকাঙ্ক্ষা ও অগাধ অতৃপ্তি দিয়া যে এক মানসপ্রতিমার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এ জগতে কোন না কোন মঙ্গলমুহূর্ত্তে তাহার সহিত যেন বিনা ভূমিকায় বিনা পরিচয়পত্রে অন্তরঙ্গভাবে মিলন ঘটিবে, এবং তীব্র আগ্রহসহকারে সে যেন তাহারই অন্বেষণে ব্রতী রহিয়াছে।

কবি কালিদাস মণ্ডনবিরহিতা বল্কলপরিহিতা বনবাসিনী শকুন্তলার মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয়তার অনুভব করিয়া তাঁহাকে "ইয়মধিকমনোজ্ঞা" বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু গতিয়ের চক্ষে যে সুন্দর, বিচিত্রোপকরণ প্রসাধন বিলাস ও মণ্ডনবাহুল্য তাহার পক্ষে একান্ত

অবশ্যম্ভব। সুন্দর বস্তু কেন জন্মিয়াছিল যদি সৌন্দর্য্যের পাদমূলে লুটাইয়া না পড়িবে? প্রসাধনবর্জ্জিত যৌবনলাবণ্য যেন নিরতিশয় ম্লান;—উজ্জ্বল হীরকখণ্ডকে সোনার উপর 'সেট্' না করিয়া কি থাকা যায়? রমণীয় বেষ্টন ব্যতিরেকে গতিয়ে সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতে পারিতেন না। কামিনীর সহিত কাঞ্চন তাঁহার চক্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল। সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, এতদুভয়ের মধ্যে যেন একটা আন্তরিক সামঞ্জস্য আছে—যে অতুল সৌন্দর্য্য সম্পদের অধিকারী, সে কেন অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয় নাই? গতিয়ের মানসচক্ষে কোমল নগ্ন পদপল্লব একজোড়া সৌখীন পাদুকা ও সেই পাদুকার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান কার্পেট ও জুড়ী গাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; যেন এ সমস্তই সৌন্দর্য্যের অনিবার্য্য অলঙ্কার। সংসারে যত কিছু দুঃখের দৃশ্য আছে, যদি দেববাঞ্ছিত একখানি সুন্দর মুখ দরিদ্র ও কুটীরবাসিনী হয়, তবে সে দুঃখই বুঝি দুঃখের চরম। কিন্তু যাহার রূপ নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, তাহার যেন ভালবাসিবার কোন অধিকার নাই। যাহার রূপ নাই, সে কি করিয়া ভালবাসিবে, কি দিয়া বাঞ্ছিতের পূজা করিবে? রবীন্দ্র বাবুর কৃপায় অধুনা কাঁদিবার এবং কাঁদিয়া মনের বোঝা নামাইবার যে একটা সার্ব্বজনীন অধিকার ছিল, বাঙ্গালী তাহা হইতে ক্রমশঃই বঞ্চিত হইতেছে। কেন না,

"যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারই আঁখি-জল সাজে গো।"

কবি বড়ই দুঃসাহসিক, তাই আমাদের দেশে নারীজাতির প্রতি এরূপ নির্ব্বিচার পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে ফরাসী গতিয়ের উদয় হইলেই মণিকাঞ্চন যোগ হইত।

কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছিলাম। গ্রন্থের নায়ক এইরূপে তাহার মানসপ্রতিমাকে অজস্র সৌন্দর্য্যসম্পদ বিলাসের মধ্যে কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া রাখিয়াছিল; এবং দেখা যায়, যেমন সুনিপুণ অভিনেতার অভিনয়ে এক একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ উদ্দামগতিতে বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আমাদের নায়কের মত্ত কল্পনা তেমনি সেই মানসপ্রতিমার আশে পাশে সর্ব্ব অবয়বে বিজড়িত ক্ষুব্ধ প্রহত ও সৌন্দর্য্যরসে বিপুলভাবে পরিপুষ্ট হইয়া পরিপূর্ণ বেগ সঞ্চয় করিয়াছিল, এবং সে এমনতর এক সৌন্দর্য্যস্বপ্নে মোহিত হইয়াছিল, যাহা ঘন সুনিবিড়, অথচ

পেলব, কাল্পনিক অথচ বাস্তবিক, কুসুমসুকুমার অথচ শক্তিসামর্থ্যে সমুজ্জ্বল। এক কথায়, এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য আছে, সে চাহিত,—তাহার মানসপ্রতিমায় সেগুলি অসঙ্কোচে প্রস্ফুটিত থাকিবে। তাহার মনে অনেক সময় এমন সকল ভাবের উদয় হয়, যাহা সে নামরূপে নির্দ্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারে না ; যাহা কথার অতীত ; যাহা অহেতুকী ; কিন্তু তবু যেন একটা অবুঝ ভালবাসা,একটা কাছে পাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত বিশাল ব্যাকুলতা, একটা আন্তরিক ক্রন্দন তাহার অন্তরে নিরন্তর ধ্বনিত হইত। তন্ত্রী বিনা যন্ত্রের জীবন যেমন ব্যর্থ, ভালবাসা ও ভালবাসিবার বস্তু বিহনে এলবার্টের জীবন সেইরূপ অর্থশূন্য বোধ হইত। যাহা কিছু সুন্দর,তাহা এলবার্ট তন্ন তন্ন করিয়া দেখিত ; কিন্তু কিছুতেই তাহার তৃপ্তি ছিল না। হয় ত কখন কোন নবোদ্ভিন্নযৌবনশ্রী মোহিনী সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার চখের পিপাসা মিটিত,কিন্তু একটা সুতীক্ষ্ণ তীব্র সৌন্দর্য্য ত্বক্‌ভেদ করিয়া অন্তরে গিয়া লাগিত না। তেমন সুন্দর কেহই বা কিছুই চখে পড়ে নাই, যাহাকে দেখিবামাত্র সমস্ত হৃদয় মন হাসিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া নিরতিশয় উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, "এই সেই !" চক্ষু হয় ত ক্ষণতরে তৃপ্ত হইত, কিন্তু হৃদয়ের অতি গোপনপুরে ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়া বিরলে ঝুরিয়া মরিত।

এলবার্ট সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল উন্মত্ত হইয়া উঠিত। সে তাহা উপভোগের জন্য এমন একটা তীব্র বেদনার অনুভব করিত যে, কিছুতেই মনের মত করিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিত না। রমণীর চিত্র দেখিলে তাহার সাধ হইত—যেন স্পর্শ করে, যেন আপনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চিত্রনিহিত বিচিত্র ভঙ্গী, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র আভা, বিচিত্র ছায়ালোকসম্পাতের ভিতর তাহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটাকে একবারে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে ; যেন অসংখ্য বর্ণবৈচিত্র্যের ভিতর কৌশলে প্রচ্ছন্ন অথচ সম্যক পরিস্ফুট ভাবটির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অপরূপ চিত্রহিল্লোলকে সঙ্গীতের সুরে বসাইতে ইচ্ছা করিত, তুলিকামুখে আঁকিতে চাহিত, প্রস্তরপটের উপর চিরদিনের মত বাঁধিয়া রাখিতে চাহিত, তাহাকে কাব্যকলায় বিকশিত করিতে চাহিত ; কিন্তু সৌন্দর্য্য সূর্য্যকিরণের মত স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, তাই সাধকের হৃদয় প্লাবিত করিয়া নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িত। এলবার্টের উদ্দাম বাসনার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইত না, এবং তাহার

মর্ম্মস্থল হইতে একটা নিরাশার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

রাফেল অথবা মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র দেখিয়া তাহার এক অভাবিতপূর্ব্ব চিত্রবেদনার উদয় হইত। তাহার সাধনার ধন বুঝি ইহা অপেক্ষাও মোহময়, ইহা অপেক্ষাও সুঠাম সুন্দর মাধুর্য্যময়, ইহা অপেক্ষাও স্বাধীন ও সম্পূর্ণ। সে সেই অমর চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সানুনয়ে প্রার্থনা করিত, যদি চিত্রকরগণ তাহার অন্তরকুহরশায়িনী মূক প্রতিমাকে নিশ্বাস ও ভাষা দিয়া মোহমন্ত্রবলে সঞ্জীবিত করিতে পারে, এবং সেই অসম্ভবকে অধিকতর আজ্‌গবি করিয়া তুলিবার জন্য নিজের সমস্ত মমতা বেদনা আকাঙ্ক্ষা আবেগ সংশয় সন্দেহ ও সমস্ত চিন্তা কল্পনার সেচন করিয়া নিজের চক্ষে তাহার মানসীকে একান্ত নিখুঁত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। বিধাতার উপর এই বলিয়া তার অভিমান হইত যে, অদূরদর্শী নশ্বর মানবের তুচ্ছ তুলিকায় যে চিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, দেবতার বিচারে সে অমর লাবণ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার যোগ্য নহে? সে একাধারে তারকার হাসি, কুসুমের সুরভি, বসন্তের বর্ণ, পাষাণপ্রতিমার গঠনগৌরব এবং কাব্যের ছন্দ ও ধ্বনি সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বোপরি নিজের প্রচুর হৃদয়াবেগ ঢালিয়া কল্পলোকে সে সুষমাকে অপূর্ব্ব মোহ আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; তাই পদার্থবিশেষদর্শনে তার মন উঠিত না।

এলবার্টের এই অনন্ত অজ্ঞাত তীর্থযাত্রার পথে কেবল একটা সীমাহীন আশা ও একটা জন্মান্তরীণ ঘনীভূত স্মৃতি ব্যতিরিক্ত আর কোনও পাথেয় ছিল না। সমুদ্রের গর্জ্জন যেমন কেবল সমুদ্রতীরেই শোনা যায়, কিন্তু জলচরগণ বেশ নিঃশব্দে নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনযাপন করে, এলবার্টের হৃদয়বেলায় দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় তেম্‌নি বাসনার কোলাহলে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল, কিন্তু তাহার কাতর হৃদয় নিঃশব্দে নিভৃতে সমাহিত হইয়া সুগভীর বিশ্বাসে মিলনবাসরের শুভ অবসরের অন্বেষণ করিতেছিল। সে নিজের কল্পনায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বীয় ইন্দ্রিয়নিচয়কে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিত না। তাহার মনে হইত,হয় ত তাহার সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তম তাহারই দ্বারে আসিয়া মনোবেদনায় ফিরিয়া গিয়াছে, সে ফিরিয়া চাহে নাই, এবং তাহার কনককিঙ্কিণীর করুণ নিক্কণ—হৃদয়ের উদ্বেলিত ঝটিকা তাহা শুনিতে দেয় নাই।

এমনি এক দিনে এলবার্টের কোন পরিচিত বান্ধবীর গৃহে দূরদেশ হইতে কোন বন্ধুর আবির্ভাব হয়। এলবার্ট যেন তাহাকে আজন্ম দেখিয়া আসিতেছে, চিনি চিনি,তবু চিনিতে পারিতেছিল না, তবু আবার যেন মনে হইতেছিল—এই সেই, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। কিন্তু আমি যে তোমাকে রমণীরূপে ধ্যান করিতেছিলাম, পূজার অর্ঘ্য আমি যে দেবীপদে নিক্ষেপ করিতেছিলাম, কিন্তু আজ পুরুষবেশে ছলনা করিতে আসিলে,—তুমি কে? সে চক্ষে যাহা দেখিল, মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তার মন কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, এ বিরল আবরণ ভেদ করিয়া আমি তোমাকে চিনিবই ; আমি,

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"

কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। এলবার্টের আগ্রহে জোয়ার আসিয়াছে। এমন সময় বন্ধুবর্গের ভিতর স্থির হইল, সেক্সপীয়রের as you like it অভিনয় করা যাক্। এলবার্ট সাজিল অরলাণ্ডো ; নব অভ্যাগত বন্ধু থিওডোর দেখিতে বড় সুন্দর ছিল—সে একবরে স্ত্রীবেশে সাজিল রোসালিণ্ড, একবার পুরুষবেশে সাজিল গানিমিড্। এলবার্টের বান্ধবী রোসেটি সাজিল ফীবি। ফীবি গানিমিড্‌কে ভালবাসিত ; কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট! সিলভিয়স নামে এক অপর পুরুষের সহিত সে পরিণীতা হইল। অরলাণ্ডোর সহিত রোসালিণ্ডের পরিণয় হইল। এইরূপে মিলনান্ত অভিনয়ে সকলেই প্রীত হইল। লোকে বলিল, রোসালিণ্ড এবং অরলাণ্ডোর অভিনয় বড় স্বাভাবিক,রোসেটির অভিনয় বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

কিন্তু বৃদ্ধ বৃহস্পতি যখন এই রঙ্গমঞ্চের কাল্পনিক পরিণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, বাস্তবজগতের প্রেমবন্ধনটা কন্দর্পদেব তৎপূর্ব্বেই সারিয়া রাখিয়াছিলেন। থিওডোর যখন রোসেটির গৃহে বাস করিতেছিল,তখন তাহার প্রতি অলক্ষিতে অনিবার্য্যবেগে রোসেটি আকৃষ্ট হইয়াছিল। থিওডোর যদিও তাহাকে বন্ধু ভাবেই দেখিত, কিন্তু রোসেটির সহিত প্রেমালাপন যে তার ভাল লাগিত না, এমন নহে। রোসেটি—অবোধ সে, বুঝিতে পারে নাই,—সমস্ত নারীহৃদয়টুকু থিওডোরের পদে অঞ্জলি দিবে স্থির করিয়াছিল। থিওডোর ইহাতে বড় একটা কৌতুকানুভব করিত। বুঝিত না, অহি অগ্নি ভালবাসা এ তিন লইয়া খেলা করা চলে না ; কখন অলক্ষিতে নিঃশব্দে দংশন করে, হৃদয়ের অন্তরে

কখন অজ্ঞাতে আগুন ধরিয়া যায়। কেমন একটা দ্বিধা লজ্জা সঙ্কোচ এবং বোধ করি রোসেটির প্রতি নিরতিশয় মমতাবশতঃই সে আত্মপ্রকাশ করিয়া রোসেটির সুখের স্বপন ভাঙ্গিতে চাহিত না, বুঝি পারিতও না। থিওডোর ভাবিত, হায় মানবাদৃষ্ট! রমণীর প্রেম লইয়া আমি কি করিব! যাহার মাথা নাই তাহাকে তুমি রাজমুকুট পরাইতে চাও, তোমার এ কি কৌতুক! রোসেটির দুঃখে থিওডোর আন্তরিক দুঃখ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার কাছে সে গভীর প্রেমের পরিণতি নাই, সে যে ছদ্মবেশে তাহারই ন্যায় অসহায়া রমণীমাত্র! সত্যই যদি সে থিওডোর হইত—কিন্তু হায়, সে যে ম্যাডিলেন্!

সেই অভিনয়ের পর একদিন নির্জ্জনে এলবার্ট অয়লাণ্ডো ও থিওডোর রোসালিণ্ডের পরিচয় হইল। যেন যুগযুগান্তের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নিষ্ফল অন্বেষণক্লেশ একটি ত্রিযামা যামিনীর মধ্যে সাফল্য লাভ করিল। একটি অনন্যাসক্ত ক্ষুব্ধ লুব্ধ ক্লিন্ন হৃদয় লতার ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপুলকিত আলিঙ্গনপাশে বাঞ্ছিত ম্যাডিলেনকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। এলবার্ট সৌন্দর্য্যের যে নন্দনমরীচিকা বিস্তার করিয়াছিল, শুধু একটি নিশীথের জন্য সেই মোহকানন হইতে প্রেমপারিজাত হস্তে এক অপরূপ লাবণ্যশালিনী দেবী, জগৎ সংসারের সমস্ত বাধা বিঘ্ন পরিহারপূর্ব্বক, কোন এক অখণ্ড শুভগ্রহবশে সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ লইয়া অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে বাস্তবভাবে অকাতরে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া গেল। সে শুভ রজনী বড় আনন্দোচ্ছল, বড় বেদনাপ্লুত,বড় উচ্ছ্বাসাকুল,সুনিবিড় মিলনবন্ধনের মধ্যেও যেন বড় বিরহবেদনাবিজড়িত। কিন্তু সে উগ্রসুখ শুধু একটি ক্ষুদ্র রজনীর মধ্যে সংযত সংহত। তারপর সেই চঞ্চল পথিক নিশিশেষে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মত এলবার্টকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। যদি চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইবে,তবে তোমার প্রেমে আমাকে মহিমান্বিত করিলে কেন? আমি প্রাণের আকুলতায় তোমাকে অন্তরের সহিত চাহিয়াছিলাম,কিন্তু তুমি কেন আমার এই পরিক্ষীণাশাদীপদীপ্ত মর্ম্মমন্দিরে রহস্যান্ধকারপূর্ণ বিজন নিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া মনোহরণ-অভিসারে আসিয়াছিলে? কোন্ গুণে আসিয়াছিলে, আবার কোন্ দোষে ত্যাগ করিতেছ? এই দীর্ণ বিদীর্ণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসপূর্ণ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত করুণ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বিদেশী ম্যাডিলেন কোথায় চলিয়া গেল, কেহ জানিল না। সেই চিরবাঞ্ছিত মিলনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে সেই মিলনবন্ধনের অবসান, সেই মিলন-

যাত্রার চিরবিদায়, সেই কায়ার সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ।—ইহাই এই বিরহান্ত কাব্যের অভাবিত পরিণাম।

ফরাসী সাহিত্যে Romanticism যে সকল প্রতিভাবান লেখকের দ্বারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, এবং ভিক্টর হুগোকে যাঁহারা আদর্শরূপে পূজা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গতিয়ের স্থান অতি উচ্চ; বোধ হয়, ভিক্টর হুগোর পরেই। গতিয়ের গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে লেখকের অসাধারণ ভাষাসম্পদ দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। বিশেষণযোজনায় তাঁহার এমন প্রভূত ক্ষমতা আছে যে,তাহার বৈচিত্র্যে এবং ঘাতে প্রতিঘাতে ভাবস্রোতকে মুখরিত করিয়া তোলে। বিশেষণশিলায় প্রহত হইয়া সম্পূর্ণ ভাবটি খর্ব্ব হয় না, এবং এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবেগের এক অনির্ব্বচনীয় কল্লোলের সৃষ্টি করে। গতিয়ের ভাষার একটা অপরূপ মোহ আছে—এমন একটা পরিপূর্ণ স্রোতোবেগ আকুলিত তরঙ্গভঙ্গগর্জ্জিত কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে, যাহা ভরা ভাদ্রের ভাগীরথীর মত বেগবতী, অথচ অপরূপ গতিবৈচিত্র্যে পরম রমণীয়। ভাষার সহজ গতি যেরূপ স্বাধীন, সংযমের সহিত বক্তব্য ভাবের সামঞ্জস্য-রক্ষায় তেমনই অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। একান্ত বাধাবন্ধহীন বলিয়া কদাচ তাহা উচ্ছৃঙ্খল নহে।

ফরাসী সাহিত্যের পক্ষে শুভ কি অশুভক্ষণে জানি না, গতিয়ে চিত্রকরের তূলিকা ত্যাগ করিয়া লেখকের লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা লেখক অপেক্ষা চিত্রকর হইবার পক্ষেই যেন অধিকতর উপ-যোগী ছিল। বিচিত্র আভা ও বর্ণচ্ছটায় তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ছিল, এবং ভাষার ইন্দ্রজালে বিভিন্ন বর্ণটিকে সম্পূর্ণ বিশদ ও পৃথক করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এমন রং ফলাইবার বাহাদুরী ইংরাজী সাহিত্যে কই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, বাঙ্গলা সাহিত্যের ত কথাই নাই, এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও বোধ হয় কেবল এক কাদম্বরীরচয়িতাই গতিয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন। লেখক হইয়াও অন্তরের অন্তরে তিনি একজন সুনিপুণ মনীষী চিত্রকর ছিলেন। সুচারু গঠনসৌষ্ঠব, অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য ও বিচিত্র ছায়ালোকসম্পাতে তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতেন, এবং লেখক হিসাবে যাহাতে সেগুলি সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে,সে বিষয়ে তাঁহার একটা সদাসচেতন দৃষ্টি ও আন্তরিক চেষ্টা ছিল। নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া তিনি যে অতৃপ্তি ও অগাধ ধৈর্য্যসহকারে রূপের কামনা

এবং গঠনলাবণ্যের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য কারণ এই মনে হয় যে, গতিয়ে অন্তরের অন্তরে প্রকৃতপ্রস্তাবে এক জন কলাকুশল চিত্রকর ছিলেন, তাই প্রায় সকল স্থলেই সাহিত্যের সহিত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের একটা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কোন আভাসনিপুণ সুরম্য চিত্রপট দেখিয়া দর্শকের মানসপটে যেমন একটা স্থায়ী ভাব মুদ্রিত হইয়া যায়, গতিয়ের অসাধারণ বর্ণনাকৌশলে তেমনই দর্শনীয় বস্তুটিকে চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষ ও নিবিড়তর করিয়া তোলে, এবং সমস্ত শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যেন একটি তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন বহুক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। তিনি বলিতেন, চিত্রপটে ও পাষাণপটে যে অকুণ্ঠিত নগ্ন আভরণের এত সমাদর, সাহিত্যে তাহার স্থান নাই কেন, এবং কেনই বা তাহা চিরদিন অবহেলা উপেক্ষা ঘৃণার সামগ্রী হইয়া থাকিবে? ভাবিয়া দেখিতে গেলে ইহার ভিতর কতকটা সত্য আছে, কিন্তু সব কথাটা অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইতে পারা যায় না।

পাষাণমূর্ত্তির সহিত চিত্রপট এবং লেখকের রচনার একটা মজ্জাগত সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই, পাষাণ যে পরিমাণে মূক, চিত্র ও রচনা সেই অনুপাতে মুখর। ভাস্করের সহস্র সাধনা শিল্পচাতুর্য্য কৌশল সত্ত্বেও সে মৌন প্রতিমায় যেন ভাষা দান করিতে পারে নাই—পাষাণ পাষাণ হইয়াই আছে; কিন্তু চিত্রে বা কাব্যে কবির সৃষ্টিশক্তি দর্শক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটা সৃষ্টিশক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, যাহাতে বক্ষ্যমাণ বিষয় অথবা দর্শনীয় বস্তু আংশিকভাবে অসম্পূর্ণ হইলেও মানবের মন সেটিকে পূর্ণ পরিণত নিখুঁত করিয়া গড়িয়া তোলে। কবির সৃষ্টিশক্তি যেন গান, এবং পাঠক বা দর্শকের সৃষ্টিশক্তি যেন সুর। সেই গানে ও সুরে মিলিয়া এক অপরূপ সঙ্গীতমোহের সৃষ্টি করে, যাহার নিমিত্ত চিত্রকলা ও কাব্যকলা এত মনোহারিণী। প্রস্তরমূর্ত্তি এই সুরসঞ্চার করিতে পারে না বলিয়াই তাহাকে শিল্পহিসাবে যথাসম্ভব নগ্ন করিয়া দেখান চলে, কিন্তু ঐ বিচিত্র আভাসপ্রবণতাই সাহিত্যে ভাস্কর্য্যের প্রধানতম অন্তরায়। পুরাকালে সাহিত্যকারগণ আমাদের চক্ষের সমক্ষে একটা সুন্দর ছবি দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে লেখার সহিত মূর্ত্তিরচনার একটা বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ সহজ সরলভাবে সৌন্দর্য্যবিকাশের প্রতিই লক্ষ্য ছিল; কিন্তু আজ কাল আমাদের দেশে ইহার উপর লোকে যে এতটা খড়্গা-

হস্ত, তাহার কারণ, আমাদের দেশে সুস্থ সবল কল্পনাশক্তির একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

কুশলী চিত্রকরের ন্যায় আজীবন গতিয়ে বাহিরের সৌন্দর্য্যেই মত্ত মগ্ন মুগ্ধ ছিলেন। অন্তর্দৃষ্টি সে অনুপাতে অতি অল্প ছিল। অনেকে বলেন, এই বিপুল বিশ্বসংসারের মধ্যে তিনি ঢিল পাট্‌কেলই সংগ্রহ করিয়াছেন,— মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান—এ সকলের ধার তিনি ধারিতেন না। কেন না, ইহাতে তাঁহার আদর্শের অনুরূপ কিছুই নাই। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি সুন্দর রহস্যপূর্ণ অবতরণিকায় গতিয়ে দেখাইয়াছেন যে, এ সকলের দ্বারা বরং তাহার আদর্শ খর্ব্ব হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে, গৌরবলাভের কোন আশা নাই। গতিয়ে কোন মহান উপদেশ দিবার আস্ফালন করেন নাই, অথবা কোন প্রাচীন চিরন্তন সত্যকে নূতনের ছাঁচে ঢালিয়া প্রচার করিবার প্রয়াসী হন নাই, শুধু বিশ্বপ্লাবী বিশ্বব্যাপী সহজ সৌন্দর্য্যই তাঁহার আদর্শ। তিনি নিজেও যেমন তাহারই অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন, আমাদিগকেও তার অধিক আর কিছু দিয়া যান নাই। তিনি এই গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এতই মনোজ্ঞ ও সুন্দর যে, আদ্যন্তপাঠান্তে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, যদিও তাঁহার বক্তব্য বহুবিষয়স্পর্শী এবং বিশ্লেষণক্ষমতা বিষয়-নির্ব্বিশেষে প্রভূত প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি, বিষয়বিশেষে অনন্যসাধারণ সুগভীর জ্ঞান ও ক্ষমতা সে অভাবের জন্য যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। গতিয়ের প্রতিভার এই সর্ব্বতোমুখীত্বের অভাব ফরাসী চিত্র-শিল্পের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছে।

আর এক কথা, আজ কাল বিদেশীয় সাহিত্যে realism বা বাস্তববাদের বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। ফরাসী সাহিত্যে মুঁসে জোলা প্রমুখ গ্রন্থকারগণ ইহার বড় বেশী পক্ষপাতী, এবং তজ্জন্য ফরাসী পাঠকসমাজে ইহাঁরা অতি-রিক্তমাত্রায় প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সাহিত্যে এরূপ সমাজদ্রোহকর বাস্তববাদের কখনই আদর করিতে পারি না। ইহার ফলে বিদেশীয় সমাজবন্ধন কিরূপ শিথিল এবং সামাজিক প্রথাবিশেষ কিরূপ ভ্রষ্ট, আমরা চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন তাহা দেখিতে পাইতেছি। গতিয়ের মত প্রতিভাবান লেখককেও ঐ দিকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিলে ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা থাকে না। এলবার্ট ও ম্যাডিলেনের প্রগাঢ়

প্রেমের পরিণতি শুধু একটি রাত্রির স্বল্পজীবনের মধ্যে অবসিত না হইয়া যদি পরস্পর বিবাহের অনন্ত পুণ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইত, তবে বোধ করি এলবার্টের হইয়া সমস্ত সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি ম্যাডিলেনের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিত, এবং ম্যাডিলেনও এলবার্টে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সমুদ্রের মধ্যে নদীর আত্মবিসর্জ্জনের মত একটি কমনীয় চরিতার্থতা লাভ করিয়া নারীজীবনের যথার্থ স্থায়ী সুখের স্বাদ পাইত। তাহা হইলে সে শুভ বাসরটি কাব্যদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া সমগ্র কাব্যখানিকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিত, এবং পাঠকের অন্তরেও একটা পরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশলাভ করিয়া বিমল আনন্দ দান করিতে পারিত। কিন্তু, কই ?

গতিয়ের একটি প্রধান দোষের উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি না। সৌন্দর্য্যের মহত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া যদি তিনি মহত্তর আদর্শের গৌরব খর্ব্ব করেন, তবে আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিব না। সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আমরা অকাতরে উচ্চ আসন দান করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু মানবহৃদয়ের রত্নসিংহাসন আরও ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। গতিয়ে এই অসীম রহস্যময় অপার করুণাময় অনন্ত প্রেমময় মানবহৃদয়ের অক্ষুণ্ণ দীপ্ত গৌরবের সম্যক উপলব্ধি করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। মানবহৃদয় যে সুন্দর হইতেও সুন্দরতর, নিরাভরণা শ্রীহীনার মধ্যেও যে এমন একটি অমূল্য হৃদয় নীরবে নিহিত থাকিতে পারে, যাহা লাবণ্যদীপ্ত মুখশ্রী হইতে শতগুণে শ্রীসম্পন্ন, রূপের সৌন্দর্য্যকুহক যদি একগুণ দুশ্ছেদ্য হয়, হৃদয়ের মোহজাল তবে সহস্রগুণে সুদৃঢ়। গ্রন্থে এই দুর্ল্লভ মানবহৃদয়ের প্রতি যে একটা সচেতন নাসিকাকুঞ্চন আছে, তাহা আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় মানবহৃদয়ের প্রতি একটা সমাদর প্রদর্শিত হইয়াছে। যেখানে রোসেটির সহিত ছদ্মবেশী ম্যাডিলেনের অকপট প্রেম বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে বাহ্য ও অন্তর্জগতের সংগ্রামে হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ড ঘর্ষে সংঘর্ষে, ঘাতে প্রতিঘাতে, আবেগে উদ্বেগে, ভাবস্রোতের আবর্ত্তে তরঙ্গে গর্জ্জনে একটা সীমাহীন অপার করুণা তরঙ্গিত উচ্ছলিত হইয়া পাঠকের হৃদয় সকরুণ বিষাদে প্লাবিত করিয়া আর্দ্র বিগলিত মুগ্ধ করিয়া ফেলে, এবং সেই একান্ত সামর্থ্যহীন নির্ভরপরায়ণ রমণীর নিষ্ফল

স্ত্রীসৌভাগ্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ না করা অতি কঠোর হৃদয়েরও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই স্থলে এক অপূর্ব্ব নাটকত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

চিত্রকর।

অমূল্য বাবুর বাড়ীতে একটা বড় রকমের নিমন্ত্রণের আয়োজন হইয়া । অনেক ধনী ও নির্ধন আত্মীয় বন্ধু পরিচিত নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ বীরেশ্বর বাবু তাঁহার বিপুল দেহভার তাকিয়ার উপর ন্যস্ত করিয়া প্লেগের সংক্রামত্ব হইতে ম্যাফেকিংএ অবরুদ্ধ সৈনিকদিগের দৈনিক আহারের পরিমাণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েরই গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছিলেন। সে আলোচনায় রামজীবন, নরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, বিপিন, কানাই, হরি, দুলাল প্রভৃতি বাবুগণ উৎসাহের সহিত যোগ দিতেছিলেন, এবং মনে মনে বীরেশ্বর বাবুর বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। কেবল গৃহকোণে একটি বিগতযৌবন ভদ্রলোক আপনার মনে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পরে বীরেশ্বর বাবু গৃহকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে অমূল্য, এ বাবুটি কে হে ?" অমূল্য বাবু উত্তর করিলেন, "আমাদেরই একটি আত্মীয়, শ্যামাচরণ বাবু। উনি একজন ভাল ছবি-আঁকিয়ে।"

আলবোলার নল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "ছবি-আঁকিয়ে কি, পোটো ?" কথার লক্ষ্য শ্যামাচরণ বাবুর দিকেই ছিল, তাই তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সাধারণতঃ মানুষের চেহারা আঁকি।"

"বটে ! তা বেশ। দেখ অমূল্য! তোমাদের পাড়ার কে সে হরি না কি, সে আমার নাতির একটা ছবি এঁকেছিল, তা সে এমন বিশ্রী যে আমার পছন্দ হ'ল না।" তার পর শ্যামাচরণ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি তার এক খানা ছবি আঁকো ত দেখি! তোমার বাড়ী কোন্‌খানে ?" শ্যামাচরণ বাবু অপরিচিতের নিকট হইতে "তুমি" সম্বোধনে অভ্যস্ত না থাকিলেও বীরেশ্বর বাবু ধনী ও বয়োবৃদ্ধ বলিয়া সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন,

"আমি শ্যামপুকুরে থাকি।" বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, অমূল্যকে দিয়া তোমাকে সংবাদ দিব।"

গৃহে ফিরিবার সময় শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার একটি বন্ধুকে বলিলেন, "বড়-মানুষদের সঙ্গে না মেশাই ভাল,—প্রাণে সকল সময় শান্তি অনুভব করা যায় না।" বন্ধু বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।"

২

"আচ্ছা, তুমি ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাস ?"

"হ্যাঁ, বাসি বৈ কি, আমার একটা দুই আনা দামের লাটাই আছে, আর তিন পয়সা দিয়ে দরওয়ান আমার সুতার মাঞ্জা করিয়া দিয়াছে, সে লাল সুতা, আর তাতে যে মিত্তিরদের ছেলেদের ঘুড়িগুলো কাটে, পট্ পট্ করে কেটে যায় ! জানেন শ্যামাচরণ বাবু, ওদের মাঞ্জা ভাল না। আমার মাঞ্জা কি না দরওয়ান করে দেয়, সে বেশ ভাল মাঞ্জা।"

শ্যামাচরণ বাবু বীরেশ্বর বাবুর নাতির ছবি আঁকিতে আঁকিতে তাহার সহিত কত গল্প করিতেছিলেন।

বুদ্ধিমান চঞ্চল বালককে স্থির রাখা শ্যামাচরণ বাবুর পক্ষে নিতান্ত আনন্দদায়ক হইয়াছিল। তাহার সরল হাসি, ছোট ছোট সুখ দুঃখের কাহিনী, এবং তাহার মধুর কণ্ঠে অপুত্রক চিত্রকরের জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি মুগ্ধ কর্ণে তাহার গল্প শুনিতেন, তীক্ষ্ণ নেত্রে তাহার বর্ণাকৃতি দর্শন করিতেন, এবং সুনিপুণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ক্যানভ্যাসের উপর প্রতিফলিত করিতেন। প্রত্যেক দিন অঙ্কনের শেষে বালক তাঁহার কোলে বসিয়া বলিত, "ও আমি, ও আমি।"

দুই একবার বীরেশ্বর বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্যামাচরণ বাবুর অঙ্কনের ত্রুটি বাহির করিবার প্রয়াস পাইতেন, এবং চিত্র সম্বন্ধে নিতান্ত বিজ্ঞের মত বলিতেন, "ওহে, এখেনটা শেড্ লাইট্ ঠিক হচ্চে না !" শ্যামাচরণ বাবু গম্ভীরভাবে উত্তর করিতেন, "শেষ হইয়া গেলে ও সব দোষ থাকিবে না।" বালকের চিত্র অঙ্কনে তিনি আনন্দের সহিত এই দুঃখটুকুও পাইতেন। তাহাতে শ্যামাচরণ বাবুর ক্ষোভের কারণ ছিল না ; কারণ, তিনি জানিতেন, জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুর্লভ।

৩

ছবি আঁকা শেষ হইয়া গেল। সদাপ্রফুল্ল, হাস্যময় চঞ্চল বালক একই

ভাবে চিরনিস্তব্ধ, অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিল। বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "মন্দ হয় নাই। আচ্ছা একখানি ফ্রেম করাইয়া দাও।" শ্যামাচরণ বাবু একখানি সুন্দর ফ্রেম মনোমত করিয়া প্রস্তুত করিলেন। তার পর একদিন বলিলেন, "তবে আমার টাকাটা দিতে আজ্ঞা হোক।"

বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "হুঁ, কত দিতে হবে?"

"আপনাকে আর কি বলিব?"

"তবুও বল না। তুমি পরিশ্রম করেছ, তোমার প্রাপ্য, তুমিই বল। কি বলেন গৌরী বাবু! আমি ঠিক বলচি কি না?"

পক্বকেশ গৌরী বাবু বলিলেন, "ঠিক, ঠিক, আপনার মত সদ্বিবেচক লোকের মতই বলা হয়েছে!"

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "আমি আপনাকে আর কি বলিব, এক শত টাকা দিবেন।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "এক শ' টাকা! বল কি! একখানা ছবি এঁকে এক শ' টাকা! ও বাবা!"

গৌরী বাবু কোটরাগত চক্ষু বহুকষ্টে বাহির করিয়া বলিলেন, "এঁ্যা, এক শ' টাকা আবার কখন পোটোর রোজকার!"

বীরেশ্বর বাবু বিরক্ত হইয়া সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুকে ছবির দাম পঁচিশটে টাকা দাও।"

তার পর গৌরীবাবুর সহিত অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মর্ম্মাহত শ্যামাচরণ টাকা লইলেন না। বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় গেটের ধারে বীরেশ্বর বাবুর নাতিকে দরওয়ানের সহিত ঘুড়ি-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিলেন। তিনি তাহাকে ডাকিলেন। বালক ঘুড়ি লাটাই ফেলিয়া ছুটিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ তাঁহার পাণ্ডুমুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি বিস্ময়ে ভয়ে আরও বড় হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামাচরণ বাবু কাঁদচ কেন, দাদামশায় তোমাকে বকেচে? দাদামশায় বড় বকে।" ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাচরণ বালকের মুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "না বাবা, তোমার ঘুড়ির মাঞ্জা তৈয়ার করগে।" কিছু দূর গিয়া শ্যামাচরণ বাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বালক তখনও তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। শ্যামাচরণ বাবু আর ফিরিলেন না।

৪

এই ঘটনার চারি দিন পরে প্রত্যুষে বীরেশ্বর বাবুর দরওয়ান আসিয়া বলিল, "বাবু আপনাকে এখনি ডাকিয়াছেন।" আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" দরওয়ান উত্তর করিল, "তা বলিতে পারি না বাবু, তবে খোকাবাবুর বড় অসুখ করেচে।" শ্যামাচরণ বাবু কালবিলম্ব না করিয়া দরওয়ানের সহিত চলিলেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় বীরেশ্বর বাবুর সহিত দেখা হইল। শ্যামাচরণ বাবুকে দেখিয়া বীরেশ্বর বাবু পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন, "আপনার পায়ে পড়ি শ্যামাচরণ বাবু, আমার নাতিকে বাঁচান।" তার পর শ্যামাচরণ বাবুর হাত ধরিয়া অন্দরের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। নির্ব্বাক শ্যামাচরণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

একটি প্রকোষ্ঠে শয্যার উপর বালক ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। বীরেশ্বর বাবুর পরিবারবর্গ তাহাকে ঘিরিয়া ছিলেন। বালক মধ্যে মধ্যে বলিতেছিল, "শ্যামাচরণ বাবু, কাঁদচ কেন, দাদামশায় তোমাকে বকেচে? দাদামশায় বড় বকে।"

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

সাহিত্যসেবীর বিবাহ।

যিনি যাহাই বলুন, সত্যের শাসন বড় কঠোর। অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে, অনেক স্থলেই সাহিত্যসেবীর বিবাহিত জীবন সুখলেশহীন হইয়াছে। যে ডিকেন্স বিশুদ্ধ হাস্যের উৎসমুখ মুক্ত করিয়া দিয়া সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরেও বিমল হাস্যরসসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি হাসাইতে পারেন নাই কেবল আপনার পত্নীকে। তাঁহার দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস বর্ত্তমান লেখকের মত ভক্তের পক্ষে কষ্টকর। অন্ধকবি মিলটনের বিবাহিত জীবনে কুসুম যত থাকুক আর নাই থাকুক, কণ্টকের বাহুল্য বিষম। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের দেশেও চেষ্টা করিলে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু য়ুরোপের মত এ দেশে প্রতিভার আদর নাই। সেদিন উইডা দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, সাহিত্যসেবীর জীবনে এতটুকু অন্তরাল নাই। সাহিত্যসেবী আপনার জীবনের মালিক হইয়াও যেন কেহই নহেন। পাঠক-সম্প্রদায়

সাহিত্যসেবীকে বেদখল করিয়া তাঁহার জীবন ভোগ করে। তিনি নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হয়েন। কথাটা খুবই সত্য। যুরোপে প্রতিভার আদর এত অধিক যে, অনেক সময় সে আদর ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়; জীবনচরিতের জ্বালায় উপাসিত বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার গোপনীয় পত্র-গুলি পর্য্যন্ত প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত। তাঁহার সব বিষয়ই যেন সাধারণের সম্পত্তি। এ দেশে এখনও সে আশঙ্কা নাই। আমাদের দেশে পর্দ্দার যেমন বাহুল্য—শুদ্ধান্তের সমুচ্চে স্থাপিত ক্ষুদ্র গবাক্ষে যেমন চিকের ঘটা, জীবনেও সেইরূপ। বহুকষ্টে—অনেক চেষ্টায় মধুসূদনের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত রচিত হইয়াছে। সেদিন একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের বোজেল ছিল না। আমরা নিন্দা করিতে পটু, প্রশংসা করিতে নারাজ,—সেই জন্য বোজেল এ দেশে অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত-রচনার চেষ্টাও হয় নাই। যিনি বঙ্গসাহিত্যের একাংশ সর্ব্বজনসম্মানিত করিয়া গিয়াছেন, সেই দীনবন্ধুর জীবনীর উপাদানের এক ভগ্নাংশমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার বহুকাল পরে তাঁহার পুত্র মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু লিখিয়াছিলেন। লেখা নিষ্ফল হইয়াছে—কেহ সেই মহারথীর—সেই অত্যাচারপীড়িতের সহায়, দীনের বন্ধু, ভণ্ডের শাসক দীনবন্ধুর জীবনী লিখিতে অগ্রসর হয়েন নাই। বিহারীলালের সম্বন্ধে রবীন্দ্র-বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন,তাহা ভক্তশিষ্যের অঞ্জলিদান—জীবনবৃত্ত নহে। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্বন্ধে গোটাদুই কথামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন। তারকনাথের ভাগ্যে অধুনাবিলুপ্ত 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এর অঙ্কে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধমাত্র জুটিয়াছিল, অথচ তাঁহার 'সরলা'র সমকক্ষ বঙ্গভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে দেশে রুই কাতলার এই দশা, সে দেশে চুনা পুঁটি তুমি আমি নিশঃঙ্কচিত্তে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি; কেহ সে সন্ধান লইবার কষ্ট করিবে না। সমসাময়িক খ্যাতি যেমন মুখরোচক, তেমনই প্রলোভনের। কিন্তু ভবিষ্যতের সুখ্যাতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও বড় আদরের। যদি কাহারও ভাগ্যে সে সুখ্যাতিলাভ ঘটে, তবে তখন তাঁহার ভক্তবৃন্দ অতীতের যবনিকা-অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়িবে না; তখনকার কথাও বিবেচনার বিষয়।

যুরোপের এই ব্যাপার লইয়া এখন আলোচনা হইতেছে;—প্রশ্ন উঠিয়াছে—সাহিত্য-সেবীর পক্ষে বিবাহ করা সঙ্গত কি? গত মাসে আমরা যুরোপে সম্পাদকপত্নীর দুঃখকথা জানাইয়াছি; এবার সাহিত্যসেবীর কথা বলিব।

সম্প্রতি "আর্গসী" পত্রে মিষ্টার কথবার্ট হ্যাডন এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া-ছেন। কথাটা একতরফা, সন্দেহ নাই। স্ত্রীপাঠ্য যে পত্রে এই প্রশ্ন প্রকাশিত হয়, সে পত্রের পাঠিকাগণ কি উত্তর দিয়াছেন, জানিতে পারিলে দুই পক্ষের কথার মীমাংসার সুবিধা হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। কিন্তু যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহার জন্য আক্ষেপ না করিয়া যাহা হস্তগত হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করাই সুবুদ্ধির কার্য্য। লেখক বলেন,—

খ্যাতনামা লোকদিগের মধ্যে সোপেনহোর অন্যের কথা দূরে থাক স্বকীয় জননীরও সহিত এক গৃহে বাস করিতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিবাহবন্ধনবন্ধের পক্ষে কোন অসাধারণ রচনা অসম্ভব। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সুখে হউক আর দুঃখে হউক, আরামে হউক

আর কষ্টে হউক, যাঁহারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কৃতদার। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্যসেবিগণ—বিশেষতঃ প্রতিভাবান সাহিত্যসেবিগণ প্রায়ই বিবাহিত জীবনে সুখ পান নাই। ড্রাইডেন ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী পঞ্জিকা হইলে ভাল হইত—বর্ষে বর্ষে নূতনের আমদানী করা যাইত। যে প্রতিভাশালী পুরুষ অমৃত বলিয়া গরল পান করিয়া বিষের জ্বালায় জরজর, এ তাঁহারই কথা, কিন্তু প্রতিভাবানের এ কষ্ট তাঁহার নিজ কর্ম্মফল। তাঁহারা ভাল বাছাই করিতে পারেন না। এই ব্যাপারের এতই বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবাহে স্ত্রীবাছাই ব্যাপারে ভুল করিলে—সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে প্রতিভাবান বলিয়া মনে করে। প্রতিভার এই পরিচয় অদ্ভুত বটে! আসল কথা এই যে, প্রতিভাবান ব্যক্তি আদর্শচিন্তায় মসগুল—তিনি বাস্তবরাজ্যের ব্যাপার বিবাহবন্ধনে প্রবেশকালে সব দিক দেখিয়া, সব ভাবিয়া কায করেন না। কিন্তু তিনি যদি অকূলের কূলে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া আমি গোষ্পদে নামিতেছি মনে করিয়া ঝাঁপ দেন ও শেষে তরঙ্গে কাতর হইয়া পড়েন, তবে সে দোষ তাঁহারই।

"আমি—তব প্রেম লাগি সরব-তেয়াগী" কবিতায় ভাল, কোর্টসিপের প্রত্যূষেও শোভন, কিন্তু জীবনটা স্বপ্নমাত্র নহে। নিত্য জীবনধারণের জন্য প্রিয়তমার চুম্বন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ব্যতীত আরও কিছুর আবশ্যক হয়। আহার ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। আর

"রাঙ্গা অধর, নয়ন কাল
ভরা পেটেই লাগে ভাল।"

সংসারের শত কার্য্যে স্বপ্নরাজ্য অল্পেই বিলীন হইয়া যায়; দাম্পত্যজীবনের শতজ্বালা সহজেই অনুভূত হইতে থাকে। তখন প্রতিভাবান ব্যক্তি বুঝেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার মানসসুন্দরী নহেন, তিনি মানুষীমাত্র। তখন তিনি হয় ত বার্ণসের মত অন্যত্র সন্ধ্যাযাপন করেন, নহে ত সেক্সপিয়রের মত পত্নীকে ছাড়িয়া সটান সরিয়া পড়েন।

এ সব কথা ত আছেই। লেখকের মতে সাহিত্যসেবীর দাম্পত্য জীবনে অসুখের আরও কারণ আছে। সাহিত্যসেবী দলে পতিপত্নীতে যত অধিক দেখা সাক্ষাৎ হয়, তত আর কোন দলে হয় না। অত্যধিক ঘেঁসাঘেসি—সর্ব্বদা ভাল নহে। ব্যবহারজীবী, কেরাণী ও ব্যবসাদার হইতে রাজমিস্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই সকালে কাযে যায়, আর সারাদিন শ্রমের পর দিনান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সাহিত্যসেবীর কায গৃহে; তিনি দিবারাত্রই গৃহবাসী। কাযেই গৃহের ঝঞ্ঝাট ভোগ তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। যদি শিশুর অসুখ হয়, দাসী একটা দ্রব্য ঝাড়িতে ভাঙ্গিয়া ফেলে, অথবা এমনই কিছু হয়, তবে পত্নীর সঙ্গে পতিকেও জ্বালাতন হইতে হয়।

যশের পথ স্বভাবতঃই দুরারোহ। তাহার উপর আবার সংসারের শত ঝঞ্ঝাটের জ্বালা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তাহাতে সাফল্যলাভে বিঘ্ন ঘটে। এই অবস্থায় সাহিত্যসেবী হয় স্বীয় কার্য্যে অবহেলা করেন, নয় ত পত্নীকে অবহেলা করেন। প্রতিভাশালীরই হউক, আর

প্রতিভাহীনেরই হউক—কর্ত্তব্যে অবহেলা অমার্জ্জনীয়। পত্নী সহজেই পতির নিকট অনেক আশা করেন—সে প্রত্যাশা একান্তই স্বাভাবিক। পতির—

"উপহাস আর মূক অবহেলা
বড়ই যাতনা তায় ;
ঘৃণার বেদনা, যাতনা, তাড়না,
তার চেয়ে সহা যায়।

তাহার উপর আবার সাহিত্যসেবী প্রথমে পত্নীতে অতিরিক্ত যত্নদান করেন।

"তুমিই ত শিখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা—)
প্রেমে দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা।"

যে সাহিত্যসেবী স্ত্রীকে তাঁহার স্নায্য দিতে পারেন না,তাঁহার পক্ষে বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ। তিনি দাম্পত্যজীবনের অনুপযোগী। দাসদাসীর যত্নই তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার।

সাহিত্যসেবী যে ইচ্ছা করিয়া পত্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, এমন নহে। তিনিও মানুষ, দাম্পত্যজীবনে সুখের আশা কি তাঁহার নাই? না থাকিলে তিনি বিবাহবন্ধনবদ্ধ হইতেন না। অধিকন্তু বাস্তবের মেঘমুক্ত গগনে কল্পনার ইন্দ্রধনু বিলীন হওয়াতে তিনি যত ব্যথিত, তত আর কেহই নহে। স্বপ্নমরীচিকা তাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়—তিনি তাহা ত্যাগ করিতে চাহেন না। তিনি হৃদয়ের আদর্শ লইয়া ব্যস্ত ; সে আদর্শে তিনি এমনই বিভোর যে, তাঁহার রচনায় সেই আদর্শ—প্রেম, স্নেহ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ—বাস্তবের মোহালোকে উদ্ভাবিত হইয়া উঠে। তিনি আপনার কল্পনাকে এমনই সজীব করিয়াছেন যে, পাঠকগণ তাহা বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার কল্পনাবাসীরা পাঠকের পক্ষে তাঁহাদেরই মত মানব ; তাহাদের সুখ দুঃখে তাঁহারা সমবেদনা বোধ করেন। তাঁহার পক্ষে দাম্পত্যজীবনের কল্পিত মায়াকানন জলবিম্বের মত ফুৎকারে ফাটিয়া যাওয়া বড়ই কষ্টকর। তিনি ইচ্ছা করিয়া কষ্ট সহ্য করেন না। তিনি তাঁহার চিন্তায় বিভোর থাকেন ; অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন ; আহারে, শয়নে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তার দাস। যখন পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক, তিনি তখনও দাম্পত্যজীবনের সুধাভাণ্ড করে লইয়াও পান করিতে ভুলিয়া যান। সুধাভাণ্ড করে, তবু কণ্ঠতালু পিপাসাশুষ্ক—এ যেন "পানিমে মীন পিয়াসী।"

তাঁহার পত্নী যখন কিছু বলেন, তিনি শুনিয়াও শুনেন না, কথা শুনেন, ভাবগ্রহণ করেন না। তাঁহার আদর আবদারের সময় নাই। যদি কখন স্ত্রীর জন্য তাঁহাকে বিলম্ব করিতে হয়, তবে হয় ত তাঁহার বিদ্রূপবৃত্তি জাগিয়া উঠে। আবার সময় সময় তিনি বিমর্ষ ও খিট্‌খিটে হইয়া উঠেন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই বসিয়া কায করিতে হয়। তাহাতে পরিপাকশক্তি মন্দ হইয়া আইসে। শরীর যখন ভাল থাকে না, তখন মন ভাল রাখা অসম্ভব। ইহাতে সাহিত্য-সেবীর দ্বিগুণ দুঃখ। প্রথমতঃ শারীরিক অসুস্থতা—ও তন্নিবন্ধন আশঙ্কা যে, তাঁহার ভাগ্যে যশোলাভ ঘটিবার পূর্ব্বেই হয় ত তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইবে। এ বিস্তৃত

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। "অন্তমুখ তারকার অন্তলীন রহস্য হেরিতে" —হৃদয়ের ব্যাকুলতা, সে বুঝি বৃথায় যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিমর্ষ অবস্থায় তিনি অকারণে বা অতাল্প কারণে স্ত্রীর সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করেন। তাহার ফলে তিনি আপনি যে কষ্ট অনুভব করেন, পত্নী তাহার দশাংশের একাংশও করেন না; তদুপরি আবার সেই দুর্ব্ব্যহারক্লিষ্টা পত্নীর বেদনায় সমবেদনানুভব তাঁহার পক্ষে একান্ত অনিবার্য্য।

লেখক বলেন, সাহিত্যসেবীর পক্ষে গৃহ হইতে কিছু দূরে আফিস করা সঙ্গত। তিনি সেই স্থানে কার্য্য করিবেন; গৃহের শত ব্যাপারে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবে না। এ দিকে সর্ব্বদা স্বামীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় বিরহের পর মিলনকালে পত্নী পতির অনেক ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

সাহিত্যসেবকের পক্ষে এই ব্যবস্থা। কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না, একের চেষ্টায় তেমনই দুইয়ের কায নিষ্পন্ন হয় না। সাহিত্যসেবকের পত্নীরও কর্ত্তব্য আছে। রমণী স্বভাবতঃই দয়াময়ী;—ক্ষমাশীলা। সাহিত্যসেবকের পত্নীকে কিছু অতিরিক্তমাত্রায় স্বার্থত্যাগী হইতে হইবে। যে স্বামী দেশপূজ্য, যিনি শত শত পাঠককে প্রীত করিতেছেন ও জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহার গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত বোধ করিয়া সেই গৌরবের জন্য দাম্পত্যজীবনের অনেক সুখ ত্যাগ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য। নহিলে শান্তির সম্ভাবনা নাই। স্বামী রোগী হইলে তিনি যেমন তাঁহার শত ত্রুটি হাস্যমুখে ভুলিয়া যান— তেমনই সাহিত্যসেবককে চিন্তাব্যাধিগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করাই তাঁহার পত্নীর অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কোন অসুখের সম্ভাবনা থাকে না। আর সাহিত্যসেবকের পক্ষেও পত্নীর সহাস্য প্রফুল্ল সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। যিনি স্বভাবতঃই চিন্তাকুল, যিনি সংসারে থাকিয়াও কিছু বুঝেন না, তাঁহার পক্ষে পত্নীর এইরূপ সাহায্য আবশ্যক। ইহা বুঝিয়া পত্নীর পক্ষে সামান্য স্বার্থত্যাগ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে—স্বামীর সুখবিধানচেষ্টাতেই মহত্ত্ব।

ওমার খায়্যামের রুবাই।

১

প্রভাতে উঠিল ধ্বনি মোর সুরা-ঘরে—
"মাতাল পাগল মোর, লক্ষ্মীছাড়া ওরে
"পূর্ণ করি সুরাপাত্র—সুরা দিয়ে আয়,
আয়ুপাত্র না পুরিতে অদৃষ্টের করে।"

২

না খাও খেও না মদ—নিন্দ' না মাতালে,
কৃপা যদি পাই—আমিও ছাড়িব কালে ;
মদ খাওনাক ব'লে—গর্ব্ব তব ভারি,
শত কায কর—মাতালেরা বাবা বলে।

৩

কালিকার নাহি যবে ঠিকানা তোমার,
তূর্ণ তবে পূর্ণ কর প্রাণের আবদার,
চাঁদিনীতে চাঁদমুখে সুধা কর পান—
ও চাঁদ হাসিবে নিত্য—তুমি কোথাকার !

৪

তরল মাণিক—সুরা,—সুরাপাত্র—খান,
পিয়ালাই দেহভাণ্ড,—সুরা তার প্রাণ ;
এই যে স্ফটিকপাত্র হাসিছে আসবে—
অশ্রু এ যে—মরম-শোণিতে কাণে কাণ।

৫

উঠ—ঢাল সুরা—নাহি কথার সময়—
তব মুখে আজি মোর অমৃতসঞ্চয়,
কুসুম-আসব ঢাল—অধর রক্তিম,
জটিল কুন্তল সম কুঞ্চিত হৃদয়।

৬

মানবে গড়িল যবে লয়ে জল বালি,
বিধাতা সাজাল ভালে—অদৃষ্টের ডালি,
কেন তবে মদ খেতে নিত্য কর মানা ?
সকল মানার সেরা—দু'টি হাত খালি।

৭

"মাতাল রে তুই"—বলে বেশ্যারে গোঁসাই
"পলে পলে বাঁধা তুই এর ওর ঠাঁই"—
বেশ্যা বলে "বটে—তবু শুধাই গো প্রভু
দেখাও নিজেরে যথা—সত্যই কি তাই ?"

৮

সুরা, সুর, সুরাঙ্গনা—পাশে যদি থাকে—
বনভূমি স্রোতস্বিনীকূলে যদি থাকে—
ইহা ছাড়ি ফিরনাক আশার নরকে—
ইহা ছাড়া স্বর্গ নাই—স্বর্গ যদি থাকে।

৯

সুখের—পিয়ালা, তাহে ফুলশীধু ভার
সুখের—বীণার ছন্দ—বেণুর ঝঙ্কার
বিরাগী, লও না কভু সুরার সংবাদ,
সুখের—তুমিও, যবে শত ক্রোশ পার।

১০

মদের মৌসুম গেল—এল রমজান—
পান আর হাসি খুসি হ'ল অবসান।
—রহিবে অপীত পড়ে—সঞ্চিত আসব,
অঙ্গনার অঙ্গ ঘেরি হ'বো না শয়ান।

১১

সুখ নাহি—সুরা আর ইয়ার বিহীন—
বেণুর গুঞ্জন নাই—কাঁদেনাক বীণ—
যে ছাঁদেই দেখিনাক এই ধরাখানা
জীবনের সার মজা—বাকি রসহীন।

১২

সুখের—দখিনা বায়ে ফুলের দোলন,
সুখের—কুসুম-কুঞ্জে প্রিয়ার আনন,
সুখের নহে ত কথা গত দিবসের,
সুখের আজিকে কেন তার আলাপন।

১৩

দুই চারি দিন মোরা বাঁচি এ ভূতলে—
বাত্যা—বন্যা সম আয়ু ছোটে ভীম বলে।
দুট'দিনে মনে কিন্তু দিই নাক স্থান—
যে দিন আসিবে আর যে গিয়াছে চলে।

১৪

যখন সতর্ক শিষ্ট—আনন্দ না পাই।
যখন বেহুঁষ মত্ত—কোন জ্ঞান নাই।
জ্ঞান আর অজ্ঞানের মাঝামাঝি স্থান
সেই ত জীবন বটে—তারই গুণ গাই।

১৫

জ্ঞান বিবেকের এই দুটি কথা সার—
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্মৃতি শ্রুতি দেয় নাই আর—
যাহা তাহা গেলা চেয়ে—উপবাস ভাল,
একা ভাল—নয় মেশা সাথে যার তার।

১৬

বাঁধা প্রেমে দীপ্তি নাই—স্ফূর্ত্তি মহিমার
আধনিভ অগ্নি সম তাপ নাই তার—
প্রেমিক যে জন তার কিবা দিন রাত—
নাহি শ্রান্তি—নাহি নিদ্রা—ক্ষুধা—তৃষা আর।

১৭

খাঁটি প্রেমিকের চোখে গোরা কিবা কাল,
নরক আঁধার কিবা স্বরগের আলো,—
কিবা দিব্য পট্টাম্বর—জীর্ণ কন্থা কিবা—
মৃত্তি পরে মাথা, কিবা উপাধান ভাল?

১৮

যার প্রাণে জাগিয়াছে আলোক প্রেমের—
মস্‌জিদের যাত্রী হোক—অথবা মঠের—
প্রেমের দপ্তরে যার নাম আছে লেখা
রাখে না স্বর্গের আশা—ভীতি নরকের।

১৯

মন্দির—মস্‌জিদ্ বল—ভজনারই স্থান,
ঘণ্টা-ধ্বনি নহে কি তা'—ভজনেরই তান?
তিলক—ত্রিশূল—মালা ইহারা সকলে
ঈশ্বরপূজার ভিন্ন, স্পষ্ট অভিজ্ঞান।

২০

"জানিস্ কি লাগি তুই পূজিস আমারে ?"
—মূর্ত্তি শুধাইল তার পূজক-জনারে—
"নিজ রূপোচ্ছ্বাসে মোরে যে করে উজ্জ্বল
"তোর আঁখি দিয়ে সে যে আমাকে নেহারে।"

২১

এই যে অস্তিত্ব তব—অস্তিত্ব পরের—
এই যে মত্ততা তব—মত্ততা পরের—
চিন্তাভার নত মাথা কাঁধে রাখি দেখ—
হাত তব হাত নয়—আস্তিন পরের।

২২

কোন ভুলে, বুদ্ধিমান—ধরি কোন আশা,
এ পোড়া জগতে বাঁধে হৃদয়ের বাসা ?
যখনই আরাম তরে ছড়ায় সে পা,
হাত টানি কাল বলে দেহ তোর ওঠা।

২৩

নির্গুণেরই চারিপোয়া অন্নের সংস্থান,
বেঁচা রাখে চোখা মাল—হায়রে বিধান।—
রূপসীর চারু আঁখি ভুলায় হৃদয়
চেঙ্গড়া-মহলে হায় বিলায় সে প্রাণ।

২৪

এ ধরায় আছে যার রুটি আধখানা,
মাথা রাখিবার তরে নিভৃত আস্তানা,
গোলামী করে না কা'রো, প্রভু কারো নয়—
বলগে "আনন্দ রহ"—সুখী সেই জনা।

২৫

ধরায় মিটেছে সাধ ?—তার পরে বল ?
জীবন কেতাব শেষ ?—তার পরে বল ?
শতবর্ষ বাঁচিয়াছ সুখে সাধে আর
বাঁচিবেক শতবর্ষ—তার পরে বল ?

২৬

আছিল বিশাল যবে জীবনের আশ,
ভাবিতাম খুলি সব সংশয়ের পাশ ;
সতর্ক বিচারে এবে আঁখি মেলি দেখি—
যায় দিন—অন্ধকার নাহি হ'ল নাশ।

২৭

এ ধরা যে ছিল মোর ক্ষণিকের বাস—
বালাই বিপদ দিলে—পুরাল না আশ,
খুলে নাই একটিও সংশয়ের পাশ,—
মরিতেছি প্রাণে মোর সহস্র হুতাশ।

২৮

—পাপে বন্দী আমি প্রভু—দয়া কোথা তব ?
আঁধার হৃদয়ে মোর—আলো কোথা তব ?
কর্ম্মবলে লভি যদি স্বরগের দ্বার
উহা ত মজুরি মোর—দান কোথা তব ?

২৯

তোমারই কৃপার পরে আশা রাখি যত—
অনুতাপে যাবেনাক পাপ শত শত—
তোমার কৃপায় হবে—অকৃত যা' কৃত
—কৃত যাহা হবে তাহা অকৃতের মত।

৩০

ভাল কর নাই—মন্দ করিয়াছ শত—
বিভুকৃপা পরে কিন্তু আশা রাখ যত,
মিথ্যা আশা অকৃত যা' নাহি হবে কৃত
—কৃত যাহা নাহি হবে অকৃতের মত।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র ও ভবনাথের মাষ্টারের সহিত মিলন।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা করেন। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন্ তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্রি দিন ভাবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ; চক্ষু দুটি সাতিশয় উজ্জ্বল।

ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখো, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

মাহুত নারায়ণ।

নরেন্দ্র। আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) নারে, অতো দূর নয়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত্‌ থাকতে হয়, বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন। তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করবে।

একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাট আনতে বনের মধ্যে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো 'কে কোথায় আছ পালাও,—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সব্বাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে জানে যে, হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল; আর নমস্কার করে স্তব স্তুতি কর্‌তে লাগলো। এ দিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলচে, 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কেন হাতী আসছে শুনেও চলে গেলে না? সে বল্লে, গুরুদেব যে আমায় বলে দিছলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আস্‌ছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লেন, যে হাতী নারায়ণ আস্‌ছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত্‌-নারায়ণের কথা শুনতে হয়।

শাস্ত্রে আছে আপো নারায়ণঃ—জল নারায়ণ, কিন্তু কোনও জল ঠাকুর-

সেবায় চলে, আবার কোন জলে আঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন; কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাথামাখি চলে না। কাহারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কাহারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকদের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হলে কি চুপ করে থাকা উচিত?

গৃহস্থ ও তমোগুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

এক মাঠে রাখালরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। এক দিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়! ও দিক দিয়ে যাবেন না। ও দিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বল্লেন, বাবা তা হউক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লেন, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা করে করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব, এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না। এই বলে সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন। গুরু বল্লেন, এই মন্ত্র জপ করো, আর কাহারও হিংসা করো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্লেন, আমি আবার আসবো।

এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ড্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন এক জন রাখাল তার কাছে গিয়ে লেজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে

সাপটাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। রাখালরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি-কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ হয়ে গিছল। নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিনের পর যখন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চরতে আসতো। রাখালদের ভয়ে দিনের বেলায় আসত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর জীবহিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

প্রায় এক বৎসরের পর ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলেন। এসেই সাপের সন্ধান করলেন। রাখালেরা বল্লে, সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হলো না। তিনি জানেন, ও যে মন্ত্র নিয়েছে তাহা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তাঁর দেওয়া নাম ধরে, ডাকতে লাগলেন। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো, ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা কর-লেন, তুই কেমন আছিস? সে বল্লে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী বল্লেন, তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? সাপ বল্লে, ঠাকুর! আপনি আদেশ করেছেন,—কাহারও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি। ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই, সে একেবারেই ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দেখ। সাপটার তখন মনে পড়লো যে রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে বল্লে, ঠাকুর এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তা তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা। আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করবো না তা তারা কেমন করে জানবে? ব্রহ্মচারী বল্লেন, ছি! তুই এতো বোকা, তুই আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি তোকে কামড়াইতেই বারণ করেছি, তোকে তো ফোঁস করতে বারণ করি নাই; তুই ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?

তাই বলছি, দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে ; কিন্তু তাদের গায়ে বিষ ঢালিতে নাই, তাদের উল্টে অনিষ্ট করতে নাই।

ভিন্ন প্রকৃতি।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা, এই সব আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভালও আছে ; মন্দও আছে। বাঘের মত হিংস্র জানোয়ারও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন গাছও আছে, আবার বিষ ফল হয় এমন গাছও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে, সাধু আছে আবার অসাধুও আছে, সংসারী জীবও আছে আবার ভক্তও আছে।

Are all men equal ?

জীব চারি প্রকার ;—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। নিত্যজীব—যেমন নারদাদি। এঁরা সংসারে থাকেন, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না।

মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ নন—যেমন সাধু মহাত্মারা ; যাঁদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যাঁরা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করেন।

যেমন জাল ফেলা হয়েচে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে ; এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাউ্ ধপাউ্ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতর গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে "আর

কোন ভয় নাই, আর আমরা বেশ আছি।" কিন্তু জানে না যে জেলে হড়্ হড়্ করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

সংসারী লোক।

বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে—হাত পা বাঁধা—আবার মনে করে যে ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে থাকবে; কিন্তু জানে না যে এতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তখন তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জ্বললে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এ দিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ করিল।

একজন ভক্ত। মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করতে হয়, আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয় 'আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।'

বিশ্বাসের বল।

বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল! তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।

বিভীষণ একটী কাগজে রাম নাম লিখে ঐ কাগজটী, একটী লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বল্লেন, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের ওপর দিয়ে চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ'ল যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দ্যাখে। খুলে দেখে যে কেবল

রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি! শুধু রাম নাম একটি লেখা রয়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে— গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে সে সব ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

মহাপাতকও নামের মাহাত্ম্য।

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন,—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দিনে, না ডাকে কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

(নরেন্দ্র)

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের সম্বোধন করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্লেন—

এই ছেলেটিকে দেখছ এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে যেন জুজুটি। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন আর এক মূর্ত্তি, এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উচ্চ যে অনেকদিন থেকে ডিম পড়্‌তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখ্‌তে পায় যে সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) দ্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে পড়া শুনায় সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ করে কেটে দিতে লাগল। (মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজিতে কি কোন তর্কের বই আছে?

মাষ্টার। হাঁ ইংরাজিতে Logic (ন্যায়শাস্ত্র) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন—

"এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—

সব লোক মরে যাবে।
পণ্ডিতেরা মানুষ।
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে॥

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান; যেমন,—

এ কাকটা কালো;
ও কাকটা কালো;
(আবার) যত কাক দেখছি সবই কালো;
অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে; কেন না, হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে শাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দৃষ্টান্ত,—

এ মানুষটীর বত্রিশ দাঁত আছে।
ও মানুষটীর বত্রিশ দাঁত।
(আবার) যে কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে।

অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে। এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রে আছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজে আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

নরোত্তমের 'রাধিকার মানভঙ্গ'।*

বাঙ্গালীর বৈষ্ণবসাহিত্য এক অপূর্ব্ব পদার্থ। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গ-সাহিত্য অতিশয় প্রভাবান্বিত। ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের সংযোগ ঘটিলে মিলনটা কেমন সুন্দর ও মনোজ্ঞ হয়, বঙ্গসাহিত্যক্রমের প্রধান শাখা বৈষ্ণব সাহিত্য তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের স্থল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতিসোপানে অধিরোহণ করিয়াছে, বঙ্গভাষার সৃষ্টি অবধি সেরূপ গতি আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবেই বৈষ্ণবধর্ম্মের নবজীবন-সঞ্চার হয়। ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ সাম্প্রদায়িক কলহে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বঙ্গদেশ ভাসিয়া যাইতেছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়েই দেশ যেন নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম নিরতিশয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রবণ বলিয়া প্রধানতঃ ইহার সেবকেরা ভাষাসূত্রে ভক্তির পুষ্পমাল্য রচনা করিয়া ভগবচ্চরণে উপহার দিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। এই সঙ্কীর্ত্তনপ্রবণতাহেতুই বঙ্গ সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদিগের এত প্রাবল্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্য এত দূর প্রসারী। বঙ্গীয় কাব্যকাননের কলকণ্ঠ কোকিল চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি একদিন যে মধুর সঙ্গীতলহরী তুলিয়া বঙ্গ-দেশ মাতাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী বহুতর কবিকণ্ঠে বহুদিন ধরিয়া সেই মধুর তান ধ্বনিত হইয়া আজ বৈষ্ণবধর্ম্মের জড়তাপ্রাপ্তির সঙ্গে নীরব নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রণোদনে গৌড়জনের হৃদয়ে যে উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সেই অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে! ইহার সম্মোহনশক্তিতে বঙ্গসমাজের ধমনীতে ধমনীতে ভগবদ্ভক্তির যে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ স্ফুরিত হইয়াছিল, আজ তাহা চিরদিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত, পরিপুষ্ট আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্য অদ্যাপি সাহিত্যরাজ্যের গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে সমারূঢ় আছে; ইহার প্রভাবে বঙ্গসমাজদেহে যে প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছিল,—অধুনা-

---

* এই প্রবন্ধের সঙ্কলনে আমি মাননীয় সুধী শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থ হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।—লেখক।

কঠিনীভূত সেই হৃদয়ে সেই কোমল মধুর কমনীয় প্রসূননিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া সুবাসে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার কার্য্য অদ্যাপি সমভাবেই আছে, সেই প্রসূনরাশিও বিলুপ্ত হয় নাই, কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। বৈষ্ণব সাহিত্যই বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ের নিখুঁত ফটো। জগতের যে কোন ভাষার সাহিত্যের সহিত আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্য প্রতি-যোগিতা করিতে সমর্থ। কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে ইহা চিরদিন অতুল আনন্দ প্রদান করিবে, সে বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখনকার প্রেমকবিতা বৈষ্ণব প্রেমকবিতার স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; সেরূপ মধুর কবিতা এখন আর লিখিত হইবে না। সেই সুখস্বপ্নময় চিত্রলেখা বিজ্ঞা-নের শীতলনীহারজড়িত হইয়া এখন চিরকালের মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ফুল্ল ফুলতরু পল্লবগুচ্ছে মণ্ডিত পৃথিবী পূর্ব্বে যেরূপ সুন্দর ছিল, এখনও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর আছে, কিন্তু হায়! আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি!

বৈষ্ণব যুগের সাহিত্য অতি বিস্তীর্ণ। তদুপরি, ইহার অন্তর্গত অনেক পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় কালে আরও কত কাব্যাদি লোকলোচনের গোচরীভূত হইবে, কে বলিতে পারে? পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণের লীলারসের যে অমৃতনিঃস্যন্দিনী ধারা ছুটিয়া-ছিল, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য কত লোক মধুর ভাবাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছিল। কত বিধর্ম্মী মুসলমান পর্য্যন্ত এই প্রেমা-বেশে মত্ত হইয়া অনলে পতঙ্গবৎ রাধাকৃষ্ণপ্রেমানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। (১) এইরূপে কত মহাত্মাই জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং আমাদের জন্যও কত অফুরন্ত মধু আহরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কাষ্ঠচাপে আবদ্ধ, জীর্ণ, কীটদংশনবিব্রত কাগজের অন্তরাল হইতে উদ্ধার করিয়া অদ্য আমরা সেইরূপ এক মহাত্মার কীর্ত্তি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আমাদের সমালোচ্য কীর্ত্তিমাল্যের নাম "রাধিকার মানভঙ্গ"। বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন কাব্যের মত ইহাতে লেখকের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বা

---

(১) মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ তাহার প্রমাণ।

সমাপ্তিকাল কিছুই নাই ; কেবল গ্রন্থশেষে একটিমাত্র স্থানে নিম্নের ভণিতা-টুকু আছে ;—

জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন,
তাহা বিনা অন্য নাহি ভাব।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, নরোত্তম লইল শরণ ॥

কবি এই নামটুকুমাত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণকে বিষম সমস্যায় ফেলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মধুমক্ষিকা সংবৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া মধু আহরণ করে, নিষ্ঠুর মানব তাহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহা আপনার উদরসাৎ করে। তেমনি, এই কবিও আমাদের জন্য অমৃতায়মান কাব্যমধু রাখিয়া দিয়া কোথায় কোন অমরাতে যে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে ?

সম্ভবতঃ এই নরোত্তম রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সমসাময়িক। মৃত ব্যক্তির শরণপ্রার্থনা সাহিত্যজগতে বিরল না হইলেও, সাধারণ প্রচলিত রীতি নহে। রূপ সনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত পার্শ্বচর।

ইঁহারা কর্ণাটাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত। সনাতন গোস্বামীর আবির্ভাবকাল ১৪৮৮ খৃঃ অঃ—১৫৫৮ খৃঃ অঃ ও রূপ গোস্বামীর আবির্ভাবকাল ১৪৮৯ খৃঃ অঃ—১৫৬৩ খৃঃ অঃ, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বোধ হয়, আমাদের কবি নরোত্তমও ইঁহাদের সমসাময়িক।

সকলেই জানেন যে, বৈষ্ণবজগতে নরোত্তম ঠাকুরাখ্য এক প্রেমবীর আছেন। ইনি বৈষ্ণবসমাজের অশেষ ভক্তির পাত্র ও চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় অবতার বলিয়া প্রপূজিত। ইনি কায়স্থ হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহার উপাধি 'দাস' ছিল ; বৈষ্ণবসমাজে তাহা লুপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ্য "ঠাকুর" উপাধি প্রচারিত হইয়াছে। ইনি পদ্মা নদীর তীরস্থ গোপালপুরের রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। রাজপুত্র হইয়াও ইনি বিষয়লালসা পরিহার করিয়া সংসারবিরাগী হয়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষদত্ত তাঁহার স্থলে রাজা হয়েন। এই সন্তোষদত্ত খেতুরীতে ষড়বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে মহা সমারোহসহকারে যে উৎসব করেন, তাহা ১৫০৪ অব্দে ঘটে। 'নরোত্তমবিলাস' নামে ইঁহার এক জীবনচরিত আছে। 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা,' 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,' 'হাটপত্তন' ও 'প্রার্থনা' প্রভৃতি

গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রেমবীরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রূপ-সনাতনের জীবদ্দশাতেই ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রূপ সনাতন অপেক্ষা তিনি উত্তরজীবী হইতে পারেন।

ঠাকুর নরোত্তমের উল্লিখিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতেও সমালোচ্য কাব্যের ন্যায় রূপ সনাতনের শরণপ্রার্থনা আছে, দেখা যায়। কেবল প্রার্থনা নয়, দুই কাব্যের ভাষাও তৎস্থলে প্রায় একই। 'চন্দ্রিকা'র সেই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
সে রতন মোর গলের হার।

এবং— শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।

'রাধিকার মানভঙ্গের' ও 'চন্দ্রিকার' এই দুই স্থল দৃষ্টিমাত্রই এক-লেখনীসম্ভূত বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। (২) ইহা ও গ্রন্থের ভাষা, কবিত্ব-সৌন্দর্য্য, পরিপক্ক লেখনীর নিপুণতা প্রভৃতি দেখিয়া আমরা কবি নরোত্তমকে ঠাকুর নরোত্তম হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।

গ্রন্থের নামেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ এক দিন চন্দ্রাবলীর বাড়ীতে রজনীযাপন করিয়াছিলেন। এই দোষেই শ্রীমতী মানিনী রাধিকা সুন্দরী মান করিয়া বসিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সাগ্রহ কাতর প্রার্থনা, ললিতাবিশখাদির উপরোধ অনুরোধে কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে যোগিবেশে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট মান ভিক্ষা চাহিয়া লন। এই দুই কথাতেই গ্রন্থের সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, এবং সম্ভবতঃ ইহাই এই ধরণের একমাত্র গ্রন্থ। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে নানাবিধ রাগরাগিণীসংবলিত নানাবিধ ছন্দ দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ এক নূতন ছন্দে লিখিত হইয়াছে, দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থশেষে দুইটি সঙ্গীত ভিন্ন আর কোথাও কোন রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখি নাই। প্রাচীন কবিকুলের স্বভাবসিদ্ধ যে দেববন্দনা গ্রন্থারম্ভে থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই

(২) 'মানভঙ্গের' ভণিতা দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও আমাদের মতের পোষকতা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

নাই। কবি কেবল 'নমো গণেশায়' এই দুই কথাতেই দেবস্তুতিসমাপনানন্তর আপন বক্তব্য ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ছন্দের নূতনত্ব সম্বন্ধে অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কেবল বর্ণবিন্যাস শুদ্ধ করিয়া অবিকল উদ্ধৃত করিব।

মান করিয়া রাধে বসেছে বিরলে।
ধড়া চূড়া বান্ধি কৃষ্ণ গেলা হেন কালে॥
সমুখে দাঁড়াইল কৃষ্ণ পূরিয়া মুরারি।
আড় নয়ানে গোরী শ্যাম অঙ্গ নেহারি॥ ধুয়া॥
হেদে গো ললিতা সখী।
কাল রূপ না হেরা আঁখি॥১॥
শুন গো ললিতা সখী বলিয়ে স্বরূপ।
আর না হেরিব আমি কালা কানু রূপ॥
কালা বিষে জ্বর জ্বর হইল মোর তনু।
আমার আঙ্গিন্যা হইতে যাইতে বল কানু॥ধু।
না হেরিব চিকন কালা।
অন্তরে বিষের জ্বালা॥২॥
কাল সঙ্গে প্রেম আমি না করিব আর।
আপ্ত জ্ঞান অন্তরে নাহিক যাহার॥
পরের বেদনা যেই কিছুই না জানে।
তার সঙ্গে প্রেম করি মরি কি কারণে॥ধু।
কাল অঙ্গ অহি হবে।
উলটিয়া মোরে খাবে॥৩॥
কালিয়া কবরী রাধে ঝাপিয়া বসনে।
কাল কাদম্বিনী পানে না চাহে নয়ানে॥
পিক অলি দুই ছিল রাধার সমুখে।
উড়াইয়া দিল দুই আপনার দুখে॥ধু।
যারে নাগর আন ভিতে।
যথা তোমার লএ চিতে॥৪॥
বুঝিয়া রাধার মন দেব হৃষীকেশ।
বিচিত্র করিয়া হরি বানাইল বেশ॥
অনন্ত প্রভুর মায়া কে বুঝিতে পারে।
শতো শতো কৃষ্ণ হইয়া চারিদিগে ফিরে॥ধু।
যে দিকে হেরয়ে গোরী।
সেই দিগেতে দেখি হরি॥৫॥

সমগ্র গ্রন্থখানি এইরূপ একই ছন্দে লিখিত ও এইরূপ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট। উদ্ধৃত শ্লোক গুলিতে যেমন প্রতি চারি চরণের শেষে 'ধুয়া' শব্দটি আছে, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সেইরূপ পরিদৃষ্ট হয়। ক্বচিৎ দুই এক স্থলে ছয় চরণের বা দুই চরণের পরও এই 'ধুয়ার' নির্দ্দেশ আছে। ইহা কবির ঈপ্সিত কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না; লিপিকরের প্রমাদ ও অনবধানতাই এইরূপ ব্যতিক্রমের জনয়িতা। এইরূপ সংখ্যানির্দ্দিষ্ট ২২৩টি শ্লোকে এই ছন্দের অবসান হইয়াছে। ইহার পর মঙ্গল রাগে গেয় দুইটি সুন্দর সঙ্গীতে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

এই সঙ্গীতের প্রথমটিতেই পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতাটি আছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীআবদুল করিম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান। "কৃতঘ্ন" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদারের একটি ক্ষুদ্র গল্প। বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথকৃষ্ণ দেবের "লুসার্ণ ও দার্জ্জিলিং" একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত। সুইজর্লণ্ডের লুসার্ন্ ও ভারতের দার্জ্জিলিঙ্গের তুলনায় সমালোচনা। মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর "নৈষধচরিত" প্রবন্ধে নৈষধকার শ্রীহর্ষের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নৈষধচরিত কাব্যের কোন প্রসঙ্গ দেখিলাম না। 'প্রবন্ধ-কোষ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে যে গল্প পাওয়া যায়, লেখকের মতে, "উক্ত গল্পটির কোন্ কোন স্থান কল্পনাদুষ্ট হইলেও উহা হইতে সার উদ্ধার করা যাইতে পারে।" এবং সেই সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীহর্ষের কাহিনী সঙ্কলিত করিয়াছেন। "নষ্টচন্দ্র" নামক নক্সাটি শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা; মনোজ্ঞ হইয়াছে। "বৈদিক ও পৌরাণিক যুগসন্ধি" প্রবন্ধে অনেক কথা জানা যায়, কিন্তু সকল মত গ্রহণ করা যায় না। এ স্থলে মতামতের বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। "আসামী স্ত্রীলোকের বস্ত্রবয়ন" প্রবন্ধটি মন্দ নহে। মাসিকপত্র অপেক্ষা সংবাদপত্রের অধিক উপযোগী। "বীরভদ্র মর্দ্দরাজ" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহের রচিত উৎকলজীবনের আর একটি সুচিত্রিত ছবি।

প্রদীপ। অগ্রহায়ণ। "নিত্যকৃষ্ণ বসু" নামধেয় ক্ষুদ্র সনেটটি স্বর্গীয় কবির অতি মনোজ্ঞ তর্পণ। এই ক্ষুদ্র কবিতায় দুই একটি রেখায় অক্ষয় বাবু স্বর্গীয় কবির চরিত্রটি উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন। আমরা সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম;—

"হে নিত্য, অনিত্য সব—সকলি দুদিন!
সেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদুগর্ব্বে চরিত্র সুন্দর,
সারল্যে সরল অতি, কর্ত্তব্যে প্রবীণ।
ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীন,
সংসারের সুখে দুঃখে সদা অকাতর,
জীবন-পাবন যোগে মগ্ন নিরন্তর,
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।

হে সুহৃদ্, গেলে কোন্ মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে ল'য়ে নব জাগরণ!
মাখায়ে দু'খানি পাখা পরাগে শিশিরে
বাঁধিয়া নয়নে স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ।
বাণীর চরণ-পদ্ম ঘিরে ঘিরে ঘিরে
করিতে জীবন-গীত পূর্ণ সমাপন।"

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "পাণ্ডুয়ার মেলা" একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। "রস্কিন—ললিতকলা ও রচনাশিল্প" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রসঙ্গক্রমে রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। প্রিয়বাবুর এই রচনাটি পাঠ করিলে নবীন লেখকগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রস্কিনের style সম্বন্ধে প্রিয়বাবু বলেন,—"রস্কিনের প্রতিপত্তি এই style লইয়া। ইহাতেই তাঁহার গৌরব এবং সাহিত্যকলায় শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। রস্কিনের styleই কলাবিশেষ। এই style কথাটির ঠিক প্রতিবাক্য আমাদের বাঙ্গালায় নাই। রচনা বলিলে composition বুঝায়। এ দিকে আমরা বলিয়া থাকি, অমুক লেখকের ভাষাটি বেশ, তখন আমরা ভাষা শব্দটি style অর্থেই অনেকটা ব্যবহার করি। কিন্তু ভাষা শব্দের অপর একটি অর্থ আছে—language। ইংরাজীতেও কখন কখন language, style অর্থেই ব্যবহার হয়, তথাপি style কথাটির ইংরাজীতে একটি স্বতন্ত্র এবং বিশেষ অর্থ আছে। বাঙ্গালায় তদনুরূপ বিশেষার্থবোধক শব্দ নাই। নামাবধারণে যখন গোল, তখন ভাবাবধারণে একটু গোল থাকিবারই কথা। * * * মনোগত ভাব সকল যখন অর্থগর্ভ শব্দসঙ্কেতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাই, তখন আমরা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকাশের প্রাঞ্জলতার জন্য হৃদ্গত ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন—অর্থাৎ বক্তব্য কথা তোমার হৃদয়মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হওয়া চাই। যাহা তোমার মনোমধ্যে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ—যাহার পরিষ্কার ধারণা তোমার নিজেরই নাই—তাহার স্পষ্ট প্রকাশ অসম্ভব। ভাব পরিস্ফুট হইলে তাহার একটি ক্রম থাকে; শব্দক্রম যখন সেই ভাবক্রমের অনুবর্ত্তী হয়, তখনই প্রকাশের প্রাঞ্জলতা লব্ধ হয়, অর্থাৎ সমীচীন ভাষার উৎপত্তি হয়। কোন্ ভাবার্থক শব্দ কাহার পর বসিবে, তাহার একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, এবং সেই নিয়ম অনুসারেই ভাষার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ সেই সকল নিয়ম, ভাষালোচনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া, লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নিয়ম গড়েন না—অনুসন্ধানে তাহাদের আবিষ্কার করেন মাত্র। এই সকল নিয়মই ভাবপ্রকাশের মৌলিক সহায়, এবং তদনুবর্ত্তী ভাষাই নির্দ্দোষ এবং প্রাঞ্জল। ইহাই রচনার প্রথম স্তর। কিন্তু ভাব নানাজাতীয়। যেখানে রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, সেখানে শব্দচয়ন, ছন্দ, ঝঙ্কার প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের প্রয়োজন। কোন সত্য বা তথ্যের পরিষ্কার এবং যথাযথ প্রকটনে আবার অন্যবিধ শব্দনির্ব্বাচন এবং বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন। রচনার দ্বিতীয় স্তর এই। কিন্তু style এই দুটি হইতে আরও কিছু, অর্থাৎ styleএ এই দুইটিও আছে, এবং এই দুটি হইতে অতিরিক্ত আর একটি পদার্থ আছে। এমন অনেক রচনা আছে যাহা বেশ প্রাঞ্জল—শব্দনির্ব্বাচন ও বাক্যবিন্যাসে যাহা নির্দ্দোষ—রসোদ্ভাবনে যাহার অমোঘ সন্ধান—কিন্তু যাহাকে style বলে তাহার কিছুই তাহাতে নাই। এই যে অতিরিক্ত পদার্থ, উহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি মনোহর। তাহাতেই লেখকের বিশেষত্ব। সেটি লেখকের নিজের বলিবার প্রথা—তাঁহার ভঙ্গী। এই বিশেষত্ব—লেখকের এই ভঙ্গী—ইউরোপীয় সাহিত্যে style বলিয়া অভিহিত। ইহা শিখিবার বা বাহির হইতে অর্জ্জন করিবার বিষয় নয়—স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যাহার আছে তাহার রচনাতে প্রকাশ পাইবেই। কলাব্যবসায়ীর গৌরব যেমন সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ বিকাশসাধনে, তেমনই লেখকের গৌরব—রচনায়, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব বা ভঙ্গীপ্রকাশে।

"কথাটি আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে, উপমান বিষয়টির আর একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এবং যদিও উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ নয়, সাহিত্যসমালোচনায় উহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলা-ব্যবসায়ীর কার্য্য সৌন্দর্য্য লইয়া—অর্থাৎ প্রত্যেক কলা-ব্যবসায়ীকে তাঁহার স্বকীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বা সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখাইতে হইবে। তাহা না পারিলে কলা-জগতে তাহার স্থান নাই। কবির কথাই ধরা যাক্। যিনি ভাষা, ছন্দ, মিল ও ঝঙ্কার প্রভৃতি উপাদানসংযোগে সৌন্দর্য্যরচনা করিয়া পাঠকের হৃদয়ে রস-তরঙ্গ তুলিতে অক্ষম, তিনি কবি নন। কিন্তু প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে, এই সৌন্দর্য্যবিকাশ এবং রসোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের বিশেষত্ব দেখাইতে হইবে—অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্যরচনার ভিতর এমন একটি সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য থাকিবে, যাহা অপর কবিদিগের সৌন্দর্য্যরচনা হইতে তাহাকে বিভিন্ন এবং পৃথক করিয়া তুলিবে। এই বৈলক্ষণ্যই কবির স্বকীয় অভিব্যক্তি।" * * *

যে বিচিত্র ভাষায় লেখক রস্কিনের ভাষার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গীতিকাব্যের ন্যায় ঝঙ্কারময়ী, অথচ দর্পণের ন্যায় সুনির্ম্মল,—রস্কিনের ভাষার ছবি, রচনাভঙ্গীর সৌন্দর্য্য তাহাতে কেমন অবলীলায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আমরা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না;—

"বাস্তবিক সে ভাষা—সে গদ্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা অসাধ্য। যেমন কোন সুদূরসাগর-সঙ্গম-বাহিনী স্রোতস্বিনী তুষারমণ্ডিত স্বীয় পর্ব্বত-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লীলাঙ্কিত গতিতে, ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া, উদ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়—সে নদী যেমন কখন গিরি-সঙ্কট-মধ্যগতা—প্রখর—ফেনিল—আয়সবর্ণা; কখন বীচি-বিক্ষোভসংক্ষুব্ধা—কখন বা অসীমকান্তারমধ্যগতা—নিঃশব্দবাহিনী—কখন উপল-আস্তরণমধ্যে বিস্তীর্ণদেহা—কখন ছায়া-বহুল-পত্রমর্ম্মরসঙ্কুল-বিটপশ্রেণী-পাদদেশে কলনাদিনী—আবার কখন তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণা—সেইরূপ রস্কিনের গদ্যরচনা বিচিত্রকলাসৌষ্ঠবে প্রস্ফুটশ্রী, বিবিধরসে আপ্লুতা। সে রচনা কোথাও সৌন্দর্য্যোপভোগ-পুলকে রোমাঞ্চিতদেহা, কোথাও ঘৃণায় কুঞ্চিতাননা, কখন বা আশীর্ব্বাদে কুসুমিতকলেবরা, কখন বা অভিশাপে অনলময়ী, কোথাও বা হর্ষে গদ্‌গদভাষিণী, কোথাও ক্রোধে মেঘ-মন্দ্রিতা—ফলতঃ, সর্ব্বত্র প্রতিভার জ্বালাময় ফূৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতনা, জীবনের হিল্লোল ও কল্লোলে স্পন্দমানা, এবং মানব-হৃদয়ের শোণিমায় রক্তিম-বর্ণা।"

শোক-সংবাদ।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, সুলেখক ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. মহাশয় গত অগ্রহায়ণ মাসে অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হইল। লোকান্তরে তিনি শান্তিলাভ করুন।

এই সংখ্যায় তাঁহার একখানি চিত্র প্রকাশিত হইল।



শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

KUNTALINE PRESS.

আকাশ করে গো দান তরুর শাখায়
কলকণ্ঠ সুমধুর নিজ পাখীটিরে,
উষা আসি' করে দান কুসুমে পাতায়
শীতল শিশিরবিন্দু অতি ধীরে ধীরে।

সাগর-তরঙ্গ যবে ব্যথিত-হৃদয়
আসে গো তটের কাছে লইতে বিরাম,
আসিয়া অমনি আর কিছু নাহি কয়
—প্রথমেই করে তারে চুম্বন-দান।

আমি গো দিতেছি তাই তোমারে এখন
নোয়াইয়া দেহ মম শ্রীঅঙ্গে তোমার
সকলের সেরা মোর সেই সার ধন
আছে যা সম্বল এক নিকটে আমার :—

লও তবে লও সেই পরাণের কথা
যে পরাণ অবসন্ন বিষাদের ভারে
—শিশিরের বিন্দুকণা দূর্ব্বাদলে যথা—
আসিয়াছে তব কাছে অশ্রুর আকারে।

লহ মম সুখ সাধ বাসনা সকল
প্রেমের মূরতি তুমি ওগো প্রিয়তমে!
লহ মোর ছায়া কিংবা লহ গো অনল
আছে যাহা ব্যাপি মম সমস্ত জীবনে।

লহ গো সমস্ত মম মদির উল্লাস
পরিশুদ্ধ সুবিমল গ্লানি-বিরহিত,
লহ গো সমস্ত মম আদর-উচ্ছ্বাস
গানের ভাষায় যাহা হয় উচ্ছ্বসিত।

লহ এ কল্পনা ;—মম জীবন-দোলায়
দুলিয়া দুলিয়া যে গো মগন স্বপনে,

—নয়নের জলে সে যে শয়ন ভিজায়,
কাঁদো তুমি যবে, কাঁদে সেও গো ললনে!

লহ মম অন্তরাত্মা—যে গো অনিবার
নিরুদ্দেশে ভ্রমে সদা হেথায় হোথায়,
আর কোন ধ্রুবতারা নাহিক তাহার
—তার ধ্রুবতারা তব আঁখির তারায়।

লহ গো হৃদয় মম—স্বর্গীয় বিভব,
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা ওগো ত্রিলোক-সুন্দরি!
না থাকে এ হৃদে কিছু—শূন্য হয় সব
প্রেম যদি তাহা হ'তে লয় কেহ হরি'।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার বিরহ।

১

পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দুই দিন দেওঘরে বাস করিয়া আমি ও আমার বাল্যবন্ধু অমরনাথ বৈদ্যনাথ জংশনে পশ্চিমের গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিলাম। একে শীত কালের রাত্রি, তাহার উপর আবার পাহাড়ে শীত, অলষ্টারের পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া সিগারেটের ধূমে স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। শীতে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া থাকা বড় কষ্টকর, তাই প্রণয়ীর প্রিয়সমাগমের ন্যায় ট্রেণের শুভাগমনের বিলম্বে মুহূর্ত্তে মন্বন্তর জ্ঞান হইতেছিল; এমন সময়ে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় বিশ মিনিট পরে, নির্নিমেষ রক্ত লোচনত্রয়ে সম্মুখস্থ লৌহবর্ত্ম উদ্ভাসিত ও বাষ্পশ্বসিতে চারি দিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে চিরবাঞ্ছিত লৌহরথ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরাও কুলীর মাথায় পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া মধ্যশ্রেণীর একটি গাড়ীতে আশ্রয় লইলাম।

মনে করিয়াছিলাম, পশ্চিমের গাড়ীতে খুব জনতা হইবে। হয় ত সমস্ত রাত্রি বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া কাটাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, একজনমাত্র হিন্দুস্থানী মাথায় একটা অতি বৃহৎ পাগড়ী বাঁধিয়া একখানা মোটা শীতবস্ত্রে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া বসিয়া আছেন। গাত্রবস্ত্রের নীচে দিয়া তাঁহার তুলাভরা রঙ্গিন ছিটের পায়জামায় মণ্ডিত একখানি শ্রীচরণ দৃষ্ট হইতেছিল। আমার তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিবার ইচ্ছা ছিল না। কারণ, আমাদের উপবেশনের, এমন কি, শয়নের যথেষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু অমর যদিও জানিত যে, বৈদ্যনাথে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, তথাপি গাড়ীর দ্বার খুলিবামাত্র শশব্যস্তে একবার আমাকে উঠিতে অনুরোধ, একবার কুলীকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান, একবার পোর্টম্যাণ্টো বেঞ্চির নীচে আবার পরক্ষণে বেঞ্চির উপর ও আবার তৎক্ষণাৎ বেঞ্চির নীচে রক্ষা করিতে গিয়া, মহা কোলাহলের সৃষ্টি করিল। বলা বাহুল্য, আমাদের কক্ষের সেই পাগড়ীর বাহন পশ্চিমে ভদ্রলোকটি বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে বিরক্তমনে অমরের এই উৎপাত দেখিতেছিলেন। তিনি হয় ত সে রাত্রের মত নিদ্রার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে করিয়া উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু গাড়ী প্লাটফরম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সেই পাগড়ীমণ্ডিত মস্তকটি নিদ্রাভরে বাতায়নের কাচে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল।

সেদিন মাঘী পুর্ণিমা। আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, গাড়ীতে শয়নের স্থান পাইব না; তদনুসারে উভয়ের বিছানা বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম। পূর্ণিমা-নিশীথে জ্যোৎস্নালোকে পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিবার জন্ত আমরা দুই বন্ধুতে দুইটি কোণে আশ্রয় লইয়া মুখোমুখী হইয়া বসিলাম; বাতায়নের কাচমাত্র তুলিয়া দিলাম। কাচের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক তির্য্যক-ভাবে আমাদের কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। অমর হারমোনিয়ম লইয়া মৃদুগ্রামে বাজাইতে আরম্ভ করিল ও বলিল, 'সুরেশ! একটা গান গাও।'

এখন আমার নিজের পরিচয়দান আবশ্যক। আমি শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন আসন্ন এম্. এ.; অর্থাৎ, এম্. এ. পরীক্ষা দিয়াছি, কিন্তু পরীক্ষার খবর তখনও বাহির হয় নাই। উপাধি "মিত্র" বলিয়াছি বলিয়া যেন কায়স্থ মনে করিবেন না; আমি ব্রাহ্ম। আমার পিতা স্বকৃতভঙ্গ ব্রাহ্ম; আমার ভগ্নীদের ব্রাহ্মমতেই বিবাহ হইয়াছিল; পিতা এখন পরলোকে। সংসারে মাতা, দুই ভগ্নী, একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বয়ং আমি। কলিকাতায়

দুইখানি বাড়ী আছে; তাহারই ভাড়ায় এক প্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। এম্‌. এ. পাস হইলে বিলাত যাইব কি কোনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। ভায়া শ্রীমান সুরথচন্দ্র এই বৎসর এফ্‌. এ. দিবেন।

বন্ধু-মহলে সুকণ্ঠ বলিয়া আমার একটু পশার আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষভাগে "শিক্ষিতের" অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া যাহা কিছু বিবেচিত হইত, আমাতে তাহার সকলই ছিল। বলিয়াছি, সুকণ্ঠ বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল; আমি হারমোনিয়ম্‌, পিয়ানো ও বাঁশী বাজাইতে পারিতাম। ফটোগ্রাফ তুলিতে বেশ দক্ষ ছিলাম, বাইসিকেলে হাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম, এবং ৩৫৲ টাকা দিয়া একটা ফনোগ্রাফও কিনিয়াছিলাম। 'বিকাশ' এবং 'হিল্লোল' পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে গদ্য পদ্য রচনা দিতাম; আমাদের ডিবেটিং ক্লবের প্রেসিডেণ্ট ছিলাম। ইহাতেও যদি পাঠকেরা আমার পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নাচার। আমার চেহারা না দেখিলে তাঁহারা আমাকে চিনিতে পারিবেন না; কিন্তু আশা আছে, কোনও অদূর ভবিষ্যতে 'ভুঁইফোড়' পত্রে আমার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইতে পারে! অমরের আর অন্য পরিচয় অনাবশ্যক; আমারই বন্ধু; জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং বি. এ. ফেল, এই প্রভেদ। সে উপবীত পরিত্যাগ না করিলেও ধর্ম্মবিশ্বাসে আমার অপেক্ষা অধিক অন্ধকারে ছিল না। তাহার পিতা হাইকোর্টের উকীল।

অমর হারমোনিয়মের একটা চাবি টিপিয়া সজোরে বেলো করিয়া বলিল, "সুরেশ! একটা গান গাও।"

আমি বলিলাম, "কি গাহিব?"

"যা ইচ্ছা তাই গাও; এমন পূর্ণিমা রাত; যা প্রাণ চায় তাই গাও—"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আরম্ভ করিলাম,

"আহা কিবা চাঁদনী রাতি হের লো সখি—"

দূরে তারকামণ্ডিত ম্লান নীল আকাশের কোলে নন্দনপাহাড় দেখা যাইতেছিল। নন্দনপাহাড়ের শিখরের সেই ভগ্ন গৃহ ও বৃক্ষটি পর্য্যন্ত তুষারশুভ্র কৌমুদীতে চিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এক এক বার যৌহবর্ম্মের পার্শ্বস্থ মৃত্তিকাস্তূপের অন্তরালে নন্দনপাহাড় ঢাকা পড়ে, আবার ক্ষণ পরে পূর্ব্ব আকাশের কোলে আষাঢ়ের অপরাহ্ণে পশ্চিমে মেঘের ন্যায় ভীমকান্ত মূর্ত্তিতে চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমি নন্দনপাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময়চিত্তে গাহিতেছি,

"আকাশ প্লাবিল ভাসিল রে বিমল চন্দ্রকরে।—"

কিন্তু আর গান হইল না। আমার সম্মুখে অমরের পশ্চাতে গাড়ীর লৌহ-গরাদের একখানি চাদর টাঙ্গান ছিল। বোধ করি কেহ সপরিবারে কোথাও যাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই চাদরের এক পার্শ্বে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিলাম, একখানি মুখ—শুভ্রজ্যোৎস্নালোকে প্রতিভাসিত মৃণালশুভ্র ললাট, তাহার উপর কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, কৃষ্ণতার খঞ্জননেত্র, আর আরক্ত-বিম্ববৎ অধরোষ্ঠ। আমার চক্ষু সুন্দরীর আয়ত লোচনে প্রতিবিম্বিত হইবামাত্র মুখখানি চাদরের অন্তরালে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য চকিতের ন্যায় আমার চক্ষে তাহার কটাক্ষ-বিদ্যুৎ বিদ্ধ হইল। গানের মাঝখানে অকস্মাৎ গান বন্ধ করিয়া অমরের দিকে চাহিলাম। অমর চক্ষু প্রায় মুদ্রিত করিয়া কোলের উপর হারমোনিয়ম রাখিয়া একমনে বাজাইতেছে। গান বন্ধ দেখিয়া, একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ করিলে যে?"

"গান মনে পড়িতেছে না, ভুলিয়া গিয়াছি।"

"সব সখি মিলি একতানে———"

"মনে হইয়াছে; অনেক দিন ও গানটা গাহি নাই—" আমি আবার গান ধরিলাম—অমরও আবার চক্ষু মুদিয়া হারমোনিয়ম ধরিল।

এমন সময়ে অমরের পশ্চাতের পর্দ্দাটা একটু দুলিয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র—হায়! দীনবন্ধু মিত্রের জলধরকে মনে পড়িল, "ভাবছি মালতী, এলেন কি না বিদ্যাভূষণ!"—পর্দ্দার অন্তরাল হইতে এক শুভ্রশ্মশ্রু, হৃষ্ট পুষ্ট, প্রশান্ত, চসমান্বিত মুখ আমার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল।

আমি গান বন্ধ করিয়া অপরাধীর ন্যায় একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "চীৎকার ক'রে আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত করেছি-ক্ষমা করুন—"

শুভ্রশ্মশ্রুর অধিকারী সহাস্যে বলিলেন, "আমরা আপনার গানে বড় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম; আপনার কি সুন্দর আওয়াজ! গান বন্ধ করিলেন কেন?"

"আপনাদের বিরক্তির ভয়ে—"

"বিলক্ষণ! সুমধুর সঙ্গীতে বিরক্তি?"

ভদ্রলোকের কথায় অমর একটু সসম্ভ্রমে ফিরিয়া বসিলে ভদ্রলোকটি

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা দুই জনে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছেন?" এইবার অমরের পালা; সে বলিল, "কখনও পশ্চিমে যাই নাই, তাই একবার দুই বন্ধুতে বিদেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি। মহাশয় কোথায় যাইবেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমার স্ত্রীর অসুখ, তাই সপরিবারে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য লক্ষ্ণৌ যাইতেছি। সেখানে আমার একটি বন্ধু আছেন, তাঁহার ওখানে ২।১ মাস থাকিবার ইচ্ছা আছে।"

ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইল। তিনি আমাদিগকে দুইটা ভাল চুরুট দিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সাক্ষাতে ধূমপান সঙ্গত বিবেচনা করিলাম না। তিনি ধূমপান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে ধূমপান না করাতে তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল। কেন জানি না, তাঁহার সন্তোষ-উৎপাদনে আমার কেমন একটু আন্তরিক ইচ্ছা হইল। পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার নাম হেমাঙ্গকুমার চক্রবর্ত্তী—পেন্সন-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

পরদিন প্রাতে আমরা মোগলসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ট্রেণ ত্যাগ করিয়া আউধ রোহিলখণ্ডের গাড়ীতে যাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। আমি ও অমর যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু তিনি একাই এক শত। তাঁহার সেই প্রাচীন শরীরে কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। তাঁহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া পত্নী, দুইটি কন্যা, এক জন দাসী, ৪।৫টা পোর্টম্যাণ্টো বিছানা ইত্যাদি লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে বোধ হয় দুই মিনিটও লাগিল না। আমাদের সহিত "শেকহ্যাণ্ড" করিয়া সহাস্য-আস্যে হেমাঙ্গ বাবু অপর প্লাটফরমে গমন করিলেন। আমি সাহস করিয়া সেই খঞ্জন-গঞ্জন-নয়নশালিনীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না। যখন তাঁহারা চলিয়া যান, তখন চাহিয়া দেখিলাম, হেমাঙ্গ বাবুর কন্যারা পাদুকা ও মোজা ব্যবহার করেন। আমরা আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলাম।

২

বৈশাখ মাসের শেষে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে একটা বিবাহ ছিল। বিবাহটি বেশ জমকাল গোছ। আমি বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলাম, এবং কন্যা-কর্ত্তার অনুরোধে গাহিতেছিলাম। আমাকে ও টেবিল হারমোনিয়মটিকে

ঘিরিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। আলোক, পুষ্পমালা, ছোট ছোট বালক বালিকা ও সমবেত জনতার একটা অস্পষ্ট আনন্দকোলাহলে বিবাহবাড়ী যেন আনন্দনিকেতন বলিয়া বোধ হইতেছিল। বরটি আমার বন্ধু; সুতরাং আমি বরযাত্রী।

আমার গান শেষ হইবামাত্র সকলে আমাকে,—অথবা আমার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীতরচয়িতাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় আমার পার্শ্বের জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া এক জন অকস্মাৎ সাদরে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"Hallo my young friend! How do you do?"

মুখ ফিরাইয়া দেখি, হেমাঙ্গ বাবু!

হেমাঙ্গ বাবুর সহিত অনেক কথা হইল। পারিবারিক কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম,তাঁহার পত্নী ভাল আছেন। এই বিবাহবাড়ীতেই পুত্র কন্যা সহ আসিয়াছেন। হেমাঙ্গ বাবু যখন পশ্চিমে যান, তখন তাঁহার পুত্রকে দেখি নাই;—আজ দেখিলাম। বেশ বিস্তৃতবক্ষ মাংসল সুন্দর তরুণ যুবা। হেমাঙ্গ বাবু বলিলেন, "আপনি এম্. এ. পাশ হইয়াছেন,গেজেটে নাম দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,আমি এম্. এ. পাশ হইয়াছি। এলাহাবাদে আমার এক মাসীমা থাকিতেন, তিনি হিন্দু, এবং বিধবা। তাঁহার অনেক টাকার সম্পত্তি; বোধ হয়, বাৎসরিক ২০।২৫ হাজার টাকা আয়। মাসীমার পুত্রসন্তান ছিল না। অমর ও আমি যখন এলাহাবাদে যাই, তখন মাসীমার নিকট ১৫।২০ দিন অবস্থান করি। মাসীমা আমাদিগকে দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। প্রত্যেকের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—আহারের সময় নিকটে বসিয়া কত সযত্নে কত স্নেহভরে খাইতে বলিলেন। আমরা যে হিন্দুসমাজচ্যুত, মাসীমা যেন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মাসীমাকে প্রণাম করাতে তিনি আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাকে স্পর্শ করিবার পর হইতে আর গৃহের অন্য কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না! সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া আবার শুচি হইলেন। আমরা যে কয় দিন তাঁহার নিকটে ছিলাম, তাঁহাকে প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে এই প্রকার স্নান করিতে দেখিতাম। এই মাসীমাতার আলয়ে অবস্থানকালে আমি আমার পাশের খবর পাই। সুরথ, আমার সহোদর, আমাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল।

বিবাহসভায় মাসীমার ইতিহাস, বোধ হয়, পাঠকগণের একটু অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে। কিন্তু পরে বোধ হয় তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবার সুযোগ পাইবেন। যাহা হউক, হেমাঙ্গ বাবু পুত্র কন্যা সহ আসিয়াছেন শুনিয়া আমার মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল—অনেক বালকবালিকাকে দেখিলাম, কিন্তু সেই রাত্রের সেই কৃষ্ণ নয়ন, আরক্তিম ওষ্ঠাধর ত দেখিলাম না। হেমাঙ্গ বাবুর আরও পরিচয় পাইলাম। তিনিও ব্রাহ্ম; উপবীতত্যাগী; কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন; আমাদের "নববিধান"; তাঁহারা "উন্নত"। বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আহারাদি শেষ হইল। আমি কর্ম্মকর্ত্তা ও অন্যান্য পরিচিত লোকের নিকট বিদায় লইলাম। হেমাঙ্গ বাবু তাঁহার ঠিকানা দিয়া বলিলেন, "আপনাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিলে বড় সুখী হইব।"

আমিও সম্মতি জানাইয়া বিদায় লইলাম।

৩

৪।৫ দিন পরে এক দিন আমি ও অমর হেমাঙ্গ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। হেমাঙ্গ বাবু অন্তঃপুরে ছিলেন; তাঁহার পুত্র হেমন্তকুমার আমাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের পাঠাগারে বসিতে বলিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। হেমাঙ্গ বাবুর খুব বড় লাইব্রেরী; দুইটা গৃহ পুস্তকে পরিপূর্ণ। দর্শন বিজ্ঞান কবিতা ইতিহাস ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত সকল প্রকার পুস্তকই আছে। হেমাঙ্গ বাবুর আবাস-বাটী ও গৃহসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে ধনবান বলিয়া বোধ হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে হেমাঙ্গ বাবু বাহিরে আসিলেন; আমাকে ও বিশেষতঃ অমরকে দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং অনেকক্ষণ নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর আমাদের দুই জনকে কিছু জলযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "সুরেশ বাবুকে আমি জোর করিয়া জল খাওয়াইতে পারি, কিন্তু অমর বাবুকে বলিতে পারি না; কারণ আমরা হিন্দুসমাজচ্যুত 'বেহ্ম'।"

এই বলিয়াই তিনি হাহারবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গ বাবুর স্বভাবই এই; কোনও কথা বলিয়া একেবারে হাহারবে উচ্চহাস্য করেন।

আমি সহাস্যে বলিলাম, "অমরের আপত্তি থাকিলেও আজ সে আপত্তি খাটিবে না; কারণ,আমি পূর্ব্বেই উহার জাতি মারিয়াছি। আমার অসাক্ষাতে ... কিন্তু আমার সাক্ষাতে নহে।" বহির্বাটী

ও অন্তঃপুরের মধ্যবর্ত্তী একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আমরা উপস্থিত হইলাম। হেমাঙ্গ বাবুর পত্নী হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমাদিগকে জলযোগের অনুরোধ করিলেন। আমরা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জলখাবারগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলাম।

হেমাঙ্গ বাবুর দুই কন্যাকে দেখিলাম। জ্যেষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, নাম বিমলকুমারী;—সেই কৃষ্ণচক্ষু ও আরক্তিম ওষ্ঠাধরের অধিকারিণী। আর কনিষ্ঠা কমলকুমারী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা।

৪

আমি এখন হেমাঙ্গ বাবুর "ঘরের ছেলে" হইয়াছি। বিমল আর আমাকে দেখিয়া পলাইয়া যান না। প্রায়ই সকলে আমাকে গান গাহিতে বলেন; আমিও অতি আগ্রহে গান গাই। বিমল আমার নিকট হারমোনিয়াম শিক্ষা করেন।

বিমলের পাণিপ্রার্থী অনেকগুলি দাড়িচশমাওয়ালা গ্রাজুয়েট জুটিয়াছিলেন। কিন্তু হেমাঙ্গ বাবুর নিকট কোনও প্রকার উৎসাহ না পাইয়া একে একে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল আমিই স্বয়ংবরসভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরের ন্যায় একাকী রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, হাতের খাবার মুখে দিবার পূর্ব্বেই হস্তচ্যুত হইতে পারে। অবশেষে আমার কপালে তাহাই ঘটিল। একদিন স্বয়ং হেমাঙ্গ বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুরেশ! আজ তোমাকে একটি কথা বলিব।" হেমাঙ্গ বাবু এখন আর আমাকে সুরেশ বাবু বলেন না। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হেমাঙ্গ বাবু বলিতে লাগিলেন, "তুমি বোধ হয় বিমলকে পত্নীরূপে পাইলে সুখী হও?"

আমি নীরবে দাড়াইয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাল, বুঝিলাম, 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং'। এক্ষণে আমার একটি কথা আছে। তোমার সাংসারিক অবস্থা আমি জানি। তোমার মাসে দুই শত টাকা আয়; তোমরা দুই ভাই; সুতরাং ধরিতে গেলে তোমার এক শত টাকা। আর আমার মাসিক আয় হাজার টাকার উপর। পেন্সন ছাড়া আমার কিছু জমীদারী ও কোম্পানীর কাগজ আছে; এ সমস্তই তুমি জান।"

আমি উদ্বিগ্নচিত্তে বলিলাম, "জানি।"

"ভাল—আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া কি খাওয়াইবে? এক শত

টাকার আপাততঃ এক প্রকার চলিতে পারে, কিন্তু পরে তোমার সন্তানাদি হইলে তাহাতে কুলাইবে না। তুমি শিক্ষিত; অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিতে পার। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কর। যখন তোমার মাসিক আয় এমন হইবে যে, তাহাতে তোমার সংসার সচ্ছন্দে চলিবে, তখন আমি বিমলকে তোমার হাতে সমর্পণ করিব।"

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত টাকা মাসিক আয়কে আপনি যথেষ্ট মনে করেন?"

"অন্ততঃ মাসে তিন শত টাকা আয় না হইলে লোকে আজ কাল স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তোমার এক শত টাকা আয় আছে; আরও দুই শত টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা কর। তাহা হইলে আমার আর কোনও আপত্তি থাকিবে না।"

টাকা উপার্জ্জন, সৎপথে অবস্থান, সংসারে বিচরণ ইত্যাদি নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন;—কিন্তু কথাগুলি আমার কানে গেল, মাথায় গেল না। আমার মাথা ঘুরিতেছিল। পূর্ব্বে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, চাকরী করিব না। এখন মনে হইল, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

হেমাঙ্গ বাবু অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু আমি মোটের উপর কেবল মাত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। দ্বারের নিকট আসিবামাত্র তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয়, আজ বিমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। সে বড় হইতেছে, এখন অবধি তাহার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হইলে আমার, আমার পত্নীর, অথবা হেমন্তের সাক্ষাতে দেখা করিও। পত্র দিতে ইচ্ছা করিলে আমার নামে পত্র দিও, আমি তাহাকে পড়িতে দিব। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান; এ প্রকার কঠোরতা আবশ্যক, তাহা তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।"

আমি কিছু না বলিয়া কেবল নমস্কার করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

৫

প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। আমি চাকরীর জন্য প্রথমে অনেক চেষ্টা করিলাম। অনেক জুটিল, কিন্তু স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। একেবারে দুই শত টাকা দূরে থাক, একটা ৫০৲ টাকার চাকরীও জুটাইতে পারিলাম না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাবনায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল—হায়! বুঝি বিমলকে পাইব না!

একবার আমার সেই এলাহাবাদের মাসীমাকে মনে পড়িল। যদি মাসীমা ব্রাহ্ম হইতেন, যদি আমরা ব্রাহ্ম না হইতাম; কিন্তু তাহা হইলে কি বিমলকে পাইতাম? অসম্ভব! মনে হইল, একবার মাসীমার শরণাপন্ন হই, কিন্তু তিনি আমাকে টাকা দিবেন কেন? একেবারে না হয় দুই হাজার কি পাঁচ হাজার টাকা দিলেন, কিন্তু প্রতি মাসে দুই শত টাকা দিবেন কেন? অবশেষে সমস্ত ক্রোধ একীভূত হইয়া হেমাঙ্গ বাবুর প্রতি পতিত হইল। তিনি কেন টাকার কথা তুলিলেন? যাহারা এক শত টাকা বেতনে চাকরী করে, তাহারা কি উপবাসী থাকেন? তিন শত টাকা কয় জনের মাসিক আয়? হেমাঙ্গবাবু আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত, বিমলের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিতাম না। হেমাঙ্গ বাবুর উপর বড় রাগ হইল; তাঁহাকে যেমন করিয়া পারি, প্রতিশোধ দিব। ক্রমাগত অসুস্থ হইতে লাগিলাম। অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে এক ভৃত্য ও এক পাচক লইয়া নওয়াডীতে যাত্রা করিলাম।

প্রায় দুই মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে বেড়াইতেছি। একখানি পশ্চিমযাত্রী ট্রেণ প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল। পরিচিত কাহাকেও দেখিলাম না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এমন সময় এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক —হইতে সবেগে বাহির হইয়া গাড়ীর সহিত দৌড়াইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে একখানা মধ্যশ্রেণীর গাড়ীর হাতল ধরিয়া এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি যেমন লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, অমনি—দেখিতে পাইলাম,—তাঁহার পকেট হইতে একটা কি শ্বেতবর্ণ পদার্থ প্লাটফরমের নীচে একেবারে রেলের ধারে পড়িয়া গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। গাড়ী ছুটিতেছে, এবং দ্রব্যটাও চাকার নীচে পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত গাড়ী চলিয়া যাইবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাড়ী চলিয়া গেলে আমি সেই স্থানে গিয়া দেখি, কতকগুলি কাগজ; যেন দলীলের মত বোধ হইল। ভাবিলাম, ষ্টেশনমাষ্টারের জিম্মা করিয়া দি;—যাঁহার হারাইয়াছে, তিনি অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।—কাগজের তাড়াটি হাতে করিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের আফিসের নিকট যাইতে যাইতে একটা আলোকের নীচে গিয়া কাগজগুলা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চক্ষের নিকট ধরিয়া দেখি, এক স্থানে লেখা আছে,—"হেমাঙ্গকুমার চক্রবর্ত্তী।" আমি বিস্মিত হইয়া আবরণখানি উন্মোচন করিয়া দেখি, সেগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা দলীল। ভাবি-

লাম, ষ্টেশনমাষ্টারকে দিব না; পর দিন হেমাঙ্গ বাবুকে পাঠাইয়া দিব।

পর দিন প্রাতে ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টারের নিকট বসিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান দেখিতেছিলাম। দেখিলাম, হেমাঙ্গ বাবু বিজ্ঞাপন দিতেছেন,—তাঁহার কতকগুলি দলীল চুরী গিয়াছে; যে চোরের বা দলীলের সন্ধান করিয়া দিবে, সে যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে। আমি সেই দিনই দলীলগুলি পাঠাইয়া দিব, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইল, ইহাকেই বলে বিধির নির্ব্বন্ধ। হেমাঙ্গ বাবুর দলীল চুরী গেল, কিন্তু কুড়াইয়া পাইলাম আমি!

এমন সময় চিঠি বাছিতে বাছিতে, চশমা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া পোষ্ট-মাষ্টার বাবু আমাকে বলিলেন, "সুরেশ বাবু! আপনার একখানা রেজিষ্টারী চিঠি আছে।"

আমি রসিদ স্বাক্ষর করিয়া পত্র উন্মোচন করিয়া দেখি—অসম্ভব!

কলিকাতার চাটার্জি উড এটর্নি আমাকে লিখিতেছেন,—

"অতিশয় দুঃখিত হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, আমাদের মক্কেল কলিকাতার শ্রীমতী ক্ষমাসুন্দরী দাসী (আমার সেই হিন্দু মাসীমা) কাণপুরে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে জ্বর-বিকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বাক্ষী এবং চিকিৎসকগণের সমক্ষে সজ্ঞানে এক উইলপত্র করিয়া যান। সেই উইলের মর্ম্ম অনুসারে ক্ষমাসুন্দরী তাঁহার ভগ্নীর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র ও সুরথচন্দ্র মিত্রকে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন। কেবল উক্ত ক্ষমাসুন্দরীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার সম্পত্তি হইতে দশ হাজার টাকা লইয়া কাশীতে এক শিবস্থাপন করিতে হইবে, এবং পাঁচ হাজার টাকা ক্ষমাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু পাইবেন, এবং উক্ত দীক্ষাগুরুই শিবস্থাপনের সমস্ত কার্য্যে অধ্যক্ষতা করিবেন। এক্ষণে চাটার্জি উড অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র ও সুরথচন্দ্র মিত্রকে এই সুসংবাদ দিতেছেন যে, পত্রপাঠ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব উভয় ভ্রাতার একত্র Chatterjewood কোম্পানীর আফিসে আসিলে তাঁহারা সম্পত্তির তালিকা, দলীল ইত্যাদি আবশ্যক বিষয় জানিতে পারিবেন।"

মাসীমা লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। আনন্দ আসিয়া শীঘ্রই সেই শোককে প্রশমিত করিল। মনে হইল, এইবার আমার বিমলকে পাইব। সেই দিনই নওয়াড়ী ত্যাগ করিলাম।

রাত্রি ৯টার সময় হাবড়া ষ্টেশন হইতে বরাবর হেমাঙ্গবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সেই পুরাতন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবু কোথায়?"

সে নমস্কার করিয়া বলিল, "পড়বার ঘরে।"

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না।

পাঠাগারে উপনীত হইয়া দেখি, হেমাঙ্গ বাবু একখানি বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। পদশব্দে চকিত হইয়া আমাকে দেখিয়াই সহাস্যে হাত বাড়াইয়া সাগ্রহে বলিলেন, "Hallo! সুরেশ কবে এলে? কেমন আছ? নওয়াডীতে ছিলে না? বেশ সেরেছ?"

এইমাত্র নওয়াডী থেকে আসিতেছি—এখনও বাড়ী যাই নাই—"

"এখনও বাড়ী যাও নাই? তবে আহারাদি হয় নাই?"

হ'বে এখন, সে জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আপনার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে, তাই একেবারে আপনার নিকট আসিলাম।"

তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি কথা? এখনই বলিতে পার; কিন্তু আহারাদি করিয়া—"

"আহার পরে হইবে—আপনার কতকগুলি দলীল হারাইয়াছে?"

"হাঁ; তোমাকে কে বলিল?"

"খবরের কাগজে দেখিলাম, আপনি অনুসন্ধানকারীকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কি পুরস্কার দিবেন?"

অতি আগ্রহসহকারে হেমাঙ্গ বাবু বলিলেন, "কেন তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? কোনও সন্ধান পাইয়াছ?"

"যদি বলি পাইয়াছি, তাহা হইলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন?"

তিনি সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। দুই তিন মিনিট পরে বলিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

আমি তাঁহার সম্মুখে দলীলগুলি রাখিয়া মৃদুস্বরে নতমস্তকে বলিলাম, "যদি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হই?"

বোধ হয়, আমার গলাটা একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। তিনি একটু নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র কথা, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আজ হইতে আমার বিমলকুমারী তোমার হইল।"

এই কথা বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি দীর্ঘ নিশ্বাসের মানে বুঝিলাম। আমার মনে রোমাঞ্চ জাগিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলাম, "আমি আপনাকে বাধ্য করিয়া [illegible]

কন্যাকে লইব না ; আমি কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করি না। আপনাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কারের দায়ে ফেলিয়া আপনার কন্যাকে লইব, আমি এত নীচ নহি।" এই বলিয়া এটর্নীর চিঠিখানি তাঁহাকে দেখিতে দিলাম। তার পর আর বলিতে হইবে কি ?

নরোত্তমের 'রাধিকার মানভঙ্গ'।

(২)

পদাবলী সাহিত্যে বৃন্দাবনী বুলি যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে তত মিষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থেও বৃন্দাবনী ভাষার প্রভাব একবারে নাই, এমন নহে। বৈষ্ণবসমাজের কথিত ভাষা তখন মিশ্রিত হইয়া গিয়া খিচুড়ীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীমুখেও তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে এত বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব।

আর একটি বিস্ময়ের কথা এই যে, গ্রন্থখানি ন্যূনাধিক সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দ (৩) পূর্ব্বে বিরচিত হইলেও ইহাতে আধুনিক ভাষার অনেক শব্দচিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়। 'হবে', 'যাব', 'বসেছে' প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখা যাইবে। প্রাচীন সমস্ত গ্রন্থেই 'করিয়া' শব্দকে 'করিআ' লেখা হইত, কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে 'করিয়া'ই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটিমাত্র শব্দের উল্লেখ করিলাম, সকল ক্রিয়া সম্বন্ধেই এই গ্রন্থে ঐ নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। নামপুরুষের ক্রিয়ায় কোথাও বা উত্তম পুরুষের ক্রিয়া এবং

(৩) আমরা যে হস্তলিখিত পুঁথিখানি পাইয়াছি, তাহা লিখিত হইবার তারিখটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—"সন ১২০৯ সাল তারিখ ৩০ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার এক প্রহর বেলা থাকিতে মোকাম মীরেশ্বরাই পশ্চিমদ্বারী ঘরের মাঝের কুটরীতে এই পুথি শ্রীযুক্ত ফকির চান্দ চৌধুরীর লেখক শ্রীযুত রামতনু দেবশর্ম্মা সাং বেলপুখুরিয়া উত্তর পাড়ায়।" তবেই হস্তলিপিখানির বয়স আজ ৯৮ বৎসর হইতেছে। 'মীরেশ্বরাই' এখন 'মীরেশ্বরী' বা 'মীরসরাই' নামে পরিচিত ; চট্টগ্রাম সহরের ৩৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে মুন-

কোথাও উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার স্থলে নাম পুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যবিদ্‌গণের নিকট এরূপ ব্যভিচারের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। "সাত নকলে আসল খাস্ত" হয়; লিপিকরেরাও যে কিছু কারসাজি করেন না, তাহাই বা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? এতৎসম্বন্ধে নিম্নের এই দুইটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট ;—

মান করি রইলে বসি।
কে তোমায় সাধিবে আসি॥

না কর এমত মান শুনহ সুন্দরী।
নিশ্চয় কহিল আমি নিতান্ত তোমারি॥

চতুর্দ্দশ অক্ষরী পয়ারে কোথাও পঞ্চদশ অক্ষরও দেখা যায়। যথা ;—

অনন্ত প্রভুর মায়া কে বুঝিতে পারে। শত শত কৃষ্ণ হইয়া চারি দিগে ফিরে॥

এই যে ছন্দের মাত্রাবিপর্য্যয়, ইহা আমাদের মতে অনবধান লিপিকরেরই দোষ। শেষ চরণের 'হইয়া'কে 'হৈয়া' করিলে কোন দোষ থাকে না। গ্রন্থে এইরূপ সঙ্কোচিত 'হৈয়া', 'লৈয়া', প্রভৃতি শব্দও অনেক আছে।

বঙ্গীয় কবিপ্রতিভার অপূর্ব্ব সৃষ্টি শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া সৃষ্ট। তাঁহার নয়ননিঃসৃত নির্ম্মল অশ্রুবিন্দু দ্বারা সিক্ত হইয়া আমাদের বঙ্গভাষা এক অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহাই তাঁহার পবিত্র স্পর্শলাভ করিয়াছে, তাহাই নির্ম্মল গঙ্গাধারার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহার পবিত্র পদরজঃসংস্পর্শে বাঙ্গালা কাব্য সকল এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, এ গ্রন্থে স্বয়ং তাঁহারই এক অপূর্ব্ব প্রেমলীলার এক অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা যে সুন্দর হইবে, তাহাতে আর কথা কি? ইহার প্রণেতাকে আমরা বৈষ্ণবসমাজের অগ্রগণ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছি। এরূপ মণিকাঞ্চনযোগেও যদি গ্রন্থের শোভা ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হয়, তবে আর কিসে হইবে? এই মহাত্মার লেখনী যেন অবিশ্রান্ত মধু বর্ষণ করিয়াছে। এত পুরাতন কাব্য হইলেও তাঁহার রচনানৈপুণ্যে কোথাও ইহা শ্রুতিকর্কশ কি দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। সরল, সহজ, অনাড়ম্বর অথচ গুরু গম্ভীর রচনা পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয় অধিকার করে। অর্থপ্রতীতি কি ভাবপরিগ্রহের জন্য পাঠককে কোথাও এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিতে হইবে না। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আপনাআপনি তরলজলবৎ হৃদয়গত হইয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য নব্য সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অধুনা, ছন্দোহীন, রাগহীন, তাললয়হীন ও ভাবহীন যে সকল অসংখ্য কবিতা দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহার

অধিকাংশই কেবল শব্দাড়ম্বরের ঘোর মেঘনির্ঘোষ বই আর কিছুই নয়; ভাব বা অর্থের গ্রহণ করিতে হইলে পাঠককে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়, অথবা রসদ-পত্র লইয়া লেখকের বাড়ীর অনুসন্ধানে বাহির হইতে হয়। ইহা সাহিত্যের দোষ কি গুণ, আমাদের সাহিত্যপ্রেমিকগণের একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রচলিতরীত্যনুসারে আমরাও এ কাব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব, মনন করিতেছি। কিন্তু কোন্ স্থানটি রাখিয়া কোন্ স্থানটি উদ্ধৃত করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। কাব্যের সর্ব্বত্রই সরল, মধুর, কমনীয়, ললিত-শব্দরচিত পদ সকল ইহার শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। বঙ্গ ভাষায় এমন সহজ রচনা বড়ই বিরল। কাব্যজগতে শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ মূর্ত্তিমতী সরলতা দিয়া গঠিত, তাঁহার প্রেমলীলার বর্ণনাতেও সেইরূপ সরলতা অনুসৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থে কবি যেন লেখনীমুখে রাধিকারই সেই প্রেমবিহ্বল, অভিমানস্ফীত চপল হৃদয়ের কথাগুলিই ব্যক্ত করিয়াছেন। তখন লেখকের আত্মজ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার চিত্রগুলি কেমন জীবন্ত! কেমন উজ্জ্বল! লেখক নিজে আত্মসংযমী সংসারবিরাগী ছিলেন; নিজের এরূপ পাণ্ডিত্যাভিমানত্যাগ তাঁহারই উপযুক্ত। ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল, সরল ও হৃদয়গ্রাহিণী দেখুন:—

নারী হৈল চক্রপাণি।
বৃন্দার বচন শুনি ॥৩৯॥
দিব্য বেশ আভরণ পরিল প্রচুর।
চরণে পরিলা হরি বাজন নূপুর॥
কালরূপ অঙ্গরাগ কৈল হরিতালে।
বনমালা ত্যজি গলে দিল রত্নমালে ॥ধু॥
ললাটে সিন্দুর ফোঁটা।
যেন রবি করে ছটা ॥৪০॥
সুচারু নারীয়া বেশ বানাইল বেণী।
মেঘের আড়েতে যেন ঘন সৌদামিনী॥
হস্তেতে কঙ্কণ যেন করে ঝিকি মিকি।
দেখিয়া গগনশশী মেঘে হৈল লুকি ॥ধু॥
ব্রজপতি নারী হৈল।
গগনশশী লাজে মৈল ॥৪১।

বামাকে রাধিকা একবার বীণাযন্ত্রে গান করিতে বলিলেন। বীণা কৃষ্ণ বিনা আর কিছু জানে না; বীণা কৃষ্ণগুণই গাহিতে লাগিল। কিন্তু

শুনিয়া বীণার গান।
উথলে রাধার মান॥ ৮৪।
যে নাম শুনিলে কাণে হাত দেই আমি।
সেই নাম বীণাতে গান কর তুমি॥
এথা হৈতে শীঘ্র করি যাও ত সুন্দরী।
কৃষ্ণ নাম যেই করে তাহারে না হেরি। ধু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নমুনা প্রদর্শন জন্য কোন্ স্থান রাখিয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিব, আমরা স্থির করিতে পারি নাই। ইচ্ছা হয়, সমগ্র কাব্য-

খানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে ইহার অপূর্ব্ব অনুপম সুধা পান করাই; কিন্তু আমাদের আর স্থান নাই। গ্রন্থে এরূপ সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। ইহার শেষে যে দুইটি সঙ্গীত আছে, তন্মধ্যে একটি এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মঙ্গল রাগ।

প্রাণ হরি হরি হেন দিন হইবে আমারে। যোগাইব অধর কমলে ॥

দুই মুখ নিরখিব,
দুই অঙ্গ পরশিব,
সেবন যে করিব তাহারে ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে,
সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক শপট করি,
কর্পূর তাম্বূল ভরি,

রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
সেই মোর প্রাণধন,
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় রূপ সনাতন,
দেহো মোরে এই ধন,
তাহা বিনা অন্য নাহি ভাব (ভায় ?) ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, মূলগ্রন্থে শেষ পদের কতকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ পদটী দেখিলেই ইহা মনে উদিত হয়। তৎকালের অনবধান লেখকের প্রমাদবশতঃ এমন সুন্দর গীতটি অপূর্ণ রহিল! মূলগ্রন্থে যে ইহার আর কয়েক চরণ ছিল, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট এই গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান বিবেচিত হইবে। ইহার স্থানে স্থানে যে সকল প্রাচীন বিভক্তিচিহ্ন ও শব্দাদির প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনার যোগ্য। যদি পারি, অন্য প্রবন্ধে আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। *

শ্রীআবদুল করিম।

---

* আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 'রাধিকার মানভঙ্গ' পুঁথিখানি আমার স্নেহাস্পদ প্রিয় ছাত্র আনোয়ারা-নিবাসী শ্রীমান শশিকুমার নন্দী সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় পরম উপকৃত হইয়াছি। তজ্জন্য শশী আমার আশীর্ব্বাদভাজন।—লেখক।

যেমনটি চাই তেমন হয় না।

গাঁজাখুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা বিশ্বময় ; না ?
দেখ, যখন চাই রদ্দুর ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর যখন চাই বৃষ্টি, তা হয় না।
আমি, চাই ইঙ্গিতে অসম্ভব হয় সম্ভাব্য,
চাই বিনা লয় তানে হয় গীত সুশ্রাব্য,
বিনা ছন্দে হয় আশ্চর্য্য অত্যুত্তম কাব্য, তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি, চাই যে বাপ রেখে যায় প্রভূত অর্থ, স্ত্রীর মা রেখে যায় প্রচুর গয়না,
আর,আমরাই তাই একা ভোগ কর্ব্ব এই সর্ত্তে; তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।
আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ—তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি,চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা (অথচ) সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না ;
চাই বেশীর ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা,—তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই মম পুত্রার্থে আনে বয়ঃস্থা
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় সস্তা,—তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই চিরযৌবন, আমার কেমন বাতিক ! তা যৌবনও বাঁধা ত রয় না—
চাই ধনে হই কুবের ও রূপে হই কার্ত্তিক,—তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্য্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি,চাই আহার ও নিদ্রা,আর চাইনাক দুঃখ,—তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার গুণকীর্ত্তন গায় বিশ্বশুদ্ধ (যেন) শেখানো টিয়া কি ময়না,
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,—তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই রেলে সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিষে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিষ, কিন্তু হা অদৃষ্ট ! তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সাঁওতাল পরগণার বিবরণ।

দেশের অবস্থা।

সাঁওতাল পরগণা অতি গরিবের দেশ। প্রকৃতি দেবী ইহাকে বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত করিলেও ইহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। এখানকার জলবায়ু উৎকৃষ্ট হইলেও শীতাতপ দুইই প্রবল। অধিবাসীদের অধিকাংশই নির্ধন; যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহারাও দরিদ্রের ন্যায় দিনযাপন করে। ইহারা অপ্রচুর খাদ্য খাইয়া সামান্য কুটীরে বাস করে, মলিন ও গ্রন্থিযুক্ত পরিধেয় বস্ত্রে কোন মতে দেহ ও লজ্জা রক্ষা করে। লেখাপড়া অতি অল্প লোকেই জানে; ন্যায় অন্যায় ও হিতাহিতের বোধ প্রকৃতি যাহা দিয়াছেন,তাহা ভিন্ন বড় বেশী নাই। সমৃদ্ধিশালী নগরী, বিবিধবৃক্ষসমাকীর্ণ ধনধান্যভরা জনপদ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ভদ্রলোক ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার এখানকার অতি অল্প লোকেই দেখিয়াছে; সুতরাং ইহারা যেমন অনভিজ্ঞ ও অপরিণতবুদ্ধি, তেমনই ভীরু। তবে, যদি "সন্তোষ"কে "রত্ন" বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ধনী বলা যাইতে পারে; কারণ,সুখ ও উন্নতির অভিজ্ঞতা না থাকায় ইহাদের অন্তরে উচ্চাভিলাষ প্রায়ই স্থান পায় না, সুতরাং সন্তুষ্টচিত্ত বলিয়া এক প্রকার সুখী বলা যাইতে পারে। ইহারা ২৷৩ আনা পয়সা পাইলে সমস্ত দিন এক পয়সার মুড়ি খাইয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন অনেক দরিদ্র আছে, যাহারা পরিত্যক্ত ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন দেখিতে পাইলে কুকুরের ন্যায় পরিতুষ্ট হইয়া যত্নের সহিত তাহা খুঁটিয়া খায়। মহাজনেরা প্রজাদিগকে বপনের জন্য ধান্য কর্জ্জ দিয়া ফসলের সময় দেড়গুণ বা দ্বিগুণ শস্য গ্রহণ করে। যদি শস্য ভালরূপ না জন্মে, তবে বাকী ধান্য পর বৎসরে সুদ সহ আদায় করিয়া থাকে। এই প্রকারে বিদেশীয় ধনী মহাজনেরা টাকা বা ধান্য ধার দিয়া প্রজাগণকে চিরঋণজালে জড়িত করিয়া অবশেষে তাহাদের জমীর উপস্বত্ব আপনারা ভোগ করিতে থাকে। অনেক প্রজা এইরূপে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এবংবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ১৫৷২০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিতে গবর্মেণ্টকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার পর

হইতে ইহাদের স্বপক্ষে আইনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের সেটেল্‌মেণ্ট আইনানুসারে সাঁওতাল পরগণার কেহই আপনার জোত জমী হস্তান্তর করিতে পারিবে না। মহাজনেরা ঋণের দেনায় অধমর্ণের অস্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ নিলাম করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার জমী বিক্রয়ের অধিকার নাই। অধিবাসীরা নিঃস্ব বলিয়া মকর্দ্দমার খরচও এখানে অনেক অল্প ; কেন না, হাকিমদিগের অনুমতি না হইলে বড় বড় ব্যারিষ্টারেরাও আদালতে প্রবেশ করিতে পান না; এবং অনেক সময় উকীল মোক্তার ব্যতিরেকে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। দরখাস্তলেখককে (petitionwriter) চারি আনা দিয়া নালিসের কারণ বুঝাইয়া দিলে, সে মুসাবিদা করিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিতে বাধ্য। অনেক সময় সাঁওতালদিগের মৌখিক দরখাস্তও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের চাষের জমীর খাজনাও অনেক কম। কিন্তু তথাপি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। ইহারা নিতান্ত অলস, অপব্যয়ী ও মদিরাসক্ত। নিজের পানভোজনের নিমিত্ত যতটুকু পরিশ্রম আবশ্যক, তাহার বেশী কিছুতেই করিতে চাহে না, এবং সঞ্চিত অর্থ না ফুরাইলে পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

সাঁওতাল পরগণায় জমীদারের প্রভুত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রজাদিগের সহিত জমীদারের সম্বন্ধও অল্প। "প্রধান" খাজনা আদায় করিয়া না দিলে জমীদারের আদায়ের ক্ষমতা নাই ; জমীদারের খাসমহল না হইলে প্রজার নিকট হইতে তাঁহার কর আদায়ের অধিকার নাই। আবার প্রধানও গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত, সুতরাং আইনতঃ চুক্তিভঙ্গ না করিলে মকদ্দমা করিয়া তাহাকে তাড়াইবারও যো নাই। গরীব প্রজার উপর অত্যাচার না হয়, এমন নহে ; কিন্তু নালিশ হইলে তাহাদের উপর বিচারকর্ত্তাদিগের স্বাভাবিক দয়া ও বিশ্বাসবশতঃ অনেক সম্ভ্রান্ত লোককেও লাঞ্ছিত হইতে হয়। মহুয়া গাছ এখানকার নিজস্ব। ইহার ফুল শুষ্ক করিয়া রাখিলে সংবৎসরেও নষ্ট হয় না। উহা সুমিষ্ট. কিন্তু সুগন্ধ নহে ; গরীব লোকেরা ফল খাইয়া অনেক দিন কাটাইতে পারে ; অধিকন্তু উহা দ্বারা মদও প্রস্তুত হয়। উহার ফল তরকারী-রূপে আহার করা যায়, এবং তাহা হইতে ঘৃতের ন্যায় এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। এই বৃক্ষ বার্ষিক ৵৹ আনা খাজনায় প্রজাদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া হয় ; কোন কোন স্থলে প্রজাদিগকে বিনা করেও দেওয়া

হইয়া থাকে। এই মহোপকারী বৃক্ষ না মরিলে কাহারও কাটিবার অধিকার নাই; কাটিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। জমীদারের শাল প্রভৃতির "রাখা জঙ্গল" (reserve forest) আছে। তাহা হইতেও তিনি ইচ্ছামত গাছ কাটিতে পারেন না। রাস্তা ঘাটও অনেক সময় তাঁহাকে মেরামত করিয়া দিতে হয়।

বাণিজ্য, রেলওয়ে, রাজপথ।

এ দেশে বাণিজ্যস্থান অধিক নাই। লুপলাইনের ধারে সাহেবগঞ্জ ও রাজমহল, এই দুইটি প্রধান বন্দর। সাহেবগঞ্জ, রেলওয়ে লাইন ও প্রশস্ত নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায়,এখানে জলপথ ও স্থলপথে নানা দেশ হইতে দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানি হইতেছে। পূর্ব্বে ভাগলপুর, পীরপৈঁতি, কাহালগাঁ প্রভৃতি স্থানে যে সকল কারবার চলিত, এখন সে সকল সাহেবগঞ্জ একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। নদী ও রেলের ধারে অবস্থিত বলিয়া বিদেশের সহিত ইহার বাণিজ্যের যত সম্পর্ক, সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য প্রদেশের সহিত তত নয়। সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্ব দিক দিয়া লুপলাইন ও পশ্চিম দিক দিয়া কর্ডলাইন চলিয়া গিয়াছে। লুপলাইনের ষ্টেশনগুলির নাম—পাকুড়, বিজাপুর, বহাওয়া, তিনপাহাড়, রাজমহল, মহারাজপুর ও সাহেবগঞ্জ। কর্ডলাইনের ষ্টেশন যথা,—জামতারা, কর্মাটার, মধুপুর ও বৈদ্যনাথ। এই দুইটি প্রধান লাইন ব্যতীত মধুপুর হইতে হাজারিবাগের কহরবাড়ী পর্য্যন্ত আর একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে। তাহার ধারে সাঁওতাল পরগণায় জগদীশপুর নামে একটি ষ্টেসন আছে। সংপ্রতি ভাগলপুর হইতে চৌসী হইয়া দুমকা পর্য্যন্ত একটি এবং চৌসী হইতে দেওঘর ও গোড্ডা পর্য্যন্ত আর একটি লাইন খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। তাহা হইলে, এ জেলার প্রধান প্রধান নগর ও মহকুমাগুলি পরস্পর এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে। কিন্তু এখন টাকায় যে দুই সের ঘৃত ও কুড়ি সের দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা তখন উপকথা বলিয়া বোধ হইবে। এই জেলায় পাঁচটী মহকুমা আছে; তাহাদের নাম, নয়াদুমকা বা সদর, রাজমহল,দেওঘর, গোড্ডা এবং পাকুড়। এতদ্ভিন্ন কুমরাবাদ, নলহাটী, ননীহাট, সরাইয়াঘাট, রোহিণী, সারোয়া, কোরোন, কুণ্ডিত প্রভৃতি নগরের প্রত্যেকটীতে প্রায় দুই সহস্রের অধিক লোকের বাস।

এ জেলায় ভাগলপুর সুরি রোড নামক রাস্তাটি পাকা। অন্যান্যগুলির

অধিকাংশই কাঁচা। বড় বড় কয়েকটি রাজপথের নাম ও পরিমাণ দেওয়া যাইতেছে; যথা,—পীরপৈঁতি গোড্ডা রোড –৩১ মাইল। দেওঘর জর্মুন্তী রোড ২৬ মাইল। সাহেবগঞ্জ বারাহাট রোড—৩১ মাইল। মুরারী অমর পাড়া রোড –২০ মাইল। পাকুড় হিরাপুর রোড—১২ মাইল।

অজয়, জয়ন্তী, পাত্রো, কাজিয়া, হার্ণা প্রভৃতি নদীতে বন্যা আসিয়া থাকে। গত বৎসর শেষোক্ত নদীদ্বয়ের বহুদূরব্যাপী জলপ্লাবনে অনেক গৃহ, মানুষ ও পশু নষ্ট হইয়াছে। বন্যার সময় ডাক ও লোকের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।

শিক্ষা।

ডুমকা, দেওঘর, পাকুড় ও জামতারায় এক একটি এন্ট্রেন্স স্কুল আছে। উক্ত স্থানচতুষ্টয়ের আদালতের ভাষা বাঙ্গালা হওয়ায় তত্রত্য স্কুলেও অনুবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় হইয়া থাকে। দেওঘর ও ডুমকার বিদ্যালয় দুইটি সমধিক প্রসিদ্ধ। গতপূর্ব্ব বৎসর ডুমকা হইতে একটি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। ছোট ছোট স্কুল অনেক আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত তুলনায় এখানকার শিক্ষা অনেক নিম্ন সোপানে অবস্থিত। সাঁওতালেরা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পোষাক ও কথাবার্ত্তায় হিন্দুদিগের অনুকরণ করিতেছে। অশিক্ষিত সাঁওতালেরা স্থানীয় তন্তুবায়নির্ম্মিত একহাত বহরের ক্ষুদ্র কাপড় পরিধান করে। কিন্তু এই জাতীয় অনেকে লেখাপড়া শিখিয়া পরিষ্কার বিলাতী কাপড় পরিধান করিতে ও মস্তকে টিকি রাখিতে শিখিয়াছে। আজকাল প্রায় সকলেই হিন্দুদিগের নামানুসারে পুত্র কন্যার নাম রাখিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারে; কিন্তু পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী যে সকল সাঁওতাল হিন্দুগণ হইতে অনেক দূরে বাস করে, তাহারা অনেক বিষয় সঙ্কেত ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কতিপয় মিশনরী গোড্ডার অন্তঃপাতী পাথ্রা নামক স্থানে প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত করিয়া, তৎসংলগ্ন ছাত্রনিবাসে কয়েকটি পাহাড়ীয়া বালক রাখিয়া, লেখাপড়া ও ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন। তথাকার পাহাড়ীয়া বালকদিগের প্রকৃতি ও ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উহারা প্রতি রবিবার খ্রীষ্টীয় উপাসনামন্দিরে যাইয়া অপরের দেখাদেখি বেঞ্চির উপর উপবেশন করে, সময়মত উঠিয়া দাঁড়ায়, কখনও

বা জানু পাতিয়া হেঁটমুণ্ডে কি ভাবিতে থাকে। সমভূমিতে মনুষ্যের স্বহস্ত-রোপিত উদ্যান ও মনোহর নরনারীর বিচিত্র বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের পশুপ্রকৃতিতে যে কালক্রমে কোমলতার সঞ্চার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গিরিবাসী পাহাড়ীয়ারা এখনও পূর্ব্ববৎ অজ্ঞান ও অসভ্য রহিয়াছে। শুনা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে গবর্মেণ্টের কোন আমিন পাহাড়ীয়াদিগের জমী জরিপ করিতে গেলে, স্থানবিশেষের পাহাড়ীয়ারা সমবেত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিয়াও যখন দেখিল যে, সে কিছুতেই প্রতি-নিবৃত্ত হইবার নহে, তখন তাহারা আমিনকে রজ্জু দ্বারা গাছের সহিত বন্ধন করিয়া নির্য্যাতন করিতে ত্রুটি করিল না। কোন কোন স্থলে আমিন অসভ্যদিগের তিরস্কারে ভীত হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত স্বত্ব লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। আগামী ১৯০১ সালে দামিনীকোট পাহাড়ের জরিপ আরম্ভ হইবে। তখন অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

এখানকার লোক গরীব হইলেও ডাকাতি বা খুন না হইয়া থাকে, এমন নয়। অনেক সময় কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা লোকদিগকে নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিম্বু মাঝি নামক এক সাঁওতাল কোন দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এক অতি বীভৎস প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিল। সে এক অপরিচিত লোককে প্রতারণা পূর্ব্বক পাহাড়ের নিকটে আনিয়া আরও তিন জন সহ-চরের সাহায্যে উহাকে ভীষণরূপে বলিদান করিয়া, রোগমুক্ত হইবার আশায়, হতভাগ্যের শোণিতে স্নান করিল। সে প্রথমে লোকটির মুখের মধ্যে কাপড় পুরিয়া স্বর বন্ধ করিয়া হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিল, এবং নিজের ক্ষুর দিয়া উহার কেশের কিয়দংশ চাঁচিয়া লইল। অত্যাচারী দলের মধ্যে এক জন পাহাড়ীয়া ছিল; সে ঘৃত, আতপ চাউল, ও সিঁদুরের দ্বারা এক প্রকার পূজা সম্পন্ন করিলে, অপর তিন জন সাঁওতাল হতভাগ্যের গলায় রজ্জু বাঁধিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিল। মৃত্যুর সময় মুখ বন্ধ করা অবিধি জানিয়া লিম্বু তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। পরে অপর দু জন সাঁওতাল বেচারীর পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলে লিম্বু স্বীয় তরবারি দ্বারা উহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। বিচারে লিম্বুর ফাঁসী ও অপর দুই জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছিল।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

অশোক-গুচ্ছ।

সমালোচনা।

কবি জগতের শিক্ষক। প্রকৃতি হইতে প্রকৃত শিক্ষা। প্রতিভাবান ব্যক্তির অলৌকিক, অনন্যসাধারণ অনুভূতি ও দর্শনশক্তি এই চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকাপরিশোভিত নভঃস্থল ও জীবজন্তুতরুতৃণপরিবৃতা নদনদী-মেখলা ধরণী হইতে নিত্য সৌন্দর্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। সেই অনুভূতি ও দর্শনশক্তি কল্পনার মোহিনী ভূষায় ভূষিত হইয়া প্রতিভার প্রভাবে যে অজ্ঞাত, অপরিচিত, অদৃষ্ট, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ও সত্যের আবিষ্কার করিতেছে, তাহাই যখন ভাষানূপুরমুখর হইয়া, প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ধারায় অভিষিঞ্চন করে, তখন আমরা সেইখানে কাব্যদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আনন্দপ্রফুল্লনয়নে চাহিয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগের তৃষিতনয়নের আকুলদৃষ্টি সেই অশরীরিণী সৌন্দর্য্যরাণীকে হৃদয়-কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে কি? তাহার প্রতিবিম্ব হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয় সত্য, কিন্তু প্রতিকৃতিনির্ম্মাণ সম্যক অসম্ভব। চিত্রকরের তূলিকা সেখানে শিথিল হইয়া পড়ে, মুখের ভাষা মূক হইয়া যায়, ব্যাখ্যা নির্ব্বাক হইয়া থাকে। ইহা ইন্দ্রিয়াধিকারের অতি দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়; ধরিতে গেলে ধরা দেয় না, ডাকিলে নিকটে আসে না। কাব্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কে না আপনার অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন? কি সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ, কি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ, কেহই আজ পর্য্যন্ত, কাব্য সম্বন্ধে, সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কাব্য একটি সংজ্ঞাহীন শব্দ। প্রাণ দিয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, প্রাণ দিয়া ইহাকে বুঝিতে হয়।

ফরাসী সমালোচক Q de Quincy বলেন Poetry is an art, Aesthetics is the philosophy of art. কিন্তু ইয়োরোপীয় সমালোচক Lewes এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "বহুকাল পূর্ব্বে Baumgarten নামক এক জন জর্ম্মান পণ্ডিত কোন একটি বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও ভাববিশ্লেষণ উপলক্ষে এই Aesthetics শব্দ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। সুন্দর ও ভাবমধুর রচনামাত্রই কাব্য-নাম-বাচ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে অনেক গদ্যরচনাও কাব্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে।" প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহকে আমরা কাব্য নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যদিও সে সকল গদ্যে লিখিত, তথাপি কাব্যগুণবহুল। কিন্তু Lewes এ প্রকার রচনা সম্বন্ধে বলেন, They are no doubt poetical but never poetry. To those who assert that all that is said in verse might be equally said in prose, we answer, as soon might cabbages be violets. এই যে এত তর্ক বিতর্ক, এত বাকবিতণ্ডা, এত উপহাস বিদ্রূপ; কিন্তু কাব্যের সংজ্ঞা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। Hegel বলেন, As all art has a

philosophical foundation so poetry necessarilly demands a philosophical elucidation. কাব্যেও দর্শন আছে সত্য, তবে প্রকার ও প্রকরণ ভিন্ন। উদ্দেশ্য, অবশ্য, উভয়েরই এক। দর্শন সতত সত্যানুশীলন ও সত্যনির্দ্ধারণে নিরত, কাব্য ও সত্যানুসন্ধান ও সত্যাবিষ্কারে সতত ব্যগ্র। এক জন প্রচারক, অপর আবিষ্কারক। একে, সত্য অনেক সময় অপ্রিয়, তাহাতে দার্শনিক সত্য বড়ই নীরস। কাব্য সেই নীরস শ্রবণাপ্রিয় সত্যকে রূপ, রস, গন্ধ, মোহে পরিপূর্ণ করিয়া, সরস ও শ্রুতিমধুররূপে প্রতীয়মান করে।

স্বীয় অনুভূতি ও দর্শনের বিজ্ঞাপনই কবির উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি যাহা দেখিয়াছেন, কিংবা অনুভব করিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, সুতরাং, সাধারণ্যে তাহা প্রকাশেরও কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ সংস্কার আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। বিধাতার সৃষ্টির বাহিরে নূতনত্বের আবিষ্কার সম্ভবে না। সুতরাং দেখিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুভূতি ও দর্শনের মধ্যে কোন মৌলিকতার পরিচয় আছে কি না। মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কারই বিশেষত্বের পরিচায়ক। অপরের দর্শন ও অভিজ্ঞতা যতই মূল্যবান হউক না কেন, প্রচারকের তাহাতে কোন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার জানা উচিত যে, তিনি প্রচারকমাত্র, আবিষ্কারক নহেন। তাঁহাকে Photographer বলিতে পারি, artist বলিতে পারি না। কবি Thoreau বলিয়াছেন, None is poet who has no clear vision and heartfull feeling. আমরা এই "অশোক-গুচ্ছ" কাব্যে কবি দেবেন্দ্রনাথের সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রাণপূর্ণ অনুভূতির কোন পরিচয় আছে কি না, তাহাই দেখিবার চেষ্টা পাইব।

আমরা আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, "অশোক-গুচ্ছে" কবির অনুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান আছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার মৌলিকতার অপূর্ব্ব প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

কবির "নারীমঙ্গল" কবিতা কবিত্বের অমৃতময় আধার। এই "নারীমঙ্গল" কবিতায় নারীর নারীত্ব, বধূত্ব, গৃহিণীপণা, মাতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রের একত্র মধুর-সমাবেশ। নারী কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। কবি বলিতেছেন,—

জানি আমি নারী তুমি কবি-বিধাতার　　উপমার কারিগরি বর্ণের যোজনা,
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;　　কল্পনার লীলা খেলা (গোপীর হিন্দোলা!)
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার!　　হেরি সখি! মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা ;
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী!　　নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তীনিচোলা!

নারীর এই সৌন্দর্য্য কেবল কবিরই উপভোগ্য। পৃথিবীর কোন জাতির কাব্যে নারীর ম মহিমা, অতুল গুণগরিমা, অসামান্য সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যাত না হইয়াছে? পৃথিবীর কোন কর রমণীর রমণীয়তার আভাস দিতে যাইয়া লাবণ্যের নিকট আপনার ব্যর্থ প্রয়াসের চয় না দিয়াছে? কোন ভাস্কর নারীর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে রিয়াছে? নারী বিশ্ববিধাতার বিশ্ব কাব্যের অপূর্ব্ব ভাষা। এক জন পাশ্চাত্য কবি য়াছেন,—

"Oh woman, lovely woman, nature made thee
To temper man ; we had been brutes without you ;
Angles are painted fair, to look like you ;
There's in you all that we believe of heav'n
Amazing brightness, purity and truth,
Eternal joy and everlasting love."

প্রকৃতই, নারী অনন্তের মহিমা, বিশ্বের গরিমা, সৃষ্টির নৈপুণ্য ! নারী বিলাসীর বিলাস, সাধকের সাধনা, যোগীর ধ্যান, তপস্যার প্রাণ। নারী রূপে শেফালিকা, মাধুর্য্যে অপরাজিতা, সরমে বনযূথিকা। নারী স্নেহের মন্দাকিনী, পবিত্রতায় গোমুখী, প্রেমের ফল্গু। এই নারীই সহিষ্ণুতায় সীতা, পাতিব্রত্যে সাবিত্রী, তেজস্বিতায় দ্রৌপদী ! নারী গৃহকার্য্যে গৃহিণী, সন্তান-পালনে জননী, ক্ষুধার্ত্তের অন্নপূর্ণা, আর্ত্তের করুণারূপিণী। তাই কবি বলিয়াছেন,—

করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হ'য়ে বয় জীবদুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা ?

নারীর অপার মহিমা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ হয় না।

কিন্তু যেমন চন্দ্রেও কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, কুসুমেও কীট প্রবিষ্ট হয়, দেবোদ্দিষ্ট পবিত্র পুষ্পপাত্রও অপবিত্রতাস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনই এই কোমলতা পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমা নারীও নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কখন কখন দৃপ্ত ফণিনীমূর্ত্তি ধারণ করে। "কালিদাসের জয়" কবিতায় কবি সেই নারীধর্ম্মবিবর্জ্জিতা নারীর ঘৃণিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যে নারী "পরপুরুষের পবন-পরশে সচেলে সিনান" করে, যার নূপুরশিঞ্জিতে বসুধা পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, যার পূত পাদস্পর্শসুখ অনুভব করিবার জন্য ধরিত্রী সাগ্রহে বুক পাতিয়া দেয়—এ নারী, সে নারী নহে। এ নারী "লজ্জা সরম ধরম করম" কালিন্দীর নীরে বিসর্জ্জন দিয়া, কলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া, বাসমুক্ত উলঙ্গ দেহে পরপুরুষের কণ্ঠবিলম্বিনী হইবার জন্য ব্যাকুলা। পূতোজ্জ্বলা পুণ্যের প্রতিকৃতি নারীর কি ঘৃণিত কালিমালিপ্ত চিত্র ! সতীত্ব নারীর ধর্ম্ম, বা নারীত্বের গর্ব্ব, এবং সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে অদেয় অমূল্য ধন। এ নারী উন্মত্ত ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম উত্তেজনায় সেই অমূল্য ধন লালসার পঙ্কিল হ্রদে নিক্ষেপ করিয়াছে ; জীবনপাতেও আর কখনও তাহা ফিরিয়া পাইবে না। আজ সে প্রবৃত্তির দাসী। তাহার নয়নে আর সে মধুর চাহনি নাই, লালসার লেলিহান শিখা তাহাতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে ; তাহার প্রতি নিশ্বাসে দাবাগ্নি-তাপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ; প্রতি কথায় ঝলকে ঝলকে গরল উদ্গীরিত হইতেছে। আজ সে সমাজের চক্ষে, সংসারের চক্ষে, ততোধিক ঈশ্বরের চক্ষে উপেক্ষিতা হইয়া, আপনার জন্য নিরয়দ্বার উন্মোচিত করিয়াছে। "নারীমঙ্গল" ও "কালিদাসের জয়"—এই উভয় কবিতার মধ্য দিয়া কবি অতি সুকৌশলে পুণ্য ও পাপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্ধকারের পাশে আলোক বড় উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে ! উভয় কবিতাই কবির কবিত্ব-কুবলয়ের মধুর সৌরভে পরিপূর্ণ।

কবির "মা" কবিতাটি তাঁহার পবিত্র আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। আমরা সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন পরিহার করিতে পারিলাম না।—

তবু ভরিল না চিত্ত ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিনু পুলকে,

বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণীসঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি, ভৈরবে বেড়িয়া
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব্বতীর্থ-সার
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার !

শত সহস্র অলঙ্কার, অসংখ্য বিশেষণ, এই "সর্ব্বতীর্থসার" কথা কয়েকটির নিকট মূক হইয়া গিয়াছে। বুঝি "সর্ব্বতীর্থসার" কথা কয়েকটির স্থানে আর কোন কথা বসাইলে মার অপার মহিমা এমন অক্ষুণ্ণ থাকে না, বুঝি তাহার পবিত্রতা এত প্রভাম্বিত হয় না, বুঝি আন্তরিকতা এত পরিস্ফুট হয় না। মা বড় মধুর শব্দ। মা নামে অদম্য রিপু শিথিল হয়, প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠে, নয়নে আনন্দাশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়। সংসারের সকল দারিদ্র্য দুঃখ মা'র কোমল কোলে নির্ব্বাণ লাভ করে, তাপজ্বালা সেই স্নেহশীতল-বক্ষে স্নিগ্ধ হইয়া যায়, শোকযাতনাবহ্নি মা'র আশীর্ব্বাদ সুধায় নির্ব্বাণ লাভ করে। পৃথিবীর সমগ্র তীর্থের সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত পুণ্যরাশি অপেক্ষাও পবিত্রতর—মার শ্রীপাদ-পদ্ম। মা—প্রকৃতই সর্ব্বতীর্থ-সার। আমরা তীর্থে যাই পুণ্য সঞ্চয় করি—স্বর্গপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। সেই বাঞ্ছিত স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়ান জননীর পদকোকনদ। আন্তরিকতাশূন্য কোন কথা কখন কাহারও প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না।—কবির "মা" কবিতা আন্তরিকতাপরিপূর্ণ ;—তাই এত মধুর—এত মর্ম্মস্পর্শিনী—এত আনন্দদায়িনী।

"বিধবার আরসী"—একটি ভাবৈশ্বর্য্যশালিনী কবিতা। কবির অপূর্ব্ব দর্শনশক্তি এই আরসীর অঙ্গে বিধবা নারীর যে চিত্র দেখিয়াছে, তাহা সমগ্র হিন্দু বিধবার চিত্র। এ চিত্র ব্যক্তিগত নহে—সার্ব্বজনীন। কবির কবি-প্রতিভা জড় আরসীকেও মুখর করিয়া তুলিয়াছে।—

সধবা আছিল যবে, এ মুখ নেহারি মোর
কতই সে পাইত গো সুখ ;
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুকটুকে মুখ।
গিয়েছে সোহাগ জানা, বোঝা গেছে ভালবাসা
এ ধরায় কেহ কারো নয়
ছ' মাস চলিয়া গেল, একবার নাহি এল ;
দেহ মোর কালিঝুলিময়।

"আরসীর" এ উক্তি বিষাদোদ্বেলিত শোকসিন্ধুর তীব্র উচ্ছ্বাস। ছয় মাস পূর্ব্বে যে রূপ-চঞ্চল, লাবণ্যচলচল, অলঙ্কার-বলয়িত 'তনুয়া' আরসী-সরসীতে নিত্য অবগাহন করিত ; যে তাম্বূলরাগরঞ্জিত-ওষ্ঠাধর, যে বিলাসবিভ্রমপূর্ণ নয়নযুগল,—নয়নের যে মোহন কটাক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যে টিপ-পরা হাসিভরা "অরবিন্দ"-নিভ "টুকটুকে" একখানি মুখ, প্রতিদিন "আরসী"র অঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইত,—আজ আর তাহা হয় না। পতিসঙ্গে সতীর এ সকলই অনুগমন করিয়াছে। সীমন্ত-সিন্দূরের সঙ্গে সঙ্গে, সাধ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলারূপিণী নবদুর্গা-মূর্ত্তিখানি আজ মহা অমঙ্গলা-রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাণ চলিয়া গিয়াছে ;—দেহ আছে ! কায়া গিয়াছে—ছায়া রহিয়াছে ! আরসীর

সহিত আর এখন তাহার সম্বন্ধ কি? আরসীর সহিত পূর্ব্ব-সখীত্ব আজ সপত্নীত্বে পরিণত হইয়াছে। তাই "আরসী" বলিতেছে,—

ভুল ভুল!-"সখী" নয়, সে মোর 'সতীন' হয়,
সব কথা বুঝিয়াছি আমি;
যামিনী হয়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর,
—একদিনে দু'সতীনে হারায়েছি স্বামী।

এই বিরহ-বিধুরা মুখরা "আরসীর" মুখে কবি সমগ্র হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'বিধবার আরসী' ত সকলেই দেখে, কই তা দেখিয়া কয় জনের হৃদয়ে এমন অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে? যিনি এই প্রকার নিত্যদৃষ্ট, সহজ-পরিচিত সামগ্রীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে এমন একটি অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় ভাবের রাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবি। কবির এই "বিধবার আরসী" বিষাদের জীবন্ত চিত্র হইলেও, বড় সুন্দর—বড় মধুর।

সাবিত্রীর মহাকালের নিকট হইতে পতির অমরত্ব মাগিয়া লওয়া প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য। সাবিত্রী সমগ্র সতী নারীকে শিখাইয়াছেন যে, যাহার অন্তর অনন্ত প্রেমের আকুল উচ্ছ্বাসে অনুক্ষণ সিক্তিত হইতেছে, যে অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আপনার স্বামীকে আপনার ক্ষুদ্র বুকটুকুর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহার স্বামী কখনও মরে না। কবি দেবেন্দ্র-নাথের "পাগলী বিধবার গান" সেই অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনের করুণসঙ্গীত। "পাগলী বিধবা" গাহিতেছে,—

হো-হো-হো সধবা করিতে চায়!
চিরবিরহের, কত যে আমোদ,
এরা কিছুই বোঝে না হায়

* * *

ছিল একটি আমার স্বামী—
এখন নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
শিশুর নধর-অধর ভিতরে,
যুবার শোভার কহ্লার-সায়রে,
যুবতীর স্থির আঁখির মাঝারে
(মোর) শত-শত স্বামী তার!

শিবের চকিত ত্রিনেত্র ভিতরি,
বিশ্ব যুড়ি যেন রাজরাজেশ্বরী!
অর্জ্জুনে বুঝাতে বিশ্বের আভাস,
মদনমোহন মূরতি প্রকাশ!
এরা দেখেও দেখে না হায়!

* * *

আমি স্বামী পাছে ছায়া আছিরে লাগিয়া
সৌরভ যেন রে কুসুমে বেড়িয়া;
শ্যামলতা যথা পল্লবের মাঝে,
কোমলতা যথা কুসুমে বিরাজ,
তেমনি অভেদ তনু!

এই বিধবা সামান্যা পাগলী বলিয়া উপেক্ষিতা হইবার নহে। এই বিধবার কণ্ঠে আজ বিশ্বের অক্ষয় প্রেম-মাহাত্ম্য গীত হইতেছে। সে আজ বিশ্বের রূপে পতির রূপ দেখিয়া, সেই অসীম রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিবার জন্য উন্মাদিনী হইয়াছে। যে ব্যক্তিগত পতিত্বের নিকট সে দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছিল,—যাহার মুহূর্ত্তের বিরহে সে কাঁদিয়া আকুল হইত,—যাহার একটি চুম্বনের জন্য তাহার তৃষিত অধর অধীর হইয়া উঠিত,—যাহার প্রফুল্ল-আননের মধুর-সম্ভাষণ শুনিবার জন্য তাহার ব্যগ্র হৃদয় আবেগে উছলিয়া উঠিত,—আজ সে পতির কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। যে বিকশিত-যৌবনের মুকুলিত-অনুরাগ, সেই বাঞ্ছিত-ধনকে শিরীষ-

কোমল বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিত,—যাহার প্রিয়সম্ভাষণ শুনিতে না পাইলে অভিমানে আরক্ত গণ্ডস্থলে অশ্রুমুক্তা ঝরিয়া পড়িত, যাহার অনাদর-আশঙ্কায় ক্ষুদ্র হিয়া দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত,—তাহার সেই বাঞ্ছিত আজ আর তাহার বাঞ্ছনীয় নহে। আজ বিহগের কণ্ঠে তাহারই স্বামীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে; কল্লোলিনীর কলতানে তাহারই স্বামীর অব্যক্ত প্রণয়কাহিনীর অনন্ত উচ্ছ্বাস উছলিয়া পড়িতেছে; শারদ-জ্যোৎস্নার তরলাভায় তাহারই প্রাণাধিকের অপরূপ রূপ-প্রভা প্রভাসিত হইতেছে; বাসন্ত-মলয়ের মৃদুল স্পর্শে তাহারই প্রাণেশ্বরের হর্ষ-আকুল কোমল করের রোমাঞ্চস্পর্শ অনুভূত হইতেছে, ফুল-মালঞ্চের ফুল্ল হাসিতে তাহারই প্রিয়তমের প্রফুল্ল-মুখের শুভ্র-হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সিন্দূর-হীন সীমন্তে, আজ শত শত সুরলোকবাসিনী-সুর-ললনার সীমন্তসিন্দূর ঝরিয়া পড়িতেছে। —সে আজ, জরামৃত্যুময় সংসারের মরণশীল পতির পরিবর্তে, অনাবিল-প্রেমের অক্ষয় আধার নিখিলের পতি শ্রীপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া, অনন্ত-প্রেমের অপূর্ব্ব মাল্য সেই গলায় দোলাইয়া দিয়াছে।

এই অনাবিল শান্ত শুদ্ধ অসীম প্রেম-মাহাত্ম্যের মহিমা-ব্যাখ্যাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্যতর একটি উদ্দেশ্য। নতুবা, যাহা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ, তাহা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পঙ্কিল; তাহা স্বার্থদিগ্ধ, লালসাস্পৃষ্ট, ভঙ্গুর ও ক্ষণিক। শ্রেষ্ঠকাব্যের পক্ষে তাহা পরিত্যাজ্য —অস্পৃশ্য।

"বিধবা নারী"—এই কবিতা ব্যক্তিগত আদর্শে রচিত হইয়া থাকিলেও, ইহার মধ্যে সমগ্র হিন্দুবিধবার সংযত ব্রহ্মচারিণীমূর্ত্তির পবিত্র শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে ও অপূর্ব্ব বর্ণনাচাতুর্য্যে "বিধবা নারী" ত্রিবেণীতীর্থ।

আমারা এত ক্ষণ ধরিয়া কেবল কবির বিষাদের চিত্রগুলিই দেখাইলাম; এইবার দুই একটি সৌন্দর্য্যের চিত্র দেখাইব।

"লক্ষ্ণৌর আতা,"—কবির কলাচাতুর্য্য ও তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যদৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয়। পাঠকগণ একবার এই রসেভরা আতাটি দেখুন।—

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্ষুব্ধ
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর!
চাহি নাক 'সেউ'—যেন বিরহবিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির!
একটুকু রসে ভরা চাহি না আঙ্গুর
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটীর!
চাহি না 'গন্নার' * স্বাদ কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতীর!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া;
চঞ্চলা বেগম কোন হয়ে উল্লাসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা উপরি!

আমরা কবির স্পৃহনীয় এই সুমিষ্ট আতাটির রস বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহার সরসতা নষ্ট করিব না। বক্ষ্যমাণ কবিতা দেবেন্দ্রবাবুর মৌলিকতার অন্যতর সুন্দর নিদর্শন। যিনি একটি

* লক্ষ্ণৌ সহরে ইক্ষুকে 'গন্না' বলে।

সামান্য আতায় এত রসের, এত অলঙ্কারের সমাবেশ করিতে পারেন, তাঁহার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই কাব্যরসের স্বতঃউৎসারী উৎস, এবং সেই উৎসের তলদেশে যক্ষের প্রহরায় কবিত্বের কুবের-ভাণ্ডার বিদ্যমান।

"অশোক-গুচ্ছের" শেষ কবিতা "অশোকতরু" অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যকাহিনীর অভিনব ব্যাখ্যা। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যকাহিনীর অন্তরালে একটি মৌন শোককাহিনীর অস্ফুট বিলাপ ধ্বনিত হইতেছে। কবি বলিতেছেন,—

——বৃথা এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু জীব প্রাণী!
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়েছে ভুলে অশোক-কাহিনী!
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা';
তেমতি, অশোক, তোর লালে লাল খেলা!

"অশোককাহিনী"—আমাদিগকে রাক্ষসকারাবাসিনী দুঃখিনী জানকীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তখন বোধ হয়, অশোক বিষাদিনী জানকীর রোদনলোহিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহানুভূতি ও সমবেদনায় "লালে লাল" হইয়া গিয়াছিল, অথবা ইন্দ্রিয়পরায়ণ দশাননের অত্যাচারদর্শনে ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, অশোক আজ আপনার পূর্ব্বজীবন-কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে; কেমন করিয়া সে "লালে লাল" হইল, তাহা আর তাহার মনে নাই। আজ অশোক নবীন জীবন লাভ করিয়া,নব সৌন্দর্য্যে মধুর হাসি হাসিতেছে। 'দেয়ালা' করিতে করিতে শিশুর আননে যেমন হাসি কান্নার যুগপৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই অশোকতরুর জীবনকাহিনীর মধ্যেও, কবি, তেমনি হর্ষবিষাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন।

সুমধুর সুললিত শব্দ-সম্পদে কবিতার রূপতরঙ্গ উছলিয়া উঠে; ঝঙ্কারের মধুর তাললয়ে (Rhym এবং Rhythm হইতে ঝঙ্কারের উৎপত্তি) কবিতা শ্রবণমোহিনী হয়। ঝঙ্কার কবিতার অন্যতর গুণ। "ডায়মণ্ডকাটা মল" ঝঙ্কারময়ী কবিতার সুন্দর উদাহরণ। প্রবন্ধ-সংক্ষেপার্থ আমরা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিলাম। এই "ডায়মণ্ডকাটা মলের" ছন্দ ও ঝঙ্কারে একটি সুমিষ্ট সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতের তিন প্রকার শ্রোতা;—কেহ সুর ভালবাসেন, কেহ তাললয়ে আকৃষ্ট হন, কেহ বা তাহার কবিত্ব উপভোগ করেন। যাঁহারা সুর ও তাললয়ে লুব্ধ, তাঁহারা "ডায়মণ্ডকাটা মলের" শব্দে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। "ঝমর ঝমাৎ ঝম্, ঝমর ঝমাৎ ঝম্" অপেক্ষা যখন "ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্" শব্দে প্রিয়তমার ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি মলের শব্দে বাজিতে থাকে, তখন অনেক নববিবাহিত পতির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ইংরাজি কোন কোন কবিতা সুধু ছন্দের ঝঙ্কার-উৎপাদনের অভিপ্রায়ে রচিত হইয়া থাকে। আমাদিগের বোধ হয়, বক্ষ্যমাণ কবিতাও সেই অভিপ্রায়ের সুমধুর সার্থকতা। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, কবি শ্বশুরবাড়ী গিয়া তাঁহার "রাঙ্গাদিদির" প্রশ্নোত্তরে যে অপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা তাঁহার intellectএর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

"কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী"তে কবি সমাজের বুকে শ্লেষের শক্তিশেল নিক্ষেপ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণপূর্ণ সহানুভূতির দ্রবময়ী ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু সহানুভূতি হয় কাহার জন্য? যে দুঃখ নীরবে সহ্য করে। কুলীনব্রাহ্মণপত্নী কলঙ্কিনী, তাহার

ঘৃণিত জীবনকাহিনীর সাফাই গাহিতে গিয়া, স্বীয় পতির উদ্দেশে যে অপ্রীতিকর উক্তির প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি অধিকতর ঘৃণার উদ্রেক হয়। পতি হিন্দুরমণীর —ভূদেবতা। দীন দরিদ্র হউক, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হউক, কদাকার কুৎসিত হউক,—পতি সকল অবস্থাতেই হিন্দু নারীর উপাস্য। "কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী"তে সহানুভূতির উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু, নীতি বড়ই উপেক্ষিত হইয়াছে, এবং সেই জন্য আদর্শও খাটো হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, যেখানে নীতিবেত্তার শত উপদেশ কার্য্যকর না হয়, সেখানে কবির দুই চারিটি বাক্য মর্ম্মে অশ্রুপাত করে। ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ—স্থূল, কাব্যের উপদেশ—সূক্ষ্ম।

"অশোকগুচ্ছে"র প্রায় সকল কবিতাই কবির কবিত্বের পরিচায়ক। কি হর্ষসঙ্গীত, কি বিষাদগাথা, উভয়ই তাঁহার প্রতিভায় প্রদীপ্ত। "রাধারাণী", "এই নাও", "কৌটার সিন্দুর", "যাব না, যাব না" প্রভৃতি কবিতা পড়িয়া আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার হর্ষসঙ্গীত অপেক্ষা বিষাদগাথাগুলিই যেন অধিকতর মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, "our sweetest songs are those that tell of our saddest thought."

কবির রাজ্য বড় উচ্চ, বড় সুন্দর, বড় মহিমময়। উত্তুঙ্গ শৈলশিখরস্থ ব্যক্তি যেমন বায়ুর প্রবল তাড়না, রৌদ্রের খর তাপ, বৃষ্টির নির্দ্দয় প্রহার প্রভৃতির মধ্যেও প্রকৃতির দিগন্তব্যাপ্ত বিশ্ববিমোহন নগ্ন সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণে অবর্ণনীয় আনন্দের অনুভব করে; আমরাও তেমনই, কবির বিষাদগাথা বিরহগাথার মধ্যেও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করি। যদিও পড়িতে পড়িতে অশ্রুবেগরোধ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, তবুও সে অশ্রুতে সুখ আছে। সে অশ্রু বিষাদের অশ্রু নহে, দ্রবীভূত আনন্দধারা।

মৌলিক কাব্য "অশোক-গুচ্ছে"র প্রণেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন—প্রতিভাসম্পন্ন কবি। কল্পনার হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, অতি কষ্টে তাঁহাকে কাব্যোপকরণ চয়ন করিতে হয় নাই; তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী কল্পনা তাঁহার জন্য নিত্যসেবিত, সদা-পরিচিত গৃহসংসারের মধ্যেই কাব্যের উপাদানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার রচনার কোথাও চেষ্টা বা আয়াসের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। পড়িলেই বোধ হয়, যেন তাঁহার রচনা শৈল-নন্দিনী নির্ঝরিণীর ন্যায়, আপন আবেগে আপনি চঞ্চলা। কবিতা যদি হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত না হয়, তবে তাহা কবিতার আবৃত্তিমাত্র।

আজকাল অধিকাংশ কবিতা পড়িলেই যেন মনে হয়, তাহা একটি প্রতিধ্বনি; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কবিতা একটি স্বাধীন ধ্বনি;—যেন সচ্ছন্দ পিকের সানন্দ-ঝঙ্কার।

"অশোক-গুচ্ছ" রচনা করিয়াই যে দেবেন্দ্রনাথ কবি নামে পরিচিত হইতেছেন, তাহা নহে। যখন "ভারতী ও বালক" সাহিত্যসম্ভাষণে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই দেবেন্দ্রনাথের মুকুলিত কবি-প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল। তার পর, "সাহিত্যে" সেই বিকশিত-প্রতিভার সুষমা সৌরভ সাহিত্যোদ্যান আমোদিত করিয়া তুলিল। তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম, আগতপ্রায় ভবিষ্যতের আবছায়ে তাঁহার জন্য প্রতিষ্ঠার সিংহাসন রচিত হইতেছে। আজ তাঁহাকে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, আমরা সানন্দচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

সমাধিমন্দিরে।

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক পাইচারি করিতে লাগিলেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন বেলা আন্দাজ ৫টা। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন; দুই চারি জন ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে। জিজ্ঞাসা করাতে এক জন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কত দূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়!' গানটি এই :—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত; (কিবা) বিজলী চমকে,
সে রূপ-আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি 'কোটী শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছিলেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বরদর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল,—

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম-নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।"

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য—শরীর সেইরূপ নিঃস্পন্দ ও স্তিমিত-লোচন, কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছিলেন; আর সেই অপ-রূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছিলেন।

এইবারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দ রসে, হায়রে)
(প্রেমানন্দরসে)

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল,—

প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।
(হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)

নরেন্দ্র-ভবনাথাদি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ।

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা ৩ টার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেয় মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা; ১৯, ২০ বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরা-দের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে!' বলিয়াই হাস্য। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—

"দ্যাখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম থাইয়ে দিছিল। তার পর দিন ঠিক চারটার সময় সেই ময়ূরটা এসে উপস্থিত—আফিমের নেশা লেগেছিল—মৌতাত ধরেছিল—তাই আবার ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।" (হাস্য)

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি ত ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন্ দেখিব কখন্ দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আন্‌লে। মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই,এখানে আস্‌তেই হবে। এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এ দিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগলেন, যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে। মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁর কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তিই কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথমদিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করেছিলেন? ইনি কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য, আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছিলেন ?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ এর একটু উমের বেশী কি না, তাই একটু গম্ভীর। এরা এতো হাসি খুসী করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন ২৫।২৬ হইবে।

'ব্রহ্মকল্পতরু'।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, হনুমানের কি ভাব। ধন, মান, দেহসুখ, কিছুই চায় না, কেবল ভগবানকে চায়। যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পলাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে, ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়। সে বললে,—

আমার কি ফলের অভাব,
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরাম-কল্পতরু-মূলে বসে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই (ধনী গো) ও ফল গ্রাহক নই,
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।

পুনঃ সমাধি।

গান গাইতে গাইতেই আবার সেই সমাধি অবস্থা, আবার নিঃস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন,দেহ স্থির,বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা, যাহারা এইমাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিল, সকলেই একদৃষ্টি হইয়া সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল, মুখ সহাস্য হইল, ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে ফিরিতে লাগিল। ঠাকুর চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই ছেলেদের সঙ্গে ফচকেমি করিতেছিলেন। তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক। ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন,—"তোমরা দু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও তর্ক বিচার করো, আমি শুনবো।" মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দু' জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের তর্ক বিচার আর সম্ভব নয়—তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ্ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা আর হইল না।

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরে ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টার ও ঠাকুর বাড়ীর এ দিক ও দিক পায়চারি

করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ্ আর একটু বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আসছিস কি না। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন —পতি। কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র বলিলেন, "হাঁ চেষ্টা করবো।" আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। তারা ভাল গরু মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে; সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। এই যে নরেন্দ্রকে দেখছো, এ সেই গরুর জাত। ভিতরে খুব তেজ আছে।" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ করগে যাও। আমায় বলবে কি রকম ছেলে।"

মাষ্টার, অনেক ক্ষণ পরে যখন আরতি হইয়া গেল, চাঁদনির কাছে বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কালেজে পড়িতেছি, ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। আবার বড় সাধ যে, তাঁর মুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরমধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল! বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দেখাইতেছিল।

মাষ্টার সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর বলিলেন, "না,আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, "তবে এক কর্ম্ম করো। আমি বলরামের বাড়ী কলিকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।" মাষ্টার বলিলেন, "যে আজ্ঞে।" শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সঙ্গে (নাট মন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। "আচ্ছা,তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,আমাকে তোমার কি বোধ হয়?"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?"

মাষ্টার। আনা এ কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা ভক্তি বা বিশ্বাস কোথাও দেখি নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না; তাই সেখানে যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তা হলেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে। মাষ্টার যে আজ্ঞা বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈজ্ঞানিকের ডালি।

দিনের বেলায় নক্ষত্রদর্শন।

যে তারাটি কখন কখন পশ্চিমাকাশে, রাত্রির প্রথম ভাগে, অন্য সকল তারা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ও বৃহত্তর দেখায়, তাহার নাম শুক্রগ্রহ (ইংরাজী নাম ভিনাস।) এই তারাটিই আবার সময়ে সময়ে শেষরাত্রে পূর্ব্বাকাশে

তদ্রূপ উজ্জ্বল ও বৃহৎ দেখায়।* যখন পশ্চিমাকাশে ইহা বড় দেখায়, তখন ইহার একটি স্বতন্ত্র নাম; যথা, সন্ধ্যাতারা (বাঙ্গালা), ভেস্‌পার (Vesper) ইংরাজী। যখন ইহা পূর্ব্বাকাশে বড় দেখায়, তখনও ইহার ভিন্ন নাম আছে—যথা শুকতারা—(বাঙ্গালা) লুসিফার (Lusifer)—ইংরাজী। কিন্তু এই সকল নাম এখন প্রায় কাব্যেই সীমাবদ্ধ।

এই তারাটির সহিত আমরা অতি শৈশব হইতেই পরিচিত। বোধ হয়, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে জননী দিবাবসানে দৈনিক কঠোর শ্রম হইতে একটু অবসর পাইয়া আদরের খোকাকে কোলে লইয়া আকাশমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকেন।—এই পৃথিবীর ধূলিঝঞ্ঝাতে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ঐ সুনীল নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন। এরূপ সময়ে প্রথমেই যে তারাটি তাঁহার চোখে পড়ে—এবং যাহা তিনি অতি আগ্রহে কোলের নয়নতারাটিকে দেখাইয়া থাকেন, সেই তারাই ঐ শুক্রগ্রহ। শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে অনিমেষনয়নে উহার উজ্জ্বল গৌর কান্তি ও বিপুল বিশ্বের দিকে চাহিয়া থাকে। ক্রমে এই শিশু বড় হইয়া যদি কোনও দিন ধূলাখেলা ভুলিয়া দূরবীক্ষণ লইয়া খেলিতে বসে, তখনও বোধ হয়, সে সমুদয় জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা শুক্রগ্রহকেই বেশী ভালবাসিয়া থাকে। এত মাথামাখি ও এত ভালবাসার জন্যই বুঝি সকল দেশে ইহার এতগুলি করিয়া নাম রাখা হইয়াছে। আর কোনও তারার ত এত নাম দেখি না! বহুদিন পরে গৃহস্থের ঘরে যদি একটি শিশুর উদয় হয়, যাহার জন্য পুরাতন দুধের

---

* প্রতি উনত্রিংশৎ মাস অন্তর ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এই যে সন্ধ্যাকালে বড় দেখা বা শেষরাত্রে বড় দেখা,—তাহা ২৯ মাস পরে পরে হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এইরূপ বড় ও অন্য সময়ে ছোট দেখাইবার কারণ এই যে, চন্দ্রের ন্যায় শুক্রগ্রহেরও আকারের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তবে যে ইহার অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রভৃতি নানাপ্রকার মূর্ত্তি (যাহা চন্দ্রের বেলা দেখিয়া থাকি) দেখা যায় না, সে শুক্রের অত্যুজ্জ্বল আলোর জন্য। আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে পরিমাণে আলো পাইয়া থাকে, শুক্র সূর্য্যের সান্নিধ্যবশতঃ তাহার দ্বিগুণ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহার চতুর্দ্দিকে যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহা আলোর পক্ষে এমন দুর্ভেদ্য যে, আমরা শুক্রের প্রকৃত মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না বলিলেই হয়; আমরা কেবল বায়ুমণ্ডলটি দেখি; সেই জন্য উহাকে গোলাকার বিন্দুরূপেই সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি। সূর্য্যমণ্ডল হইতে পতিত আলোকের শত করা পঁয়ষট্টি অংশ প্রতিফলিত (reflected) হইয়া থাকে; এই জন্য উহাকে এত উজ্জ্বল দেখায়।

বাটি ও ঝিনুকের সন্ধান পড়ে,তাহা হইলে যেমন সেই শিশুর রাশি রাশি নাম হইয়া থাকে,—মা, ঠাকুরমা, খুড়া, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি 'নসী' 'শশী' 'মাখন' 'বোচন' কত কি নাম রাখিয়া থাকেন, সেইরূপ রৌদ্রতপ্ত সুদীর্ঘ দিবাবসানে প্রথমে যে তারাটির স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহারও কতকগুলি নাম না হইলে মনের তৃপ্তি হইবে কেন ?

সে যাহা হউক, এই তারাটির সম্বন্ধে একটি কথা বোধ হয় অনেকের জানা নাই যে, দিবাভাগেও—এমন কি মধ্যাহ্নেও—ইহাকে দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখা যায়। তবে বেলা বারটার কাছাকাছি সময়ে আমাদের মত দেশে মার্ত্তণ্ডের খরতর কিরণের সম্মুখে ইহার আলো এত অস্পষ্ট থাকে যে, তখন সকল চক্ষু ইহাকে দেখিতে পায় না ; কিন্তু এ দিকে প্রাতে ৯টা ১০টা ও অপরাহ্নে ২টা ৩টার সময় ইহাকে অনেকেই দেখিতে পারেন ; এবং তাহাতে দূরবীক্ষণের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক,—ঐ সকল সময়ে এই তারাটি আকাশমণ্ডলের কোন্ স্থানে অবস্থান করে, তাহা জানা থাকা আবশ্যক। নতুবা বিশাল আকাশে ইহার অনুসন্ধান ফলপ্রদ না হইতেও পারে।

প্রথমে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তারাটিকে দেখিয়া পরে সেই দূরবীক্ষণের নলের পার্শ্ব দিয়া (যন্ত্রসাহায্য ব্যতিরেকে) চাহিলে উহাকে দেখা যাইবে। একবার দিনের বেলায় চন্দ্রের অতি সন্নিকটে এই নক্ষত্রটিকে দেখা গিয়াছিল ; খবরের কাগজে সংবাদটি উঠিয়াছিল ; এবং সেবার প্রায় সকলেই ইহাকে দিনের বেলায় দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে,চন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ সকলেই উহার বাসস্থান সহজে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া চন্দ্র দ্বারা অন্য একটি উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়াছিল। কোন সুদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিবার সময়ে আমাদের চক্ষুকে তাহার উপযোগী করা আবশ্যক, অর্থাৎ অক্ষিগোলককে আংশিক সম্প্রসারিত করিয়া 'ফোকস্' ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। চন্দ্রের দিকে চাহিবার সময়েই আমাদের সেই 'ফোকস্' ঠিক করা ব্যাপারটি সম্পন্ন হইয়া যায় ; এবং চক্ষুর সেই অনুকূল অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিতে থাকিতেই আমরা চন্দ্রের অদূরবর্ত্তী নক্ষত্রের দিকে চাহিলে অনায়াসেই তাহাকে দেখিতে পাই। নক্ষত্রটি চন্দ্র হইতে বেশী দূরে থাকিলে, বিশেষতঃ উহার অবস্থানের স্থান পূর্ব্বে জানা না থাকায় এ দিকে ও দিকে অন্বেষণ করিতে হইলে, অনেক স্থলে ফোকস্ ভঙ্গ হইয়া যায় ; তবে এ

বিষয়ে অভ্যস্ত শিক্ষিত চক্ষু চন্দ্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও নক্ষত্রটিকে বাহির করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই।

অন্ধ মৎস্য।

সম্প্রতি লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় কেণ্টাকী (ইংলণ্ডের অন্তর্গত) হইতে কয়েকটি জন্মান্ধ মৎস্য আনীত হইয়াছে। এগুলি তথাকার প্রসিদ্ধ 'ম্যামথ-কেভ্' নামক গুহায় ভূনিম্নস্থ চিরতিমিরাবৃত জলে বাস করিত। এই অসূর্য্যম্পশ্য জেনানা-প্রথার উৎকট-পক্ষপাতী মৎস্যগুলি জড় জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মূল কারণ আলোকের বিরহে লাল নীল পীত হরিত প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার বর্ণে বঞ্চিত। দীর্ঘকাল হাঁড়ীঢাকা দুর্ব্বার মত ইহাদের গায়ের রং শাদা, ফেকাশে,—বড়ই অপ্রীতিকর। ইহারা যখন এই বীভৎস শুভ্রদেহ লইয়া অন্ধত্ববশতঃ বেকুবের মত ধীরে ধীরে বিচরণ করে, তখন বড় অদ্ভুত মনে হয়। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র; খুব বড়গুলিও পাঁচ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের চক্ষু চর্ম্মের নিম্নে লুক্কায়িত আছে। বোধ হয়, নিবিড় অন্ধকারে ইহাদিগকে আজন্ম বাস করিতে হইয়াছে বলিয়া ইহাদের চক্ষুর কখন ব্যবহার হয় নাই; এইরূপে সর্ব্বদা ইহাদের চক্ষু নিমীলিত থাকিত বলিয়া কালসহকারে ইহাদের চোখের দুইটি পাতা জুড়িয়া এক হইয়া গিয়াছে, এবং এইরূপে ইহাদের চক্ষু চর্ম্মের নিম্নে ডুবিয়া যাওয়াতে ইহারা অন্ধ হইয়া গিয়াছে; এখন ইহারা পুরুষানুক্রমে জন্মান্ধ হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিতবর ডার্‌উইন্ যে বলিয়া গিয়াছেন, ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ-বিশেষের দীর্ঘকাল অব্যবহারবশতঃ সেই ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ কালে লুপ্ত হইয়া যায়, এ কথা এই অন্ধ মৎস্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। মানুষের নাকি ব্যাঘ্র কুকুর প্রভৃতির ন্যায়, মুখের সম্মুখে উপরে নীচে চারিটি বড় দাঁত ছিল। কালসহকারে মানুষ যখন সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিল, যখন তাহাকে সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে হইল, তখন হইতে তাহার এই চারিটি দাঁতের ব্যবহারও উঠিয়া গেল। এইরূপ, মানুষ এক সময়ে হস্তী হরিণ গাভী প্রভৃতির ন্যায় নিজের কান ইচ্ছামত সঞ্চালন করিতে পারিত, তাহাতে শত্রুর আগমনশব্দ শুনিতে পাইবার যথেষ্ট সুবিধা হইত। কালে মানুষ জীবজগতে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহার শত্রুভয় কমিয়া গেল, ও সেই সঙ্গে তাহার কাণের ঐ ব্যবহার

বিলুপ্ত হইল। এইরূপ, কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মুখে শুনা যায় যে, মানুষের (এবং গরুর) মস্তকে নাকি আর একটি চক্ষু ছিল, তাহা ব্যবহারাভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ চক্ষুর চিহ্ন এখনও নাকি মানুষের ও গরুর মাথায় আছে। এখনও যে সময়ে সময়ে গরুর তিন চক্ষু দেখা যায়, তাহা নাকি বিলুপ্ত চক্ষুর পুনরাবির্ভাবমাত্র। মানুষের লাঙ্গুলের অস্তিত্ব অনেকেরই বিদিত, সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একবার খবরের কাগজে দুইটি শ্যামদেশীয় লোকের বৃহল্লাঙ্গুলবিশিষ্ট চিত্র দেখিয়াছিলাম।

কাঁকড়া ও লব্‌ষ্টার।

কাঁকড়া ও লব্‌ষ্টার নামক চিংড়ী মাছ (যাহা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, বিলাতে পাওয়া যায়) সম্বন্ধে "কন্টেম্পোরারী রিভিউ" নামক পত্রে সুন্দর একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; উহাতে উক্ত দুই জন্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক আমোদজনক কথা জানা যায়।

এই উভয় জন্তুই বহুরূপী। ইহারা প্রয়োজনমত, কখন বা আত্মরক্ষার্থ, কখন বা খাদ্যসংগ্রহার্থ, নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। কয়েক প্রকার ফড়িংএরও এই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তাহারা পক্ষিকুল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার আশঙ্কায়, পক্ষিকুলের অভক্ষ্য ফড়িংএর আকার ধারণ করিয়া থাকে; অথচ ইহারা পাখীদের অতি প্রিয় খাদ্য। ইহারা কখন কখন শত্রুকে ভীত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় শরীরের অংশবিশেষকে হুল-রূপে সাজাইয়া থাকে, কখন বা কাষ্ঠখণ্ড, তৃণ, বা বৃক্ষপত্রের আকার ধারণ করিয়া পড়িয়া থাকে, এই ছদ্মরূপপরিগ্রহে ইহারা ভক্ষক পাখীর হাত হইতে পরিত্রাণ পায়।

কাঁকড়া ও লব্‌ষ্টার উভয়েরই দেহ যেরূপ প্রকৃতিদত্ত কঠিন আবরণে সুরক্ষিত, তাহাতে ইহাদের আততায়ীর সংখ্যা বড় অধিক নহে; তবু যে ইহারা নানা মূর্ত্তি ধারণ করে, সে প্রধানতঃ আহারসংগ্রহের সুবিধার জন্য। কিন্তু ইহাদের যে একেবারেই শত্রু নাই, এমন বলা যায় না। যে বড় আকারের কাঁকড়া বিলাতের লোকের অত্যন্ত মুখরোচক ও পরিচিত, একরূপ ক্ষুদ্রজাতীয় কাঁকড়া তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। যেমন আমাদের দেশে একজাতীয় বড় ঘুণ আরশোলাকে আক্রমণ করিতে যাইয়া প্রথমেই তাহার চোখ দুটী নষ্ট করিয়া দেয়, এবং তাহাকে অবলীলাক্রমে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই ছোট কাঁকড়াও প্রথমেই

বড় কাঁকড়ার চোক দুটী নষ্ট করিয়া পরে তাহাকে বিনাশিয়া উদরস্থ করিয়া থাকে।

লবষ্টারগুলি সময়ে সময়ে স্ত্রীঘটিত মাম্‌লা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে। "বীরভোগ্যা সুন্দরী" কথাটা বোধ হয় ইহাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

হাঙ্গর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় মৎস্য প্রচুরপরিমাণে কাঁকড়া খাইয়া থাকে। এত বড় প্রবল শত্রুর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে ফল নাই, বোয়ারদিগের মত এই কথা জানিয়া ইহারা নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। আমাদের দেশের টিকটিকী-জাতীয় "বহুরূপী"র মত ইহারা আপনাদের বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। সমুদ্রতলের যে স্থানে ইহারা বাস করে, সেই স্থানের রং অনুসারে ইহারা রং পরিবর্ত্তন করে, তাহাতে ইহাদের আততায়ীরা ইহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া ফিরিয়া যায়। এইরূপ কখন কখন সমুদ্র-তলস্থ শৈবালের অনুকরণে হরিতবর্ণ, বা অন্য কোন বর্ণ অবলম্বন করিয়া এক দিকে যেমন ইহারা শত্রুর চক্ষে ধূলা দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্য দিকে ইহারা আপনাদের ভক্ষ্য জন্তুর চক্ষে ধূলা দিয়া অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। কখন কখন ইহারা সামুদ্রিক শৈবালের জামা গায়ে দিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া আত্মরক্ষা করে।

সহযোগী সহিত্য।

জীবনচরিত।

অধ্যাপক হাক্স্‌লে।

মানুষ যায়, নাম থাকে। বিজ্ঞানাচার্য্য হাক্স্‌লে আজ সমস্ত স্নেহমমতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সুখ দুঃখ ভয় ভাবনার অতীত হইয়া মরণসিন্ধুর পরপারে অসীম অজ্ঞাত অভিনব রাজ্যান্তরে নবজীবনের প্রশান্ত কর্ম্মক্ষেত্রের সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তমণ্ডলী আমরা এখনও সবিস্ময়ে একান্তভক্তিনম্রহৃদয়ে তাঁহার আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের নিগূঢ় সত্য রহস্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া সেই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি চিরনবীন করিয়া রাখিয়াছি। অসাধারণ সত্যানুসন্ধিৎসা, সুসূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং প্রভূত জ্ঞানসম্পদ যখন তাঁহাকে তৎসাময়িক বিজ্ঞানজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অগ্রণীরূপে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দান করিতেছিল, তখনও সেই সকল উন্নত মনোবৃত্তির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের জীবনে

একটি আদর্শ গৃহীর অকলঙ্ক চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। ইহার ফলে, তিনি জগন্মান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রীতি ও অনাবিল আনন্দের স্বর্গলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সংসারে এ চিত্র দুর্লভ নহে যে, যে সকল মহাত্মা পরকে আপন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক স্থলে আপনার জনকে পর করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের স্বীয় পারিবারিক ক্ষুদ্র স্বার্থ মানবসমাজের বিশাল সুখ দুঃখ স্বার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। যদিও হাক্স্‌লের জীবনে সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ ক্রমে প্রতিবেশীর স্বার্থে, স্বদেশের স্বার্থে এবং সর্ব্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবিরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি নিজ পরিবার ও স্বজন বন্ধুবর্গ কখনও তাঁহার হৃদয়াসন হইতে চ্যুত হয় নাই, পরন্তু বিশেষ কামনার বস্তুরূপে তাঁহার অন্তরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। এমন সুখের গৃহ, এমন মধুময় গার্হস্থ্য জীবন সাহিত্যসেবীর সংসারে সচরাচর সুলভ নহে! সম্প্রতি তদীয় পুত্র কর্তৃক অধ্যাপকের যে জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি চিঠিপত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেগুলিতে অধ্যাপকের নির্ম্মল গার্হস্থ্য জীবনের একটি মধুর আস্বাদ পাওয়া যায়। হাক্সলে পরিবার একটি অতি রমণীয় সুখী পরিবার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সন্তানেরা পিতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত, এবং পিতাও তাঁহার শত সহস্র আচরণে ক্ষুদ্র গৃহকোণের মধ্যে একটি রমণীয় দেবলোকের সৃষ্টি করিয়া অনুদিন সেই প্রশংসমান পরিবারের ভক্তি ও বিস্ময় আকর্ষণ করিতেন।

পিতা পুত্রের মধ্যে যে ভক্তি প্রীতি ভালবাসার এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিভিন্ন কর্ত্তব্যের একটি অপূর্ব্ব মোহবন্ধন আজীবন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্য ও পরমরমণীয়তা আমরা পিতা হইয়া পুত্রকে শিক্ষা দিতে শিখি নাই, এবং পুত্র হইয়াও পিতার নিকট উপযুক্ত বিনয়সহকারে শিক্ষা করিবার সার্থকতা উপলব্ধি করি নাই ;—অধ্যাপক হাক্স্‌লে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একবিংশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁহাকে যে সারগর্ভ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পিতা পুত্রের কর্ত্তব্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে পরিস্ফুট ধারণা জন্মে,—যাহা পিতার পক্ষে পরম পরিতোষজনক, এবং সন্তানের পক্ষেও একান্ত গৌরবসূচক। সেই লিপিখণ্ড চিরদিন সাহিত্যসংসারে অমূল্য রত্নরূপে বিরাজ করিবে। ভবিষ্যৎ পিতৃকুল ও সন্তানসমাজ তাহা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব সৌরভ ও সুখস্মৃতিতে নিমগ্ন হইতে পারিবেন, আর চিরদিন—তাঁহার সেই সস্নেহ সহাস্য সরল অসঙ্কুচিত উপদেশ কর্ত্তব্যবোধহীন পিতা পুত্রের মধ্যে সমস্ত ক্ষণিক ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। সমগ্র লিপিগুলি কি স্বদেশে কি বিদেশে অধ্যাপকের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়। তিনি যে একাধারে কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর, একান্ত বন্ধুবৎসল, পরিবারানুরাগী, দয়াবান ও আশ্রিতপরায়ণ ছিলেন, এই পত্রগুলি তাহার প্রকৃত নিদর্শন। সর্ব্বোপরি দেখা যায়, তাঁহার শান্ত সংযত সমাধিমগ্ন হৃদয়ের ব্যাকুল কল্পনা পৃথিবীর চিরন্তন কুসংস্কার ও ভ্রমান্ধতা সর্ব্বথা পরিহারপূর্ব্বক ব্যগ্র বিহঙ্গমের মত ধাবিত হইয়াছিল—যশঃস্বর্গের দিকে নহে, সত্য ও মানব কল্যাণের দিকে।

স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার একটা নিজস্ব মত ছিল। তাঁহার স্বভাবকোমল

হৃদয় অসহায় নারীজাতির প্রতি সততই অনুরাগী ছিল। তিনি পুরুষ ও নারীকে অসঙ্কোচে সমানভাবে উচ্চশিক্ষার অধিকারদানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পুরুষজাতি ও নারীজাতি সমানভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, স্ত্রীলোকে কালক্রমে পুরুষকে পরাজিত করিতে পারে, ইহা তিনি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। স্ত্রীজাতিকে বলপূর্ব্বক উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া পদানত করিয়া রাখা এবং ন্যায় ও সাম্যনীতির মস্তকে পদাঘাত করা তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বিবেচিত হইত।

Vivisection বা জীবশরীরব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে তিনি যদিও নিজে করুণাকাতর হৃদয় লইয়া সতর্কতার সহিত তাহার পরীক্ষা হইতে নিবৃত্ত থাকিতেন, কিন্তু বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বীকার করিতেন যে, সমগ্র মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণকল্পে জীবশরীরব্যবচ্ছেদে কোন দোষ নাই। জাতীয় স্বাধীনতারক্ষার্থে উভয় বা ততোধিক জাতির অনিবার্য্য সংঘর্ষে জাতিতে জাতিতে অজস্র রক্তপাত যদি মানবসমাজের স্বাভাবিক অধিকাররূপে গণ্য হইতে পারে, তবে বিধাতার এই সুবিপুল বিশ্বসংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি মানবের স্থায়িমঙ্গলকামনায় জীবের শরীরব্যবচ্ছেদ অসমীচীন নহে। ইহা বলা যাইতে পারে, মানবের ও জন্তুশরীরের এই রক্তহরণের মধ্যে কেবলমাত্র একটি স্তরের প্রভেদ ও পরিমাণের পার্থক্য বর্ত্তমান। পরিমিতসংখ্যক কয়েকটিমাত্র জন্তুর শরীরব্যবচ্ছেদের ফলে অসীম মঙ্গল লাভ করা যাইতে পারে। যে সকল সত্য কালের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ধীরে ধীরে লোকসমাজে সঞ্চারিত হইতেছে, পুনরায় তাহাদের পরীক্ষার্থ জীবন্ত জীবের অঙ্গব্যবচ্ছেদ অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচায়ক, কিন্তু যদি কোন সদাশয় মহাজন কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগকে মানবসমাজ হইতে দূরীকৃত করিবার কামনায় বদ্ধপরিকর হইয়া জীবশরীরব্যবচ্ছেদ আবশ্যক বোধ করেন, তবে আশা করি, নিরপেক্ষ মানবমাত্রই তাহাতে অসঙ্কোচে সায় দিবেন। হাক্সলের মত কতকটা এইরূপ ছিল।

স্বর্গীয় অধ্যাপকের এই নবপ্রকাশিত জীবনীপাঠে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ইংলণ্ডের অবস্থা ও ঘোরতর মসীযুদ্ধ ও বিতণ্ডার লুপ্তপ্রায় স্মৃতি নূতন করিয়া মনে পড়িয়া যায়। তখন ডারুইন-প্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তিবাদ বিজ্ঞানজগতে বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন বিজ্ঞানের ক খ পড়িয়াই লোকে মাথা নাড়িতে লাগিল, এবং যে অলোকসামান্য অমর প্রতিভা গতানুগতিকের পথ বর্জ্জন করিয়া সমগ্র জগতকে স্বাধীন চিন্তার অবসর দিয়াছিল, সাপ্তাহিকে মাসিকে সংবাদপত্রে গোপনে প্রকাশ্যে কদর্য্যভাবে তাহার সমালোচনা চলিতে লাগিল। যাহার ফলে ডারুইনের প্রতিভা-ভাস্বর কীর্ত্তিমুকুট অজ্ঞানের কলঙ্কমলিন বিদ্রূপে ও মূর্খের সাহঙ্কার আস্ফালনে ক্ষণতরে ম্লান হইয়া গেল। কার্লাইলের মত মনীষী ব্যক্তিও নূতন প্রবর্ত্তিত থিওরিমাত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দেশব্যাপী বদ্ধমূল কুসংস্কারের সাক্ষ্য দান করিতেছিলেন। জীবনচরিতকার লিওনার্ড হাক্সলে কার্লাইল সম্বন্ধে এই গল্পটি লিখিয়াছেন;—চেল্সী নগরে অবস্থিতিকালে দৈবক্রমে একবার কার্লাইলের সঙ্গে হাক্সলের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। সেই নবপরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত্তে কার্লাইল তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—'তুমিই হাক্সলে? তুমিই না আমাদিগকে বানরজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া

প্রতিপন্ন করিতে চাও ?' এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘৃণায় আরক্তিম হইয়া ভ্রুকুটিকুটিল মুখে সবেগে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ যখন বিজ্ঞান-জগতে অভ্রান্ত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তখনকার দিনে কার্লাইলের মত ব্যক্তির অসৌজন্য দেখিয়া কতকটা অনুমান হয়, ডারুইনকে তাঁহার পুস্তকপ্রকাশের সময় কিরূপ সুগভীর পরিহাস ও সুতীব্র বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ কার্লাইলের ন্যায় অন্ধ গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্তই হাক্স্‌লে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি নিজে ডারুইন-প্রবর্ত্তিত বিবর্তনবাদকে চিরদিনই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু ডারুইনের "জীবোৎপত্তির ইতিহাস" (Origin Of Species) নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরেই হাক্স্‌লে ডারুইনের মতে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হইলেন। উল্লিখিত পুস্তকের পাঠকালে হাক্স্‌লে সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন,—"আমরা কি মূর্খ ! এমন সহজ সরল সত্যটা এতদিন আমাদের কাহারও মাথায় আসে নাই!" কিন্তু রহস্য এই, প্রতিভাবানের উর্ব্বর মস্তিষ্ক সহজে যাহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে, জনসাধারণ তাহাকে অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না; সুতরাং হাক্স্‌লের মত বিজ্ঞানবিদের শত চেষ্টা স্বত্বেও ডারুইনের মত সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের বিশপের সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদ লইয়া হাক্স্‌লের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। বিশপ বলেন, এই নিখিল জীবজগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তনের বিধি বর্ত্তমান বা ক্রমোন্নতির একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই; এবং পরিশেষে পুরোহিতসুলভ রূঢ়তাসহকারে প্রকাশ করেন,—"যদি মিষ্টার ডারুইন স্থির জানেন যে তিনি বানরবংশসম্ভূত, তখন তাঁহার পিতামহ কি পিতামহী হইতে তিনি বংশের উৎপত্তি ধরিয়াছেন, আশা করি, সেটুকুও আমাদিগকে বলিতে পারিবেন।" উত্তরে অধ্যাপক হাক্স্‌লে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তীব্র হইলেও, তাঁহার গুণগ্রাহিতা ও প্রতিভার প্রতি ঐকান্তিক সম্মানের পরিচায়ক। তিনি প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন,—"যে ব্যক্তি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মার্জ্জিত জ্ঞান ডারুইনের মত এক জন সত্যপ্রাণ মহাত্মাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য প্রযুক্ত করিতে পারেন, আমি হইলে, তাঁহার বংশ অপেক্ষা বুদ্ধিলেশহীন বানরবংশ হইতে উৎপত্তি অধিকতর গৌরবজনক মনে করিতাম।"

অনেকে বলেন, হাক্স্‌লের স্বভাব একটু কলহপ্রিয় ছিল। তিনি নিজে কিন্তু তাহা অস্বীকার করিতেন, এবং বলিতেন, অনেক স্থলে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। কি বিচারে, কি বিবাদে, কি বন্ধুতায়, সকল কার্য্যেই তাঁহার যে একটা স্বাভাবিক একাগ্রতা ও অনন্যসুলভ তন্ময়তা ছিল, সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যকারগণ তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীক হৃদয় কখনই সত্যগোপন করিতে পারিত না, এবং তাঁহার অমোঘ যুক্তি একাগ্রগামী শরের ন্যায় অনায়াসে পাঠক অথবা শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিদ্ধ করিত। তিনি প্রচুর হাস্যরসের অধিকারী ছিলেন, এবং কাহারও সহিত মতভেদ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীর মনে ক্ষোভের উৎপাদন না করিয়া নিজের বক্তব্য সরস অথচ সংযত ভাবে বলিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার চিত্ত দয়া ও প্রীতিতে পূর্ণ ছিল, এবং সেই শুদ্ধ সরল স্নেহপ্রবণ অন্তর স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকামনায় চিরদিন ব্যগ্র ছিল। আজ সেই মহান জীবনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একটি আন্তরিক তন্ময় বিজ্ঞান সাধকের অবসান হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাঁহার পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তৎপ্রদর্শিত সত্যানুসন্ধানের মহিমা বুঝিয়াছি ও কলঙ্কসঙ্কুল মরীচিকাময় সংশয়পথে কথঞ্চিৎ সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিতেছি, এবং আমাদের প্রার্থনা এই, যেন ক্ষণিক নিষ্ফলতায় নিরুৎসাহ ও সফলতায় গর্ব্বিত না হইয়া আমরা তাঁহারই মত সত্যের অনুসন্ধানে আজীবন রত থাকি, এবং যেন যুগে যুগে সেইরূপ কোন মহাপুরুষের অনুরূপ আদর্শের আবির্ভাবকামনায় বলিতে পারি, 'তমসা ন জ্যোতির্গময়',—অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।

মেঘ।

আমি সুশীতল বারিধারা, নির্ম্মল স্ফটিক পারা,
ফেলি এনে কুসুমের তৃষিত অধরে।
আমি মৃদু ছায়া করে থাকি, পল্লবের দলে ঢাকি,
মধ্যাহ্নে ঘুমের মাঝে স্বপনের ঘরে।
আমার কোমল পাখা, আর্দ্র শিশিরেতে মাখা,
জাগাইয়া তোলে প্রতি কুঁড়িটি সুন্দর।
যখন গাছের কোলে, সুখ-হিন্দোলায় দোলে,
নেচে উঠে পাতাগুলি পেয়ে রবিকর।
সুতীব্র করকাপাতে, ছেয়ে ফেলি পথে পথে,
শ্যামল প্রান্তর শোভে কি শুভ্র বরণে !
পুন বরষার বারি-ধারে গলে আমি যাই ধীরে,
হাসিয়া মিশিয়া যাই চপলার সনে।
শুভ্র তুষারের থরে, ছেয়ে ফেলি শিরে শিরে,
উচ্চ বৃক্ষশাখা করে করুণ ক্রন্দন।
আমার নিরালা ঘরে, শুভ্র সেই শেজ পরে,
শুয়ে থাকি ঝটিকারে করি আলিঙ্গন !
বিজলী প্রহরী মম, যেন কর্ণধার সম,
জেগে থাকে আকাশের কুঞ্জের দুয়ারে।
দূরে কোন গুহাতলে বজ্রেরে বাঁধিয়া বলে
রেখে দেছি—আস্ফালন করে চারিধারে।
সাগরে ধরার পরে, কর মোর ধরি করে
সুধীরে বিজলী পথ দেখাইয়া যায়।
সুনীল সাগরতলে, কোনো এক পরী ছলে
বাঁধিয়া প্রেমের ডোর ল'তেছে ভুলায়ে।
নদ, নদী, উপবন, উচ্চ-শির শৈলগণ,
সকলেরি মাঝে যেন রয়েছে লুকায়ে।
আমি সে সুনীলাকাশে, হেসে দেখি একা বসে
বৃষ্টির মাঝারে সে ত মিশাইয়া যায়।
আমি কনক-কিরণ-পথে, বসায়ে অরুণ-রথে,
ডেকে আনি জ্যোতির্ম্ময় তরুণ তপনে।
যখন সে শুকতারা, জ্যোতি তার হয়ে হারা
ডুবে যায় ধীরে ধীরে প্রভাত-গগনে,—
উন্নত শৈলের সম, গগনেতে ছায়া মম,
উপরে হিল্লোলে ভাসে কনকবরণ।
সুবর্ণ বিহগ হেন রবি শোভা পায় যেন,
সে জ্যোতিতে পুলকিত মোহিত ভুবন।
রবি যায় অস্তাচলে, যেন সাগরের জলে,
মিশিয়া যেতেছে শ্বাস, বিদায়ের বেলা।

সেই রক্তবর্ণ দেখি, বাতাসের ঘরে থাকি,
যেন ভীত বিহঙ্গম নীড়েতে একেলা।
শুভ্র বাসে তনু ঢাকি, সুস্নিগ্ধ আলোক মাখি,
ধীরে ধীরে আসে শশী গগন প্রাঙ্গণে,
অদৃশ্য সে পদতলে, কি সুন্দর সূক্ষ্ম জালে
গাঁথা গৃহ ছিঁড়ে যায় কখন কে জানে।
সেই বাতায়ন দিয়ে, কত শত তারা মেয়ে,
উঁকি মেরে দেখে তার সৌন্দর্য্য শোভায়।
আমি হাসি দেখি তায়, স্বর্ণমক্ষিকার প্রায়,
যবে তারা হেসে হেসে সাঁতারিয়া যায়।
মৃদু সমীরের ভরে, আমার শিবির ধীরে
ছিঁড়ে ফেলি, ভেসে যাই আপনার মনে।
সাগরে, নদীর বুকে, প্রতিবিম্ব ভাসে সুখে,
বাগানের ছায়ারাশি জ্যোছনা-কিরণে।
আমি সাজাই অরুণ-রথ, দিয়ে রত্নরাশি কত,
চাঁদের ললাটে দিই মুকুতার হার।
হেসে তারা ফুটে উঠে ঘূর্ণীবায়ু বেগে ছুটে,
কম্পিত সাগর-বুকে তরঙ্গ তাহার।
অচল রবির করে, থাকি আমি গর্ব্ব-ভরে,
আকাশ দাঁড়ায়ে যেন প্রাচীরের প্রায়।
আমি জয়ধ্বনি করি, হেথা হোথা ঘুরি ফিরি,
বারিধারা চপলা ও লয়ে ঝটিকায়।
আবার কুহকজালে, পবনেরে বাঁধি বলে,
নির্ম্মল পবনে ফুটে ইন্দ্রধনু-হাসি।
নানা রঙে শোভা পায়, দেখে আঁখি মুগ্ধপ্রায়,
আর্দ্র ধরা হেসে চায় সুখালসে ভাসি।
আমি ধরা ও জলের মেয়ে, আকাশের কোলে রয়ে,
আমার সুখের দিন হেসে কেটে যায়।
সমুদ্রের তল দিয়ে, কত নদ নদী বেয়ে,
চলে যাই, মৃত্যু কভু হয় না তাহায়।
কত রূপ আমি ধরি, কত না সে বেশ করি,
জীবন-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিয়ে বেড়াই।
থামিলে বৃষ্টির ধারা, সুনীল আকাশ সারা,
নব রূপ নব ভাবে তাহারে জাগাই।
জ্যোতিষ্কমণ্ডল-করে, রতি জাগে গর্ব্বভরে,
ভাঙ্গি সে গরব তার বাতাসের ঘায়।
যেন ক্ষুদ্র শিশু মার কোলে, প্রেতাত্মা সমাধিতলে,
সেইরূপে উঠে আমি ভাঙ্গি সে খেলায়। *

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

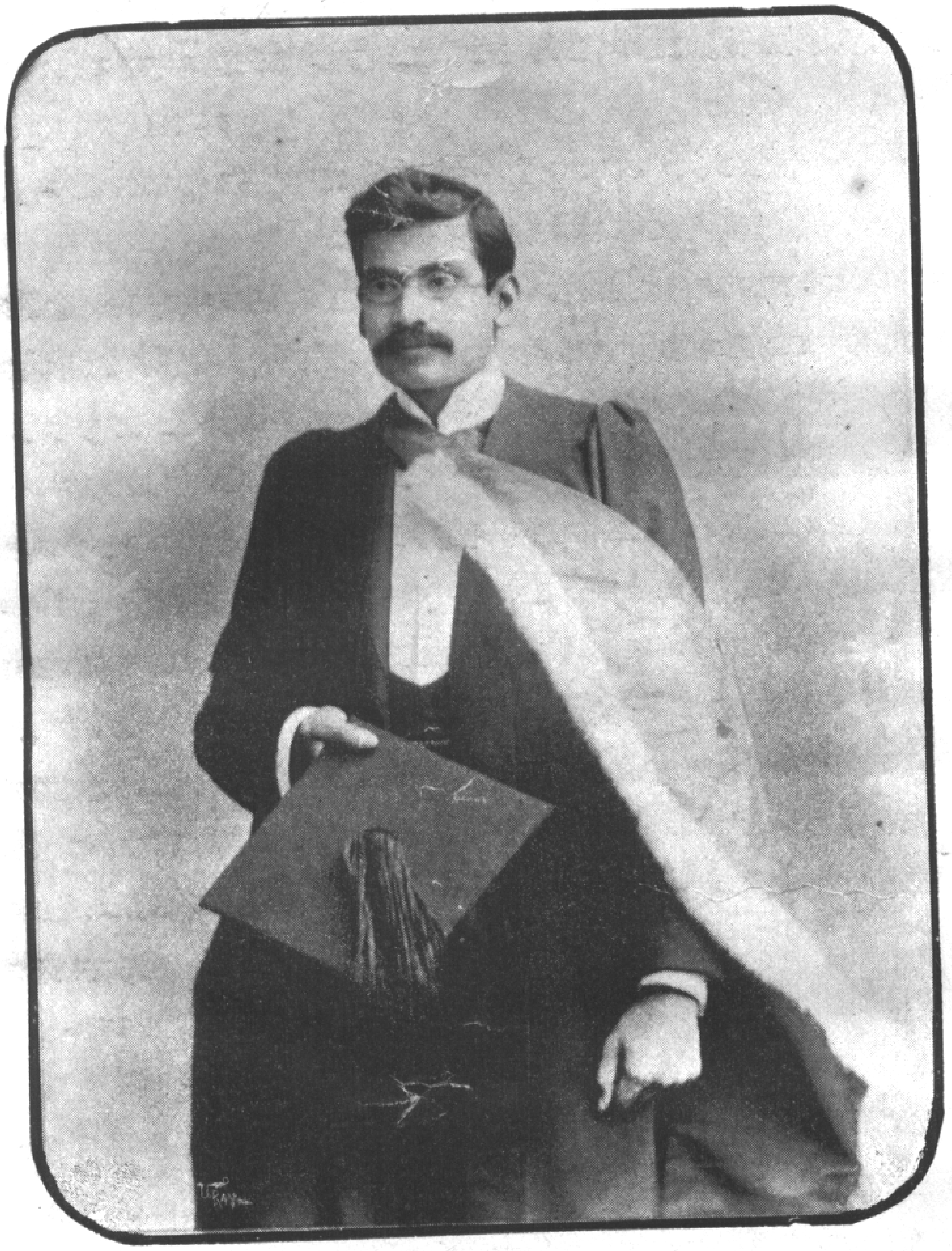
---

* The Cloud ;—Shelly.

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের "চোর" নামক কবিতাটি কি গুণে ভারতীর প্রথম স্থান অধিকার করিল, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "কুণ্ডু মশাই" নামক নক্সাটি সুপাঠ্য। "বঙ্গ সাহেবিয়ানা" প্রবন্ধে 'জনৈক বিদেশি-বেশদ্বেষী' ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের ইংরেজী পরিচ্ছদপরিধানস্পৃহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পোষাক পরিচ্ছদ দূরের কথা, ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের অন্তঃকরণ যে একবারে ফিরিঙ্গী হইয়া যাইতেছে। শোলাটুপী নেক্‌টাই সহ্য হয়, কিন্তু বিবাহকালে সম্বন্ধবিচারের পবিত্রতায় পদাঘাত করিতে প্রবৃত্তি দেখিলে রোগ ঔষধের অসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। বন্ধনবিহীন নিরবলম্ব ইঙ্গবঙ্গ-সম্প্রদায়ের সমাজ নাই,—তাঁহাদের মুষ্টিমেয় সমষ্টিকে ভদ্রতার খাতিরে সমাজ বলিতে পার, কিন্তু তাহা সমাজ-নামের যোগ্য নহে। সমাজের শাসন নাই, তাই উদ্দাম ইঙ্গবঙ্গের যথেচ্ছাচার দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। অন্তরের উন্নতি চাই; তাহার পর বাহিক পরিচ্ছদ। যাহার মন ফিরিঙ্গী, সে কোষেয় বাস পরিলেও তাহাকে স্বদেশী মনে করিতে পারিব না। কাঁঠালের আমসত্ত্ব বা সোনার পাথরবাটী কখনও সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "বীরভদ্রের শাসনপ্রণালী" সুখপাঠ্য সরস রচনা। গল্প-পাঠের সুখের সঙ্গে উৎকলের সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "ছাত্রাবাস-সংস্কার" প্রবন্ধটি সাময়িক ও সাধারণের আলোচ্য।

প্রদীপ। পৌষ। 'প্রদীপ' চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। বিজ্ঞাপনে যেরূপ গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম, বর্ষণ সেরূপ দেখিলাম না। "নব বর্ষে" বোধ করি প্রদীপের নেপথ্যচারী সম্পাদকের উক্তি। প্রদীপ পৌষ মাসে নব বর্ষ গণনা করিতেছেন। 'বর্ষ' শব্দে 'খণ্ড' তাঁহার উদ্দিষ্ট কি? অথবা বিক্রমাদিত্যের মত বৈকুণ্ঠবাবুও নূতন সংবৎ প্রচলিত করিবেন? সম্পাদক বলিতেছেন, "আমরা প্রদীপে কখনও মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা করি নাই। করিবার প্রবৃত্তিও রাখি না।" ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে অতি অমূল্য সংবাদ। 'প্রবৃত্তিও রাখি না' অতি সুন্দর! "মাসিক 'সন্তাড়না'র ভয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে।" বটে! আমরা তাহা জানিতাম না। আবার—"যত শীঘ্র সম্পাদকের 'সন্তাড়নবৃত্তি' ঘুচিয়া যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ততই মঙ্গল।" এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। কেন না, ম্যাথু আর্ণোল্ড বলিয়াছেন,—সাহিত্য পূতিগন্ধে পূর্ণ হইলে উগ্র বিশোধকের প্রয়োগ আবশ্যক। এই যে ত্রাহিমধুসূদনধ্বনি, ইহাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের মঙ্গলের আশা করি। এই সার্থক 'সন্তাড়ন-বৃত্তি' অমর হইয়া থাক, নতুবা দিন কতক পরে প্রেসম্যান্, দপ্তরী, জমাদার পাইব না,—সকলেই ডারুইন-প্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তনবাদের নিয়মে ক্রমে লেখক,—এমন কি, ঘোরতরপ্রতাপশালী সম্পাদক হইয়া উঠিবে। এবারকার 'প্রদীপে' সুপাঠ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। "তারহীন তাড়িতবার্ত্তা"র ভাষা বাঙ্গলা, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সাময়িক সাহিত্যের কথা" আলোচ্য বটে। "বদাল স্তম্ভে উৎকীর্ণ রামগুরব মিশ্রের প্রশস্তি" নামে যাঁহারা ভীত না হইবেন, অনুবাদের অভাবে তাঁহারাও মূল প্রশস্তি বুঝিতে পারিবেন না।



শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।
B. Sc., F. R. M. S. (Lond), F. R. S. (Edin)

KUNTALINE PRESS.

জীবতত্ত্বের গুটিকত কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুমূর্ষুকালেও তাহার সস্মিত মুখ দেখিয়াছি। ইহার জন্মকালে পৃথিবীতে নররক্তের স্রোত বহিয়াছে, এবং আসন্নমৃত্যুসময়েও যে রুধিরধারা ধরাকে রঞ্জিত করিল,—ইতিহাস হইতে সে কলঙ্কের দাগ মুছিবার নহে—কিন্তু তবুও এ অপূর্ব্ব শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে—বুঝি বা তাহাই স্মরণ করিয়া ইহা হাসিতে হাসিতে অতীতের মহাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গত শতাব্দীর কণ্ঠে বিজ্ঞান যে সকল বহুমূল্য সত্যের হার পরাইয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "জীবের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব" (Theory of organic Evolution) একটি অতি উজ্জ্বল রত্ন। এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ডারউইন প্রমুখ পণ্ডিতগণ ধ্যানরত তাপসের মত প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া আজীবন বিজ্ঞানের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের কঠোর সাধনার ফলে আজ ক্রমবিকাশের নিয়ম শুধু যে জীবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে; মানব চিন্তার আয়ত্ত প্রায় সকল বিভাগেই ইহার আধিপত্যের বিস্তার হইয়াছে।

জীবের ক্রমবিকাশতত্ত্ব

আমাদিগকে কি শিখাইতেছে—মোটামুটি ভাবে তাহা দেখা যাক। জলে, স্থলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাইয়া আছে, তাহাদের সৌন্দর্য্যে, অভিনব আকার ও আভ্যন্তরিক গঠনে, ভাবভঙ্গী ও ধরণ ধারণে অশেষ প্রকার বিভিন্নতা দেখিয়া একবারে অবাক হইতে হয়। অতি সামান্য শৈবালক হইতে ফল ফুলে সুশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ পর্য্যন্ত, এবং ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট হইতে সুবৃহৎ তিমি পর্য্যন্ত অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণিপুঞ্জের মধ্যে কি অদ্ভুত বিচিত্রতাই দেখিতে পাওয়া যায়! বর্ত্তমান সময়ের জীবরাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়,—

জীবসৃষ্টির আদিতেও কি এইরূপ বিচিত্রতা ছিল?—

না, কালের প্রভাবে পরিবর্ত্তনের পরম্পরায় এই বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে?—ইহার উত্তরে এক দল লোক বলিয়া থাকেন যে, সৃষ্টির আদি হইতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে জীবপ্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে—অর্থাৎ,

আমাদের সমসাময়িক যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাই, সৃষ্টির আদিতেও ঠিক সেইরূপই ছিল। এই উত্তর বিজ্ঞানসম্মত নহে। কারণ ভূগর্ভে এমন সকল জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (Fossil) পাওয়া গিয়াছে—যাহাদের মত জীব এখন আর জগতে নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জগতের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্নপ্রকার জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে।

জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে অপর এক দল লোকের মত এই যে,

এক এক যুগান্তে মহাপ্রলয়

ঘটিয়া সেই যুগের জীবকে ধ্বংস করিয়াছে—আবার নূতন করিয়া পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি হইয়াছে। যুগে যুগে এরূপ মহাপ্রলয়ের কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং এই উত্তরও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা সকল বিষয়েই অতীতের উত্তরাধিকারী—অতীত হইতেই ইহার জন্ম। বর্ত্তমান কালের জীবসমূহ ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে অতীতের জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠজাতীয় জীবের দেহতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সৃষ্টির জটিল রহস্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু জীবসৃষ্টির প্রথমাবস্থায় জীবদেহগঠনে এরূপ জটিলতা ছিল না। অতি সামান্য সামান্য জীবাণু হইতে উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবদেহ ইহার বর্ত্তমান বিচিত্র গঠন ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশের মতই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

এখন দেখা যাক—জীবের ক্রমবিকাশসমর্থনে কি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রাণিজগৎকে বহু শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। কত লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের জীব এই পৃথিবীতে আছে, তাহার স্থিরতা নাই। যেখানে এত অধিক সংখ্যা লইয়া কারবার, সেখানে শ্রেণীবিভাগ না করিলে কোন একটিকে বাছিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য যে সকল প্রাণীর মধ্যে দেহগঠনের সাদৃশ্য আছে, অথবা যাহাদের ধরণ ধারণ এক রকমের, কিম্বা যাহাদের মধ্যে কোন সাধারণ গুণ দেখা যায়—তাহাদের এক শ্রেণীতে ধরা হয়। যেমন মনে করুন, যে সকল জন্তুর শাবকেরা মাতৃস্তন্য পান করিয়া বাঁচে, তাহাদের এক শ্রেণীতে ধরিয়া "স্তন্যজীবী" নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদের দু'খানি করিয়া পাখা আছে ও সর্ব্বাঙ্গ

পালকে ঢাকা এবং যাহারা ডিম্ব প্রসব করে, তাহাদের দলকে "পক্ষীজাতি" বলা হয়; ইত্যাদি।

প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা কেবল এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। আমাদের দেশের জাতিবিভাগের ন্যায়—এই জীবশ্রেণীরও আবার জাতি, বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি শাখা প্রশাখা আছে। কারণ, এক শ্রেণীর অন্তর্গত সকল জন্তুর আচার ব্যবহার এক প্রকার নহে। যেমন দেখিতে পাই, কতকগুলি জন্তুর মাংস খাইতে রুচি নাই—তাহারা "উদ্ভিদভোজী"। আবার আর এক দলের নিরামিষে চলে না—তাহারা "মাংসাশী"। কিন্তু ইহাদের এক একটি দলের ভিতরও সকল জানোয়ার ঠিক এক রকমের নয়। কতকগুলির হাব ভাব এক রকমের—তাহাদের দেখিলেই বোধ হয়, যেন তাহাদের মধ্যে আরও একটু নিকট সম্পর্ক আছে। যেমন মনে করুন, মাংসাশী জাতির মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র ও তাহার মাতৃষ্বসা বিড়ালের ধরণ ধারণ এক প্রকারের—সুতরাং ইহাদের মার্জ্জারবংশীয় বলা যাইতে পারে।

তাই প্রাণিতত্ত্বের ভাষায় একটি বাঘের কথা বলিতে হইলে প্রাণিরাজ্যে তাহার স্থান এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে :—

স্তন্যজীবী শ্রেণীর অন্তর্গত,
মাংসাশী-জাতিভুক্ত,
মার্জ্জার-বংশোদ্ভব,
ব্যাঘ্র-পরিবারস্থ।

জীবরাজ্যে এই শ্রেণীবিভাগের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই যে, জীব সোপানের সর্ব্বোচ্চ স্তর মানুষ ও স্তন্যজীবী পশুরা অধিকার করিয়া আছে। ইহার নিম্নে পক্ষী জাতি; তাহার পর কুম্ভীর, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতি সরীসৃপ জাতি, তার নীচে ভেক জাতি ও তৎপর মৎস্য জাতি বিরাজ করিতেছে। এইরূপ ক্রমে নীচের দিকে চাহিলে—শঙ্খ, শম্বুক, পতঙ্গ, কীটাদির রাজ্য ছাড়াইয়া—জীবসোপানের সর্ব্বনিম্ন স্তরে কেবলমাত্র অতি ক্ষুদ্র জীবাণুই দেখা যায়।

এই ত গেল শ্রেণীবিভাগের কথা। এখন দেখা যাক, এই সকল বিভিন্ন-প্রকার জীবের মধ্যে দেহগঠনের কোন সাদৃশ্য আছে কি না। যদি মানুষের ও পাখীর দেহগঠনে তুলনা করি, তবে সহজ দৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে 'আশমান জমী' প্রভেদ দেখিতে পাইব (যদিও আমরা সময়ে সময়ে মধ্যম ও

তৃতীয় পুরুষে "প্যাঁচার মত মুখ" এ উপমা প্রয়োগ করিতে ছাড়ি না!) অথবা যদি কেহ মাছের সহিত হাতীর দেহগত সাদৃশ্যের কথা বলেন, লোকে তাহাকে বাতুল বলিবে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানুষ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবশ্রেণীর দিকে একবার বিজ্ঞানের চক্ষে চাহিলে তাহাদের সকল বিচিত্রতার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

জীবরাজ্যে এমন ধারাবাহিক শ্রেণীবিভাগ ধরিতে পারা যায়, যাহাতে পাশাপাশি যে সকল জীবের স্থান, তাহাদের পরস্পরের দেহগঠনের তুলনা করিলে এক নিকট সম্বন্ধ ধরা পড়ে।

সহজ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবে যত প্রভেদ দেখা যায়, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বস্তুতঃ তত প্রভেদ নাই। যেমন, মৎস্য ও ভেকজাতির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে—তাহা বেশ সহজেই ধরা যায়। ভেকজাতীয় প্রায় সকল জীবেরাই শৈশবাবস্থায় জলে থাকে, এবং তাহাদের এক একটি করিয়া লেজ থাকে। যাঁহারা বেঙ্গাচীকে জলে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ছোট ছোট চুনো পুঁটির সহিত ভেকশিশুর সাদৃশ্যে সন্দেহ করিবেন না। লেজ খসিলে বেঙ্গাচীই পূর্ণাবয়ব ভেকের গাম্ভীর্য্য লাভ করে। কিন্তু ভেকজাতীয় আর এক দল জীব আছে, যাহারা পরিণত বয়সেও শৈশবের লেজটি ছাড়িতে পারে না—এবং তাহারা দেখিতেও কতকটা ছোট সরীসৃপের মত। সুতরাং ভেক ও সর্পে কেবল যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, তাহা নহে।

এইরূপ খুঁজিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, সমস্ত জীবরাজ্য এক অদ্ভুত শৃঙ্খলে বাঁধা রহিয়াছে। এ কথা সত্য যে, বর্ত্তমান সময়ে এই শৃঙ্খল এক এক জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান সময়ে পাশাপাশি দুই জাতীয় জীবের মধ্যে কোন নিকট সম্পর্ক ধরিতে পারা যাইতেছে না; অর্থাৎ, অতীতের কোনও সময়ে এই দুই জাতির মাঝে অপর এক জাতীয় জীব ছিল, এখন তাহা ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যেমন,—এখনকার সরীসৃপ ও পক্ষীতে বড় একটা সাদৃশ্য হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভূগর্ভে এমন কোন কোন সরীসৃপের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের পাখীর মত ডানা ছিল;—সুতরাং এইখানেই এই দুই জাতির একটা সম্বন্ধ ধরা পড়িল।

অতীতের ইতিহাস

জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দেয়, তাহা দেখা যাক।

ভূতত্ত্ববেত্তারা বলেন যে, ধন ধান্যে ভরা এই বসুন্ধরার বয়স কোটী বৎসরেরও অধিক। এই অতীত কালকে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানুষের অভ্যুদয় কেবলমাত্র ইহার শেষ যুগে। তবে এ সব প্রাচীনতম সময়ের ইতিহাস মিলিবে কোথায়?—ধরাপৃষ্ঠ খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্তরে স্তরে পৃথিবীর উপর নানা প্রকারের আচ্ছাদন পড়িয়াছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরই পূর্ব্বোক্ত কালবিভাগের নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

এক এক স্তরে নানাবিধ বৃক্ষলতাদি ও জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (Fossil) পাওয়া যায়। এই সকল কঙ্কালাবশেষ দেখিয়া সেই অতীত সময়ের জীবদেহের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীর গাত্রে এই যে সকল আচ্ছাদন আছে, ইহাদের সর্ব্বনিম্ন স্তরই প্রাচীনতম—এবং যতই উপরে উঠা যায়, ততই অপেক্ষাকৃত নূতন স্তর পাওয়া যায়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কঙ্কালাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নীচের স্তরে কেবলমাত্র সামান্য সামান্য জীবদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায়, এবং যতই উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই শ্রেষ্ঠতর জীবের কঙ্কাল মিলে।

সুতরাং ইহা দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, জীবসৃষ্টির গোড়ায় কেবল নিম্নশ্রেণীর জীবের অভ্যুদয় হয়, এবং উত্তরোত্তর তাহা হইতে উচ্চতর জীবসমূহের ক্রমবিকাশ হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান যুগে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

জীবরাজ্যে ক্রমোন্নতি যে হইয়াছে,তাহার যেন প্রমাণ পাইলাম; কিন্তু কিরূপে জীবসমূহে এইরূপ বিচিত্রতা ও জাতিবর্ণভেদ ঘটিল, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ডারউইন বলেন যে, "নৈসর্গিক মনোনয়ন" (Natural Selection) এই বিচিত্রতার কারণ।

"নৈসর্গিক মনোনয়ন" ব্যাপারটা কি?

জগতে জীবসংখ্যা দিন দিনই ভয়ানক বাড়িতেছে। যেখানে একটি গাছ পোঁতা হইয়াছিল—দশ বৎসরে হয় ত সে স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে; নূতন পুষ্করিণীতে কয়েকটি মাছ ছাড়া হইয়াছিল—অল্পকালেই তাহাতে মাছ উথলিয়া পড়িতেছে; কোন গাছে এক যুগল পাখী আসিয়া বাসা বাঁধিল—

কয়েক বৎসর পরে সে গাছ পাখীতে পাখীতে আচ্ছন্ন হইল। এইরূপ উত্তরোত্তর জীবসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতে স্থান ও খাদ্যের অভাব বাড়িতেছে। এক দিকে জীবজন্মের হার যেমন বাড়িতেছে, তেমনই অপর-দিকে জীবনসংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। একটি বটবৃক্ষে কত লক্ষ লক্ষ ফল উৎপন্ন হয়, এবং তাহার প্রত্যেক ফলে কত শত ক্ষুদ্র বীজ থাকে—তাহার প্রত্যেক বীজেই যদি এক একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিত, তবে এ বিশ্বে আর অন্য কাহারও স্থান জুটিত না; জগৎ বটগাছময় হইয়া যাইত। প্রতি মুহূর্ত্তে জগতে যে সংখ্যাতীত জীবজন্তু জন্মিতেছে, তাহারা সকলেই যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে দারুণ দুর্ভিক্ষের হাহাকার জগতের চির-সহচর হইত। কিন্তু দেখিতে পাই, বিশ্বের মাঝে এই ভয়ানক জীবনসংগ্রামে অল্পসংখ্যক জীবই জয়ী হয়, অবশিষ্ট ধ্বংস হইয়া যায়। প্রকৃতি কেবল বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটিকে বাঁচাইয়া রাখেন, অবশিষ্ট মৃত্যুর করাল গ্রাসে বিলুপ্ত হয়। দেখা যাক,—প্রকৃতি কোন্ নির্ব্বাচনপ্রণালীতে এই প্রসাদ-ভোগী জীবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন।

বিলাতে অবস্থানকালে আমার গৃহের বাতায়ন হইতে দেখিতে পাইতাম,—আমাদের বাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাঙ্গনে একটি বিড়াল প্রায়ই আহার অন্বেষণে আসিত। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত, সে যাহা কিছু খাদ্য খুঁজিয়া পাইত, তাহাতেই কোন রকমে তাহার দিন চলিয়া যাইত। ক্রমে কোথা হইতে সেখানে চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিড়ালশিশু আসিয়া জুটিল। কি জীবনসংগ্রামই না জানি তখন তাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইল! এইরূপে কিছু কাল যায়—ক্রমে শীত আসিল। একদিন প্রত্যূষে দেখি, দুইটির মৃতদেহ তুষারে আবৃত রহিয়াছে। আর একটি কোন অজানা স্থানে চিরপ্রবাসী হইল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অবশিষ্ট বিড়ালশিশুটির গাত্রচর্ম্ম বিচিত্র রেখা-বিশিষ্ট ছিল; তাহা দেখিয়া এক রমণী তাহার প্রতি সদয় হইলেন ও সযত্নে তাহাকে পুষিলেন। সুখে সচ্ছন্দে সে বিড়াল বাড়িতে লাগিল—তাহার আদর দেখে কে! ক্রমে তাহার সুন্দর সুন্দর শাবক হইল—তাহাদের গাত্র-চর্ম্ম আরও সুন্দর, আরও বিচিত্র। ইহা দেখিয়া সেই রমণীর বন্ধুরা তাহাদের পাইবার জন্য লালায়িত হইলেন।

বিশ্বের চারি দিকে প্রতিনিয়ত অনেকটা এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। প্রকৃতিকে অসংখ্য জীবরাশির মধ্য হইতে কেবল কয়েকটিকে বাছিয়া লইতে

হইতেছে। জীবরাজ্যে যাহাদের জীবনধারণোপযোগী কোন গুণ বা এমন কোন একটি সুবিধা আছে, যাহাতে তাহারা অন্যের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান, তাহারাই বাঁচিয়া যায়। হার্বার্ট স্পেন্সার ইহাকেই বলিয়াছেন Survival of the fittest,—অর্থাৎ, এ বিশ্বের মধ্যে—এ কঠোর জীবন-সংগ্রামে—যোগ্যতমেরাই উত্তরজীবী। এইরূপে শুধু যে ভাগ্যবান জীবেরাই বাঁচিয়া যায়, তাহা নহে; কিন্তু যে গুণে সেই জীবেরা সংগ্রামে জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে, সেই গুণ বা বিশেষত্ব বংশপরম্পরায় উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমাদের দেশে সর্ব্বত্র শিয়ালকাঁটা নামে এক প্রকার আগাছা বহুল-পরিমাণে জন্মে। সকলেই জানেন, এই আগাছার সর্ব্বাঙ্গে কেমন সুতীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে। এই শরসজ্জার প্রসাদেই শিয়ালকাঁটা উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের গ্রাস হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারে। কিন্তু এই শিয়ালকাঁটা বংশের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, এক সময়ে ইহার গায়ে এরূপ কাঁটা ছিল না, এবং এখনও ইহার জ্ঞাতিকুটুম্ব অনেক আছে—যাহাদের গায়ে কাঁটা নাই; সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অতি প্রাচীন সময়ে এই বংশের এক আগাছা পাতার অগ্রভাগ একটু তীক্ষ্ণ হওয়াতে জীবনসংগ্রামে অপর সজাতীয়ের উপর কিছু সুবিধা লাভ করিল। তাহাতে সে যে শুধু বাঁচিয়া গেল, তাহাই নহে; পক্ষান্তরে সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ রূপ যে বিশেষত্ব তাহাকে বাঁচাইল, তাহাও বংশপরম্পরায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান শিয়ালকাঁটার সর্ব্বাঙ্গের শর-সাজে পরিণত হইল।

প্রকৃতি এই যে বিশেষত্ববিশিষ্ট জীবকে বাঁচাইয়া রাখেন ও ক্রমে তাহা বাড়াইয়া দেন, ইহাকেই ডারউইন বলিয়াছেন,—"নৈসর্গিক মনোনয়ন।" ডারউইন এই নৈসর্গিক মনোনয়নের ক্ষমতার উপর যত আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ঠিক না হইতে পারে; কিন্তু জীবরাজ্যে ক্রমবিকাশের নিয়মে যে জীবসমূহ ধীরে ধীরে অতি সামান্য অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এই ক্রমোন্নতির নিয়ম জগতের চারি দিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমবিকাশের নিকটসম্পর্কীয় আর একটি সত্য গত শতাব্দীতে বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;—তাহাকে

"পুনরাবর্ত্ত-তত্ত্ব"

বলা যাইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, সমগ্র জীবের জাতীয় বিকাশে যে

ক্রম দেখা যায়, কোন একটি শ্রেষ্ঠ জীবের দেহবিকাশেও ঠিক সেই ক্রমের পুনঃপ্রবর্ত্তন হইয়াছে। ছোট হউক বড় হউক, জীবদেহমাত্রই এক প্রকার অদ্ভুত তলতলে পদার্থের আধার। ইহাই জীবনের ভৌতিক উপাদান বা প্রাণপঙ্ক (protoplasm)। এই প্রাণপঙ্কের ভিতরেই প্রাণের দুরবগাহ রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রাণিজগতের নিম্নতম শ্রেণীতে যে সকল জীবাণু পাওয়া যায়, তাহারা কেবল এক এক টুকরা প্রাণপঙ্ক বা "কোষাণু"- (cell)-মাত্র। ইহাদের অপেক্ষা একটু শ্রেষ্ঠজাতীয় যাহারা, তাহাদের দেহ এইরূপ কতকগুলি কোষাণুর সমষ্টির দ্বারা গঠিত। আরও শ্রেষ্ঠতর জীবের গঠন পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহারা নিরেট নহে, কিন্তু তাহাদের দেহে এক একটি দেহ-গহ্বর জন্মিয়াছে। ক্রমে আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, দেহ-গহ্বরে নানাপ্রকার দৈহিক যন্ত্রের আবির্ভাব হইতে থাকে। এইরূপে উত্তরোত্তর এক এক শ্রেণীতে কিছু কিছু উন্নতি হইয়া শেষে পূর্ণাবয়ব জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

সমগ্র জীবজাতির ইতিহাসে এই যে ক্রমোন্নতির প্রথা দেখিলাম, ব্যক্তিগত জন্মকথা খুঁজিলেও ঠিক এই একই প্রথা দেখিতে পাইব। জীবমাত্রই এক একটি প্রাণপঙ্কের কোষাণুরূপে জন্মে; এই একটি কোষাণু হইতেই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কতকগুলি কোষাণুর সমষ্টি জন্মে; তাহার পর ক্রমে দেহ-গহ্বর ও তাহাতে ধীরে ধীরে নানাপ্রকার আভ্যন্তরিক যন্ত্র গঠিত হয়; এবং ক্রমে অবয়ব সকল জন্মে।

সুতরাং দেখিতেছি, "পুনরাবর্ত্ত-তত্ত্ব" আর কিছুই নহে, কেবল ব্যক্তিগত দেহগঠনে ক্রমবিকাশের নিয়ম। এখানেও সেই একই প্রথা,—একই উদ্দেশ্য।—ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, সরল হইতে জটিল, নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ, জীব ক্রমশঃই উন্নতির দিকে ধাইতেছে।

জীবের প্রধান শত্রু জীবাণু।

নানাবিধ দুরন্ত ও সংক্রামক রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া গত শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমরা নরঘাতী শত্রুর মধ্যে দিন রাত বাস করিতেছি।

এই সকল সূক্ষ্মদেহী জীবকণিকা অলক্ষিতভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ইহাদের দুর্দ্দান্ত প্রতাপের কথা শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া

উঠে। আমাদের চারি দিকেই এই সকল জীবকণিকা নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে ও কিরূপে অপর জীবের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদের স্বার্থসাধন করিবে, তাহাই খুঁজিতেছে। সুপক্ক ফলটি যখন পাকিয়া উঠিল, তখন জানিবেন, তাহা এই সকল জীবাণুর কাজ; যেখানেই কোন জীবদেহ ধ্বংস পাইতেছে, সেখানেই ইহাদের 'কেরামতি'।

যক্ষ্মা, ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রোগ সকল ব্যাক্‌টিরিয়া নামক জীবাণুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যাক্‌টিরিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণুমাত্র। ইহারা উদ্ভিদ-রাজ্যের সর্ব্বনিকৃষ্ট জীব;—এই জাতিগত নিকৃষ্টতার ন্যায় ইহাদের প্রকৃতিও অতি নিকৃষ্ট। ইহাদিগকে পরাঙ্গপুষ্ট (parasite) বলে। পরের দেহে জন্মিয়া পরের খাইয়াই ইহারা বাঁচে; অথচ যাহার খায়, তাহারই সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়ে না! এই জীবাণুদের আশ্চর্য্য বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা। একবার যদি একটি জীবাণুও সুবিধা করিয়া কোথাও বসিতে পারে, তবেই সেখানে দেখিতে দেখিতে অসংখ্য জীবাণু জন্মে। ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রথাও অতি সহজ;—একটি ভাঙ্গিয়া দুইটি হয়,—তাহার প্রত্যেকটি ভাঙ্গিয়া আবার দুইটি হয়, এইরূপ।

এখন প্রশ্ন এই যে, এত শত্রুর মধ্যে থাকিয়াও আমরা সকলে মরিতেছি না কেন? আমাদের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে—পানীয় জলে—এমন কি, প্রতি নিশ্বাসে কত অসংখ্য অসংখ্য জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকিতেছে তথাপিও আমরা এক রকম নিরাপদ আছি কেন? দেখা যাক।

এই ঘোর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা কি?

যদি শরীর হইতে একবিন্দু তাজা রক্ত বাহির করিয়া একখানি কাচের উপর রাখিয়া—তাজা থাকিতে থাকিতেই তাহাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করি, তবে সেই একবিন্দু রক্তেই লক্ষ লক্ষ গোলাকার ঈষৎ লাল বর্ণের রক্তকণিকা দেখিতে পাইব। এই সকল লালবর্ণ রক্তকণিকার মাঝে মাঝে এক একটি বর্ণহীন রক্তকণিকা দেখা যায়। ইহারা গোলাকার নহে, ইহাদের আকৃতি থাকিয়া থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, ইহারা খুব আস্তে আস্তে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহারা শুধু যে রক্তস্রোতেই ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা নহে; শরীরের সর্ব্বত্রই ইহাদের গতিবিধি আছে। এই

সকল বর্ণহীন রক্তকণিকা (শ্বেত কোষাণু) অবিরাম প্রহরীর কার্য্য করিতেছে, পাছে কোন শত্রু শরীরমধ্যে প্রবেশ করে।

একবিন্দু রক্তে দশ সহস্রেরও অধিক বর্ণহীন কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়;—তবেই দেখুন, সমুদায় শরীরে কত কোটি কোটি বর্ণহীন কোষাণু প্রহরীর কায করিতেছে। পৃথিবীতে এমন দুর্গ কি আর আছে, যাহা এত সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত? প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন, "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"; কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের আলোকে আমরা দেখিতেছি,

"শরীর সুরক্ষিত দুর্গ"

শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলেই সেখান দিয়া যেমন ব্যাক্‌টিরিয়ারা আসিয়া আক্রমণ করে,—তেমনি ভিতর হইতে দলে দলে এই বর্ণহীন কোষাণুরা সেই ক্ষত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাদের শত্রুদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। এ সংগ্রামে যদি শত্রুরা জয়ী হয়, তবেই আমাদের জীবনসংশয় হইয়া উঠে। একবার এই শত্রুরা শরীরে প্রবেশ করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিলেই দেখিতে দেখিতে তাহাদের আশ্চর্য্য সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ও তাহারা শরীর মধ্যে একপ্রকার বিষ জন্মাইতে থাকে; কিন্তু তখনও ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসঘাতক জীবাণুদের অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি ও আস্ফালনই নিজেদের সর্ব্বনাশের কারণ। ইহাদের প্রস্তুত বিষ যখন শরীরে বাড়িতে থাকে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে আর একপ্রকার পদার্থ জন্মিতে থাকে,—যাহা ঐ বিষক্ষয় করিতে, এমন কি, ব্যাক্‌টিরিয়াকে বিনাশ করিতেও সমর্থ হয়। এই শেষোক্ত পদার্থকে "বিষঘাতী" (antitoxin) বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিষঘাতীর সাহায্যে নানাপ্রকার দুরন্ত রোগের চিকিৎসার এক অত্যাশ্চর্য্য উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বিষয়টি এত বিস্ময়জনক যে, এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ডিফ্‌থিরিয়া নামক সংক্রামক রোগ ঐরূপ একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এই জীবাণু শ্বাসনালীর উপর একবার জন্মিয়া বৃদ্ধি পাইলে অল্প কালের মধ্যেই তাহাদের বিষের তাড়নায় কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে। এ রোগের যাতনা যে কি ভয়ানক, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এ দুরন্ত রোগের আধুনিক চিকিৎসায় পূর্ব্বোক্ত "বিষঘাতী" আশ্চর্য্য সুফলপ্রদ। এই বিষঘাতী প্রস্তুতের পন্থা সংক্ষেপে এইরূপ,—ডিফ্‌থিরিয়ার জীবাণু যে শুধু শ্বাসনালীতেই জন্মিতে পারে, তাহা নয়; মাংসের সুরুয়া প্রভৃতি পদার্থে ইহার "জমী" প্রস্তুত

করিয়া তাহাতে এই জীবাণু বহুলপরিমাণে জন্মাইতে পারা যায়। ইহাদের বংশ ও প্রকোপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে "জমীতে" বিষ বৃদ্ধি পায়। যথেষ্ট বিষ জন্মিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া খুব অল্পমাত্রায় ক্রমে ক্রমে একটি অশ্বের (বা অপর কোন বৃহৎ জন্তুর) দেহে প্রবেশ করান হয়। সকলেই জানেন, অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে খুব ভয়ানক বিষ শরীরে সহাইয়া লওয়া যায়। ডিফ্‌থিরিয়া বিষের মাত্রা ক্রমে যতই বাড়ান হইতে থাকে, ততই অশ্বের দেহে "বিষঘাতী" অধিক জন্মিতে থাকে। এইরূপে এই অশ্বের রুধির হইতে যথেষ্টপরিমাণ সতেজ "বিষঘাতী" পাওয়া যাইতে পারে, এবং ডিফ্‌থিরিয়াক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিলে এ দারুণ রোগের হাত হইতে তাহার বাঁচিবার উপায় হয়।

গত শতাব্দীতে জীবতত্ত্বের আর একটি কূটতর্ক মীমাংসিত হইয়াছে।

জড় হইতে জীবের উৎপত্তি

হইতে পারে কি না, এই তর্ক দুই শতাব্দীরও অধিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এক দল লোকের মতে কেবল জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়,—জড় হইতে জীবের জন্ম কখনও হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর দল বলিতেছেন, জীবের অবর্ত্তমানেও নূতন জীব আপনা হইতেই জন্মিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার ব্যাশ্চিয়ান নামক এক জন বিজ্ঞানবিৎ বিস্তারিত পরীক্ষার পর এই শেষোক্ত মতকে আবার জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার পন্থা সংক্ষেপে এইরূপ:—যদি কতকগুলি খড়ের টুকরা জলে ভিজাইয়া রাখা হয় ও কয়েক দিন পরে সেই জলের এক বিন্দু লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতে অনেক জীবাণুকে নড়িতে চড়িতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, শুষ্ক খড় বা তৃণখণ্ডে অনেক জীবাণু শুকাইয়া লাগিয়া থাকে, তাহারাই জল ও একটু উত্তাপ পাইলেই আবার তাজা হইয়া উঠে। ডাক্তার ব্যাশ্চিয়ান এইরূপ খড়ের জল কাচপাত্রে পুরিয়া আগুনে জ্বাল দিয়া এই জীবাণুদের বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধ জলে যখন সমুদয় জীবাণু মরিয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তখন সেই কাচপাত্রগুলির মুখ আগুনে গলাইয়া বন্ধ করিয়া রাখা হয়। কয়েক মাস পরে সেই সকল পাত্রস্থ জলের এক এক বিন্দু অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। এত সতর্কতার পরও যখন সেই জলে জীবাণুর আবির্ভাব দেখা গেল, তখন ডাক্তার ব্যাশ্চিয়ান স্থির করিলেন,

প্রাণের অবর্ত্তমানেও নূতন করিয়া আপনা হইতে ঐ সকল জীবাণুর জন্ম হইল। ডাক্তার ব্যাশ্চিয়ান তাঁহার এই মতের ঘোষণা করাতে অধ্যাপক টিণ্ডাল প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানবিৎ এ তর্কের মীমাংসার জন্য আসরে নামিলেন। তাঁহাদের পরীক্ষা ও গবেষণায় জানা গেল যে, কতকগুলি জীবাণু এত অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে যে, তাহারা ব্যাশ্চিয়ানের অবলম্বিত উপায়ে মরিবার নয়। এতদ্ভিন্ন টিণ্ডাল দেখাইলেন যে, ডাক্তার ব্যাশ্চিয়ানের পরীক্ষিত কাচ-পাত্রস্থ জলের উপরিভাগে যে বাতাস ছিল, তাহা হয় ত জীবশূন্য ছিল না। এই জন্য টিণ্ডাল এক অভিনব উপায়ে উত্তাপ ও চাপের সাহায্যে তাঁহার নিজ পরীক্ষিত পাত্রস্থ খড়-ভিজান জল ও বাতাসকে একবারে জীবশূন্য করিয়া সেই পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে সেই জল যখন অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করা হইল, তখন তাহাতে আর কোন জীবাণুর চিহ্ন পাওয়া গেল না। সুতরাং এই তর্কে ব্যাশ্চিয়ান হারিলেন। এইরূপে জড় হইতে যে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ এখন মিলিয়াছে। জড়জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে অর্গল চিররুদ্ধ। যতই নৈসর্গিক শক্তির সাধ্য সাধনা করি না, কোন রসায়ন—কোন তাড়িতপ্রবাহ —বিজ্ঞান-উদ্ভূত কোন কৌশলই মৃত জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। জড় ও প্রাণের মধ্যে যে অকূল পাথার পড়িয়া আছে, তাহা অলঙ্ঘনীয়। অনুবীক্ষণ ও রসায়নের সাহায্যে প্রাণপঙ্ককে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইয়াছে —কিন্তু তাহাতে প্রাণ যে কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা আজিও ধরা পড়িল না। কে জানে, কোন দিন পড়িবে কি না?

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

চন্দ্রালোকে।

উপাসনা-মন্দিরের সৈনিক বলিয়া আবে মারীনার সমরবিভাগে সুনাম ছিল। সে এক জন দীর্ঘাকৃতি কৃশ যাজক, অত্যধিক "গোঁড়া", চঞ্চল, কিন্তু সাধুচেতা। তাহার মতগুলি বেশ দৃঢ় ছিল—কদাপি সংশয়চালিত হইত না। তাহার ধারণা ছিল, সে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে; ভাবিত, সে তাঁহার সকল অভিসন্ধি, তাঁহার সকল ইচ্ছা, নিখিল সঙ্কল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

যখন সে আপনার ছোট গ্রাম্যবাটীর উদ্যান-বীথিকায় দীর্ঘপদবিক্ষেপে বিচরণ করিত, সময়ে সময়ে তাহার মনে প্রশ্ন উঠিত; "ঈশ্বর ঐটি করিয়াছিলেন কেন?" এবং কল্পনায় ঈশ্বরের পদ অধিকার করিয়া সে অবিচলিতভাবে তাহার অনুধাবনে মনোনিবেশ করিত, এবং প্রত্যেক কার্য্যের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিত। "হে প্রভু, তোমার কৌশল বোধাতীত"—এ কথা ভক্তিজাত বিনয়ের উচ্ছ্বাসেও বলিবার লোক সে নয়। সে ভাবিত, "আমি ঈশ্বরের সেবক; তাঁহার কার্য্যের কারণ আমার জ্ঞাত থাকা উচিত; যদি অজ্ঞাত হয়, অনুমান করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।"

তাহার মনে হইত, প্রকৃতির সমুদায় দ্রব্য বিশুদ্ধ ও প্রশংসনীয় ন্যায়ের অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। "যে হেতু" এবং "কেন"র সাম্য সকল সময়েই সুরক্ষিত। তোমার জাগরণ আনন্দময় করিবার জন্য উষার সৃষ্টি, শস্যাদির পরিপাকের জন্য দিনগুলি সৃষ্ট, উহাদের সেচনার্থ বারিধারা, সায়াহ্নশয়নোদ্যোগের জন্য এবং তামসী নিশীথিনী সুপ্তির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

চারিটি ঋতু ত কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাতের সম্পূর্ণ উপযোগী; তাহার এমন কোন সংশয় হইত না যে, প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য নাই; পরন্তু, জীবিতমাত্রই বিভিন্ন যুগের, জলবায়ু প্রভৃতির, এবং জড় পদার্থের কঠোর নিয়মরাজির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

কেবল সে রমণীকে ঘৃণা করিত; বিবেকের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত হইয়া সে তাহাদিগকে ঘৃণা করিত, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত। সে প্রায়ই খৃষ্টের কথা আবৃত্তি করিত, "মানবি! তোমার সহিত আমার কি প্রয়োজন?" সে আরও বলিত, এমনও বলা যাইতে পারে যে,ঈশ্বর তাঁহার নিজের হাতের এই কার্য্যবিশেষে অসন্তুষ্ট।" বস্তুতঃ, রমণীকুল তাহার নিকট কবি-কথিত "দ্বাদশগুণ অপরিচ্ছন্ন শিশু।" নারীই ত শয়তান—সেই ত আদিপুরুষকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়াছিল, এবং এখনও তাহার অনিষ্টকর কার্য্যে রত রহিয়াছে! দুর্ব্বল, বিপজ্জনক, দুর্জ্জয়রূপে অনিষ্টকর জীব—নারী! এবং ধ্বংসকারী নারী-অঙ্গ অপেক্ষা সে প্রেমময় নারী-হৃদয়কে অধিক ঘৃণা করিত।

সে প্রায় অনুভব করিত, রমণীর কোমলতা তাহাকে বদ্ধ করিতে চাহে। যদিও সে আপনাকে অজেয় বলিয়া জানিত, তথাপি নারী-বক্ষে সর্ব্বদা যে প্রেমালোক কম্পিত হইত, তাহা ভাবিয়া সে ক্রুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

তাহার বিশ্বাস, ঈশ্বর মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এবং পরীক্ষা করিবার জন্য নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না হইয়া নারীর নিকটবর্ত্তী হওয়া তোমার উচিত নয়; ফাঁদের কাছে পড়িলে যে আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হৃদয়ে না পুষিয়া রমণীর সন্নিধানে যেও না। আলিঙ্গনপ্রসারিত বাহু ও উদ্ভিন্না ধরা রমণী সত্য সত্যই ত ঠিক একটি ফাঁদ।

সে কেবল ভিক্ষুণীদের প্রশ্রয় দিত—তাহারা যে শপথ গ্রহণ করিয়া অমঙ্গলমুক্ত হইয়াছে; কিন্তু, তথাপি সে তাহাদের সহিত পরুষ ব্যবহার করিতে ছাড়িত না; কারণ, পুরোহিত হইয়াও যে কোমলতা সে হারাইয়াছে, তাহাই সে ভিক্ষুণীদের সংযত হৃদয়ের—তাহাদের পবিত্র হৃদয়ের—অন্তঃস্তলে দেখিতে পাইত।

তাহাদের চাহনিতে সে ইহা বুঝিতে পারিত—ভিক্ষুদের দৃষ্টি অপেক্ষা সে দৃষ্টি ভক্তিতে আর্দ্র। তাহাদের উল্লাসে, খৃষ্টের প্রতি প্রেমোচ্ছ্বাসে সে ইহা বুঝিতে পারিত; সে প্রেমোচ্ছ্বাস রমণীর ভালবাসা বলিয়া সে ক্রুদ্ধ হইত। এমন কি, তাহাদের শিক্ষাপ্রবণতায়, কণ্ঠস্বরের মৃদুতায়, তাহাদের আনত নয়নে, এবং যখন সে তাহাদিগকে পরুষভাবে তিরস্কার করিত, তখনকার বিনম্র অশ্রুপাতে, সে ইহা—এই পাপময় কোমলতা—বুঝিতে পারিত।

মঠের দ্বার অতিক্রম করিয়া সে আপনার পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া লইত, এবং দ্রুতপদে চলিয়া যাইত—যেন কোন আশু বিপদ হইতে পলাইতেছে।

তাহার একটি ভাগিনেয়ী ছিল; সে আপনার জননীর সহিত নিকটস্থ একটি ছোট বাড়ীতে থাকিত। যাজকটির ইচ্ছা ছিল, তাহাকে ভিক্ষুণী করে।

মেয়েটি বেশ ফুটফুটে, চঞ্চলপ্রকৃতি; সকলকে রাগাইবার ক্ষমতা তাহার বেশ ছিল। মাতুল যখন ধর্ম্মোপদেশ দিত, সে হাসিত; মাতুল যখন তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইত, সে তাহাকে আপনার বক্ষের উপর চাপিয়া প্রবল অনুরাগে চুম্বন করিত। যাজক অনিচ্ছায় আপনাকে এই আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু সে ইহাতে কেমন একটু মিষ্ট আনন্দের স্বাদ পাইত; এবং পুরুষমাত্রেরই অন্তরে যে পিতৃস্নেহ অন্তর্লীনভাবে বিরাজ করে, তাহারই অনুভূতি যাজক-হৃদয়ের অন্তঃপুরে জাগিয়া উঠিত।

বালিকাটিকে পার্শ্বে লইয়া সে প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাকে ঈশ্বরের—তাহার নিজের ঈশ্বরের—কথা বলিত। কিশোরী কিন্তু কদাপি ইহাতে কর্ণপাত করিত; ততক্ষণ সে জীবন্ত উল্লাসে আকাশ, তৃণ ও কুসুমপুঞ্জের দিকে চাহিয়া থাকিত—পরমানন্দ তাহার নয়নযুগে ফুটিয়া উঠিত। সে কখন, হয় ত, একটি পতঙ্গ ধরিতে ছুটিয়া যাইত, এবং ধরিয়া আনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত; "দেখ মামা, এটি কেমন সুন্দর; আমার ইচ্ছা হয় ইহাকে চুম্বন করি।" এবং পতঙ্গ বা ফলটিকে চুম্বন করিবার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া যাজক বিরক্ত, ক্রোধোদ্দীপ্ত ও উত্যক্ত হইয়া উঠিত। রমণী-হৃদয়ে কোমলতা যে চিরদিন স্বতঃজাত, ইহাতেও সে তাহাই দেখিত।

এমন সময়ে একদিন আবে মারীনার গৃহরক্ষয়িত্রী অতি সঙ্গোপনে তাহাকে জানাইল, তাহার ভাগিনেয়ীর এক জন প্রেমাস্পদ বিদ্যমান।

তখন সে ক্ষৌরকার্য্যে রত; মুখময় সাবান মাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল; ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন সে চিন্তা করিবার ও কথা কহিবার সামর্থ্য ফিরিয়া পাইল, চীৎকার করিয়া বলিল; "ইহা সত্য নয়; মেলানি, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।"

কিন্তু কৃষক-পত্নী স্বীয় বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া বলিল, "মহাশয়, যদি আমি মিথ্যা বলিয়া থাকি, ঈশ্বর যেন আমার দণ্ডবিধান করেন। আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি, সে প্রতিদিন রাত্রে, আপনার ভগিনী শয়ন করিলে, তাহার নিকট যায়। নদীতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। যদি আপনি দশটা হইতে দ্বিপ্রহর রজনীর মধ্যে সেখানে যান, স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।"

প্রসাধন বন্ধ করিয়া সে প্রচণ্ডবেগে কক্ষে বেড়াইতে লাগিল ;—গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলে সে সর্ব্বদাই এইরূপ করিত। যখন সে পুনর্ব্বার কামাইতে গেল, তিনবার স্বীয় কপোলভাগ কাটিয়া ফেলিল।

উত্তেজনায় ও রাগে ফুলিয়া সে সমস্ত দিন মৌন রহিল। প্রেমের মহাশক্তির বিরুদ্ধে, যাজকোচিত গর্ব্বের সহিত পিতার, শিক্ষকের ও ধর্ম্মসংস্থাপকের ন্যায্য ক্রোধ একত্র মিলিল। সে কি না একটি শিশুর দ্বারা বঞ্চিত, অবমানিত, প্রতারিত হইল ?

পিতামাতার অজ্ঞাতে বা অভিমতের বিরুদ্ধে দুহিতা স্বামী বরণ করিলে, তাঁহাদের যেমন আত্মশ্লাঘায় আঘাত লাগে দারুণ মনঃকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহারও সেইরূপ হইল।

ভোজনের পর সে একটু পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মনকে বশে আনিতে পারিল না ; তাহার ক্রোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দশটা বাজিলে, সে আপনার ছড়ি লইল—ওক্ কাষ্ঠের ভীষণ লগুড়বিশেষ ; রাত্রে পীড়িতকে দেখিতে যাইতে হইলে সে কদাপি সেই যষ্টিখানি লইতে ভুলিত না। পল্লীবাসীর দৃঢ় মুষ্টিতে বিপুল লগুড়টি ধারণ করিয়া, শূন্যে ঘুরাইয়া, যেন উহাকে সম্মানিত করিল। তার পর, সহসা উহা উত্তোলন করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, একখানি চেয়ারের উপর সবলে ফেলিল ; অকালে উহার পশ্চাদ্ভাগ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সশব্দে ভূমিসাৎ হইল।

বাহিরে যাইবার জন্য সে কপাট উন্মুক্ত করিয়াই থামিয়া পড়িল—অলোকসামান্য কৌমুদী-বিভায় বিস্মিত হইয়া।

তাহার মানসিক প্রকৃতি কল্পনাময় কবিকুলের, মন্দিরের আচার্য্যগণের, প্রকৃতির মত উন্নত ছিল বলিয়া, স্মিতবদনা যামিনীর এই মহান্ ও সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্যে সহসা বিচলিত উদ্দীপিত হইয়া গেল।

স্নিগ্ধদীপ্তি-পরিস্নাত ছোট উদ্যানটিতে, শ্রেণীবদ্ধ ফল বিটপিগণ আপনাদের দারুময় ক্ষীণ অঙ্গগুলি ছায়াবর্ণে বীথিকাপটের উপর অঙ্কিত করিতেছিল। এ দিকে, প্রাচীর-বিসর্পিণী "হনি-সকল্" লতিকাটি মনোরম মধুশ্বাস ফেলিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন এই তপ্ত বিমল যামিনীর অন্তরে কোন সুরভি-সিঞ্চিত আত্মা বিরাজ করিতেছে।

মাতাল যেমন সুরাপান করে, সে তেমনই করিয়া এই সমীর উপভোগ করিবার জন্য জোরে নিশ্বাস লইতে লাগিল। বিস্ময়াপ্লুত আত্মবিস্মৃত হইয়া সে ধীরে, অতি ধীরে চলিতে লাগিল, —স্বস্-কন্যার কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল।

বিমুক্ত পল্লীপথে আসিয়া সে এই সোহাগময় প্রভায় পরিপ্লাবিত প্রশান্ত মধুযামিনী, এই সুকোমল পাণ্ডু সুষমায় নিমজ্জিত অবারিত ক্ষেত্রভূমি নেত্র ভরিয়া দেখিবার জন্য দাঁড়াইল। অনুক্ষণ ভেকবৃন্দের অত্যুচ্চ ধৈবতরাগিণী শূন্যে বিলীন হইতেছিল। দূরস্থিত নাইটিঙ্গেল বিহঙ্গ চন্দ্রিকার মনোহারিতার সহিত আপনার সন্দীপনসঙ্গীত বিমিশ্রিত করিতেছিল, সে সঙ্গীত স্বপ্ন ছাড়া আর কোনও চিন্তা মনে আনে না—সেই ললিত মূর্চ্ছনাময় সঙ্গীত চুম্বনের জন্যই তানলয়ান্বিত।

সে পুনরায় চলিতে লাগিল ; কিন্তু সে সাহস হারাইতেছিল ;—কেন,তাহা নিজেই বুঝিতে

পারিল না। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহাকে বলহীন করিতেছে; সে সহসা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল, একবার এখানে বসি, একবার তাঁহার নিখিল কার্য্যের গুণকীর্ত্তন করি।

এখানে, নিম্নে, ক্ষুদ্র তটিনীটির বাঁকে বাঁকে, সুদীর্ঘ পপ্‌লার তরুশ্রেণী জোট্ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া; খানিকটা সুদৃশ্য কুজ্‌ঝটিকাস্তর নদীতট ও ভূমিভাগ ব্যাপিয়া বক্রগামিনী স্রোতস্বিনীকে আচ্ছাদিত করিয়া, একখানি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ আস্তরণের মত নিরলম্বে ঝুলিতেছিল; চন্দ্রকিরণ সেই শুভ্র বাষ্প ভেদ করিয়া, উহাকে রৌপ্য-মণ্ডিত ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রবল ও পরিবর্দ্ধমান উত্তেজনায় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া, সে পুনর্ব্বার থামিল।

কেমন একটু সংশয়, যেন উদ্বেগের ছায়া, তাহার হৃদয় অধিকার করিল; সে আপনার মনে সময়ে সময়ে যে সকল প্রশ্ন করিত, তাহারই একটি এখন মনে উদিত হইল।

ঈশ্বর কেন ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন? রাত্রি যদি নিদ্রা, চেতনার বিলোপ, বিশ্রামের জন্য জগৎকে ভুলিয়া যাইবার জন্য, তবে কেন আজিকার নিশি দিনালোকের অপেক্ষাও রমণীয়, অরুণোদয় ও সূর্য্যাস্তের অপেক্ষাও মধুর? এই মন্থরগামী মনোহর তারকাটি সূর্য্যের অপেক্ষাও কবিত্বময়; এমন সূক্ষ্মদর্শী যে, মনে হয়, জ্যোতিষ্কপতি যে সকল অতি সুকুমার অতিনিভৃত পদার্থকে প্রোজ্জ্বল করিতে পারে না, ইহা সেই তাহাদের আলোকিত করিবার জন্য সৃষ্ট। এই সব ছায়াবিচিত্র কাননকে আলোকদীপ্ত করিতে সূর্য্য কেন আসিয়াছিল?

সঙ্গীতপটু বিহঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাখীটি কেন অপর সকলের মত নিদ্রিত নয়? কেনই বা সে এই অস্পষ্ট আবেগজনক অন্ধকারে বসিয়া গান করিতেছে?

প্রকৃতির কেন এই আধ অবগুণ্ঠন? বক্ষ কেন কম্পিত হইতেছে? মন কেন উত্তেজিত? শরীরের কেন এই অবসাদ?

কেন এ বিচিত্র মায়ার বিকাশ? মানুষ ত দেখিতেছে না—এখন যে সকলেই সুখশয্যায় নিদ্রাতুর। এই সমুদয় দৃশ্য কা'র জন্য? কাহারই বা তৃপ্তির জন্য এই স্বর্গমর্ত্ত্যবিপ্লাবিনী কবিত্বধারা?

যাজকটি ত কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু, ঐ দেখ—বনান্তে দুটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি—সমুজ্জ্বল নীহারে পরিস্নাত তরুতোরণের নিম্নে পাশাপাশি বিচরণ করিতেছে!

পুরুষটি দীর্ঘতর, ভুজপাশে প্রেয়সীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া; ক্ষণে ক্ষণে তাহার ললাট চুম্বন করিতেছে। নির্জ্জীব প্রকৃতিকে তাহারা সহসা প্রাণদান করিল; নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবার জন্যই এই দিব্য দৃশ্য বিরচিত! বোধ হইতেছিল, তাহারা দু জনে মিলিয়া একটিমাত্র প্রাণী—তাহার নিমিত্তই এই নিভৃত শান্ত রজনী সৃষ্ট।

তাহারা যাজকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—যেন সচেতন উত্তর। বিশ্বপ্রভু যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর পাঠাইলেন!

সে অভিভূতচিত্তে, স্পন্দিতবক্ষে, নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন বাইবেলে বর্ণিত রুথ এবং বজের প্রেমকাহিনীর অভিনয় দেখিতেছে;

ধর্ম্মগ্রন্থে কথিত একটি মহান আখ্যানে যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে। Song of Songsএর কবিতা—সেই আন্তরিক বিলাপ, শরীরীর সেই সব দৈব আমন্ত্রণ, স্নেহ প্রেমে উদ্দীপ্ত সে কাব্যের সকল উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা—তাহার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সে আপনার মনে বলিল, "বোধ হয় ঈশ্বর মানবের প্রেমকে চরমোৎকর্ষে মণ্ডিত করিবার জন্যই এমন রজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।"

অন্যোন্যের করধৃত বিচরমান প্রণয়িমিথুনের সম্মুখ হইতে সে চলিয়া গেল।

এ যে তাহার ভাগিনেয়ী ছাড়া আর কেহ নয়!

এখন সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঈশ্বরকে অমান্য করি নাই ত? যে প্রেমকে তিনি এমন গৌরবে বিমণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার অভিপ্রেত নয়?"

বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া সে ছুটিয়া পলাইল—যেন লজ্জিত—যেন যে মন্দিরে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ, তথায় সে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে।*

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

চরিত্রনীতি।

ইংরাজীতে Ethics বা Moral Philosophy বলিতে যাহা বুঝায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচনার বিষয়। Ethics শব্দের অনুবাদ লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। "চরিত্রনীতি" সম্বন্ধে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির ন্যায় চরিত্রনীতি শব্দও বিজ্ঞান ও ব্যবহার (Science and Art) এই উভয় ভাবে গৃহীত হইতে পারে। Ethicsএর অনুবাদে নীতিবিজ্ঞান সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, চরিত্র অর্থে নীতিশব্দের ব্যবহার বিরল। অনেক স্থলে 'নীতি' উপদেশসমষ্টির অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু Theology, Sociology প্রভৃতির অনুবাদে নীতিশব্দ প্রযুক্ত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রকটিত করিয়া থাকে। অতএব চরিত্রনীতিকে উহাদের অন্যতম বলিয়া গণনা করা, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

* গী দে মোপাসাঁর রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে চরিত্রনীতির অনুশীলন দুর্ভাগ্যক্রমে অতি বিরল। বঙ্গসমাজ পরস্পরপ্রতিযোগী বিভিন্নমুখ শক্তিনিচয়ের সংঘাতে যেরূপ অস্থির অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে চরিত্রনীতির ন্যায় শাস্ত্রের উপকারিতা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মের একাতপত্র প্রতাপ ছিল, সে ধর্ম্মের বিলয় হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মের স্থিরতা নিতান্ত অল্প, চরিত্রের পরিণতি আরও সুদূরপরাহত। চরিত্রগঠনের প্রতি এইরূপ উদাসীনতা আমাদের বিকাশোন্মুখ জাতীয় জীবনের যে কত দূর অন্তরায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষার বহুস্তর অতিক্রম করিয়া বঙ্গীয় যুবক যখন সমাহিতচিত্তে দেখিতে পান যে, তাঁহার শিক্ষার মূলদেশ বালুকাস্তূপের ন্যায় শ্লথ ও স্খলিত, তখন নৈরাশ্যশঙ্কিতহৃদয়ে তিনি চরিত্রনীতির সৃষ্টি করিয়া লইয়া সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, সমাজের অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ রীতিনীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। সমাজও অস্বাভাবিক আত্মম্ভরিতার অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। কঠিন জীবনসংগ্রামে কঠিনতর সামাজিক সংগ্রাম মিশ্রিত হইয়া আত্মোৎকর্ষের আশা বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; Metaphysics অর্থাৎ মুখ্য দর্শন, Psychology—মনোবিজ্ঞান, Ethics—চরিত্রনীতি। চরিত্রনীতির বিষয় মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ ও ন্যায়ান্যায়ের নির্দ্ধারণ। মনের স্বরূপনির্ণয় মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, এবং বিশ্বের মূল কারণের নিরূপণ মুখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য। ভারতীয় প্রাচীন দর্শনে এইরূপ কোনও বিভাগ নাই। আমাদের প্রাচীন চরিত্রনীতি মুখ্য দর্শন ও সংহিতানিবদ্ধ বিধির সহিত এরূপভাবে সংমিশ্রিত যে, তাহা পৃথক করা কঠিন। সেকালে সমাজনীতি বা চরিত্রনীতি, ধর্ম্মনীতির অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। ধর্ম্মনীতি আবার দর্শনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। লোকশিক্ষার্থ যে সকল সংহিতার রচনা হইয়াছিল, তাহাতে আচার, নীতি, বিধি, পদ্ধতি ও ধর্ম্ম, সমস্তই একত্র সংমিশ্রিত। অবশ্য প্রাচীন সমাজ ও আধুনিক সমাজের পার্থক্যই আমাদের প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পার্থক্যের হেতু বলিয়া অনুমিত হয়। বর্ত্তমান কালেও যে ধর্ম্মনীতি হইতে চরিত্রনীতির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সাধিত হইয়াছে, এমন নহে। এবং এরূপ স্বাতন্ত্র্য আদৌ সম্ভব কি না, এ জটিল প্রশ্ন এখনও অনেকের মনে উত্থিত হইয়া থাকে। সময়ের হিসাবে এতদুভয়ের কোনটী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ

করিয়াছে, তাহা অবধারণ করা দর্শনের ইতিহাসের কর্ত্তব্য। মানবজ্ঞানের আদিম ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া আমাদের পুষ্টতর জ্ঞানে ধর্ম্মনীতি ও চরিত্র-নীতি যে অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ঈশ্বরে আস্তিক্যবুদ্ধি ও ঈশ্বরের সহিত মানবের চিরন্তন সম্বন্ধ লইয়া ধর্ম্মনীতি গঠিত। আর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ক্রিয়ার ন্যায়ান্যায়বিচারে চরিত্রনীতি ব্যাপৃত। আমাদের যে সকল ক্রিয়া অজ্ঞানকৃত, অথবা যাহা অপরের ইচ্ছার দ্বারা, বা অন্য কোন কারণে এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, তাহাতে কর্ত্তার ইচ্ছার কোন অবকাশ নাই, তাহা ন্যায়ান্যায় অভিধানের অন্তর্ভূত নহে। কেহ স্বপ্নভ্রমণের বশবর্ত্তী হইয়া কোন জলাশয়ে নিমগ্ন হইল ;—তাহাকে আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী বলা যায় না। প্রাণনাশোদ্যত দস্যুদল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কেহ অপরের দ্রব্য অপহরণ করিল ; তাহাকে নীতির চক্ষে দোষী বলা যায় না। সুতরাং ক্রিয়ামাত্রই চরিত্রনীতির অন্তর্গত নহে। আমরা জ্ঞানের সহিত স্ব-ইচ্ছায় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, কেবল তাহারই সম্বন্ধে পাপ পুণ্য, দোষ গুণ, ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কোন বস্তু বা বিষয় আপনা হইতে পাপ পুণ্য সংজ্ঞা পাইতে পারে না। মদ্যপান পাপ হইতে পারে, কিন্তু মদ্যকে পাপ বা অন্যায় বলিলে শব্দের অপ-ব্যবহার করা হয়। ক্রিয়াব্যপদেশে যে সকল শারীরিক প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাও নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের নৈতিক বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। শিশু ছাত্রকে প্রহার করিলে শিক্ষক দায়ী হইবেন না, কিন্তু তিনি যদি তাঁহার সহযোগীকে প্রহার করেন, তবে তিনি সম্পূর্ণ অপরাধী। প্রহার ব্যাপারে যে শারীরিক প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, তাহা উভয়ত্র সমান। কিন্তু নীতির চক্ষে তাঁহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত। এক পক্ষে ছাত্রের হিতেচ্ছা, পক্ষান্তরে সহযোগীর অবমাননা, তাঁহার বিভিন্নরূপ দায়িত্বের হেতু। তাহা হই-লেই প্রতিপন্ন হইল যে,ইচ্ছা বা বাসনার (Desire) ন্যায়ান্যায় অনুসারে পাপপুণ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। কোন বস্তু পাইবার জন্য বা উপভোগ করিবার জন্য যে ইচ্ছা হয়, তাহাকে বাসনা বলা যাইতে পারে। যখন তাহা লোকের ইচ্ছার বাহিরে থাকে, অর্থাৎ যখন সে বস্তুর সহিত কাহারও ইচ্ছার কোন সম্বন্ধ নাই, তখন তাহা ন্যায় অন্যায় সংজ্ঞাভুক্ত হইতে পারে না। যখন তাহা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হয়, তখন তাহার সেই সম্পূর্ণ বস্তুগত স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের বিচারের বিষয়ীভূত হয়। অতএব আমরা দেখিলাম, কোন ক্রিয়া

স্বেচ্ছাসম্পাদিত হইলে ন্যায়ান্যায় আখ্যার অন্তর্গত হয় এবং যে অভিপ্রায়ে সেই কার্য্যটির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ভাল মন্দ লইয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কার্য্য সৎ, অপরটি অসৎ, এ স্থলে কর্ত্তার যদি এতদুভয়ের মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহার সম্বন্ধে 'দায়িত্ব' কথাটি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। আমরা যখন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদের নির্ব্বাচনী শক্তি অনন্ত সম্ভাবনার কোন একটি সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করিতেছে। অনেকগুলি কর্ম্ম-সম্ভাবনার মধ্যে বাস্তবজগতে একটিমাত্র আবির্ভূত হইল, অপরগুলি সম্ভাবনাই রহিয়া গেল। অপর শত শত কার্য্য থাকিতে এইটীই কেন অনুষ্ঠিত হইল? অপর সহস্র উপায় থাকিতে এই উপায়ে কার্য্যটি কেন নিষ্পন্ন হইল? ইহা ভাবিয়া দেখিলে কর্ম্মক্ষেত্রে নির্ব্বাচনী শক্তির অবসর সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে শক্তির দ্বারা অনন্ত অপরিমেয় সম্ভাবনার সমূহ হইতে কর্ম্মানুষ্ঠাতা একটিমাত্র সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করেন, তাহাকেই নির্ব্বাচনী শক্তি বলা যায়। অনেকের মধ্যে একের নির্ব্বাচন ইচ্ছার ধর্ম্ম, ইচ্ছার স্বাধীনতা; এই স্বাধীনতাই আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মূল। ইচ্ছা অন্যান্য ঘটনার দ্বারা ও শিক্ষার প্রভাবে কি পরিমাণে গঠিত হয়, তাহা আমরা পরে দেখিব। কোন একটি কার্য্য করিবার সময় 'এই কার্য্যই সৎ, ইহাই করা কর্ত্তব্য, অন্যরূপ করিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকিলেও তাহা অকর্ত্তব্য'—যদি এইরূপ মনে না হইত, তবে দায়িত্ব কেবল কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইত। যন্ত্র কেবল একভাবে কার্য্য করিতে পারে, সুতরাং তাহার দায়িত্ব নাই, বিকল হইয়া কাহারও কোন ক্ষতি করিলেও যন্ত্রকে সে ক্ষতির জন্য 'দায়ী' বলা যায় না। শিশু ও ইতরপ্রাণিগণের চৈতন্য থাকিলেও ক্রিয়াফলের অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং তাহাদের নির্ব্বাচনীশক্তি থাকিতে পারে না; এ জন্য তাহারা নীতির হিসাবে তাহাদের কর্ম্মের জন্য দায়ী হয় না। নৈতিক জ্ঞানের পরিণতি অনুসারে যে কার্য্যকে ন্যায় বলিয়া মনে করা যায়, তাহার অবলম্বনের প্রবৃত্তিকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলে। অনেকগুলি কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মটিকে শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হয়, তাহা 'কর্ত্তব্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তব্য ন্যায়েরই অপরাংশ, অথবা কর্ত্তব্য ও ন্যায় উভয়ই এক, কেবল ভিন্নপক্ষমাত্র। যাহা ন্যায্য, তাহাই কর্ত্তব্য; ন্যায্য ব্যতীত কর্ত্তব্য

নাই। কর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে যাহাকে ন্যায় বলিয়া বোধ হয়, কর্ত্তার দিক দিয়া দেখিলে তাহাই কর্ত্তব্য। পরের দুঃখবিমোচন সৎকর্ম্ম, অতএব উহা আমাদের কর্ত্তব্য, করা উচিত। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে, এই ঔচিত্যবোধের মধ্যে 'বাধ্যতা' ও 'দায়িত্বের' জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করা না করা আমাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। তাহা করিতে আমরা বাধ্য, এবং না করিলে দায়ী হইব, এইরূপ অনুভব করি। যেমন প্রভু কোন আদেশ করিলে ভৃত্য তাহা প্রাণপণে পালন করিতে বাধ্য, এবং যতক্ষণ সে যথাসাধ্য চেষ্টা না করে, ততক্ষণ সে প্রভুর নিকট অপরাধী। কর্ত্তব্য তেমনই যেন কাহারও আদেশ, আদেশের ন্যায় ইহাতেও দায়িত্ব আছে, এবং আদেশের ন্যায় ইহা পালন করিতে আমরা বাধ্য। কোন একটি কর্ম্ম কর্ত্তব্য,—এইরূপ অবধারিত হইবামাত্র, উহা আমাদের প্রভুস্বরূপ হইয়া উঠে। অনেক স্বার্থ, বিলাস ও প্রিয়বস্তু ছাড়িয়া যে কর্ত্তব্যের অনুসরণে কায়মনোবাক্য নিয়োজিত করিতে হয়, সেই কর্ত্তব্য আদেশ অপেক্ষা কঠোর; কিন্তু আদেশ নহে। কর্ত্তব্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাহারও আদেশ নহে, কর্ত্তব্যের সঙ্গে প্রভুর শাস্তি ও পুরস্কার মিশ্রিত নাই। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ পালন করিয়া শাস্তির হস্ত পরিত্রাণ পাইবার ও পুরস্কার লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট, কর্ত্তব্যবুদ্ধি সেরূপ স্বার্থপরতাপ্রসূত নহে। দুরন্ত শিশুকে মিষ্ট আবরণে তিক্ত ঔষধ খাওয়াইলে সে যেমন তাহার আস্বাদ সম্বন্ধে প্রতারিত হয়, শাস্তি ও পুরস্কারের সম্ভাবনামিশ্রিত কর্ত্তব্যজ্ঞানেও সেইরূপ প্রতারণার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ত্তব্যের সঙ্গে ইহজগতের কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ সুখের সম্বন্ধ নাই। সুখের বিনিময়েও কর্ত্তব্যের অনুশাসন মানিতে হয়, কর্ত্তব্যের প্ররোচনা সর্ব্বাপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী। কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের অনিবার্য্য শক্তির অনুভূতি হয়, কিন্তু তাহাতে বলপ্রয়োগের আশঙ্কা নাই। কর্ত্তব্যের মূলে এইরূপ বাধ্যতার ধারণা বিস্ময়কর ব্যাপার, সন্দেহ নাই। পারলৌকিক কোন নিগ্রহানুগ্রহের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের ধর্ম্ম সম্যক রক্ষিত হয় না। আমরা যত প্রকার আদেশের সহিত পরিচিত, এবং সেই আদেশ সকল আমাদের মানস-রাজ্যে যে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ, কর্ত্তব্যজ্ঞান অনেকাংশে আদেশের ন্যায় হইয়াও, তাহাদের মত নহে। কর্ত্তব্যের মূল অদৃশ্য, অনিশ্চিত, কাল্পনিক; কিন্তু কর্ত্তব্য স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। যেরূপ প্রবৃত্তি হইতে আমরা কর্ত্তব্যপালন

করি, সেরূপ প্রবৃত্তি হইতে কখনও কোনও আদেশ পালন করি না। ইহার অনুভব স্বতন্ত্র, শাস্তি স্বতন্ত্র, পুরস্কার স্বতন্ত্র। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাহত হইয়া কর্ত্তব্যানুসারী ব্যক্তি যে অনুতাপ ভোগ করেন, তাহা পার্থিব শাস্তি হইতে স্বতন্ত্র।

এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের মূল কি? ইহা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা ধর্ম্মনীতি রাজ্যের অত্যন্ত সন্নিহিত হইলাম, বোধ হইবে। কর্ত্তব্যজ্ঞানের মূল যদি ঈশ্বরে আরোপিত করা যায়, তাহা হইলে অনেকগুলি বিষয় সহজবোধ্য হয়। তাহা হইলে কর্ত্তব্যের মধ্যে আদেশের ভাব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিয়ামকত্ব আর বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না। ন্যায়ান্যায়ের প্রকৃতিগত বৈষম্য ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য কতকগুলি ক্রিয়া স্বতঃ ন্যায়, কতকগুলি অন্যায়, কতকগুলি পথ সরল সহজ, কতকগুলি পিচ্ছিল, পঙ্কিল। পরমেশ্বরই ন্যায়ান্যায়ের প্রবর্ত্তক; কর্ত্তব্য তাঁহারই আদেশ। কর্ত্তব্যের শ্রেয়োজ্ঞানজনিত যে অপ্রতিহত প্ররোচনা, তাহাও এই ঐশ্বরীয় জন্মের ফল। কর্ত্তব্যের অনুসরণে পুরস্কার তাঁহার প্রীতি, কর্ত্তব্যের অবহেলায় শাস্তি তাঁহার ক্রোধ। অতএব পার্থিব সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া মানব কর্ত্তব্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা শরণ্য বলিয়া মানিবে, ইহা বিচিত্র কি? সকল শ্রেয়ের বিধাতা, ন্যায়ের উৎস পরমেশ্বরের যে আদেশ বিশাল সৃষ্টিগ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া মানবের মনে চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পার্থিব এমন কি বল আছে, এমন কি প্রতিযোগী প্রভাব আছে, যাহা সেই আদেশ—ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সেই কর্ত্তব্যের তুলনায় মানব হেলায় উপেক্ষা করিতে না পারিবে? কর্ত্তব্যজ্ঞানের এই প্রকার উৎপত্তি মানিয়া লইলে চরিত্রনীতি ও ধর্ম্মনীতির মধ্যে পার্থক্য সংকীর্ণ হইয়া আসিবে। তখন উভয়ে একই অনন্ত সাগরে মিলিত দুইটি স্রোতের মত, অথবা একই উৎস হইতে উৎসারিত দুইটি ধারার মত, একত্র উত্থিত ও বিলীন মনে হইবে। চরিত্রনীতির ভাষায় যাহা ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম্মনীতির ভাষায় তাহাই পুণ্য ও পাপ। চরিত্রই ধর্ম্মজীবন; ধর্ম্মজীবন চরিত্রে প্রকাশিত।

ধর্ম্মের সহিত কর্ত্তব্যের এইরূপ সংমিশ্রণ অনেকের মতে যুক্তিবিরুদ্ধ। কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে ঈশ্বরের আদেশ হইতে অভিন্ন কল্পনা করিলে তাঁহার প্রীতি ও অপ্রীতি পুরস্কার ও শাস্তির রূপে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে, এবং লোকে ইহলোক বা পরলোকের সুখদুঃখের আশা

ও আশঙ্কাকেই ন্যায়ানুষ্ঠানের মূল বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি সুখদুঃখের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার স্বধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। ঈশ্বরের প্রতি ইহার হেতুত্বের আরোপ করিলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অন্তঃস্থিত প্রভাব বাহ্য প্রভাবে পরিণত হয়। জড়জগতের প্রলোভননিচয় যেমন বাহির হইতে অন্তঃপ্রকৃতির উপর কার্য্য করে, ঈশ্বরাদেশ তেমনই বাহির হইতে আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম্মের সহিত নৈতিক জ্ঞানের এইরূপ মিলনে অনেক সময়ে কুফল ফলিতে দেখা যায়। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কতকগুলি ধর্ম্মমত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এ সকল ধর্ম্মে কুনীতির জন্য ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের অসারতার জন্য নীতি, উপেক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, নাস্তিকতার মধ্যেও নৈতিক জ্ঞানের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান দেখা যায়। শৈশবে যখন ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাতও হয় না, তখন নৈতিকজ্ঞানের ক্রমবিকাশ লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যায় কিছু দেখিলে বালকের ভ্রূকুঞ্চন তাহার ঈশ্বর-বিশ্বাসের বহু পূর্ব্বে পরিলক্ষিত হয়। এই সকল কারণে অনেকে এরূপ মনে করেন যে, ধর্ম্ম ও নৈতিকতার মধ্যে আদৌ কারণ কার্য্য সম্বন্ধ নাই। পূর্ণবিকশিত নৈতিকজ্ঞানের সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না, আমাদের জীবনের প্রারম্ভে ও অনেকের সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্ম্ম কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহায়তা করিয়া থাকে। কর্ত্তব্যজ্ঞান পরিণতি লাভ করিলে এই সকল বাহ্য প্রভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নিঃস্বার্থতা ও উদারতা লাভ করে।

ধর্ম্মনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে চরিত্রনীতি যে একান্ত অসম্ভব নহে, তাহা পরস্পরবিসংবাদী দার্শনিকগণের কলহ হইতে অবগত হওয়া যায়। এক সম্প্রদায় যুক্তি অপেক্ষা মানবের ধর্ম্মপ্রবণতা ও ঈশ্বর-ভক্তির সাহায্য লইয়া ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। অপর সম্প্রদায় যুক্তির সাহায্যে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য প্রবৃত্তির দ্বারা নৈতিকজ্ঞানের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া সন্তুষ্ট। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের মতে ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতি নিত্যসম্বদ্ধ। ইহাঁদের মধ্যে এক শ্রেণী চরিত্র ও ধর্ম্মনীতিকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিতে চাহেন ; আর এক শ্রেণী আছেন,—তাঁহারা ধর্ম্মকে চরিত্রনীতির কারণ না বলিয়া,চরিত্রনীতিকেই ধর্ম্মের কারণ মনে করেন। ধর্ম্মের সহিত কর্ত্তব্যের সংমিশ্রণে আমরা পূর্ব্বোক্ত মতের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কাণ্ট ধর্ম্মনীতি ও চরিত্রনীতির সমবায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার

মতে সচ্চরিত্রতার সহিত সুখের নিত্যসম্বন্ধ। ইচ্ছার স্বাধীন সংযম হইতে মানব যে সচ্চরিত্রতা (virtue) লাভ করে, সুখ তাহার পুরস্কার। কিন্তু সুখ পার্থিব বস্তুর উপর নির্ভর করে, পুণ্য অন্তঃরাজ্যের বস্তু। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধের আমরা কল্পনা করিতে পারি না। পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে সুখের সম্ভাবনার হেতু দেখা যায় না। কাণ্ট বলেন, পুণ্য ও সুখের মধ্যে যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে, সেই সম্বন্ধের সংস্থাপয়িতা, সেই স্বাভাবিক নিয়মের নিয়ামক—ঈশ্বর। সুতরাং নৈতিক জগতের কার্য্য-পরম্পরার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কাণ্ট ঈশ্বরের কারণত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাণ্টের মতে ধর্ম্মই চরিত্রনীতির কারণ। বলা বাহুল্য, এই মত আদৌ খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম সাধারণতঃ নৈতিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাতে হিন্দুধর্ম্মে, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মে যে নৈতিকতার অভাব আছে, তাহা বুঝায় না। নৈতিকতার প্রাধান্যই খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরবস্থল। মনের বিশুদ্ধি, চরিত্রের পবিত্রতা খ্রীষ্টধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। স্বর্গীয় ডাঃ মার্টিনো দার্শনিকভাবে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মনীতির বহুপূর্ব্বে চরিত্রনীতি মানবের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে। চরিত্রনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে যে কেবল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, তাহা নহে। চরিত্রনীতি নহিলে ধর্ম্মের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমাদের নৈতিক জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মে লীন হয়। আমাদের হৃদয়ে যে সকল প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের কতকগুলি নিকৃষ্ট, অপরগুলি উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এবং প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্টের জয় ও নিকৃষ্টের পরাজয় হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিপরম্পরার মধ্যে এইরূপ স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা ও জয়শীলতা, মার্টিনোর মতে, আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূল। এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে যে বাধ্যতাজ্ঞান রহিয়াছে, তাহাতে পরিণামে নৈতিক জীবনকে ঈশ্বরমুখ করিয়া দেয়। ন্যায়ের আধ্যাত্মিক শাসন আমাদিগকে যে দায়িত্ব ও বাধ্যতা শিক্ষা দেয়, সেই দায়িত্ব ও বাধ্যতা যাঁহাকে দেয়, অর্থাৎ যাঁহার নিকট তাহার জন্য আমরা দায়ী বা বাধ্য, তাঁহার ধারণায় চরিত্রনীতি সাফল্য লাভ করে। ধর্ম্মের আদর্শে না মিলাইতে পারিলে সে চরিত্র ব্যর্থ ; আর চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে সে ধর্ম্ম অর্থহীন। ইহাই সংক্ষেপতঃ মার্টিনোর মতের ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সার মর্ম্ম।

অনেক দার্শনিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য নৈতিক জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন কারণ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ আত্মসুখপরতা, কেহ সার্ব্বজনীনসুখপরতা, কেহ সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসা, কেহ যুক্তিবাদ, এবং কেহ বা আত্মনির্বৃতিকে (self realisation) নৈতিক জ্ঞানের মূল নির্দ্দেশ করিয়া, চরিত্রনীতি হইতে ধর্ম্মকে বিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যাঁহারা আত্মনির্বৃতিকেই চরিত্রনীতির কারণ ও উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নীতিকেই এমন ভাবে গঠিত করেন যে, তাঁহাদের নীতিবাদকে ধর্ম্মতত্ত্ব বলা, বা ধর্ম্মতত্ত্বকে নীতিবাদ বলা, একই কথা। আমরা বারান্তরে অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে এই সকল মতের আলোচনা করিব।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না বলিয়াই ইহার নানাপ্রকার কারণ কল্পিত হইয়াছে, এবং চরিত্রনীতির সমগ্রতার জন্য উহাদের স্বাতন্ত্র্য যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, দেশ বা কাল ভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; এ জন্য কেহ কেহ ধর্ম্মের ভিত্তিকে অতি শ্লথ বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ, বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ঈশ্বরবিহীনধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে চরিত্রনীতির ব্যবস্থা করিতে হইলে, চরিত্রনীতিকে ঈশ্বরনিরপেক্ষ করিতেই হইবে।

কিন্তু ধর্ম্ম হইতে নীতিকে বিচ্যুত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলেও, যখন ব্যক্তিগত জীবনে আসিয়া পড়ি, আমরা বিপন্ন হই। কুপথগামী ব্যক্তিকে সৎপথে আনয়ন করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইবার আশা করা যাইতে পারে? আত্মসুখপরতা প্রভৃতি যুক্তির অবলম্বন অপেক্ষা তাহার পারিবারিক দুঃখ কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার হৃদয়কে জাগ্রত করিতে পারিলে অধিক ফল ফলিবার সম্ভাবনা। মদ্যপায়ী কোন যুবককে, মদ্যপান যুক্তিযুক্ত নহে, অথবা ইহা শারীরিক অকল্যাণদায়ক, বা মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা কর; সে বলিবে, মদ্যপানই প্রকৃত আমোদ, তাহার তুলনায় শরীরের মঙ্গল কিছুই নহে। কিন্তু এই সময়ে পরজীবনের চিন্তা, ধর্ম্মের ধারণায় প্রভূত ফল ফলিয়া থাকে। যেখানে সকল যুক্তি ব্যর্থ, ধর্ম্ম সেখানে জয়যুক্ত। সেই জন্য মনে হয়, আমাদের সর্ব্বতোমুখ প্রবৃত্তিনিচয়ের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করিবেন, কুপথগামী মানবের বিকৃত প্রকৃতির পক্ষে যাহা যুক্তিযুক্ত, আত্মস্থ প্রকৃতির পক্ষে তাহাই যে যুক্তিসঙ্গত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। আমরাও

যে কেবলমাত্র ইহাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি, তাহা নহে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির স্বতন্ত্র উৎপত্তিকল্পনাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় দৃষ্টিসীমার বাহিরে লইয়া গেলে চরিত্রনীতির দেবত্বরক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

খ্রীষ্টানের আত্ম-কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৈশবেই মাতৃহীন হই, এবং পাঠ্যাবস্থায় (যখন বি-এ ক্লাশে পড়ি) পিতাও আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যান।

আমি পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা পঞ্চাশ টাকা বেতনে কলিকাতায় স্কুলমাষ্টারী করিতেন। কষ্টে সংসার চলিত। পিতা আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার অবস্থায় বার টাকা মাহিনা দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাকে পড়ান এই স্নেহের একটি নিদর্শন। কলেজের বেতন দিয়া ও অন্যান্য খরচ বাদে আমাদের উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকিত না। মৃত্যুকালে পিতা একখানি পৈতৃক বাড়ী ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা এই বাড়ীতেই থাকিতাম।

সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়াতে অগত্যা আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল। বলিতে ভুলিয়াছি, অল্পবয়সেই পিতা আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। আমার স্ত্রীর নাম প্রাণদা।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা দুইটি প্রাণী সংসারসাগরে যখন ভাসিতেছি, আমার এক দূরসম্পর্কীয় মামা স্নেহপরবশ হইয়া আজিমগড় এঞ্জিনিয়ার আফিসে কুড়ি টাকা বেতনে আমার একটি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। মামা সেই আফিসেই একটা বড় কাজ করিতেন।

অনেক চেষ্টায় আমাদের বসতবাড়ীর একটি ভাড়াটিয়া ঠিক করিয়া সস্ত্রীক আজিমগড় যাত্রা করিলাম। আমি জীবনে এই প্রথম কলিকাতা ছাড়ি।

বেলা দশটার সময় আজিমগড়ে পঁহুছিলাম। মামা আমাদের জন্য একটি

ছোটখাট বাংলা ঠিক করিয়াছিলেন। থাকিবার দুইটি ঘর ও দাওয়ায় দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা একটি ছোট রান্নাঘর ছিল। বাড়ির পশ্চিমধারে একটু বাগানের মত—দুই চারিটি গোলাপ ও চামেলী,এবং ফলের মধ্যে আতা ও পেয়ারা গাছ। এক মাইল ধরিয়া আর কোথাও ঘরবাড়ী নাই—সুবিস্তীর্ণ মাঠ ধুধু করিতেছে।

ট্রেণে সারা রাত আমার ঘুম হয় নাই। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই একটা মাদুর পাতিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আমার স্ত্রী ঐন্দ্রজালিক ক্ষিপ্র হস্তচালনায় নিমিষের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর চুলায় আগুন ধরাইয়া এক বাটি গরম দুধ আনিয়া আমাকে খাইতে দিলেন।

এইখানে আমার স্ত্রীর একটু বর্ণনা করিলে, আশা করি, কেহ আমাকে বেয়াদব ঠাওরাইবেন না। কারণ, এই আখ্যায়িকায় আমার স্ত্রীকে বাদ দিলে আমাকেও কলম বন্ধ করিতে হয়।

তবে নির্ভয়ে আরম্ভ করি। আমার স্ত্রী অসামান্যা সুন্দরী, অন্ততঃ আমার চক্ষে। এণাক্ষী, শুকচঞ্চুনাসা, বিম্বোষ্ঠ প্রভৃতি মাপকাটির সহিত না মিলিতে পারে। কিন্তু উজ্জ্বল গৌরবর্ণে মুখে এম্‌নি একটি স্বচ্ছ সুমিষ্ট সুন্দর ভাব—যাহা আমার কাছে কি বলিব!—আমার স্ত্রী গৃহকর্ম্মে অপরাজিতা। এ বিষয়ে আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই সাক্ষ্য দিবেন।

কিন্তু তবুও আমার মনে সুখ নাই। সংসারের হিসাবপত্র আমাকে রাখিতে হয় না, আমার স্ত্রীই রাখেন। ঘড়িধরা সময় মত আহার পাই, রোগে শুশ্রূষা পাই, সুন্দর মুখ চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে দেখিতে পাই—তবুও আমার মনে সুখ নাই। মিষ্টি মুখে এত শুষ্কতা, এত তীব্রতা! সুন্দর ফুল এত গন্ধহীন! ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আহার না পাইলেও চলে, সংসারের হিসাবপত্র কষ্টে স্বষ্টে দেখা যায়; কিন্তু যাহা না হইলে জীবন থাকা আর না থাকা সমান, সেই পদার্থ হইতে আমি বঞ্চিত ছিলাম। আমার স্ত্রীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি ছিল না, কলের মত কাজ করিতেন, ভালবাসিবার তাঁহার বড় একটা অবসর ছিল না। কখনও মিষ্ট কথা কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত আদর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। হয় ত আমিই তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

প্রত্যহই আফিস যাই। মামার খাতিরে সকলেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। অল্প দিনের মধ্যে আফিসের কাজ কর্ম্ম আমার বেশ অভ্যস্ত

হইয়া আসিল। সকালে দশটা বাজিতে না বাজিতে আফিস যাই, আর বেলা পাঁচটার সময় কাগজপত্র বগলে করিয়া শ্রান্তদেহে একাকী সুদীর্ঘ ধান্য-ক্ষেতের মধ্য দিয়া বাড়ী ফিরি।

বাড়ী ফিরিয়াই দেখি,দাওয়ায় ঘটিটি গামছাটি ও ঘরের মেজের জলখাবার সব প্রস্তুত রহিয়াছে। গৃহিণী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। মুখ হাত ধুইয়া কিঞ্চিৎ উদরস্থ করিয়া একখানা বই হাতে লইয়া পড়িতে বসি। তখন চামেলী গাছ অজস্র সুমিষ্ট গন্ধ উদ্গীরণ করিয়া আমার শ্রান্ত মনকে কি যেন স্মরণ করাইয়া অধিকতর শ্রান্ত করিয়া তুলিত। সন্ধ্যা হইলে কখনও কখনও মাঠে একটু বেড়াইয়া আসি। তাহার পর অল্পস্বল্প আফিসের কাজ দেখিয়া আহারান্তে শয়ন করি।

সে দিন বড়ই মধুর জ্যোৎস্নারাত্রি। স্বচ্ছ নীল আকাশ। স্নিগ্ধ তরল আলো সমস্ত দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। দূরে সারি সারি মহুয়া গাছ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান। কোথাও খোয়াইয়ের মধ্যে একটু আধটু জল চিক্ চিক্ করিতেছে। আমি দাওয়ায় ইজি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। সহসা কি ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া ঘরে ঢুকিলাম। আমার স্ত্রী পান সাজিতেছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। এ কথা সে কথার পর বলিলাম, প্রাণদা, পিতা আমার অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমি দুঃখী, আমাকে বিবাহ করিয়া কেবল তোমারই কষ্ট। আবার ত শীঘ্রই একটি নূতন প্রাণী আমাদের সংসারে আসিতেছে (আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন)। সময়ে সময়ে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হয়। স্ত্রী বলিলেন, ভাল করিয়া কাজ কর, যাহাতে মাহিনা বাড়ে, তাহারই চেষ্টা দেখ। হায়, এমন জ্যোৎস্নাভরা সুন্দর রজনী, এমন সুন্দর মুখ, আমার চিত্তচকোর উন্মুখ, এরূপ অবস্থায় এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর উত্তর আমার বুকে বড়ই বাজিল। আমি উঠিয়া ইজি-চেয়ারে গিয়া বসিলাম। মর্ম্মভেদ করিয়া চোখ দিয়া জল বহিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।

এক দিন অপরাহ্নে আফিস হইতে বাড়ী আসিয়াছি। ছেলেকে কোলে করিয়া বাগানে চামেলি ফুল তুলিয়া দিতেছিলাম। এমন সময় দেখি, এক জন পাদ্রী সাহেব উলঙ্গ মৃতপ্রায় একটি বালককে কোলে লইয়া আমাদের বাড়ীর

দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, এই দুর্ভিক্ষের সময় এই ছেলেটিকে একটি ক্ষেতের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছি। ইহার চেহারা দেখিয়া ইহার অবস্থা সবই বুঝিতে পারিতেছেন। যদি দয়া করিয়া কিছু ক্ষণের জন্য ইহাকে আপনার বাড়ীতে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে ছেলেটি বাঁচিতে পারে। আমার বাড়ী এখান হইতে অনেক দূরে, সেখানে লইয়া যাইতে যাইতে হয় ত ইহার বিপদ সম্ভাবনা। আমি সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী আনিলাম। দুই জনে মিলিয়া বালকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করিয়া একখানি কাপড় পরাইয়া দিলাম। তাহার পর খানিকটা গরম দুধ খাওয়াইলাম। অনেক চেষ্টা ও যত্নে বালকটি একটু সুস্থ হইলে আমার স্ত্রীর জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া আমরা দুই জনে বাহিরে আসিয়া বসিলাম।

পাদ্রী সাহেব আপনার জীবনের কথা, ধর্ম্মের কথা বলিতে লাগিলেন। পিতার অগাধ বিষয় ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে এ দেশে আসিয়াছেন। পিতার মত ছিল না যে, চর্চ্চে প্রবেশ করেন, কিন্তু পুত্রের একান্ত জিদ্ দেখিয়া শেষে আর কিছু বলিলেন না। বড় ঘরের এক কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, প্রচারকার্য্যে ভারতবর্ষে আসিতেছেন শুনিয়া কন্যার পিতা শেষে বাঁকিয়া বসিলেন। দেখিলাম, ক্রাইষ্টের কথা কহিতে কহিতে ইঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কি ধর্ম্মভাব, কি জীবন্ত বিশ্বাস, কি জ্বলন্ত প্রেম ও নিষ্ঠা, উপাস্য দেবতার চরণে আত্ম-বলিদান দিয়া কি স্বাচ্ছন্দ্য-অনুভব!—সমুন্নত বলিষ্ঠ দেহ ক্রূশের সম্মুখে যেন তৃণের মত কাঁপিতেছে! বলিতে লাগিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম বড়ই মধুর। আত্মাকে একেবারে পরিষ্কার, একেবারে আকাঙ্ক্ষাশূন্য করিতে হইবে,—তবে প্রভু আসিয়া হৃৎপদ্মে বসিবেন। যিনি আমাদের পাপভার হরণ করিতে দয়া করিয়া পৃথিবীতে আসিলেন, তাঁহাকে কার্য্যে বচনে মননে প্রত্যক্ষীভূত করিতে হইবে। আমি সহজে কাহাকেও খ্রীষ্টান করি না। কেহ খ্রীষ্টান হইতে আসিলে আমি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুই চারিবার ফিরাইয়া দিই। তাহার পর যদি দেখি, পিপাসা অতি প্রবল, তখন ধর্ম্মে দীক্ষিত করি। কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন সাহেব আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছেলেটিকে কোলে করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। সে দৃশ্য আমি আর জীবনে ভুলিব না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কথা আমার কানে বাজিতে লাগিল। রাত্রে স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিলাম।

প্রত্যহই পাদ্রী আমাদের বাড়ী আসেন। প্রত্যহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হয়। আমার আর তাঁহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। যীশু খ্রীষ্টের একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আমাকে উপহার দিয়াছেন,—সেখানি সযত্নে ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি। অবসর পাইলেই বাইবেল পাঠ করি। ক্রমশঃ আমার মনে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে কি যন্ত্রণা!

যাহার দুঃখের সীমা নাই, সে দুঃখ ভুলিবার উপায় খুঁজিয়া বেড়ায়,—কেহ মন্দ পথে গিয়া মদ খায়, কেহ প্রভুর চরণ সার করিয়া উদ্ধার পায়। সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ সুখের নহে,—দেবতার সহিত আমার চির-সম্বন্ধ হউক। বিপুল বিভব ত্যাগ করতঃ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই দীর্ঘ-বপু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী শ্বেতপুঙ্গব এত সুখ পাইল, আমি কি তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন করিয়া শান্তি পাইব না!—কে যেন বলিল, "বিশ্বাস কর, অবশ্যই পাইবে!"

আমার স্ত্রীর নিকট এক দিন আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। স্ত্রী বলিল, মরণ আর কি, খ্রীষ্টান হবার আবার সাধ গেছে!

ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যাবেলায় আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। মধুর বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পশ্চিমে গোলাপ সুন্দর রঙ ফলাইয়া স্তরে স্তরে ফুটিয়া আছে। আমি সুখে নৃত্য করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছি। আমার আনন্দ দেখে কে! বাড়ীতে ঢুকিয়া নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে আমার স্ত্রীকে বলিলাম, আজ আমি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। স্ত্রী ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরদিনই তিনি আমাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় পিত্রালয়ে গমন করিলেন। আমার কলিকাতার পৈতৃক বাটী স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঁচ বৎসর সমানভাবে কাজ করিলাম। আমার বেশ উন্নতিও হইতে লাগিল। মাসে মাসে কিছু কিছু রাখিয়া অল্প স্বল্প টাকাও জমাইলাম। শেষে আর ভাল লাগিল না, কাজ ছাড়িয়া দিয়া এস্যান্‌সোলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

খোলার ঘরে থাকি। আসবাবের মধ্যে একখানি খাটিয়া আর লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য খান দুই চেয়ার। ঘরের এক পাশে একটা মাটীর উনান,—স্বহস্তে চা রুটি তৈয়ারি করিয়া খাই। কুলুঙ্গির উপর একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স—প্রতিবাসীদের অসুখ বিসুখে ঔষধ দিই। জীবনের সাথী একখানি বাইবেল রহিয়াছে—কখনও কখনও পড়ি। অধিকাংশ সময় উর্দ্ধনেত্রে পরিত্রাতার পানে চাহিয়া থাকি। বেতনভোগী মিশনরীদের সঙ্গে আমার বড় একটা বনিবনাও ছিল না। তাহাদের পুঁথিগত ধর্ম্ম আমার ভাল লাগিত না। আমার আজিমগড়ের সাহেব কখনও কখনও আসিতেন—তখন আমার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় যাই, আমার এক খ্রীষ্টান বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উঠি। সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী গিয়া আমার ছেলেকে একবার দেখিয়া আসি। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতেন না। আমার পরম সৌভাগ্য,—আমার ছেলেকে কাছে আসিতে কেহ নিষেধ করিতেন না। কখনও কখনও ইচ্ছা হইত, আমার ছেলের জন্য কিছু খাবারসামগ্রী কিনিয়া লইয়া যাই—কিন্তু সাহস করিতাম না; আমার ছোঁয়া কি তাহাকে খাইতে দিবে?

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেছে। আমি কলিকাতায় আসিয়া সকাল বেলা পুত্রের সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখি, বাহিরে রকের উপর রসুনচৌকি বাজিতেছে। গৃহ লোকে লোকারণ্য। শুনিলাম, আজ আমার পুত্রের উপনয়ন। ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া নিতান্ত অপরিচিতের মত সভার এক কোণে গিয়া বসিলাম। বিদ্ধকর্ণ মুণ্ডিতমস্তক পুত্র পীঁড়ার উপর বসিয়া আছে, পুরোহিত মন্ত্র দিতেছেন। সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখি, আমার স্ত্রী চিকের মধ্য হইতে তাম্বূলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠে হাসিতে হাসিতে উৎসব দেখিতেছেন। আমি চক্ষু দুটি ফিরাইয়া লইলাম। উৎসবশেষে পকেট হইতে একখানি ছোট বাইবেল বাহির করিয়া পুত্রের ভিক্ষাঝুলির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বন্ধুগৃহে ফিরিলাম।

দুই দিন পরে এণ্ডানসোলে আসিয়া দেখি, আমার প্রদত্ত বাইবেলখানি খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছে। ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় সাধারণের পরিচিত নহেন। কিন্তু তিনি এক জন অসাধারণ ভাবুক ও ভক্ত কবি ছিলেন। সঙ্গীতরচনায় তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল। অল্প দিন হইল, তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে তাঁহার মুখেই তাঁহার স্বরচিত গীত শুনিয়াছি, এবং তৎপ্রণীত দুইখানি সঙ্গীতপুস্তক ও একখানি কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াছি; সাহস করিয়া বলিতেছি, তাঁহার কবিত্ব অসাধারণ ছিল। তবে "দারিদ্র্যদোষো গুণ-রাশিনাশী।" প্রসন্নকুমার অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এবং একমাত্র দরিদ্রতায় তাঁহার সকল গুণ প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি নিজে কখনও আত্মপ্রকাশে অগ্রসর বা ব্যগ্র ছিলেন না, এ জন্য অনেক সাহিত্যসেবকের নিকটেও তাঁহার নাম নূতন বলিয়া বোধ হইবে। ঢাকা জেলায় তাঁহার জন্মস্থান, এবং ঢাকা জেলাতেই তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; অথচ এই জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিরাও তাঁহাকে জানিতেন না।

প্রসন্নকুমার জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের কাজ করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাদের অনেকের নিকটেই তিনি "প্রসন্ন পণ্ডিত" নামে পরিচিত বলিয়াই, আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত বলি নাই। আমাদের বিশ্বাস, প্রসন্নকুমার এক জন প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে সাধকত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

প্রসন্নকুমারের জীবন-কথা লিখিবার ইচ্ছা নাই। লিখিতে গেলে তাহা কেবল দুঃখদারিদ্র্যের কাহিনীতে পূর্ণ হইবে। তাঁহার কবিতা বুঝিবার নিমিত্ত কিছু জানা আবশ্যক বলিয়া, আমরা সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা লিপি-বদ্ধ করিতেছি।

বিক্রমপুর পরগণার রাজবাড়ী থানার অতি নিকটবর্ত্তী বয়েরক গ্রাম প্রসন্নকুমারের জন্মস্থান। ইহাঁর পিতার নাম রামজয় চট্টোপাধ্যায়। রামজয় তিন বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান। দ্বিতীয়ার গর্ভে এক কন্যা জন্মে; তিনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন। প্রসন্নকুমার তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত। যখন প্রসন্নের বয়ঃক্রম এক বৎসর, এবং তাঁহার জননীর বয়স ষোল সতের

বৎসর, সেই সময়ে রামজয় গতাসু হন। প্রসন্নের কিছু পৈত্রিক জমা জমি ছিল। তাহার অধিকাংশ এক প্রতিবেশী আত্মসাৎ করেন। অবশিষ্ট পদ্মা নদীর উদরসাৎ হয়। প্রসন্নের এক মাতুল ডিব্রুগড়ে চাকরী করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তিনিই প্রসন্ন ও তাঁহার জননীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসন্নকুমারের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন এই মাতুল মানবলীলা সংবরণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহাদের দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হয়। জননী এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া অতি কষ্টে পুত্রের লালনপালন করেন। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই প্রসন্নকুমার অন্নকষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া চাকুরীর চেষ্টায় বাহির হন, এবং কিছু দিনের জন্য এক পুলিশ কর্ম্মচারীর অধীনে সামান্য লেখাপড়ার কর্ম্ম করেন। সে কালে পুলিশের মুহুরী থাকিত। এ চাকরী তাঁহার সহিল না। প্রসন্নকুমার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, এবং অনেক কষ্টে ও নিজের আন্তরিক যত্নে নর্ম্যাল স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এইখানেই তাঁহার অপরা বিদ্যার শেষ। পরা বিদ্যায় তিনি কত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রবন্ধশেষে পাঠক তাহার বিবেচনা করিবেন। ইহার পর প্রসন্নকুমার কেবল ঢাকা জেলার নানা স্থানে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের কাজ করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে ঢাকা সহরে জি, সি, দত্তের স্কুলে পণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের ১৭ই মাঘ বুধবারে তাঁহার জন্ম হয়; আর ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১০ই মঙ্গলবার তিনি দেহত্যাগ করেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

পিতার ন্যায় প্রসন্নকুমারও পুত্রলাভার্থ একাধিক বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা স্বভাবকুলীন ছিলেন। ভঙ্গ হন নাই। প্রসন্নকুমারের প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক কন্যা হয়। এই কন্যার বয়স পনের বৎসর হইলে পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায় প্রসন্নকুমার পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। নশঙ্কর-গ্রামনিবাসী স্বভাবকুলীন স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়ের প্রস্তাব হয়। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনের তিন দিন পূর্ব্বে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকেও প্রসন্নকুমারকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই প্রস্তাবে প্রসন্নকুমারের জননীর সম্মতিলাভ করেন। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রসন্ন-

কুমার মাতার আদেশে একই দিনে তুই বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার চারি পুত্রের জন্ম হয়। তৃতীয়া স্ত্রী নিঃসন্তান। মৃত্যুকালে প্রসন্নকুমার তাঁহার তিন পত্নী, এক পুত্রবতী কন্যা, চারিটি পুত্র ও বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী পিত্রালয়ে,কন্যাটি শ্বশুরভবনে এবং তৃতীয়া স্ত্রী মাতুলাবাসে অবস্থিতি করিতেছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত তুইটি দরিদ্র সহোদর লইয়া নশঙ্কর গ্রামে অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। পুত্র কয়েকটির মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ উপনয়নের বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছেন; অর্থাভাবে আজিও উপনয়ন হয় নাই।

প্রসন্নকুমার চিরদিন দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের কাজ করিয়া তিনি মাসে পঞ্চদশ হইতে বিংশ মুদ্রার অধিক অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই স্বল্প আয়ে পরিবারস্থ সকলের গ্রাসাচ্ছাদন সচ্ছলরূপে সম্পন্ন হইত না। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন বড়লোক তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতেন। বিশেষ বিপন্ন না হইলে তিনি কখন কাহারও দ্বারস্থ হইতেন না। বাড়ীভাড়া দিবার সামর্থ্য ছিল না বলিয়া প্রসন্নকুমার বহু দিন এক বড়লোকের অনুগ্রহে তাঁহার ঢাকার বাড়ীর বাহিরের খণ্ডে বিনা ভাড়ায় বাস করিতেন। তাঁহাকে নিজ হস্তে বুড়ী গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনিতে হইত। ইহাতেও তাঁহার প্রতি কমলার কোপ প্রশমিত হয় নাই। বাগ্দেবীর কিছু দয়া ছিল বলিয়াই বোধ হয় এমন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার পৈত্রিক তালুকের কতক অংশ এক প্রতিবেশী আত্মসাৎ করেন, কতক পদ্মা নদীর উদরসাৎ হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রসন্নকুমারের পৈতৃক বাসভবনে যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র চালা-ঘর৷ ছিল, তাহা অগ্নিদেব ভস্মসাৎ করেন। প্রসন্নকুমার ভিক্ষা করিয়া তথায় একখানি সামান্য চালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সংপ্রতি তাঁহার বৃদ্ধা জননী উন্মাদিনী অবস্থায় সেই চালায় অবস্থান করিতেছেন।

এই গেল প্রসন্নকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। এইবার আমরা তাঁহার কবিত্বের কথা বলিব। তিনি শৈশব হইতেই অতিশয় সংগীতানুরাগী ছিলেন। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি গীত রচনা করিতে পারিতেন। প্রথমতঃ তিনি যাত্রা, কবি ও হোলির গান রচনা করিয়া দিতেন, এবং

অনেক সময়ে নিজে দলে মিশিয়া গান করিতেন। নিজের রচিত গীত ভিন্ন তিনি অন্য কিছু গাইতেন না। কিন্তু যাত্রা, কবি ও হোলির গানে তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি হইবে কেন? তিনি বঙ্গবাসীকে অনেক উচ্চ অঙ্গের সংগীত শুনাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারের নিষ্ঠুরতায় অতি অল্প বয়সেই তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতির গুণে ও সুকৃতির বলে তিনি চিরদিন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সুতরাং অল্প দিনেই তাঁহার কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাধকত্বে পরিণত হইল। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চিরদিন কালীনামের উপাসক ছিলেন। প্রসন্নকুমারের অন্যবিধ রচনা থাকিলেও, এই গীতগুলিই তাঁহার প্রাণের জিনিষ। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত গীতের অধিকাংশই রক্ষিত হয় নাই। প্রসন্নকুমারের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তাঁহার রচিত কত শত গীত বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়াছে। তিনি নিজে কখনও তাহা মুদ্রিত করিবার প্রয়াসী বা সাহসী ছিলেন না। চিরদিন জঠরজ্বালায় জর্জ্জরিত, পুস্তক মুদ্রিত করিবার অর্থ কোথা হইতে আসিবে? মুদ্রিত পুস্তক সঙ্গীতময় দুই খণ্ডে আমরা কেবল প্রসন্নকুমারের প্রৌঢ় বয়সের রচনা দেখিতে পাই। তাঁহার প্রথম ও মধ্য জীবনের দুই চারিটি গীতমাত্র ইহাতে থাকিতে পারে। ইহাতে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা দেশের তত দোষ দিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রসন্নকুমার আত্মপ্রকাশে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অনুরোধ উপরোধের ধার ধারিতেন না। গানে তাঁহার মনের কথা তিনি জগজ্জননী মাকে বলিয়াই সন্তুষ্ট। মানুষকে বলিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ছিলেন না। লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে কেন? প্রবন্ধ লিখিব মনে করিয়া আমরা ঢাকা জেলার অনেক শিক্ষিত লোকের নিকট প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াছি। তাঁহাদের কেহ কেহ কহিয়াছেন, তাঁহারা প্রসন্নকুমারকে "পাগ্‌লা পণ্ডিত" বলিয়া জানিতেন। সংসারের হিসাবে তাঁহাকে পাগল বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তিনি সর্ব্বদা গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষমালা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মুখে কালীনাম প্রায় লাগিয়াই থাকিত, অথচ উদরান্নের জন্য সংসারের সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত। ভিতরের জিনিষ তিনি যাহার তাহার নিকট বাহির করিতেন না। অধিক কি, দীর্ঘকাল ঢাকা সহরে থাকিয়াও

সর্ব্বজনপরিচিত গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের নিকটও তিনি ধরা দেন নাই। ফলতঃ, এই পনের টাকা বেতনের পণ্ডিতের প্রাণ এমন ভাবময়, ভক্তিময় ও কবিত্বময় ছিল, ইহা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পরিচিত অনেকেও জানিতেন না। তাই বলিতেছিলাম, আমরা স্বদেশী-দিগকে অপরাধী করিতে পারি না। দেশের যে দু' একটি বড়লোক তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রসন্ন পণ্ডিতকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করি-তেন। তৎপ্রণীত মুদ্রিত দুই খণ্ড সঙ্গীতপুস্তকের জন্য বঙ্গদেশ কয়েক জন হৃদয়বান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্ লোকের নিকট ঋণী। স্থানাভাবে আমরা সাহায্য-দাতাদের নাম দিতে পারিলাম না।

প্রসন্নকুমারের অপ্রকাশিত গীত অনেক আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক হইতেই দুই চারিটি গীত উদ্ধৃত করিব। আমাদের বিশ্বাস, অধিকাংশ পাঠক প্রসন্নকুমারের পুস্তক দেখেন নাই। সংগীতময়ের ত বিজ্ঞাপন ছিল না। পুস্তকের সহিত কোন প্রশংসাপত্রও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচিত দুই চারি জন লোক ব্যতীত কেহ এই পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

প্রসন্নকুমার চিরদিন কালীনামের উপাসক ছিলেন। সংসারে আসিয়া তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হন। জ্ঞান হইবার পরে তিনি স্নেহময়ী জননীকেই চিনিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে "মা" ডাকই স্বাভাবিক। দরিদ্রা গর্ভধারিণীর একমাত্র নয়নপুত্তলী হইয়া তিনি মাতৃস্নেহের যে বিমল স্বাদ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সেই বিশ্বপ্রসূতির অসীম প্রেমের প্রভা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার আপন জননীর ন্যায় জগজ্জননীকে চিনিবার জন্য পাগল হইয়াছিলেন। দরিদ্র প্রসন্নকুমার একটি গানে বলিতেছেন,—

কোন প্রাণে মা! মা বিনে আর অন্য ডাকে ডাকি তোরে?
মা ডাকের মত ডাক কি মা আছে আর এ সংসারে?

* * *

জন্মমাত্র মা বুঝেছি, তার পরে আর সব চিনেছি,
মায়ের কৃপায় বেঁচে আছি, মা বিনে কি মুখে সরে?

* * *

মা ত গো মা তোমার ছায়া, তাইতে তাহার এত মায়া,
কতই অগাধ অপার তোমার দয়া প্রসন্ন তাই মা মা করে।

কয় জন দরিদ্রসন্তান জননীর আত্মত্যাগ হইতে সেই বিশ্বজননীর পবিত্র প্রেমের আস্বাদ পায়? প্রসন্নকুমার মায়ের সুসন্তান। তাই তাঁহার দরিদ্রতা কবিত্ব ও সাধনার সহায় হইয়াছিল। শৈশব হইতেই তাঁহার মনের কথা বলিবার একমাত্র পাত্র ছিলেন জননী। তাঁহার কবিত্ব ও সাধনায় তিনি মনের কথা জননীকেই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গানে তিনি মায়ের কাছে কখনও ভক্তি, কখনও ভালবাসা, কখনও প্রার্থনা, কখনও অনুযোগ, কখনও বা আবদার জানাইয়াছেন। সহসা দু' চারিটি গীত এক সঙ্গে পড়িলে একের ভাব অন্যের বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে বিরোধ কিছুই নাই। সঙ্গীতময় দুই খণ্ডে যে দুই শত পঁয়ষট্টিটি গীত আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, প্রসন্নকুমারের মনে যখন যে ভাব আসিয়াছে, তাহাই তিনি সংগীতে গ্রথিত করিয়াছেন। মায়ের কাছে মনের কোন ভাবই গোপন করেন নাই। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই দেখা যায়, সকল গীতেরই মূলমন্ত্র এক। সেই মন্ত্র এই যে, ঐহিক সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ বড়ই অনিত্য, বড়ই অস্থায়ী। মুগ্ধ মানব ইহা লইয়া মারামারি না করিয়া মায়ের প্রতি একাগ্র হইলে উদ্ধারের পথ পাইতে পারে। এই এক মহামন্ত্রই তাঁহার সমস্ত সঙ্গীতের প্রাণ। এই স্থানে বলিয়া রাখি, প্রসন্নকুমারের প্রকৃতি ও ধর্ম্মমত বড়ই উদার ছিল। তিনি যেখানেই মায়ের কাছে কাঁদিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই কেবল নিজের জন্য কাঁদেন নাই, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভবজীবের জন্য কাঁদিয়াছেন। তিনি সকলকেই এক মায়ের সন্তান ভাবিতেন। নিজে পবিত্র হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অহিন্দুর প্রতি তাঁহার ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না। ঈশা মুসা মহম্মদ নানক চৈতন্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই তিনি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার কালী-নাম অথবা মা-নামেও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাঁহার একটি গীত এই ;—

আল্লা কালী ভেদ কি কারণ? *
ও ভাই দ্বিভাবে নাই ত্রাণ কদাচন।
কেহ কারণ হতে কার্য্য বোঝে, কেহ কার্য্য হতে বোঝে কারণ,
ও ভাই যে যে পদেই যাউক না কেন গোবিন্দলাভ সবার মনন।
ভেদ ভাবে হয় দ্বন্দ্ব উদ্ভব দ্বন্দ্বই ত হয় ঈর্ষ্যার কারণ ;
তাতে ধর্ম্মে হয় অধর্ম্মের সঞ্চার, উদ্ধার হয় না, হয় ত পতন।

---

* রামপ্রসাদী সুর।

তাঁর ত অনন্ত নাম, যে নামে যার বাসনা হয় কর গ্রহণ,
তাঁরে ভক্তিভাবে ডাক্‌লেই শোনেন ঝগড়া বিবাদ কিসের কারণ ?

পাঠক দেখিবেন, প্রসন্নকুমার সংকীর্ণতার কত অতীত। আমরা তাঁহার সার্ব্বজনীন প্রীতি ও ভ্রাতৃভাবের দ্যোতক আর একটি গীত এখানে উদ্ধৃত করিব ;—

নাই ত কারও গতি বারণ *
যাচ্ছ তুমিও যেমন আমিও তেমন
মিঠা মুখে আলাপ করে পথ হাঁটিতে সুখটা যেমন।
ও ভাই দ্বন্দ্বে কেবল দ্বিগুণ কষ্ট, হব শৃগাল কুকুর কিসের কারণ ?
এস তবে সবে মিলে মা'র কার্য্য করে যাই সাধন,
ও ভাই প্রসন্ন ত দুর্ব্বল পথিক ধরে নাও তোমরা দশ জন।

জীবনপথে কেহ কাহারও গতিরোধ করিতে পারে না। পরস্পর কলহ করায় কেবল পথের কষ্ট বর্দ্ধিত হয় ; এই জন্য কবি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানব সাধারণকে মার কার্য্যসাধনার্থ একত্র মিলিত ও প্রীতিসম্বদ্ধ হইতে বলিতেছেন। শেষ পংক্তিতে কি মধুর বিনয় প্রকাশিত হইয়াছে ! পাঠক এমন বিনয় প্রসন্নকুমারের অনেক গানে দেখিতে পাইবেন। তিনি মার কার্য্যকেই সার কার্য্য মনে করিতেন। জীবনের অনিত্যতা, ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা, সংসারের অসারতা সম্বন্ধে তাঁহার অসংখ্য গীত আছে। আমরা এখন এই শ্রেণীর দুই একটি গীত উদ্ধৃত করিতেছি। একটি গানে প্রসন্নকুমার বলিতেছেন,—

তুমি যাবে ভব ছেড়ে, খেলার সজ্জা র'বে পড়ে, †
মায়ামুগ্ধ হয়ে এবে কতই আদর কর যারে।
মেটে হাঁড়ি যেমন করে পাচক ধোয় যতনভরে
মাসান্তে দেয় ফেলে দূরে, আবার নূতন হাঁড়ি কাড়ে ;
যত দেখিছ পরিজন, করিছে তোমায় যতন,
কালান্তে করে বর্জ্জন, সেবিবে এম্‌নি অপরে।
স্নান করে যায় পথিক যখন, আর্দ্র পদের চিহ্ন যেমন,
কিছু দূর জেগে বিলক্ষণ ক্রমে লুপ্ত হয়ে পড়ে ;
তেম্‌নি গেলে ভব ছেড়ে, নূতন নূতন ক'দিন স্মরে,
ক্রমে ক্রমে প্রসন্নেরে, পরিজনও যাবে পাশরে।

---

* রামপ্রসাদী সুর। † ললিত ; আড়া।

যাঁহারা মেটে হাঁড়ির ব্যবহার জানেন, তাঁহারা অতি সহজেই এ উপমার সৌন্দর্য্য বুঝিবেন। প্রসন্নকুমারের অধিকাংশ উপমাই গ্রাম্য বিষয় বা দরিদ্রপরিচিত সামগ্রী। তিনি স্বয়ং সংসারের হিসাবে চিরদরিদ্র ছিলেন। কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি এইরূপ বলিয়াই সাধারণের অতিশয় চিত্তাকর্ষক। পরবর্ত্তী কয়েক পংক্তিতে প্রসন্নকুমার কি সুন্দর ভাবেই বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, এবং শেষে একবারে লোপ পাইয়া থাকে। এমন কবিতার মাধুরী বুঝাইবার নিমিত্ত বোধ হয় টীকার প্রয়োজন নাই। পাঠক প্রসন্নকুমারের আর একটি গীত শুনুন ;—

যত পুত্র জায়া, দেখায় মায়া, কথার কথা সার ! *
দেহ পতন হলে দেয় যে ফেলে ফিরে চায় না আর !
* * *
মুখে থুক্ † থাকে যতক্ষণ, মুখামৃত হয় ততক্ষণ,
(একবার) মুখ হ'তে হ'লেই পতন, হয় ঘৃণার সঞ্চার।

প্রাণবান ও প্রাণহীন দেহের পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত কি সহজ সরল, অথচ মর্ম্মভেদী দৃষ্টান্ত! প্রসন্নকুমারের রচিত এমন গীত কতই আছে। মানুষের জীবন অস্থায়ী, তাহার ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার হস্তে, কবি এই কথা বুঝাইতে গিয়া কি মহাজ্ঞানমূলক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, পাঠক শুনুন ;—

কাজ কি ভবিষ্যৎ বিচারে ?
যখন পরক্ষণ,তোর অন্ধকারে ?
স্রোতের মুখের তৃণ তুমি কুয়াসায় তোর সমুখ ঘিরে,
তুমি যেটুক্ এগোও সেইটুক্ দেখ, সাধ্য কি দেখিবে পরে ?
কি করিলে কি হইবে তুমি বুঝতে পার বুদ্ধির জোরে,
তোমার কাজ সেইরূপ হবে কি না তা রয়েছে খোদের ঘরে।
যেমন মেয়ের বিয়ে দেবে বলে উদ্যোগ কর্ল্লে ধুমধাম করে,
তোমার এমন জ্বরে দিল ঠাঁসা বিয়ে গেল কোথায় উড়ে !
দাবার চালে শত্রুদমন কর্‌বে ভাবলে তিন সন পরে,
তুমি কাল যে মরবে সন্ন্যাস রোগে তা কি জান চিন্তা করে ?
স্নান করতে যাও নদীর ঘাটে, আহার এসে করবে পরে,—
ও মন ! এমনও ত হতে পারে, ফিরে না আসিবে ঘরে। ‡

* তাল—যৎ। † থুক্—থুতু ; ঢাকা অঞ্চলের দেশজ অপভ্রংশ। ‡ যাহাদের হাঙ্গরকুম্ভীরসংকুল নদীতীরে বাস, তাহাদের পক্ষে কি সুন্দর ও স্বাভাবিক কথা।

কেহ দালান তুলে বাস করে না কারও অর্দ্ধেক দালান আছে পড়ে,
কারও ইটের স্তূপই পড়ে আছে, ইট কেটেই সে গেছে মরে।
গাছ রোপিছ ফল খাইতে, নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাই রে!
দ্বিজ প্রসন্ন কয়, রোও না বৃক্ষ স্রষ্টার সৃষ্টিরক্ষার তরে।

এ গীতের আর টীকা কি করিব?

প্রসন্নকুমারের স্বর তেমন মধুর ছিল না, তিনি শিক্ষিত গায়কও ছিলেন না। কিন্তু তিনি যাহা গাহিতেন, তাহাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ইহাতেই তাঁহার গান এত মিষ্ট লাগিত।

পূর্ব্বোক্ত গানটির শেষ পংক্তিদ্বয়ে যেমন পরের প্রতি উপদেশ আছে, প্রসন্নকুমারের অধিকাংশ গীতেই ইহা নাই। অনেক স্থলেই তিনি নিজের দোষ অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। দু' এক স্থলে কেবল পরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

প্রসন্নকুমারের অধিকাংশ গীতই গ্রাম্য ভাষায় অতি সহজবোধ্যভাবে রচিত। অনেক স্থলে তিনি নিজের দেশের ভাষা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে কচিৎ দু' একটি শব্দ অন্যদেশীয় লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে; কিন্তু মনে হয়, তাহাতেও প্রসন্নকুমারের গীতের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমারের গীতগুলি ঠিক যেন খনি হইতে উদ্ধৃত হীরকের ন্যায়। ইহাতে মানুষের হাত পড়ে নাই; অস্ত্রের দাগ লাগে নাই। মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হইলে হীরকের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কৃত্রিমতা আসিয়া পড়ে।

প্রসন্নের গানে কৃত্রিমতা নাই। সংসারের মান অভিমান সম্বন্ধে প্রসন্নকুমারের একটি সুন্দর উপমাপূর্ণ গীত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, কি সরল ও সহজ দৃষ্টান্তে কবি অসার অভিমানের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।—

আগে পাছে ত সবাই সমান? *
তবে কেনই এত মান অভিমান?
নির্ঝরমুখে জলবিন্দু ঝরে আসা একই প্রমাণ
মাঝে দিন দুই চারি ঢেউ খেলিয়ে সাগরেতেই শেষে মিলান।
রেলগাড়ীতে চড়ার মত পথ দুই দিকেই ত একই ধরান্
সবার আঁতুড়ঘরদে আসিতে হয় আর শ্মশান দিয়েই করবে পয়ান্।

---

* রামপ্রসাদী সুর।

প্রথম শ্রেণীর গাড়ীই কর, কিংবা নিম্ন শ্রেণীর যান,—
ও ভাই সকলকেই ত নাব্‌তে হবে, গাড়ীতে নয় জীবন কাটান!

ইংরেজ কবি বার্ণস্‌ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কবিতায় * কতকটা এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতায় শ্লেষ বিদ্রূপ ও অভিমানের অভিব্যক্তি কিছু অধিক। প্রসন্নকুমারের শ্লেষ বিদ্রূপ নাই। তাঁহার ইচ্ছা, বন্ধুর ন্যায় সকলকে যাবার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। সমগ্র সঙ্গীতময় পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ধনীর প্রতি অযথা আক্রমণ নাই; কিন্তু দুর্জ্জন ও পরপীড়কের প্রতি কটাক্ষ আছে। তাহাও অতি মৃদু। বিষয়ের অনিত্যতাবিষয়ক প্রসন্নকুমারের কতকগুলি গীত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা চিকিৎসকের অস্ত্রের ন্যায় হিতকারী। বস্তুতঃ তাঁহার বলিবার প্রণালী অতি চমৎকার। তাঁহার দৃষ্টি যেমন প্রসারিত, অন্তঃকরণ তেমনই উদার। সামান্য সামান্য বিষয় হইতে তিনি নিজের ও অন্যের জন্য অমূল্য উপদেশ আহরণ করিতে পারিতেন। নদীর তীরে শ্মশানের নিকটে একটি মানুষের মাথার কঙ্কাল দেখিয়া প্রসন্নকুমার গান ধরিলেন,—

কুস্থানে হায় অযতনে পড়ে কার মাথার খুলি! †

*　　*　　*

বিষয়ের বিষম চিন্তায় ঘুরেছে যে সদা কালই—
আজ কিনা হস্তিভক্ষিত কদ্‌বেলের মত খালি!

*　　*　　*

দেখে শুনে চৈতন্য নাই, ধরেছে ভাই দারুণ কলি;
এই বেলা দিন থাকিতে বল প্রসন্ন কালী কালী!

হস্তিভক্ষিত কদবেলের উপমা বহু পুরাতন। প্রসন্নকুমার তাহাই নূতন স্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন।

মানুষের মৃত্যু আমরা অহরহ দেখিতেছি। প্রসন্নকুমার একটি দেখিয়াই কেমন ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন! একদিন তিনি ঢাকা সহরে বাসা হইতে স্কুলে যাইতেছেন; পথিমধ্যে দেখিলেন, একটি বাড়ীর রোয়াকে একটি শব শায়িত রহিয়াছে। সৎকার করিবার লোক আসিয়া পঁহুছায় নাই। ঢাকা

---

* For'athal For'athal

† ভৈরবী; পোস্ত।

সহর সর্ব্বদা জনাকীর্ণ। মৃতব্যক্তির ভগ্নী ভার্য্যা প্রভৃতি গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু জননী সেই দুই প্রহরের রৌদ্রে মৃত পুত্রের পার্শ্বে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। শবের মুখে রৌদ্র লাগিতেছিল দেখিয়া তাহার হোগ্‌লা শয্যার হোগ্‌লা টানিয়া ছায়া দিতেছেন। প্রসন্নকুমার এই দৃশ্যের সারসংগ্রহ করিয়া একটি গীতে কেমন চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন ;

আজ কোন মনের খেদে এ দুপুরে রোদে শয্যা ত্যজে বাইরে শুয়েছ ? *
(ঐ না) তোমার রম্য গৃহ পড়ে কেন হোগ্‌লাতে বাহিরে কি দুঃখে সুখশয্যা ত্যজেছ ?
(ঐ না) ভগ্নী ভার্য্যা আদি কাঁদি কাঁদি হায়, গৃহ হতে তোমায় উঁকি দিয়ে চায়,
আর এই বিষম রৌদ্রের মাঝে অভাগিনী মায়, ধূলায় পড়িয়ে শিয়রে লোটায় ;
এত কাল কষ্টে লালিত যতনে, সে দেহের এ দশা সহে কি মার প্রাণে ?
ছায়া দিচ্ছেন মাতা হোগলা টেনে টেনে, কেমনে তা দেখে সহিছ ?
(আহা !) গর্ভে সঞ্চার হতে মরণ সময় এতে ঘটে যত কিছু বিঘ্ন সমুদয় ;
বলি তাহাতে কেবল মায়েরি সে হয় শারীরিক মানসিক যাতনা দুর্জ্জয়,
কর বা না কর সুখী তুমি কাজে, দুঃখের বেলায় কিন্তু তারি মর্ম্মে বাজে,
তোমার বিপদে দোষ ভুলে বিষাদেতে মজে মা বিনে কারে দেখেছ ?
বলি এ দুরন্ত রোদে খেদে জননীর কেমনে কঠিন রহিয়াছ স্থির ?
পথিক গৃহ পেয়ে হলে পুলকে অধীর এ সব পান্থ বন্ধু হল মনের বাহির,
মায়ের স্তন শিশু পাইলে যেমন, আর না আঙ্গুল চোষে ভ্রমেও তখন,
তুমি পান্থ ধর্ম্ম করে প্রত্যক্ষ অক্ষর প্রসঙ্গে ভালই বুঝায়েছ !

এক তুলিকাতেই অসীম মাতৃস্নেহ ও সংসারের অসারতা অতি বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শবের মুখে রৌদ্র লাগিতেছে, জননীর ইহাও সহ্য হয় নাই ; তিনি শবের শবত্ব ভুলিয়া সেই রৌদ্রনিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, এই ক্ষুদ্র চিত্র কেমন সুন্দর, কত উজ্জ্বল ! আমরা বহুদিন পূর্ব্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতায় এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি পাইয়াছিলাম। প্রসন্নকুমার ইংরাজী জানিতেন না, নিশ্চয়ই ওয়ার্ডসওয়ার্থের গ্রন্থ পড়েন নাই। শেষ কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, এমন জননীও পান্থ বন্ধু ভিন্ন অধিক কিছু নহেন।

তিনি বৃদ্ধ হন নাই, কিন্তু বার্দ্ধক্যের ছায়া আসিয়া তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। ইহাতেই তিনি কেমন ভাবনা ভাবিয়াছেন,—

---

* তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে—সুর।

অল্পে অল্পে পথ ফুরালো, *
ক্রমে শেষের দিন এগিয়ে এলো।
পরিলের খোঁটার মত মাঝে মাঝে দণ্ড রৈল
বিলের ক্ষুদ্র ঢেউএর মত চর্ম্মে ক্ষুদ্র ঢেউ ধরিল।
মাগো চন্দ্রালোকে পড়তাম সুখে সে দিন আমার ফুরাইল,
হ'ল সূঁচে সুতা ভরা কঠিন, আস্তে কথার বালাই হ'ল।
বুদ্ধি উদ্যম স্মৃতি আদি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হ'ল,
কেবল মিট্‌লো না মা ভবের তৃষ্ণা, সে ত অক্ষয়া বিবলতা হ'ল।
তৃষ্ণা আজন্ম ভবেতেই রৈল, তোমার দিকে নাহি গেল—
এখন মোষের ঘণ্টা শুনা যায় মা! প্রসন্নের কি হ'বে বল?

শেষ পংক্তিতে কি সরল কথায় প্রসন্নকুমার শমন-আগমনের আশঙ্কা করিতেছেন! পূর্ব্ববর্ত্তী পংক্তিদ্বয়ে পরকালচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কি সুন্দরভাবে আত্মগ্লানি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রসন্নকুমারের অনেকগুলি গীত এইরূপ;—

বল্‌তে পারি, কর্‌তে নারি,
যা বলে ফিরি, কই তা করি?
গোমুখীর মুখে সদাই ছোটে চোটে গঙ্গাবারি,—
বল গোমুখীর কি উপকার তায়, পাষাণ সে ত পূর্ব্বাপরই!

প্রসন্ন পাষাণ না হইলেও তাঁহার মুখে কবিতা যে গোমুখীমুখনিঃসৃত গঙ্গাবারির ন্যায় ছুটিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি গানে বলিতেছেন,—

বুঝ্‌লাম রে তুই নরাধম,
দেখি পাষাণে নাস্তি কর্দ্দম।
যত কর্‌লাম রহিয়ে জল ঢাল্‌লাম পূর্ব্বাপর তুই রইলি সম,
টেনে ছেড়ে দিলে রবার যেমন নাই আর কিছু বেশী কম।

যাহারা সংসারে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে ভগবানের দিকে যাইতে চাহিয়া আবার আসিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, তাহাদের পক্ষে কি সুন্দর কথা! মানুষ প্রবৃত্তি দমন করিতে গিয়া বিকৃতির হেতু দেখিলেই আবার পথ ভুলিয়া যায়; কবি কি সরল কথায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন!—

হ'ল আমার সব কল্পনা।
ওমা কাজের বেলায় জ্ঞান থাকে না।

---

* রামপ্রসাদী সুর।

মাছের কাঁটা গলায় বেধে ভাবলাম আর ত মাছ খাব না,—
আবার বুকরাঙ্গা কই পাতে পলে কাঁটার কথায় মন মানে না।
পাকা ফলার ধাতে সয় না, ভাবলাম আর ফলার করবো না;—
আবার নিমন্ত্রণ পেলে ভাবি,—আজ খাই খেয়ে আর খাব না!
দিবানিশি এম্‌নি করে ঘটিছে কতই ঘটনা,
নাই সুযোগ পেলে ছাড়াছাড়ি, প্রসন্নের এ কি লাঞ্ছনা!

নিম্নলিখিত গীতটিতে কবি আত্মগ্লানির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন;

সুপুত্র কই আমার মত?
কেবল তুই মা বলেই সহিস এত!
যেমন বুকে থেকেই বুক খুঁড়ে খায় কর্কটিকার ছানা যত,
তেম্‌নি তোর বুকেই থেকে দংশি তোর বুকেই মা অবিরত;
তুই কুলীরক দিয়ে দেখাইলি মাতৃস্নেহ অতুলিত,—
আর তায় ছানা দিয়ে দেখাইলি পুত্রাধম প্রসন্ন কত!

কতকগুলি গীতে আত্মগ্লানির সঙ্গে আরাধনা মিশ্রিত; তাহার দু' একটি কেমন মিষ্ট!—

তোমায় কি মা ভুষ্‌তে পারি?
আমি আপন দোষে আপনি মরি।
কুকুর যেমন প্রভু ছেড়ে ঘোরে ময়রার দ্বারে লোভে পড়ি,
তেম্‌নি ভবে ফিরি সুখের লোভে তোমাকে উপেক্ষা করি!
তুমি টেনে নিতে চাও সম্মুখে, আমি পাঁঠার মত খুঁটি ধরি,
লাগে গলায় ফাঁশ আর ভ্যা ভ্যা করি, তবু সোজা পথে চল্‌তে নারি।
পাঁঠার ত পাঁঠাত্বেই সুখ, মা, সে নরত্ব পাবে কি করি?
তুমি প্রসন্নে প্রসন্না বড় তাই নর-সমাজে চরি।
প্রসন্ন তোর বোকা ছেলে,—কথার ভট্‌চায্‌ কাজে নড়ি।*
তারে চুলে ধরে শাসন কর মা (ঘাড়ে) দিয়ে দুটো জুতোর বাড়ি।

সৎপথে যাইবার জন্য প্রাণে কত আবেগ আসিলে এমন ভাষা বাহির হয়? আমরা আত্মগ্লানিমিশ্রিত আরাধনার গান আরও দুই একটি উদ্ধৃত করিব। প্রসন্নকুমার আপনাকে ভবরোগের বিকারগ্রস্ত ভাবিয়া গাইতেছেন;

যখন সান্নিপাত বিকারে ধরে—
তখন বিষ ভাবে মা অমৃতেরে।

* নড়ি—কিছু নয়।

তখন চিকিৎসক করে না গণ্য তাহার শাসন মান্য থাক্‌লে পরে,
তার মুখে তুলে ঔষধ দিলেও থু করে দেয় ফেলে দূরে।
বিকার তারে যেম্‌নি লওয়ায় সে নির্ব্বিরোধে তেম্‌নি করে;
তারে ধরে রাখ্‌লে বিরক্ত হয়, ছুটে যেতে চাহে জোরে;
ও সে হিত করিলে অহিত ভাবে, উন্মত্তপ্রায় কফের জোরে;
প্রসন্নের কি বিষম বিকার (ওমা) ঔষধ আর ত নাহি ধরে।
কত মহাজনের মহৌষধি পয়সার মাল সব গেল উড়ে।
বাবা বৈদ্যনাথকে পাঠিয়ে দে মা যদি এ বিকার মোর কাট্‌তে পারে,
তবে সাধ্যমত আশুতোষে তুষিব মা ভাঙ্গ ধুতুরে।

একটি গানে তিনি বলিতেছেন,—

বিষ করে তুলি সুখে,—শেষে ভাবি জীবন গেল দুখে;
মা তুই সুধাসিন্ধু দেখায়ে দিস্‌, তাহা ত না দেখি চোখে;
তুই ভালবেসে অমৃত দিস্‌, কাদা মেখে দেই মা মুখে।
তোর সংসারে দুঃখ কোথায়? সীমা ছেড়েই পড়ি দুঃখে,
সুখ পেলেই এম্‌নি মেতে উঠি সুখের সুখ আর নাহি থাকে!
শিশুর হস্তভ্রষ্ট মিষ্ট যেমন ধুলো ঝেড়ে মা দেন মুখে,—
তেম্‌নি অত্যাচারের কষ্ট ঝেড়ে খাঁটি সুখ দাও প্রসন্নকে।

কি সুন্দর অথচ সরল প্রার্থনা! নিজের দোষ স্বীকার করিয়া মায়ের নিকট এইরূপ প্রার্থনা তাঁহার কত গীতেই আছে। পাঠক একটি ক্ষুদ্র গীত শুনুন,—

ভবের বড় বিড়ম্বনা।
ওমা আপন দোষ ত কেউ দেখে না।
যে দোষেতে দোষী নিজে সে দোষ কর্লে অন্য জনা
ওমা তার প্রতি হয় খড়্‌গহস্ত নিজের কথা মনে হয় না।
(ফেরে) লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে তুই যে দেখিস তা দেখে না!
মা তোর প্রসন্ন ত ঐ দলের লোক, তারে কেন মেজে নেনা।

আর কত উদ্ধৃত করিব? প্রসন্নকুমারের গীত কোনটি অপেক্ষা কোনটি অধিক মধুর, আমরা তাহা ঠিক করিতে পারি না। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গবাসী এমন গান সবগুলি শুনিতে পাইলেন না।

অতি সামান্য বিষয় হইতে প্রসন্নকুমার কত উচ্চভাবের কথা টানিয়া আনিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিন সন্ধ্যাকালে কোন গৃহস্থ তাহার একটি পোষা ছাগলের কান ধরিয়া বাড়ীর দিকে টানিয়া

লইয়া যাইতেছেন, ছাগলটি অনিচ্ছার সহিত পালকের অনুসরণ করিতেছে; তদ্দর্শনে প্রসন্নকুমার গান ধরিলেন ;—

মা! কান ধরে নে টেনে মোরে—
ঐ নিচ্ছে যেমন পশুটারে।
ঐ ত উচিতমতই নিচ্ছে ওরে ওটা যেমন বাঁধায় ফিরে—
ওগো পশু কি আর বশ থাকে মা নির্য্যাতন না কল্লে' পরে?
তুমি দড়ি বেঁধে আস্তে টান যাই এদিক ওদিক রাস্তা ছেড়ে,
যদি প্রসন্নেরে পথে নিবি, নে দেখি মা ধরে ঘাড়ে।
এক টানেই ত নিতে পার, কেন তামাসা দেখ রঙ্গ করে?
এ ত মানুষ নয় মা পশু বটে, তামাসা কি সাজে পশুরে?
ঘরে নিয়ে বেঁধে রেখো, আর কভু দিও না ছেড়ে—
পশু ছাড়া পেলেই স্বেচ্ছায় চরে ধরা দেয় না দৌড়ে ফিরে।
প্রসন্নের কপালই মন্দ, কেন যত্ন কর্‌বি তার উদ্ধারে,—
(নইলে) যার ইচ্ছায় ফেরে অসীম জগৎ,—কটাক্ষে তার কি না করে?

কতকগুলি গীতে প্রসন্নকুমার খাঁটি প্রার্থনা করিয়াছেন,—

শুন্‌বি কি কাঙ্গালের কথা?
শুনে দূর করবি কার মর্ম্মব্যথা?
(মাগো) খনির তিমিরের লৌহ উঠাবে কি আসি হেথা
ওমা চুম্বকে ঘসিয়ে দিয়ে জন্মাবে কি চুম্বকতা?
কম্পাসের শলাকার মত কর দেখি মা একাগ্রতা,
যেন ঘুরে ফিরে তোর দিকেই হই যখন আমি থাকি যথা;
নফরের ভার নাহি নিলে থাকে কি আর মনিবত্তা?
মা তোর প্রসন্নের ভার নিতেই হবে, নৈলে স্থান তার নাহি কোথা।

তিনি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই কালীপূজা করিতেন। অর্থের অস্বচ্ছলতানিবন্ধন পূজার তেমন আয়োজন হইত না। একদিন পূজার সমস্ত উদ্যোগ হইলে প্রসন্নকুমার গান ধরিলেন,—

(মা) কর এসে পূজা গ্রহণ!
হ'ল কাঙ্গালের ক্ষুদ্ যা আয়োজন।
তোমার দত্ত সকল বটে, তা বলে করো না হেলন;
দেখ মনিব থেকে মাইনে এনে করায় না কি মনিবভোজন?
আমার পাত্রখানা হীন বলে ভোগ ফেলে করো না গমন,
যারা সোনার থালে ভাত খায় মা, পাতে কি আর খায় না কখন?
রাগ করো না দেখে আমার যৎসামান্য উপকরণ,

যারা ক্ষীর সন্দেশ খায়,—নফরবাড়ীর ডা'ল্ ভাত কি করে বর্জ্জন ?
প্রসন্ন দরিদ্র বলে পূজার যোগ্য নয় কি এমন ?
যে ন্যাক্ড়া দিয়ে চুল বাঁধে মা তার কি বিয়ে হয় না কখন ?
ভকতি-ইচ্ছিতা তুমি চাও না আর কোন আয়োজন,
তা প্রসন্নে দিয়াছ যেমন, প্রসন্নও দিল তেমন।

এইবার আমরা প্রসন্নকুমারের আবদারে আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি অনেক গানে মার কাছে আবদার ও মায়ের প্রতি অনুযোগ করিয়াছেন। দু'একটি নমুনা দেখাইতেছি,—

তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী ;
তোর তিলেক অবসর নাহি দেখি !
লোকে লোকে সবাই ডাকে সবা'র ঘরে তুই একাকী,
তুই বড় বাপের বেটী বটিস্ তাই কি সহে এত ঝুঁকি ?
অচেতন চায় পরিবর্ত্তন, ফলফুল পাতা চাহে শাখী,
জীবের ত অশেষ যন্ত্রণা দিবারাত্রি ডাকাডাকি !
সকল গড়াও, সকল সাজাও, কোথাও কিছু রয় না বাকি,
মা ! তোর প্রসন্নের মন গড়াইতে অবসর হয় না কি ?

কি মিষ্ট অনুযোগ ! এইরূপ অনুযোগের আর একটি গান শুনুন ;—

মা তুমি মা জগদ্‌ভরা—
কেবল সন্তান নিয়ে কর্‌ছ ক্রীড়া।
নাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ কোথায়, কোথাও দিচ্ছ দুগ্ধধারা ;
কোথাও করছ সোহাগ, কোথাও বা রাগ, ঘুরাইয়ে নয়নতারা ;
কোথাও বুকে রেখে ঘুম পাড়াচ্ছ, কোথাও কোলে নিয়ে বেড়াও পাড়া ;
কোথাও গাছে বসে ডিম্ তা দিচ্ছ, কোথা অশৌচগৃহে আধমরা ;
আবার রুগ্ন পুত্র নিয়ে কোথাও দিনরাত্ আহার-নিদ্রা-ছাড়া ;
কোথাও শোকাতুরা লোটাও ভূমে, ফেলিয়ে অজস্র ধারা।
মা ! তোর মধুময় ভাব পবিত্র ভাব যে দিকে চাই পূর্ণ ধরা,
মা তুই শান্তিময়ী ঘরে ঘরে, প্রসন্ন কি জগৎছাড়া ?

পাঠক দেখুন, প্রসন্নের মা জগদ্ব্যাপিনী কি না ? মানবের জননীর ত কথাই নাই, ডিম্বরক্ষয়িত্রী পক্ষিণীও তাঁহার লক্ষ্যের বহির্ভূত নহে। তিনি সকল জননীতেই সেই বিশ্বজননীর ছায়া দেখিতেন। এমন জগদ্ব্যাপিকা জননীর অনুগ্রহ না পাইয়া তিনি আক্ষেপের সহিত সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, তিনি মায়ের সন্তানই নহেন। প্রসন্নকুমার বলিতেছেন,—

বুঝলাম আমি সন্তান নাকো।
যারা সন্তান তাদের বুকে রাখো।
পেটে হলেই সন্তান হয় না, ক্রিমি ত হয় পেটেই দেখ ;
তারে সন্তান বলে কে আদরে প্রসন্ন সেই ক্রিমি পোক।
তোর সন্তান থাকে ফুলবাগানে তাতে আবার কোলে রাখ,
আমি পুরীষে পচিয়া মরি দেখিয়াও নাহি দেখ।
একটি পরমাণু অযত্নের নাই যত সৃজিলে অনন্ত লোক,
আমায় সৃষ্টিছাড়া করে খুলি,—কোথায় রাখি দারুণ দুঃখ।

সাধনার বল না থাকিলে মানুষ এমনভাবে মায়ের কাছে কাঁদিতে পারে না। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য কোন কবি এমন ভাবে কাঁদিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। দুই এক স্থলে প্রসন্নের অনুযোগের মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। তিনি মার সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন, মার ব্যবস্থার দোষ বাহির করিয়াছেন। প্রসন্নকুমারের এই ভাবের গানও মধুর !—

ছি ছি মা তোর স্বভাব কেমন ?
ইথে সম্মানরক্ষা হয় কি কখন ?
রাজরাজেশ্বরী হয়ে ছেলেমো ঘুচ্‌লো না এখন !
ওমা দু'দিকে দুই খোঁচা দিয়ে রঙ্গ দেখিস্‌ পাতলার * মতন ?
বাঘকে বলিস মৃগ খাগে,—মৃগে ক'স কর্ত্তে পলায়ন,
ওমা চোরকে বলিস চুরি কর্ত্তে, গৃহস্থে কস থাক্‌ জাগরণ।
কুকুরকে দিস্‌ হুলাইয়ে শশক ধরে কর্ত্তে নিধন,—
আবার শশকে ক'স কুকুর এলো কুটিলগতি দৌড়া এখন।
বৃত্তিগুলির প্রশ্রয় দিয়ে করে দিলি মত্ত বারণ,—
আবার অঙ্কুশ দিয়ে শাসন কর্ত্তে যুদ্ধ বাধালি অনুক্ষণ।
প্রসন্ন হয়েছে পাগল, আত্মজ্ঞান যার নাই নিরূপণ,
ও সে কীটাণুকীট হয়ে করে মহাজ্ঞানের সমালোচন।
কি হেতু কি কর মাগো ! তুমিই জান তোমার মনন,
আমি অহঙ্কারী তাই বিচারি ধরা দেখি সরার মতন।

দু'এক স্থলে তিনি জীবের দুঃখে যেন একবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন,—

নাহি বিচার মা তোর সদনে
নাই ধর্ম্মের জোর ত এ ভুবনে।
* * *

---

* পাতলা—হালকা স্বভাবের লোক ; ঠিক ছেলেমোর ভাবপ্রকাশক।

গরু ঘোড়া আদি যত অহিংস্রক জন্তুগণে
আহা বনের ঘাস খায় লোকের কামায় তবু সদা রয় জীবনে।
একে উপযুক্ত আহার পায় না, অতিশ্রম তায় রাত্র দিনে,
আবার প্রহারের ত স্থান অস্থান নাই,—চোক খেয়ে দেখিস্ কেমনে?
পূর্ব্বজন্মের পাপের সাজা বল মা তা বুঝি কেমনে?
যখন জন্মান্তর মনে আসে না কি ফল বল এ শাসনে?
মাছ খাইল বিরাল কবে—মার তায় ধরে এখনে,
সে ত বুঝিল না কেন মার;—সতর্ক হবে কেমনে?

* * *

যথেচ্ছস্বভাবা তুমি কর যারে যা লয় মনে,
মিছে পূর্ব্বজন্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের দোষ কি প্রসন্ন মানে?

দুই এক স্থলে তিনি মা'কে পরামর্শ দিতেও ছাড়েন নাই। যথা,—

কেন তবে ভবে জীবে এত দুঃখ পায়?
যত সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব যদি তোর ইচ্ছায়?
ভেকে দিলি সাপে খেতে, ভেকের সুখ দিতি তাইতে,—
সাপের মুখে ভেকে যাইতে কেন কাঁদে উভরায়।
ব্যাঘ্রে যে চক্ষু ডুবায়ে হত জন্তুর রক্ত খায়,—
সেটা বাঘের দোষ, না জিহ্বার দোষ, না দোষ দিব জিহ্বা-দাতায়!
যত তৃণজীবিগণে, দিলি হিংস্রক-ভক্ষণে,—
হিংস্রকের তৃণ-অশনে তোর বাপের কি খোরাক যায়?
খাদ্যখাদকের মিল হইলে দম্পতির প্রায়,
ভবের অর্দ্ধেক দুঃখ কমে যেত, কতই সুখ বাড়িত তায়!

কবি ভবজীবের সুখ দুঃখ কিরূপ ভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা এই একটি গীতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। মায়ের কাছে তাঁহার অভিযোগ এই যে, খাদ্যখাদকের পরস্পর সংযোগ দাম্পত্যমিলনের ন্যায় উভয়ের পক্ষে সুখকর হইল না কেন? চিন্তা কত দূর প্রসারিত হইলে কবির মনে এমন অনর্গল ভাবের স্রোত আসিতে পারে, এবং তাহা এমন নিঃসঙ্কোচে বাহির করিতে পারা যায়? মাকে এইরূপে বকিয়া প্রসন্নকুমার ভাবিলেন, মায়ের ছেলে মা মারিতেছেন, আমার উহাতে মাথাব্যথা কি? অমনি গাইলেন,—

মন তোর কেন ফাজিল কথা?
অনধিকারচর্চ্চায় ঘুরাও মাথা।
ভব জীবের দুঃখ দেখে দুঃখী তুমি হও সর্ব্বথা,—
যার মাথা তার ত ব্যথা নয় মন! তোর দেখি সে মাথাব্যথা!

জীব যাহার ব্যবস্থা তাহার তিনিই জানেন কার কি বাধা,
তার কি প্রসন্নের মন্ত্রণা লাগে অসীম রাজ্যের যিনি নেতা?

ইহাতেও প্রসন্নকুমার দেখিলেন, যেন মায়ের উপর রাগ করা হইল। প্রতিবেশিনী কোন রমণীকে নিষ্ঠুরভাবে ছেলে ঠেঙ্গাইতে দেখিলে আমরা যেমন মুখ বাঁকাইয়া বলি, যার ছেলে সে মারিবে তোমার আমার কি?—এ যেন ঠিক সেই ভাবের কথা। প্রসন্নকুমার স্থানান্তরে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ সম্বন্ধে মায়ের কোন হাত নাই, জীবের সুখ দুঃখ কর্ম্মজন্য। মা কি করিবেন? তিনি গাইলেন,—

বুঝলাম তোমার ক্ষমতা নাই;
কর্ম্মে যেমন আছে, ঘটিবে তাই।
ভোগানুরূপ জন্ম হয় মা! কেহ, জন্ম অন্ধ; কারও পা নাই;
তারা দুঃখে পড়ে তোমায় ডাকে, দুর্ভোগ যায় কই, বৃথা দোহাই!
কেহ পরের সম্পদ পেয়ে হারায়, ভুগবে কিসে, ভোগে ত নাই।
ভোগের মত বুদ্ধি হয় মা, থাকে ভোগে যেমন, করি গো তাই;
ও মা দু'দিন পরে যা ঘটিবে সূত্রপাত তার আজ, কি বালাই!
নিয়মতন্ত্র রাজ্য মোদের, এতে রাজার বুঝি কোন হাত নাই;
আইনানুরূপ কার্য্য হবে, ঘুস দিলে আর হবে কি ছাই।

এইবার আমরা প্রসন্নকুমারের নিজের দুঃখ দারিদ্র্য সম্বন্ধে দুই একটি গীত উদ্ধৃত করিব। ইহা না করিলে সঙ্গীতময়ের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পুস্তকে গীতগুলির যে শৃঙ্খলা আছে, এ প্রবন্ধে তাহার অনুসরণ করি নাই। পুস্তক দুইখানিকে প্রসন্নকুমারের এক ক্ষুদ্র দর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নানা গানে নানা ভাবের অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু প্রসন্নকুমার সকল গীতকেই "মায়ের নাম" বলিতেন। সকল কথাই তিনি মায়ের কাছে বলিয়াছেন,—দুঃখদারিদ্র্যের কথা বলিবেন না কেন? চিরদিন তিনি দারিদ্র্যদাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন; সংসারে এক দিনের জন্যও বোধ হয় তাঁহার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য হয় নাই। সময়ে সময়ে তিনি ভিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতেন। তাই মায়ের কাছে আক্ষেপ,—

কত ঘুরাবি মা দেশ বিদেশে?
আর ত প্রাণ বাঁচে না এত ক্লেশে।
হা অন্ন হা অন্ন করে জীবন গেল কেবল ত্রাসে!
তোর নাম বেচিয়ে অন্ন খাব এই ছিল কি অবশেষে!

বহু অটন অন্ন লাভ মা, এ দারুণ উদর নাহি পোষে,
যেমন সারা দিন চরে কুলায় না তৃণভোজীর অসার ঘাসে;
সারভোজী মাংসাশীর কুলায়, এ কথাও মেনেই এক নিমেষে
আর অসারভোজীর সারা দিন যায় ঘাসের মাঝে মাথা ঘসে!
অসারেরই উদর ডাগর ভরে না মা বহুয়াসে,
ওগো সোনা রাখ্‌তে সিন্দুক নয় মা, সিন্দুক ভরে তামার কাঁসে!
সদাই পর্য্যটনে দেখে প্রসন্নেরে সবাই রোষে,—
তার যে ঘাসের উদর করে দিলি, সে দিকে নাই কারও দিশে।

মায়ের কাছে মনের কোন কথা বলিতেই প্রসন্নকুমারের লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না; হৃদয়ের কোন ভাবই তিনি মায়ের কাছে গোপন করেন নাই; তাই তাঁহার মুখ দিয়া এমন গান বাহির হইয়া গিয়াছে। এ গানটিতে কোন প্রার্থনা নাই, ইহা প্রসন্নকুমারের পক্ষে এক প্রকার অস্বাভাবিক। অথচ ইহাতে অন্তের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কটাক্ষের তীব্রতা অতি অল্প। কাতর ক্রন্দনের বেগই ইহাতে অধিক। প্রসন্নকুমার কাঁদিবেন না কেন? বিদ্যালয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ও অবসরসময়ে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, অনেক বড়লোকের অশ্বচালক তদপেক্ষা অধিক অর্জ্জন করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে তিনি ভিক্ষুক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন, সন্দেহ নাই। অথচ ভিক্ষা করিয়াও তিনি জীবনে পার্থিব সচ্ছন্দতা কেমন, তাহা জানিতে পারেন নাই। হায়! প্রসন্নকুমারের নামে কোন পরিচায়ক চিহ্ন (মার্কা) ছিল না কেন? দেশকে তিনি তাঁহার দুর্দ্দশার কথা জানাইলেন না কেন? দুই তিন সহস্র সঙ্গীতময় বিক্রীত হইলে তাহার মূল্যই ত তিনি স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় বিপুল মনে করিতে পারিতেন!

যাহা হউক, এখন আর দুঃখ করিয়া ফল নাই। প্রসন্নকুমারের মনের দুঃখও ক্ষণিক। সংসারের নিষ্ঠুরতায় তিনি যে যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, এক এক সময়ে অকপটে তাহাই মাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন; কিন্তু পরক্ষণেই মনকে শান্ত করিয়াছেন। উদ্ধৃত গীতটির অতিনিকটবর্ত্তী একটি গানে তিনি বলিতেছেন,—

মা আমার ন্যাংটা মেয়ে,
মায়ের লীলা খেলা ন্যাংটা নিয়ে।
মা মোর ন্যাংটা বাপ ন্যাংটা আছেন ন্যাংটা সখী নিয়ে,
বুঝি ন্যাংটা নইলে সর্ব্বনাশী চায় না তারে চক্ষু দিয়ে।

যে তারে চায় ন্যাংটা বানায় আগে দ্বারে দ্বারে নিয়ে,
মা ত মহেশ্বরকে কর্‌লে ন্যাংটা ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে দিয়ে।
তালুক নিলি ঘর পুড়ালি বাহির করলি আঁচি দিয়ে। *
করছিস দিনে দিনে তনু শীর্ণ খেটে খাবার পথ মারিয়ে,
বৃদ্ধা মাতা শিশুপুত্র রেখেছিস ঘাড়ে চাপায়ে;
এ দিকে ন্যাংটার উপর ন্যাংটা করছিস অন্নত্রাসটা বাড়াইয়ে,
বাইরে ন্যাংটা করলে কি হয় মধ্যে ন্যাংটা না করিয়ে?
করে মনটি ন্যাংটাটা প্রসন্নেরে ন্যাংটার দলে নাও মিশায়ে।

এই গীতটীতে প্রসন্নকুমারের খাঁটি প্রার্থনা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বাহিরে প্রায় নগ্নই ছিলেন। এক বসন ও এক উত্তরীয় ভিন্ন তাঁহার অন্য কিছু যুটে নাই। তিনি মাকে বলিতেন, মা! সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরটি নগ্ন করিয়া দাও। প্রসন্নকুমার এক এক স্থানে সাংসারিক দুঃখের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন বটে, কিন্তু আর এক স্থানে আবার মনে অতি সরল ভাবে সান্ত্বনা আনিতেছেন,—

ভবের দুঃখ মনে হলে মনে হয় না থাক্‌তে বেঁচে,
এটা তোমার দোষ কি প্রসন্নের দোষ তাহার বিচার পাব পাছে;
তুমি রাখলে সুখে রাখ্‌তে পার এ কথায় কি সন্দ আছে?

কিন্তু আর একটী গীতে প্রার্থনা করিতেছেন,—

যেন তব নাম নিতে নিতে মা আমার প্রাণ যায়,
আমার মতি গতি রতি প্রীতি রাখ সদা তব পায়।
যেমন মেঘ হতে মেঘান্তরে, দামিনী ছুটিয়া পড়ে, তেম্‌নি নয়নপ্রভা নয়ন ছেড়ে
যেন তোর শ্রীচরণে ছুটে পড়ে, যবে জগৎ চির-আঁধার হবে হায়!
আমি ভবে এসে কভু পেলেম নাকো সুখ, সেটা কর্ম্মদোষ না তুমি বিমুখ,—
সে সুখাসুখ বিচার চাহি না একটুকু চেও অন্তিমে,—
তুলিয়ে মুখ, পদে প্রসন্ন এই ভিক্ষা চায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রসন্নকুমার নিজের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে সাংসারিক জীবের কান্না কাঁদিয়া ফেলিতেন। পাঠক নিম্নোদ্ধৃত গীতটি শুনুন,—

মা কাঁদায়; মন কাঁদ না বসে;
তুই হাসবার জন্য ব্যস্ত কিসে?
যার সুখের কপাল সদাই সুখী, যার হাসবার কপাল সেই সে হাসে;
তোর কপাল মন্দ সদাই কাঁদো, হাসিব মা হাসালে সে।

---

* আঁচি, নারিকেলের মালা। দরিদ্র লোকে জলপানের নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

ওর রাজ্যে কেবল সুখীরই সুখ, আর দুঃখী সদাই দুঃখে ভাসে,
যে গাড়ীতে যায় তার পায়ে জুতা, মোট মাথায় যার খালি-পা সে।

শেষ পংক্তিটি যেন একখানি পুস্তকের সমান। অবনীর অর্দ্ধাধিক দরিদ্র অধিবাসীর যে ক্রন্দন, তাহা এই একটি পংক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে সমাজবিপ্লবের ইহাই এক মূলমাত্র। প্রসন্নের গীত সে ভাবের নহে। বিপ্লবকারীরা কাঁদে মানুষের কাছে, সমাজের কাছে; প্রসন্নকুমারের অনুযোগ মায়ের কাছে। অন্য এক স্থানে এই কথাই তিনি অন্য ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

হাসিতে ইচ্ছা কার না করে?—হাসি দাও ক'জনার ঘরে?
ইচ্ছা দিলে সবার সমান ভোগের বেলা সমান কই?
যার যাহাতে নাহি ভোগ, তাতেও দাও ইচ্ছা রোগ,
বাসনায় যাতনা নইলে অনুযোগ তার ছিল কই?

ধন্য প্রসন্নকুমার! মানুষের জন্য মায়ের কাছে এমন ভাবে ওকালতী করিতে আমরা কাহাকেও দেখি নাই। যে গাড়ীতে যায়, তার পায়ে জুতা; মোট মাথায় যার খালি-পা সে, ইহার তুলনা আমরা খুঁজিয়া পাই না; অথচ ইহার ঠিক পরবর্ত্তী গানটিতে প্রসন্নকুমার বলিতেছেন,—

মন তোর এত বিষাদ কেন?
মা যে দুঃখ দেন সুখের কারণ, জেনো।
রোগীর ইচ্ছামত খাদ্য কবিরাজ কি দেন কখনও?
কর্ম্মের পথ্য খেয়ে রোগ সারিলে খাও গে শেষে যা চায় মন।
মা দেন দুঃখ ভোগ কাটিতে, ভোগ কাট্‌লেই গেল বিড়ম্বন;
যেমন ক্ষুদ্ খেয়ে ঋণ শোধ করিলে ধরে না আর মহাজন।
মা যা করেন ভালই করেন, অপকার তায় নাই কখনও।

সংসারতাপক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এমন আশ্বাসবাক্য আর আছে কি? এমন সরল ও মিষ্ট ভাবে গানে তাহা কেহ বুঝাইয়াছেন কি? আর্য্যধর্ম্মের অতি মহান্ উপদেশ এই একটি ক্ষুদ্র গীতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমরা কোন আত্মীয়ের পুত্রবিয়োগসংবাদ পাই। সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে এই গানটি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, এই গীতটি তাঁহার শোকপীড়িত প্রাণে মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। বস্তুতঃ সঙ্গীতময় দুই খণ্ডে গীতের আবরণে প্রসন্নকুমার যে স্বর্ণ-মুক্তা প্রবালাদি দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবরোগীর পক্ষে জারিত ধাতুরত্নাদির

ন্যায় মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! সংসারে অনেকেই দুঃখদগ্ধ, কিন্তু কয় জনের প্রাণ মায়ের দিকে এমন ভাবে ধাবমান হইয়া থাকে? প্রসন্ন-কুমার একটি গানে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাঁহার মন যেন কম্পাসের শলাকার ন্যায় কেবল মায়ের দিকেই থাকে। উদ্ধৃত গীতগুলির দ্বারা আমরা দেখাইয়াছি যে, তাঁহার মনের গতি সর্ব্বদা মায়ের দিকেই ছিল। এত দুঃখ ভোগ করিয়াও প্রসন্নকুমার মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কেমন অবিচ্ছেদ্য বলিয়া ভাবিতেন, নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মা হারাবি কি দুঃখ পাস বলে?
মন তুই পড়েছিস এই আর এক ভুলে।
মায় মারিলে নালিশ কোথায়, কাঁদিতে হয় মা মা বলেই,
ভাত ছাড়্তে কে পারে কবে খাওয়ার দোষে পেট ফাঁপিলে?
বায়ু ছেড়ে বাঁচা কি যায় তুফানে * ঘর ভাঙ্গে বলে;
ও মন অগ্নি যাহার গৃহ পোড়ায়, তার কি আগুন নইলে চলে?
জল ছাড়তে কি পার কখন তালুক ভেঙ্গে নিল বলে,
ওরে ইন্দ্রিয় কি ছাড়া যায় মন শত পাপেও ডুবাইলে?
মার কি ইচ্ছা তুমি এম্‌নি দুঃখে পড়ে মর জ্বলে,
তবে জ্বালা যে হয়—মায়ের দোষ নয়, প্রসন্নেরি কপাল ফলে।
দেখ, মা দেন বাতাস পাখা দিয়ে—শীতল হবে সকল ছেলে,
কেহ আরাম পেয়ে চক্ষু মুদে, ঘটে পাখার বাড়ি কারও কপালে।

প্রসন্নকুমারের ভাগ্যে এ জীবনে কেবল পাখার বাড়িই ঘটিয়াছিল, আরাম তিনি বড় পান নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা কত উচ্চ! সাধনার ধার ধারি না বলিয়া আমরা প্রসন্নকুমারের আশার গানে হাত দিতে বড়ই সঙ্কুচিত। সেগুলি কেবল সাধকের কথায় সাধনার তেজে পরিপূর্ণ। আমরা একটিমাত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল তৃপ্ত করিতেছি।

সে দিন আমার কবে হবে?
মন আর ভবের ঠেকায় না ঠেকিবে।
সুখে দুঃখে ভিজিবে না, আর মনের তৃষ্ণা নাহি র'বে;
আমি খাব না সংসারের নাথি সংসার আমার নাথি খাবে।
শিল পড়ুক বৃষ্টি পড়ুক চক্ষু ফিরে নাহি চাবে,
মা আনন্দময়ী নৃত্য করে—তাই দেখিয়ে ভুলে রবে।

---

* তুফানে = ঝড়ে। পূর্ব্ববঙ্গে তুফান শব্দ ঝড় অর্থে ব্যবহৃত।

বজ্র নাচুক বা বীণা বাজুক সে দিকে না কর্ণ যাবে,
কোথা মায়ের মুরলী বাজে সেই দিকেই কাণ খাড়া র'বে।
রসনায় থাকিবে স্বতার আসক্তি তার ঘুচে যাবে,
ইন্দ্রিয় সব সবল রবে—অনুরাগ তায় না থাকিবে;
মার নিকট দিনরাত্রি বসে প্রসন্ন খেলা খেলিবে।
আয় মা তাহারে আপন হাতে নাওয়াইবে খাওয়াইবে।

প্রসন্ন সংসারকে লাথি মারিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার শেষ আশা সফল হইয়াছে কি না, ক্ষুদ্র মানবের তাহা বলিবার সাধ্য নাই। পাছে প্রাণের কথা মা'কে না বলিয়া মানুষকে বলেন, এই আশঙ্কায় তিনি একটি গানে বলিতেছেন,—

এই আবার কি রোগে ধরে।
দেখি তোরে কই না কই মনেরে।
তোরে বলি বলি আমি লোকের নিকট বলি ফিরে,
দেখি তোরে কই না লোকে কই মা। যশের ইচ্ছা তার ভিতরে।
এখন অল্পতে ঔষধ দে মা, নইলে ব্যারাম যাবে বেড়ে;
শেষে ভুগ্‌তে হবে অনেক দিন মা কুট বাঁধিয়ে * গেলে পরে;
যেখানে তোর নামকীর্ত্তন হয়, ভালবাসে যে তোমারে,
যেন তাদের ছায়ায় প্রসন্ন তোর নাম করে মা তোর গোচরে।

যিনি এমন ভাবে পার্থিব যশকে উপেক্ষা করিতে পারেন, তিনি ভিক্ষুক হইয়াও লক্ষপতি অপেক্ষা অধিক সুখী, সন্দেহ নাই। ঈশ্বরপ্রেমিক অমূল্য স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিতে পারেন; কেন না, তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যবান। প্রসন্নকুমার মানবপ্রদত্ত প্রশংসা উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

---

* কুট বাঁধিয়া যাওয়া, অর্থাৎ ব্যাধির জড়তা হওয়া; ইংরাজী complication শব্দে ঠিক এই ভাব প্রকাশিত হয়।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

চীনে দাসপ্রথা।

আমরা ইংরাজের রাজত্বে বাস করি। দাসপ্রথার বিলোপসাধন স্বাধীন ইংরাজের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। যে শুভদিনে ইংলণ্ডের কয় জন সহৃদয় ব্যক্তি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া অর্থ, অবসর ও শ্রম—সকল অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষে সাফল্য লাভ করেন—সে দিন মানবের ইতিহাসে গৌরবসমুজ্জ্বল। ইংলণ্ডের অধিকৃত এমন স্থানও আছে, যেখানে দাসপ্রথার বিলোপে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ড করুণাপ্রণোদিত হইয়া স্বল্পের জন্য বহুর ক্লেশনিবারণে প্রবৃত্ত হইয়া—মানবোচিত সহৃদয়তা দেখাইয়াছিলেন। বহুব্যয়ে ইংরাজাধিকৃত সর্ব্ব স্থানে কৃতদাসদিগকে স্বাধীনতা দান করা হয়। তাই ইংলণ্ড এখনও গর্ব্ব করিয়া বলেন, ইংলণ্ডের ভূমিতে পদার্পণমাত্র দাসের দাসত্ব বিমোচিত হয়। ইংরাজের রাজত্বে যে পূর্ব্বপ্রচলিত দাসপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা অতি গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। তবে ইংরাজের রাজ্যসীমার বাহিরে অনেক স্থানে এখনও দাসপ্রথার উচ্ছেদ সংসাধিত হয় নাই। সেই বৃত্তান্তই আমরা আজ বিবৃত করিব।

চীনদেশে দাসপ্রথা আজও প্রচলিত। সমগ্র চীনদেশে এখনও ১০০০০০০০ ক্রীতদাস আছে। ইহাদের অধিকাংশই রমণী। চীনের জনসংখ্যা ৪০০০০০০০০; হংকং, ক্যাণ্টন,

চীন দেশে।

ম্যাকাও, এমর প্রভৃতি স্থানে অবস্থাপন্ন পরিবারমাত্রেই এক বা একাধিক ক্রীতদাসী বর্ত্তমান। সাধারণতঃ তিন বৎসর হইতে পনের বৎসর পর্য্যন্ত যে কোন বয়সে ক্রীতদাসী বিক্রীত হয়—তবে সাত কি আট বৎসর বয়সেই বিক্রয় অধিক হয়। বয়স ও সৌন্দর্য্যের তারতম্যানুসারে মূল্যেরও তারতম্য হয়—মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। গৃহকার্য্যসংসাধনের জন্যই প্রায় দাসী ক্রয় করা হয়। বেতনভুক দাসী নিযুক্ত করার অপেক্ষা দাসী ক্রয় করিলে সস্তা হয়। সাধারণতঃ বিক্রয় পত্রে একটা সর্ত্ত থাকে যে, ক্রেতা অসৎকার্য্যের জন্য দাসীকে পুনরায় বিক্রয় করিতে পারিবেন না। সে সর্ত্ত না থাকিলে ক্রেতা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

হংকং বৃটিশাধিকারে; সুতরাং আইনতঃ সেখানে ক্রীতদাসী থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সহরে ক্রীতদাসীর অভাব নাই। ইহারা চীনা পরিবারে দাসী বা ধাত্রীর কার্য্য

হংকং।

করে। এক এক পরিবারে বিশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত ক্রীতদাসী দেখা যায়। পথে প্রায়ই দেখা যায়,—বিচিত্রবর্ণবহুলবেশধারিণীরা ক্রীতদাসীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিতেছেন; বাহুবন্ধনে ক্রীতদাসীর গলদেশ বেষ্টিত, পরিচ্ছদের নিম্নে চীন রমণীর সঙ্কুচিত চরণ লক্ষিত হইতেছে।

সময় সময় ক্রীতদাসীরা উপহাররূপে অর্পিত হইয়া থাকে ; এমন কি, বিবাহের যৌতুক-মধ্যে ক্রীতদাসীদানও বিরল নহে। কখন কখন দাসীরা শিক্ষয়িত্রীরূপে ও সহকারিণী পত্নী রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। ক্যাণ্টনের এক জন ম্যাণ্ডারিনের চারিটি পত্নী, ষোলটি সন্তান ও একুশটি দাসী বিদ্যমান। তাঁহার পরিবার অন্যত্র থাকে। অল্প দিন হইল, তিনি দুইটি পত্নীকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্বীয় জননীকে লিখিয়াছিলেন ; কারণ, তাঁহার নিঃসঙ্গ প্রবাস বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। বৃদ্ধা জননী উত্তরে লেখেন যে, ষোলটি সন্তানের পালন জন্য পত্নীদের আবশ্যক ; বরং তিনি কর্ম্মস্থলে দুইটি দাসী ক্রয় করুন। পুত্রও তাহাই করিতে সম্মত হইয়াছেন। সন্তানগুলিকে ইংরাজী শিখাইতে ইচ্ছুক হইয়া এবার তিনি এক জন ইংরাজ বা আমেরিকান রমণীর পাণিগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন। এ সকল কথা আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত বোধ হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। তাই কবি বলিয়াছেন, উপন্যাস অপেক্ষাও সত্য অদ্ভুত। ব্যাপার সেইরূপই বটে।

অবস্থা।

ককেসস পর্ব্বতে জিয়র্জ্জিয়া সুন্দরীপ্রসূ। জিয়র্জ্জিয়ার সুন্দরীবৃন্দে তুরস্ক সুলতানের শুদ্ধান্ত পূর্ণ। চীনে তেমনই অ্যাঙ্গচাউ ও সুচাউ নগরদ্বয় সুন্দরীর জন্য প্রসিদ্ধ। এই দুই স্থানে অনেকে ক্রীতদাসীর ব্যবসায় করে। ইহারা বালিকাদিগকে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও অন্যবিধ কলাবিদ্যায় নিপুণা করে। এই সকল বালিকারা প্রায়ই দরিদ্রের বা ক্রীতদাসীর সন্তান। চীনে পত্নীক্রয় ব্যাপার নিতান্ত বিরল নহে। এমন কি, এইরূপে যত পত্নীর সংগ্রহ হয়, তত আর কোনরূপে হয় না। চীনে এক জন যে কয়টি পত্নীর ভরণপোষণক্ষম, সেই কয়টি পত্নী বিবাহ করিবার অধিকারী। আবার বেতনভুক দাসীর অপেক্ষা সহকারী পত্নী অল্পব্যয়সাধ্য। ইংলণ্ডে একটা হাসির গল্প প্রচলিত আছে,—এক ব্যক্তি তাঁহার দাসীকে বিবাহ করায় বন্ধুবান্ধবগণ বিস্ময়প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি মিতব্যয়িতার জন্য এ কাজ করিয়াছি ; দাসীকে বেতন ও আহার উভয়ই দিতে হইত, পত্নীকে কেবল আহার দিতে হইবে। চীনবাসীরাই প্রকৃত অর্থনীতিবিদের মত এই মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত দেখায়। তাহারা সস্তার হিসাবে সহকারী পত্নী গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, চীনে প্রথম পত্নীই আইনতঃ পত্নী ; কিন্তু অপর পত্নীরা দাসী হইলেও যে তাহাদের কোন অধিকার নাই, এমন নহে। ইহারা সাধারণতঃ সদ্ব্যবহার পাইয়া থাকে, এবং ধনীর হস্তে পড়িলে ইহাদের আবার দাসী নিযুক্তা হয়। সংসারে এই সব সহকারী পত্নীর প্রভাব গৃহস্বামীর খেয়ালের উপর নির্ভর করে ; তবে গৃহকর্ম্মে কোন কথা কহিবার বা সন্তানশাসনের অধিকার তাহাদের নাই। কখন কখন তাহারা অতি দুঃখে জীবনযাপন করে। তবে বলাই বাহুল্য, মানবচরিত্র সর্ব্বত্র সমান ; তাহার সহস্র ভাব কাহারও জানিবার সম্ভাবনামাত্র নাই। অনেক সময় সে সোজা পথে যাইতে যাইতে যে স্থানে সরল পথ ত্যাগ করে, সে স্থানে তাহার পথত্যাগসম্ভাবনা ও বাধানির্ম্মাণের কথা এঞ্জিনিয়ারের স্বপ্নেরও অগোচর। কাজেই মানবচরিত্রের সহস্র জটিল প্রশ্ন একটা সরল নিয়মে আনা অসাধ্য সাধন। আমাদের দেশেও যেমন অনেক সময় দেখা যায়, গৃহস্বামীর গৃহে প্রথমা অপেক্ষা

দাসীর অধিকারাদি।

দ্বিতীয়া পত্নীর অধিক প্রভুত্ব ও তাঁহার হৃদয়ে পত্নীর অপেক্ষা প্রণয়িনীর প্রভাব অধিক—চীনেও সেইরূপ অনেক সময় সহকারিণী পত্নীর প্রভুত্ব অত্যধিক হইয়া দাঁড়ায়।

চীনে পত্নীবিক্রয় বিরল হইলেও অসম্ভব নহে; তবে তাহা বড় লজ্জাজনক। অহিফেন-সেবী নেশার দায়ে কখন কখন সন্তান, এমন কি, পত্নীও বিক্রয় করে। যাহারা জুয়াখেলায় মত্ত, তাহারাও সময় সময় পত্নীবিক্রয় করে, বা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত খেলায় বাজী রাখিয়া পত্নীকে হারায়। মহাভারতের কথা একেবারেই অসম্ভব নহে; ভারতের নিকটেই চীনে দ্যূতজিতা রমণী দৃষ্ট হয়। চীনের সকল বড় সহরেই দাস-ব্যবসায়ের দালাল আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ হেতু চীনের উত্তরাংশে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক জনকজননী বাধ্য হইয়া সন্তান বিক্রয় করিবে,—অনেকে আহার্য্যদানে অক্ষম হইয়া স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইবে। যুদ্ধের ইহাই পরিণাম; সভ্যতার এই উন্নতির সময়েও সভ্যজাতিরা সদা সশস্ত্র! চীনে এই যুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের ফল; কিন্তু এই সকল দুর্দ্দশা কি ধর্ম্মপ্রচার না নরকবিস্তার? আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট চীনে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের কথায় বলিয়াছেন, তোমরা এই ধর্ম্ম প্রচার কর—খৃষ্টের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রচারকগণ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আর একটি উপদেশে যে আছে, যাহারা তোমাদের কথা শুনিবে না, চরণতল হইলে তাহাদের দেশের ধূলি ধৌত করিয়া ফেলিও—সে কথা তাঁহারা মনে করেন না কেন? তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে সুখে আছে, তাহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টিত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের সমাজের সহস্র দোষের নিবারণচেষ্টাই কর্ত্তব্য। হায়, মানুষ ভ্রাতার চক্ষে তৃণ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয়, আপনার চক্ষে বৃহৎ কড়িকাঠের প্রতি সে একান্তই অন্ধ!

অন্য কথা।

চীনে দশ আনায় একটি শিশু পাওয়া যায়। এই মূল্যে সাংহাইস্থিত একটি অনাথাশ্রম শিশুক্রয় করিয়া থাকেন। এই আশ্রম খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের। এই আশ্রমপালিত বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে দান করা হয়। দাসীক্রয়কালে দালাল অনেক সময় জাঁকোড়ে মাল আনে; যেন সে কোন জন্তু ক্রয় করিতেছে; যদি পরীক্ষায় দেখে,—জন্তুটি সুস্থ ও সবল, তবেই রাখিবে, নচেৎ ফেরৎ দিবে। চীনে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ক্রেতা অন্ধকার ঘরে নীল আলোক জ্বালাইয়া বিক্রেয়টিকে পরীক্ষা করে; চর্ম্ম যদি হরিতাভ দেখায়, তবে সে সুস্থ; চর্ম্ম যদি রক্তাভ বোধ হয়, তবে তাহার কুষ্ঠ হইবে।

এখনও জগতে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অথচ জগৎ সুসভ্য হইয়াছে! সভ্যতা ও বর্ব্বরতায় প্রভেদ কতটুকু!

সাহিত্যে সাহায্য।

সাহিত্যসেবকের দারিদ্র্য এ দেশে লোকপ্রসিদ্ধ। য়ুরোপে ও আমেরিকায় এখন পাঠক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় সাহিত্যসেবা লাভজনক হইয়াছে। পূর্ব্বে সে দুই মহাদেশেও সাহিত্য-সেবকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান সহজসাধ্য ছিল না। আমাদের কবিকুলরবি মধুসূদন দাতব্য

চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন ;—তখন শুশ্রূষাকারিণীদিগকে একটি টাকা পুরস্কার দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না! তিনি দুঃখ করিয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমা সুন্দরী,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি—লোকে যাহা বলে—
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে।"

মধুসূদনের মৃত্যুতে শোক করিয়া হেমচন্দ্র যখন লিখিয়াছিলেন,—

"হায়, মা ভারতি, চিরদিন ভবে
কেন এ কুখ্যাতি তোর,
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল
সেই সে দরিদ্র হ'বে?"

তখন অদৃষ্টের অদূরবর্ত্তিনী ছায়া তাঁহার পক্ষে অজ্ঞাত ছিল; তখনও তিনি বুঝেন নাই যে, এক দিন আপনার কথায় তাঁহাকে লিখিতে হইবে,—"স্বজন আশ্রিতগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।" আজ গভর্মেণ্টের অতি দীন সাহায্যও তাঁহার পক্ষে সম্পদ! সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমানুষী প্রতিভা ডেপুটিগিরির আওতায় বর্দ্ধিত; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রাজকার্য্যের মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে—রায় লিখিবার অবকাশসময়ে রচিত! নবীনচন্দ্র এখনও ভগ্নস্বাস্থ্যে রায় ও কৈফিয়ৎ লিখিতেছেন। পৈতৃকসম্পত্তিপ্রসূত অবসর ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর হৃদয়-কুঞ্জদ্বারে 'সোনার তরী' ভিড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। জীবনসংগ্রামের তাড়না থাকিলে, অর্থচিন্তার সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধার মধ্যে—কবিপ্রতিভা শত শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিত কি? ইংলণ্ডে কোনান ডইল সাহিত্যসেবার ফলে অবলম্বিত চিকিৎসা ব্যবসায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে সেই চিকিৎসাবিদ্যার আয় না থাকিলে 'স্বর্ণলতা'-প্রণেতার প্রতিভার স্বর্ণলতা মুকুলিতা হইবার বহু পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া যাইত। এ দেশে লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষলাভ ঘটিয়াছিল কেবল রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ভাগ্যে; সেও লক্ষ্মীর গুণে নহে, রজনীকান্তের চেষ্টায়, টেক্‌ষ্ট্‌বুক কমিটীর কল্যাণে।

এ দেশে সাহিত্য এখনও আমাদের নিত্যাবশ্যক ও অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায় নাই; সাহিত্যসঙ্গ ব্যতীত আমাদের কোন বিশেষ অসুবিধা হয় না; সাহিত্যের জন্য আমাদের আগ্রহ এখনও অঙ্কুরিত হইয়া উঠে নাই। ইহা দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। তাই এখনও আমাদের সাহিত্যসেবা সখের মধ্যে,—তাহা ক্ষুধাতুরের পক্ষে অনধিগম্য—"কমল-বনের মধুপ-রাজি"র—প্রচুরপ্রাপ্ত অবসরের সাথী। এ দেশে সাহিত্য এখনও পর্ণকুটীরবাসী জীর্ণবাসধারীর দর্শনসৌভাগ্য লাভ করে নাই। সকল অবস্থাপন্নের সৌধসীমাতেও যাইতে পারিয়াছে কি? সাহিত্য এখনও আমাদের জীবনসঙ্গী হয় নাই; আমাদের রোগে শুশ্রূষা, শোকে শান্তি, বিজনে সাথী, সজনে আলোচ্য হইয়া উঠে নাই। আমাদের সাহিত্যচর্চ্চা যেন সাহিত্যের প্রতি কৃপা,—আমাদের লাভ নহে। আমরা ধনের আদর করি, প্রতিভার পূজা করিতে জানি না। ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়?

এ দেশে সাপ্তাহিকের আদর উপহারে, মাসিকের জীবন "পদ্মপত্রে জল"। যে দেশে

সম্পাদক বঙ্কিমকে হারাইয়া 'বঙ্গদর্শন' কলিযুগে ধর্ম্মের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল; যে দেশে 'সুরভি'র সুরভিশ্বাস প্রভাতসমীরেই মিশাইয়াছিল; যে দেশে অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষের অবসরের অভাবে 'বালকে'র বাল্যলীলাও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছিল; যে দেশে শিক্ষিত দলের সাধনার ধন 'সাধনা' সিদ্ধির অর্দ্ধপথেই বিস্মৃতির অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছিল; যে দেশে দেশের গণ্যমান্য বহু লোকের চেষ্টাতেও 'হিতবাদী' দেশের হিতে অক্লান্তশ্রম থাকিতে পারে নাই; সে দেশে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বলই বটে!

আমরা মনে করি, আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছি; আমরা তাহাদেরই মত সকল অধিকার পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু সহস্র দিকে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিলে সে কামনা নিতান্তই স্বপ্নকল্পিত বলিয়া মনে হয়। সত্যই আমাদের এখনও "গৌর হতে অনেক বাকি!"

আমরা ইংলণ্ডে সাহিত্যে সাহায্যদানের (endowment) কথা বিবৃত করিতেছি।

আজ কাল সাহায্যদত্ত রঙ্গালয়ের অনেক সমর্থক দেখা যায়। সংপ্রতি ডাক্তার পার্কহার্ষ্ট সাহায্যদত্ত সংবাদপত্রসংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বিলাতে প্রতিভাবানদিগকে ঐরূপ সাহায্যদানের কথা সর্ব্বদা শুনা যায়। কিন্তু প্রতিভাশালীদিগকে ঐরূপ সাহায্যপ্রদান সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার নহে। ডাক্তার অগষ্টস জেসপ 'নাইন্‌টীন্থ্ সেঞ্চুরী' পত্রে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে কয় জন ধনী ব্যক্তি প্রতিভাবান দুঃস্থদিগকে অর্থসাহায্য দান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিভাবিকাশে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হন; উদ্দেশ্য,—অন্নচিন্তার ফলে প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয়। তখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ ও সাদে,—তিন জনই দুঃস্থ; এবং সাহায্যের স্বর্ণমুষ্টি দেবতার পুণ্য আশীর্ব্বাদের মত তাঁহাদেরই শিরে বর্ষিত হইয়াছিল। সুস্নিগ্ধ বর্ষণে যেমন ভূমি শস্যশ্যামলা, সিতহাস্যময়ী হয়, তেমনই এই সহৃদয় সাহায্যে যে তাঁহাদের কবিপ্রতিভাপুষ্টির বিশেষ সহায়তা হয় নাই, এমন কথা কে বলিতে পারে?

এই সকল অসামান্য প্রতিভার অধিকারী যে অন্নচিন্তার দায়ে প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন না, অনুকূল অবস্থার অভাবে প্রতিভাস্ফুরণচেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্য তুচ্ছ কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট করিবেন, ইহা জগতের পক্ষে একান্ত দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। ইহাই বিবেচনা করিয়া কয় জন অর্থশালী কবিত্রয়কে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। এ সাহায্যে হঠাৎ-নবাবের মুরুব্বিয়ানা ছিল না। তাঁহারা এইরূপ অর্থসাহায্যদানই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার বিবেচনা করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে যে তাঁহারা জগতে বরেণ্য হইবেন, এ চিন্তার সুদূর সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই।

দানের উদ্দেশ্য।

সে যাহাই হউক, সম্ভবতঃ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রিসলি কলভার্ট নামক এক ব্যক্তি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বার্ষিক দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, কবিকে বার্ষিক দিয়াছিলেন ও মৃত্যুকালে তাঁহাকে এককালে ১৩৫০০৲ টাকা দিয়া যান। ইহার কয় বৎসর পরেই চার্লস উইলিয়ম্‌স্ ওয়াইন কবি সাদেকে যাবজ্জীবন বার্ষিক ২৩০০ টাকা

দিবার ব্যবস্থা করেন। ওয়েজউড ভ্রাতৃগণের অনুগ্রহে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোল্‌রিজ বার্ষিক পাইতেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই কবিত্রয় বহু দিন এইরূপ বদান্যতাভাজন হইয়াছিলেন। এই তিন জনের মধ্যে রচনার ফলে জীবিকা-অর্জ্জন কেবল সাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। অনুরক্ত ভক্তগণের অযাচিত সাহায্যপ্রাপ্তি ব্যতীত কোল্‌রিজ বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা বলা যায় না। যাঁহারা ইঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লর্ড লন্সডেন, সার জর্জ্জ বমণ্ট, চার্লস লএড প্রভৃতির নাম জানা গিয়াছে। আর অনেকের নাম এখন বিস্মৃত; অনেকে নাম প্রকাশ করেন নাই। প্রথমাবস্থায় ডিকুইন্সির কিছু অর্থ ছিল; তিনিও কবিদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাহায্যদান।

আজ কাল যে সকল সাহায্যভাণ্ডার সংস্থাপিত হয়, তাহাতে যাঁহারা অর্থদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দান আন্তরিকতাশূন্য। কেহ বা ঐরূপ দান 'ফ্যাশন' বুঝিয়া সাহায্যপ্রদান করেন, এবং বলা বাহুল্য, সে কথাটা যথাসম্ভব প্রচার করেন; কেহ কেহ বা বিষয়টি না বুঝিয়াও 'যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ' অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই দান করেন—কেন দান করিতেছেন, অর্থ কিসে ব্যয়িত হইল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন না। এই সকল দাতা সেরূপ নহেন। কোল্‌রিজ যখন কেস্থইকে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন গৃহস্বামী মিষ্টার জ্যাক্‌সন কেবল কবিকে ভাড়াটে পাইবার জন্য, অন্যে যে ভাড়া দিতে চাহিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক ভাড়ায় গৃহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই নীরস গদ্যের দিনে—টাকা আনা পাই উপাসনার সময় যে মানুষ এতটা করে, ইহাই আশ্চর্য্য। সাদে ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেষে গভর্মেণ্ট হইতে অতি সামান্য অর্থসাহায্য পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে জীবনের শেষদশায়। প্রতিভার প্রথমবিকাশকালে—যে দুঃসময়ের তাড়নায় চাটার্টন আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, জন্‌সন ও গোল্ডস্মিথ অনাহারে ক্লেশ পাইয়াছিলেন—সহৃদয় ব্যক্তিদিগের এইরূপ সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিত না।

আমাদের সময় ক্রমেই এরূপ সাহায্যদান বিরল হইয়া আসিতেছে। আমরা এখন বৃহদনুষ্ঠান নহিলে যোগ দিই না; সমিতি করিয়া সাহায্য করি। ইহাতে যে বিশেষ অপকার হয়, তাহা বুঝি না। আর যে অর্থে আমাদের প্রতিবাসীর উদরান্নের উপায় হইতে পারিত, সে অর্থ বহু দূরে যায়। জগতে সর্ব্বত্র দয়ার পাত্র আছে; পারিলে সকলকে সাহায্য করা প্রশংসনীয়। কিন্তু যেমন দশটি কুসম্পন্ন কার্য্য অপেক্ষা একটি সুসম্পন্ন কার্য্য প্রশংসনীয়, তেমনই এক জনকে সম্পূর্ণ সাহায্যদান—একটি প্রতিভার বিলোপনিবারণ প্রশংসার্হ। সাহায্যের বিস্তার কমাইয়া গভীরতা বর্দ্ধিত করা অসঙ্গত নহে।

আমাদের এই বঙ্গদেশে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। সাহিত্যসেবকদিগকে সাহায্যদান করিবার প্রবৃত্তি আর বড় নাই। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। আমাদের ধনিগণ দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে মঙ্গল হয়।

শ্রীপঞ্চমী।

ত্যজি ব্রহ্মলোক, বাণী! উর এ আসরে,
বাঞ্ছিত তোমার দেবি! এ মর্ত্ত্য-নন্দন;
বাজাও অমর বীণা হেথা প্রেমাদরে,
ত্রিদিব-ঝঙ্কারে যার মুগ্ধ ত্রিভুবন!
ওই রাঙা পা দু'খানি লভি পুণ্যবলে
কবি-চিত্ত-কুবলয় ফুটে কি শোভন!
তব উদ্বোধনে আজ কি রশ্মি বিমলে
বিভাসিত গৌড়গৃহ, মণ্ডপ, প্রাঙ্গন!
প্রমত্ত ভাবুক ভাবে আপনা হারায়
লীলার উদ্যানে তব;—কাব্য-দ্রুমদলে
কি তাপ-হারিণী ছায়া ত্রিতাপ জুড়ায়!
কি সৌরভে ফুটে ফুল, কি অমৃত ফলে!
তোমার অপূর্ব্ব পূজা কবি-প্রতিভায়,
যশের মন্দিরে নিত্য এ বিশ্ব-মণ্ডলে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ। "দুঃখ" কবিতাটির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিলাম না। যদি কবিতার বক্তব্যে কবিত্বের অবকাশ না থাকে, তাহা হইলে কেবল ছন্দের ও শব্দের বৈভবে পদ্য-রচনা কখনও সার্থক হইতে পারে না। কল্পনার যে ইন্দ্রজালস্পর্শে ছন্দে বাক্যে ঝঙ্কারে কবিতা স্ফূরিত হইয়া উঠে, সে ইন্দ্রজাল সকলের আয়ত্ত নহে। "তোমারে ভোলার চেয়ে বহু দুঃখ ভাল"—একটি সিদ্ধান্তমাত্র;—কবি এই সিদ্ধান্তটিকে কবিতায় পরিণত করিতে পারেন নাই। রচনাটির আদ্যান্তে সঙ্গতি নাই। কবির মুখ্য বক্তব্য কি, তাহাও অনুমানের অতীত। শব্দচয়নে কেবল ভাষার লালিত্যই কবির নিয়ামক, প্রয়োগ সার্থক হইল কি না, সে বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। "তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন" সুললিত বিশেষণ বটে, কিন্তু একত্রন্যস্ত 'তৃণ' ও 'শষ্প' সুপ্রযুক্ত নহে। কবিতাটির দুই একটি চরণে যে রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সে ক্ষমতার অপব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। আজ কাল অধিকাংশ কবিতায় ভাবের, কল্পনার, চিন্তার এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিতে পাই। গীতিকবিতার পক্ষে ইহা কখনও মঙ্গলাবহ হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের "ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা" আর একটি বিফল রচনা। শিবাজী মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন, সেখানে বিপজ্জালে জড়িত হইয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশলে বিপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। অন্ততঃ তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং ইতিহাসের হিসাবে এই আখ্যায়িকার কোনও মূল্য নাই। গল্পের হিসাবেও রচনাটি ব্যর্থ। দেউস্কর মহাশয় আখ্যানবস্তুকল্পনায় বা গল্প বলিবার ভঙ্গীতে নিপুণ তার পরিচয় দিতে

পারেন নাই। শ্রীমতী সরলা দেবীর "ওমর খৈয়াম" প্রবন্ধে ওমরের জীবনের আলোচনা ও 'রুবাই'র গদ্য অনুবাদ ও সমালোচনা আছে। অনুবাদ গদ্য বলিলাম, কিন্তু পদ্যগন্ধি। আভাঙ্গা সংস্কৃত ও বিকৃত চলিত শব্দের সমাহারে ভাষাটি অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনুবাদের নমুনাস্বরূপ একটি রুবাই উদ্ধৃত করিতেছি,—"মদ্যপ যে পেয়ালায় একবার মদ ভরিয়াছে তাহার উপাদান গুঁড়া করিতে চাহে না, কিন্তু এই যে সব মাথাগুলি, আর সুকুমার শ্রীচরণ, নিজের আঙ্গুলের ডগা দিয়া তিনি গাড়লেন কাহারই প্রেমে, আর কাহারই প্রতি রোষে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ?"—'নিজের আঙ্গুলের ডগা দিয়া,' সকলেই ভাষার লাঞ্ছনা করিতে পারেন, সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ নাচার। রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব খেয়ালের উপর নির্ভর করে না;—তাহা স্বতঃসিদ্ধ। চিরাচরিত পথের পথিক হইলে প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট না হউক, অনাবশ্যক হাস্যরসের আবির্ভাব হয় না;—তাহাও অল্প লাভ নহে। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামীর "ছন্দ ও মিলের খুঁটি নাটি" কবিগণের আলোচ্য। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "অধ্যাপক মক্ষ্‌মূলর" সুপাঠ্য রচনা। প্রত্যেক পাঠককে আমরা উপসংহারভাগ স্মরণ রাখিতে বলি। "ব্রহ্মে নাটপূজার" বিষয় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ভাষার প্রতি লেখক অত্যন্ত উদাসীন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চিরকুমার সভা" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামীর "ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ইতিহাসের উপকরণ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার সমালোচনা আছে, লেখকের উপদেশ ও আক্ষেপ আছে, কেবল বিষয়-সন্নিবেশে যথাযথ শৃঙ্খলার অভাব। মূল প্রসঙ্গ ও অবান্তর বক্তব্য অনেক স্থলে বেমালুম মিশিয়া গিয়া পাঠককে গোলকধাঁধায় টানিয়া আনে।

প্রদীপ। মাঘ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "সৌন্দর্য্যবুদ্ধি।" উপসংহারে লেখক বলেন,—"তবু ভাল যে সকলেই এই মদের (সৌন্দর্য্যের) মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।" তথাপি লেখক বলিতেছেন,—"সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও মানবজীবনে আনুকূল্য করে না, একবারে এত বড় কথাটা বলিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এবং যদি মানবজীবনে ইহার কোন উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনই ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আনিয়া ফেলা যাইতে পারে।" লেখক ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তিনি সৌন্দর্য্যের ইউটিলিটির অন্বেষণ করুন, আমরা ততক্ষণ উপভোগ করি। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "জাব কীট বা পিপীলিকা ধেনু" সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধের ভাষা গুরু ও মন্থর, স্থানে স্থানে দুরূহ, কোথাও বা কর্ণকটু। আজ কাল সাময়িক সাহিত্যে ভাষার বড় দুর্দ্দশা; দেখিয়া দুঃখ হয়। ভাষার সৌন্দর্য্য উপেক্ষার বস্তু নয়। ভাষার অনাদরে সাহিত্যের সুষমা নষ্ট হয়। তাহা কখনও শুভাবহ হইতে পারে না। "স্বর্গীয় কালীকান্ত" একটি জীবনচরিত। কালীকান্তের "সেই সুনাম, সেই সাধুচরিত্রের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।" কিন্তু গুণগ্রাহী জীবনাখ্যায়ক স্বয়ং নিশ্চয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কেন না, কালীকান্তের জীবনচরিত লিখিবার আবশ্যক কি, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পৃথিবীর প্রত্যেক সাধু

চরিত্র খাতায় খতিয়ান করিয়া রাখা অসম্ভব। এই জন্য অজ্ঞাত জীবনচরিত-নায়কের বিশেষত্ব কি, কেন তাঁহার জীবন অনুশীলনের যোগ্য, লেখককে তাহা সযত্নে ও সাবধানে প্রতিপন্ন করিতে হয়। কালীকান্ত-চরিত্রের সেরূপ কোনও বিশেষত্ব বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "অভাগিনী" একটি সুরচিত সুমিষ্ট গাথা। মিলনসুখফুল্ল নব দম্পতির উজ্জ্বল চিত্রের পার্শ্বে উপেক্ষিতা গ্রাম্যবালার মৃত্যুছবি কি বিষাদদিগ্ধ, কি সুন্দর! নিপুণ কবি প্রেমবঞ্চিতা পরিত্যক্তার প্রতি প্রকৃতির স্নেহদৃষ্টি কেমন কোমল করুণ-বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"কখন বকুল এক রাশি ফুল
একখানি ছায়া বিছায়ে দিল!
কে জানে কখন বিষণ্ণ পবন
শ্লথ কেশ-বাস গুছায়ে দিল!
কে জানে কখন সায়াহ্ণ-তপন
কপোলের অশ্রু মুছায়ে দিল!"

অন্যত্র,—

"দীর্ঘ অতি দিন, তরু পুষ্পহীন,
নীরস বিবশ লতিকা-কায়;
পিক ভগ্ন-স্বর, অরণ্য ধূসর,
শ্বসিয়া দহিয়া বহিছে বায়!"

নিদাঘের সুন্দর ছবি। এমন বর্ণনা আলোচ্য গাথায় বিরল নহে। বড়াল কবির চিত্রখানিও সুন্দর। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ছায়াময়ী" গল্পটি 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত';— পরিহাস না প্রকৃত, বুঝিতে পারিলাম না। দীনেন্দ্র বাবু খোসখতে গল্পটি লিখিয়াছেন, বা গল্প-রচনার ভঙ্গীবিশেষকে উপহাস ও 'সেণ্টিমেণ্ট্যালিটি'কে বিদ্রূপ করিয়াছেন, এ সংশয়েরও অবসান হইল না। "বারাণসীর পথে" ও "রাজ্ঞী-রাজত্বের অবসানে" বোধ করি 'চ-বা-তু-হি'র ন্যায় পাদপূরণার্থ! মহারাণীর ছবিখানি কি ভীষণ!

মহিলা। মাঘ। "গৃহিণীর কার্য্য" গৃহিণীরা পড়ুন। "স্বর্গগতা কিশোরীমোহিনী" একটি ব্রাহ্মিকার জীবনবৃত্তান্ত। "ভ্রমণবৃত্তান্ত—মোর্শেদাবাদ" নামটির নূতন বানান, আর কিছু নূতন নাই। নিখিল-নাথের মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর পর এরূপ জলগণ্ডূষ অনাবশ্যক।

মুকুল। পৌষ ও মাঘ। মুকুল শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। শিশুপাঠ্য একমাত্র মাসিকের এই দশা! দেশের প্রশংসা করিব, না অদৃষ্টের নিন্দা করিব? "স্বাবলম্বন ও উন্নতি" প্রবন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের জীবনবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। "বিজ্ঞানের পরী-রাজ্য" অতি সংক্ষিপ্ত, তাও আবার ক্রমশঃপ্রকাশ্য। "অশ্রুমালিকা" একটি তথা-কথিত গল্প। "মহারাণী ভিক্টোরিয়া", "কপাল", "জানোয়ারের গল্প" প্রভৃতি রচনায় প্রাণ নাই। সর্ব্বত্র অযত্নের অনাদরের বহুতর চিহ্ন বিদ্যমান। প্রবন্ধগুলির ভাষা অমার্জ্জিত;—শিশুপাঠ্য রচনার ভাষা সুমার্জ্জিত সুসংস্কৃত না হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা হয়। মুকুল আমাদের বড় আদরের,—মালীর নিকট প্রার্থনা করি, মুকুল যেন শুকাইয়া ঝরিয়া না যায়।

ভ্রম-সংশোধন।

"জীবতত্ত্বের গুটিকত কথা" প্রবন্ধে ৬৪৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে "পাকিয়া" শব্দের স্থলে "পচিয়া" হইবে।



শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

KUNTALINE PRESS.

মহাপুরুষ রাণাড়ে।

অদ্য যে মহাপুরুষের বিয়োগে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি অলৌকিকশক্তিগুণে এ দেশের রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, স্বদেশী বিদেশী সকল সমাজেরই সমান আদরণীয় এবং মহারাষ্ট্র-বাসীর হৃদয়-সিংহাসনের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং সহসা তাঁহার লোকান্তরবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসী



মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে।

দুঃখিত হইয়াছেন, মহারাষ্ট্রবাসী জনসাধারণ যে আত্মীয়বিয়োগবিধুর ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার শোকে কাতর হইয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার বিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মহারাষ্ট্রবাসীরা কয়েক দিবস পর্য্যন্ত শোকে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়াছিলেন। কারণ, যে মহাপুরুষ রাজসেবায় রাজার তুষ্টি ও

রাজশক্তির হিতসাধন করিয়াও স্বীয় গভীর জ্ঞান, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অনন্য-সাধারণ কার্য্যদক্ষতা, অতুল বিভব, এবং ধীর ও অবিচলিত উৎসাহ স্বদেশের মঙ্গলসাধনে অনুক্ষণ নিয়োজিত রাখিয়া স্বদেশ-ভক্তগণের অগ্রণীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি স্বদেশের জ্ঞানবল, ধর্ম্মবল, ধনসম্পত্তি ও সঙ্ঘশক্তির সংবর্দ্ধনের চেষ্টায় সমগ্র আয়ুঃক্ষয় করিয়াছিলেন, যাঁহার একান্ত যত্ন ও অদম্য উদ্যমের ফলে মহারাষ্ট্রবাসী ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজের চক্ষে বরণীয় হইয়াছেন,—সহস্র তত্ত্বজ্ঞান ও শত শত দার্শনিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তাঁহার বিয়োগ যে তাঁহার গুণগ্রাহী স্বদেশবাসীর পক্ষে দুঃসহ বলিয়া বোধ হইবে, সমগ্র জগৎ তাঁহাদিগের চক্ষে অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও শূন্যময় বলিয়া প্রতিভাত হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়কে দেশীয় গ্রন্থকারগণের মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার, বক্তাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বক্তা, বিচারপতিদিগের মধ্যে উত্তম বিচারপতি, গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রাজুয়েট, চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল, সমাজসংস্কারকদিগের মধ্যে এক জন সুবিবেচক সংস্কারকও এবং স্বদেশবন্ধুগণের অন্যতম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা জানেন, প্রায় দুই শত বালক তাঁহার প্রদত্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত, দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে তিনি বার্ষিক সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতেন, এবং সার্ব্বজনিক কার্য্যের জন্য একবার এক মুষ্টিতে ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার দানশৌণ্ডতার প্রশংসা করিবেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসী অদ্য তাঁহার অভাবে যে মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বকথিত গুণাবলীর জন্য নহে। ঐ সকল গুণ যে মহত্ত্বের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই; ঐ সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যে মহারাষ্ট্রে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই বা করিবেন না, তাহাও নহে। বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র সাহিত্যের জন্মদাতা স্বর্গীয় কৃষ্ণ শাস্ত্রী চিপ্‌লুণকরের ন্যায় বুদ্ধিবৈভবে বৃহস্পতির তুল্য ব্যক্তি রাণাড়ে মহোদয়ের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রার্থনা-সমাজের বা সমাজসংস্কারের অকৃত্রিম পক্ষপাতী ব্যক্তিরও এ দেশে অভাব নাই; বাগ্মিতাগুণে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তিও এ দেশে দুর্লভ নহেন; আর যতদিন হাইকোর্টে অন্ততঃ এক জন দেশীয় জজ নিয়োগের বিধান কর্ত্তৃপক্ষ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ততদিন হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে প্রসিদ্ধি

লাভ করিবার সুযোগ অনেক দেশীয়ের ভাগ্যেই ঘটিবে, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সকল গুণের জন্য যে তিনি স্বদেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। যে সকল গুণে তিনি মহারাষ্ট্রসমাজে একেশ্বররূপে বিগত ত্রিংশৎ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে অদ্য এই সভাতলে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে বা সংক্ষেপে মাধব রাও স্বদেশের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, অন্য প্রদেশে বহু ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেও তাহা সংসাধিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁহার কার্য্যাবলীর মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশের বিশেষতঃ পুণার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

এক রাজ্যের বিনাশ ও অপর রাজ্যের অভ্যুদয়, এতদুভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কাল সকল দেশেই জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বাধীন রাজ্যের বিলোপ ঘটিবার পর হইতে ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রতিকূল ছিল। যে সকল মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এই আসেতু-হৈমাচল ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়-গণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিগত ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। মহারাষ্ট্রে ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহাদিগের বংশধরগণ বৃত্তিভোগী হইয়া কেহ বিলাসব্যসনে, কেহ বা দুঃখিতান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছিলেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারের সহিত তাঁহাদিগের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দেশের শুভাশুভের প্রতি তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টি ছিল না। দেশের অগ্রণীগণই যখন এইরূপ কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইয়া দেশের শুভাশুভ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাব ধারণ করিলেন, তখন দরিদ্র প্রজাকুলের অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক দিকে ইংরাজদিগের রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা, চতুর্দ্দিকে আইন কানুনের অষ্টবন্ধন, ভূমিকরনির্দ্ধারণের জন্য কৃষিক্ষেত্রসমূহপর্য্যবেক্ষণের অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত, বাষ্পীয় শকট ও বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহের প্রচার, স্কুল কলেজের নূতন শিক্ষা, এবং ডাকঘর ও বিচারালয়ের নূতন ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া মহারাষ্ট্রবাসীর চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল; অপর দিকে সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর

ব্যাপার ইংরাজদিগের দ্বারা অল্লায়াসে দমিত হওয়ায় ইংরাজশক্তির অধৃষ্যতা-দর্শনে তাঁহাদিগের চিত্ত ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রাচীন সর্দ্দার-বংশীয়দিগের কার্য্যদক্ষতাদি গুণরাশি অনুশীলনের অভাবে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া আসিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ নূতন রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়া যে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই মত্ত হইয়া তাঁহারা দরিদ্রদেশবাসীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। দেশের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব এবং তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা তখন পর্য্যন্ত কাহারও ধারণার বিষয়ীভূত হয় নাই। যাঁহারা দেশের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিতেন, তাঁহারাও প্রতিকারের উপায়-উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। দেশের সর্ব্বত্র নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহের গভীর ছায়া প্রসারিত হইয়াছিল।

সমগ্র মহারাষ্ট্রসমাজে যখন নির্জ্জীবতার এইরূপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশের অগ্রণীগণ ভগ্নোৎসাহ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বহিতপরায়ণ হইয়া দেশের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই দুঃসময়ে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়ের জন্ম হয়। বলা অনাবশ্যক যে, এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে ও কার্য্যগুণে, সূর্য্যোদয়ে তিমিরের ন্যায়, মহারাষ্ট্র দেশের জড়তা ক্রমশঃ অপগত হইয়া উহা সজীবভাব ধারণ করে। ফলতঃ, স্বাধীনতা রত্নে বঞ্চিত হওয়ায় যে সমাজশরীর তুষার-শীতল ও শিথিল-বন্ধন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কি প্রকারে উষ্ণতার সঞ্চার করিলে উহা সজীব হইতে পারে, উহার অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি জন্মিতে পারে, সে বিষয়ে যদি কেহ অহর্নিশ চিন্তা করিয়া থাকেন, যদি কেহ মহারাষ্ট্রসমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে সুস্থ ও ক্রিয়াশীল করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া তাহা সুসম্পন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে! তাই মহারাষ্ট্রবাসী আজ তাঁহার অভাবে বিকল হইয়া অশ্রুপাত করিতেছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং রাণাড়ে মহোদয়েরও বুদ্ধি যে রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে। সে যাহা হউক, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বোম্বাই

নগরীতে প্রেরিত হন। তথায় শিক্ষাকালে তিনি ১৮৫৯ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৩ খৃঃ এম. এ. ও পরবর্ত্তী দুই বৎসরে অনার সহ এল্. এল্. বি. পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। তিনি সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোম্বায়ের শিক্ষিতসমাজ তাঁহাকে The Prince of Graduates বলিত। ১৮৭১ খৃঃ তিনি এডভোকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মাধবরাও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন। সে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প থাকায় সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া বিশেষ সম্মানজনক বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। রাজকার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনবশতঃ গবর্ণমেণ্টও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সম্মানপূর্ব্বক চাকরি দিতে সর্ব্বদা আগ্রহপ্রকাশ করিতেন। এ কারণে রাণাড়ে মহোদয়ের নিকট স্বাধীন-ভাবে জীবিকার্জ্জন অপেক্ষা সে সময়ে রাজসেবাই অধিকতর শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

১৮৬৮ খৃঃ তিনি চারি শত টাকা বেতনে বোম্বায়ের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাদানকালে তিনি ছাত্রদিগের নিকট দুরূহ বিষয়সমূহের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অভিনবতত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য ইউরোপীয় অধ্যাপকেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রেণীতে আগমন করিতেন বলিয়া শুনা যায়। ইহার পর নানা স্থানের বিচারকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্পেশাল জজের পদে উন্নীত হন। তাঁহার বিচারে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীরা কখনও বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইত না। এই কারণে বোম্বাইয়ের আংলো-ভারতীয় পত্র সমূহে বহুবার তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল; এই কারণেই তাঁহার হাইকোর্টের জজিয়তি পাইবার সুযোগ কয়েকবার উপস্থিত হইলেও, তিনি উহা ১৮৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহোদয়ের মৃত্যুর পরও কর্ত্তৃপক্ষ অপর দুই এক জনকে হাইকোর্টের জজিয়তি-প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করায় রাণাড়ে মহোদয়কেই ঐ পদ দান করিতে হয়। মরণকাল পর্য্যন্ত রাণাড়ে মহোদয় ঐ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যে দেড় বৎসর কাল তিনি ফাইন্যান্‌শ্যাল্ কমিটিতে অতীব যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জুবিলির সময় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। তিনি তিনবার বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপকসভার সদস্যও

হইয়াছিলেন। তিনি যখন যে কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন, তখনই সেই কার্য্য অসাধারণ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া সকলের সন্তোষসাধন করিয়াছেন। কিন্তু এই জন্য যে তিনি মহারাষ্ট্রে সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার দেশ-সেবার একাগ্রতাই তাঁহাকে মহারাষ্ট্রসমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিল।

বলিয়াছি, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহারাষ্ট্রসমাজের অবসন্ন দেহে অভিনব শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্বর্গীয় ডাঃ ভাউদাজী ও মিঃ দাদাভাই নৌরাজী তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এক বোম্বাই নগরের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, রাণাড়ে মহোদয় পুণার ও সমগ্র মহারাষ্ট্রের জন্য তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তিনি বোম্বাই নগরে শিক্ষা-সমাপন করিয়া রাজকার্য্য উপলক্ষে যখন প্রথম পুণায় পদার্পণ করেন, তখন দেশের অবস্থা কিরূপ নির্জীব ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রবাসীর চিত্ত যাহাতে লোকহিতকর কার্য্যে নিবিষ্ট হয়, সকলে সমবেতভাবে যাহাতে সার্ব্বজনিক কার্য্য সাধন করিয়া দেশের হিতকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, পুণায় পদার্পণ করিবার পর হইতেই মাধবরাও রাণাড়ে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বদেশের প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যে বিবিধ কর্ত্তব্য আছে, ইহা তিনিই প্রথমে পুণাবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশের সেবায় তাঁহাদিগের অনুরাগ উদ্দীপিত করেন। তাঁহার সময়ে পুণায় মনীষী ব্যক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু মাধবরাওয়ের পথপ্রদর্শনের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই প্রতিভা স্বদেশের মঙ্গলবিধানে বিশেষভাবে নিয়োজিত হয় নাই। তিনিই প্রথমে দেশের কৃতবিদ্যমণ্ডলীকে দেশের কথা ভাবিতে শিক্ষা দেন। এ সম্বন্ধে তিনি কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশসেবার কার্য্যে সকলকে সমান-ভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারই নিকট হইতে পুণাবাসীরা ও পরে প্রায় সমগ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা পাশ্চাত্যপ্রণালীক্রমে রাজনীতির চর্চ্চা করিতে শিখিলেন।

ক্লেশবহুল রাজকার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিয়াও স্বদেশের অবস্থার উৎকর্ষসাধনোপায়ের চিন্তা করা ও সেই সকল উপায়ের যথাযথরূপে প্রয়োগ দ্বারা জড়প্রায় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে চেতনার সঞ্চার করা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। কারণ, যে দেশ সকল বিষয়েই অবনতির নিম্নস্তরে নিপতিত থাকে, সেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন-বিষয়ক প্রশ্ন

সাধারণতঃ এরূপ জটিল ও বহুব্যাপক বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, তাহার মীমাংসায় ও ইতিকর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণেই বড় বড় পণ্ডিতেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়া যায়—কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা। এরূপ স্থলে অনেকেই সেই বহুব্যাপক প্রশ্নের এক এক অংশের মীমাংসা লইয়াই মত্ত হইয়া উঠেন। তখন নানা মুনির নানা মত ঘটিয়া একের কার্য্যে অপরের সহানুভূতি বিলুপ্ত ও পরিশেষে দেশের কার্য্য পণ্ড হয়।

মাধবরাওয়ের প্রধান গুণ এই যে, তিনি এইরূপ একদেশীয় উৎকর্ষ-সাধনে কখনও কালক্ষেপ করেন নাই। স্বদেশের উন্নতিসাধনের যাবতীয় বিভিন্ন পন্থাই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাগুণে তিনি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম, সমাজ, বাণিজ্য, শিল্পকলা, মাতৃভাষা ও সাহিত্য, রাজনীতির চর্চ্চা, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা, নিম্ন সমাজে শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সকল বিষয়ের সংস্কার ও উৎকর্ষসাধন ভিন্ন দেশোন্নতি সম্ভবপর নহে। ভগবানের করুণায় অগাধ বুদ্ধির ন্যায় তিনি অসাধারণ কর্ম্মঠতাও লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজনীতিচর্চ্চার যন্ত্রস্বরূপ পুণার সার্ব্বজনিক সভা, জেনারেল লাইব্রেরী নামক সাধারণ পাঠাগার, পঞ্চায়তী আদালত, বক্তৃতা সভা, দেশীয় কাপড়ের দোকান, দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী, মিউ-জিয়ম, সঙ্গীতসমাজ, দেশীয় শিল্প-সমিতি (Industrial Conference), স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি, প্রার্থনাসমাজ, সামাজিক সমিতি, ডেকান সভা, বসন্ত ব্যাখ্যান-মালা সমিতি, বেদ-পাঠশালা, ডেকান এডুকেশন সোসাইটি, ডেকান ক্লব, আর্য্যসমাজ, এবং 'জ্ঞান-প্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্র ও সার্ব্বজনিক সভার একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রভৃতি বহুবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সূত্রপাত, পরিপুষ্টি ও পৃষ্ঠপোষণ করিতে পারিয়াছিলেন। পুণার জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, সমগ্র মহারাষ্ট্রে যাহাতে তাহার অনুকরণ হয়, সে বিষয়েও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। এইরূপে ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে মহারাষ্ট্রে সর্ব্বত্র জড়তা ও শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হইতেছিল, মহামতি রাণাড়ের চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যেই সেই মহারাষ্ট্র দেশ বিবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানের কেন্দ্রভূমিরূপে পরিণত হইল। কবিবর পোপ মহামতি নিউটন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, রাণাড়ে মহোদয়ের এই সকল কার্য্যকলাপের কথা চিন্তা করিলে, আমা-দিগেরও তাহাই বলিতে ইচ্ছা করে ;—

"Poona and its citizens lay hid in night,
God said 'Let Ranade be' and all was light."

মাধবরাও তাঁহার সমস্ত প্রতিভা দেশের কার্য্যে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও সময়ে যে কোনও বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিত, তিনি তাহাকেই সেই বিষয়ের যথাযোগ্য উপদেশদানে কথনই ইতস্ততঃ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি মহারাষ্ট্রে আর দ্বিতীয় ছিল না। আইন কানুন, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, শিল্প বাণিজ্য, রাজকীয় আয় ব্যয়, অর্থনীতি, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী সর্ব্ববিধ সংস্কার, ঐতিহাসিক তত্বানুসন্ধান, দেশীয় ভাষায় গ্রন্থরচনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধির গতি অপ্রতিহত ছিল, এবং দেশের কার্য্যে তিনি তাহার নিয়োগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি সার্ব্বজনিক সভার ও তাহার ত্রৈমাসিক পত্রের জন্য যে সকল আবেদন-পত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অকৃত্রিম স্বদেশ-ভক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

অলৌকিক প্রতিভা ও অসাধারণ কার্য্য-দক্ষতা থাকিলেও একাকী কেহ কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। বিশেষতঃ রাষ্ট্রোন্নতি-সাধনের জন্য যে সহস্রভাবে সহস্রবিধ কার্য্য করা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা অপর দশ জনের সাহায্য ভিন্ন এক জনের দ্বারা সম্পাদিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। এই কারণে দেশ-হিতৈষী নেতার পক্ষে যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন ও সৃষ্টি, আবশ্যক হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন অপেক্ষা গড়িয়া পিটিয়া কার্য্যের উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য, সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্র দেশের সৌভাগ্যক্রমে এ শক্তিতেও মাধবরাও অদ্বিতীয় ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের নিয়োগ ও ধীরভাবে পুনঃপুনঃ তাহাদিগের ভ্রমপ্রমাদাদির সংশোধন পূর্ব্বক কিরূপে তাঁহাদিগকে বারংবার কার্য্যে উৎসাহদান করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বোধ হয় তাঁহার অপেক্ষা কেহই অধিকতর উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই গুণেই তিনি সার্ব্বজনিক সভা প্রভৃতি বহুবিধ সদনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব-বিধান করিতে পারিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে যাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল, এরূপ লোকের দ্বারাও তিনি এরূপ-ভাবে অনেক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত

হইতে হয়। লোকহিতকর বিষয়সমূহের আন্দোলন আলোচনা যাহাতে দেশের মধ্যে সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকে, তদ্বিষয়ে তিনি যেমন সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, সেইরূপ স্বদেশ ও বিদেশের সর্ব্বপ্রকার সার্ব্বজনিক কার্য্যের গতি ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া তৎসমূহের সহিত স্বদেশের ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার চিন্তাতেও তিনি দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার গৃহে যে কোনও সময়ে গমন করিলেও দৃষ্ট হইত যে, তিনি কোনও না কোনও সার্ব্বজনিক বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। কংগ্রেসের জন্মদাতা মিঃ হিউম্ মহোদয় যথার্থই বলিয়াছিলেন,—

If there is any man in India who for the whole of twenty-four hours of the day thinks of his country, that man is Mr. Ranade.

মাধবরাও অনুক্ষণ দেশের মঙ্গল-চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি দেশোন্নতির যে সকল উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; এ জন্য তাঁহাকে আজীবন অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই হইতে যে স্বদেশ-হিতৈষণার বীজ আনয়ন করিয়াছিলেন, পুণায় ও মহারাষ্ট্রে তাহার বপন করিয়াই তাঁহার ইষ্টলাভ হয় নাই। ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য জলসেচন ও নবোদ্গত বৃক্ষের পালনপোষণের ভারও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া রাণাড়ে মহোদয় এই সকল কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে করিতে পারিতেন না, তথাপি তিনিই যে সকল প্রকার দেশহিতকর আন্দোলন ও আলোচনার মূল, এ কথা কর্ত্তৃপক্ষের জানিতে বিলম্ব হয় নাই। এই কারণে তাঁহারা বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে রাণাড়ে মহোদয়কে ঘন ঘন স্থানান্তরিত করিতে বিরত হন নাই। বলা বাহুল্য, ইহাতেও সেই স্বদেশভক্ত মহাপুরুষ স্থাণুর ন্যায় অবিচলিত ছিলেন। মহ্লার রাও গায়কোয়াড়কে যখন কর্ত্তৃপক্ষ পদচ্যুত করেন, এবং ১৮৭৯ খৃঃ পেশওয়েদিগের পুণাস্থিত প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়, তখন তাঁহার চেষ্টায় পুণাতে যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সাহস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইহার পর স্যার রিচার্ড টেম্পেলের সময়ে তাঁহার স্থাপিত সার্ব্বজনিক সভা রাজবিদ্রোহের উত্তেজনাকারী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইলেও তিনি তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই। ফলতঃ, তাঁহার ন্যায় সাহসী অথচ ধীর, উৎসাহী অথচ অধ্যবসায়সম্পন্ন স্বদেশভক্ত

ভারতের অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহারই গুণে মহারাষ্ট্র দেশের লোকেরা একতায়, অধ্যবসায়ে ও রাজনীতিক আন্দোলনে সকলের অগ্রস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন। মাধবরাওয়ের ন্যায় ব্যক্তি যে সকল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সে সকল প্রদেশে লোকহিতকর কার্য্যে ও রাজনীতিক আন্দোলনে এতাদৃশ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ মহারাষ্ট্র দেশে বর্ত্তমান সময়ে যদি লোকহিতকর অনুষ্ঠানে একতা ও অধ্যবসায়ের কোনও চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, যদি তত্রত্য বক্তা ও লেখকগণ নির্ভীকভাবে সার্ব্বজনিক বিষয়ের চর্চ্চা করিতে কিয়ৎপরিমাণেও শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা যে রাও বাহাদুর রাণাড়ে মহোদয়েরই প্রদত্ত শিক্ষার ও তাঁহার বিগত ২৫ বৎসরের অপরিমিত পরিশ্রমের ফল, তাহা মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থাভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হয়। অধিক কি, যে মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের নাম শ্রবণ করিলে আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রীতি ও ভক্তির প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, রাও বাহাদুর রাণাড়ে মহোদয় বহুপরিশ্রমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, সেই তিলকেরও আবির্ভাব হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ মহামতি তিলক স্বয়ং এইরূপ ভাবের কথাই লিখিয়াছেন।

রাণাড়ে মহোদয় যাবতীয় দেশ-হিতকর কার্য্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও জাতীয় মহাসমিতি বা ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। যে হিউম সাহেব এ দেশে সকলের নিকট কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই হিউম মহোদয় মাধব রাওয়েরই উপদেশক্রমে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহাকে "গুরু মহাদেব" বলিয়া অনেক সময়ে সম্বোধন করিতেন। কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকিয়া রাও বাহাদুর রাণাড়ে উহার বহু প্রস্তাবের (অর্থাৎ resolutionএর) ভাষা পরিমার্জ্জিত করিয়া দিতেন, এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে তাঁহাকে সভাপতি মহাশয়ের দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ করিতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ভারতের দারিদ্র্য ও তন্নিবারণের উপায়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি দাদাভাই নৌরোজী অপেক্ষা কোনও অংশে অল্প আলোচনা করেন নাই। এ জন্য তিনি সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

তিনি যে সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিক আন্দোলনের মূলাধার, মহারাষ্ট্রে public opinion বা লোকমত সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ও মহারাষ্ট্র জন-

সাধারণের প্রকৃত নেতা ছিলেন, এ কথা কর্ত্তৃপক্ষের অবিদিত ছিল না। তাই একদিন কোনও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই লাট লর্ড হ্যারিস্ রাণাড়ে মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, Mr. Mehta and his friends are the public opinion of Bombay, while *the Great Unknown* known by the name of Sarvajanik Sabha of Poona is the public opinion of the Deccan. এই মহাপুরুষের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান সহৃদয় বড়লাট মহোদয় মৃত মহাত্মার পরিবারবৃন্দকে যে সান্ত্বনাপত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি মাধব রাওকে independent leader of the public বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

ইংরাজীতে যাহাকে plain living and high thinking বলে, রাওবাহাদুর রাণাড়ে তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার ও যশোলিপ্সার একান্ত অভাব থাকায় তাঁহার কার্য্যকলাপ ভারতের অপরাপর প্রদেশে বহুপরিমাণে অপরিজ্ঞাত ছিল। তিনি স্বয়ং নিঃশব্দে কার্য্য করিতেন, কার্য্য করিবার জন্য লোক শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে পুরোভাগে স্থাপনপূর্ব্বক দেশের হিতসাধন করিতেন। অনেক সময়ে নীতিবশে তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে এরূপ কার্য্য করিতে হইত, যাহা দেখিয়া দূরদেশবাসিগণ তাঁহার প্রতি সংশয় প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতেন। এ কথার দৃষ্টান্তস্থলে আমরা ১৮৯৭ সালের পুণার বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। পুণায় মিঃ র‍্যাণ্ড ও এয়ারেষ্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে, গবর্মেণ্টের ক্রোধানলে সমস্ত পুণা দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, তিনি যেরূপ কৌশলে গবর্মেণ্টের কোপপ্রশমন ও সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন, মহামতি তিলকের বিচারকালে তাঁহাকে যেরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান ও সময় ইহা নহে। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য কার্য্যাবলী দূরদেশবাসীর চক্ষে কিয়ৎপরিমাণে নিন্দনীয় হইলেও সেবার যে তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে পুণাবাসীরা কর্ত্তৃপক্ষের ক্রোধানল হইতে বহুপরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা অনেক মহারাষ্ট্রীয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার অসাধারণ কার্য্যকুশলতা ও প্রবল স্বদেশানুরাগ দেখিয়া অনেক মহারাষ্ট্রীয় এমনও মনে করেন যে, আরও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাণাড়ে মহোদয় জন্মগ্রহণ করিলে মহারাষ্ট্রদেশের স্বাধীনতা বা পেশওয়েদিগের সাম্রাজ্য কখনই বিনষ্ট হইত না। এরূপ চিন্তা যত দূর সঙ্গত হউক, উহা হইতে মৃত

মহাত্মার স্বদেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশবাসীর বিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

মহারাষ্ট্রজাতির পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অন্ততঃ তাঁহার রচিত মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাস পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয়, এ কথা বোম্বাইয়ের Times of India সম্পাদক স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুখের বিষয়, তাঁহার রচিত ইতিহাস বোম্বাই অঞ্চলে এক্ষণে এম. এ. শ্রেণীতে পঠিত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এই সকল গুণের ও কার্য্যাবলীর জন্য মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে কেহ মহাত্মা গ্ল্যাডষ্টোনের সহিত, কেহ বা ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্র রাজ-মন্ত্রী নানা ফড়নবীসের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া থাকেন। Times of India সম্পাদক তাঁহাকে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তুলিত করিয়াছেন। কিন্তু মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক বলেন,—"রাণাড়ে মহোদয়ের অগাধ জ্ঞান ও রাজনীতিকৌশলের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহাকে দেবগিরীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী অশেষশাস্ত্রজ্ঞ হেমাদ্রি বা বুক-রাজমন্ত্রী বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। 'সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ' এই উক্তি মাধবাচার্য্যের ন্যায় আমাদিগের মাধবরাও রাণাড়ের সম্বন্ধেও অনায়াসেই প্রযুক্ত হইতে পারে।" তিনি আরও বলেন,—"একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও পালনকার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যেরূপ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার আবশ্যক, রাণাড়ে মহোদয়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার যথোপযুক্ত বিকাশ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" মহামতি তিলকের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতমাতা কিরূপ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। (১)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

আসামের রঙ্গপুর।

বোধ করি, পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন,—সুদূর আসাম প্রদেশে 'রঙ্গপুর' নামে এক নগর এখনও আসামের আহম রাজাদিগের কীর্ত্তি-

(১) এই প্রবন্ধটি স্বর্গীয় রাণাড়ে মহোদয়ের স্মরণার্থসভায় পঠিত হইয়াছিল।

কলাপের ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া দীনভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। রঙ্গপুর বর্ত্তমান শিবসাগর সহরের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শিবসাগরের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্তবাহিনী নদী অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই দক্ষিণ পার্শ্বে এক দ্বিতল ইষ্টকালয় দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নাম "রঙ্গঘর"। আহম রাজাদিগের সময় ইহা তাঁহাদিগের রাজ-দরবারের স্থান ছিল। নীচের তলাটি এখন গোমহিষাদি প্রাণীর আবাসস্থল। দ্বিতলে আরোহণ করিবার সোপানাবলী এক্ষণে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যস্থলে একটি "হল"। দুই পার্শ্বে দুইটি বারান্দা আছে। রাজাদের বাড়ীতে অনেক গুপ্তধন আছে, এবং অনেকে অনেক ধনরত্ন পাইয়াছে,—এই প্রবাদে আস্থা স্থাপন করিয়া লোকে দেয়াল, মেজে ও সিঁড়ির পথ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কালের কঠোর শাসনে শতাব্দীতেও যাহা করিতে পারিত না, মানুষের নিষ্ঠুর হস্ত অতি অল্পকালের মধ্যেই এই সমুদায় প্রাচীন কীর্ত্তির তদপেক্ষা অধিক ধ্বংসসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই দ্বিতলের উপর দণ্ডায়মান হইলে, রাস্তার বাম পার্শ্বে, রাজাদিগের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে, এই বাটীর মাটীর উপরে ৭ তলা ও মাটীর নীচে ৭ তলা ছিল। মৃত্তিকার উপরে এখনও ৩।৪ তলা দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকার নীচেও আমি দুই তলা পর্য্যন্ত দেখিয়াছি; এবং তাহার পরেও যে নীচের দিকে যাওয়া যায়, তাহারও নিদর্শন আছে। কিন্তু ঐ স্থান অত্যন্ত অন্ধকারময় এবং সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল হওয়াও বিচিত্র নয় বলিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই। রঙ্গঘরের ন্যায় এই বাটীও অর্থগৃধ্নু লোকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। বাড়ীর অতি নিকটেই ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণী আছে। ইহা সর্ব্বদাই জলে পরিপূর্ণ থাকে। লোকে বলে যে, এই রাজবাটীর প্রায় এক মাইল দূরে জয়সাগর নামে যে সুবিস্তৃত সরোবর আছে, তাহার সহিত এই পুষ্করিণীর সংযোগ আছে। তজ্জন্যই ইহার জল কখনও শুকাইয়া যায় না। মৃত্তিকার নীচে সুড়ঙ্গ আছে। এই সুড়ঙ্গপথেই জল প্রবাহিত হয়। এই পথের নির্ণয় দুঃসাধ্য। রাজপ্রাসাদের গৃহগুলি বড় উচ্চ নহে। যে ৩।৪ তলা এখনও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের দেশের দ্বিতল গৃহের প্রায় সমান উচ্চ হইতে পারে। সম্প্রতি এই বাটীর চতুঃপার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ। একাকী যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শুনা যায়, রাজবাটী হইতে

মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া এক গুপ্ত পথ আছে। এই পথ সন্নিহিত নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে রাজারা এই গুপ্তপথে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। রাজাদের ধনাগার এখনও বিদ্যমান আছে। উহার বর্ত্তমান অবস্থা এরূপ যে, উহার মধ্যে প্রবেশ করা একরূপ অসাধ্য। সব ঘরগুলিই প্রায় একরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত।

জয়সাগরের এক পার্শ্বেই অত্যুচ্চ এক মন্দির আছে। অপর দিকে অন্য দুইটি মন্দির আছে; তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র। বড় মন্দিরের মধ্যে দেবতাদি কিছুই নাই। মন্দিরটি উচ্চে প্রায় ১৩০।১৩৫ হস্ত হইবে। মন্দিরের গাত্রে চতুষ্পার্শ্বেই প্রস্তরে খোদিত পৌরাণিক দেবতাদিগের চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় চিত্র সূক্ষ্মশিল্পের পরিচায়ক না হইলেও, পূর্ব্বতন দেশীয় ভাস্করবিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

রাজবাড়ী হইতে এই মন্দিরের দিকে যাইতে যাইতে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মন্দির দেখা যায়। এই স্থানেই মৃত রাজাদিগের সমাধি হইত। কোনও রাজার মৃত্যু হইলে এক প্রকাণ্ড গহ্বর খোদিত হইত। ঐ গহ্বরে নামিবার জন্য সিঁড়িও প্রস্তুত হইত। নির্দ্দিষ্ট দিনে সমাধির জন্য যখন মৃতদেহ ঐ স্থানে নীত হইত, তখন বহুসংখ্যক নাগরিক ব্যক্তি, ভৃত্যাদি ও গায়ক বাদকগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শবদেহের অনুসরণ করিত। রাজার দেহ ঐ গহ্বরে নীত হইলে অনুচর ব্যক্তিবর্গও গানবাদ্য করিতে করিতে ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিত। সকলে ঐরূপ আমোদপ্রমোদে লিপ্ত থাকিতে থাকিতেই গহ্বরে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইত। গহ্বরস্থিত হতভাগ্যগণ রাজার সহিত জীবিতাবস্থায় প্রোথিত হইত! এইরূপ করিবার কারণ এই যে, একাকী প্রোথিত হইলে পরলোকে রাজাদের পরিচর্য্যার জন্য লোকের অসদ্ভাব হইতে পারে; সুতরাং এই অদ্ভুত উপায়ে পূর্ব্বাহ্নেই সেই অভাব নিবারণের ব্যবস্থা হইত!

ভ্রমণে বাহির হইবার সময় রাজাদিগকে বাহকগণ দোলায় বহন করিয়া লইয়া যাইত। পথিপার্শ্বস্থিত দর্শকবৃন্দ রাজযান নিকবর্ত্তী হইবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত। সাধারণ লোকেরা জানুর নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিতে পারিত না।

শিবসাগরের মন্দিরের কথা কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের

উপসংহার করিব। এই মন্দিরও গঠন বিষয়ে জয়সাগরের তীরবর্ত্তী মন্দিরেরই অনুরূপ। ইহার দুই পার্শ্বেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি মন্দির আছে। বড় মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। মন্দিরের চূড়ায় একটি বৃহৎ সুবর্ণ-কলস আছে। কথিত আছে, পার্শ্বস্থিত মন্দিরদ্বয়ের শীর্ষদেশেও ঐরূপ দুইটী সুবর্ণকলস ছিল। মানেরা (ব্রহ্মদেশীয় মঘেরা) আসাম আক্রমণ-কালে ঐ দুইটি কলস লইয়া যায়। কিন্তু শিবের মন্দির অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া তদুপরিস্থ কলস লইয়া যাইতে পারে নাই। মন্দিরত্রয়ের সমীপেই অতি বৃহৎ ও পরিষ্কারজলপূর্ণ শিবসাগর নামক সরোবর আছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল। নগরস্থ লোকেরা ইহার জলই পান করিয়া থাকে।

শ্রীরাইকিশোর চট্টোপাধ্যায়।

উন্মাদ।

১

ভূস্বামী গৃহের তরে জমী 'খাস' করি'
রচিবে প্রাসাদ উচ্চ তাহার উপরি;
সেথায় প্রাসাদচূড়া উঠিবে আকাশে
যেথা ভূমি পূর্ণ ছিল দরিদ্রের বাসে—
নিয়ত কাকলিপূর্ণ—শত মক্ষিকায়
গুঞ্জনমুখরনিত্য মধুচক্র প্রায়।
ধনীর বিলাস লাগি' দরিদ্র যে জন
সে কেন না যা'বে ছাড়ি' পৈতৃক ভবন?

কৃষিজীবী সিধুমলে রঘুনাথ রাও
শুনাইল "রাজ"-আজ্ঞা,—"গৃহ ছাড়ি' যাও।"
এখনো অপক্ক শস্য, অর্থ-রিক্ত কর,
মহাজন উৎপীড়ন করে নিরন্তর,
সদ্যোজাত শিশুপুত্র, স্থবিরা জননী,
সূতিকা-আগারে বদ্ধা বিশীর্ণা রমণী,—
শুধু সাত দিন তরে যাচিল সময়।
একদিন নাহি দিল নাএব নির্দ্দয়।

ছাড়িয়া পৈতৃক ভিটা—বিষণ্ণবদন—
দাঁড়াইল রাজপথে—সহ পরিজন।
ঊর্দ্ধে শোভে নীলাকাশ সূর্য্যকরোজ্জ্বল,
অদূরে তটিনী সেই—তরঙ্গচঞ্চল;
সেই পরিচিত পথ, প্রবাহ, প্রান্তর;
সব ত্যজি' যেতে হ'বে কোন্ দূরান্তর?
চাহিতে কুটীর পানে চক্ষে আসে জল।
ফেলি' গেল তপ্তশ্বাস দরিদ্র-সম্বল।

২

ভিখারী এসেছে দ্বারে—ছিন্ন দীনবেশে,
কে তা'রে আশ্রয় দেয়? ভ্রমে দেশে দেশে।
পথশ্রমে শীর্ণ দেহ,—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা
শুষ্ক করি' লয়ে গেছে মাতৃস্তনে সুধা;
অনাহারক্লিষ্ট শিশু কাঁদি দুগ্ধ তরে
ঘুমায়ে পড়িল শেষে মাতৃঅঙ্ক পরে।
ক্ষণ পরে দেখে, দেহে তাপ নাই তা'র,
সে যে কালনিদ্রা! আঁখি মেলিল না আর।

বাজিল বিষম ব্যথা জননীর বুকে,
ক্ষুধায় পাইলে অন্ন রুচে না তা' মুখে;
দিবানিশি নেত্রে অশ্রু, শীর্ণ দেহ ক্ষীণ।
পথপ্রান্তে বৃক্ষমূলে বসে একদিন,
বিশ্রাম লভিবে বলি। যেন স্নেহ ভরে
আবরিল রৌদ্র তরু—স্নিগ্ধপত্র করে;
স্নেহভরে পরশিল শীতল বাতাস।
তেয়াগিল—পতি-মুখ চাহি'—শেষ শ্বাস।

মৃত পুত্র, মৃতা পত্নী—জীবন-সম্বল!
শুষ্ক-অশ্রু-উৎস, নেত্রে ঝরিল না জল।
স্বর্গবাসী হে দেবতা, তুমি কি নির্দ্দয়!
ধনী শুধু পুত্র তব,—দরিদ্র কি নয়?
হা অদৃষ্ট, দরিদ্রের নিষ্ঠুরা বিমাতা!
হা দারিদ্র্য, সর্ব্বপাপ, সর্ব্বদুঃখদাতা!
তবু ভাঙ্গিল না হৃদি হয়ে শতখান;
এমনি কঠিন শিলা দরিদ্রের প্রাণ!

৩

অদূরে গ্রামের প্রান্তে ভগ্ন দেবালয়,
মাতা পুত্রে সেথা গিয়া লইল আশ্রয়।
অশ্বত্থের শত মূল চারিদিকে আসি'
প্রাণপণে ভগ্নগৃহ ধরিতেছে গ্রাসি';
বরষার বারিধারা শত ছিদ্রে ঝরে
জনহীন গৃহমাঝে,—শূন্য বেদী পরে।
কেহ নাহি যায় সেথা, কুণ্ডলিনী ফণী
নিদাঘে শীতল ছায়ে ঘুমায় আপনি।

সেথা হ'তে সিধুমল নিত্য গ্রামে যায়,—
শ্রমজীবী কার্য্য করি যদি কিছু পায়।
কোন দিন জুটে কায; সে দিন দু'জন
দু'মুঠা আহার পায়; নহে অনশন।
অনশনে—অর্দ্ধাশনে কাটে কয় মাস;
আসিল উত্তর হ'তে শীতের বাতাস।
জননীর জীর্ণ দেহ আচ্ছাদিতে চাই;
ভিক্ষা মাগি—ছিন্ন কন্থা। তাও নাহি পাই।

মাতৃমুখে মৃত্যুছায়া;—আসে সর্ব্বগ্রাসী;
বহে না শরীর আর; দেখা দিল কাশি।
সহজে জ্বালার নাহি হয় অবসান;
সহজে কি বাহিরায় দরিদ্রের প্রাণ?
বহুদিন কষ্ট সহি' আসিল মরণ;
জুড়াইল তপ্ত হৃদি,—ঘুচিল যাতন।
এইবার সব শেষ—সহা নাহি যায়।
শিশুসম সিধুমল কাঁদিয়া লুটায়।

৪

ভাসাইয়া শবদেহ তটিনীর নীরে
একাকী ফিরিল সিধু বিজন মন্দিরে।
শুকা'ল নয়নজল। হৃদে বহি' যায়
পূর্ব্বস্মৃতি,—বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোত প্রায়।
কেন আজ এ দুর্দ্দশা? দলেছে চরণে
কে সে সুখ-তপ্ত নীড়? ভাতিল নয়নে
তীব্র প্রতিহিংসাবহ্নি। হায়, জন্মভূমি,
দেশচ্যুত পুত্রে তব ভুলেছ কি তুমি?

স্মরণে উদিল, সেই কুটীর তাহার—
শ্যামপত্র তরুপুঞ্জে স্নিগ্ধ চারিধার;
প্রভাতে সন্ধ্যায় তাহে বিহগকূজন;
মুঞ্জরিত সহকারে মধুপ-গুঞ্জন;
মৃদুগন্ধে স্নিগ্ধ বায়ু মাঠ হ'তে আসে,
জুড়ায় দিনের ক্লেশ সন্ধ্যার বাতাসে।
শস্যশীর্ষে ক্রীড়ারত চঞ্চল পবন
হৃদয়ে জাগা'ত কত সুখের স্বপন!

অদূরে—তরঙ্গগর্ব্বে কল কল স্বরে
বহি' যেত স্বচ্ছনদী; বারি বক্ষোপরে
পণ্য লয়ে পণ্যতরী পাল প্রসারিয়া
শুভ্র রাজহংস সম চলিত ভাসিয়া।
নাহি চিন্তা, নাহি জ্বালা, খাটি নিজ করে
দু' মুঠা আনিত ঘরে সকলের তরে;
হৃদে ছিল শান্তি; ছিল আনন্দ জীবনে।
কে ঘুচা'ল সব? বহ্নি জ্বলিল নয়নে।

দূরে প্যাওগড় পর্ব্বতের শিখরমালা পূর্ব্ব গগনের ধূসর ছায়ায় মিশাইয়া গিয়াছে। বৃটীশ ও দেশীয় রাজার রাজ্যের সীমানির্দ্দেশক স্তম্ভগুলি সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে শুভ্রবস্ত্রাবৃত নিশ্চল প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্মুখে সুবৃহৎ ময়দান; লালকুর্ত্তিধারী মারাঠা সৈন্যগণ সঙ্গিনকণ্টকিত বন্দুক ঘাড়ের উপর ফেলিয়া সমতালে পা ফেলিয়া মস্ মস্ শব্দে কাওয়াজ সারিয়া রেসিডেন্সী অভিমুখে চলিয়াছে। তাহার পাশেই একটা মাঠে এক দল মারাঠা বালক ক্রিকেট খেলিতেছে; বালপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই অভিন্ন;—ছুটাছুটি, হাস্য কলরব, করতালি, নৃত্যের বিরাম নাই। নূতনত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকগণের অর্দ্ধমুণ্ডিত মস্তকে আর্কফলার আন্দোলন বৈদেশিকের চক্ষে কিছু বেখাপ দেখাইতেছিল। ক্রীড়ামগ্ন বালকগণের মধ্যে প্রায় কাহারও মস্তকে উষ্ণীষ ছিল না।

অবশেষে রাজপথে উপস্থিত হইলাম। পথের দুই দিকে বট গাছের সারি। জনবিরল পথ, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, নগর হইতে কিছু দূরে। ইহা রেসিডেন্সির পথ। পথের ধারে স্থানে স্থানে পারসী দোকানদারগণের দোকান। মদ ও ষ্টেশনারীর দোকানই অধিক। দুই একটি পারসী রমণী ধীরে ধীরে পথে পাদচারণ করিতেছে। আয়ারা দুই একখানি ঠেলা গাড়ীতে রেসিডেন্সীর কুপোষ্য ফিরিঙ্গীশাবকগণকে 'হাওয়া' অথবা ধূলি সেবন করাইয়া ফিরিতেছে। দুই একখানি গাড়ী, 'কাঁপা মা যাউছি' ক্যাম্পের দিকে চলিয়াছে। গুজরাতি শকটচালকের মস্তকে জমকালো লাল বা সবুজ পাগড়ী, কর্ণে মুক্তা-গাঁথা মাকড়ী, মুখে বিড়ি। পথে মলিনবসনা, রঞ্জিতদশনা, রুক্ষকেশা, দুর্ভিক্ষখিন্না, বিবর্ণা গুজরাতি রমণীগণ গোময় সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। পথের পাশে বটগাছের নীচে অস্থিচর্ম্মসার বলদ কাকের তাড়নায় বিরক্ত হইয়া অতিকষ্টে পুচ্ছ আন্দোলন করিতেছে। কোন কোন বৃক্ষমূল প্রস্তরবদ্ধ, তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির, মন্দিরমধ্যে বিভিন্ন দেবতার মূর্ত্তি; সে মূর্ত্তিগুলি বহুদিন হইতে ভাস্করনৈপুণ্যের আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। কচ্ছধারিণী মুক্তাবহুলবর্ত্তুলনথপরিহিতা, স্থূলবলয়মণ্ডিতপ্রকোষ্ঠা মারাঠা রমণীগণ যুক্তকরে দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে।

ক্রমে যতই নগরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই জনতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পথে নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্যের দোকান, ছাতু ও গুড় হইতে লঙ্কা মরিচ ও লাড্ডু সকল রকম জিনিষ সজ্জিত রহিয়াছে।

খাবরালের চালবিশিষ্ট সুরঞ্জিত নানা আকারের গৃহ, গৃহপ্রাচীরে পুরুষ ও রমণীর চিত্র, কতকগুলি চিত্র অতিরিক্ত রঙ্গদার। কোন চিত্রে দুই জন পালোয়ান মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত, ব্যাঘ্র ও হস্তীর চিত্রও অনেক। প্রত্যেক দোকানে গুজরাতি রমণীগণ মহাকলরবে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতেছে; সুবিপুল বর্ত্তুল উদর প্রসারণ পূর্ব্বক গুজরাতি শেঠ মহাশয়েরা মাথায় পাগড়ী 'ঙ'র মত বসিয়া লম্বা লম্বা কলিকায় নির্ব্বিকারচিত্তে শুষ্ক তাম্রকূটপত্রের ধূমপান করিতে-ছেন, কেহ বা কোন পান্থজনের সহিত বৈষয়িক আলাপে ব্যস্ত, প্রত্যেকের মস্তক দুর্দ্দমনীয় বাক্যপ্রবাহে ঝঞ্ঝাতাড়িত তালশীর্ষের ন্যায় প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছে—পাঠক মহাশয় মার্জ্জনা করিবেন,—উপমাটা ঠিক হইল না, কারণ প্রত্যেকের মস্তকে নীল, পীত, লোহিত নানাবর্ণের উষ্ণীষ, অত্যন্ত জমকালো।

রাজপথ দিয়া হন হন করিয়া গরুর গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, বলদের গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে, গাড়ীতে আধ ডজন আরোহী বসিয়া দুলিতেছে। সুদৃঢ় কাটিবারি বা সুবৃহৎ ওয়েলার সংযোজিত শকটগুলি ধনিসন্তানগণকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রাজকীয় প্রমোদোদ্যানের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; বলদের পিঠে সারি সারি ধোপার কাপড়, গাধার পিঠে যাযাবর জাতির 'ডেরা ভাণ্ডা'—ইহাদের অধিকাংশ 'ভাঙ্গি' 'ধেড়' প্রভৃতি অস্পৃশ্যজাতির ন্যায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

হঠাৎ এক জন বড়লোকের কুঠীর ভিতর হইতে এক পাল ছেলে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের পরিচ্ছদ কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার দলের শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতির মত; হাতে বাঁশীর পরিবর্ত্তে ছোট ছোট লাঠি, এক এক জনের হাতে দুখানি করিয়া লাঠি দেখিলাম। যে সর্দ্দার, তাহার মস্তকের চূড়া খুব জমকালো, পোষাকেরও পারিপাট্য আছে; তাহার হস্তে লাঠি নাই, একটি বাঁশী। এই সর্দ্দার বালক বংশীরব করিলেই ইহারা নৃত্য সহ গান আরম্ভ করে, আবার বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য গীত বন্ধ হইয়া যায়। অনেক বড়লোকের গৃহে ইহারা 'খেলা' দেখাইয়া বাতাসা নারিকেল ও 'পান সুপারী' উপহার পায়। আজ গণেশ-একাদশীর দিন এরূপ অনেক দল বাহির হইবে। রাজপথে ক্রমে লোকারণ্য বাড়িতে লাগিল। নানাপ্রকার বাদ্যভাণ্ড সহ গণেশ দেবকে বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে!

উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পথ,

পথের দুই ধারে সারি সারি দোকান, কত রকম জিনিসের দোকান, তাহার সংখ্যা নাই। কাপড়ের দোকানের সারি, সাইনবোর্ডযুক্ত দোকানে গুজরাটী দোকানদার কাপড় বিক্রয় করিতেছে। পাশেই ষ্টেশনারী দোকান, মাথার টোপাটা কোলের কাছে নামাইয়া দোকানদার গুরুগম্ভীরভাবে বসিয়া আছে, কাঁসা পিতলের বাসনের দোকানে দোকানদারের ভৃত্যগণ ক্রমাগত পিতলের উপর ঠংয়াস ঠংয়াস শব্দ করিতেছে। দোকানদারগৃহিণীগণ দোকানের সম্মুখে পথের উপর রক্ষিত খাটিয়ায় শুইয়া কেহ বা বসিয়া গল্প করিতেছে। উটের উপর এক জন লোক বসিয়া তাহার রঞ্জিত গলরজ্জু ধরিয়া গন্তব্য পথে চলিয়াছে, উটের গলাতেও ঘণ্টা, ক্রমাগত ঠুন ঠুন করিয়া শব্দ হইতেছে।

বাজনা বাজাইতে বাজাইতে একটা বিবাহের দল রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল, গোটাকত ঢাকও নয় ঢোলও নয় রকমের বাদ্যযন্ত্র, আমাদের পল্লী অঞ্চলের চড়বড়ের মত, আর গোটা দুই বাঁশী, বর মহাশয় অতি শিশু, তিন বৎসর বয়স হইতে পারে, একটি বয়োবৃদ্ধা কন্যাকে বরের পাশে বসাইয়া ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। বরের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার খুব সম্ভ্রান্তোচিত, মেয়েটির ললাটদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত, তাহার পাশ দিয়া সুন্দর মুখখানি দেখা যাইতেছে, চোক দুটি ছল ছল করিতেছে। বাঙ্গালীর নববিবাহিতা বালিকার অশ্রুসজল মুখ মনে পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে রাজপথের আলোক ও দোকানের আলোক মিশিয়া একটা কুহক রচনা করিল; দেখিলাম,সেই সুসজ্জিত অশ্বের পশ্চাতে একদল গুজরাতি রমণী, প্রত্যেকের মস্তকের উপর এক একটি অতি উজ্জ্বল লোটা, এক একটি পেয়ালা লোটার মুখ জুড়িয়া বসিয়া আছে—রমণীগণের পরিচ্ছদ অতি সুন্দর, নানা বর্ণের শাড়ী ঘাগরার উপর শোভা পাইতেছে, সমতালে পা পড়িতেছে, সত্যই গজেন্দ্রগমন, অনেকেই যুবতী, তাহাদের দুর্দ্দমনীয় যৌবনশ্রী দেহাবরণ বিদীর্ণ করিবার জন্য সুগোল দেহের প্রত্যেক অংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহ-দলের পশ্চাতে একটা শীর্ণদেহ চিতা। প্রথমে মনে হইয়াছিল, চিতা মহাশয়ও এক জন বরযাত্রী; শেষে বুঝিলাম, তাহা নহে। চিতার চক্ষু চামড়ার ফিতা দিয়া বাঁধা, তাহার গলায় দুইগাছি শৃঙ্খল, দুই দিকে দুই জন তাহা ধরিয়া চলিয়াছে, কটিদেশে একখান কাপড় বাঁধা, কাপড়খানি আর এক জন ধরিয়া চলিয়াছে। ব্যাঘ্রের পশ্চাতে এক পাল ছেলে।—হঠাৎ দূরে খটাখট্ খটাখট্ অশ্বপদশব্দ উত্থিত হইল। প্রায় পঞ্চাশ জন শিখ অশ্বারোহী

বল্লমের উপর নীল ও সাদা পতাকা উড়াইয়া বাম কোষে তরবারি ও দক্ষিণ হস্তে বন্দুক ধারণ পূর্ব্বক সমান তালে ছুটিয়া আসিতেছে; তাহার পর সৌম্যমূর্ত্তি মহারাজা, সঙ্গে কয়েক জন সভাসদ; তাহার পশ্চাতে এক জন কাপ্তেনের গাড়ী, সকলের শেষে দুই জন অশ্বারোহী নিষ্কোষিত অসিহস্তে, আর দুই জন উদ্যত বন্দুক হস্তে মহারাজের অনুগমন করিতেছে। মহারাজ যেমন চলিতেছেন, আর দুই দিক হইতে মস্তক নত করিয়া প্রজাগণ রাজবন্দনা করিতেছে! সকলের হৃদয়ই রাজার প্রতি প্রীতিরসে অভিষিক্ত।

আমরা গুজরাতি পল্লীতে প্রবেশ করিলাম। অপরিসর পথ, পথের উভয় পার্শ্বে সমুন্নত গৃহশ্রেণী, তাহা ভেদ করিয়া সেই দুর্গম পথে কিরণ-দান মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডেরও অসাধ্য। গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল; বারান্দায় গুজরাতি রমণীগণ বসিয়া গল্প করিতেছে;—কোন গৌরাঙ্গী কোন রহস্যালাপে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। দু তিন জন লোক কোন কোন দ্বিতল বাতায়নের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পথের দিকে চাহিয়া আছে। পথে পাঁচ সাত হাত অন্তর এক একটা অস্থিচর্ম্মসার কুকুর শয়ন করিয়া আছে, যষ্টিপ্রহারের ভয় দেখাইলেও উঠে না, একবার মুখ তুলিয়া কাতরদৃষ্টিতে যষ্টিধারীর মুখের দিকে চাহে, মতলবটা,—পৃথিবী ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এখা-নেও লাঠি! অবস্থাটা প্রায় আমাদের সমান, তবে আমাদের পিঠে লাঠি পড়ে, আর ইহাদের পিঠে কেহ লাঠি মারে না।

এ পথে মারাঠাদের বড় গমনাগমন নাই; কেহ কেহ দেবমন্দিরে দেব-তার আরতি দেখিতে যাইতেছে। কোন কোন বিধবা সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া দেবদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। কড়ির সহিত রজ্জু বদ্ধ অনতি-উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিয়া দুলিতে দুলিতে কোন গুজরাতী যুবতী তাহার শিশুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে পথের দিকে চাহিয়া আছে;—ঘরে মিট মিট করিয়া দীপ জ্বলিতেছে। পাশেই এক স্থলে কথা আরম্ভ হইয়াছে। এক জন কথক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পমালায় বিভূষিত, একটি দীপের সম্মুখে বসিয়া পুঁথি খুলিয়া সুর করিয়া কথকতা করিতেছেন, সম্মুখে ভক্তবৃন্দ বসিয়া নীরবে কথা শুনি-তেছে; পাগড়ীর স্রোত চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কথকের কথা 'সমজ' করিয়া ভাবভরে মাথা নাড়িতেছে। অদূরে একটা বারান্দায় বসিয়া কতক-গুলি রমণী নিবিষ্টচিত্তে কথকতা শ্রবণ করিতেছে। দূরে চারি জন ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—দেহ কঙ্কালসার; শীর্ণ; দুর্ভিক্ষ তাহাদের দেহে মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান করিতেছে।

একটি ছোট মন্দির, মন্দিরে একটি সিন্দূররঞ্জিত মূর্ত্তি, তাহাতে পিতলের মুখোস লাগানো ; আজ উৎসবের দিন, দেবতা মুখস পরিয়া বসিয়াছেন, পূজা আসিতেছে, সুতরাং মুখোসটা আবশ্যক ; অন্য সময় মুখোস থাকে না। আমাদের কলির দেবতা আমাদের অধিকাংশ কলির মানুষের মতই প্রবঞ্চনাপ্রিয়—রাজনৈতিক ভাষায় ডিপ্লোমাটিষ্ট।

মন্দিরের প্রাঙ্গনতলে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত ষণ্ড, ঝুঁট বাঁকাইয়া নতমুখে শয়ন করিয়া আছে, তাহার সম্মুখেই একটি কচ্ছপ, গ্রীবা উন্নত করিয়া চলিবার ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ;—এই দুই মূর্ত্তির যুগপৎ স্থাপনের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক কোন প্রকার অর্থই আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। চিন্তাকুলচিত্তে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এক জন গুজরাতি ভদ্রলোক গৃহের পথপ্রান্তস্থ দ্বার খুলিয়া রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথের আলোকে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে এক থাল জিলিপি। তিনি জিলিপিগুলি রাজপথে দুই একখানি করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কোথা হইতে এক পাল কুকুর আসিয়া মহানন্দে তাহা ভোজন করিতে লাগিল। এমন সময় দেখিলাম, কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত নর নারী ছুটিয়া আসিয়া কুকুরের মুখ হইতে সেই সকল জিলিপি কাড়িয়া লইয়া খাইতে লাগিল; একটি ছোট মেয়ে একখানি জিলিপি কুড়াইয়া লইয়া তাহার এক একটু ভাঙ্গিয়া খাইতেছে, এমন সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক একটি বালক তাহার হাত হইতে জিলিপি কাড়িয়া লইয়া একেবারে মুখে পুরিয়া দিল। মেয়েটি সমস্ত দিন বোধ হয় কিছু খাইতে পায় নাই, সে মাটিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বালানাং রোদনং বলং। বালিকাকে কেহ তুলিল না। এ দিকে গুজরাতি মহাশয় মনুষ্য কর্ত্তৃক জিলিপির এই প্রকার অপব্যবহার হইতে দেখিয়া ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে এক জন সঙ্গীর সহিত মোটা লাঠি হস্তে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও লোকগুলাকে নির্দ্দয়ভাবে মারিয়া সেখান হইতে দূর করিয়া দিলেন! কুকুরগুলি তখন নিশ্চিন্তভাবে জিলিপি ভক্ষণ করিতে লাগিল। পশুপ্রীতির এই পরাকাষ্ঠায় গুজরাতি সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অদূরে একটা বাড়ীতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ আলোকিত, লতাপত্রে ও পুষ্পমাল্যে প্রত্যেক স্তম্ভ সুসজ্জিত। পথের উপর

সারি বাঁধিয়া গুজরাতি পুরাঙ্গনাগণ আহারে বসিয়াছে। মহাকলরবে তাহাদিগকে লাড্ডু ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হইতেছে; কুকুরের দল তাহাদের ভোজ্য দ্রব্যের উপর আক্রমণ না করে, এ জন্য কয়েক জন গুজরাতি লাঠি হস্তে পথ রক্ষা করিতেছে। আমরা অতি কুণ্ঠিতচিত্তে সেই ভোজনোপবিষ্টা গুজরাতি রমণীগণের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। শুনিলাম, রাজপথ ভিন্ন গৃহে ইহাদের আহার হয় না, উৎসবাদি উপলক্ষে রাজপথই ভোজনক্রিয়ার অতি প্রশস্ত স্থান! পশ্চিম ভারতে এমন কত অদ্ভুত প্রথা আছে, কে বলিবে?

অল্পক্ষণ পরেই আমরা নৃসিংহ দেবের মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভয়ানক ভিড়। পুরুষ ও রমণী,—মারাঠা গুজরাতি নর নারী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে মন্দিরপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিবার সেই একমাত্র দ্বার।

প্রস্তরবদ্ধ মন্দিরপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভয়ানক জনতা, কিন্তু সকলেই স্থিরভাবে নরসিংহ মূর্ত্তির দিকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া আছে। নরসিংহ পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। পিত্তলময় মূর্ত্তি, তাহার উপর ঘৃতের প্রদীপের মৃদু রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। আরতির বাজনা বাজিতেছে, করতালের শব্দ হইতেছে, আর পূজারীগণ সমস্বরে ভজন গাহিতেছে—অনেক ভক্ত সেই গানে যোগদান করিতেছে। অনেকে ঘৃতের প্রদীপের উপর উভয় হাত স্থাপন করিয়া উত্তপ্ত হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত করিতেছে, অবশেষে বক্ষে কর্ণে ও ললাটে যুগ্ম কর স্থাপন পূর্ব্বক দেবতার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছে। রমণীগণ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তাহাদের কৌতুকতরল চক্ষে দীপরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে। কোন যুবক যুবতী প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটু অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া আলাপ করিতেছে, কে জানে কি আলাপ? গুর্জ্জরের অনেক দেবমন্দিরেই ভগবান অনঙ্গদেব তাঁহার শরাসন উদ্যত রাখেন, এরূপ শুনিয়াছি।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর আরতি শেষ হইয়া গেল। পুরুষ ও রমণীগণ দলে দলে মন্দিরপ্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিতে লাগিল। আমরা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। বন্ধু বলিলেন, একটা গুপ্ত পথ দিয়া বাহির হওয়া যাক। অবিলম্বে আমরা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা

যায় না, দুই দিকে উচ্চ প্রাচীর, মধ্যে সুঁড়ি পথ, দুই জন লোক পাশাপাশি সে পথে চলিতে পারে না। শত শত পুরুষ ও রমণী পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সেই পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে; কেহ হাসিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কোন যুবক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অন্ধকারে কোন যুবতীর উপর আসিয়া পড়িতেছে, পরিহাস ক্রমে ট্রাজিডীতে পরিণত হইতেছে।

পাঁচ সাত মিনিট পরে আমরা সেই গুহাপথ হইতে দীপালোকিত মুক্ত রাজপথে আসিয়া পড়িলাম। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। পথে জনকোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। পারসী শৌণ্ডিকালয়ে পিশাচের মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। 'চানাচুরের' দোকানে অতিরিক্ত জনতা। গোয়ানিজগণ লম্বা লম্বা লাঠি হাতে লইয়া দুর্বোধ্য ভাষায় আলাপ করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে গম্য স্থানে ধাবিত হইয়াছে। তাহাদের চরণে চটি জুতা, দেহে তালিবিশিষ্ট বিবর্ণ প্যাণ্ট ও কোট, মাথায় মলিন নাইট-ক্যাপ, মুখে পাইপ।

সহরের প্রান্তবর্ত্তী চন্দ্রালোকিত পথ দিয়া আমরা প্রান্তর-প্রান্তবর্ত্তী নির্জ্জন আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। তখন বোধ হইতে লাগিল, দিবসের উত্তাপ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত নগর ধীরে ধীরে সুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে। তরুরাজি চন্দ্রকিরণে পরিপ্লুত হইয়া স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান, কেবল দুই একটা নিশাচর পক্ষীর কর্কশ চীৎকারে প্রকৃতির সেই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ হইতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আলোক—দৃশ্য ও অদৃশ্য।

২

রঙ্গটেনের অদৃশ্য-কিরণ সাধারণ অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া যায়। ইহার প্রভাবে দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল (phosphorescent and flourescent) পদার্থ সকল অন্ধকারে দীপ্তিমান হইয়া উঠে, এবং ইহার দ্বারা ফোটোগ্রাফের জন্য প্রস্তুত কাচ-ফলকে ছবি উঠান যায়।

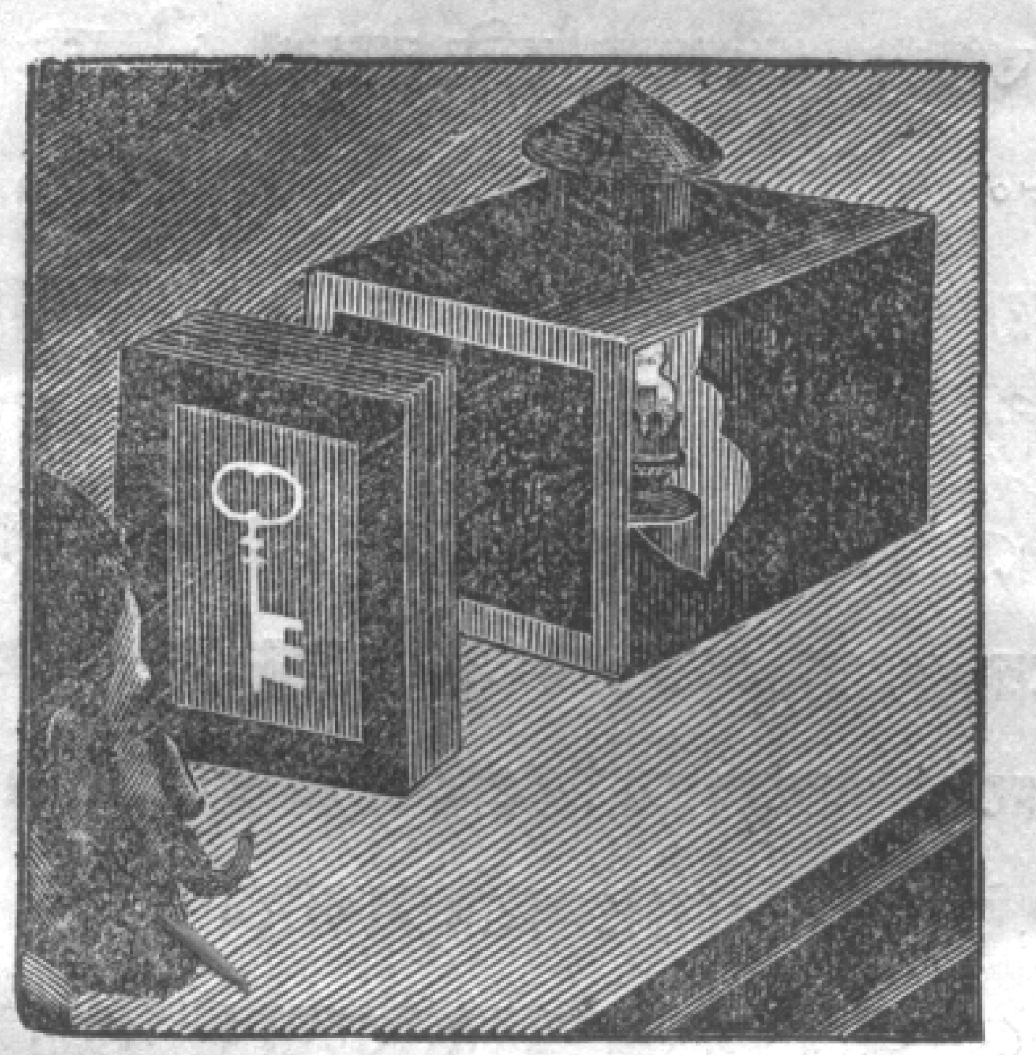
রঙ্গটেন কিরণ তাড়িতপ্রবাহ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। তাহাও কেবল নিঃশেষিতবায়ু কাচগোলক বা ক্রূকস্ নলের অভ্যন্তরেই হয়। বায়ুশূন্য

কাচগোলকের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহসঞ্চালনজনিত অদৃশ্য কিরণ ব্যতীত আরও কোন প্রকার কিরণ আছে কি—যাহা অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে ও ফোটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠাইতে পারে ?

১৮৯৬ খৃঃ ফরাসী পণ্ডিত হেনরি বেকুইরেল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, নাইট্রেট অব ইউরানিল এবং ফ্লুরাইড অব ইউরেনিয়াম ও আমোনিয়াম প্রভৃতি ইউরেনিয়াম-ধাতুঘটিত কতিপয় লবণ, আলোকেই হউক বা অন্ধকারেই হউক, সর্ব্বত্র একপ্রকার অদৃশ্য কিরণ বিকীরণ করে; তাহা অস্বচ্ছ আলুমিনিয়াম ধাতুপত্র ভেদ করিয়া ফোটোগ্রাফের কাচফলকে কিরণপথবর্ত্তী অন্যান্য ধাতুদ্রব্যের ছায়া-ছবি উঠাইতে পারে। বাল্‌মেনস্ লুমিনাস পেণ্ট বা সলফাইড অব ক্যাল্‌সিয়াম যেরূপ সূর্য্যকিরণপাতের পর বহুঘটিকা পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান থাকিয়া আলোক বিকীরণ করে, তদ্রূপ ইউরেনিয়াম লবণও বহু দিবস, এমন কি, বহু মাস পর্য্যন্ত এক প্রকার অদৃশ্য কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে। ইহাকে অতি-উদ্দীপনা (hyper phosphorescence) বলে। লুমিনাস্ পেণ্ট একবার উজ্জ্বল হইবার কয়েক দিবস পরেই নিভিয়া যায়; তখন তাহা হইতে আর কোন প্রকার দৃশ্য কিরণ বাহির হয় না। তথাপি তাহা হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এক প্রকার অদৃশ্য-কিরণ বাহির হইতে থাকে। এমন কি, ছয় মাস পরেও সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে ইহার সম্মুখস্থ ফোটোগ্রাফের কাচফলক সেই অদৃশ্য কিরণ-পাত জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এইরূপ অনেক দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল পদার্থ আছে, যাহাদের দৃশ্যদীপ্তি অপেক্ষা অদৃশ্যদীপ্তি বহুকালস্থায়িনী হয়।

যেমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের উপর সূর্য্যালোক বা তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক পড়িলে দীপ্তিমান হইয়া উঠে ও দৃশ্য-কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে, সেইরূপ অনেক দ্রব্য আছে, যাহারা সেরূপ দীপ্তিমান হইয়া না উঠিলেও অদৃশ্য-কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে। ইহাদের অদৃশ্যদীপ্তি চক্ষুর অগোচর হইলেও ফটোগ্রাফের কাচফলকের নিকট ধরা পড়ে। ইউ-রেনিয়াম ধাতুঘটিত লবণ দুই প্রকার আছে। এক প্রকারকে ইউরানিক্ সল্টস্ (uranic salts) ও অপর প্রকারকে ইউরেনাস্ সল্টস্ (uranous salts) বলা যায়। ইউরানিক সল্টসএর ন্যায় ইউরেনাস সল্টস্ দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল নহে, অর্থাৎ আলোক লাগিলে ইহারা জ্যোতিষ্মান হয় না। তথাপি ইহাদের দ্বারা ফোটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠান যায়।

স্মাগ্‌নাক্, বেক্কুইরেল, নিওয়েনগ্রাউস্কি, হেনরি ও টুষ্ট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সকল অদৃশ্য কিরণের নিকট জল, মোম ও গন্ধক স্বচ্ছ। আলুমিনিয়ম অপেক্ষা রাং অধিকতর অস্বচ্ছ, তদপেক্ষা কাচ ও কোবল্ট ধাতু অস্বচ্ছ। তাম্র ও প্লাটিনাম্ খুব স্বচ্ছ, রৌপ্য ও দস্তার পাতের ভিতর দিয়াও কিরণ যাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা পাৎলা সীসের পাতের ভিতর দিয়া একেবারেই যাইতে পারে না। রঙ্গটেন অদৃশ্যকিরণ অপেক্ষা এই সকল অদৃশ্যকিরণ অবাধে ধাতুদ্রব্য ভেদ করিয়া যায়। রঙ্গটেনের অদৃশ্য কিরণ পড়িলে ইলেকট্রোস্কোপ্ বা তাড়িত-দর্শক যন্ত্রের তাড়িতভার অপসৃত হয়। কিন্তু তাড়িত-দর্শক যন্ত্রটি যদি তাম্র বা প্লাটিনামপাতনির্ম্মিত যবনিকার অন্তরালে রাখা যায়, তবে সে যবনিকা ভেদ করিয়া রঙ্গটেন কিরণ যাইতে পারে না। কিন্তু সেরূপ যবনিকার অন্তরালে থাকিলেও, বেক্কুইরেলের অদৃশ্য কিরণ তাহা ভেদ করিয়া তাড়িত-দর্শক যন্ত্রের তাড়িতভারের অপসরণ করিয়া দেয়। দৃশ্যকিরণের ন্যায় বেক্কুইরেলের অদৃশ্য-কিরণ সমতল দর্পণ দ্বারা পরাবর্ত্তিত ও পুটাকার দর্পণ দ্বারা কেন্দ্রীভূত করা যায়। ত্রিপার্শ্ব কাচ দ্বারা বক্রীভূতও করা যায়।



অন্য সকল পদার্থ অপেক্ষা ইউরেনিয়াম ধাতু অতি সহজে এই অদৃশ্য কিরণ বিকীরণ করে। সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও বহু মাস ধরিয়া অদৃশ্য রশ্মি উদ্বমন করিতে থাকে। ইউরেনিয়াম কিরণ যে বর্ণচ্ছত্রের বেগুনের পর অতি দূরস্থিত একপ্রকার কিরণমাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক সিল্‌ভেনাস্ টম্‌সন্ দেখিয়াছেন যে, ফস্‌ফরসের নিষ্প্রভ আলোকের সহিত এক প্রকার অদৃশ্য আলোকও বাহির হয়, যাহা কাল কাগজ ও সেলুলইড ভেদ করিয়া যায়, কিন্তু আলুমনিয়াম ধাতুপাত ভেদ করিতে পারে না। বাইসল্‌ফাইড্ অব কার্ব্বন্ জ্বলিলেও তাহা হইতে ঐরূপ অদৃশ্য কিরণ বাহির হয়।

জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপক ডাক্তার মারুকা

জোনাকী পোকার আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা কার্ড বা তাম্রপাত ভেদ করিয়া ফোটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠাইতে পারে। তিনি একটি অগভীর বাক্সের মধ্যে এক হাজার জোনাকি পোকা পুরিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহাদের অণু সকল সূর্য্যালোক বা অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের তরঙ্গাভিঘাতে দীপ্তিমান হইয়া উঠে, এবং উত্তেজক রশ্মির প্রভাব হইতে সরাইয়া লইলেও সেই সকল পদার্থ আপন আপন প্রকৃতিভেদে অল্পাধিক কাল পর্য্যন্ত উজ্জ্বল থাকে। এই সকল পদার্থকে দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল (phosphorescent and flourescent) পদার্থ বলা যায়।

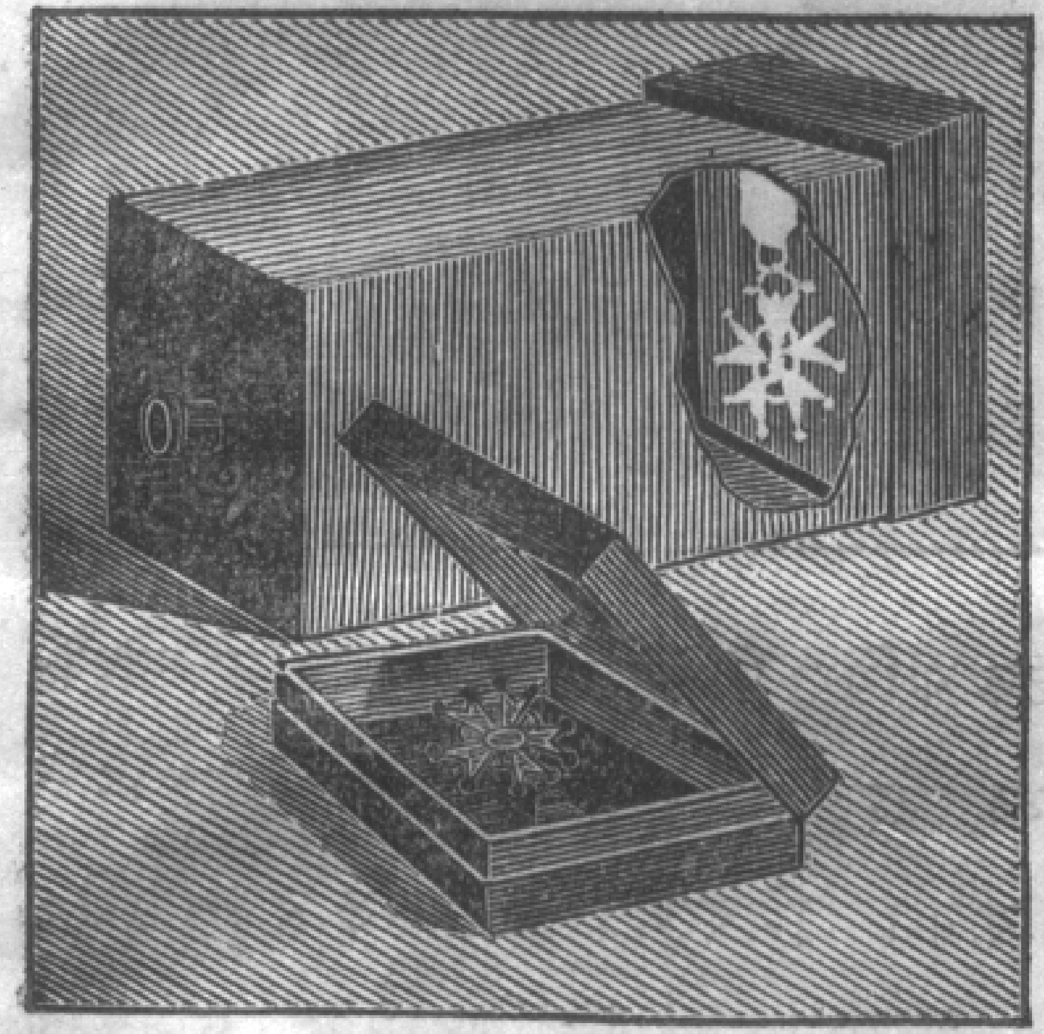
অধ্যাপক বেক্কুইরেল ও ডিওয়ার এতৎসম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, জ্যোতিষ্মান সল্‌ফাইড্ অব ক্যাল্‌সিয়ামকে উত্তপ্ত করিলে, উত্তাপবৃদ্ধির সহিত তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। শীতল করিলে উজ্জ্বলতার হ্রাস হয়, এবং ৮০° ডিগ্রিতে একেবারে নিভিয়া যায়। যদিও—৮০° ডিগ্রিতে উদ্দীপিত সল্‌ফাইডের আলোক উদ্গীরণ করিবার ক্ষমতা থাকে না, তথাপি—৮০° ডিগ্রিস্থিত অনুদ্দীপ্ত সল্‌ফাইডে একবার সূর্য্যালোক পড়িলে, সেই আলোক শোষণ করিয়া তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবার ক্ষমতা থাকে। কারণ, পরে অন্ধকারে তাহাকে গরম করিলে জ্যোতিষ্মান হইয়া আলোক উদ্গীরণ করে। পূর্ব্বে কোনও প্রকার উত্তেজক রশ্মিপাত হয় নাই, এরূপ সল্‌ফাইডকে উত্তপ্ত করিলে জ্যোতিষ্মান হয় না।

অধ্যাপক ডিওয়ার দেখিয়াছেন যে, প্রায় সকল পদার্থই অতি শীতল অবস্থায় উদ্দীপনশীল হয়। বৈদ্যুতিক আলোকের কিরণপাত দ্বারা উত্তেজিত করিলে ১৮০° ডিগ্রি শৈত্যে জিলাটিন বা শিরিশ, গজদন্ত, শৃঙ্গ, রবর, প্যারাফিন্ প্রভৃতি বিলক্ষণ উজ্জ্বল হইয়া নীল বা সবুজ আলোক বিকীরণ করে। আবার যে সকল পদার্থের দীপ্তিমত্তা ক্ষণস্থায়িনী, তাহারা অতি শৈত্যে বহুকাল কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে।

সুরা-সার, গ্লিসরিন, সল্‌ফুরিক্ ও নাইট্রিক্ এসিড্ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে ও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে।—১৮০° ডিগ্রিতে উত্তেজিত করিলে এসিটিফিনোন্, বেন্‌জোফিনোন্, ইউরিয়া, স্যালিসিলিক্ এসিড্ ও গ্লাইকোজেন প্রভৃতি অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত হয়। ডিম্ব ও পাখীর পালক

অন্ধকার ঘরে উজ্জ্বল নীল আভা বিস্তার করিয়া অতি সুন্দর দেখায়। তুলা, পশম, কাগজ, চর্ম্ম, কাছিমের খোলা ও স্পঞ্জ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ সকল অতি শৈত্যাবস্থায় কিরণাভিঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

ফরাসী পণ্ডিত গাষ্টাভ্ লিবঁ দেখিয়াছেন, এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, সূর্য্যালোক লাগিলে তাহা অত্যল্পকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আবার সূর্য্যালোকে ঐরূপ অদৃশ্য কিরণ আছে, যাহা অন্য কিরণ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া সেই উজ্জ্বলীকৃত পদার্থের উপর পাতিত করিলে সেই পদার্থের উজ্জ্বলতা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

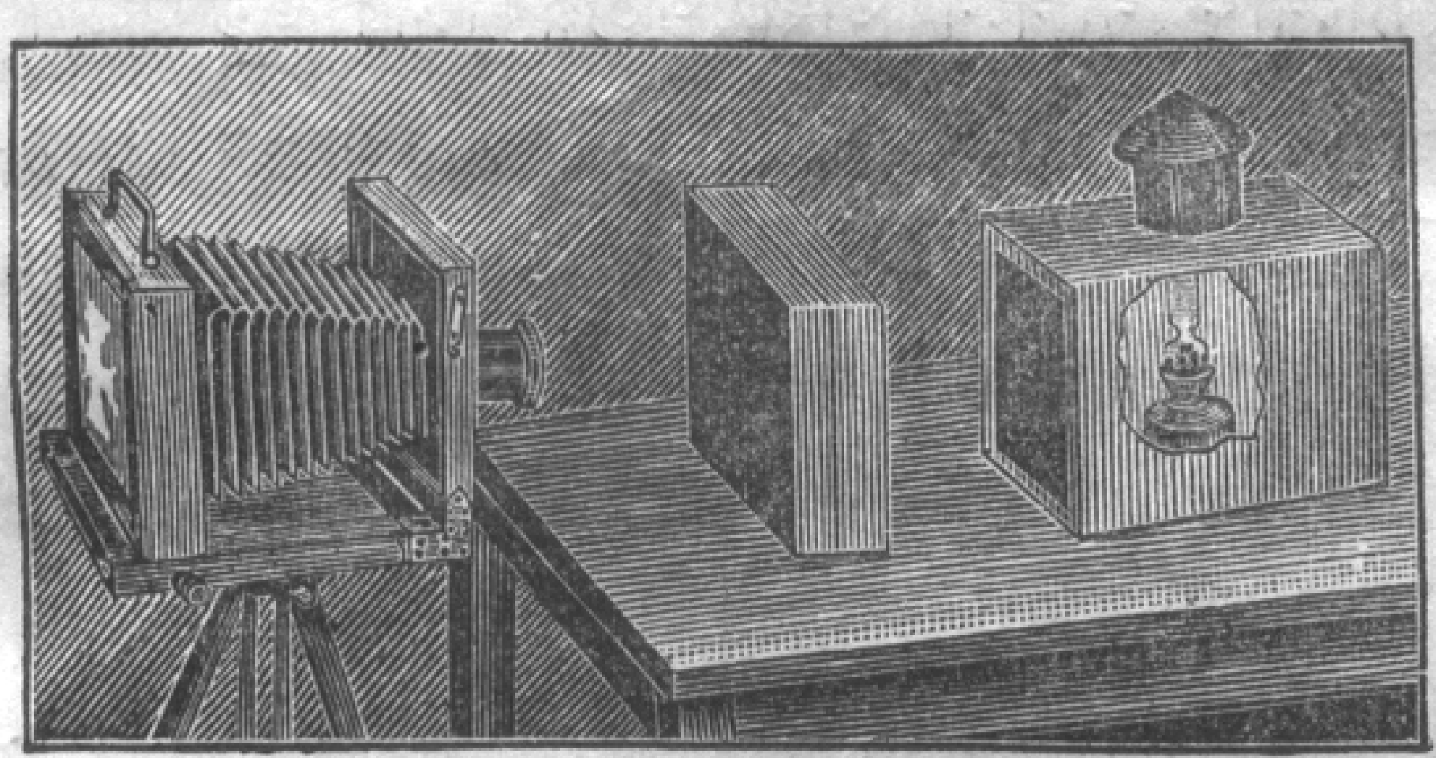


অধ্যাপক ডার্সনভ্যাল্ (D'arsonval) ১৮৯৯ খৃঃ ফ্রেঞ্চ একাডেমি অব সায়ান্সেস্ নামক বিজ্ঞানসভায় লিবনের এই আবিষ্কারের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং লিবনের পরীক্ষিত ব্যাপার উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে প্রদর্শিত করেন।

লিবঁ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্য, এমন কি, সাধারণ কেরোসিন বা অন্য যে কোন ল্যাম্পের আলোক হইতে দৃশ্য কিরণের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অদৃশ্য কিরণও বাহির হইতে থাকে। এই অদৃশ্য কিরণ পাৎলা কাঠের তক্তা কাল পুরু কার্ডবোর্ড ভেদ করিয়া যাইতে পারে। লিবঁ ইহার নাম রাখিয়াছেন Black Light বা কৃষ্ণ আলোক।

তাঁহার আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থ একখণ্ড পুরু কার্ডবোর্ডে মাখাইয়া লইয়া সূর্য্যালোকে জ্যোতিষ্মান (phosphorescent) হইয়া উঠে। এইরূপ উদ্দীপিত অবস্থায় সেটা একটা অগভীর কার্ডবোর্ডের বাক্সের উপর রাখিয়া বাক্সের বিপরীত দিক ল্যাম্পের দিকে ধরিলেন। এই লাম্পটিও কৃষ্ণবর্ণের পুরু কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতর রুদ্ধ ছিল। তন্মধ্য হইতে বাহিরে কিছুমাত্র আলো নির্গত হইতেছিল না। এইরূপ রুদ্ধ ল্যাম্পের দিকে সেই বাক্সটা ফিরাইবামাত্র তদুপরিস্থিত রাসায়নিক পদার্থ মাখান উজ্জ্বল কাগজখণ্ডের প্রায় সমস্ত অংশই নিষ্প্রভ হইয়া গেল, কেবলমাত্র সেই বাক্সের অভ্যন্তরে

স্থাপিত একটি লোহার চাবির অবিকল আকৃতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত রহিল (১নং চিত্র দেখ)। এ ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য, এবং রঙ্গটেন রশ্মি দ্বারা দীপনক যবনিকায় যেরূপ ছায়াছবি দেখা যায়, ইহা তদনুরূপ হইলেও, ঠিক তাহার বিপরীত। রঙ্গটেন রশ্মির প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থ মাখান যবনিকা



উজ্জ্বল হইয়া উঠে; যে সকল পদার্থ ভেদ করিয়া রশ্মি যাইতে পারে না, তাহাদের ছায়াস্থান উজ্জ্বল হইতে পারে না, সুতরাং উজ্জ্বল ক্ষেত্রের উপর সেই সকল পদার্থের কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি দেখা যায়। লিবনের পরীক্ষিত ব্যাপারটিও ঠিক সেইরূপ। উদ্দীপিত যবনিকার উপর "কৃষ্ণ আলো" পড়িবামাত্র যবনিকার উজ্জ্বলতা চলিয়া গেল। কেবল যে পদার্থ ভেদ করিয়া সেই "কৃষ্ণ আলোক" রশ্মি আসিতে পারিল না, তাহারই ছায়াস্থান উজ্জ্বল রহিল। রঙ্গটেন রশ্মিতে অনুজ্জ্বল রাসায়নিক যবনিকা উজ্জ্বল হয়, লিবনের রশ্মিতে উজ্জ্বলীকৃত রাসায়নিক যবনিকা দীপ্তিহীন হইয়া যায়। রঙ্গটেন রশ্মির বেলায় অনুজ্জ্বল যবনিকার ছায়াস্থান অনুজ্জ্বলই থাকে। লিবনের রশ্মির বেলায় উজ্জ্বল যবনিকার ছায়াস্থল উজ্জ্বলই থাকে।

লিবনের রশ্মি ক্যামেরা যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া পদার্থ সকলের ছায়া-ছবি উঠান যায় (৩নং চিত্র দেখ)। লিবনের উদ্দীপনশীল রাসায়নিক পদার্থের দীপ্তিমত্তা অতি ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই সকল চমৎকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিশেষ সাবধানতাপূর্ব্বক খুব শীঘ্র দেখিয়া লইতে হয়। অন্ধকার ঘরেই এই সকল পরীক্ষা দেখিবার সুবিধা। লিবঁ দিবালোকে ঘরের মধ্যে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য এক যন্ত্র তৈয়ার করিয়া লইয়াছিলেন। একটা কাল কার্ডবোর্ডের বাক্সের এক ধারের প্রাচীর কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে তাঁহার রাসায়নিক পদার্থ মাখান যবনিকা বসাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। তাহারই সম্মুখে বাক্সের অপর দিকে একটা ছিদ্র করিয়া

লইলেন। যবনিকাটিতে ক্ষণকাল সূর্য্যালোক বা তাড়িতালোক পাতিত করিয়া উদ্দীপিত করিয়া বাক্সের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করিতে হইবে।

এখন কোন কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে মুদ্রা মেডেল প্রভৃতি দ্রব্য রাখিয়া সেই বাক্সটা এই যন্ত্রের যবনিকার পার্শ্বে রাখিয়া কোন ল্যাম্পের দিকে ফিরাইলে, যন্ত্রের ছিদ্রপথ দিয়া যবনিকার উপর সেই বাক্সস্থিত মুদ্রা বা মেডেলের উজ্জ্বল ছায়া দৃষ্ট হইবে (২নং চিত্র দেখ)।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির।

কি রাজত্বগৌরবে, কি রাজ্যপরিসরে, কি রাজত্বকালবিস্তারে—জগতের নৃপতিমণ্ডলে ভিক্টোরিয়ার সমকক্ষ দুর্লভ। যিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া বিশাল বৃটিশসাম্রাজ্যের মহিমাচ্ছটাসমাচ্ছন্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তিনি আর ইহজগতে নাই। বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে রাজবিয়োগে আর্ত্তরব উত্থিত হইয়াছে। কোন কোন ইংরাজ বলেন, ভারতবর্ষ বৃটিশ মুকুটের মধ্যমণি। সিপাহীবিদ্রোহের পর সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং ভারতশাসনভার লইবার পর হইতে ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার সিংহাসনচ্ছায়ায়—দেশীয় বহু ভাষার পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে, সংবাদপত্র সবল হইয়াছে, ইংরাজীশিক্ষার বিস্তারফলে জনগণের মধ্যে নূতন আশা ও নূতন আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে। ইংলণ্ডে নৃপতির ক্ষমতা সামান্য—প্রজাই প্রবল। ইংলণ্ডে রাজা ক্ষমতাবলে প্রকৃতিরঞ্জন করিতে পারেন না, ব্যবহারগুণে পারেন। সাগরপারবাসিনী সাম্রাজ্ঞীর সহিত ভারতবর্ষের দীন প্রজার সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্পর্ক কতটুকু ছিল? তথাপি আজ তাঁহার মরণে ভারতবাসী যে দুঃখ জানাইতেছে, তাহা আন্তরিকতাশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। সাম্রাজ্ঞী ব্যবহারগুণে প্রকৃতিপুঞ্জকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন ইংরাজগণ জীবনের পরিবর্ত্তে জীবনগ্রহণ আবশ্যক ও সঙ্গত, এই নীতির অবলম্বন করিয়া পিশাচমূর্ত্তি প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন সাম্রাজ্ঞী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নির্ম্মমতার অঙ্কুর বিনষ্ট করিয়া দয়ার প্রস্রবণ উৎসারিত করেন; স্নেহৌষধে অসুস্থ হৃদয় সুস্থ করেন। তিনি যে ঘোষণাপত্রের প্রচার করেন,তাহাই ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি—তাহাদের রাজদত্ত অধিকারতালিকা। সেই ঘোষণাপত্রে ভারতবাসী প্রজাগণের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,—"তাহাদের

শ্রীবৃদ্ধিই আমাদের শক্তি ; তাহাদের সন্তোষেই আমাদের আপদাভাব ; তাহাদের কৃতজ্ঞতাতেই আমাদের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার।"

সুদূর সাগরপারে তরুণ-কর্ম্মচারীর হস্তে, অব্যবস্থিতচিত্ত প্রতিনিধির ব্যবহারে, অজ্ঞতা-প্রণোদিত বিধিব্যবস্থায়—এই মহতী বাণীর অবমাননা হইয়াছে কি না, সে বিচারের সময় এ নহে। যে সাম্রাজ্ঞীর শ্রীমুখে এই অভয়বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক। তাই চিরাচরিত রাজভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, সাম্রাজ্ঞী ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসীর ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্ঞীর স্মৃতিচিহ্নসংস্থাপনের প্রস্তাব উঠিয়াছে। রাজপ্রতিনিধি বলিয়াছেন, ইহাতে যে কেবল সাম্রাজ্ঞীর প্রতি ভক্তিই প্রদর্শিত হইবে, এমন নহে; তাঁহার রাজত্ব-কালে সৃষ্ট সাম্রাজ্যিক একতার কথাও জগতে প্রতিপন্ন হইবে। এই স্মৃতিচিহ্ন কি হইবে, তাহা স্থির হইবার পূর্ব্বেই দেশীয় রাজন্যবর্গ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কোন কোন পত্রে প্রকাশ, দরিদ্র ভারতে দশ বিশ লক্ষ মুদ্রা বড় সুলভ নহে, কেবল ইংরাজ রাজের অসন্তোষভয়েই রাজন্যবর্গ প্রজার মুখ না চাহিয়া এত টাকা দিতে চাহিতেছেন। ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কে করিবে?

এখন স্থির হইয়াছে যে, সংগৃহীত অর্থে একটি স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আলোকচ্ছুরিত প্রাসাদমালিনী কলিকাতা নগরীর প্রাসাদমাল্যে একটি মধ্যমণি গ্রথিত হইবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥"

তেমনই কলিকাতার প্রাসাদপুঞ্জের মধ্যে এই স্মৃতিমন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা-নয়নরঞ্জন হইবে। বীচিবিক্ষোভচঞ্চলা ভাগীরথীর কূলপ্রান্তে প্রাচ্যদেশসম্ভব নীলাম্বরতলে, গড়ের মাঠের হরিৎ বক্ষে যে উপবনসম্পন্ন শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত স্মৃতিমন্দির শোভা পাইবে, রাজপ্রতিনিধি এমন আভাষও দিয়াছেন।

"কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?"

ইহার পর যদি আরও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে কোন দয়াব্যঞ্জক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে; সম্ভবতঃ ভারতের প্রজানাশে মত্ত, লোলজিহ্ব দুর্ভিক্ষের আক্রমণনিবারণে ব্যয়িত হইবে। সংপ্রতি জয়পুরের মহারাজা, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাকল্পে ষোল লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, হয় ত উদ্বৃত্ত অর্থে সেই ভাণ্ডার পুষ্ট হইবে। তবে সে কথার মীমাংসা এখন হয় নাই। কত টাকা উঠিবে, কত ব্যয়িত হইবে—এখনও সবই অনিশ্চিতের অন্ধগর্ভে। যত টাকার সংগ্রহ হয়, তাহাই বুঝিয়া ব্যবস্থা হইবে। "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে!"

এই স্মৃতিমন্দিরে যে সকল দ্রব্যাদি রক্ষিত হইবে, তাহাতে মন্দিরের গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে—

"বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে।"

এই স্মৃতিমন্দিরে কিরূপ দ্রব্য রক্ষিত হইবে, সে সম্বন্ধে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ—রাজপ্রতিনিধির শ্রমশীলতা ও লিপিকুশলতার পরিচায়ক। প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের বাহুল্যেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,এই স্মৃতিমন্দিরসংস্থাপনের প্রস্তাব এক দিনে স্থির হয় নাই। রাজপ্রতিনিধি বহুদিন সংবাদ লইয়া এইরূপ অনুষ্ঠানের কল্পনা করিতেছিলেন। সাম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে তাহা তদীয় স্মৃতিমন্দিরে পরিণত করিতেছেন।

কারিগরী বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে রাজপ্রতিনিধি বলেন, সে কায গভর্মেণ্টের ও সমাজের। বিশেষতঃ, তাহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধ কি?

এই স্মৃতিমন্দির মিউজিয়মে পরিণত হইবে না। ইহার একাংশে অবশ্য ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধীয় দ্রব্যসম্ভার রক্ষিত হইবে। তাঁহার পাষাণপ্রতিমা সম্ভবতঃ গৃহপ্রাঙ্গণে স্থাপিত হইবে। মধ্যকক্ষে একখানি আলেখ্য স্থাপিত হইতে পারে। তাহার চারি দিকে তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি থাকিবে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধিদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল সংগৃহীত হইতে পারে। তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও কিছু কিছু হয় ত পাওয়া যাইবে। কক্ষপ্রাচীরে স্বর্ণাক্ষরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র লিখিত হইতে পারে। মূল ইংরাজী ও দেশীয় নানা ভাষায় অনুবাদ অঙ্কিত হইতে পারে। সময়ে সময়ে সাম্রাজ্ঞী ভারতবাসীদিগকে যে সকল বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন, সে সকলও গৃহপ্রাচীরে লিখিলে হয়। মূল পত্রাদি পাওয়া যায় ভালই—সে সকল কাচের আবরণমধ্যে রক্ষিত হইবে। অশোকের বার্ত্তা দ্বিসহস্রাধিকবর্ষ অবিনষ্ট রহিয়াছে, ভিক্টোরিয়ার বার্ত্তাই বা অবিনশ্বর হইবে না কেন?

একটি গৃহে মধ্য আসিয়া হইতে আর্য্যদিগের অভিযানকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কালের উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির রক্ষণ অসম্ভব। প্রত্নাগারই প্রাচীন কালের দ্রব্যাদির উপযুক্ত স্থান। ভিক্টোরিয়া হলের জন্য মোগলদিগের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত সময়ের দ্রব্যাদি রক্ষিত হইবে। এই সময়ের প্রত্যেক রাজবংশের ও প্রত্যেক যুগের স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ অসম্ভব হইবে না। চিত্র, এনামেল চিত্র, ভাস্কর্য্য, পুস্তক—এ সকল পাওয়া যাইতে পারে। অল্প দিন পূর্ব্বে নাকি আকবরের শিরস্ত্রাণ ও জাহাঙ্গীরের বর্ম্ম বিক্রীত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে—শিবাজীর চিত্র ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ নেতৃগণের আলেখ্য সংগৃহীত হইবে। শিখদলের নানক হইতে গুরুগোবিন্দ পর্য্যন্ত গুরুদের, রণজিৎ প্রভৃতির চিত্রের সংগ্রহ হইবে। রাজপুতানায় রাণা প্রতাপের, মানসিংহের, জয়সিংহের ও যশোবন্তসিংহের স্মৃতিচিহ্ন আনীত হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সকল বীর বা বীরনারী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নও রক্ষণীয়। ঝান্সীর রাণীর, হায়দর আলীর ও টিপুর স্মৃতি সম্মানের যোগ্য। কিন্তু যাহারা ক্রূরকর্ম্মে কলুষিত, তাহাদের স্থানদান করা অসম্ভব। নানা সাহেবের পাগড়ীর পাড়ও রক্ষিত হইবে না।

মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে টিপুর মৃত্যুর একখানি সুন্দর চিত্র আছে। ভারতে বরেণ্য ধর্ম্মগুরু, কবি, শাসনকর্ত্তা প্রভৃতির অভাব নাই। চৈতন্য, আলীবর্দ্দী খাঁ, রামমোহন, কেশব, কৃষ্ণচন্দ্র, সৈয়দ আহাম্মদ, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির স্মৃতি রক্ষণীয়। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নবাবনাজিমদিগের ও অযোধ্যার প্রসিদ্ধ তালুকদারগণের স্মৃতিও রক্ষার যোগ্য।

ভারতের বৃটিশসম্পর্কিত ইতিহাসে বহু ব্যক্তির গৌরবগর্ব্বোজ্জ্বল নামের উল্লেখ করা যায়। ইহাঁদের স্মৃতিচিহ্নও সযত্নে সংরক্ষিত হইবে।

স্মৃতিমন্দিরের একাংশে ভাস্করকীর্ত্তি রক্ষিত হইবে। অনেক পূর্ণমূর্ত্তি, আবক্ষমূর্ত্তি ইত্যাদি সহজেই পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতেও সকলের ভাগ্যে গড়ের মাঠে বহুব্যয়সাধ্য বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তিলাভ ঘটিবে না। তাঁহাদিগের মূর্ত্তি এই স্মৃতিমন্দিরে রক্ষিত হইবে। মন্দিরের আর এক অংশে নানাবিধ চিত্র রক্ষিত হইবে।

গৃহপ্রাচীরে স্মরণীয় ঘটনার চিত্রসংস্থাপনের প্রস্তাবও উঠিয়াছে। অজন্তার গুহায়, ফতেপুর শিকরীর প্রাসাদপ্রাচীরে, আগ্রা ও দিল্লীর রাজভবনে, টিপুর নিদাঘগৃহে চিত্র দেখিয়া ভারতের শিল্পীর ক্ষমতায় আশ্চর্য্য হইতে হয়। সে শিল্প লুপ্ত হয় নাই, এবং সঞ্জীবিত হইতেছে। পলাশী প্রভৃতির যুদ্ধের, রাণী পদ্মিনীর চিতারোহণের, রাঠোর-রাণীর রণপরাজিত গৃহাগত পতির পক্ষে পুরদ্বার রুদ্ধ করিবার, জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরাজ দূতের,—এমন কত বিষয়ের চিত্র চিত্রিত হইতে পারে। যদি বর্ণ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে, অন্যবিধ চিত্র সংস্থাপিত হইতে পারে। মন্দিরের এই সকল অংশে কাচাবরণমধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের পত্রাদিও রক্ষিত হইতে পারে। সন্ধিপত্র সনন্দ প্রভৃতিও রক্ষার যোগ্য। এলিজাবেথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনন্দ দেন, তাহা নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় চার্লসের অনুমতিলিপি আজও বর্ত্তমান। মূল না পাইলে নকল রক্ষিত হইবে। বৃটিশ মিউজিয়মে ম্যাগনাচার্টার যে লিপি রক্ষিত আছে, তাহা মূল নহে। মূল বিনষ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিলিপিও অন্যত্র অগ্নিরোধী লৌহসিন্দুকে রক্ষিত। প্রাচীন পুঁথিও সংগ্রহণীয়।

পুঁথির পর মানচিত্র। মানচিত্রসংগ্রহ দুরূহ ব্যাপার নহে। সংবাদপত্রও সংগ্রহযোগ্য। সম্পূর্ণ সংগ্রহ মিউজিয়মের কর্ত্তব্য; এখানে বাছাই করিয়া রাখা হইবে। মুদ্রারও সংগ্রহ হইবে। যত প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়, সবই রক্ষিত হইবে। অতি প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মুদ্রার সংগ্রহ ঐতিহাসিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। এ দেশে সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। স্মৃতিমন্দিরে বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত হইবে। পোর্সিলেনের দ্রব্যও উপেক্ষিত হইবে না।

দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্যের ইতিহাস, তাঁহাদের রাজসভার সম্পদসৌন্দর্য্য, তাঁহাদের কীর্ত্তি—দেশীয়রাজ্যে গমন করিলে বুঝা যায়। এই মন্দিরে তাঁহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অংশ থাকিবে। তাঁহারা অস্ত্র, বর্ম্ম, অশ্বসজ্জা প্রভৃতি দিতে পারেন। দান না করিলে ঋণ দিতে পারেন। নির্দ্ধারিত কালের পর সে সকল ন্যাস প্রত্যর্পিত হইবে। এ দেশে ইংরাজের রণসজ্জার সকল সংগ্রাম যে সহজেই সংগৃহীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। তরবারি, বন্দুক, কামান, সকলের ছাঁচই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাদের সকল রূপই সকলিত ও রক্ষিত হইবে।

অনেক রক্ষণীয় দ্রব্য এখন বিনষ্ট; অনেকগুলি এত বড় যে, গৃহে রক্ষা করা অসম্ভব। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে ভাস্কোডিগামা যে তরণীতে কালিকট বন্দরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার এক শতাব্দী পরে ল্যাঙ্কাস্টার ও মিড্‌ল্‌টন কর্তৃক যে সকল স্লুপ ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখনও হুগলীর বক্ষে যে সকল পালের জাহাজ দেখা যায়, যে সকল বাষ্পীয়পোত এখন "ছয় দিনে চলিয়াছে ছ' মাসের পথ", এ সকলের আদর্শ রক্ষিত হইবে। প্রসিদ্ধ যুদ্ধাদির ক্ষুদ্র আদর্শও রক্ষার যোগ্য। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গের আদর্শও রক্ষিত হইতে পারে।

অনেকে এই স্মৃতিমন্দিরে দ্রব্যাদি দান করিতে পারেন। অনেকে মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার ন্যাসরূপে রক্ষা করিতেও পারেন। অনেকগুলি সহজেই পাওয়া যাইবে। টাউনহলের অন্ধকার কক্ষে হেষ্টিংসের ও কর্ণওয়ালিসের প্রস্তরমূর্ত্তি অনাদৃত অবস্থায় রক্ষিত। টাউনহলে পরলোকগতা সাম্রাজ্ঞীর উপহার তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর আলেখ্য প্রভৃতি বহু চিত্রাদি আছে। টাউনহল জীর্ণ—নিরাপদ নহে। তবেই—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি", সেইরূপ এই সকল চিত্রও টাউনহলের জীর্ণকক্ষ ত্যাগ করিয়া ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের নবনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল অঙ্কে গমন করিবে। হাইকোর্টে সার ইলাইজা ইম্পের দুইখানি চিত্র বর্ত্তমান। হয় ত বিচারপতিরা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে একখানি দান করিবেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিকারে প্রতিষ্ঠাতা সার উইলিয়ম জোন্সের একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি ও দুই তিনখানি আলেখ্য আছে। হয় ত সোসাইটী তাঁহার যশোবিস্তারাভিলাষী হইয়া ভিক্টোরিয়া হলে একটি দিবেন। সোসাইটীতে কর্ণওয়ালিস প্রভৃতি চারি জন বড়লাটের আলেখ্যও বর্ত্তমান। ভিক্টোরিয়া হলে সেগুলি অধিক লোকের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। ডালহৌসী ইন্‌ষ্টিটিউটেও এরূপ সম্পদের অভাব নাই। লর্ড ডালহৌসীর প্রস্তরমূর্ত্তিটি গভর্মেণ্ট হাউসের; ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সার জন লরেন্স কর্তৃক এই গৃহে প্রদত্ত হয়। গৃহের অলিন্দে লর্ড হেষ্টিংসের যে মূর্ত্তি বিদ্যমান, তাহার সহিত এ গৃহের সম্বন্ধ নাই। তাহার আবরণ লর্ড আমহর্ষ্টের সময় নির্ম্মিত;—পরে তাহারই পশ্চাতে ডালহৌসী ইন্‌ষ্টিটিউট নির্ম্মিত হয়। মেটকাফ হলে মেটকাফের তিনটি আবক্ষপ্রস্তরমূর্ত্তি বর্ত্তমান। হল গভর্মেণ্টের হস্তে আসিয়াছে। একটি মূর্ত্তি ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে আসিবে। বার লাইব্রেরীতে সুপ্রীম-কোর্টের জজ হাইডের স্বহস্তলিখিত চতুর্দ্দশ খণ্ড নথিপত্র আছে। হেষ্টিংস, ফ্রান্সিস, বারওয়েল, ক্লেভারিং ও মনসনের স্বাক্ষরিত কাগজপত্র কয় বৎসর পূর্ব্বেও চট্টগ্রামে কলেক্টারের এজলাস-গৃহে ছিল। হয় ত কীট কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া গিয়াছে।

সালেমের কলেক্টারের আফিসে সার টমাস মনরোর কাগজপত্র বিদ্যমান। এ সকল কাগজপত্র সযত্নে রক্ষা করিবার যোগ্য। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরই ইহাদের উপযুক্ত স্থান।

কেহ কেহ ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে একটি সুবৃহৎ পুস্তকাগার সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার আবশ্যক নাই। গভর্মেণ্ট মেটকাফ হল ও লাইব্রেরী ক্রয় করিতেছেন। সেই গৃহে গভর্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট হইতে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী নীত হইবে। বৃটিশ মিউজিয়ম হইতে এক জন অভিজ্ঞ গ্রন্থরক্ষককে পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, অতি সত্বরই এই

পুস্তকাগার অভিনব শ্রী লাভ করিয়া বৃটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হইবে।

এই স্মৃতিমন্দিরের মধ্যে একটি বৃহৎ হল থাকিবে। তাহাতে দরবারাদি বসিতে পারিবে। সময় সময় অন্যবিধ সম্মিলনও হইতে পারিবে।

গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে একটি কথা বলিবার আছে। এ দেশের জলবায়ু ধ্বংস-সহচর। যাহাতে হল স্থায়ী মালমশলায় নির্ম্মিত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। শ্বেত মর্ম্মর মন্দ নহে। হলটি পূর্ণাঙ্গ হইলেও—এমন করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে আয়তন বর্দ্ধিত করিবার অসুবিধা না হয়।

রাজপ্রতিনিধি মোটামুটি গৃহের ও গৃহসজ্জার এইরূপ আভাষ দিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, কল্পনা বিশদ ও বিপুল। যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে বৃহৎ ব্যাপারেই পরিণত হইবে বটে।

এ মাসের বহি।

জীবজন্তু। *

পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবজন্তু আছে। এক স্তন্যপায়ী জন্তুই কেবল ভারতবর্ষেই চারি শতাধিক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ও অস্থিহীন প্রাণীর কথা বলিতেছি না—তাহাদের সংখ্যা গণনা করে কে? শুধু স্তন্যপায়ী জন্তুই যে এত প্রকারের আছে, সে সকলের অস্তিত্বের কথাই আমরা কয় জন জানি? আমাদের বাসগৃহের নিকটে যে সকল জন্তু দেখিতে পাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অনেকের অভিজ্ঞতা তাহাদের অস্তিত্বজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। দেশের অপর অংশে যে অন্য কোনও প্রকারের জীব আছে, তাহাই আমাদের ধারণা নাই। আসামের মধ্যে যে উল্লুক আছে, ভারতবর্ষের মধ্যেই যে তিন প্রকারের গণ্ডার আছে, তাহা কি আমরা সকলে জানি? গণ্ডার নামে একটা জন্তু আছে, শুধু তাই জানি। উল্লুক বোধ হয় আফ্রিকা হইতে জাহাজে করিয়া আনা হয়,—এইরূপ আমাদের ধারণা।

এমন কি, যে সকল জীবজন্তু আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহাদের আচরণ ও প্রকৃতি কিরূপ, তাহারা কি খায়, কি প্রকারে চলা ফেরা করে, তাহাও কি কখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি? ব্যাঘ্র, ফেউ, হনুমান বা বিড়ালের বিষয় কত প্রকার গল্প প্রচলিত আছে, সেই সকল গল্পের মধ্যে কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা, তাহা কি আমরা অনুসন্ধান করি? এ

* শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, সিটি বুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০ মাত্র।

সকল বিষয় জানিবারও আমাদের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা নাই। মাতৃভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট প্রাণিবৃত্তান্তের অভাবেই যে আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহাতে এই সকল বিষয় কিছু কিছু শেখা যায়, এরূপ একখানি পুস্তক পাইলে আমাদের যে কেবল অজ্ঞতা দূর হয় তাহা নহে, সেই সকল বিষয়ে নূতন তত্ত্ব শিখিবার স্পৃহাও জাগরিত হয়। অনেক সময়ে আমরা 'ফেউ'এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া ব্যাঘ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকি; কিন্তু একবার যখন জানিতে পারি যে, ফেউ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জন্তু নাই, তখনই ফেউএর ডাক শুনিয়া সন্ধান করিবার ইচ্ছা হয় যে, শৃগালটা কেন অমন করিয়া ডাকে। নদী প্রভৃতি জলাশয় হইতে দূরে দলভ্রষ্ট হনুমানটি দেখিলে আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে সে সংগ্রামে পরাভূত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছে;—প্রচুরপরিমাণে আহার পাইলেও সে বেশী দিন দলভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে না। প্রাণিবৃত্তান্তের ভাল পুস্তক থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া যেমন এই সকল বিষয়ে অনেক নূতন কথা শিক্ষা করা যায়, তেমনি অনেক বিষয়ের অনুসন্ধানেও প্রবৃত্তি জন্মে। বাঙ্গলা ভাষায় এমন পুস্তক এত দিন একখানিও বাহির হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বেশ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, কিন্তু জীবতত্ত্ব বিষয়ে এত দিন আমাদের মধ্যে কেহই তেমন করিয়া লেখেন নাই। দুই একখানি ছোট ছোট পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় একখানি খুব ছোট স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, এমন বিষয় স্কুলে শিখিবার উপযুক্ত বলিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনে করিলেন না!

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জীবজন্তু" নামে একখানি সচিত্র সুবৃহৎ প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলায় প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃত, বিশদ ও ধারাবাহিক আলোচনা। সুখের বিষয়, গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে কল্পিত নহে। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ বালকবালিকাদিগের জন্য কল্পিত হইলেও, ইহা পাঠ করিয়া বয়স্কেরাও আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ডারবিনের "অরিজিন অব স্পীসিস্" নামক পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বে সকলেরই সংস্কার ছিল যে, যেমন নদীগর্ভে নানা প্রকারের উপলখণ্ড অসম্বদ্ধ বা এলোমেলো ভাবে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই পৃথিবীতে এত বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের পরস্পরের কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। নিউটন যেমন এক মাধ্যাকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থের মধ্যে এক আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা আছে, ডারবিনও তেমনি বিভিন্নপ্রকারের অসংখ্য জীবজন্তু একমাত্র আদিম জীবনধাতুময় মোনেরা হইতে উৎপন্ন হইয়া এত বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিয়া, জীবতত্ত্বশিক্ষার এক নূতন পথ বাহির করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশী, অস্থি, স্নায়ু বা ধমনী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এক প্রকার মনুষ্যেতর জন্তু হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ডারবিনই প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবজন্তুদের দেহের গঠনপ্রণালীর পরীক্ষা করিয়া আমরা যে কেবল তাহাদের বিষয়েই শিক্ষালাভ করি

তাহা নয়; তাহাদের দেহ ক্রমে বিকশিত হইয়া কিরূপে মানবদেহের গঠনে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিতে শিখিয়াছি। এখন মানবশরীরতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শুধু মানবদেহের পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হয় না, অন্যান্য জীবদেহের তত্ত্ব লইবারও আবশ্যক হয়। দ্বিজেন্দ্র বাবুর পুস্তকপাঠে এই দিকেও আমাদের মনোযোগ কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইবে।

জন্তুদের শরীরের সহিত মানবশরীরের যেমন একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাদের মানসিক বৃত্তির সহিতও মানবের মনোবৃত্তির তেমনই সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের মানসিক বা নৈতিক বৃত্তি সকলের উৎপত্তির বা ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে, বানর কুকুরের মনের ক্রিয়া সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক, তাহা আজকাল কেহ অস্বীকার করিবেন না। এখন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও জীবজন্তুর মানসিক ক্রিয়ার বিষয়ে কিছু অবগত না থাকিলে মানব-মনের ক্রিয়াও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। আমরা অনেকেই দেখিয়াছি যে, বানরেরা পরস্পরকে আদর যত্ন করে। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকে এ বিষয়ের একটি বেশ উদাহরণ দিয়াছেন।—"একবার সিমলা হইতে আলিপুর জীবনিবাসে দুইটা বাঁদর আনা হইয়াছিল। ছোট বাঁদরটা আহত হওয়ায় তাহাকে চিকিৎসার জন্য একটা খাঁচায় বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তার সঙ্গী বড় বাঁদরটা খাঁচার বাহিরে থাকিয়া, লোহার শিকের ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিত ও কত আদর করিত। দুঃখিতমনে খাঁচার কাছেই বসিয়া থাকিত, সেখান হইতে নড়িত না।" এই পুস্তকে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুদের সম্বন্ধেও এইরূপ বন্ধুর প্রতি স্নেহ ও দয়ার কথার অনেক উল্লেখ আছে।

পশুদের বুদ্ধির বিষয়েও অনেক গল্প এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক বানরের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসঙ্গে যে সকল ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহার একটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"বাঁদরেরাও যে ইট পাথর গড়াইয়া দেয়, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। একবার এক সাহেব ভারতবর্ষের দক্ষিণে কোন পাহাড়ে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিকটে এক স্থানে কতকগুলি বাঁদরের খুব কিচির-মিচির শব্দ শুনিলেন। তার পর দেখিতে পাইলেন যে, বাঁদরেরা ব্যস্ত ও ভীত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। তিনি পাহাড়ের পাশ দিয়া ঘুরিয়া তলদেশে আসিয়া দেখিলেন, একটা খুব বড় পাহাড়ী বোড়া সাপ একটা বাঁদর ধরিয়া গিলিতেছে। তাই আর সব বাঁদরেরা খুব কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া বাঁদরেরা কি করে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন, কয়েকটা খুব জোয়ান বাঁদর মিলিয়া একটা বড় পাথরের খণ্ড গড়াইতে গড়াইতে যেখানে সাপটা ছিল, ঠিক তাহারই মাথার উপরে পাহাড়ের ধারে আনিল, পরে সকলে মিলিয়া সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। পাথরটা সাপের মাথার উপর গিয়া পড়িল। এত উপর হইতে অত বড় পাথর পড়াতে সাপের মাথা একেবারে থেঁৎলাইয়া গেল, তাহাতে বাঁদরদের মহা আনন্দ হইল।"

ইহা পাঠ করিলে, মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকারের, তাহা কাহারও কি বলিতে সাহস হইবে? আন্দামান-দ্বীপবাসী অসভ্যেরা যে ইহা অপেক্ষা খুব বেশী বুদ্ধিবৃত্তির

পরিচালিন করিয়া থাকে, তাহা মনে হয় না। বানর কুকুরের বুদ্ধির ক্রিয়া দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হয় না। মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যে এই সকল নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের বুদ্ধিবৃত্তি হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে, তাহাই প্রমাণিত হয়।

কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন মিশরদেশবাসীরা বনের বিড়াল ধরিয়া তাহাকে গৃহ-পালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন কি তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এই বিড়ালই মানবচরিত্রের অনেক উন্নতবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে? দ্বিজেন্দ্র বাবু বিড়ালদের বিষয়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন। আমরা যখন এই গল্পগুলি পড়ি, বা আমাদের ঘরে বিড়াল-গুলি কিরূপে বাস করে—তাহা স্মরণ করি,তখন মনে হয়, ইহারা যেন আমাদের ঘরের আদুরে মেয়ে। তবে পেটের দায়ে ক্ষুধার সময় তাহারা যে একটু আধটু উৎপাত করে, আমাদের ঘরের ছোট ছেলেরা যে সেইরূপ অবস্থায় পশুপ্রকৃতি অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হয়, তাহা মনে হয় না।

জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে অতীতের ইতিহাসও আমরা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিতে পারি। কুকুর ও শৃগালের মধ্যে পরস্পরের কিরূপ সৌহার্দ্দ্য, তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ জন্মাবধি জ্ঞাতশত্রু দুইটি জন্তু একবংশসম্ভূত। বাড়ীতে কুকুর ও বিড়াল এক সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করে, কিন্তু কেহ কাহারও আত্মীয় নয়। কুকুর শৃগালের অতি নিকটসম্পর্কিত আত্মীয় হইলেও সুবিধা পাইলেই শৃগালবংশ ধ্বংস করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এই জ্ঞাতিশত্রুতা এতই প্রবল! একজাতীয় দুইটি জন্তু—একটি মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া পালিত হইয়াছে—আর একটি সেই আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই অবস্থায় আশ্রয়হীন জীবটির স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরি-চালন ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকায় তাহার ধূর্ত্তবুদ্ধি যে ক্রমশঃ বিকশিত হইবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। জ্ঞাতিশত্রু কুকুর মানবের সাহায্যে শৃগালকুলকে ধ্বংস করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে,শৃগালও বুদ্ধিপরিচালনা দ্বারা সেই সংগ্রামের মধ্য হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে শৃগালের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের প্রতি হিংস্র-বৃত্তিও বাড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু শৃগাল ও কুকুরের সংগ্রামের অনেকগুলি গল্প দিয়া এই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, শৃগাল ও নেকড়ে গৃহপালিত হইয়া কুকুর-রূপে পরিণত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকে এ বিষয়ের অবতারণামাত্র করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে অনেক প্রকার কুকুর আছে, তাহা 'জীবজন্তু' পড়িলেই জানা যায়। ইহাদের শারীরিক বল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ঘ্রাণশক্তি যে কত বিভিন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণও উক্ত পুস্তকে পাওয়া যায়। এত বিভিন্নতা কি করিয়া জন্মিল? সকল প্রকারের কুকুরই কি এক বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া পরে স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে জীবনসংগ্রামের ফলস্বরূপ এইরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, না, ইহাদের উৎপত্তির মূলও বিভিন্ন? দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকে এ বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন। এক-জাতীয় জন্তু বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া যে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া যাইতেছে, কুকুর-বংশ তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ।

পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে গিয়া অনেক কথার অবতারণা করিয়াছি। পুস্তকখানি যদি শুধু ছেলেভুলান ছবির বহি হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে এত কথা বলিতে হইত না। সমালোচ্য পুস্তকখানি ছবির বহি ও গল্পের বহি হইলেও, কেবল তাহাই নহে, ইহা বিজ্ঞানের বহিও বটে। ইহা বালকবালিকাদের পাঠ্য, বয়স্কদিগেরও পাঠ্য। ইহাতে প্রাণিবৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত, অথচ বিজ্ঞানের কাঠিন্য ও নীরসতা নাই। পুস্তকখানির এই প্রথম খণ্ড পাইয়া আমরা অবশিষ্টাংশ পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম। আশা করি, লেখক মহাশয় শীঘ্রই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন ও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে আর একটি কথা আমাদের মনে সর্ব্বদাই উঠিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা কি অসম্পূর্ণ! বিজ্ঞানের কোন কথাই বাঙ্গলা ভাষায় সহজে লেখা যায় না। Geology বা Biology কোন শাস্ত্র বাঙ্গলা ভাষায় লেখা এক প্রকার অসম্ভব। এই কলিকাতা নগরে বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য বহু সাহিত্যসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেও বঙ্গভাষা বিজ্ঞানালোচনার পক্ষে সরল হয় নাই। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের দৈন্য আজও ঘুচে নাই। ইংরাজীতে যেমন order, Genus, species, varietis প্রভৃতি কথা আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তদর্থব্যঞ্জক কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিশব্দ নাই। অথচ এই সকল শব্দ না হইলে জীবতত্ব ও ভূতত্ত্বের কোন কথাই লেখা যায় না। দ্বিজেন্দ্র বাবু এত পরিশ্রম করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার পুস্তকে পরিভাষা-রচনার কোন সূত্রপাত করেন নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান পুস্তকের রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট শব্দগুলির অনুবাদ করিলে তিনি উত্তরবংশীয়গণের আরও ধন্যবাদভাজন হইবেন।

উপসংহারে আমরা আশা করি, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রত্যেক শিক্ষিত-পরিবারে বালকবালিকাদিগের সহচর হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

কবিতা-কুঞ্জ।

তটিনী।

নিত্য তুমি কেঁদে ফের করি কুল-কুল,
তুলি' কত মর্ম্ম-ভরা সকরুণ তান,
কূল ত চাহ না তুমি; সতত আকুল
অকূলে ঢালিতে তব তাপ-দগ্ধ প্রাণ।

ক্ষুদ্রত্ব মহত্বে ঢালি—তাহাতে মিশিয়া,
অনন্তের কোলে সান্ত করি সমর্পণ,
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কিবা যাইছ বহিয়া
স্বামিত্ব আমিত্ব দিয়া করিতে বরণ!
আকুলিত ক্ষুদ্র হৃদি—হে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

কি আবেগে অনুরাগে নাচিয়া নাচিয়া,
গাহি' কত প্রণয়ের অব্যক্ত কাহিনী,
বাঞ্ছিত-মিলন-আশে চলেছ ছুটিয়া!
অনন্ত বিশ্বাস বাঁধা যার হৃদি-মূলে,
অকূল ত্যজিয়া, কভু, চায় সে কি কূলে!

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

জিজ্ঞাসা।

নীরবে শিখেছি প্রেম তোমারি কাছে,
মরমে তোমারি ছবি নীরবে আছে।
পাখীর ললিত তানে,
তব ছবি জাগে প্রাণে,
মলয়ে তোমারি প্রেম উছলি আসে।
তোমারি প্রেমের স্মৃতি সাগরে ভাসে।

চাঁদের মধুর হাসি,
তোমারি সুষমারাশি
তোমারি করুণাবিন্দু নীল আকাশে।
তোমারি সুরভি লভি সান্ধ্য-বাতাসে।

অনন্ত হ'য়েও তুমি
সান্ত-রূপে মরভূমি
জুড়িয়া রয়েছ কিবা মধুর রূপে।
সাধে কি সমাধি চাই ও প্রেম-কূপে!
বলেছিলে এক দিন মধুর হেসে,
জুড়াবে তাপিত প্রাণ নিকটে এসে।

সেদিন আসিবে কবে,
কাটাই একা গণি ভবে,
বল এ সাধনা মোর পূরিবে কবে?
অসীমে সসীমে কবে মিলন হ'বে?

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

সে।

সে ছিল আমার হৃদয়-বৃন্তে
পদ্মের মত ফুটিয়া;
যেন এসেছিল মূরতি বিকাশি'
আমারি গোপন আকাঙ্ক্ষারাশি,
আমার মনের সকল মাধুরী
নিয়েছিল যেন লুটিয়া।

সে ছিল একটি মধুর স্বপ্ন
আমার মুগ্ধ নয়নে,
বিশ্ব প্রকৃতি নিত্য নূতন
সুষমার হারে শোভিত তখন,
কঠোর কঠিন ধরাভূমি ছিল
বিলীন কুসুম-শয়নে।

সে ছিল আমার যৌবন-বনে
মৃদুল মলয়-লহরী,
পরশে তাহার কল্পনা-লতা
পল্লবে ফুলে হ'ত অবনতা,
মুখর কোকিল ছেয়ে দশ দিক
হরষে উঠিত কুহরি'।

সে ছিল আমার পরাণ-বীণায়
একটি ললিত রাগিণী;
নিশি দিনমান সে মধুর ধ্বনি
ঝঙ্কারি' চিতে উঠিত আপনি,
সে আমার ছিল চির সুধাধারা
নিখিল বিশ্বপ্লাবনী।

সে ছিল আমার অন্তরাকাশে
চির অচপল দামিনী;
চারিধার ঘিরি' নীরদ নীলিমা,
তারি মাঝে তার দীপ্তি প্রতিমা,
উজলি' ছিল সে মোর আঁধার
শুষ্ক জীবন-যামিনী।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

দূরে।

দেবী দূর হ'তে আমি গড়িব তোমারে
দেবতা মনের মত,
সাজাব দেউল মানসের মোর
অমূল্য রতনে যত।
দূরে থেকে আমি হেরিব তোমার
মহিমা গো নিশি দিন,
পাছে এ মলিন মর্ত্ত্যের ছায়ায়
ও দেবত্ব হয় ক্ষীণ।
উঠিবে যখন ধূপ-ধূনা-বাস
তোমার বরণ পানে
মর্ম্মের কাহিনী মুরছিবে পড়ি
জাগ্রত মহিমা-ধ্যানে!
আরতির দীপ্ত প্রদীপ-প্রভায়
কনক কোমল ছায়ে
যখন তোমার দূর দেবী ছায়া
উঠিবে উজ্জল হয়ে—
দূর হতে তুমি মধুর নয়নে
চেয়ো তবে একবার,
গণিব আমার জীবনের চির
সেই মহা পুরস্কার।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

বর্ষশেষে।

আজি বর্ষশেষে,—
ভাবি বসে বসে,
কি করেছি দেখি মিলায়ে!
নব বসন্তের গাঁথা ফুলদাম
কোথায় ফেলেছি হারায়ে?—
শূন্য ফুল সাজি, ভ্রমি বনে বনে,
মালিকার কথা শুধু ওঠে মনে,
কত সাধ ব্যথা দিয়ে সে যে গাঁথা
অশ্রু-শিশিরে ভিজায়ে!—
আকুল হৃদয় খুঁজি চারিধার,
কার শিরে বাঁধা মোর ফুলহার?
দিয়াছি কি কবে নিমেষে ভুলিয়ে,
অথবা গিয়াছে হারিয়ে?—
থাকে থাকে আসে নয়নেতে জল,
কেন আজি হেন হৃদয় বিকল,
কে নিল আমার নিজন-সম্বল
পথে একা পেয়ে কাড়িয়ে?—
কবে বনবীথি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
কি ধরেছি চাপি যুগল মুঠিতে,
নিজনে গোপনে খুলিয়া দেখিতে,
গিয়াছে পাখীটি উড়িয়ে?—
কোথা তরুতলে ধূসর সন্ধ্যায়,—
স্বপন-মগন ভেবেছি কাহায়?
কোন নদীকূলে অশ্বথের ছায়,
রচেছি মানস গাথাটি?—
দিয়ে আমারি—আমারি ব্যথাটি!
আজিকে মধুর মুক্ত বাতাসে,
মেলি তারা পাখা ভ্রমে দিশে দিশে,
সকল গুপ্ত,—হয়েছে মুক্ত!—
কে নেছে তুলিয়া ঢাকাটি?—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ফাল্গুন। '৺ সাম্রাজ্যেশ্বরী' এবং 'লোকান্তরিতা' স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত। এরূপ রচনা সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। 'গ্রাম্য পরিবার'—গল্পের হিসাবেও কিছু হয় নাই, চিত্রের হিসাবেও কিছু হয় নাই। চাকুরী করিতে গিয়া সাহেবের কাছে যে সহজে ছুটি পাওয়া যায় না, বৃষ্টিতে বাহির হইলে যে কাপড় ভিজিয়া যায়, এবং আছাড় খাইলে কর্দ্দমাক্ত হইতে হয়, অসুস্থ শরীরে যে অধিক আহার করা যায় না এবং করিলে উদরাময় হয়, এগুলি যে অতি কঠোর সত্য এবং মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এমনই করিয়া কি কাগজ পুরাইতে হয়? 'প্রেম গণিত'—অপূর্ব্ব প্রবন্ধ। ইহাতে প্রেমের সীমানির্দ্দেশ আছে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের দোহাই আছে, ডারউইন সাহেবের প্রেতাত্মার প্রত্যাদেশ আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের বুঝা না বুঝায় কিছু আসে যায় না—'ভারতীর' গ্রাহকবর্গ বুঝিলেই হইল। 'বাঙ্গালীর বিবাহ ও জনসংখ্যা'—এবারকার 'ভারতীর' এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিও উপাদেয়—সুচিন্তিত, সুযুক্তিপূর্ণ, সুলিখিত। সকল স্থলেই আমরা প্রবন্ধলেখকের সহিত একমত হইতে না পারিলেও প্রবন্ধটি যে সকলেরই পাঠ্য এবং সুপাঠ্য, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। 'আমাদের ভাবিবার বিষয়'—ভাবিবার বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের মধ্যে ভাবে কয় জন, ভাবিতে পারে কয় জন? আমরা যদি ভাবিতে জানিতাম ও তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? বিষয়টির বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইলে ভাল হয়। 'ভাষায় প্রাদেশিকতা'—অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। এত সংক্ষিপ্ত যে পড়িয়া কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে না—অন্ততঃ আমাদের হয় নাই। প্রবন্ধের শেষে লেখক বলিতেছেন যে, "স্থানীয় ভাষা সম্বন্ধে কোন একটি নিয়ম স্থাপন না করিলে লেখকদিগের বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভব। 'সাহিত্যসমাজ' বা 'সাহিত্যসভার' সভ্যগণ এ বিষয়ে অগ্রসর হইবেন কি?" বিশেষ কোন গোলযোগ ত আজি পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায় নাই। আর, 'সাহিত্যসমাজ' বা 'সাহিত্যসভার' নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিবে কে? 'শোভাবতী'—একটি গল্পের কিয়দংশ। উড়িয়াদের সমাজের খণ্ড চিত্র হিসাবে মন্দ হয় নাই। তবে, লেখক যে উড়িষ্যার সমাজপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং তাহার চিত্র আঁকিবার বিশেষ অধিকারী, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি কিছু অধিক আয়াস পাইয়াছেন। এত আয়াস স্বীকার করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 'প্রেত-তত্ত্ব'—ভৌতিক বিজ্ঞান ও ভৌতিক ঘটনার সমাবেশ। লেখক স্বয়ং ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং প্রকারান্তরে পাঠকদিগকেও বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। তিনি গম্ভীরভাবে, অথচ একটু অবজ্ঞার সহিত, বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি ভূত দেখিতে পায় না, ভূত দেখিবার ফ্যাকল্টি তাহার নাই। প্রেততত্ত্বের এমন সরল, সুন্দর, অতি-পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখা যায় নাই। 'চিরকুমার-সভা' এখনও শেষ হয় নাই; তবে, যেরূপে শেষ হইবে, তাহা একরূপ বুঝা যায়।

প্রদীপ। ফাল্গুন। 'স্বর্গীয় দিগম্বর সান্ন্যাল'—একটি জীবন-চরিত। জীবনচরিত কি যার তার লিখিতে আছে। এই বঙ্গদেশে কত শত ছাত্র যে করাল দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নের মধ্যে থাকিয়া, পর-গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া, পরান্নে জীবনধারণ করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছে, এমন কি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ৪, টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছে; কত লোক যে উকীল হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন; কত লোক যে দীন দুঃখীর কষ্টমোচনের জন্য অকাতরে দান করিয়াছেন, লেখক কি তাহার হিসাব রাখেন? ইঁহাদের সকলেরই যদি এক একটি জীবনবৃত্ত লিখিত হয়, তাহা হইলে ব্যাপার ত নিতান্তই মারাত্মক হইয়া উঠে। লেখক বলিতেছেন, "এই আখ্যায়িকার সমস্ত বৃত্তান্তই আমরা তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি।" তবে এত ভুল কেন? দিগম্বর বাবু বহরমপুর কলেজে পড়িতেন। লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকা বৃত্তি পাইলেন।" বহরমপুর

কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০্ টাকা মাত্র বৃত্তি পাওয়ার
কথা এই প্রথম শুনিলাম। হয় তিনি চৌদ্দ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, না হয় ও থম
বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন নাই। আসল কথা, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।
তার পর ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষার কথা। "যদিও পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার
ভাগ্যে এবার বৃত্তিলাভ ঘটিল না"—ইহার অর্থ কি? "৬০্ ষাট টাকা বেতনে তিনি বহরমপুর
স্কুলের হেড মাষ্টারী পদ গ্রহণ করিলেন।" একটি ছত্রে তিনটি ভুল। প্রথম, বহরমপুর
স্কুল বলিয়া কোন বিদ্যালয় নাই এবং কখনও ছিল না। দ্বিতীয়, দিগম্বর বাবু হেডমাষ্টার
নিযুক্ত হয়েন নাই; তিনি পঞ্চম মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয়, তাঁহার বেতন ৬০্
টাকা ছিল না, ৫০্ টাকা ছিল। প্রবন্ধটির আর অধিক পরিচয়ের বোধ হয় প্রয়োজন নাই।
'অল্-বেরুণী' সুপাঠ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। 'অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর'—এবারকার 'প্রদী-
পের' এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। লেখক দেববিজ্ঞান ও প্রতিভের আলোচনা করি-
বার অধিকারী বটেন, এবং আলোচনাও বিশদ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কিন্তু এই
প্রবন্ধটি ছোট অক্ষরে ছাপা হইল কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'জীবনে-
মরণে'—একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটি এই—এক বালক ও এক বালিকা পরস্পরের প্রেমে পড়িয়া-
ছিল, কিন্তু তাহাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বিবাহ অসম্ভব হইলেই যে চুম্বনটা
অসম্ভব হইবে, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। সুতরাং এক দিন জ্যোৎস্নারাত্রে "প্রেমের প্রথম
চুম্বন" হইল। লেখক লিখিতে ভুলেন নাই যে, সেই চুম্বনটার খাতিরেই সে রাত্রিটা পূর্ণিমার
রাত্রি হইয়া পড়িয়াছিল। সে যাহা হউক, অন্য পাত্রের সহিত নায়িকার বিবাহের সম্বন্ধ
স্থির হইল। বিবাহের রাত্রে নায়িকা আফিম খাইয়া মরিল। নায়ক এমন পাপকার্য্যটা
করেন নাই বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা যাহা গুরুতর তাহা করিয়াছেন, অর্থাৎ একটি চাকরী
লইয়া মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিয়াছেন এবং 'প্রতিক্ষণে মিলনের দেবতা মঙ্গলময় মৃত্যুর প্রতীক্ষা
করিতেছি' বলিয়া পাঠকদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত'—রবীন্দ্র বাবু
'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' বঙ্গভাষার শব্দদ্বৈত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই
'সামান্য ত্রুটি' এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতেও যে ত্রুটি নাই, এমন নহে;
তবে এ বিষয়ের যে আলোচনা হইতেছে, ইহা আহ্লাদের বিষয়। 'হতভাগ্য' একটি হৃদয়গ্রাহী
গল্প; রচনাপ্রণালীও সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। লেখকের গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে।
'সাহাজাহান বাদসাহের দৈনিক জীবন'—সংক্ষিপ্ত হইলেও জানিবার কথা অনেক আছে।

পুণ্য। অগ্রহায়ণ। 'বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা'—সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয় একটি সুলিখিত
প্রবন্ধ। পাশ্চাত্য বিবাহপ্রণালী অপেক্ষা হিন্দুর বিবাহপ্রণালী যে অনেক উচ্চ অঙ্গের, লেখক
তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। হিন্দু বিবাহের
মধুর, কোমল, শান্ত, পবিত্র ভাব যে এই প্রবন্ধে সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই, তাহা লেখকের
দোষ নহে। এরূপ বিশাল বিষয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যথাযথরূপে আলোচিত হইতে পারে
না। যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য রীতি পদ্ধতির অন্ধ
উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধ ধীরভাবে পড়িতে অনুরোধ করি।
'পিতৃগণ' একটি গম্ভীরপ্রকৃতির সযত্ন-লিখিত প্রবন্ধ। এই প্রকৃতির প্রবন্ধের অংশমাত্র
পড়িয়া মতামত প্রকাশ করা চলে না; তাহা করিলে, লেখকের উপর দৌরাত্ম্য করা হয়।
'নস্যদানী'—ইংরেজি হইতে অনুবাদিত একটি গল্প। গল্পটির প্রশংসা এই যে, ইহা পড়িতে
আরম্ভ করিলেই শেষ করিতে হয়। খাদ্যপাকসম্বন্ধীয় রচনাগুলি পড়িয়া বড় ক্ষোভ
উপস্থিত হয়। ক্ষোভ এই যে, রন্ধন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ আনাড়ি। পরীক্ষা করিতে পারি
নাই, সুতরাং মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। 'য়্যান্টিগণ'—প্রাচীন গ্রীসের একটা
প্রচলিত গল্প। গল্পটা শিক্ষিতমাত্রেই অবগত আছেন। ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।